শনিবারের চিঠি Gift No
২০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৫

গান্ধীচরিত

সত্য

১৯৪২ সালের আন্দোলনে এবং সেই বৎসর দুর্গাপূজার সময়ে বিপুল ঝড় এবং বন্যায় মেদিনীপুর জেলাকে বহু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও তমলুক এবং কাঁথি মহকুমার অধিবাসীগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নিজেদের সাধ্যমত দেশের শাসনকার্য চালাইয়া যাইতেছিলেন। ইংরেজ-সরকার বহুবিধ শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তাঁহাদিগকে কাবু করিতে পারে নাই। অবশেষে গান্ধীজী মুক্তিলাভের পর যখন কংগ্রেসকর্মীগণকে গোপনে থাকিতে নিষেধ করেন, তখনই শুধু মেদিনীপুরের কর্মীগণ সরকারের নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন। মেদিনীপুরের শৌর্য, দৃঢ়তা প্রভৃতির সংবাদ গান্ধীজীর নিকট পৌঁছিলে তিনি তাহার যথোচিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। আবার যে যে কার্যের জন্য মনে হইয়াছিল যে, কংগ্রেসকর্মীগণ অহিংসার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, সেগুলির জন্য তিনি তাঁহাদিগকে সমালোচনা করিতেও বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন নাই।

১৯৪৫ সালের শেষভাগে গান্ধীজী বাংলা, আসাম এবং মাদ্রাজ সফরে বাহির হইয়া পড়িলেন। তিনি ওয়ার্ধা হইতে যখন যাত্রা করেন, তাহার অব্যবহিত পূর্বে আমি আশ্রমবাসী জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে পত্র পাই, যেন গান্ধীজী বাংলায় পৌঁছিলে আমি অতি-অবশ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। নভেম্বর মাসের ২ তারিখে গান্ধীজী সোদপুর আশ্রমে পৌঁছিলে তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠান এবং অল্প কয়েক মিনিট কথাবার্তার পর আমি চলিয়া আসি। পরে বেশিক্ষণ কথা বলিবার জন্য তিনি আমাকে নির্দেশ দেন।

মহাত্মাজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় আমার কখনও ছিল না। তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছি, তাঁহার লেখা সংগ্রহ করিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছি; সেই সূত্রে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হইয়াছে। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে ওয়ার্ধা আশ্রমে একবার তাঁহার সহিত দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, দুই দিন প্রায় তিন ঘণ্টা তর্ক-বিতর্কও করিয়াছিলাম; কিন্তু ঠিক

যাহাকে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পরিচয় বলে, তাহার সূত্রপাত ১৯৪৫ সালের শেষভাগেই লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম।

নভেম্বর মাসের ৪ তারিখ, বেলা ৪-১৫ মিনিটের সময়ে তিনি তাঁহার বৈকালীন আহারের সময়ে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেবারত কর্মীগণ তাঁহার জন্ম দুধ, ফল প্রভৃতি রাখিয়া চলিয়া গেলেন। পিয়ারেলালজী অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন, নিকটে আমি একাই বসিয়া রহিলাম। তিনি আরম্ভ করিলেন:

তোমাকে ডাকিয়াছি, তাহার একটি কারণ আছে। তুমি আমার লেখা হইতে সংকলন প্রকাশ করিয়াছ, কিন্তু তুমি শুধু তাহা তো কর না, আমার মতামত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টাও কর। সেখানে তোমার একটি ভুল হইয়া থাকে, আমি সে বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিতে চাই।

কথাটি শুনিয়া একটু দমিয়া গেলাম। ভয়ও হইল। কারণ পাছে কোথাও ভুল হয়, আমার নিজের সংস্কারের প্রভাবে পাছে গান্ধীজীর মতামতকে বিকৃত করিয়া ফেলি, এই আশঙ্কায় আমি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াই চলিতাম। আমি জানিতাম, গান্ধীজী গভীরভাবে ভগবানে বিশ্বাস করেন। তাঁহার নিকট ভগবান এবং মানুষ এক হইয়া গিয়াছে। আমি গান্ধীবাদের ব্যাখ্যাকালে, স্বীয় সংস্কারের বশবর্তী হইয়া গান্ধীজীর ভগবদ্ভক্তির দিকটি কখনও প্রকট করি নাই, কিন্তু মানবাত্মার প্রতি তাঁহার অবিচল প্রেম এবং স্থির বিশ্বাসের প্রকাশ যথেষ্ট করিয়াছি। ইহাকে একদেশদর্শিতা হয়তো বলা যাইতে পারে, কিন্তু গান্ধীজী যে ভাবে আমাকে ভ্রান্তির, বা হয়তো অপব্যাখ্যার অপবাদ দিলেন, জ্ঞানত সেরূপ কিছু করিয়াছি বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। তাই আশঙ্কা হইল, কোথাও অজানিতে কিছু কি ভুল করিয়া বসিয়াছি? মৌন হইয়া তাঁহার নির্দেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

গান্ধীজী তখন বলিলেন, তুমি আমার লেখারই শুধু সংগ্রহ-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছ। কিন্তু আমাকে কাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে দেখ নাই। আমি যাহা লিখি, তাহাতে আমার যে রূপের প্রকাশ, তাহা তো আমার সমগ্র প্রকৃত রূপ নহে। তুমি যদি আমার কাছে থাক, আমার সঙ্গে ভ্রমণ কর, তখন প্রতিদিনের ঘটনাবলীর ভিতরে এমন অনেক বস্তু চোখে পড়িবে যাহার দ্বারা তুমি আমাকে আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে।

একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বহুদিন পূর্বে মেদিনীপুরে আমি একবার সফরে

গিয়াছিলাম। তখন নাড়াজোলের রাজবাটীতে আমি অতিথি হই। সেখানে সোনার থালায় আহার পরিবেশন করা হয়। সোনার থালায় খাওয়া আমার নীতিবিরুদ্ধ; কিন্তু তখন মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া, কিছু না বলিয়াই আহার করিলাম। এমনই দুর্বলতা আমার মধ্যে রহিয়াছে। তাহার পরিচয় না পাইলে তুমি আমার সম্যক্ পরিচয় পাইবে না; আদর্শ হইতে আচরণে কতখানি অন্তর পড়িতেছে, তাহা না জানিলে আদর্শকেই ঠিকমত বুঝিতে পারিবে না। পুনরায় উদাহরণ দিয়া কহিলেন, একবার ট্রেনে চলিয়াছি, আমার আহারের সময় উপস্থিত হইল। সেদিন আঙুর খাইতেছিলাম দেখিয়া জনৈক সহযাত্রী সমালোচনার ভাষায় আমাকে বলিলেন, তুমি দিনে ছয়-পয়সার মত আহার কর শুনিয়াছিলাম, গরিবের সঙ্গে এক হইয়া চল শুনিয়াছিলাম, এই কি তাহার নমুনা? আমি বন্ধুটিকে আদর করিয়া বলিলাম, আপনি আমাকে দেখিয়া ফেলিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি চাই, আপনি আমার দোষ-ত্রুটিগুলি প্রকাশ করিয়া দেন, লোকে আমার সত্য পরিচয় লাভ করুক।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় স্বামী— তেমনই আমাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে, আমি নিজে লোক খারাপ নয়, কিন্তু যাহারা আমার চারিদিকে থাকে তাহারা কপট এবং মিথ্যাচারী। আমি স্বামীজীকে বলি যে, আমি তো সঙ্গীদের লইয়া সমবেতভাবে একটি আদর্শ সাধনার চেষ্টা করিতেছি। সে ক্ষেত্রে যদি কোনও দোষত্রুটি ঘটে তাহা হইলে আমি ভাল এবং তাঁহারা খারাপ, এরূপ কখনও হইতে পারে না। দোষ নিশ্চয়ই আমার মধ্যে আছে, আমারই কোনও ত্রুটির বশে আদর্শ বিকৃত আকারে প্রকাশিত হইতেছে।

এই কথা শুনিবার সময়ে ব্যক্তিগতভাবে আমার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। কারণ গান্ধীজীর মত কোনও মানুষ সাধনার শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তে লব্ধ আদর্শকে নিজের অন্তরের সত্যতম প্রকাশ না বলিয়া, বরং আচরণের মধ্যে যতটুকু আদর্শকে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন, শুধু তাহাকেই নিজের প্রকৃত প্রকাশ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন—ইহাতে বাস্তবিকই আশ্চর্য হইবার কথা। আর শুধু তাহাই নহে, আমার মত অজ্ঞানিত এক ব্যক্তির নিকটে অকুণ্ঠিতভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন, তাহাতে আরও বিস্মিত হইলাম। তিনি অবশেষে এমন নিমন্ত্রণও করিলেন যে, স্বীয় আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি যে-সকল বিভিন্ন সংস্থা গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেগুলিকে

তাঁহার উপস্থিতির সময়ে এবং অনুপস্থিতিকালেও কার্যরত অবস্থায় যেন আমি নিরীক্ষণ করি। তবেই সত্য ও অহিংসার আদর্শকে বাস্তবিক কতখানি কার্যত আয়ত্ত করা যায়, আমি বুঝিতে পারিব। শুধু, মানুষ চিন্তার শিখরে উঠিয়া যাহা লাভ করে, তাহাতে তাহার আশা ব' আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়; বাস্তব তাহা হইতে অনেক পিছনে পড়িয়া থাকে। বাস্তবকে পরীক্ষা করিবার প্রয়োজনই বেশি, তবেই আমরা আদর্শকে উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠা করিবার কৌশল আয়ত্ত করিব। প্রসঙ্গক্রমে তিনি এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহার ভয় হয়, পাছে তাঁহার অবর্তমানে এই সকল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জড়ত্বপ্রাপ্ত হইয়া যায়।

১৯৪৫ সালের ৪ঠা নভেম্বর আমার নিকট স্মরণীয় দিন। গান্ধীজীর নূতন একটি রূপ আমার নিকটে প্রতিভাত হইল। কথাবার্তার মধ্যে এক সময়ে একটু সুরের আভাস কানে বাজিয়াছিল, যাহা কিছুক্ষণের জন্য আমার ভাল লাগে নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার উপরোক্ত স্বামীজীর প্রসঙ্গে যখন কথা বলিতেছিলেন, তখন একবার এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, পরবর্তীকালে সেই স্বামীজীর নিজের চরিত্রে কতকগুলি দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং তিনি লোকচক্ষে খারাপ বলিয়া ধরা পড়িয়া যান। গান্ধীজীর মুখে এই ক্ষীণ নিন্দাসূচক বাক্য ভাল লাগে নাই; এবং আরও ভাল লাগে নাই এইজন্য যে, ক্ষণেকের জন্য আমার মনে হইয়াছিল, তিনি হয়তো নিন্দাস্তুতির প্রয়োজনকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। হয়তো আমার ভুল হইয়া থাকতে পারে; হয়তো বা সত্যই তাঁহার মধ্যে অপরের সমর্থনের (প্রশংসার নয়) প্রয়োজন অথবা সমালোচনারও প্রয়োজন ছিল। এই প্রসঙ্গে পরমহংসদেবের কথা সময়ে সময়ে স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছি যে, সিদ্ধপুরুষগণেরও জীবনে অহং-কারের দাগ থাকিয়া যায়। পদ্মফুলের পাপড়ি অথবা নারিকেল-সুপারির বালতো খসিয়া গেলেও যেমন তাহার দাগ থাকিয়া যায়, ইহাও তেমনই। ইহাতে কাহারও কোনও অনিষ্ট হয় না।

যাহাই হউক, সেই দিন মানুষ হিসাবে গান্ধীজীর সান্নিধ্য এবং পরিচয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

বিহারযাত্রার বিষয়ে আলোচনা

২৭এ ডিসেম্বর ১৯৪৬। অর্থাৎ প্রায় এক বৎসর পরের ঘটনা। গান্ধীজী তখন দাঙ্গায় বিধ্বস্ত নোয়াখালি জেলার শ্রীরামপুর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করিতেছেন। সঙ্গে দুই জন মাত্র সাথী, তাহার মধ্যে পরশুরাম নামে ত্রিবাঙ্কুরের জনৈক তামিল কর্মী ছিলেন, তাঁহার বয়স তিরিশের কিছু কম হইবে। নোয়াখালিতে তখন গান্ধীজী প্রতিদিন হিন্দু এবং মুসলমানের সহিত মিশিয়া উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের ভাব ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যে বিহারের দাঙ্গা শেষ হইয়া গিয়াছে; তাহার ফলে অনুমান সাত-আট হাজার লোক মারা গিয়াছে। বিহারে দাঙ্গা থামাইবার জন্য গান্ধীজী আংশিক উপবাসের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং পত্র ও লোক মারফৎ বিহারের মন্ত্রী-গুলীকেও মুসলমানদের পুনর্বসতির বিষয়ে বিবিধ উপদেশ দিতেছিলেন। অর্থাৎ সে কাজ দূর হইতেই পরিচালিত হইতেছিল; কিন্তু নোয়াখালির দুরূহ কাজকে তিনি নিজের জন্য আলাদা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

এমনই সময়ে একদিন শ্রীরামপুর গ্রামে আমি লক্ষ্য করিলাম, গান্ধীজী পরশুরামের সঙ্গে গভীর আলোচনায় মগ্ন রহিয়াছেন। পরশুরামের দৃঢ় বিশ্বাস, গান্ধীজীর পক্ষে এখনই নোয়াখালি ত্যাগ করিয়া বিহারে যাওয়া উচিত, নয়তো নোয়াখালির মুসলমানের নিকট তিনি কোন্ মুখে হিন্দুদের প্রতি সুব্যবহারের প্রত্যাশা করিবেন? আর গান্ধীজী তাঁহাকে ধীরভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন যে, বিহারের কাজ তিনি কংগ্রেসপন্থী মন্ত্রীদের মারফৎ চালাইয়া যাইতেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার এখন সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই। পরশুরাম কিন্তু কিছুতেই সে কথা মানিতে প্রস্তুত নন। প্রায় এক ঘণ্টা তর্ক করিয়াও গান্ধীজী তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলেন না; অথচ গান্ধীজীর এক ঘণ্টার যে কত মূল্য তাহার হিসাব করা যায় না। অতিশয় গুরুতর প্রশ্ন আলোচনা করিতে আসিলেও আমরা বহু ব্যক্তিকে পনরো-কুড়ি মিনিটের বেশি সময় দিতে পারিতাম না। সেইজন্য পরশুরামের সঙ্গে আলোচনার পরে আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি আজ এমনভাবে সময় নষ্ট করিলেন কেন? পরশুরামকে নিষেধ করিলেই তো পারিতেন। তিনি উত্তর দিলেন: না, সময় কিছুই নষ্ট হয় নাই। পরশুরাম সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন সৎ ব্যক্তি। তাহাকে আমার বিহার না যাওয়ার কারণ যখন বুঝাইতে পারিলাম না, তখন আমার

যুক্তির মধ্যে কোথাও না কোথাও ত্রুটি আছে। যদি আমার যুক্তি নির্দোষ হয়, তাহা হইলে শুনিবামাত্র পরশুরামের তাহাতে বিশ্বাস জন্মিত। তাহা যখন হয় নাই, আমি আলোচনা করিয়া যুক্তির দুর্বলতা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম

নিজের সত্যদৃষ্টিতে ভুল হইতে পারে, অতএব অপরের সমালোচনা বিচার করা উচিত—গান্ধীজী সর্বদা এই নীতি মানিয়া চলিতেন। প্রতিদিনের চিঠি-পত্রের মধ্যে তিনি দেশের মতামত এবং আবহাওয়ার সম্যক্ পরিচয় পাইতেন। নানা সময়ে নানা জন গান্ধীজীকে প্রশংসা অথবা নিন্দা করিয়াছেন। নিন্দামূলক চিঠিগুলি পাত্রবিশেষে গালিগালাজ পর্যন্ত নামিয়া আসিত। সমর্থনসূচক চিঠি গান্ধীজী পড়িতে চাহিতেন না এমন নহে, কিন্তু তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল সমালোচনাসূচক চিঠির উপরে। সেগুলিকে পড়িয়া তিনি কোনও সার পদার্থ আছে কি না তাহা যাচাই করিবার চেষ্টা করিতেন। কিছু আবিষ্কার করিতে পারিলে সে বিষয়ে প্রার্থনান্তিক সভায় আলোচনা করিতেন, কখনও বা 'হরিজনে'র জন্য প্রবন্ধাদিও লিখিতেন।

কলিকাতায় অনশন

আরও প্রায় এক বৎসর পরের ঘটনা। তারিখ ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সাল। মুসলিম-লীগের ঘোষিত 'ডিরেক্ট অ্যাক্‌শনে'র দিন হইতে কলিকাতায় সাম্প্রদায়িকতার যে তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছিল, অকস্মাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্তিদিবসকে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার পরিবর্তে শহরে অভাবনীয়ভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সূচনা দেখা গেল। ১৫ই আগস্ট হইতে ৩০এ পর্যন্ত শান্তিতে কাটিল। কিন্তু ৩১এ তারিখে পুনরায় শহরে প্রচণ্ড আকারে দাঙ্গা শুরু হইয়া গেল। ১লা সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর শিবিরের পাশেই মুসলমান-শরণার্থীবাহী একটি লরির উপরে বোমার আঘাত হয় এবং দুই-তিনজন তৎক্ষণাৎ মারা পড়ে। এবারকার দাঙ্গার বিশেষত্ব, হিন্দু-সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেই প্রথম আঘাত আরম্ভ হয়।

গান্ধীজী সমস্ত শহরের বৃত্তান্ত শুনিয়া শহরবাসীর শুভবুদ্ধি ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমরণ অনশনের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। বাংলার প্রধান মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রদেশপাল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী

প্রভৃতি গান্ধীজীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গান্ধীজী সংবাদপত্রে দিবার জন্য একটি বিবৃতি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা রাজাজী প্রমুখ কয়েক-জন নিকটতম বন্ধুকে দেখানো হইল। রাজাজী নানা ভাবে গান্ধীজীকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি দুই দিনের সময় ভিক্ষা করিলেন এবং বলিলেন, কংগ্রেস এবং গবর্মেণ্টের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া শহরে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করা হইবে, অতএব অন্তত এই দুই দিন গান্ধীজী যেন অনশন হইতে বিরত থাকেন। গান্ধীজীর পক্ষে যুক্তি ছিল, এই দুই দিন কি তিনি নিজে কিছুই করিবেন না, শুধু অপরের চেষ্টা নিরীক্ষণ করিতে থাকিবেন? তাঁহার উচিত প্রতি নগরবাসীকে ইহাই বুঝানো যে, আজ ভারতবর্ষে হিন্দুই হউক অথবা মুসলমানই হউক, উভয়ে সমান-অধিকারভোগী প্রজা। প্রত্যেকে যাহাতে রাষ্ট্রের প্রতি আন্তরিক আনুগত্য স্বীকার করে সেজন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের দ্বারা সে কার্য সম্পূর্ণ পণ্ড হইয়া যাইবে, অতএব দাঙ্গা পরিহার করিয়া উভয়ে কি করিয়া ভ্রাতৃভাবে থাকিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। গান্ধীজী বলিলেন, শরীরে আমার এত পরিশ্রম কুলাইবে না; এবং ব্যক্তিগতভাবে উন্মত্ত জনতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি তাহাদের কিছু বুঝাইতেও পারিব না। অন্তত গতরাত্রে যাহারা বেলেঘাটার শিবির আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে মুখের কথায় শান্ত করিতে আমি অসমর্থ হইয়াছিলাম। অতএব আমাকে অনশনের দ্বারা সর্বসাধারণের চিত্তকে স্পর্শ করিতে হইবে, তখন তাহারা যুক্তির কথা শুনিবে। আমরণ অনশনের ব্রত এই নিমিত্তই গ্রহণ করিতেছি।

রাজাজী সমস্ত শুনিলেন এবং গান্ধীজীর প্রস্তাবিত বিবৃতিটি পড়িতে লাগিলেন। তাহার মধ্যে এক জায়গায় ছিল—

What my word in person cannot do my fast may. It may touch the hearts of all the warring elements even in the Punjab if it does in Calcutta. I therefore begin fasting from 8-15 p.m. to end only if and when sanity returns to Calcutta. I shall as usual permit myself to add salt and soda bicarb and sour limes to the water I may wish to drink during the fast.

রাজাজী এই অংশটি পড়িয়া বলিলেন, যদি আমরণ অনশনের ব্রতই গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে লবণ ও সোডা যোগ করার কথা বুঝি, লেবুর রস জলে মিশাইবার হেতু তো বুঝিলাম না। গান্ধীজী তৎক্ষণাৎ 'and sour limes' শব্দ তিনটি কাটিয়া আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, দেখ, তুমি অল্প দিন আমার সঙ্গে রহিয়াছ, রাজাজী দীর্ঘদিন আমাকে অন্তরঙ্গভাবে জানেন। সেই-জন্য সত্যই যে মুহূর্তে আমার দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে, সেই মুহূর্তে উহা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে নাই। শরীরের প্রয়োজনে, উপসর্গ নিবারণের জন্য লবণ ও সোডাই যথেষ্ট; লেবু অনাবশ্যক; এবং আমার বাঁচিয়া থাকিবার বাসনার বশেই অসতর্ক মুহূর্তে আমি উহা যোগ করিয়াছিলাম।

নিজের অন্তরে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি অসত্য, সে সম্বন্ধে এরূপ নিরলস সদাজাগ্রত দৃষ্টি আর কোনও ব্যক্তির মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। বিজ্ঞানসেবীদের বেলায় বিজ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য এই সতর্কতা অভ্যস্ত ব্যাপার, তেমন বৈজ্ঞানিকও দর্শন করিয়াছি। কিন্তু শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের প্রাত্যহিক আচরণের ব্যাপারে গান্ধীজীর মত এরূপ সতর্কতা, এই সত্যনিষ্ঠার তুলনা আর কোথাও পাই নাই।

অথচ এমন কথাও বলিব না যে, ইহা হইতে কখনও তাঁহাকে বিচ্যুত হইতে দেখি নাই। বিচ্যুত হইতে সময়ে সময়ে দেখিয়াছি বটে; কিন্তু সে বিচ্যুতির ক্ষেত্র স্বল্পপরিসর এবং কাল সংকীর্ণ। বেশিক্ষণ সে অবস্থা থাকে নাই; সাহসভরে ভুল দেখাইয়া দিলে তিনি সাধ্যমত তাহা বিচার করিয়াছেন এবং স্বীকার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র জীবনের মুহূর্তগুলি একত্র করিলে এমন সজাগ দৃষ্টি এবং বিচারশীল মনের পরিচয় কদাচিৎ পাওয়া যায়। সত্যকেই তিনি সর্বদা সর্বোত্তম আসনে বসাইতেন। এবং সেই সত্যের সন্ধানে নিজের বিচারের উপরে যেমন নির্ভর করিতেন, অপরের সমালোচনাকেও তেমনই মর্যাদার স্থান দিবার যথাসম্ভব চেষ্টা করিতেন।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

—

"দেশের ছেলেরা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিবার পর ভয়ানক বিপদে পড়িয়া যায়। ইহার পর তাহারা কি করিবে, তাহা খুঁজিয়া পায় না। প্রকৃত শিক্ষা তাহাকেই বলিব, যদ্দারা মানসিক শক্তি বোধশক্তি ও শারীরিক শক্তির বিকাশ ঘটিবে। শিক্ষাকে হইতে হইবে বেকারের বীমার স্বরূপ—যাহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সকলেই শিক্ষানুরূপ কাজ পাইবে।"—মহাত্মা গান্ধী

নব-বর্ষ *

আজ নব-বর্ষের প্রথম দিনে প্রণাম জানাই তোমাকে হে পূজনীয়, প্রীতি-নিবেদন করি হে বন্ধু, আশীর্বাদ করি হে কল্যাণীয়। আজ শ্রদ্ধান্তরে স্মরণ করি তাঁহাদের, যাঁহারা সেই বহু বহু শতাব্দী পূর্বে সিংহ-ব্যাঘ্র-ঋক্ষ-উগ্র-সর্প-মাতঙ্গ-অধ্যুষিত অরণ্যের নিবিড়তায় আরম্ভ করিয়াছিলেন মানবজীবনের প্রথম জয়-যাত্রা। বল্গার উপকূলে, পামীরের উপত্যকায়, ইরাণের পর্বতচূড়ায়, কাশ্মীরের ভূস্বর্গে, সপ্তসিন্ধুর তীরে তীরে ভ্রাম্যমান আমাদের সেই নগ্ন অর্ধনগ্ন পূর্বপুরুষগণকে, জীবন-সংগ্রামের নিষ্ঠুর সংঘর্ষে সমুড্ডীন রাখিয়াছিলেন যাঁহারা প্রাণবন্ত আত্মমহিমার বিজয়-বৈজয়ন্তী।

একান্ত আশাভরে আজ কামনা করি সেই ভবিষ্যৎকে, যে ভবিষ্যতে সফল হইবে কবির স্বপ্ন—'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানব-জাতি'।

হিংসা, দ্বেষ, ক্ষুদ্রতা, নীচতার কারাগারমুক্ত সেই স্বাধীন মানবতাকে আজ অভিনন্দন জানাই—যাহার পদধ্বনি শুনিয়াছি ইতিহাসের ঘটনা-জটিল বন্ধুর পথে, যাহার বাণী শুনিয়াছি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কবি-ঋষির ছন্দ-সুন্দর কাব্য-মন্ত্রে, নীলাকাশের বিস্তারে যাহার আদর্শ, প্রকৃতির বৈচিত্র্যে যাহার প্রতিচ্ছবি, তপস্বীর তপস্যায় যাহার উপলব্ধি।

জীবনের দুঃখ গ্লানি অভাব-অভিযোগে আমরা যেন ভগ্ন-হৃদয় না হই। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই—জীবনের উদ্দেশ্য অর্থ নয়, প্রতিপত্তি নয়, যশ নয়,—আনন্দ।

আমাদের দোষ অনেক আছে, দুর্বলতার সীমা নাই, পদে পদে পতন ঘটে, ভুল আমরা অনেক করি। তবু আমরা যেন হতাশ না হই। এই বিখ্যাত শ্লোকটি আমরা যেন মনে রাখি—

> খ্যাতঃ শক্রো ভগাঙ্গঃ বিধুরপি মলিনো মাধবো গোপজাতো
> বেশ্যাপুত্র বশিষ্ঠ সরুজপদযমঃ সর্বভক্ষো হুতাশঃ
> ব্যাস মৎস্যোদরীয় সলবণ উদধি পাণ্ডবা জারজাতা
> রুদ্রঃ প্রেতাস্থিধারী ত্রিভুবনবসতাং কস্য দোষো ন জাতঃ

(ধ্রুবানন্দ মিশ্র)

ইন্দ্র ভগাঙ্গ, চন্দ্র কলঙ্কী, কৃষ্ণ গোয়ালার ঘরে পালিত, বশিষ্ঠের মত ঋষিও

---

* ভাগলপুর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে নব-বর্ষ-বৈঠকে পঠিত। ১লা বৈশাখ, ১৩৫৫

বেশ্যাপুত্র, বিমাতার অভিশাপে সর্বশক্তিমান যমের চরণও শীর্ণ, অগ্নি সর্বভুক, ব্যাস মেছুনীর পুত্র পাণ্ডবগণ জারজ, রুদ্র প্রেতাস্থিধারী। এ কথা কে না জানে, ত্রিভুবনে আসিয়া দোষ কাহার না ঘটিয়াছে ?

আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে, দোষ-দুর্বলতা-ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও আমরা মানুষ, আমরা সত্য-সন্ধানী, আমরা শিব-উপাসক, আমরা আনন্দকামী, আমরা আদর্শতীর্থের যাত্রী।

কঙ্কর কণ্টক কর্দম নয়, পথই বড়।

আমরা ভারতবাসী, আমাদের উত্তরাধিকার যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

সর্বশেষ প্রণাম করি তাঁহাকে

সবার চলায় যাঁহার চলা
সবার সুরে যাঁহার বাঁশী
পূর্বাচলে যাঁহার ছটা
অস্তাচলে যাঁহার হাসি
নিবিয়ে ঝড়ে ছোট্ট প্রদীপ
জ্বালেন আলো আকাশ-ভরা,
ছোট্ট ডোবা ডুবিয়ে যিনি
বহান নদী কলস্বরা ;
মিথ্যারূপেও সত্য যিনি
আলোক যিনি অন্ধকারে
পঙ্ক যিনি পদ্ম যিনি
প্রণাম করি আজকে তাঁরে।

"বনফুল"

মুসাফিরের ডায়েরি

পরাজয়

জীবনের অনেকটা পিছনে ফেলে রেখে একক ভাবে পথ চলতে চলতে সহসা যে সব চরিত্রে চোখ ঠেকে যায়, অমিতাভ ছিল তারই একজন। ব্যক্তিত্বে, বৈশিষ্ট্যে, মাধুর্যে ভরপুর ছিল তার অন্তর বাহির। অতি মামুলিভাবে এক সার্বজনীন সভায় ওর সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

অদ্ভুত এই শহরে আত্মকেন্দ্রিকতা ও সভ্যতার নির্মোক। একই শহরে আমরা লালিত-পালিত হয়েছি, একই শিক্ষায়তনে সংশ্লিষ্ট থেকেছি—হয়তো কখনও একই চলচ্চিত্রের গৃহে বা খেলার মাঠে পাশাপাশি ব'সে রসসঞ্চয় করেছি; তবু কেউ কাউকে চিনতুম না। তারপর নানা আলাপে আলোচনায় প্রীতির আদানপ্রদানে নিবিড় পরিচয়ের পর ওর দিকে চেয়ে চেয়ে আমার বিস্ময়ের সীমা থাকত না। এমন বলদৃপ্ত, কর্মবিলাসী, অনুভূতিশীল মানুষ ছিল কোথায়?

জীবনের তটে তটে ফিরেছি। কত ঘাটে বাটে মাঠে চলেছি। উন্মুক্ত শ্যামল প্রান্তরের মাঝে, সূত্ররেখার মত উজ্জ্বল পথে, বনানীতে আচ্ছন্ন চোরা-বাটেতে, ঊষর বালুকাতটে অথবা মানবসমাজের গভীর আবেষ্টনীর মধ্যে কত মানুষের সঙ্গসুখ আস্বাদন করেছি, কত যাত্রীর দর্শন পেয়েছি, সাহচর্য পেয়েছি। কত চিত্তলোকে ভ্রমণ করেছি, তবু ভরে নাই চিত্ত। তবু তাদের সহযাত্রী ব'লে হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে পারি নি—একাত্মবোধের উন্মেষ তো হয় নি। এ সবের মূলে নারদমুনির মত ম্যামনদেব রয়েছেন তাঁর তর্জনী উঁচিয়ে।

আমরা বৈশ্যশাসিত যুগের পথিক। বিশেষ এতদিন বণিকজাতির দাসত্ব স্বীকার ক'রে যেন বুড়ো-বেণে ব'নে গেছি। জীবনে সকল ক্ষেত্রেই যে সাত-পাঁচ বিচার ও হাতের কড়ি বজায় রাখার আকুল আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় এক বিরাট দৃষ্টি নিয়ে সমগ্রতার ছবি মনে জাগে না—এ যে 'স্পেশালাইজেশন' এর কাল। অন্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যেন একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে কি বিষয় নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি, তার সার্থকতা আছে কি না—এ বি ঘুলিয়ে গেছে। তাই বিকৃত রুচি ও মনের অপলকা কাঠামো নিয়ে কেবা লেন-দেনের হিসাব কষি। সদাই ভয় হয়—হারাই হারাই, বুঝি লোকসান হ গেল! আত্মসচেতন স্পর্শকাতর মন নিয়ে কেবল যাচাই করি, কে সমাদর সম্মান দেখালে—কে সামান্যতম অবহেলা করলে! ফলে ওই গোলক ধাঁধাতেই পাক খেয়ে মরি—এ সবকে ছাড়িয়ে ওপরে উঠতে পারি না প্রাত্যহিক তুচ্ছতার ধূলি গায়ে ছড়িয়েই থাকে। শুচিবায়ুগ্রস্তা বিধবার মত মালিন্যের কল্পিত স্পর্শ থেকে আর মোহমুক্তি হয় না।

এ হেন বৈশ্যবৃত্তির উপাসক আমি নিরন্তর মনের দেওয়া-নেওয়া দাবি দাওয়ার হিসেবে মগ্ন থেকে মাথা নীচু ক'রে সজাগ-দৃষ্টিতে থলির সম্পদ মাপে

যাপতে পথ চলেছি, হঠাৎ এ নবাগত যাত্রীর সহজ স্পষ্ট পদক্ষেপে চকিত হয়ে মুখ তুলে দেখি—এক ব্রাহ্মণ। দীর্ঘ ঋজু গঠন, চিন্তাচঞ্চল মুখ। আজকাল প্রকৃত ব্রাহ্মণের দর্শন দুর্লভ। ক্রমশ জানলুম, উদাসীন সাধনমগ্নচরিত্র। শিবের উপাসনায় এমন যতচিত্ত যে, চারিপাশে দৈনন্দিন গ্লানিকে, কলহকলরব-বিরোধকে অতি সহজে বিনা আয়াসে উপেক্ষা ক'রে চলে—নিজের আন্তর সম্পদ দিয়ে সকল অশুভকে দূর ক'রে আত্মমর্যাদার স্নিগ্ধতায় ছেয়ে দেয়।

আমি আশৈশব জেদী ও খেয়ালী প্রকৃতির। অপরের আশ্রয় পেয়ে পেয়ে লড়াই ক'রে বিরোধ ক'রে উচ্চকণ্ঠে নিজের চাহিদা মেটাতেই অভ্যস্ত। অপ্রতিহতগতিতে চ'লেও এসেছি, প্রায়শ প্রতিবেশী-পরিজনের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লেগেছে। এ ক্ষেত্রেও কতবার অসহিষ্ণু হয়ে উষ্মাপ্রকাশ করেছি, আঘাত হানবার চেষ্টা করেছি; কিন্তু সে তার অক্ষয়কবচে ঠেকে বিফল হয়ে ফিরে এসেছে। আমার সকল অস্ত্র ভোঁতা হয়ে ঝ'রে পড়েছে। নিজের কাছে নিজে লজ্জা পেয়েছি। অপরকে আঘাত করব না, এবং অপরকেও আঘাত করতে দেব না—এই যেন তার ব্রত। নিরাবরণ মৈত্রীর মাঝে দিন কাটছে। ওর মধুর ব্যবহারের জন্য বহু বন্ধু-বান্ধব গুণমুগ্ধ ভক্ত। আমরা অনেকেই মনে করতুম, আমিই বুঝি তার ঘনিষ্ঠতম সাথী, আমার অধিকার ওর ওপর খুব বেশি, আমার অনুরোধ কদাচ উপেক্ষা করবে না।

বড় ধোঁকায় প'ড়ে অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়েছিলুম একবার, তারই এ কাহিনী।

বহুদিন পরে দুজন একত্র হলুম সেবার। নানা গল্প চলছে। একটি অল্পবয়স্ক তার কাছে ঘোরাফেরা করছে, নব-পরিচিত জানলুম। ওর জিনিস-পত্রের আংশিক জিম্মেদার হয়েছে। তার হাবভাবে মনে হ'ল, ওকে তদারক করার দায় পেয়ে সে খুব খুশি—চঞ্চলভাবে নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে নানা কাজে। অমিত বললে, এবার একে পেয়েছি পথে, ভারি মিষ্টি স্বভাব, নেহাৎ ছেলেমানুষ। আমার অনেক কাজে সাহায্য করে, যত্ন নেয়; বেশ নিশ্চিন্ত আছি ওর অভিভাবকগিরির আওতায়। ওর নাম কল্যাণ।

তাই নাকি? তোমার দেখছি অসংখ্য ভক্ত, 'গোরা নাম নিব কত'-গোছ ব্যাপার। যেখানেই যাও দু-একজন জুটে যায়। সবাই সেবা ক'রে ধন্য হয়।

অমন কথা বলছ কেন? তোমাদের স্নেহ আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, আমি কি অমৃত-সম্পদের অধিকারী—তোমাদের সকলের দানে আমি পূর্ণ।

তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তর ভ'রে যায়। তোমরাই তো আমার চিত্তকে সরস কোমল ক'রে রেখেছ।

দেখ, কে কাকে সরস রেখেছে ও তর্কের শেষ নেই, ও থাক্। জান তো ঋষিবাক্য—ওঁ বাদো নাবলম্ব্যঃ।

কল্যাণ, সেই চিঠি ও বইগুলো কোথায় কোন্ ঝোলায় আছে দেখ তো ভাই, এঁকে দিতে হবে।—ব'লে অমিত আমার দিকে চেয়ে বললে, তোমাকে লেখা চিঠি আর কিছু পড়ার মত ভাল বই, গড়িমসি ক'রে আর পাঠানো হয় নি। শুনেছিলুম তুমি আসবে, তোমাকে রোজ প্রত্যাশা করেছি, তাই এ গাফিলতি।

মনে কেমন অভিমানের মেঘ জমল। চিঠি লিখে দেবার তাগিদ নেই—এত অবহেলা আমাকে! আবার সে চিঠি জমা আছে ওই নবীনের কাছে, ওর কাছ থেকে হাত পেতে নিতে হবে? থাক্। তাড়াতাড়ি মৃদু হেসে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বললুম, থাক্ না চিঠি, তাড়া কিসের? ছেলেটির কাছে নিজ মর্যাদা ও দাবির ওজন দেখাবার জন্য বললুম, না ভাই, তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না। ওসবের কিছু দরকার নেই, এই তো দেখা হ'ল, সব কথা হবে 'খন। বেচারী, নানা ভাল সামলাতে সামলাতে তোমার প্রাণ গেল, যত বাজে কাজের ভার তোমার ওপর! তোমাকে আর ক্লান্ত শরীর নিয়ে অত খাটতে হবে না।

কল্যাণ কাঁচুমাচু মুখ ক'রে বললে, না, বাজে কাজ আর কি! ওগুলো কোথায় রেখেছি, পাচ্ছি না। কি করি বলুন তো? উনি যে আপনাকে দিতে বললেন, নিশ্চয় দরকারী কিছু, না হ'লে ব'য়ে আনবেন কেন?

আরে, না না, ও আমার চাই না—ওর ও একটা খেয়াল মাত্র। পরে যদি পাও তো ছিঁড়ে ফেলো, কি বা ওর মূল্য! একটু আত্মপ্রসাদ ভোগ করলুম। যাক, ওকে অনেকটা হারিয়ে দিয়েছি, ও যাকে অমূল্য ধন মনে ক'রে ব্যাকুল হচ্ছে, আমি তাকে উপেক্ষা করতে পেরেছি। প্রমাণ করেছি, আমি এমন ঘনিষ্ঠ যে, অমিতের কথাও হেলাফেলা করতে পারি। কল্যাণকে খানিক 'পেট্রোনাইজ' করলুম বিজয়ীর মত। অমিত আর পীড়াপীড়ি করলে না; শুধু বললে, তোমাকে দেব ব'লেই ওগুলো রেখেছিলুম।

এমনই ঘটনাচক্র—তার পরদিনই অমিতের জন্মদিন। বিদেশবিভুঁই—আমরা যাত্রী, কি করি! একটা কিছু প্রীতির নিদর্শন দেবার ইচ্ছা হ'ল।

আরও ভাবলুম, কল্যাণ কত সম্ভ্রমে দূরে থাকে, সেবা ক'রে তৃপ্ত হয়, আমি যে কেমন সমপর্যায়ের এটা প্রমাণ করা চাইই। অমিতের সুরুচির সঙ্গে খাপ খায় এমন কিছু সেই ক্ষুদ্র নগরে পেলুম না, একটা দামী ফুলদানি কিনে আনলুম। তার মিনার নকশার চাকচিক্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অমিতের জন্য যথারীতি জন্মতিথির আঙ্গিক পরমান্ন ফরমাশ দিলুম।

কল্যাণ আমার আত্মীয়তার দম্ভ দেখে বেশ অবাক হয়ে গেল। ওকে শুনিয়ে বললুম, এ ছাই দেশে কি কিছু পাওয়া যায়, ভাল ফুলের তোড়াও নেই, দাম দিতে রাজি আছি, তবু মনোমত জিনিস মিলবে না। গন্ধরাজ ও ক্যানা ফুল কটা অনেক তল্লাস ক'রে পেলুম, গুছিয়ে রাখ তো ভাই। কল্যাণ নিবে-যাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলে, এ ফুলদানিটার খুব দাম নিয়েছে নিশ্চয় ?

হ্যাঁ, দামের জন্য ভাবি না, পেয়েছি এই যথেষ্ট, অমিতকে তো যা-তা দেওয়া যায় না।

অমিতের মধ্যে যে দরদী মানুষ আছে, যার জন্য ও সকলের প্রিয়, সেই মানুষটির কিছু দৃষ্টি এড়ায় নি। ও কল্যাণকে হঠাৎ কাছে ডেকে বললে, কল্যাণ ভাই, আজ জন্মদিন, খুব শুচিশুদ্ধ হয়ে নবজীবন লাভ করতে ইচ্ছে হচ্ছে। সব বড় নোংরা হয়ে আছে, তুমি একটু মন দিলে এগুলোর গতি হয়। আর শোন, আজ তোমাকে কিছু দিতে ইচ্ছে করছে, তা কাছে তো কিছু নেই। এই বইখানায় আমার হাতে নাম লেখা থাক্, কেমন ?

কল্যাণ পরমানন্দে অমিতের জামাকাপড় নিয়ে ছুটল। বইখানা এক চলতি প্রার্থনার গানের সঞ্চয়ন।

আজ এই ঠাণ্ডা দিনে তোমার ওসব কি ভিজে থাকবে ?

থাকুক ভিজে, এখনই তো চাই না। কল্যাণটা একটা কাজে রত থাকুক, কেমন মুষড়ে পড়েছে, ওর মনে ধারণা হয়েছে যে, ও আমার কাছে অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়েছে। নেহাৎ ছেলেমানুষ !

রাতে শোবার সময় অমিত আমার উপহারটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে বললে, খুব জমকালো জিনিস দেখছি, কেন অত টাকা নষ্ট করলে ? ফুলের ঘ্রাণ নিয়ে বললে, সাদা ফুলের মধ্যে গন্ধরাজের গন্ধটা বড় তীব্র, না ? এসব কেমন ক'রে যোগাড় করলে ? আবার খাবার নিয়ে কি হাঙ্গামা করছ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

পরদিন দুপুরে খাওয়ার পর জটলা করছি, পিওন এল। আমিই হাত বাড়িয়ে নিলুম পত্রভার। একখানা খামে পরিচিত হস্তাক্ষর দেখে ব'লে উঠলুম, এ যে বিভবের লেখা, নিশ্চয় তোমার জন্মদিনের শুভকামনা বহন ক'রে এনেছে এ চিঠি।

বিভব অমিতের বহুদিনের বন্ধু—ওর দুঃখের দিনের সাথী।

খামটা ছিঁড়ে চিঠি বের করার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা বিশীর্ণ সাদা গোলাপের পাপড়ি ঝ'রে পড়ল। তখনও তাদের অঙ্গে ম্লান সুরভির আভাস লেগে আছে।

অমিত সহসা আবেগভরা সুরে ব'লে উঠল, অতীন দেখ, আমি যে গোলাপের মৃদু গন্ধ ভালবাসি, বিভব তা ভোলে নি, ঠিক সেই ফুলই পাঠিয়েছে, ও আমার মন দর্পণের মত দেখতে পায়।

ফুলের একটি পাপড়ি আঙুলে নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে দ'লে ছিঁড়ে ফেললুম। সেই ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে খড়ি পেতে আঁক কষতে লাগলুম। মনে হ'ল, মার খেয়ে গেছি। আমি প্রীতির আধিক্য দেখাতে গিয়ে যে বাহুল্য প্রকট করেছি, তা অমিতের আপন-ভোলা শিল্পীমন গ্রহণ করতে পারে নি। আমি পাছে আঘাত পাই, তাই কিছু বলে নি। ওই উগ্রগন্ধা ফুলও ওকে তৃপ্তি দেয় নি। সব ব্যর্থ মনে হ'ল। হিংসা ও দর্পে মত্ত হয়ে এ কি করেছি! শুধু বস্তুভার জড়ো ক'রে ওকে দিয়েছি, যা ঢেলার মতই ওর কাছে অপ্রয়োজনীয়। ইচ্ছা হ'ল, ওর ঝোলা থেকে ফুলদানিটা নিয়ে দূরে ফেলে দিই—নিশ্চিহ্ন করি আমার এই স্থূল মনের পরিচয়। বিভব যা দিয়েছে তা অতি ক্ষণস্থায়ী, তার কোনও অস্তিত্ব থাকবে না উত্তরকালে। তার যতটুকু তৃপ্তি দেবার দিয়ে নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যাবে শুধু ওর মৃদু সুবাস ও তার পিছনে প্রিয়জনকে খুশি করবার আন্তরিকতা অমর হয়ে থাকবে। প্রবাসী অমিতের মনের পটে একটা শান্ত মাধুর্যের ছোঁওয়া রেখে যাবে।

ফুলদানিটা কোথায়?

যত্ন ক'রে ঝোলায় তুলে রেখেছি, আজ তো যাত্রা শুরু হবে, যদি ভুল হয়ে যায়।

ওটা আবার তোমার বোঝা বাড়াল। ওর খবরদারি করতে হবে, সাক্ষ রাখতে হবে। হয়তো চলার পথে সর্বক্ষণ ঠং-ঠং ক'রে জানিয়ে দেবে, আমি আছি।

তুমি অমন ক'রে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ কেন, জান তো, ফুল কত ভালবাসি! যেখানে ফুল পাব ওর মধ্যে রেখে দেব।

আমার জিনিসটা একটা ভার হয়ে থাকবে আর বিভবের ফুল শিথিল মুঠি থেকে খ'সে ঝ'রে শুকিয়ে পড়লেও অমিতকে বিন্দুমাত্র সচকিত হতে হবে না— এই কথাটা মনে খচখচ করতে লাগল। ভাগ্যে কল্যাণের কাছে আমার চিত্তের দৈন্য (বা উদ্বেগতা) ধরা পড়ে নি! কালকের 'হিরো'র আজ তা হ'লে অপমৃত্যু ঘটত।

"মুসাফির"

ডানা

৮

ডানা ভিতর থেকে এসে আবার বসল।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলেন বৈজ্ঞানিক—

এইবার আমরা যে সব হাঁস পেয়েছি, সেইগুলোকে দেখি আসুন। এই যে পাঁচটা দেখছেন, এগুলো হ'ল Lesser Whistling Teal—বাংলায় শরাল হাঁস বলে, হিন্দী সিল্‌হী। এরা হচ্ছে Ducks যারা Pedestrian এবং Perching, অর্থাৎ হেঁটে বেড়াতে পারে, গাছেও চড়ে। এদের সঙ্গে Goose-এর খানিকটা সাদৃশ্য আছে। এদের ঠোঁট এবং গোছ প্রায় সমান হয়। স্ত্রী-পুরুষ দেখতে এক রকম, গায়ে বেশ রঙ আছে। Whistler চার রকম হয়। এগুলো হচ্ছে Lesser Whistling Teal। Large Whistler ও আছে এক রকম। আরও দু রকম আছে—Wandering Whistler এবং Spotted Whistler—তারা এ দেশে আসে না, East Indies এ থাকে। হুইস্‌লার ছাড়াও আরও কয়েক রকম Pedestrian Perching হাঁস আছে, যেমন চখা—আমরা পেয়েছি; নাকি হাঁস—আমরা পেয়েছি। Common Sheldrake—শাহ চখা এ দেশে আসে না প্রায়, Cotton Teal—পেয়েছি, বাংলায় এদের বলে বাংরিয়েল, হিন্দী গিররি। সবচেয়ে ছোট Duck এরা। শীতকালে খুব আসে। এ দেশে থাকেও। এ দেশে ডিমও পাড়ে। এদের শ্রেণীতে আরও দু রকম আছে, Wigeon আমরা পাই নি, আর Mandarin Ducks এ দেশে আসেই না। আচ্ছা, আর কি কি Ducks পাওয়া গেছে

দেখা যাক—Pedestrian Perching-এর মধ্যে Lesser Whistling Teal, চখা, Cotton Teal।

রূপচাঁদ আর একটি সিগারেট ধরালেন। কবি বললেন, Pedestrian Perching-এর বাংলা করুন কিছু। বড় কটমট শোনাচ্ছে। আমি ভেবে একটা ঠিক করেছি। Swan-গুলোকে মরাল, Geese-দের রাজহংস, Mergansers না কি বললেন—

হ্যাঁ। আমরা একটা পেয়েছি,—এই যে, স্মিউ (Smew)।

চমৎকার দেখতে তো!

চমৎকার। এদের আরও দু রকম আছে. Goosander আর Red-breasted Merganser, সে দুটো দেখতে আরও চমৎকার। এরা বরফের দেশে সমুদ্রের জলে থাকে, এ দেশে আসে না। এদের স্ত্রী-পুরুষ আলাদা আলাদা রঙের হয়, আর দুজনেই দেখতে সুন্দর।

কবি বললেন, তা হ'লে এদের বিচিত্র-হংস নাম দেওয়া যেতে পারে এবং Ducks-দের শুধু হংস।

বাঃ, তা হ'লে তো চমৎকার হয়। Ducks-দের মানে হংসদের তিনটে ভাগ আছে—Diving Ducks, Pedestrian and Perching এবং Surface Feeding Ducks।

কবি বললেন, Diving Ducks ডুবুরি হাঁস, Pedestrian and Perching-দের ভূমিচর ও তরুচর বললে মন্দ কি! Surface Feeding Ducks কি রকম?

তারা খাদ্য সংগ্রহের জন্যে ডুবও দেয় না, কিংবা গাছেও চড়ে না। এরা জলের উপর থেকে কিংবা মাঠে যা সামনে পায় খায়। শভেলারের (Shoveller) ঠোঁট তো অদ্ভুত, জলে ঠোঁট ডুবিয়ে যা পায় শুষে নেয়।

তা হ'লে এদের সম্মুখভোজী বলুন, সামনে যা পায় খায়।

হ্যাঁ, বেশ হবে।

ডানা কতকগুলো হাঁসকে দেখিয়ে বললে, ওইগুলো টীল বললেন না?

হ্যাঁ, ওগুলো কটন টীল। টীল মানে ছোট হাঁস। এ অনেক জাতের আছে। এই এগুলো দেখুন—Lesser Whistling Teal. এই দেখুন এদের ল্যাজের উপর দিকে যেমন রঙের ছোপ রয়েছে। Larger Whistling

Teal-এর ক্রীম রঙ থাকে এখানটায়। তা ছাড়া এ দুটোও দেখুন Teal, কিন্তু এরা ও-জাতের নয়, এরা হ'ল আনন্দবাবুর নামকরণ অনুসারে সম্মুখ-ভোজী। কমান টীল (Common Teal)—যাকে বেলেহাঁস বলে। সম্মুখ-ভোজীদের দশ রকম আছে। তার মধ্যে পাঁচ রকমের স্ত্রী-পুরুষ অনেকটা একরকম দেখতে—Wood-Duck, Pink Head, Marbled Teal, Shoveller, Pintail। Pintail আমরা পেয়েছি। এর কথা পরে বলছি। স্ত্রীপুরুষ দেখতে আলাদা আলাদা—Mallard, Gadwal, Bronze cap আর Teal। এই Teal তিন রকম। Common Teal, Andaman Teal, Oceanic Teal। শেষের দুটো এ দেশে পাওয়া যায় না। আমরা পেয়েছি কমান টীল। আর এক রকম আছে—Garganey। এদের Blue-winged Teal-ও বলে। এটা কি?—বাঃ, চমৎকার! একটা Spot-bill-ও পেয়েছি দেখছি, এও হচ্ছে Mallard জাতের, Indian Mallard বলে কেউ কেউ, এর বিশেষত্ব—দুটো কমলা রঙের ফোঁটা ঠোঁটের দু পাশে কপালের কাছে। আর ডগাটা হলদে। এই দেখুন। পালকের প্যাটার্নটা অনেকটা আঁশ-আঁশ গোছের—সুন্দর, নয়?

ওগুলো কি বললেন?—ডানা প্রশ্ন করলে।

নাকি হাঁস—Comb-Duck। এরা হচ্ছে Pedestrian and Perching, কি নাম করলেন এর আনন্দবাবু?

ভূমিচর ও তরুচর। একসঙ্গে ভূ-তরু-চরও করা যায়।

মন্দ নয়। চলতি ভাষায় এদের 'নাকটা' বলে। এদের পুরুষদের নাকের কাছে একটা উঁচু ঢিবির মত থাকে, দেখতে পাচ্ছেন? Breeding Season-এ এটা আরও উঁচু হয়ে ওঠে। অধিকাংশ হাঁসই শীতের সময় এ দেশে আসে, এরা কিন্তু এ দেশেরই বাসিন্দা। ডিমও পাড়ে এ দেশে, গাছের গুঁড়ির ফাটলে বা গর্তে ডিম পাড়ে—

কবি বাধা দিলেন।

ডিমের কথা থাক্ এখন। পাখিদের পরিচয় শেষ করুন আগে।

আচ্ছা বেশ, ডিম নিয়ে আর একদিন আলোচনা করা যাবে। ও নিয়ে প্রবন্ধই লেখবার ইচ্ছে আছে একটা।

ডানা আর একটা হংস-স্তূপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, এগুলো কি?

এ দেশে ওগুলোকে লালশর বলে। অর্থাৎ লাল মাথা। কিন্তু মজা আছে, সবগুলো এক জাতের নয়। Diving Ducks মানে ডুবুরি-হংসদের মধ্যে যেগুলো লালশর তাদের Pochard বলে। তিন রকম আছে—Red-crested Pochard, বাংলায় এদের পুরুষটাকে অনেক জায়গায় ভুমার বা ভুমার বলে। এদের পা-ও হয় লাল বা অরেঞ্জ। এরা শুধু ডুব-সাঁতারই দেয় না, মাঠে চরেও। এদের সকলেরই সাদা রঙের Wing-Bar আছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার লালশর—Red-headed Pochard-এর এই Wing Bar নেই।

Wing-Bar কি আবার?

এই যে ডানার এই পালকগুলোকে Wing-Bar বলে। Red-headed Pochard-এর এটা নেই। ডুবুরি-হাঁসদের মধ্যে এই হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর লালশর। এদের বাংলায় ভুতিহাঁসও বলে, ইংরেজী—White-eyed Pochard। এদের পুরুষগুলোর চোখের বিশেষত্ব সাদা চোখ। এদের পেটের নীচেও একটা সাদা ওভাল (oval) প্যাচ আছে, এই দেখুন। যখন ওড়ে তখন দেখা যায়। ডুব-সাঁতার কাটতে এরা প্রায় অদ্বিতীয়। ডানায় এক-আধটা ছররা লাগলে এদের ধরা শক্ত। এমন ডুব-সাঁতার কেটে কেটে লুকিয়ে বেড়াবে যে, পাত্তাই পাওয়া যাবে না। এরা নির্জন স্থানেই থাকতে ভালবাসে। ধানের ক্ষেতেও চরতে দেখেছি ভোরবেলা। উত্তর-মেরুর কাছাকাছি জায়গা থেকে এরা প্রতি বছর শীতের সময় আসে এ দেশে। এই তো গেল ডুবুরিদের মধ্যে, লালশর ভূমি-তরু-চরদের মধ্যেও আছে। Wigeon-এর উল্লেখ আগেই করেছি, Wigeon-কেও কোথাও কোথাও ছোট লালশর বলে। আর এইটে দেখুন, ইনি হচ্ছেন সম্মুখ-ভোজী, একেও লালশর বলে, কিন্তু ইনি হচ্ছেন Pink headed Duck। গোলাপী লালশরও বলে কেউ কেউ। কি চমৎকার রঙ দেখেছেন! এ কিন্তু একেবারে এ দেশী পাখি। ওয়াঘাঃ ওয়াঘাঃ ওয়াঘাঃ—এই ধরনের ডাক। আর একটা কথা ব'লে নি—শুধু লালশর নয়, নীলশর-সবুজশরও আছে। ডুবুরি-হাঁসদের মধ্যে যাকে Eastern White-eye বলে, তার মাথা হচ্ছে Dark glossy green। এ দেশে আসে না। পুলিনবিহারীদের মধ্যে নীল বা সবুজ মাথা নেই তেমন। সম্মুখভোজীদের মধ্যে আছে, Mallard-এর মাথা সবুজ, হিন্দীতে কিন্তু নীলশির বলে।

ডানা মুখের সামনে বাঁ হাত রেখে হাই তুলতেই বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, বিষয়টা বোধ হয় হৃদয়রোচক করতে পারছেন না তিনি। ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়ার মত হয়ে যাচ্ছে। অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। একটা হাঁস তুলে বললেন, আচ্ছা, এটার কি বিশেষত্ব চোখে পড়ছে কোনও?

সকলের মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন। কোনও উত্তর বা উত্তরের আভাস কারও মুখে দেখতে পেলেন না। রূপচাঁদ গুম হয়ে ব'সে ছিলেন তাঁর ধূমাচ্ছন্ন চিন্তালোকে। বৈজ্ঞানিকের কথা তাঁর কানে যাচ্ছিল কি না সন্দেহ। উন্মনা কবি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে ছিলেন। তাঁর মনে পড়ছিল রঘুবংশ। ইন্দুমতী যখন স্বয়ংবরসভায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ-মানসে প্রত্যেক রাজাই বিভিন্ন রকম প্রয়াস পেয়েছিলেন। কেউ আন্দোলিত করেছিলেন লীলাকমল, কেউ ঘাড় বেঁকিয়ে কেয়ূরের প্রান্ত-লগ্ন মালাটি ঠিক করেছিলেন, কেউ কনক-পাদপীঠে নখরাঘাত ক'রে করেছিলেন ইঙ্গিত, অঙ্গুলি আন্দোলন ক'রে রত্নাঙ্গুরীয়চ্ছটায় মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন কেউ, কেউ নিজের রত্ন-শোভিত মুকুটে হাত দিয়েছিলেন, কেউ বামস্কন্ধ ঈষৎ উন্নমিত ক'রে প্রদর্শন করেছিলেন তাঁর বৃষস্কন্ধ, কেতকীপত্র ছিন্ন করেছিলেন কেউ অধীরচিত্তে। কিন্তু এর কোনটাই তো সম্ভব নয় এখন। তাঁর মনে হচ্ছিল, স্বয়ংবরসভাতেই এসেছেন তিনি, ইন্দুমতীও এসেছে, কিন্তু কি ক'রে তাঁকে মনোভাব জানাবেন! এ কি অদ্ভুত পরিস্থিতি!

বৈজ্ঞানিকের কথায় চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল তাঁর। তিনি সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলেন, অমরবাবু একটা মরা হাঁস তুলে ধ'রে আছেন। চকলেট রঙের মাথাটা ঝুলে পড়েছে এক ধারে। ডানাটা বিচিত্র। অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি খানিকক্ষণ।

ডানা বললে, ওর ল্যাজটা একটু বেশি ছুঁচলো মনে হচ্ছে।

ঠিক বলেছেন। এর নামই পিন-টেল (Pintail)—এর ল্যাজের জন্য। বাংলায় এর নাম হচ্ছে দিগ-হাঁস, শোলক্ও বলে কেউ কেউ। পশ্চিমেরা বলে সিংক-পার। এর মাংস খেতে খুব চমৎকার। এরা আসে উত্তরমেরু থেকে। এখানে কটন টীলকে অনেকে দীঘোচ বলছে, কিন্তু আমার মনে হয়, এইগুলোই দীঘৌচ। বাংলা দিগ-হাঁসের সঙ্গে বেশ মিল হয়। না? এটা পুরুষ, মেয়েটা

এত সুন্দর নয়। মাথায় এ রকম চকোলেট রঙ নেই, এ রকম Bronze-green Wing-Barও নেই।

একটু হেসে তারপর বললেন, পক্ষীসমাজে পুরুষরাই বেশি অলঙ্কৃত।

ব'লেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন।

সব সময় অবশ্য নয়। প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচারের মেয়েটাও কম সুন্দর নয়। তা ছাড়া, এই হাঁসেদের মধ্যে যাদের Mergansers বললাম, আনন্দবাবু যাদের বিচিত্র-হংস নাম দিলেন, তাদের Female-গুলো চমৎকার। এই যে স্মিউটা দেখছেন, এর সঙ্গিনীও কি কম সুন্দর? তার মাথাটা বাদামী, কালো নয় এর মত। Goosander-ও তাই। শাহ্-চখার স্ত্রী-পাখিটাই বোধ হয় বেশি সুন্দর। সাধারণ চখার স্ত্রী-পাখিটার গলায় কেবল কণ্ঠী নেই, কিন্তু আর সবই এক। মানে—

অপ্রস্তুত মুখে চুপ ক'রে গেলেন। যদিও এটা অবিসম্বাদিত সত্য যে পক্ষীসমাজে পুরুষরাই বেশি সুন্দর, তবু নিজে পুরুষ হয়ে একজন মহিলার সামনে জোর গলায় তা প্রকাশ করার মধ্যে কেমন যেন একটু অভব্যতা প্রচ্ছন্ন আছে, এ কথাটা স্পষ্টভাবে মনে হওয়ামাত্র সব গুলিয়ে গেল তাঁর।

সবচেয়ে বড় হাঁসটা কি বললেন?—ডানাই প্রশ্ন করলে আবার।

ও, ওটা বার-হেডেড গুজ (Bar-headed goose), এটাও পুরুষ। স্ত্রীদের মাথায় এই কালো দাগটা থাকে না। এদের গায়ের রঙ জগমগে নয়, দেখেছেন? বেশ আভিজাত্য আছে। এদেরই আর একটা জাত এ দেশে আসে, তাদের Grey Lag বলে। তাদের গায়ের ধূসর বর্ণ একটু বেশি। Grey Lag-এর বাংলা হচ্ছে কলহংস, সংস্কৃত কাদম্ব। এরা যখন আকাশে ওড়ে, মনে হয় মালা উড়ে যাচ্ছে একটা। অনেক সময় লম্বা রেখায় ওড়ে, অনেক সময় আবার V-shaped, চমৎকার দেখায়। ডাকও চমৎকার। এরা নিশাচর। দিনের বেলা বিশ্রাম করে, রাত্রে চরতে বেরোয়। দল বেঁধে আকাশপথে উড়ে যায় তখন ডাকতে ডাকতে। একজন ইংরেজ লেখক তা শুনে লিখেছেন, থ্রিলিং—

তার চেয়ে ঢের ভাল ক'রে বলেছেন কালিদাস।—কবি ব'লে উঠলেন হঠাৎ। বৈজ্ঞানিক যে বাজে কচকচিতে ডানার সমস্ত মনোযোগ দখল ক'রে রেখেছেন, এ যেন আর সহ্য হচ্ছিল না তাঁর।

কি বলেছেন?

কামস্ক হংসবচনং মণি-নূপুরেষু—মণি-নূপুরের নিক্কণের সঙ্গে তিনি উপমিত করেছেন হাঁসের ডাককে। আমরা যে চোখে রাজহংসকে দেখি, সে চোখে সাহেবরা দেখতে পারবে না ওকে। আমরা ওর সঙ্গে জড়িত করেছি দময়ন্তীকে, সরস্বতীকে, যক্ষের বিরহ-বেদনাকে, হিমালয়ের স্বপ্নকে, আকাশের অনন্তকে। লীলাঞ্চিতা মদালসার রূপমাধুরী, বধূদুকূল, সন্নতাঙ্গী গৌরীর মঞ্জীরধ্বনি—কত কি জড়িয়ে আছে ওর সঙ্গে। শুধু 'থ্রিলিং' বললে কিছুই বলা হয় না।

বৈজ্ঞানিক হেসে বললেন, বিজ্ঞানের ভাষা একটু সংযত কিনা। তার কেবলই ভয় হয়, পাছে সে এমন কিছু ব'লে ফেলে, যা সে প্রমাণ করতে পারবে না। কাব্যের তো সে দায়িত্ব নেই।

কে বললে নেই? কাব্যও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে সত্য যাচাই করবার যন্ত্র আপনাদের কাছে না থাকতে পারে, রসিকের কাছে আছে।

ডানার চোখের দৃষ্টিতে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল।—ওগুলো চখা বুঝি? চমৎকার রঙ তো!

যদিও প্রশ্নটা অবান্তর তবু ডানা দেখলে, প্রশ্ন করা ছাড়া তর্কের মোড় ফিরিয়ে দেবার আর কোন উপায় নেই।

হ্যাঁ। ইংরেজীতে বলে ব্রাহমিনি ডাক্স্।

কবি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, সংস্কৃতে চক্রবাক।

মৃদু হেসে ডানা বললে, সংস্কৃতে ওর আর একটা নাম বোধ হয় রথাঙ্গনামা। নয়?

উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন কবি।

আপনি সংস্কৃত জানেন?

হ্যাঁ। বি. এ.তে আমার সংস্কৃত ছিল। কালিদাসের শ্লোক মনে আছে এখনও।

ব'লেই সে আবৃত্তি ক'রে দিলে—

অত্র বিযুক্তানি রথাঙ্গনাম্নামন্যোন্যদত্তোৎপলকেশরাণি
দ্বন্দ্বানি দূরান্তরবর্তিনা তে ময়া প্রিয়ে সস্পৃহ মীক্ষিতানি।

আবৃত্তি ক'রেই কিন্তু লজ্জিত হয়ে পড়ল একটু। নিজের বিদ্যা জাহির করার

মত শোনাল যেন। কিন্তু এঁদের কাছে আত্মপরিচয় না দিয়েও সে পারলে না কিছুতে। মনে হ'ল, কেন দেবে না?

কবি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে রইলেন শুধু ডানার দিকে। বৈজ্ঞানিকও বিস্মিত হয়েছিলেন। অতিশয় অবহেলাভরে তিনি যে আশ্রয়হীনাকে এই প'ড়ো বাড়িটাতে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন, সে যে হঠাৎ এমন ভাবে কালিদাস আবৃত্তি করতে পারবে, তা তিনি প্রত্যাশাই করেন নি। রূপচাঁদও করেন নি। শুধু বিস্মিত নয়, চমকে গিয়েছিলেন তিনি। ঘাড় ফিরিয়ে একদৃষ্টে তিনি চেয়ে ছিলেন ডানার দিকে। তাঁর চোখের দৃষ্টি চকচক করছিল।

ডানা সামলে নিয়েছিল নিজেকে। অতিশয় স্বাভাবিক কণ্ঠে সে প্রশ্ন করলে আবার, আচ্ছা, কবিরা যে কল্পনা করেছেন, চখাচখীরা সমস্ত দিন এক-সঙ্গে থাকে, কিন্তু রাত্রে দুজনে নদীর দু পারে চ'লে যায়, এর কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে কি?

বৈজ্ঞানিক বললেন, না। বরং এ নিয়ে ঠাট্টাই করেছেন দু-একজন। তবে দিনের বেলায় যে ওরা একসঙ্গে থাকে, মানে জোড়ায় জোড়ায় থাকে, তাতে কোনও ভুল নেই। নদীর ধারে গেলেই দেখতে পাবেন।

বৈজ্ঞানিকের এই কথায় কবি প্রতিবাদ করলেন না। কবি ল্যাণ্ডরের সেই বিখ্যাত লাইনটা মনে প'ড়ে গেল তাঁর—I strove with none, because none was worth my strife। তাঁর মনে হ'ল, এই সব বৈজ্ঞানিকেরা অতি অদ্ভুত রকম শিশু-প্রকৃতির লোক, সামান্য মাটির পুতুল নিয়ে মেতে থাকে, আকাশের দিকে চাইবার অবসর পায় না। উচ্চাঙ্গের ভাবে পরিপূর্ণ হ'লে মানুষের মুখভাব যেমন হয়, কবির মুখভাব তেমনই হয়ে উঠল। ডানার মুখের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন তিনি। চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হ'ল তাঁর, তিনি নিজেও কি একটা খেলনা দেখে আত্মহারা হয়ে পড়েন নি? কিন্তু তখনই তাঁর মন এ অভিযোগের জবাব দিলে কবিতায়। তাঁর মনে গুনগুন ক'রে উঠল।

তুচ্ছ ক্ষুদ্র খেলেনা নয় ও
আকাশ নেমেছে উহারই কাছে

নয়নে রয়েছে নীলের আভাস
চাহনিতে ওর বিজলী নাচে

গুচ্ছ গুচ্ছ কালো কেশ-পাশে
নিবিড় মেঘের মহিমা প্রকাশে
মহা-আকাশের অন্ত-হীনতা
ওই তনু-দেহে লুকায়ে আছে।

কবিতাটা আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'ত হয়তো, কিন্তু চা এসে পড়ল। রূপচাঁদ একটি কথা বলেন নি এতক্ষণ। চা আসাতে ঈষৎ ন'ড়ে চ'ড়ে বসলেন। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সিগারেটে শেষ টানটি দিয়ে ফেলে দিলেন সেটা এবং চায়ের পেয়ালাটি নিয়ে চা খেতে লাগলেন নীরবে। চা-পর্ব নীরবেই সমাধা হ'ল। বৈজ্ঞানিক একটু ইতস্তত করছিলেন, হংসবিষয়ক বক্তৃতায় অগ্রসর হওয়াটা এর পর শোভন হবে কি না! কিন্তু ডানাই প্রশ্ন করলে আবার, আচ্ছা, কালিদাস যে বলেছেন চক্রবাক উৎপল-কেশর খায়, তা সত্যি নাকি?

জানি না। আমি যতদূর জানি, ওরা সব খায়। গুগলি শামুক পোকা-মাকড়, ছোট ছোট সরীসৃপ, এমন কি মড়া পর্যন্ত।

মড়া খায়?

আমি নিজের চোখে খেতে দেখি নি। বইয়ে পড়েছি—

কবি হেসে বললেন, ঠিকই পড়েছেন। একটা কথা কিন্তু পড়েন নি এবং বিজ্ঞানের বইয়ে সম্ভবত তা পাবেনও না। সেটা শুনে রাখুন। যে চখা-চখীরা উৎপল-কেশর খায়, নিশীথে যাদের মাঝখান দিয়ে বিরহের নদী ব'য়ে যায়, মত্তমাতঙ্গদের সংস্রব বর্জন করে যারা, তাদের নাগাল বৈজ্ঞানিক পায় নি কখনও, শিকারীর গুলিতে মারা পড়ে নি সেই হিরণ্য-হংসদম্পতি আজও।

বৈজ্ঞানিক গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, কিন্তু এক জায়গায় তারা ধরা পড়েছে শুনেছি।

কোথায়?

কবির কল্পনাজালে।

রূপচাঁদ বৈজ্ঞানিকের মুখের দিকে চকিতে একবার চেয়ে সিগারেট ধরালেন। ডানার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল কৌতুকের দীপ্তিতে।

কবি বললেন, নিশ্চয়।

তারপর হেসে বললেন কবিতাতে—

কল্পনা-জাল অল্প না জেনো
নাহিক গণ্ডি পরিধি তার
অবাঙ্-মানস-গোচরও তাহাতে
ধরা প'ড়ে যায় বারংবার।

ডানা ব'লে উঠল, বাঃ, বেশ কবিতা তো! কার লেখা?

চুপ ক'রে রইলেন কবি। তাঁর হৃৎপিণ্ডটা বক্ষ-পঞ্জরে মাথা কুটতে লাগল হঠাৎ। কিন্তু মুখ দিয়ে একটি কথা বেরুল না তাঁর। নীরবে ব'সে রইলেন তিনি। বৈজ্ঞানিকই উত্তর দিলেন।

উনিই বানালেন বোধ হয়। চমৎকার কবিতা লিখতে পারেন উনি। পাখি নিয়েই কত কবিতা লিখেছেন'।

তাই নাকি! দেখাবেন আমাকে? কবিতা বড় ভাল লাগে আমার।

কবির মনে হ'ল, কল্প-লোকের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। মন্দাকিনীর কল্লোল শোনা যাচ্ছে, ভেসে আসছে পারিজাতের গন্ধ। ক্ষণিকের জন্য তাঁর চোখের সামনে থেকে অবলুপ্ত হয়ে গেল যেন সব। খানিকক্ষণ পরে যখন আত্মস্থ হলেন, তখন শুনলেন, বৈজ্ঞানিক শরাল-হাঁস আর বালি-হাঁসের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা ক'রে চলেছেন, ডানা নিবিষ্টচিত্তে শুনছে। রূপচাঁদ নীরবে ধূম উদ্গীরণ ক'রে নিজের চতুর্দিকে আবার একটা অস্পষ্টলোক সৃজন ক'রে ব'সে আছেন তার মধ্যে।

হঠাৎ মধুরকণ্ঠে গান গেয়ে উঠল কে যেন অন্ধকারের ভিতর থেকে। সংস্কৃত গান, সেই পুরাতন সংস্কৃত শ্লোকটা—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

চমকে উঠলেন সবাই। রূপচাঁদের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল আরও।

বৈজ্ঞানিক ডানার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, এখানে আর কেউ আছে নাকি?

আমার তো জানা নেই, আর কেউ আছে। আনন্দবাবু যে চাকরটা দিয়ে গিয়েছিলেন, সে-ই আছে কেবল। ওই যে—

চাকরটা একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল সব।

তোমার সঙ্গে আর কেউ আছে নাকি?

না তো।

ও তবে কে?

জানি না।

মুন্সি, দেখে আয় তো, আলোটা নিয়ে যা। নদীর ধারে আউট-হাউসটার দিক থেকেই গানটা আসছে মনে হচ্ছে।

মুন্সি আলোটা নিয়ে চ'লে যেতেই অন্ধকার হয়ে গেল বারান্দাটা। অদ্ভুত অনুভূতিময় অন্ধকার। মনে হ'ল, অন্ধকারের পরতে পরতে যেন অদৃশ্য বিদ্যুৎ সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। কেউ কোনও কথা বলছে না, কিন্তু তানার মনে হচ্ছে, তার চারিদিকে যেন আছড়ে পড়ছে অব্যক্ত ভাবের অসংখ্য তরঙ্গ। দূরে অন্ধকারের ভিতর থেকে উদাত্ত মধুর কণ্ঠে সংস্কৃত গানটা তখনও ভেসে আসছিল। হঠাৎ থেমে গেল সেটা। একটু পরেই দেখা গেল, মুন্সি ফিরছে, তার পিছু পিছু আর একটি লোক। লোকটি কাছে এসেই নমস্কার করলে সকলকে। অদ্ভুত চেহারা। খুব লম্বা। মাথায় বড় বড় চুল, মুখে গোঁফ-দাড়ি। খালি পা। গায়ে কালো কম্বল জড়ানো একটা। শ্যামবর্ণ। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং প্রশান্ত। ব্যক্তিটির অসাধারণত্ব লেখা রয়েছে তার চোখের দৃষ্টিতে।

বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে?

আমি একজন পথিক। সন্ধ্যাবেলায় এসেছি এখানে। রাত্রের মত আশ্রয় নিয়েছি ওই প'ড়ো ঘরটাতে।

পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিলে। রূপচাঁদ এটা প্রত্যাশা করেন নি। আরও কুঞ্চিত হয়ে গেল তাঁর কপাল।

কোথা থেকে আসছেন আপনি?

সংগ্রামপুর থেকে।

সন্ধ্যায় সময় সেখান থেকে আসবার কোনও ট্রেন তো নেই!

আমি হেঁটে এসেছি।

এই অপ্রত্যাশিত উত্তরটা শুনে সকলে স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। ত্রিশ মাইল হেঁটে আসবার কল্পনাও কেউ করে না আজকাল, বিশেষত ট্রেন আসে যখন সেখান থেকে।

কোথায় যাবেন আপনি?—বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন।

তা ঠিক করি নি এখনও। তারপর একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে, ওই প'ড়ো ঘরটাতে কাটিয়ে যেতে পারি দিন কতক। নদীর ধারটা ভাল লাগছে বেশ।

এই কথায় কবির অন্তর পুলকিত হ'ল। তিনি প্রশ্ন করলেন, বাড়ি কোথায় আপনার?

কোথাও নেই।

কি করেন?

কিছুই করি না।

এর পর কি জিজ্ঞাসা করবেন—জিজ্ঞাসা করাটা সঙ্গত হবে কি না—কবি ভেবে পেলেন না। চুপ ক'রে রইলেন।

রূপচাঁদ বললেন, চলে কি ক'রে আপনার?

কি চলবার কথা বলছেন?

পেট।

পোস্ট-অফিসে আমার কিছু টাকা আছে, তার সুদ থেকে চলে।

কথাটা ব'লে যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল লোকটি, পোস্ট-অফিসে টাকা থাকাটা যেন অপরাধ। আবার কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন সবাই। লোকটিই নীরবতা ভঙ্গ করলে।

আমি যদি কয়েকদিন ওখানে থাকি, আপত্তি আছে কি আপনাদের? যদি আপত্তি থাকে, কাল সকালেই আমি চ'লে যাব।

বৈজ্ঞানিক বললেন, আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে ইনি এখানে থাকেন, এঁর যদি অসুবিধা না হয়—

ডানার দিকে চাইলেন তিনি। সকলেই তার দিকে চাইলেন। ডানা দেখছিল লোকটিকে। আপাতদৃষ্টিতে তার লম্বা চুল, কুঞ্চিত ঘন গোঁফ-দাড়ি, গায়ে কম্বল-জড়ানো, খালি পা, দেখলে ভয় হবার কথা। কিন্তু কিছুমাত্র ভয় করছিল না ডানার। একটা অদ্ভুত আশ্বাস যেন ক্ষরিত হচ্ছিল লোকটির চোখের দৃষ্টি থেকে। অতি পবিত্র, অতি নির্মল, অত্যন্ত আনন্দময় একটা জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছিল যেন। ভয় হচ্ছিল না, বরং মনে হচ্ছিল, নির্ভরযোগ্য একটা কিছু পাওয়া গেল। রূপচাঁদ নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিলেন ডানার

দিকে। চোখোচোখি হতেই তিনি বাম-চক্ষুটা ঈষৎ বুজে এবং মাথাটা ঈষৎ নেড়ে যে ইঙ্গিতটা করলেন, তার মর্ম জানা যে বুঝতে পারলে না তা নয়, কিন্তু বুঝতে না পারার ভান করল। বৈজ্ঞানিকের দিকে চেয়ে সে বললে, না, আমার কিছু অসুবিধা হবে না। বরং কাছাকাছি একজন ভদ্রলোক যদি থাকেন, ভালই তো।

আগন্তুক এর পর দাঁড়িয়ে রইল আরও মিনিট খানেক। তারপর বললে, এবার আমি যেতে পারি কি ?

বৈজ্ঞানিক তাড়াতাড়ি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়। আপনাকে এমনভাবে ডেকে এনে দাঁড় করিয়ে রাখাটা অন্যায় হয়েছে আমাদের। কিছু মনে করবেন না। নমস্কার।

প্রতি-নমস্কার ক'রে আগন্তুক চ'লে গেলেন। তারপরই অদ্ভুত ঘটনা ঘটল একটা। পরমুহূর্তেই বোঝা গেল, রাত্রি শেষ হয়েছে, অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। সহসা পাখিরা কলরব ক'রে উঠল একযোগে। ঐক্যতান-বাদন শুরু হয়ে গেল যেন। মনে হতে লাগল, নাটকের নূতন অঙ্ক আরম্ভ হবে এইবার।

বৈজ্ঞানিক উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে কবির দিকে ফিরে বললেন, শুনছেন ?

কি ?

ওই যে, ওই যে—

কবি শুনতে পেলেন এইবার। মধুর গিটকিরিভরা একটা সুর। মনে হ'ল, প্রভাতের আলো যেন কাঁপছে। বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন তিনি। নূপুরের নিক্কণ, বাঁশীর সুর, তার মাঝে মাঝে শিস দিচ্ছে যেন কেউ, ...ারের মীড়ের আভাসও পাওয়া যাচ্ছে, তা ছাড়া আরও কত কি—যা ...র্ণনীয়, মিনতি-ভরা আহ্বান, সোহাগ-ভরা আবেদনের সঙ্গে প্রাণ-ভরা বলিষ্ঠ ...জীতময় পৌরুষের কি অদ্ভুত সমন্বয়।

কবির মুগ্ধভাবটা বৈজ্ঞানিক উপভোগ করছিলেন। যেন কৃতিত্বটা তাঁরই, ...রের নয়। উন্মনা কবি উৎকর্ণ হয়ে চেয়ে ছিলেন স্বচ্ছায়মান অন্ধকারের ...িকে, যেন প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করছিলেন অদ্ভুত এই সুর-সমন্বয়কে। আশা ...রছিলেন, নিজের অজ্ঞাতসারেই কোনও অপরূপ অপ্সরাকে দেখতে পাবেন ...ুঝি এইবার...। ঘাড় ফেরাতেই চোখোচোখি হ'ল বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে।

তিনি বললেন, দোয়েল।

ও।

দেখেছেন কখনও?

না।

চলুন, দেখিয়ে দেব এখুনি।

তারপর ডানার দিকে ফিরে বললেন, আচ্ছা, চলি এবার আমরা। অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে অনেক কষ্ট দিলাম আপনাকে, মাপ করবেন।

তারপর কবির দিকে ফিরে বললেন. চলুন। সোৎসাহে নেবে পড়লেন দুজনেই বারান্দা থেকে। মুন্সি মরা হাঁসগুলোকে পুরতে লাগল বোরার মধ্যে। মুন্সিও যখন চ'লে গেল, তখন রূপচাঁদ কথা কইলেন।

আমি অবাক হয়ে গেছি। শুধু অবাক নয়, ভয় পেয়ে গেছি একটু।

কেন?—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে ডানা।

আপনার সংস্কৃত শুনে। সত্যি আপনি বি. এ. পাস করেছেন?

হ্যাঁ। কিন্তু তাতে ভয় পাবার কি আছে?

হাসি-ভরা দৃষ্টি মেলে ডানা চেয়ে রইল রূপচাঁদের দিকে।

সত্যি নেই? রূপচাঁদের চোখের দৃষ্টিতেও হাসির ঝলক খেলে গেল একটু

নিমগাছের একটা উঁচু ডালে ব'সে ডাকছিল দোয়েলটা। কবি আর বৈজ্ঞানিক দুজনেই ব'সে ছিলেন একটা ঝোপের ধারে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে। কবি দূরবীন লাগিয়ে দেখছিলেন, আর বৈজ্ঞানিক ব'লে চলেছিলেন ফিসফিস ক'রে।—

আমার মতে কোকিলের ডাক নয়, দোয়েলের ডাকই এ দেশে বসন্তের আগমন ঘোষণা করে। কোকিল তো এ দেশে বারো মাসই ডাকছে। দোয়েল কিন্তু শীতকালে ডাকে না তেমন, বসন্ত পড়লে ডাকে। বাই দি বাই, আমরা যাকে কোকিল ব'লে থাকি, ইংরেজীতে তার নাম Cuckoo নয়, Koel হিন্দীতে কোয়েলই বলে। ইংরেজীতে যার নাম Indian Cuckoo—বাংলায় তিনি হচ্ছেন 'বউ কথা কও'। একটু গরম পড়লে সেগুলোর ডাক শোনা যাবে আমবাগানে।

কবি তন্ময় হয়ে শুনছিলেন দোয়েলের গান। বৈজ্ঞানিকের কথা তাঁর কানে ঢুকছিল, কিন্তু মনে প্রবেশ করছিল না। তাঁর মনে হচ্ছিল—

আমরা কেবল সদরে গলিতে
ধূলায় পঙ্কে কাদায় পলিতে
রঙ-বেরঙের নানান থলিতে
নানান রকম স্বার্থ ভরিয়া
করি কলরব করি বাড়াবাড়ি
করি হুড়োমুড়ি করি তাড়াতাড়ি
করি মারামারি করি কাড়াকাড়ি
অপরের শির লক্ষ্য করিয়া
কাদা ছুঁড়ি আর ইঁট মারি।

শাখার শিখরে ও দোয়েল পাখি
চটিয়া গিয়াছ তাই তুমি নাকি
পুচ্ছটি বুঝি তাই থাকি থাকি
আকাশের দিকে ধরিতেছ তুলি
হানিতে চাহিছ সবার প্রাণেতে
তীব্র মধুর তীক্ষ্ণ তানেতে
অবাধ সুরের 'মেশিন গান'-এতে
মর্ম্ম-ভেদিনী এ কি গোলা-গুলি
গিটকারি-ভরা টিটকারি।

কবির মনে হ'ল, শীতের তীক্ষ্ণতা হঠাৎ ক'মে গেছে যেন। কনকনে পূবে হাওয়ার ভিতরও ভেসে আসছে যেন দক্ষিণা বাতাসের আমেজ। মানসপটে ভেসে উঠল, কর্ণিকার মুকুলের গুচ্ছ বিকাশোন্মুখ হয়ে উঠেছে, অশোক-শাখা মুকুলভারনম্র। আকুল নয়নে তিনি খুঁজতে লাগলেন কোথায় নবমল্লিকার দল, কোথায় পদ্মবন…

এদের নিকট-আত্মীয় শ্যামা মানুষের কাছে ঘেঁষে না বড়।—কবি শুনলেন, বৈজ্ঞানিক ব'লে চলেছেন, কতক্ষণ থেকে ব'লে চলেছেন কে জানে!—এরা কিন্তু খুব মানুষ-ঘেঁষা। বাগানে প্রায়ই দেখতে পাবেন। এমন কি এরা ডিমও পাড়ে আমাদেরই ঘরের কাছাকাছি। সেবার আমার মালীর ঘরের পিছনের দিকের কানিশে দেখেছিলাম ওদের বাসা। ডিম ওদের—

বাধা পড়ল। পাশের ঝোপ ভেদ ক'রে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির হলেন মল্লিক। সনাতন মল্লিক, তাঁর হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার। বনে-বাদাড়ে ঘুরে ভদ্রলোকের কাপড়ে লেগেছে অজস্র চোর-কাঁটা। পাঞ্জাবির পকেটটা কি লেগে যেন ছিঁড়ে গেছে। ঝুলছে। এঁদের দেখতে পেয়ে হাত কচলাতে কচলাতে অতিশয় কাঁচুমাচু ভঙ্গীতে এগিয়ে এলেন তিনি। বৈজ্ঞানিকের মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বললেন, কাল সন্ধ্যে থেকে আপনাকে খুঁজছি।

আমি শিকারে বেরিয়েছিলাম এঁদের নিয়ে। কেন, কিছু দরকার আছে নাকি?

আপনার পাখির জন্যে যে ফড়িং দরকার তা তো আমি জানতাম না, সত্যি বলছি, জানতামই না। মুন্সি ব্যাটা মিছমিছি লাগিয়েছে আমার নামে মায়ের কাছে। তিনি কাল একটা চিঠি দিয়েছেন আমাকে। কি আশ্চর্য, সামান্য ব্যাপার, আমাকে একটু বললেই চুকে যেত। ফড়িঙের ভাবনা কি, আমার বাগানে তো যথেষ্ট ফড়িং, দেখুন তো, মিছিমিছি কি কাণ্ড!

বৈজ্ঞানিক বুঝতে পারছিলেন না ব্যাপারটা ঠিক। বললেন, কি চিঠি, কে দিয়েছে?

এই যে দেখুন না, সামান্য ব্যাপার, ছি ছি!

একটি ছোট চিঠি বার ক'রে দিলেন তিনি। স্বর্ণপ্রভার চিঠি। স্বর্ণপ্রভা গোটা গোটা বড় বড় অক্ষরে লিখেছেন—

সবিনয় নিবেদন,

ওঁর পাখির জন্য ফড়িং যোগাড় ক'রে দেবার ভার আপনাকে নিতে হবে। যদি না পারেন কাজে ইস্তফা দিন, আমরা অন্য ব্যবস্থা করব। ইতি স্বর্ণপ্রভা।

বৈজ্ঞানিক ছোট্ট একটু শিস দিয়ে চুপ ক'রে গেলেন। তারপর আড়চোখে চাইলেন একবার সনাতনবাবুর দিকে। শুধু অবাক নয়, অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। কি যে বলবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না। মল্লিক ব'কে চলেছিলেন, সামান্য ফড়িঙের জন্যে এত কাণ্ড করার দরকারটা কি ছিল মুন্সির।

অকারণে গলাটা ঝেড়ে বৈজ্ঞানিক বললেন, আমি এর বিন্দুবিসর্গ কিছুই

জানি না। তবে আমার পাখিগুলো ফড়িঙের অভাবে ম'রে যাচ্ছে। গোটা পাঁচেক ম'রে গেছে।

আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেব।

ধন্যবাদ। বিশ্বাস করুন, এ চিঠির কথা আমি কিছুই জানতাম না।

তাঁর একবার ইচ্ছে হ'ল যে বলেন, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু বসুপ্রভার আত্মসম্মান তাতে ক্ষুণ্ণ হতে পারে ভেবে চুপ ক'রে গেলেন। মল্লিক দন্ত বিকশিত ক'রে হেসে ফেললেন খুব খানিকটা। তারপর বললেন, উনি মনিব, আমি চাকর, হুকুম দেবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ওঁর নিশ্চয় আছে। কিন্তু সামান্য ফড়িং, দেখুন দিকি!

বৈজ্ঞানিক অপ্রতিভমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

এই কথাটা বলবার জন্যেই খুঁজছি আপনাকে কাল থেকে। এক-আধটা নয়, প্রচুর ফড়িঙের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। আজই লাগিয়ে দেব ছোঁড়াগুলোকে। মুলিকে দেবেন পাঠিয়ে, সেও ধরবে। ফড়িঙের আবার ভাবনা! আচ্ছা, চলি এবার তবে।

নমস্কার ক'রে মল্লিক চ'লে গেলেন।

কবির দিকে চেয়ে একটু হেসে বৈজ্ঞানিক আবার শুরু করতে যাচ্ছিলেন, হ্যাঁ, দোয়েলের ডিমের কথা হচ্ছিল। এদের ডিম চমৎকার দেখতে, বুঝলেন?

কবি হেসে উত্তর দিলেন, এখন একটি কথা ছাড়া আর সমস্তই অবান্তর মনে হচ্ছে আমার কাছে।

বৈজ্ঞানিক একটু থমকে গেলেন।

সে কথাটি কি?

বসন্ত এসেছে। যার সম্বন্ধে কবি কালিদাস বলেছেন—

> দ্রুমাঃ সপুষ্পাঃ সলিলং সপদ্মং স্ত্রিয়ঃ সকামা পবনঃ সুগন্ধিঃ
> সুখাঃ প্রদোষা দিবসাশ্চ রম্যাঃ সর্বং প্রিয়ে চারুতরং বসন্তে।

উদ্ভাসিত চক্ষে বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, ও, সার্টেনলি।

ক্রমশ

"বনফুল"

গান্ধী-বাণী-কণিকা

(ইংরেজী হইতে ছন্দে অনুবাদিত)

(১)

হিংসার হবি যোগাইয়া পলে পলে
দেহের কুণ্ডে জীবনযজ্ঞ চলে ;
এ ব্রহ্মাণ্ড বলয়িত যেন
হত্যার শৃঙ্খলে।
জীবকরুণায় সিক্তচিত্ত
চিরবনবাসী যারা
তারাও রুধিতে পারে না এ দেহে
অনাদি হিংসাধারা।
প্রতি নিশ্বাস সাথে
অসংখ্য প্রাণ লভে নির্বাণ
অদৃশ্যে অজ্ঞাতে।
অহিংসাপথ-পথিকের তাই
মর্মের প্রার্থনা
দেহবন্ধন ঘুচায়ে আত্মা
পায় মহাসান্ত্বনা।

(২

পরাজয় কভু মেনো না মহৎ ব্রতে ;—
প্রার্থনা-দৃঢ় চিত্ত
তুমি রাখো রাখো সুপবিত্র,
রাখো প্রত্যয়, নিশ্চিত জয়
নামিবে উর্ধ্ব হ'তে।

(৩)

বন্ধু, যাহারা দিতে চাও মোরে সম্মান,
আপন জীবনে আমার মত ও
পথের করহ সন্ধান।

আস্থা না থাকে যদি,
প্রাণপণে মোরে বাধা দাও ভাই
নিরন্ত নিরবধি।

(৪)

প্রেম ও সত্য দুয়ে একত্র হ'লে
নিখিল বিশ্ব লুটাবে চরণতলে।
রাষ্ট্রজগতে সত্য প্রেমের
সাগ্রহ সাধনাই
সত্যাগ্রহ ভাই।

(৫)

সত্যাগ্রহ মম
অস্ত্র শ্রেষ্ঠতম,
অনায়াসে শত সঙ্কট নাশে
দ্বি-ধার কৃপাণ সম।
যে হানে, যাহারে হানে
উভয়েরই কল্যাণে
রক্তমসী না মাখিয়া এ অাস
পশে মর্মস্থানে।

(৬)

সত্যাগ্রহী অকুতোভয়
শত্রুতে না অপ্রত্যয়,
বিশ বারও যদি বিশ্বাস ভাঙে
একুশ বারে সে পিছপা নয়।
মানুষমাত্রে বিশ্বাস
এদের প্রাণের নিশ্বাস।

(৭)

ধর্মযুদ্ধে মিথ্যা শাঠ্য গুপ্তভাব ত
নেই স্থান,

সত্যাগ্রহী সৈন্য; স্বয়ং সেনাধ্যক্ষ
ভগবান।
ছুটছে সৈন্য পায় পায়,
ঘনাচ্ছন্ন নিরুপায়!—
সেনাধ্যক্ষ পাঠায় তখনি উদ্ধারণের
অভিযান।
সে নয় ধর্ম্মযুদ্ধ যেখানে নেইক
ঐশী আহ্বান।

(৮)

শত শত যবে সত্যাগ্রহী
মরণ বরণ করে,—
নহি অকরুণ, তবু দেখে যাই
সানন্দে অকাতরে।
অন্তরমাঝে আমি জেনেছি যে
এই মরণেরই অক্ষয় বীজে
ভবিষ্যতের কোটি জীবনের
অকাল মরণ হরে।
হাসিবে বিশ্ব অমল প্রাণের
শ্যামল শস্যভরে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

টুকরি

শব্দ হয় ব্রহ্ম তাই মানুষের বাণী
কভূ না হারায় এই ব্রহ্মাণ্ড-আবাসে,
পবন কখন কার কানে দেয় আনি
তারি লাগি প্রতীক্ষিয়া ভাসে শূন্যাকাশে।

*   *   *   *

ভাল কথা শুনে শুনে প'চে গেল কান,
কিঞ্চিৎ খারাপ কথা শুনাও সুহৃৎ—
মিষ্টতর হয় কিসে খাঁটি হাঁড়ি পান,
সংস্কৃত প্রেম হয় প্রাকৃতে পীরিত।

প্রাচীন বাংলা-লেখকগণ

বিপ্রদাস, নারায়ণ দেব এবং শ্রীকর নন্দী

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের ধারা কয়েকটি নির্দিষ্ট খাতে প্রবহমান ছিল। একটি ছিল লাউসেনের কীর্তিকাহিনী। এটি ছিল ধর্মমঙ্গলের বিষয়বস্তু। ময়ূরভট্ট, রূপরাম, খেলারাম, মাণিকরাম গাঙ্গুলী, সীতারাম দাস, রামদাস আদক, ঘনরাম, দ্বিজ রামচন্দ্র, সহদেব চক্রবর্তী, নরসিংহ, গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, রামনারায়ণ, শ্যাম পণ্ডিত, দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ, সেন পণ্ডিত, প্রভুরাম, দ্বিজ ভগীরথ প্রভৃতি কবি সকল ধর্মমঙ্গল রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে ময়ূরভট্টই সকলের চেয়ে প্রাচীন, তিনি সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ছিলেন।

দ্বিতীয় বিষয়বস্তু ছিল কালকেতুর উপাখ্যান। তৃতীয় ছিল ধনপতি সদাগরের বৃত্তান্ত। এই দুইটিই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উপজীব্য হয়েছিল। প্রথমে বোধ হয় চণ্ডীমঙ্গলে একটি মাত্র উপাখ্যান থাকত। পরে অন্যটি যোগ করা হয়। চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি মাণিক দত্ত। তাঁর সময় অনুমান খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে। তারপর মাধবাচার্য, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, মুক্তারাম সেন, দ্বিজ হরিরাম, ভবানীশঙ্কর, জনার্দন প্রভৃতি কবিগণ চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন।

চতুর্থ বিষয়বস্তু ছিল বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান। এই উপাখ্যানটি বাংলার বাইরে থেকে এ দেশে এসেছিল। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ময়মনসিংহের কঙ্ক ছিলেন এর আদিম লেখক। তিনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন ব'লে অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু দ্বিজ শ্রীধর গৌড়ের সুলতান ফিরোজশাহের আদেশে (১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁর বিদ্যাসুন্দর রচনা করেছিলেন। সম্ভবত তিনিই আদি কবি। তারপর গোবিন্দদাস, কৃষ্ণরাম দাস, কবিশেখর বলরাম চক্রবর্তী, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রামপ্রসাদ সেন, প্রাণরাম চক্রবর্তী, নিধিরাম আচার্য কবিরত্ন, কবীন্দ্র মধুসূদন, ক্ষেমানন্দ, বিশ্বেশ্বর দাস প্রভৃতি কবিগণ এই বিষয়ে কাব্য লেখেন। কবি কঙ্ক জনৈক পীরের আদেশে তাঁর কাব্য লেখেন। এতে সত্যপীরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য কবিরা এই বিষয়বস্তু নিয়ে কালিকামঙ্গল বা অন্নদামঙ্গল রচনা করেছেন। একজন মুসলমান কবি সাবিরিদ খান বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান লিখেছেন। তাঁর পুথিখানি খণ্ডিত। তবে প্রাচীন রচনা বটে। নেপালী ভাষাতেও বিদ্যাসুন্দরের কাব্য আছে।

পঞ্চম বিষয়বস্তু বেহুলা ও লক্ষীন্দরের কাহিনী। এই বিষয়টি নিয়ে শতাধিক কবি মনসামঙ্গল বা পদ্মপুরাণ রচনা করেছেন। গল্পটি বিহার থেকে এ দেশে এসেছিল। কবি বিদ্যাপতি সংস্কৃতে এই বিষয়ে একখানি বই লিখেছেন। এখনও বিহারী ভাষায় এই উপাখ্যান প্রচলিত আছে। পদ্মানদীর সঙ্গে মনসাকে অভিন্ন ক'রে মনসার নাম বোধ হয় পূর্ববঙ্গে পদ্মা হয়। যদি বিদ্যার দেবী সরস্বতী নদী থেকে অভিন্ন হতে পারেন, তবে কেনই বা মনসা পদ্মানদীর সঙ্গে অভিন্ন হবেন না? চৈতন্যদেবের সমকালে এই সকল লৌকিক দেবতার পূজার যে খুব একটা ঘটা ছিল, তা চৈতন্য-ভাগবতে নীচের উদ্ধৃতাংশ থেকে বোঝা যায়।—

ধর্ম কার্য লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলী পূজায় কেহ দিয়া বহু ধনে॥ (আদি খণ্ড)

বিষহরি মনসার নামান্তর। মনসামঙ্গলের আদি লেখক কানা হরি দত্ত। বিজয় গুপ্ত তাঁর পদ্মাপুরাণে কানা হরি দত্তের নাম করেছেন।—

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত॥
হার দত্তের যত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
যোড়া গাঁথা নাই কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই, নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল॥ (স্বপ্নাধ্যায় পালা)

হরি দত্তের কয়েকটি পদ মাত্র প্রাচীন পুথিতে রক্ষিত হয়েছে। তিনি সম্ভবত খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি পূর্ববঙ্গের কবি। সৌভাগ্যের বিষয় বিজয় গুপ্তের আত্মপরিচয় থেকে আমরা তাঁর পদ্মাপুরাণের সন-তারিখ পাই—১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। তখন সুলতান হোসেনশাহ গৌড়ের বাদশাহ।

ঋতুশশী বেদশশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক॥
সংগ্রামে অর্জুন রাজা প্রভাতের রবি।
নিজ বাহুবলে রাজা শাসিলা পৃথিবী॥
পশ্চিমে ঘাগরা নদী পূর্বে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর॥

—এই ফুলশ্রী বর্ত্তমান বারশাল জেলার গৈলা গ্রামের একটি পাড়া। তাঁর পিতা-মাতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন।—

সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত।
সেই বিজয় গুপ্তে রাখ তব পদ সাথ॥

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ রচনার পর-বৎসরে বিপ্রদাস তাঁর মনসামঙ্গল রচনা করেন। আমরা এখানে কবির আত্মপরিচয় উদ্ধৃত করছি।—

মুকুন্দ পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি বাদুড়্যা বটগ্রাম॥
বাৎস্য গোত্র পিপিলাই পঞ্চপ্রবর।
সাম বেদ কৌথুম শাখা চারি সহোদর॥
শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে॥
পাঁচালী রচিতে পদ্মা কৈলা আদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ।
কবি গুরু ধীর জনে করি পরিহার।
রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র অনুসার॥
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শাহা গৌড়ের সুলতান॥
হেন কালে রচিল পদ্মার ব্রত গীত।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক পরম পিরীত॥
পদ্মাবতী চরণ সরোজ মধুলোভে।
দ্বিজ বিপ্রদাস তথি ভৃঙ্গরূপ শোভে॥

—এর থেকে রচনার সময় ১৪১৭ শক বা ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ দাঁড়ায়। বাদুড়্যা-

বটগ্রাম অধুনা চব্বিশ পরগণায় বসিরহাট মহকুমায় বাদুড়িয়ার নিকটবর্ত্তী বড়গাঁ। গ্রন্থের প্রথমে গ্রন্থকার স্বয়ং গ্রন্থসূচী আমাদের জানিয়েছেন।—

প্রথমে কহিব তত্ত্ব শুন নর একচিত্ত
মহাযজ্ঞ করে দেবগণ।
গঙ্গা হরের ঘরে নিরঞ্জন আসি তাঁরে
যেন মতে দিলা দরশন॥
নাগইন্দ্র রক্ষা কাজে কালীদহে গজরাজে
মনসা জন্মিল যেন মতে
চণ্ডীর সহিত বাদ হৈল বড় পরমাদ
নির্বাসিলা সিজুয়া পর্বতে॥
কহিব যজ্ঞের কথা কশ্যপ নন্দন যথা
ব্রহ্মা মনমথে মহারণ।
ব্রহ্মশাপ ইন্দ্রে হৈল লক্ষ্মী জলধি গেল
ক্ষীর নদী করিল মথন॥
বিশ্বেশ্বর পশুপতি আসিয়া ত্বরিত মাত
যেন মতে করাইল চেতন।
বিষ কাঁটি দিলা নাগে মনসার বিভাযোগে
জরৎকারু মুনি মহাজন॥
আস্তীক কুমার হৈল নাগইন্দ্র রক্ষা পাইল
জন্মেজয় যজ্ঞ নাশ করি।
মায়া পাতিয়া গিয়া রাখালের পূজা লইয়া
বধিলেন হাসনের পুরী॥
ত্রাস লইল নিম্নস্থানে হরিল চাঁদোয় জ্ঞানে
হেন মতে বধি ধন্বন্তরি।
ধনা মনা বধ করি চাঁদোয় ছয় পুত্র মারি
অনিরুদ্ধ ঊষা আনে হরি॥
নৃপতি পাটনে যায় লখাই বেহুলা হয়
চাঁদ রাজা আইল নিজ দেশে।

উজানি নগরে গিয়া লখাই বেহুলা বিয়া
এড়িল লোহার গুপ্তবাসে ॥
সুতার সঞ্চারে আসি লোহার মন্দিরে পশি
দংশিলেক কাল নাগিনী ।
মান্দাসে ভাসিয়া গেল মৃতপতি জিয়াইল
সুরপুরে করিল মেলানি ॥
তাহা দেখি চাঁদো রাজা করিল পদ্মার পূজা
লখাই বেহুলা স্বর্গবাসী ।
সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গল গীত
বিস্তরে কহিব সপ্ত নিশি ॥
এ সব অপূর্ব গীত যেই শুনে একচিত
ধনপুত্র সিদ্ধ পুরে আশ ।
পদ্মাপদ পঙ্কজে পুট চাটু করি ভুজে
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাস ॥

চাঁদ সদাগরের যাত্রা-প্রসঙ্গে নদীপথের বৃত্তান্তে অনেক ভৌগোলিক তত্ত্ব পাওয়া যায়। রাজঘাট, রামেশ্বর, পরে ধর্মখাল, অজয় নদী, উজানি, শিবানদী ও সাড়াই বা সাখাই, পরে উজানি, কাঁটোয়া, ইন্দ্রঘাট, পরে ইন্দ্রানি নদী, আঁবুয়া, ঘুগিয়া, গুপ্তিপাড়া, মীর্জাপুর, ত্রিবেণী, পরে সপ্তগ্রাম। এখানে সপ্তগ্রামের অতি বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তখন সপ্তগ্রামের সমৃদ্ধি দশা। সপ্তগ্রামের পরে কুমারহাট, পরে ডাহিনে হুগলি, বামে ভাটপাড়া, পশ্চিমে বোরো, পূর্বে কাকীনাড়া, পরে মূলাজোড়া, গাড়ুলিয়া, পশ্চিমে পাইকপাড়া, ভদ্রেশ্বর, পরে ডাহিনে চাঁপদানি, বামে ইছাপুর, পরে বামে বাকীবাজার, পরে দেগঙ্গা, নিমাই-তীর্থ, চানক, বুড়লিয়া, রামলাল, আকনা, মাহেশ, খড়দহ, ডাইনে রিষিড়া, বামে সুকচর, পশ্চিমে কোন্নগর, ডাহিনে কোতরং, বামে কামারহাটি, পূর্বে আড়িয়াদহ, পশ্চিমে ঘুষড়ি, পরে চিৎপুর, পরে পূর্বকূলে কলিকাতা, তারপর বেতড়, কালীঘাট, চুড়াঘাট, ধনস্থান, বারুইপুর, পরে ছুলিয়ার গাঙ, ছত্রভোগ, বদরিকা কুণ্ড, হাথির গড়, তারপর সাগরসঙ্গম। বোধ হয় কলিকাতার উল্লেখ এই সর্বপ্রথম।

পদ্মাপুরাণের আর একজন প্রাচীন লেখক নারায়ণ দেব, তিনি আ
পরিচয়ে বলেছেন,—

নারায়ণ দেব কহে জন্ম মগধ।
বিপ্র পণ্ডিত নহি ভট্টবিশারদ॥
শূদ্র কুলে জন্ম মোর সৎ কায়স্থ ঘর।
মোদ্গল্য গোত্র মোর গাঞি গুণাকর॥
পিতামহ উদ্ধব মোর, নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥
পূর্বপুরুষ মোর অতিশুদ্ধ মতি।
রাঢ় তেজিয়া বোর গ্রামেত বসতি॥

—উদ্ধৃত অংশে যে মগধশব্দ আছে, মধ্য-বাংলায় তার অর্থ—হীন, মূর্খ। বে
কোন পুথিতে আছে—

বৃদ্ধ পিতামহ মোর দেব উদ্ধরণ।
রাঢ় দেশ ছাড়িয়া যে আসিলা আপনা॥

অন্য কোন পুথিতে পাই—

নারায়ণ দেবের জন্ম হ'ল বঙ্গদেশ।
নরসিংহ দেব পুত্র বিজ্ঞতা বিশেষ॥
কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যাবিশারদ।
সুকবি বল্লভ খ্যাতি সর্বগুণ যুত॥

নারায়ণ দেবের জন্মস্থান বোরগ্রাম, বর্তমানে ময়মনসিংহ জিলায় কিশোর
মহকুমার অধীন নসিরুজিয়ান পরগনার তাড়াইল থানার অন্তর্গত। এখ
সেখানে তাঁর বংশধরেরা বসবাস করছেন। তাঁরা নারায়ণ দেব থে
আঠারোর পর্যায়ে। চার পুরুষে একশো বৎসর গনলে নারায়ণ দেব আজ থে
সাড়ে চার শত বৎসর পূর্বে ছিলেন অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু আসা
প্রাপ্ত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে চৈতন্যদেবের বন্দনা পাওয়া যায় এ
মনে হয়, তিনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন।

নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ আসামী ভাষাতেও বর্তমান আছে। দরঙ জিল
লোকে এখনও তাঁর পালা-গান ক'রে থাকে। তারা বলে যে, নারায়ণ
দরঙরাজার আড্ডায় পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। এই দরঙরাজা বিখ্যাত রা

নরনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র। নরনারায়ণের রাজত্বকাল ১৫৪৩ থেকে ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। এতে ক'রে নারায়ণ দেবের সময় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যেই পড়ে বটে। নিম্নে মৃত্যুকালে লক্ষীন্দরের খেদোক্তি উদ্ধৃত করছি—

ওঠ ওঠ ওহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাও।
কাল নাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও॥
তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতিতলে।
অকারণে রাঢ়ী হইলা খণ্ডব্রত ফলে॥
কত খণ্ড তপ তুমি কৈলা গুরুতর।
সে কারণে তোমা ছাড়ি যায় লক্ষীন্দর॥
মাও সোনকা মোর মৃত্যুকথা শুনি।
অগ্নিকুণ্ড করি মায়ে ত্যজিবে পরাণি॥
আমার মরণে মায়ে বড় পাবে তাপ।
পুত্রশোকে মাও মোর সাগরে দিবে ঝাঁপ॥
আমার মরণে মাও হইবে পাগল।
মাগনি হইয়া মায়ে বেড়াবে সহর॥
ছয় পুত্র পাসরিল আমাকে দেখিয়া।
কেমনে ধরাবে দুঃখ মা ঘরে রইয়া॥
খেয়াতি রাখিল মায়ে সংসার জুড়িয়া।
মায়ে পুত্রে মরিবেক চিতাতে পুড়িয়া॥
চিতা সাজাইবে নিয়া গুঙরীর তীরে।
আমা সঙ্গে পশিবে অগ্নির মাঝারে॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাঁচালী।
পয়ার ছাড়িয়া এক বলিব নাচাড়ী॥

। অন্য নীচে আসামী পাঠ দিচ্ছি।—

দিহা—বেহুলা জাগ, উঠা মোর প্রিয়া।
উঠা উঠা প্রাণেশ্বরী কত নিদ্রা যাস।
মোক খাইলা কাল নাগে চক্ষু মেলি চাস॥
তোর সম অভাগি নাহিকে ক্ষিতিতলে।
অকালত রাড়ী ভৈলি খণ্ডব্রতর ফলে॥

কতজন্মে খণ্ডব্রত কৈলি বহুতর।
সেহি দোষে তোক এরি যাউ লক্ষীন্দর॥
যান সনেকা মোর মরণ শুনিলে।
অপনি আলিয়া মার গাবর অকলে॥
আমার মরণে মার মরিব পুরিয়া।
খ্যাতি রাখিবো মারে সংসার জুরিয়া॥
বিষর জালত লখাই বিনায়ে বচন।
কাল নিদ্রা হৈয়া বেহুলার নাহিকে চেতন॥
কায়া আজুলীর বিষে ব্রহ্মার দ্বার পাইলা।
বেহুলা বেহুলা লখাই ডাকিবে লাগিলা॥
সুকবি নারায়ণ দেবর সরস পাঞ্চালী।
লখাইর করুণা বুলি একবে লেচারী॥

আসামী পদ্মাপুরাণের নাম সুকনান্নি। শব্দটি আসলে সুকবি নারায়ণী। এক বাঙালী কবিকে আসামীরাও যে নিজের ব'লে সম্মান করেছেন, এটা আমাদের গৌরবেরই কথা। আমরাও মৈথেলী কবি বিদ্যাপতিকে একরকম আমাদের ক'রে নিয়েছি।

আমার এই প্রবন্ধের প্রথমে মধ্যযুগের কাব্যের যে পাঁচটি প্রধান বিষয়-বস্তুর কথা বলেছি, সেগুলির সঙ্গে আরেকটি বিষয়-বস্তুর যোগ হয় চৈতন্যদেব নিয়ে। তাঁর অলৌকিক জীবনী সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে ওঠে। আর এব প্রধান বিষয়-বস্তুর কথা বলা হয় নি, সেটি পদাবলী। পদাবলী চৈতন্যদেবে পূর্বেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব আর শিক্ষার প্রভাবে এই পদাবলীর অপূর্ব সমৃদ্ধি হয়। এ পর্যায়ে আমরা দুই শতের বেশি পদকর্তার পেয়েছি। বড়ু চণ্ডীদাস ও যশোরাজ খান ভিন্ন সকলই চৈতন্যের সমকালীন পরবর্তী। মধ্যযুগের সাহিত্যের আর একটি বিষয় ছিল অনুবাদ। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের দশম স্কন্ধের অনুবাদ অনেকে করেছিলেন কাশীরাম দাসের মহাভারতের অনুবাদের পূর্বে কয়েকজন কবি বাংল মহাভারত রচনা করেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীকর নন্দী একজন প্রাচীন কবি এখন তার সম্বন্ধে কিছু বলছি।

✓দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বিখ্যাত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' বলেছেন যে, কর

পরমেশ্বর সুলতান হোসেনশাহের সেনাপতি লস্কর পরাগল খানের আদেশে বাংলা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন। আর পরাগল খানের পুত্র ছুটি খানের আদেশে শ্রীকরণ নন্দী অশ্বমেধপর্বের অনুবাদ করেন। আমি অনেক বছর আগে ঢাকার 'প্রতিভা' পত্রিকায় দেখিয়েছিলুম যে, শ্রীকরণ নন্দীর উপাধি কবীন্দ্র পরমেশ্বর। কাজেই তাঁরা দুজন নন। শ্রীকরণ নন্দী নামটি ভুল। তারপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করেছেন। শ্রীকরণ নন্দী কবীন্দ্র পরমেশ্বর পরাগল খানের আদেশে প্রথমে সপ্তদশ পর্ব মহাভারত শেষ ক'রে শেষে অশ্বমেধপর্ব আরম্ভ করেন। অশ্বমেধপর্বের পরীক্ষিতের জন্ম-উপাখ্যান শেষ হবার পূর্বেই সম্ভবত পরাগল খানের মৃত্যু হয়। তখন পরাগল খানের উপযুক্ত পুত্র ছুটি খানের আদেশে কবি অশ্বমেধপর্ব শেষ করেন। কবি মহাভারতের ভূমিকায় হোসেনশাহ ও পরাগল খানের প্রসংশায় বলেছেন,—

নৃপতি হুসেন সাহ হএ মহামতি।
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরমসুখ্যাতি ॥
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হৈল যেন কৃষ্ণ অবতার ॥
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান এক সেনাপতি হওন্ত লস্কর ॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি ॥
লস্করী বিষয় পাই আইলন্ত চালয়া।
চট্টিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া ॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি-হরষিত মতি ॥

অশ্বমেধপর্বের ভূমিকায় কবি নসরৎ শাহ ও ছুটি খানের প্রশংসা করেছেন।—

নসরৎ শাহ নাম অতি মহারাজা।
পুত্রসম রক্ষা করে সকল পরজা ॥
নৃপতি হুসেন শাহা তনয় সুমতি।
সাম দণ্ড ভেদে পালে সর্ব বসুমতী ॥

তান এক সেনাপতি নামে ছুটিখান।
ত্রিপুরা গড়েতে গিয়া হৈল সন্নিধান ॥

* * *

লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমর বিজয়ী ছুটি খান মহাশয় ॥
আজানু লম্বিত বাহু কমল লোচন।
বিশাল হৃদয় মত্ত গজেন্দ্র গমন ॥
চতুঃষষ্ঠি কলায় বসতি গুণনিধি।
পৃথিবীর কল্পতরু সৃজিলেক বিধি ॥
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য ধৈর্য, গাম্ভীর্য বীর্যের নাহি সীমা ॥
কপটের গন্ধ নাহি প্রসন্ন হৃদয়।
রামসম পিতৃভক্ত খান মহাশয় ॥

কবি শ্রীকর নন্দী সম্ভবত হোসেন শাহের রাজত্বের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ) শেষভাগে মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন এবং নসরৎ শাহের রাজত্বের (১৫১৯-৩২ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম ভাগে শেষ করেন।

মধ্যযুগের নাথ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের সিদ্ধাদের ও রাজা গোপীচাঁদের সম্বন্ধে এক সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্বন্ধে অনেক চমৎকার কথা বলা যেতে পারে। বোধ হয় হোসেন শাহের সময়ে সত্যপীরের পালা প্রচলিত হয়। এই সমস্ত ছিল মধ্যযুগে সাহিত্যের ধারা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

রাখে কেষ্ট

অকালে মরিছে যারা ডালি দিয়ে নিজেদের আয়ু,
দীর্ঘজীবী করে তারা কতিপয় ভাগ্যবান জনে ;
শূন্য "পকেটে"র কলে উদ্দাম বহিতে থাকে বায়ু,
ক্রমেরে করিতে ক্রম এরণ্ড এরণ্ড রয় বনে।
নিঃস্ব যশোহীন করি সাধারণ অনেক মানুষে,
বিত্তযশে ধনী হয় কেহ কেহ দেখি এ সংসারে,
তুমি জর্জরিত হও বৃথা বন্ধু, ঈর্ষার কলুষে—
কেষ্ট যারে করে রক্ষা ইহলোকে কে তাহারে মারে।

প্যাথি-বিভ্রাট

সনাতন সার্বভৌমের একমাত্র কন্যা—ভারতী ;
সারা পল্লীর দুলালী সে,
তারই হ'ল সঙ্কটাপন্ন পীড়া।
পাড়াতেই থাকেন দুঃখহরণ
আয়ুর্বেদরত্ন মহাভিষগশাস্ত্রী ;
তিনিই নিলেন চিকিৎসার ভার।
তাই তো,—সুষুম্না পিঙ্গলা ঈড়া
ত্রিনাড়ী আশ্রয় ক'রে ত্রিদোষজ পীড়া !
চলতে লাগল দীর্ঘ দিন যথাশাস্ত্র চিকিৎসা ;
বটিকা চূর্ণ কষায় আসব
ইত্যাদি সব বিবিধ মহৌষধি।
কিন্তু রোগের মেলে না অবধি,
সে নিত্য চলে বেড়ে।
শাস্ত্রী বললেন,—আছে বটে
চরকে সুশ্রুতে বাগভটে
অসাধ্য ব্যাধিরও শাস্ত্রীয় ঔষধ।
উপস্থিত অবস্থায় প্রয়োজন—
ক'টি নপুংসক ছাগ,
আর যথা-বিধানে করতে হবে তাদের বধ।
তার পর যা যা কর্ত্তব্য
সে সব আমিই করব ;
তোমরা কেবল—
কৃষ্ণপক্ষ পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্রে,
উত্তরাস্য হয়ে, স্বামী-স্ত্রী একত্রে,
পদ্মপত্রে যে জল
করছে সদাই টলমল,
সেই জল কিছু করবে সংগ্রহ ;

সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে কর্তার অনুগ্রহ,
মিলিয়ে নিয়ে রাশি গণ
যথাযথ শান্তি-স্বস্ত্যয়ন সাজ ক'রে,
ত্রিকটু ত্রিফলা পঞ্চতিক্ত দশমূল
শালপানি বেড়েলা ইত্যাদি
সন্তুতোলা চৌষট্টি মসলা-যোগে,
পরম শুদ্ধাচারে,
যে মহা ভেষজ হবে প্রস্তুত,
তাতেই হবে সুফল ;
আর সে ফল হবে—
অত্যাশ্চর্য অদ্ভুত !

তত দিন রোগী টিকবে কি না
সে সন্দেহ স্বতই উঠল সনাতনের মনে।
ডাকলেন তিনি—বিলাতী-ডিগ্রীধারী
পশ্চিম পাড়ার ডাক্তার মিস্টার গন্‌এ।
শাস্ত্রীমশায় সুতরাং গেলেন চ'টে,
মনে মনে বললেন,—বটে !
তবে পাড়াপড়শী, আত্মীয়তার স্থান,
আসেন,—নাড়ী দেখে যান।

চিকিৎসা করছেন ডাক্তার গন্‌
খাঁটি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ;—
মল-মূত্র-রক্ত পরীক্ষান্তে
রোগটা যখন পারা গেল জানতে,
চলল নানা ঔষধ,
প্রলেপ পট্টি বিবিধ ইন্‌জেকশন।
কিন্তু রোগ গেল এমনই বেড়ে
যে ধাতই এল ছেড়ে।

গন্ বললেন,—
হার্টের যা অবস্থা, তাতে
যে ট্যাব্‌লেটে হবে নিশ্চিত ফল,
এক ক্যালিফর্নিয়া আর মস্কৌতে
তার আছে দুটি কল।
এখানকার আমদানি বা প্রস্তুতি দাওয়াই,
বিশ্বাস হয় না ছাই।
ক্যালিফর্নিয়া বা মস্কৌ থেকেই আনা চাই,
যদি হন রাজি,
এরোপ্লেনের ব্যবস্থা ইত্যাদি
সব করতে পারি আজই।

অত টাকাই বা কোথায়?
আর রোগীর এমন অবস্থায়
অত দেরি সইবে কি না
স্বতই সন্দেহ হ'ল সনাতনের মনে।
নিরুপায় হয়ে ডাকলেন
ভিন্নপাড়ার হোমিওপ্যাথ একজনে
ডাক্তার গন্ গেলেন খুবই চ'টে;
মনে মনে বললেন,—বটে!
তবে, খবরাখবর নিয়ে থাকেন,
মেয়েটার আর কত দেরি
জনে জনে শুধিয়ে দেখেন।

বন্ধ হ'ল রঙিন দাওয়াই প্রলেপ ইন্‌জেকশন,
চলতে লাগল সূক্ষ্মশক্তি উচ্চ ডাইলিউশন
তুচ্ছ খাঁটি জল।
তাতেই কিন্তু মনে হ'ল একটু-আধটু ফল।
শুনে শাস্ত্রী উঠেন হেসে,
ডাক্তার করেন ব্যঙ্গ;—

এই যোগেতে হোমিওপ্যাথি !
হায় রে কপাল, হাতে ঠেলবে হাতী !
যে কারণেই হোক—
শেষে হাতী কিন্তু নড়ে ।
হপ্তা খানেক পরে
ফিরে এল রোগীর নাড়ী,
প্রলাপ ছেড়ে জ্ঞানের কথা কয়,—
পাড়াসুদ্ধ সবাই বলে—
হোমিওপ্যাথির জয় !

এরই ক'দিন পরে আমি এলাম গ্রামে ফিরে ।
সকল কথা শুনে দেখতে গেলাম ভারতীরে ।
শীর্ণশ্রী শক্তিহারা দেহ,
সদ্য-ফিরে-পাওয়া প্রাণের টাটকা হাসিটুকু
জাগায় বুকে সশঙ্কিত স্নেহ ।
মনে হ'ল—
কি বাঁচাটাই বেঁচে গেছে এবার !
এখন শুধু প্রয়োজন এর
সুপথ্যের আর অক্লান্ত সেবার ।

বাড়ি ফিরতে পথে হ'ল দেখা,
গঙ্গাস্নান সেরে ভিষগশাস্ত্রী
ফিরে আসছেন একা ।
কথা উঠল ভারতীর ;—
বেঁচেছে, না, ছাই !
মকরধ্বজ দেওয়া ছিল,—তাই ।
মাসখানেক—বড় জোর,
তারপরেই দেখতে পাবে
কি যে ঘটে ওর ।
নাড়ীতে জ্বর লেগেই আছে ;

ভায়া, নাড়ী বোঝা চাই ;
ইনি উনি যিনিই হোন না
নাড়ীজ্ঞান তো নাই।
নমস্কার ক'রে যাচ্ছি চ'লে,
দেখি—চলেছেন ডাক্তার গন্
জরুরী এক 'কলে'।

আমায় দেখে বললেন,—কবে এলেন ?
সনাতনের মেয়ের কথা
বোধ হয় শুনেছেন ?
আহা, মেয়েটাকে কোঅ্যাক ডেকে
মেরে ফেললে ওরা !
আমি তো সব দেখছি আগাগোড়া,—
ভিটামিনের অভাবে সব শুকিয়ে দিলে টিস্যু ;
এখন যত পিপ্‌ এবং ফিস্যু
বলছে—মেয়ের রোগ গিয়েছে সেরে !
ফুঃ,—গেছেই যদি সেরে,
এক হপ্তার উপর হ'ল
ভাত খাচ্ছে, দুধ খাচ্ছে,
উঠল না কই ঝেড়ে ?
সেই যে গোড়ায় দেওয়া ছিল ভি-ডি ইন্‌জেক্‌শন,
তাই এখনও টিকে আছে ;
কিন্তু,—কতক্ষণ ?

ঘরে ফিরে উঠল মনে নানা কথার ঢেউ।
মেয়েটা যে বেঁচে আছে, হয়তো বেঁচে গেছে,
কি কবিরাজ কি ডাক্তার
খুশি নয়কো কেউ।
দুজনাতেই চাইছে ওরা বাক্যকায়মনে
হোমিওপ্যাথির বাঁচা রুগী
মরবে কতক্ষণে ?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

প্রসঙ্গ কথা

'বাংলা নাটকের ইতিবৃত্ত'

[শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি, সুতরাং মাত্রাজ্ঞান-বিরহিত। একটি সামান্য মশা মারিবার জন্য তিনি মারাত্মক কামান দাগিয়াছেন। যে ব্যক্তি বি. এ. ডিগ্রী মাত্র সম্বল করিয়া নিজেকে বার বার পি. এইচ-ডি. উপাধি ভূষিত করিতে লজ্জিত হন না, বাংলা সাহিত্যে গবেষণার নামে যিনি অনবরত যাহা-খুশি-তাহাই লিখিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তাঁহার বিপুল গ্রন্থাবলী আখমাড়াই-কলে নিংড়াইলেও ছোবড়া ছাড়া কিছুই বাহির হইবে না। তাঁহার একটি "ম্যাবিশে"র প্রতিবাদে ব্রজেন্দ্রবাবু আমাদের আট পৃষ্ঠা নষ্ট করিবেন, ইহা আমরা পছন্দ করি নাই। ব্রজেন্দ্রবাবুর যুক্তি এই যে, নিরীহ ও বিশ্বাসী ব্যক্তিদের সর্বনাশ যাহাতে না ঘটে (ঐ পুস্তক পাঠে), তাহার ব্যবস্থা করাও তো সামাজিক কর্তব্য। এই যুক্তি মানিয়া লইয়াই এই "প্রসঙ্গ" পত্রস্থ করিতেছি। পাগলা-গারদের রোগীকে আয়ত্তে রাখা যাঁহাদের কর্তব্য, তাঁহারা যদি সে কর্তব্য পালন না করেন, তখন জনসাধারণকে যতদূর সম্ভব সতর্ক করিয়া দিতেই হইবে। তাহা ছাড়া, ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রতিবাদ পাঠে দেখিতেছি, এই ব্যক্তির পাগলামির মধ্যে ঘোরতর মতলববাজিও আছে। আমরা ইহার পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠা মাত্র পড়িয়া পাণ্ডিত্যের যে নমুনা দেখিলাম, তাহাতে আর অগ্রসর হইতে পারি নাই। ব্রজেন্দ্রবাবু নমস্য ব্যক্তি, তিনি পরহিতায় বহু ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠায় এই মহাগবেষক লিখিতেছেন :

"তবে কি বাঙ্গালী নাটক লিখিতে জানিতেন না? তা নয়, কিন্তু পূর্বে নাটক লিখিত হইত সংস্কৃত ভাষায়। জয়দেবের মধুর সঙ্গীত 'ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বরনারী' 'দেহি পদপল্লব মুদারম্' প্রভৃতিই কেবল সর্বত্র শ্রুত হইত না..."

ভদ্রলোক জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্' কখনও চোখেও দেখেন নাই, কানেও শুনেন নাই, অথচ পাণ্ডিত্যের লোভটুকু ষোল আনা আছে। "ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী" এ দেশের শিশুতেও জানে। ইনি জয়দেবকে চেনেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' মারফৎ। স্বামী সত্যানন্দ জয়দেবের পংক্তিটি একটু বিকৃত করিয়া "বনমালী" স্থলে "বরনারী" ব্যবহার করিয়া অন্যান্য সন্তানদিগকে সংজ্ঞাহীনা কল্যাণীর সংবাদ দিতে চাহিয়াছিলেন। "বরনারী"টি

সম্ভবত গবেষকের বড় মিঠা লাগিয়াছিল, তাই মূল "বনমালী"কে খুঁজিয়া বাহির করার প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই। গবেষণাকার্যে এই বিকৃতবুদ্ধিই তাঁহাকে বরাবর চালিত করিয়াছে, এই কারণে আমরা দীর্ঘকাল তাঁহাকে হিসাব হইতে বাদ দিয়াছিলাম। ব্রজেন্দ্রবাবু আবার নূতন করিয়া হিসাবের খাতা খুলিলেন, এইখানেই আমাদের আপত্তি।—স. শ. চি.]

সম্প্রতি শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত 'বাঙ্গলা নাটকের ইতিবৃত্ত' নামে ১৯২ পৃষ্ঠার এক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিতেছেন :— "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে প্রথম গিরিশচন্দ্র ঘোষ অধ্যাপকের গৌরবময় আসন দিয়া নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যে সুযোগ দিয়াছেন এই গ্রন্থ রচনার সে সুবিধাও কম নয়।" বিশ্ববিদ্যালয়ের "গিরিশ-লেকচারারে"র গবেষণা কিরূপ ফল প্রসব করিয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দিব। না দিয়াও বোধ হয় উপায় নাই ; তাঁহার ন্যায় গবেষক স্বকীয় গ্রন্থের বহু স্থলে আমাকে অযথা আক্রমণ করিয়াছেন ; আমার একমাত্র অপরাধ বোধ হয় এই যে, আমি একখানি 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' রচনা করিয়াছি ! হেমেন্দ্রবাবুর এই আক্রমণ কতটা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে তাহার বিচারের ভার সুধীজনের উপর দিয়া আমার বক্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

"প্রথমাভিনীত বাংলা নাটক" : হেমেন্দ্রবাবুর মতে, রামনারায়ণ তর্করত্ন-প্রণীত 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব'ই* "প্রথমাভিনীত বাঙ্গলা নাটক—প্রথমে ইহার অভিনয় হয় ১৮৫৬ খ্রীঃ।...'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' সম্বন্ধে তিনি [ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়] যে তারিখ দিয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক" (পৃ. ২৬, ৬৫)।

১৮৫৬ সনে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' অভিনয়ের কথা প্রথমে প্রচার করেন— মাইকেল মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাস বসাক তাঁহার স্মৃতিকথায় ('মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', ১ম সং, ১৮৯৩ দ্রষ্টব্য)। হেমেন্দ্রবাবু ও আরও কেহ কেহ এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র ; ভাবিয়া দেখেন নাই যে, স্মৃতিকথায় বর্ণিত ঘটনার তারিখ নির্বিচারে গ্রহণ করিলে অনেক সময়ই বিপদে পড়িতে হয়। হইয়াছেও তাহাই। প্রকৃতপক্ষে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটক

---

* হেমেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে সর্বত্র (অন্ততঃ ১২ বার) নাটকখানির নাম 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' মুদ্রিত হইয়াছে। 'চা-কর দর্পণ নাটক'ও সর্বত্র 'চাকর দর্পণে' পরিণত হইয়াছে। এরূপ মুদ্রণে অর্থান্তর হয় কিনা বিবেচ্য।

প্রথম অভিনীত হয়—১৮৫৭ সনের মার্চ মাসে, নূতনবাজারে রামজয় বসাকের বাটীতে (১৮৫৬ সনে নহে)। 'এডুকেশন গেজেট' পত্রে এই অভিনয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়; তাহারই উল্লেখ করিয়া সহযোগী 'হিন্দু পেট্রিয়ট্‌' ১৮৫৭, ১৯এ মার্চ লেখেন :—

"*Friday, the 13th March*....The Educational Gazette states that the well-known farce of Koolino Kooloshorbushya was acted in the private residence of a Baboo in Calcutta with great success. We are glad to see these new pieces acted."

সমসাময়িক সংবাদপত্রের এই সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিবার উপায় নাই। হেমেন্দ্রবাবুর অবগতির জন্য জানাইতেছি, যে-গৌরদাসের স্মৃতিকথা অবলম্বনে তিনি ১৮৫৬ সনে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' অভিনয়ের কথা বলিয়াছেন, সেই স্মৃতিকথার ঐ ভ্রমাত্মক অংশ পরবর্তী কালে (৩য় সং, ১৯০৫†) বর্জিত হইয়া এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে :—

The credit of organizing the first Bengali Theatre belongs to the late Babu Jayram Bysack...who formed and drilled a Bengali dramatic corps and set up a stage in his house, on which was formed, in MARCH 1857, the sensational Bengali play of *Kulin Kula Sarvasva.*

এই তারিখের সহিত 'এডুকেশন গেজেটে' প্রদত্ত অভিনয়কালের হুবহু মিল আছে।

হেমেন্দ্রবাবুর মতে, 'কুলীন কুলসর্ব্বস্বে'র "পরে অভিনীত হয় নন্দকুমার রায় অনূদিত শকুন্তলা নাটক" (পৃ. ৪১)। প্রকৃতপক্ষে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্বে'র দেড় মাস পূর্ব্বে, ১৮৫৭ সনের ৩০এ জানুয়ারি, শকুন্তলা নাটক অভিনীত হইয়াছিল। এই অভিনয় দেখিয়া 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য; তিনি লেখেন :—"প্রতি বৎসর প্রসিদ্ধ ইংরেজী কবি সেকসপিয়র নাট্যক্রীড়া ইস্কুলের ছাত্রেরা প্রায় করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহ এরূপ বাঙ্গালায় নাট্যক্রীড়া চেষ্টা করেন নাই।" এই উক্তিও সপ্রমাণ করে যে, শকুন্তলাই "প্রথমাভিনীত বাংলা নাটক"; ইহার পূর্ব্বে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' বা অন্য কোন বাংলা নাটকের অভিনয় হয় নাই।

'মায়া-কাননে'র প্রথমাভিনয়-কাল : হেমেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন

---

† মৃত্যুর (ইং ১৮৯৯) অব্যবহিত পূর্ব্বে, গৌরদাস ৩য় সংস্করণ মাইকেল-জীবনীর জন্য তাঁহার স্মৃতিকথাটি সংশোধন করিয়া গিয়াছিলেন, এরূপ মনে করাই সঙ্গত হইবে।

(পৃ. ৬৫) :—"বেঙ্গল থিয়েটারে মায়াকানন অভিনীত হয় ১৮৭৩, ৩০শে আগষ্ট।"* এই তারিখের সমর্থনে তিনি যে পাদটীকাটি দিয়াছেন তাহা এইরূপ :—" 'মধুসূদন দত্ত' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে লিখিয়াছেন 'মায়া-কানন' ১৮৭৪ এপ্রিল মাসে প্রথম অভিনীত হইয়াছে ইহা ভ্রমাত্মক। নাট্যাচার্য্য অমৃত বসুর স্মৃতিকথা দ্রষ্টব্য—পুরাতন প্রসঙ্গ দ্বিতীয় পর্য্যায় ১৩২, ১৩৩ পৃ.।"

আমরা 'পুরাতন প্রসঙ্গ,' ২য় পর্যায় সযত্নে পাঠ করিয়াছি, তাহার কুত্রাপি হেমেন্দ্রবাবু-প্রদত্ত 'মায়া-কাননে'র অভিনয়-কাল "১৮৭৩, ৩০শে আগষ্ট" খুঁজিয়া পাই নাই। প্রকৃতপক্ষে 'মায়া-কাননে'র প্রথমাভিনয়-কালে আমি কোন ভুল করি নাই। অভিনয়ের পূর্বদিন 'ইংলিশম্যানে' যে বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়, তাহা উদ্ধৃত করিলেই আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে :—

The Bengal Theatre.—...Next Saturday, Maya Kanan, or the Enchanted grove, the posthumous production of the late Michael Modusudan Datta, will be produced. (17 April 1874)

ইহার পরের সপ্তাহে (২৫এ এপ্রিল) 'মায়া-কাননে'র "দ্বিতীয় অভিনয়" হয়, ঐ তারিখের 'ইংলিশম্যানে' প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে তাহার উল্লেখ আছে।

তারিখ-নির্ণয়ে ঔদাসীন্য : হেমেন্দ্রবাবুর গ্রন্থের সর্বত্র সঠিক তারিখ নির্ণয়ের প্রতি ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়াছি। ঐতিহাসিক গ্রন্থে ইহা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। দুই-চারিটি দৃষ্টান্ত দিতেছি :—

(১) 'কীর্ত্তিবিলাস নাটকে'র প্রকাশকাল সম্বন্ধে তিনি বলেন (পৃ. ১০, পাদটীকা) :—"প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় ১৮৫১ সালের উল্লেখ আছে।" 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক মহাশয়ের নিকট এই নাটকের এক খণ্ড আছে, তাহার আখ্যা-পত্রে কেবলমাত্র "১২৫৮ সাল" মুদ্রিত আছে। হেমেন্দ্রবাবু কোথা হইতে "১৮৫১ সাল" পাইলেন ?

(২) হেমেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে (পৃ. ৪২) আছে :—"১৮৫৪ সালে Captive Lady প্রকাশ।" বইখানির নাম—*Captive Ladie*; প্রকাশকাল—"মাদ্রাজ, ১৮৪৯"।

---

* হেমেন্দ্রবাবু তাঁহার 'গিরিশ-প্রতিভা'য় (পৃ. ৫৭৭) 'মায়া-কাননে'র প্রথমাভিনয়-কাল আবার "২৩এ আগষ্ট" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(৩) তাঁহার মতে রাজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু-তারিখ "১৮৯৪ সালের ৫ই মার্চ্চ" (পৃ. ১৭৬)। আমাদের তো "১১ই মার্চ" বলিয়াই জানা আছে।

* * *

কিন্তু এ তো গেল হেমেন্দ্রবাবুর বিচারবুদ্ধিহীনতা ও ঔদাসীন্যের যৎকিঞ্চিৎ নিদর্শন। এবার যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা চিরদিন তাঁহার গবেষণা-গরিমার কলঙ্কস্বরূপ হইয়া থাকিবে।

নাটকে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দ : গিরিশচন্দ্রের চরিতকারগণ বলেন, "রাবণবধ নাটকে গিরিশচন্দ্র ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ—প্রথম প্রবর্ত্তন করেন।" শিল্পী গিরিশচন্দ্রের হস্তে এই ছন্দ যে সার্থক ও সুন্দর হইয়াছিল, ইহা সর্বজন-বিদিত; কিন্তু তিনি এই ছন্দের প্রথম প্রবর্তক নহেন। আমি 'শনিবারের চিঠিতে'ই ইতিপূর্বে (অগ্রহায়ণ ১৩৫২) দেখাইয়াছি যে, অভিনয়-সৌকর্যার্থে বাংলা নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিরাট্ সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া রাজকৃষ্ণ রায়ই সর্বপ্রথম এই ছন্দে 'হরধনুর্ভঙ্গ' নামে পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করেন; তিনিই বাংলা নাটকে—কাব্যেও বটে—ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্তক।

গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' ও রাজকৃষ্ণের 'হরধনুর্ভঙ্গ' একই বৎসরে, ১২৮৮ সালে, প্রকাশিত হইলেও, অভিনয় ও পুস্তক-প্রকাশ—উভয় ক্ষেত্রেই রাজকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রের পূর্বগামী :—

পুস্তক-প্রকাশকাল	অভিনয়-কাল
'হরধনুর্ভঙ্গ'...২৮ জুলাই ১৮৮১	২৮ জুলাইয়ের পূর্বে বেঙ্গলে অভিনীত
'রাবণবধ' ... ৫ নবেম্বর ১৮৮১	৩০ জুলাই ১৮৮১

১৮৮১, ২১এ মে 'আনন্দ রহো' অভিনীত হইবার অব্যবহিত পরেই গিরিশচন্দ্রের মনে ভঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দের সম্ভাব্যতার কথা উদিত হয়; ইহারই দুই মাসের ব্যবধানে 'রাবণবধ' রচিত হইয়া ৩০এ জুলাই (অর্থাৎ রাজকৃষ্ণের 'হরধনুর্ভঙ্গ' প্রকাশের দুই দিন পরে) প্রথম অভিনীত হয়। ভক্ত হেমেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রকে আভিনয়িক ছন্দের প্রথম প্রবর্তক-রূপে দেখিতে ইচ্ছুক; তিনি তাই কৌশলী উকিলের ন্যায় বলিতেছেন :—

"দুই মাসের পূর্ব্বে কোন পঞ্চাঙ্ক নাটকেরই পাবলিক থিয়েটারে অভিনয়ই সম্ভব নয়, তাই আনন্দরহোর পরেই দুই তিন মাস রিহার্সেল

দিয়া গিরিশ রাবণবধ নাটক ৩০ জুলাই মকস্থ করেন।...এই সময়ে রাজকৃষ্ণবাবুর নিজস্ব একটী প্রেসও ছিল—উহার নাম বীণা যন্ত্র। সুতরাং একশত* পৃষ্ঠার পদ্যের একখানি বহি নিজের কথায়ই ৫।৬ দিন লিখিতে ও নিজের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত করিতে সর্ব্বসমেত পোনর দিন লাগিতে পারে। আড়াই মাস পূর্ব্ব হইতে রাবণবধ অভিনয়ের কথা ও কবিতার আবৃত্তি সর্ব্বত্র বিদিত হইয়াছে, সেই সন্ধানটুকু অবলম্বন করিয়া কোন কবি ও নাট্য-কুশল ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি ও মনীষার সহায়তায় যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত বহি বা নাটক বাহির করিতে পারেন তাহা অসম্ভব বা বিচিত্র নয়। সুতরাং রাবণবধের অভিনয়ের মাত্র দুই দিন পূর্ব্বে প্রবেশকাল হইলেও রাবণবধই যে মৌলিক এবং নূতন অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম নাটক, এই সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক। আর যাহার নিজের প্রেস আছে সে পুস্তকে প্রবেশকাল আগষ্ট মাসে হইলেও ২৮শে জুলাই তারিখ স্বচ্ছন্দে বসাইতে পারে... ।" (পৃ. ১৬২-৬৩)

হেমেন্দ্রবাবুর ওকালতির দাপটে নিরীহ রাজকৃষ্ণ অসাধু ও জুয়াচোরে পর্যবসিত হইয়াছেন। কিন্তু কোন "বিচার সম্পন্ন ব্যক্তি" যদি প্রশ্ন করিয়া বসেন, "মহাশয়, আপনি তো বলিলেন 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকখানি লিখিতে ও নিজের প্রেসে মুদ্রিত করিতে রাজকৃষ্ণের সর্বসমেত ১৫ দিন লাগিয়াছে। কিন্তু মাঝে যে অনেকটা ফাঁক রহিয়া গেল? ব্রজেন্দ্রবাবু যে বলিতেছেন, নাটকখানি প্রকাশের পূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল; ইহা সত্য হইলে, আপনারই যুক্তি অনুসারে পশ্চাৎ নাটকখানি পাবলিক থিয়েটারে মহলা দিতে অন্তত দুই মাস সময় লাগিয়াছিল, তাহার পর অভিনয়, এবং সর্বশেষে ২৮এ জুলাই নাটক প্রকাশ। এরূপ হিসাব করিলে তো গিরিশচন্দ্রের প্রাধান্য বজায় থাকে না। তাহার কি করিতেছেন?" হেমেন্দ্রবাবু যে কথাগুলা ভাবেন নাই তাহা নহে। তিনি আসল কথাটি সজ্ঞানে গোপন করিয়া নির্লজ্জভাবে এই যুক্তি দিয়াছেন :—

(১) "ব্রজেন্দ্রবাবু কতকগুলি অবান্তর অনুমানের উপর তাঁহার সিদ্ধান্ত নির্ভর করিয়া আরও বিচারশূন্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে বলেন 'হরধনুর্ভঙ্গে'র প্রকাশকালের পূর্ব্বে উহা বঙ্গরঙ্গভূমিতে অভিনীত

* এক শত পৃষ্ঠায় নহে;—৮০+১২০ পৃষ্ঠায়।

হইয়াছিল, ইহা নিতান্তই অলীক ও কাল্পনিক কথা।...নাটকের প্রকাশ-কালের পূর্ব্বে অভিনয় হইয়া থাকিলে নাটকে এই বিষয়ে উল্লেখ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার—নিশ্চয়ই থাকিত।" (পৃ. ১৬৪, ১৬৬)

(২) "৺রাজকৃষ্ণ রায় তখন [১৮৮১ সনে 'হরধনুর্ভঙ্গ' প্রকাশকালে] কোন থিয়েটারের সহিতই সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। তখন তিনি নব্য নাট্যকার।" (পৃ. ১৬৫)

(৩) "বস্তুতঃ প্রহ্লাদচরিত্রের পূর্ব্বে (১৮৮৪), বেঙ্গল থিয়েটারে রাজকৃষ্ণবাবুর কোন নাটক অভিনীত হয় নাই।" (পৃ. ১৬৬)

হেমেন্দ্রবাবু সত্যনিষ্ঠ হইবেন, ইহাই আমরা আশা করিয়াছিলাম। দুঃখের সহিত তাঁহার তিন দফা "প্রলাপোক্তি"র প্রতিবাদ করিয়া সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছি। পাঠকগণ মিলাইয়া পড়ুন :

(১) হেমেন্দ্রবাবু গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাদিও আমাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।" কিন্তু তিনি যদি পরিষদে রক্ষিত মূল 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকখানির আখ্যা-পত্রের প্রতি নেত্রপাত করিতেন তাহা হইলে বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত—"বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত" কথাগুলি নিশ্চয়ই তাঁহার নজরে পড়িত। অর্থাৎ নাটকখানি প্রকাশের পূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল। কৌতূহলী পাঠকের জন্য আখ্যা-পত্রটির নকল দিলাম :—

হরধনুর্ভঙ্গ / পৌরাণিক-ইতিবৃত্ত-মূলক দৃশ্যকাব্য। / ... / শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।। **বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনীত** / কলিকাতা / ৩৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—ঠনঠনিয়া—বীণাযন্ত্রে / শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত। / ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে / শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক / প্রকাশিত। / ১২৮৮ /

(২) ১৮৮১ সনে 'হরধনুর্ভঙ্গ' প্রকাশের সময় রাজকৃষ্ণ "নবনাট্যকার," ইহা (হেমেন্দ্রবাবুর ভাষায়) "অলীক ও কাল্পনিক কথা।" যখন গিরিশচন্দ্রের কোন নাটকই প্রকাশিত হয় নাই, তখন রাজকৃষ্ণের একাধিক নাট্যগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। 'হরধনুর্ভঙ্গে'র পূর্বে প্রকাশিত রাজকৃষ্ণের নাট্যগ্রন্থগুলির প্রকাশকাল সহ তালিকা :—

১। পতিব্রতা (নাট্যগীতি) ... ৩ ডিসেম্বর ১৮৭৫
২। নাট্যসম্ভব (উপরূপক) ... ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬

৩।	অনলে বিজলী (নাটক) ···	৭ এপ্রিল	১৮৭৮
৪।	দ্বাদশ গোপাল (প্রহসন)···	১১ জুলাই	১৮৭৮
৫।	লৌহকারাগার (নাটক) ···	২৮ জানুয়ারি	১৮৮০
৬।	তারকসংহার (নাটক) ···	২০ জুলাই	১৮৮০

'হরধনুর্ভঙ্গ' প্রকাশকালে রাজকৃষ্ণ "কোন থিয়েটারের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন না" বলিলেও সত্যের অপলাপ করা হয়। রাজকৃষ্ণের সুহৃৎ ও একদা-সহকর্মী শরচ্চন্দ্র দেব এ-বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে মনে করি। তিনি লিখিয়াছেন :—

"তাঁহার প্রথম নাটক 'অনলে-বিজলী'। তিনি চেষ্টা করিয়া বঙ্গরঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণের দ্বারা উহার অভিনয় করাইয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই উক্ত রঙ্গভূমির সহিত তাঁহার সম্পর্ক আরম্ভ হয়।···রাজকৃষ্ণবাবু বঙ্গরঙ্গভূমির জন্য ক্রমে নাট্যসম্ভব, দ্বাদশ গোপাল, লৌহকারাগার, বিক্রমাদিত্য, হরধনুর্ভঙ্গ ও রামের বনবাস রচনা করেন।···রামের বনবাসের অভিনয় কিছু বেশী দিন চলে, এই সময়ে রাজকৃষ্ণবাবু গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটারে 'তরণীসেন বধ' লিখিয়া দেন। ('বাল্মীকি রামায়ণ', ৪র্থ সং. জীবনী)

(৩) ১৮৮৪ সনে প্রহ্লাদচরিত্রের পূর্বে বেঙ্গল থিয়েটারে রাজকৃষ্ণের কোন নাটক অভিনীত হয় নাই—ইহাও (হেমেন্দ্রবাবুর ভাষায়) "প্রলাপোক্তি"। 'প্রহ্লাদচরিত্রে'র পূর্বে রাজকৃষ্ণের অন্তত আটখানি নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে সগৌরবে অভিনীত হইয়াছিল ; যে-কেহ রাজকৃষ্ণের মূল গ্রন্থগুলি দেখিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন। নাটকগুলি :—

১৮৭৬ : নাট্যসম্ভব
১৮৭৮ : অনলে বিজলী ; দ্বাদশগোপাল।
১৮৮০ : লৌহকারাগার
১৮৮১ : হরধনুর্ভঙ্গ
১৮৮২ : রামের বনবাস
১৮৮৪ : যদুবংশধ্বংস
রাজা বিক্রমাদিত্য।

সজ্ঞানে এবং অজ্ঞানে কৃত প্রমাদের ভূরি ভূরি নিদর্শন এই পুস্তকের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা করিবার ধৈর্য আমার নাই—বোধ হয় আর তাহার প্রয়োজনও নাই।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

"প্রাচীন বাংলা-লেখকগণ"

চৈত্রের (১৩৫৪) 'শনিবারের চিঠি'তে বন্ধুবর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের "প্রাচীন বাংলা-লেখকগণ" প্রবন্ধটি প'ড়িলাম। প্রবন্ধের বিষয়ে যৎসামান্ত আলোচনা প্রয়োজন। শহীদুল্লাহ সাহেব লিখিয়াছেন, "সেন রাজাদের সময়ে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। যাতে ক'রে পরে বাংলা সাহিত্যে এক নূতন ধারা এসে জোটে। সেটি হচ্ছে ধর্মপূজার প্রবর্তন।" এ কথাটা নূতন, কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। ধর্মরাজ-পূজার প্রবর্তন হয় পাল-রাজাদের সময়ে। পাল-সম্রাট প্রথম মহীপালের সময়েই ধর্মরাজ-পূজা প্রবর্তিত হয়, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে। দাক্ষিণাত্যের দিগ্বিজয়ী ভূমিপাল রাজেন্দ্র চোল ঈশাই অব্দ ১০২৪ দশ শত চব্বিশে বাংলা আক্রমণ করেন। তিনি মেদিনীপুর দাঁতনের রাজা দণ্ডভুক্তিপতি ধর্মপালকে যুদ্ধে নিহত করেন। দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর, বঙ্গের গোবিন্দচন্দ্র তাঁহার নিকট পরাস্ত হন। খুব সম্ভব উত্তর রাঢ়ের মহীপালের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া যান। পালসম্রাট প্রথম মহীপাল —"অনধিকৃত বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য গৌড়েশ্বর" গৌড় হারাইয়া রাঢ়ের বনময় প্রদেশে মুর্শিদাবাদের গয়েসপুর অঞ্চলে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকও এই নূতন রাজধানীতেই হয়। নিভৃতে বলসঞ্চয় করিয়া পরে তিনি হৃতরাজ্য পুনরাধিকার করেন। দণ্ডভুক্তির ধর্মপাল মহীপালের ভাগ্য-বিপর্যয়ের সুযোগে অজয়তীরবর্তী প্রাচীন ত্রিষষ্ঠী গড় বা ঢেকুর গড় বা সুহ্মের প্রাচীন রাজধানী (শ্যামারূপার গড়) অধিকারপূর্বক সেখানে একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। ঢেকুরের রাজা তখন কর্ণসেন। বাণভট্টের হর্ষচরিতে ইহারই পূর্বপুরুষ দেবসেনের কথা উল্লিখিত আছে। যিনি "দেবযা রক্তা মহিষী দেবকীর বিষচূর্ণচুম্বিত কর্ণোৎপলে" মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন সুহ্মের দামলিপ্ত বা তাম্রলিপ্ত এক সময় ইহাদের রাজধানী ছিল। কর্ণসেনের রাজ্যে যাঁহাকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন, তাঁহার নাম সোম ঘোষ। রাজেন্দ্র চোলের সহিত যুদ্ধে ধর্মপালের মৃত্যু হইলে সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগে কর্ণসেনকে তাড়াইয়া দেন এবং নিজে ঢেকুরের রাজা হইয়া বসেন। কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন মহীপালের সহায়তায় যুদ্ধে ইছাইকে বধ করিয়া পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। কর্ণসেন বাঁকুড়া

ময়নাগড়ে বিবাহ করিয়া সেখানেই আত্মগোপন করিয়াছিলেন। রামাই পণ্ডিত ময়নাপুরের অধিবাসী। লাউসেনের সাহায্যের জন্য সাময়িক প্রয়োজনে তিনি ধর্মপূজার প্রবর্তন করেন এবং লোয়ার, খয়রা, ডোম, বাগদী, ভল্ল, হাড়ী প্রভৃতি সেকালের যোদ্ধজাতিকে ধর্মঠাকুরের নামে একতাবদ্ধ করিয়া একটি নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া তোলেন। সৌর, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধধর্মের সমন্বয়ে ধর্মরাজ-ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটে। রাঢ় দেশ (বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ ও মেদিনীপুরের কতকটা) ভিন্ন সারা বাংলার অন্য কোথাও ধর্মঠাকুরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

অনেক ধর্মমঙ্গলেই লেখা আছে—"ধর্মপাল রাজা মলো অরাজক দেশ। পাত্রমিত্র প্রজালোক পায় বড় ক্লেশ॥" ধর্মমঙ্গলে লাউসেনের গৌড়যাত্রার কথা আছে। যাইবার পথে তিনটি স্থানে তিনটি ঘটনা ঘটে। এই তিনটি স্থানের নামে ধর্মমঙ্গলে তিনটি পালা আছে। প্রথম জলন্দার গড় পালা। দ্বিতীয় জামতী পালা। তৃতীয় গোলাহাট পালা। ইহার পরেই গৌড় রাজধানী। জলন্দা, জামনা বীরভূমের মধ্যে, গোলাহাট মুর্শিদাবাদে ময়ূরাক্ষীর তীরে। ইহার পরেই গয়েসপুর সেকালের পাল-রাজধানী। পরবর্তী মঙ্গল-কাব্য-রচয়িতাগণ সকলেই এই তিনটি পালা রচনা করিয়াছেন এবং তাহার পরেই গৌড় রাজধানীর উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, গয়েসপুরের কথা লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। রাজধানী বলিতে গৌড়ই বুঝাইত। কিন্তু পথের তিনটি স্থানের নাম ও ঘটনা লোকে মনে রাখিয়াছিল। কবিগণ কিম্বদন্তী শুনিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। নিরঞ্জনের উষ্মা বহু পরের রচনা এবং যোজনা। পালেদের সময় হইতেই বাংলা রচনার সূত্রপাত হয়। সেনেদের সময়ে কবি জয়দেবের প্রভাবে বাংলা লেখা সহজসাধ্য হইয়া আসে। ময়ূর ভট্ট, কানা হরি দত্ত, মানিক দত্ত প্রভৃতি কবি বড়ুচণ্ডীদাসের পূর্ববর্তী। চণ্ডীদাসের রচনা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহার পূর্বেই বাংলা কবিতার একটা গড়ন দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, ভাষা এবং ছন্দ বেশ মার্জিত হইয়া আসিয়াছিল। বড়ু-চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই ইহার পরিচয় রহিয়াছে। "অষ্টাদশ পুরাণানি" শ্লোকটি সেন-রাজাদের বহু পরের রচনা। ওই একটি মাত্র শ্লোক দেখিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা অন্যায্য। রাজদরবারে বাংলার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন চণ্ডীচরণ-পরায়ণ রাজা দনুজমর্দন দেব বা রাজা গণেশ, এবং তৎপুত্র যদু বা

জেলালউদ্দীন। পরবর্তী গৌড়েশ্বরগণ তাঁহা:ই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন মাত্র।

মালাধর বসুকে গুণরাজ খান এবং তৎপুত্র লক্ষ্মীকান্ত বসুকে সত্যরাজ খান উপাধি কে দিয়াছিল, অনুসন্ধান আবশ্যক। চণ্ডীদাসের বাংলা ও প্রাচীন বাংলার মাঝখানে সন্ধিস্তর একটা ছিল নিশ্চয়ই। এই স্তরের কবিদের পরিচয় প্রয়োজন। মিথিলায় যেমন বিদ্যাপতির, তেমনই বীরভূমে চণ্ডীদাসেরও একজন আশ্রয়দাতা ছিলেন, ইহার নাম কিপ্তিকন, ইনি হিন্দু ভূস্বামী। কৃত্তিবাসের আশ্রয়দাতা গৌড়েশ্বর যে রাজা গণেশ, সে বিষয়ে সন্দেহ না করাই নিরাপদ। অবশ্য যশোরাজ খান, দামোদর এবং কবিরঞ্জন—ইহারা মুসলমান সুলতানেরই আশ্রিত ছিলেন। রামগোপাল দাস রসকল্পবল্লী গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

শ্রীকবিরঞ্জন দামোদর মহাকবি।
যশোরাজ খান আদি সবে রাজসেবী॥

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র যাহাই বলুন না কেন, কবিরঞ্জন শ্রীখণ্ডের অধিবাসী, তিনি পদাবলী-রচয়িতা এবং তাঁহার ছোট বিদ্যাপতি উপাধি ছিল—এসব কথা ঐতিহাসিক সত্য। শ্রীখণ্ডের ওই রামগোপাল দাস নরহরি শাখা নির্ণয় ও রঘুনন্দন শাখা নির্ণয় গ্রন্থে তিন শত বৎসর পূর্বে এসব কথা লিখিয়া গিয়াছেন। "বাণ অঙ্গ শর ব্রহ্ম নরপতি শাকে। সমাপ্ত হইল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে।" রসকল্পবল্লী গ্রন্থ ১৫৬৫ শকাব্দায় ১৬৪৩ ঈশাই অব্দে রচিত হয়। তাহারই কিছু পরে শাখা নির্ণয় রচনা। প্রায় ত্রিশ বৎসরেরও পূর্বে শ্রীখণ্ডের ঠাকুর-বাড়ি হইতে শাখা নির্ণয় ছাপানো হইয়াছে। স্বর্গগত দীনেশ সেন মহাশয় যাহা যাহা লিখিয়াছিলেন, গতানুগতিকভাবে সে সব কথার সমর্থনের দিন চলিয়া গিয়াছে। নূতন উপকরণ অনেক পাওয়া গিয়াছে। স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান আলোচনা ও সিদ্ধান্ত স্থাপনের জন্য পরিশ্রম করিতে হইবে। বন্ধুবর শহীদুল্লাহ সাহেবের নিকট আমরা তাহাই প্রত্যাশা করি। চৈবেতুহি দিয়া পাদপূরণ—অন্তত তাঁহার পক্ষে অশোভন।

যশোরাজ খানের পদে পাঠ ভুল হইয়াছে। "কোনে মিলন জোর" হইবে না, হইবে "কোলে মিলন জোর", "আধ পদ হেরি" হইবে না, হইবে "আধ পদ চারি"।

শ্রীখণ্ডের চক্রপাণি মহানন্দের সঙ্গে চিরঞ্জীব, সুলোচনের নামও উল্লেখযোগ্য।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

পোরাণা পকিতী

পণ্ডিত নেহেরু আমেরিকাবাসীদের উদ্দেশ্য করিয়া যে বেতার বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর সকল দেশ ও জাতির শান্তি, সুখ, নিরাপত্তা রক্ষা করিতে হইলে সকল দেশেরই একটা moral law-এর উপর ভিত্তি করিয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা চালাইতে হইবে।

Morality, Moral law—কথা দুইটির ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া কঠিন। নৈতিক আচরণ কথাটি দ্বারা হয়তো ইহার যথার্থ ভাব প্রকাশিত হইতে পারে।

ইংরেজীতে Diplomacy বলিয়া যে শব্দটি আছে, বাংলায় তাহার অনুবাদ করিয়া বলিয়া থাকি কূটনীতি। এই কূট কথাটি দ্বারাই ইহার যথার্থ রূপ প্রকাশিত হয়। যাহা কূট, তাহা নৈতিক আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সত্যকে ইচ্ছা করিয়া গোপন করা, মিথ্যাকে সত্যের আবরণে সাজাইয়া প্রচার করাই কূটনীতি। যাহার সঙ্গে শত্রুতা করিব স্থির হইয়াছে, তাহার প্রতি কপট প্রেম দেখানো কূটনীতির অঙ্গ। আজ যাহার সঙ্গে মিত্রতা, কার্যসিদ্ধির পর স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার সঙ্গে শত্রুতা কূটনীতির একটি কুৎসিত রূপ।

দেখা গিয়াছে, যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি রাষ্ট্রশাসনের ভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনে হয়তো প্রকৃতই সত্যবাদী ন্যায়পরায়ণ এবং সৎ লোক, কিন্তু রাষ্ট্রচালনায় তাঁহারাও কূটনীতির আশ্রয় লইয়া থাকেন। এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আমাদের মনে ক্রিয়া করে যে, রাষ্ট্রনীতিতে নৈতিক আচরণের স্থান নাই।

সেই মেকিয়াভেলির যুগ হইতে আজ মার্শেলের যুগ পর্যন্ত কূটনীতির কত কুৎসিত রূপ আমরা দেখিলাম! ভারতবর্ষের চাণক্য-নীতি এক কালে হয়তো কার্যকরী হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্থায়ী শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে নাই। কলিঙ্গ-বিজয়ের পর অশোক কূটনীতি বর্জন করিয়া রাষ্ট্রকর্ম নৈতিক আচরণের ভিত্তিতেই পরিচালিত করিয়াছিলেন। পালি ভাষায় এই নৈতিক বিধানের নাম ছিল—পোরাণা পকিতী, ইহার অর্থ বোধ হয় চিরাগত চিরন্তন ধর্মনীতি, যাহা সর্বকালে সকল ধর্মের সকল শ্রেণীর মানুষ গ্রহণ করিতে পারে।

মহাত্মাজী এই নৈতিক আচরণের ভিত্তির উপরই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। পণ্ডিত নেহেরুর ভাষণে আমরা সেই আদর্শেরই পরিচয় পাইতেছি। মহাত্মাজীর চালনায় যে সংগ্রাম ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে চলিতেছিল, তাহাও নৈতিক আচরণের ভিত্তিতেই চলিতেছিল। তাঁহার সেই সত্য-ন্যায়-অহিংসার যুদ্ধে ব্রিটিশ-কূটনীতি পরাস্ত হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসে একটি বিশেষ গৌরবের স্থান অধিকার করিবে।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এই কূটনীতির বিষে কলুষিত না হয়, তাহার জন্য নেতৃস্থানীয়দের সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। কূটনীতির পরিণাম—বিবাদ-বিসম্বাদ, যুদ্ধ। ভারতবর্ষ শান্তিকামী, তাহার পররাষ্ট্র-লোলুপতা নাই, সুতরাং ভারত-রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় কূটনীতির স্থান থাকা উচিত নয়।

এই পোরাণা পকিতীর স্বরূপ লইয়া তর্ক চলিতে পারে না। চিরন্তন সত্য, চিরন্তন নীতিকে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না।

এই পোরাণা পকিতীর একটি মাত্র রূপ লইয়া এখন একটু আলোচনা করিব।

পৃথিবীতে মানুষে মানুষে বিভেদ থাকা উচিত নয়—এ কথা সকলে স্বীকার করিলেও কর্মক্ষেত্রে ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমরা বিভেদের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছি। ভারতবর্ষের আদর্শ এই বিভেদের প্রতিকূল। কত দেশ-বিদেশের কত বিভিন্ন ধর্ম-আচরণের লোক আসিয়া এই ভারতবর্ষে একত্র হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের "ভারততীর্থ" কবিতায় তাহার উজ্জ্বল বর্ণনা আমরা পাইয়াছি—

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহা-ওঙ্কার ধ্বনি
হৃদয় তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রণরণি
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।

শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৫৫

সেই সাধনার সে আরাধনার
যজ্ঞশালার খোলো আজি দ্বার
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে
আনত শিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

মানুষে মানুষে বিভেদ ভুলিতেই হইবে। বিশ্বমানবের জন্য একটি বিরাট হিয়ার সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাই ভারতবর্ষের আদর্শ। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই ভারতের রাষ্ট্ররথ পরিচালিত করিতে হইবে। বিদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের ব্যবহার এই আদর্শেই পরিচালিত হইতে থাকিলে পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষ একটি গৌরবোজ্জল আসনে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শুধু বহির্বিশ্বে নহে, আমাদের দেশের অভ্যন্তরেও পোরাণা পাকতীর আদর্শে সমস্ত রাষ্ট্র ও সামাজিক কর্ম অনুষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ এখন যেমন কদর্য রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, তেমনই হিন্দু-সমাজও অস্পৃশ্যতা-জাতিভেদের বিষে জীর্ণ হইয়া আছে। ইহার উপর নূতন রোগ দেখা দিয়াছে—প্রাদেশিকতা; এই বিভেদ আমাদের জাতীয় শক্তি ক্ষয় করিতেছে। আজ মানুষের মধ্যে নৈতিক বোধ প্রায় লোপ পাইয়াছে। অসততা আমাদের সর্বনাশের দিকে লইয়া যাইতেছে। যেমন ব্যক্তিগত দৈনন্দিন জীবনে, তেমনই সমষ্টিগত সামাজিক জীবনেও আমরা আদর্শভ্রষ্ট হইয়া বর্বর-যুগের মানুষের মত পরস্পরকে প্রতারণা করিয়া, পীড়ন করিয়া, হত্যা করিয়া লাভবান হইবার কুকর্মে রত হইয়াছি। স্বাধীনতা লাভ করিয়াও এই জন্যই অনুভব করিতেছি না যে, সত্যই আমরা স্বাধীন হইয়াছি। দেশময় এই অসততার মহামারী এখনই প্রশমিত করিবার জন্য তেমন কোনও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় নাই। ইহা আক্ষেপের বিষয়। ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য নেতাগণ যে পরিকল্পনা করিতেছেন, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না, যতক্ষণ সমাজের অধিকাংশ লোক অসৎ থাকিবে। Grow more food—আরও খাদ্য উৎপাদন কর, এই আন্দোলনের সঙ্গে Grow more honest,—আরও তোমরা সৎ হও, এই আন্দোলনও শক্তিশালী হওয়া উচিত, নহিলে কষ্টলব্ধ স্বাধীনতা বেশি দিন স্থায়ী হইবে না।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

গান

১

ওরে পাখি, এই বসন্তে বাঁধবি কি তোর বাসা ?
হাতছানিতে ডাক দিয়েছে নীড়ের ভালবাসা।
অসীম উদার নীল আকাশে
ঘরের মায়া ছায়ায় ভাসে,
বুকে কি তোর উথ্‌লে ওঠে নতুন সুখের আশা !
ওরে পাখি, এই বসন্তে বাঁধবি কি তোর বাসা ?

দূর সুদূরের সুর কেটেছে কাছের রাগিণীতে,
হঠাৎ যেন লাগছে ভাল পরম পরিচিতে।

(ও তুই) পড়বি বাঁধা প্রেমের ডোরে
খবর যে তার হাওয়ায় ওড়ে,
গড়ার টানে হার যে মানে ভাঙন সর্বনাশা।
ওরে পাখি, এই বসন্তে বাঁধবি কি তোর বাসা ?

২

ওরে নীড়হারা পাখি,
অসীম শূন্যে কোথা পাবি ঠাঁই আসে কালবৈশাখী।
কার অভিশাপে ভেঙে গেল ঘর,
ক্লান্ত পাখাই শুধু নির্ভর—
ভগ্ন কুলায়ে প্রিয়-আহ্বান এখনো শুনিস নাকি !
ওরে আশাহত, ওরে দিশাহীন, ওরে নীড়হারা পাখি।

ওরে পাখি, ওরে আশ্রয়হারা, সুমুখে দীর্ঘ পথ,
নিবিড় তিমির আবরিয়া আছে অন্ধ ভবিষ্যৎ।

শুধু উড়িবার নিয়তি যে তোর—
কেন আর পায়ে রাখা মায়া-ডোর—
সব পথ তোর রুদ্ধ হ'ল রে এক পথ শুধু বাকি,
শেষ আশ্রয় আশ্রয় কর্ ওরে নীড়হারা পাখি।

শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৫৫

৩

সহজ কি তা সবাই জানে, কঠিন আমি করেছি পণ।
(আমার) মন যে কোথায়, সেই কথাটাই ভাবতে ভয়ে চায় না যে মন।
আপনাকে তাই ছিঁড়ে ছিঁড়ে
খুঁজে খুঁজে প্রায় দেখি রে
হাত ধ'রে যে চালায় মোরে লুকিয়ে থাকে কোথায় সে জন!
সহজ কি তা সবাই জানে, কঠিন আমি করেছি পণ।

নিজের ভিতর লুকোচুরি
আর কতকাল চলবে ওরে?
আঁধার ভয়ে পালিয়ে যে যায়
সূর্য ওঠে যেমনি ভোরে!

আলোর কমল ফোটা বুকে
মনের ধাঁধা যাবে চুকে
বাহিরে তুই প্রকাশ পাবি মনের খাঁচা ভেঙে তখন।
সহজ কি তা সবাই জানে, কঠিন আমি করেছি পণ।

আহ্বান

প্রভাতের তোরণ-দুয়ারে,
জাগো যাত্রীদল,
চলিষ্ণু শিখায় কাঁপে
প্রত্যুষের ধূসর আকাশ,
আঁধার বেদনাবিদ্ধ
—আলোকের অব্যর্থ সন্ধান।
হঠাৎ হাওয়ায় কাঁপে
তন্দ্রান্বিত নীড় বিহঙ্গের,
অস্ফুট কাকলী-রব
থেমে যায় দারুণ শঙ্কায়।

সমুদ্রের সর্পান্বিত ঢেউ
শুভ্র ফণা হানে শূন্যতায়,
আকাশের স্তব্ধ বেদনায়
প্রত্যুষের ত্রস্ত প্রত্যাঘাত।
অসীম বিস্ময়ে জাগে
মুহূর্তের কম্পিত হৃদয়,
বিস্মরণ ভিক্ষার সময়
হ'ল আজ, জাগো যাত্রীদল
বন্দরের একান্ত সীমায়
বাণিজ্যের ভরাডুবি শেষ,
বৈশাখীর উড়ন্ত পাখায়
বৈদগ্ধ্যের আসিছে সংবাদ।

জাগো যাত্রীদল,
সঙ্গীতের কাল এ তো নয়,
চূর্ণ কর মৃদঙ্গ তোমার,
পদধ্বনি-ছন্দে কর লয়
নিশীথের অস্থায়ী বিলাপ।

ঝড় এল মেঘের পাখায়,
রাঙা ধূলি উড়িছে চঞ্চল,
ছিন্নভিন্ন বিজয়-নিশান,
তোরণের দ্বার ভেঙে যায়,
জাগো যাত্রীদল।

শ্রীআরতি রায়

পদচিহ্ন

অমূল্যের স্ত্রীর আত্মহত্যার প্রয়াস যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনই বীভৎস।

গোয়াল-ঘরের মধ্যে অন্ধকারে নির্জনে ব'সে গরুর জন্য খড়-কাটা বঁটি দিয়ে গলা কাটবার চেষ্টা করেছে, বেশ খানিকটা কেটেও ফেলেছে, খাদ্যগ্রহণের নলীটা প্রায় সম্পূর্ণ ই কেটে গিয়েছে, তারপর আর পারে নি, প্রচুর রক্তস্রাবের সঙ্গে ছটফট ক'রে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল গোবর এবং চোনার মধ্যে। স্থানীয় ডাক্তারখানার ডাক্তারটি তরুণ ও দুঃসাহসী, তিনি কাটা নলীটিকে বিচক্ষণতা এবং ধীরতার সঙ্গে জোড়া দিয়ে সেলাই করলেন, এবং রোগিণীকে একখানি তক্তার উপর শুইয়ে তার সঙ্গে বেঁধে দিলেন, যাতে না নড়তে পারে।

কাশীর বউ শিউরে উঠলেন তার অবস্থা দেখে। মনে প'ড়ে গেল, ছিন্নমস্তা রূপের কথা। ডাক্তার তাঁকে দেখে বললেন, আমার যা করবার আমি করলাম। এখন আপনার হাত। দেখবেন, কোন রকমে যেন এতটুকু না নড়ে। আর জ্ঞান হওয়ার পর যেন কোন রকমে উত্তেজিত না হয়। এ কাজ আপনি যদি পারেন, অন্য কেউ পারবেন ব'লে মনে হয় না।

কাশীর বউ ডাক্তারের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, আমি পারব?

ডাক্তার বললেন, আপনি পারবেন। আপনাকে আমি দু দিন দু ক্ষেত্রে দেখলাম। বিশ্বেশ্বরী ব'লে মেয়েটি পুড়ে মরল—সেদিন দেখেছি, চারু বিষ খেয়েছিল—সেদিনও দেখেছি। আপনি পারবেন।

কাশীর বউ বললে, আজ কিন্তু ভয় হচ্ছে।

ভয় হচ্ছে? ভয় হচ্ছে মা?—বলতে বলতে এগিয়ে এল অমূল্যের দিদি। চোখে তার রূঢ় ক্রোধের দীপ্তি ঝকমক ক'রে উঠল। এগিয়ে এসে তাঁর মুখের কাছে মুখ এনে নিষ্ঠুরভাবে বললে, এ সব তোমার কীর্তি, তোমার কীর্তি। আজ ভয় পেলে চলবে কেন মা? বসতে হবে তোমাকে। যদি মরে, তোমাকে দায় পুয়োতে হবে।

মণিভূষণ এসে ধমক দিয়ে উঠল, এই শৈল! শৈল!

শৈল ঘাড় বেঁকিয়ে পিছনে মণিভূষণের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ সাপিনীর মতই গর্জন ক'রে উত্তর দিলে, কি?

কাকে কি বলছিস? বেরিয়ে আয়। চুপ কর্।

শৈল ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, কেন? চুপ করব কেন?

মণিভূষণের চোখ ক্রোধে প্রখর হয়ে উঠল, স্থির গম্ভীর স্বরে মণিভূষণ বললে, শৈল! মণিভূষণের এ দৃষ্টি এবং এ কণ্ঠস্বরকে তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা সকলেই ভয় করে। শৈল বেরিয়ে এল, কিন্তু কথা বলতে ছাড়লে না। বললে, আমি চুপ করছি, আমাকে চুপ করতে হবে বইকি। আমি যে কুলীনের মেয়ে, আমি যে তোমাদের গলার কলসী। আমার যদি আবার রোজকেরে স্বামী থাকত, গায়ে গয়না থাকত, তবে কে আমাকে চুপ করতে বলত, দেখতাম।

সে কেঁদে ফেললে, কাঁদতে কাঁদতেই আবার বললে, আমি বললেই দোষ! তোমরা বললে দোষ হয় না। তোমরা যে মাতব্বর, জমিদার; থানা-পুলিস যে তোমাদের হাত-ধরা।

মণিভূষণ আবার ধমক দিয়ে উঠল, শৈল!

শৈল বললে, কেন? শৈলকে চোখ রাঙাবে কেন? বল নি, তোমরা নিজেরা বল নি, ও কাশীর বউই গাঁয়ের আপদ হয়েছে—ওকে তাড়াতে হবে গাঁ থেকে? বল নি?

মণিভূষণ নেমে এল ঘরের দাওয়া থেকে, তার স্থির দৃষ্টি শৈলর উপর আবদ্ধ, মুখ রূঢ় কঠোর, চোখের দৃষ্টিতে অদ্ভুত প্রখর দৃষ্টি। সম্ভবত সে রাগে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল, সকলে শঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু তাকে বাধা দিতে কারও সাহস হ'ল না। এক বাধা দিতে পারতেন অমূল্যের মা, মণিভূষণের জ্ঞাতিদিদি হ'লেও তিনি তার মায়ের বয়সী, এই পরিবারটির মধ্যে সর্বজনমান্যা। কিন্তু তিনি পুরানো রোগে মৃত্যুশয্যাশায়িনী, দীর্ঘদিন ধ'রে বিছানায় প'ড়ে আছেন, চোখের দৃষ্টি নাই, কানেও শোনেন না, সম্ভবত যন্ত্রণাবোধশক্তিও বিলুপ্ত হয়েছে।

শৈল চীৎকার ক'রে উঠল, এস, এস, কি করবে কর। দেখি।

ঠিক এই মুহূর্তে এসে ঢুকলেন রজনী-ঠাকরুণ—বিশ্বেশ্বরীর মা। বিশ্বেশ্বরীর মৃত্যুর পর তিনি গিয়েছিলেন গঙ্গাতীরে উদ্ধারণপুরে। সঙ্গতি নাই, কাশী বৃন্দাবনে যেতে পারেন নি, বিশ মাইল দূরবর্তী গঙ্গাতীরের এই পুণ্যতীর্থ গ্রামখানিতে কয়েকদিনের জন্য সান্ত্বনা লাভ করতে গিয়েছিলেন। ফিরেছেন এই এখনই, গাড়ি থেকে নেমেই সমস্ত শুনে ছুটে এসেছেন। তিনি কিছুই না শুনেও মণিভূষণের গতিভঙ্গী এবং মুখের চেহারা দেখে এবং শৈলর ওই

চীৎকার শুনে কি ঘটতে চলেছে, এটা সঠিক অনুমান ক'রে নিয়েছেন। তিনি মণিভূষণের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, মণি, ছি!

মণিভূষণ চমকে উঠল, রজনীদিদি!

হ্যাঁ। এই এলাম আমি। এসেই শুনলাম সব। ছুটে আসছি।

আঃ, বাঁচলাম দিদি। বউটা হয়তো বাঁচবে এইবার।

রজনী-ঠাকরুণ ম্লান হাসি হেসে বললেন, বেঁচে কি করবে ভাই? ওর মরণই ভাল।

পিছন থেকে শৈল ব'লে উঠল, হ্যাঁ গো, তা তো ভাল হবেই। বিশুর কেলেঙ্কারির জোড় মিলবে। বলতে পাবে, একা কি আমার মেয়ে, অমূল্যের বউও মরেছে।

মণিভূষণ আবার ঘুরে দাঁড়ালে। রজনী-ঠাকরুণ তাকে ফিরিয়ে বললেন, কেন ওর উপর রাগ করছিস মণি? ওরও মনে হচ্ছে এমনই ক'রে মরতে। ওর সে সাহস নাই, তাই এইভাবে গালাগাল করছে। ধরিস নে ওর কথা।

তারপর এদিক ওদিক চেয়ে বললেন, অমূল্য কোথা?

মাথা হেঁট ক'রে মণিভূষণ বললে, দুপুরবেলা বউটাকে মেরে-ধ'রে সেই বেরিয়েছে। শুনছি, সাহাদের দোকানে প'ড়ে আছে, অজ্ঞান অবস্থা।

ঘরের দরজায় এসেই রজনী-ঠাকরুণ অসীম আশ্বাসভরে ব'লে উঠলেন, তুমি এসেছ ভাই কাশীর বউ?

কাশীর বউ এরই মধ্যে নিঃশব্দে নিজের স্থান গ্রহণ করেছিলেন, অমূল্যের বউয়ের পাশে। অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বাইরের ওই সকল বাক্যবাণ, যার প্রতিটিই পরোক্ষভাবে এসে তাঁকে বিদ্ধ করছিল, অবিচলিত চিত্তে সহ্য ক'রে এই হতভাগিনীর পাশে নীরবে স্থিরভাবে ব'সে ছিলেন। তাকিয়ে ছিলেন অমূল্যের বউয়ের মুখের দিকে। ডাক্তারটি লজ্জায় এক পাশে মাথা হেঁট ক'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনিও যেন বেরিয়ে যাবার পথ পাচ্ছিলেন না।

রজনী-ঠাকরুণের দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হেসে কাশীর বউ বললেন, আসুন।

রজনী দেবী কাশীর বউয়ের বিপরীত দিকে অমূল্যের বউয়ের পাশে বসলেন, অমূল্যের বউকে কিছুক্ষণ দেখে বললেন, সংসারে মেয়েদের দুঃখ চিরকাল।

কেন এ কাজ করলি মা? যদি যাস, তুইই তো যাবি। দু দিন পরে সবাই তোকে ভুলে যাবে।

যন্ত্রণায় রোগিণীর হাতে পায়ে আক্ষেপ জেগে উঠল। কাশীর বউ তার একটা হাত একটা পা ধ'রে বললেন, আপনি ওদিকটা ধরুন।

রাত্রি তখন কতটা কে জানে, তবে অনেক রাত্রি। ঘরের মধ্যে জলছিল একটা চিমনি। ওটা পাঠিয়ে দিয়েছে পবিত্র। মণিভূষণ আছেন ঘরের তত্ত্বাবধানে, পবিত্র ভার নিয়েছে বাইরের। ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, ওষুধ, থানা, গ্রামের গুজব—এ সমস্তের ব্যবস্থা সে করেছে। থানায় খবর দিয়েছে, আকস্মিক দুর্ঘটনা ব'লে। পা পিছলে খোলা বঁটির উপর প'ড়ে গিয়ে গলায় চোট লেগেছে এই সংবাদ দিয়েছে, ডাক্তারও তাই সমর্থন করেছে।

চিমনির আলোটা জলছিল রোগিণীর মাথার দিকে। রাত্রির প্রথম দিকটা ক্লান্ত রজনী-ঠাকরুণ ঘুমিয়ে ছিলেন, কাশীর বউ ব'সে ছিলেন জেগে। ঘুম ভেঙে রজনী-ঠাকরুণ বাইরে গিয়ে ফিরে এসে বললেন, তুমি একটু শোও ভাই কাশীর বউ। আমি অনেক ঘুমিয়েছি। বাইরে দেখলাম, রাত্রি বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে। সাত ভাইয়ের লেজটা ঘুরে গিয়েছে।

কাশীর বউ শুলেন না। বললেন, ঘুম আমার আসবে না ঠাকুরঝি। আপনি বরং শুয়ে পড়ুন। সমস্ত দিনটাই প্রায় পথে এসেছেন।

রজনী-ঠাকরুণও শুলেন না। বললেন, তবে দুজনে গল্প করি। রাত্রি দুপুর পার হয়েছে। দুটো দুঃখের কথা বলি ভাই তোমাকে।

কাশীর বউ একটু হাসলেন।

রজনী দেবী বললেন, তুমি ভাই বড় কম কথা বল। সকল কথাতেই হাস। আগে মনে হ'ত, তোমার বড় অহংকার। বিশুর মৃত্যুর পর থেকে সে ভুল ভেঙেছে। কিন্তু তবু, তুমি চুপ ক'রে থাক, আমি হাঁপিয়ে উঠি, তোমার যেন নাগাল পাই না।

কাশীর বউ বললেন, ছেলেবেলা থেকেই আমি কম কথা কই ঠাকুরঝি। আর—

আর?

আর নিজের দুঃখের কথা ব'লেই বা করব কি? বলবই বা কাকে? বলি মনে মনে ভগবানকে।

রাধাকান্ত মারা গেছে, সে দুঃখ তোমার অনেক। কিন্তু সে তো—। রজনী-ঠাকরুণ চুপ ক'রে গেলেন কিছুক্ষণের জন্য, তারপর বললেন, কি বলব বুঝতে পারছি না। অদৃষ্ট যদি বলি, তবে তো আমার উড়ে কুলীনে বিয়ে হওয়াও অদৃষ্ট, বিশুর উড়ে কুলীনে বিয়ে—তাও অদৃষ্ট, বিশুর মিথ্যে কলঙ্ক—তাও অদৃষ্ট, সে কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে ম'ল—তাও অদৃষ্ট। এই চাকর কলঙ্ক—তাও অদৃষ্ট, সে বিষ খেলে, বাঁচল—সেও অদৃষ্টের খেলা, তার ফলে স্বামী তাকে নিলে না—সেও অদৃষ্টের লেখা। অমূল্য মাতাল বউকে মারে—সেও অদৃষ্ট। সে গলায় ছুরি দিয়েছে—সেও তাই। কিন্তু—

আবার তিনি চুপ করলেন, চুপ ক'রে ঘরের কোণের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। ভেবে যেন তিনি কিনারা পাচ্ছেন না। গঙ্গাতীরে সান্ত্বনা পেতে গিয়েও তিনি এই কথাই ভেবেছেন। গঙ্গার ঘাটে ব'সে চলমান জলস্রোতের দিকে চেয়ে এই ভাবতেন। উদ্ধারণপুরের শ্মশানঘাট প্রসিদ্ধ শ্মশান। গঙ্গার পশ্চিমে, তিন দিকে বিশ ক্রোশ থেকে এখানে দাহক্রিয়ার জন্য শব আসে পরলৌকিক-সদ্গতিলাভের জন্য। সেখানে গিয়েও তিনি ব'সে থাকতেন, দেখতেন মৃতের বয়স-বিচার নাই, শিশু মরে, বালক মরে, বালিকা মরে, যুবক মরে, যুবতী মরে, প্রৌঢ় মরে, বৃদ্ধ মরে। কিন্তু তবুও এ দিয়েও বিশুর মৃত্যুর দুঃখ ভুলতে পারেন নাই, সান্ত্বনা খুঁজে নিতে পারেন নাই। যখনই এই দেখিয়ে মনকে বোঝাতে গিয়েছেন, তখনই মনের মধ্যে থেকে কেউ যেন বলেছে, বিশু যদি রোগে মরত, তবে এ কথা মেনে নিতে পারতাম। ঘরে আগুন লেগেও যদি সে ঘরের মধ্যে পুড়ে মরত, তাও বুঝতাম। এমন কি হঠাৎ যদি তার কাপড়ে আগুন লাগত, তাতে সে মরত, তাতেও মেনে নিতাম। মৃত্যুর কাছে বয়স নাই, এ সত্য। কিন্তু বিশু মৃত্যুকে ডাকলে যে। না ডাকলে সে তো আসত না। সে ডাকলে কেন? তবে? যারা দুঃখ দিয়ে তাকে মৃত্যুকে ডাকতে বাধ্য করলে, তাদের দায়ী না ক'রে তার মন মানবে কেন?—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দৃষ্টি ফিরিয়ে রজনী-ঠাকরুণ বলতে গেলেন, সেই সব কথাই তো বলব তাই তোমাকে—। কিন্তু বলা হ'ল না, তিনি আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রোগিণীর দিকে। সে চোখ মেলে

তাকাচ্ছে। রক্তহীন চোখের পাণ্ডুর শুভ্রচ্ছদের মধ্যে কালো তারা দুটি এদিক ওদিক ফিরে বুঝতে চাচ্ছে, স্মরণ করতে চাচ্ছে—বর্তমান এবং অতীতকে।

রজনী-ঠাকরুণ ওদিকে কাশীর বউয়ের দিকে তাকালেন। কাশীর বউ ঘুমে ঢুলে পড়েছেন। তিনি ধীরে ধীরে তাকে মৃদু ঠেলা দিয়ে ডাকলেন, কাশীর বউ!

লজ্জিত হয়ে সোজা হয়ে ব'সে কাশীর বউ বললেন, একটু ঘুম এসেছিল।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রজনী দেবী আঙুল দেখিয়ে বললেন, তাকাচ্ছে।

কাশীর বউ একটু ঝুঁকে তাকিয়ে দেখে বুঝলেন, জ্ঞান হয়েছে।

তার চোখে চোখ পড়তেই অমূল্যের বউ অস্পষ্টস্বরে বললে, মরি নি?

কাশীর বউ এবং রজনী-ঠাকরুণ দুজনেই একসঙ্গে কথা ব'লে উঠলেন। রজনী দেবী বললেন, কেন এমন কাজ করলে মা?

কাশীর বউ বললেন, একটু জল খাবে?

ডাক্তারের নির্দেশমত সন্তর্পণে রবার পাইপ দিয়ে খানিকটা দুধ খাওয়ালেন কাশীর বউ। তারপর অল্প অল্প প্রায় ফোঁটা ফোঁটা ক'রে খানিকটা জল দিয়ে জিভ এবং কণ্ঠনালী ভিজিয়ে সরস ক'রে দিলেন। রজনী-ঠাকরুণ এক হাতে বাতাস করলেন, অন্য হাতে কপালে পরম স্নেহভরে হাত বুলিয়ে দিলেন। খাওয়া শেষ হতেই তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, কেন এমন কাজ করলে বউমা?

কপালে ঠেকাবার জন্যই বোধ হয় সে হাত তুলতে গেল, কিন্তু পারলে না, হাত বাঁধা ছিল, অগত্যা কপালে কুঞ্চনরেখা টেনে অস্পষ্টস্বরে বললে, কপাল

তারপর বললে, কপাল বইকি! নইলে, বিশু আমায় ডাকলে, স্নেহলতা আমায় ডাকলে, ডেকে, নিলে না কেন? এখনও আমি মলাম না কেন?

থরথর ক'রে কেঁপে উঠলেন রজনী-ঠাকরুণ। বললেন, কি বলছ বউমা?

অমূল্যের বউ বললে, স্বামীর মার খেয়ে জীবনে ধিক্কার হ'ল। অনেক কাঁদলাম। ভাতের থালাটা ফেলে দিতে গেলাম গোয়ালে গরুর ডাবায়। সেখানে—

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ অমূল্যের বউ, সে যেন স্মরণ করছিল, সে যেন মনশ্চক্ষে দেখছিল। অস্পষ্টস্বরে আস্তে আস্তে বললে, অন্ধকার ঘরের এক কোণে কে একজন দাঁড়িয়ে ছিল, সে বললে, বউ! আমি দেখলাম, সে বিশু। কি সুন্দর দেহ, কত রূপ হয়েছে তার! আমি তাকে বললাম, তুমি

বিশু? সে বললে, হ্যাঁ। তোমাকে ডাকতে এসেছি। আমি বললাম, তুমি তো পুড়েছিলে, এমন রূপ কি ক'রে হ'ল তোমার? সে বললে, আমি যে স্বর্গে এসেছি, এখানে অমৃতকুণ্ডে স্নান করলাম, আমার সব পোড়ার ঘা ভাল হ'ল, দাগ মিলল, এই রূপ হ'ল। পাপের পৃথিবীতে থেকো না, তুমিও এস, তোমারও এমনই রূপ হবে। অনেক সুখ, অনেক শান্তি এখানে। আমি চুপ ক'রে থাকলাম। সে বললে, এই দেখ, স্নেহলতাও তোমাকে ডাকতে এসেছে। দেখ তার রূপ। তাকে জিজ্ঞেস কর। বিশুর পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল স্নেহলতা, তাকে দেখলাম। কি রূপ, কি হাসি, কি সুখ তার! সেও ডাকলে। বললে, চ'লে এস। আগুন লাগুক পৃথিবীতে, আগুন লাগুক সমাজে, আগুন লাগুক ঘরে—যে ঘরে অজ্বালা আগুনের জ্বালায় দেহ গেল শুকিয়ে, মন গেল পুড়ে খাক হয়ে। জ্বলুক, সব ধুধু ক'রে জ্বলুক। বললে, তোমার হাতেই দেশলাই আছে দেখ। লাগাও আগুন কাপড়ে। দেখলাম, সত্যিই আমার হাতে দেশলাই। আর আমার ভয় হ'ল না, দেশলাই খুললাম, কিন্তু আমার কপাল—বাক্সে কাঠি ছিল না। আমি বললাম, কাঠি নাই। কি দেশলাই দিলে? তখন এদিক ওদিক চেয়ে বিশু বললে, তবে ওই দেখ, ওই খড়-কাটা বঁটি, ওই বঁটি দিয়ে কেটে ফেল, গলাটা কেটে ফেল। বঁটির কাছে বসলাম। ওরা দেখালে, হাত দিয়ে নেড়ে দেখালে, এমনই ক'রে কাট। আমি কাটলাম।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে সে বললে, আমার কপাল! আমি মরলাম না। আমার মরণ হ'ল না। বলতে বলতে দু চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল জল অজস্রধারায়।

শুনতে শুনতে কাশীর বউ এবং রজনী-ঠাকরুণ দুজনেই যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রজনী-ঠাকরুণ কাপড়ের আঁচল দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দিলেন। কাশীর বউ পাখাটা তুলে নিতে গিয়ে শিউরে উঠলেন। গলার ক্ষতস্থানে তুলো ব্যাণ্ডেজ রক্তে ভিজে উঠেছে। তিনি বললেন, আর কথা ব'লো না তুমি বউমা। না। ডাক্তার বারণ ক'রে গিয়েছেন।

অল্প কিছুক্ষণ পরই মেয়েটির চোখ বন্ধ হয়ে এল। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

শেষ রাত্রির গাঢ় স্পর্শে পৃথিবী আচ্ছন্ন। অগণ্য কোটি কীট, যারা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেও অবিরাম ডেকে চলে, তারাও এ সময়ে স্তব্ধ হয়ে এসেছে।

রজনী-ঠাকরুণও ঢুলে পড়ছেন। কাশীর বউও ঢুলছিলেন। হঠাৎ তিনি চমকে জেগে উঠলেন। কেউ তাঁকে ডাকলে কি? তিনি তাকালেন ঘরের কোণের দিকে। সেখানে কি বিশু এবং স্নেহলতা দাঁড়িয়ে আছে?

থরথর ক'রে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল তাঁর। কিন্তু তাঁর সাহস অপরিসীম, মনের স্থৈর্য অসাধারণ। তিনি স্মরণ করলেন ইষ্টদেবতাকে। ভাল ক'রে চেয়ে দেখলেন চারিদিক। তারপর উঠে গিয়ে চিমনির আলোটা বাড়িয়ে দিলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকতে থাকতে মনে মনে অকস্মাৎ আকুল হয়ে উঠলেন, তাঁর একমাত্র সন্তানের জন্য—গৌরীকান্তের জন্য। তিনি রজনী-ঠাকরুণকে ডাকলেন। বললেন, ঠাকুরঝি, আর বোধ হয় ঘণ্টাখানেক রাত্রি আছে। এইটুকু আপনি জেগে থাকুন।

রজনী দেবী লজ্জিত হয়ে বললেন, তুমি শোও বউ, আমি শুধুই ঘুমুচ্ছি। তোমার ঘুমের আর দোষ কি বল?

তিনি সোজা হয়ে বসলেন। কাশীর বউ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি বাড়ি যাচ্ছি ভাই ঠাকুরঝি।

বাড়ি যাবে? এই রাত্রে?

আমি চ'লে যাব—এই তো।

নিঃশব্দে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। বাড়ির দোরে এসে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। বৃদ্ধ গোক্ষুর চলেছে মন্থর গমনে।

তাঁর শ্বশুরের আমল থেকে সে আছে। কচিৎ কখনও লোকের চোখে পড়ে। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়াতেই সেও স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর আবার ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। গিয়ে ঢুকল তাঁদেরই প্রাচীন আমলের ভাঁড়ার-ঘরে। তিনি তাঁকে নমস্কার করলেন। আবার চলতে উদ্যত হতেই হঠাৎ তাঁর কানে এসে ঢুকল গৌরীকান্তের কণ্ঠস্বর।

এত রাত্রে গৌরীকান্ত জেগে?

তিনি দরজায় এসে মৃদু করাঘাত ক'রে ডাকলেন, গৌরী! গৌরী!

ক্রমশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অহিংসা

'হিংসাবৃত্তি বড় ঘৃণ্য ব্যাপার'—মানুষ যুগে যুগেই ঘোষণা করেছে, কিন্তু হিংসা না হ'লে তার চলে না।—এই কথাটি মধুবাবু ভাবছিলেন। বাজার থেকে ফেরবার পথে এই কথাটা মনে হ'ল একটা খোদাই ষাঁড়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে। হাত থেকে ইলিশমাছটা ফসকে গিয়েছিল আর কি! ভিখিরিটার শ্যেনদৃষ্টিতে কি হিংসে নেই? মনে মনে হয়তো ভাবছে, তুমি দিব্যি ইলিশমাছ খাচ্ছ, আর আমি দু মুঠো খাবারের অভাবে কষ্টে ম'রে যাচ্ছি। ব্যাপারটা আরও বেশি মনে হ'ল একটা মাংসওয়ালার দোকানের সামনে, যেখানে একটা বিরাট খাসী ঝুলছে, কুকুর কয়েকটা কাছেই ঝগড়া শুরু করেছে অচিন্তিত আশায়। মধুবাবু চলেছেন এড়িয়ে বলের মত। পৃথিবীতে দুটো পথ-চলার পদ্ধতি আছে, এক হচ্ছে সহিংস গতি, আর একটি অহিংস। সহিংস গতিতে শুধু বেগ, যেন তেড়ে চলাই উদ্দেশ্য; আর অহিংস গতি?—মধুবাবুকে দেখে বিশ্বাস করা যায়, এই হচ্ছে অহিংস গতি। ধীর মন্থর বেগে চলেছেন অবিরাম, মুখের ভাবটি স্থির, অচঞ্চল। হিংসা না হ'লে বেগ সৃষ্টি হয় কি? এ প্রশ্নটাও মনে জাগে।

ইলিশের ঝকঝকে রূপটি মনকে খুশি করছে সন্দেহ নেই। কিন্তু মধুবাবুর মনে হচ্ছে যে, পরিতৃপ্তি শুধু একটি নতুন বস্তুকে পেলেই আসে না। এই পরিতৃপ্তির মূলেও একটা বিশেষ অ নিহিত রয়েছে। একটা পছন্দসই জিনিস কিনলে আপনারও মনে পরিতৃপ্তি জাগবে। এই পরিতৃপ্তির মূলে রয়েছে সেই ব্যাপার—হিংসা। বড়বাবুর বাড়িতে রোজ দুটো ইলিশ যাচ্ছে, অতএব—। অথবা এও হতে পারে, হাতের জিনিসটি দেখে অনেকে ভাবছে, আহা, বেশ জিনিসটি, আমি বুঝি পেলুম না। মানুষের মনের এই প্রচ্ছন্ন বৃত্তিকে কি ক'রে দূর করা চলে? অবচেতনা থেকে কি ক'রে যে সে রক্তের ধারা বেয়ে জীবনের মধ্যে চেতনী মনে প্রকাশিত হয়, তাকে নিরোধ করা চলবে কি ক'রে? মহাত্মার অহিংসা-ধর্মের প্রসঙ্গে দু দিন ধ'রে কত কথাই মনে হচ্ছে।

সহসা বড় বিব্রত হয়ে পড়লেন। মনের সামনে স্ত্রী এসে দাঁড়িয়েছেন, বলছেন, ইলিশমাছ কেনবার পয়সা হাতে আসে, অথচ ব্লাউজের কাপড়টা কেনবার বেলায় পয়সা থাকে না? এ অভিযোগ কি হিংসাশ্রয়ী নয়? কাপড়টা হয়তো অন্যকে ব্যবহার করতে দেখেছেন, তাই ওটা চাই। এর পর

আবার হয়তো বলবেন, এর চেয়ে পান্তীর মা অল্প পয়সায় ভাল মাছ কিনতে জানে। কি যে এনেছ!

গৃহিণীকে প্রত্যুত্তর দিতে হয়, দাও না কেন পান্তীর মাকেই কিনতে।

তখন গৃহিণী বলবেন, উঃ, কি হিংসে, বাপ্‌স! এ মাসে কিন্তু খায়খোর চলবে না ব'লে দিচ্ছি।

তাই তো, এ কি পান্তীর মাকে হিংসে ক'রে বলা হয়েছে? এক কথায় গৃহিণীরই মনের রূপটি প্রকাশিত হয়। আবার হয়তো বলবে, যাঁরা মাইনে পান বেশি, তাঁরা নয় ইলিশ খাবেন রোজ, কিন্তু তুমি কেন কিনবে?

আসল রাগটি কোথায়, মধুবাবু তাও জানেন। আপিসের সহকর্মীরা বাঁ হাত বাড়িয়ে টাকা আমদানি করেন, ডান হাত তাও জানে না। তাঁদের গৃহিণীরা এসে মধুবাবুর সহধর্মিণীর কাছে ব'লে যায় গর্ব ক'রে। মধুবাবুর ঔদাসীন্য স্ত্রীর মনে উষ্মার সৃষ্টি করে, মেজাজ বিগড়ে যায়, কাজে মন যায় না, গাম্ভীর্য মুখের ওপর এসে পাথরের মত চেপে বসে, রান্নায় ব'সে ডালের কাঠি নাড়তে নাড়তে বলেন, সহদেববাবুর স্ত্রী এসে ব'লে গেলেন, এ মাসে তাঁদের এক শো টাকার ওপর আয় হয়েছে, আর তোমার সততার কথা শুনে হাওয়া খেয়ে বাঁচি।

মধুবাবু হয়তো বলবেন, নাও, ঘাট হয়েছে, আর ইলিশমাছের দরকার নেই।

স্ত্রী বলবেন, ও মা, আমি কি সে কথা বলেছি? খাবে, তাতে কি? কিন্তু হিসেব করা দরকার, আয় বাড়ানো দরকার।

মধুবাবু বলবেন, ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স তো পাচ্ছি।

স্ত্রী বলবেন, খরচের সময় যে প'ড়ে রয়েছে সামনে। এ কথা ভুলছ কেন?

মধুবাবু এবার হেসে বলবেন, হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি, আর খাব না, যদি তোমার একটা মেয়ে হয়। আপিসের মিস গোমস্‌ কাল বলেছে, মিস্টার ডাট, এবার তোমার একটা মেয়ে হবে। (মিস গোমস্‌ আপিসের একজন কেরানী।)

মধুবাবু আপন মনে হেসে উঠলেন। রাস্তায় কে তাঁর এ হাসি লক্ষ্য করলে, মধুবাবু তা মোটেও ভাবলেন না। বেশ মজার কথাটি বলবেন তিনি, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া হবে ভীষণ। মেয়ে হবার কথাটিতে গৃহিণী চটবেন, কারণ আপিসের বড় সায়েবের ছেলে হয়েছে, অ্যাকাউন্টেন্টবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশনে সেদিন পয়সা খরচ ক'রে নেমন্তন্ন গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়ে কে

চায় ? কেন মেয়ে হবে ? কিন্তু দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি গৃহিণীর কাছে অসহ্য। সে হ'ল নারী-কেরানী মিস গোমস। মিস গোমসকে ভাল বললে অর্ধাঙ্গিনীর রাগ হয়, মিস গোমসকে সুন্দরী বললে তিনি অকারণে বারুদের মত ফেটে যান। কিন্তু মিস গোমস মেয়েটি বেশ ভাল, কথায় কথায় সে গান্ধীজীর একটি উক্তি আবৃত্তি করে, Woman is the incarnation of Ahimsa. Ahimsa means infinite love, which again means infinite capacity for suffering (নারী হচ্ছে অহিংসার অবতার। অহিংসা মানেই হচ্ছে অনন্ত প্রেম, যার অন্য অর্থ হচ্ছে দুর্ভোগের অন্তহীন ক্ষমতা।) মিস গোমস গান্ধীজীর এই কথাটি ব'লে বড় পরিতৃপ্ত হয়। গান্ধীজী যে মেয়েদের জীবনকে মহিমান্বিত ক'রে দিয়েছেন, এই কথা বলতে বলতে গোমসের মুখ উজ্জল হয়ে ওঠে। কিন্তু মধুবাবু স্ত্রীর কাছে মিস গোমসের কথাটি বলতে গৃহিণী, গান্ধীজী আর মিস গোমসকে এক সঙ্গে যা করেন তা অভাবনীয়।

যাক, মধুবাবুর মনে হচ্ছে, এর পর মুখভার ক'রে রান্নার কাজ চলবে। সহসা হয়তো স্ত্রী রান্না সেরে বলবে, ওগো, রান্না হয়েছে, তাড়াতাড়ি চান সেরে এস। মাছের লোভে লেট হয়ে যাবে যে !

লেট, কে বললে লেট ! (এই প্রসঙ্গটি মনে হতেই মধুবাবু দ্রুতগতিতে রাস্তায় এগিয়ে চললেন।) কে বললে লেট ?

স্ত্রী। ওই তো তুমি প্রায়ই লেট হও। এজন্যেই তোমার উন্নতি হয় না। মহাদেববাবুর মাইনে বাড়ে, তোমার বাড়ে না। কে জানে, আপিসে খালি খালি গোমস-মাগীর দিকে চেয়ে কাটাও কি না ! (এর নাম কি অহিংসা !)

মধুবাবু ভাবছেন, আর যেন স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবার দরকার নেই। রাস্তায় পরিচিত লোকের নমস্কার ও মাছের দর জিজ্ঞাসায় সমস্ত প্রসঙ্গটা মন থেকে দূর হয়ে যায়। মৎস্যটির দিকে একবার চেয়ে এসে দাঁড়ান মুদীর দোকানের সামনে। দোকানী বলে, দিব্যি মাছটি তো ! আসুন স্যার।

মধুবাবু দাঁড়িয়ে ভাবছেন, সরষে কতটা কেনা দরকার ? আড়াই পো কিনলে মণের দরে মিলবে, কিন্তু এতটা পরিমাণ কেনবার দরকারটা কি ?

সহসা মুদীটা চেঁচিয়ে উঠল, আ-হা-হা, নিয়ে গেল ! সর্বনাশ করলে আহা-হা ! এমন চমৎকার জিনিসটি—

হতবুদ্ধি মধুবাবু লক্ষ্য করছেন। একটা চিল ইলিশটিকে ছোঁ মেরে মহাশূন্যাকাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর অপেক্ষা করছে না, একদম পাকা কাজ।

এবারে মুদীর বক্তৃতা কানে প্রবেশ করতে লাগল, চমৎকার মাছটা ছিল। কাক-চিলগুলো আজকাল যা হয়েছে, তা আর বলতে! এই ব্যাটা চিলটা বড্ড পাজি, মিষ্টান্নের দোকানের ওপর ব'সে তাক্ করে আর ভোজ লাগায়। আর ময়রা ব্যাটাই বা কি রকমের লোক দেখুন, দু পয়সা বেশি বিক্রি হবে ব'লে মানুষের অপকার করাচ্ছে চিলটাকে দিয়ে। পুষেছে চোরাবাজার থেকে চিনি কিনে,—এই ব্যবসার টাকা ক'দিন থাকবে? ওর দু পয়সা বিক্রি হচ্ছে ব'লে আমার মনে কোন হিংসা নেই, কিন্তু আমি দশজনার অপকার সহ্য করতে পারি নে।

মধুবাবুর শুব্ধতা ভঙ্গ হ'ল, বললে, দাও তো আধ সের আলু। মাছের তেমন দরকার ছিল না, ঘরে চিংড়ি আছে, কিন্তু তবু এনেছিলুম।

মুদী বললে, এই তো একটু শান্তির জন্যে তো? তাতেও ভগবানের হিংসে? তবে, চিংড়িকে ছোঁ মারতে পারবে না বাবু, চিংড়ি লাফিয়ে চলে কিনা।

লজ্জা ঢাকতে গিয়ে মধুবাবু মিথ্যে কথাটিকে আর একটু বাড়ালেন, চিংড়ি ভাজা হয়ে আছে একেবারে।

মুদী বললে, তাতে কি বাবু? একবার আমার শ্বশুরবাড়িতে ভাজা গলদা-চিংড়ির লাফ দেখে বহু লোক জ'মে গেল।

মুদীটা কি বলতে চায় বুঝতে পারলেন না মধুবাবু। বাড়ি ফিরে গৃহিণীকে বললেন, আজ মাছের বড় বেশি দর, ইলিশ কিনব ভেবেছিলুম—

গৃহিণী উত্তর দিলেন, এত দেরি হ'ল, ভাবলুম, কত রাজ্যের বাজার আসছে আজ। কেন আনলে না? পান্তীর মা আজ ভাল ইলিশ এনেছে বললে।

দাড়ি কামিয়ে উঠে মধুবাবু তাড়াতাড়ি স্নানে যাবেন। গুনগুন সুরে অন্যমনস্ক হয়ে গান করছেন। জানলার ফাঁকে চেয়ে দেখলেন, প্রশান্ত নীলাকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে—যারা অকারণে হিংসে ক'রে বেড়ায়; অথচ সে জানে না, কি ভীষণ ক্ষতিই করেছে পরের।

আজও হয়তো লেট হতে হবে।

শ্রীসুকুমার রায়

সংবাদ-সাহিত্য

মাস কয়েক আগে সরকারী কাজে ইংরেজীর বদলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। পরিভাষা সৃষ্টির জন্ত একটি পরিভাষা-সংসদ্ গঠিত হয়। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে পরিভাষার "প্রথম স্তবক" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, পরিভাষা নির্মাণে সংস্কৃত ভাষার উপর অধিকতর নির্ভর করিতে হইয়াছে। "মুখবন্ধে" এইরূপ করিবার একটি প্রধান কারণ এইভাবে দেওয়া হইয়াছে—"নির্ধারিত বাংলা প্রতিশব্দগুলি যেন ভারতের অন্যান্য প্রদেশে গৃহীত না হইলেও বোধগম্য হইতে পারে। যে সমস্ত কারণে সংসদ্‌কে সংস্কৃত ভাষার সাহায্য অধিক মাত্রায় গ্রহণ করিতে হইয়াছে ইহা তন্মধ্যে একটি প্রধান।"

সংসদের সদস্যেরা "ভূমিকা"য় তাঁহাদের অবলম্বিত পদ্ধতির অনুকূলে যে যুক্তি দিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমাদের সংকলিত ও রচিত পরিভাষা কোন কোন ক্ষেত্রে আপাত দুর্বোধ বা শ্রুতিকটু মনে হইতে পারে। ইহার প্রধান কারণ, এতদিন ইংরাজী ছিল আমাদের রাষ্ট্রভাষা এবং দেশীয় ভাষা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলাম না। অতীতে অনেক স্থলেই আমরা ইংরেজীর প্রতিশব্দ বাহির করিবার কোন চেষ্টাই করি নাই, অথবা করিলেও সে চেষ্টা বেশি-দূর অগ্রসর হয় নাই। যে কোনও দিনের সংবাদপত্র খুলিলেই ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। এপর্যন্ত "Accounts" শব্দের বাংলা প্রতিশব্দরূপে আমরা হয়ত "হিসাব" এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছি, "Accountant"কে কোন কোন সময় "হিসাব-রক্ষক" নামে অভিহিত করিয়াছি, কিন্তু "Accountant-General" পর্যন্ত আমরা কোনদিনই পৌছাই নাই। "Accounts" অর্থে "হিসাব" শব্দ গ্রহণ করিলে আমাদের কি অসুবিধা হইতে পারে, এতাবৎকাল আমরা তাহা চিন্তা করি নাই। "গণন" শব্দটি "Accounts"এর প্রতিশব্দরূপে গ্রহণ করিলে এ অসুবিধা বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয়, কেন না এই এক "গণন" হইতেই আমরা "গাণনিক" (Accountant) ও "মহাগাণনিক" (Accountant-General) অনায়াসেই লাভ করিতে পারি। "গাণনিক" শব্দ বহু পুরাতন, "হিসাব-রক্ষক" অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও যুক্তাক্ষর বর্জিত, কাজেই এই শব্দ গ্রহণে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। এইরূপ "Court" শব্দের অর্থ "আদালত" বা "বিচারালয়" করিলেও স্থলবিশেষে আমাদের বিলক্ষণ অসুবিধায় পড়িতে

হইতে পারে। "High Court" "প্রধান বিচারালয়" নামে চলিতে পারে, কিন্তু "Small Causes Court"এর বেলা "বিচারালয়" শব্দটি রাখা বিশেষ সুসাধ্য নহে এক্ষেত্রে হয়ত আমাদের "ছোট আদালত"এ নামিয়া আসিতে হইবে। অথচ "আদালত" শব্দ "High Court"এর বেলা সুসংগত বলিয়া অনেকেরই মনে হইবে না। কিন্তু "Court"কে "অধিকরণ" করিলে "High Court"কে অনায়াসে "মহাধর্মাধিকরণ", "Criminal Court"কে "দণ্ডাধিকরণ" ও "Civil Court"কে "ন্যায়াধিকরণ" করা চলিবে। এক অধিকরণ শব্দই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইবে। এই শব্দটিও বহু পুরাতন। "Accounts" বা "Court"এর একপ্রকার প্রতিশব্দ প্রচলিত থাকিলেও "Registration" বা "Registrar"এর বাংলা প্রতিশব্দ দেখা যায় না। খুব বেশি যাঁহারা অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা এ পর্যন্ত "Registration"এর অনুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন "রেজিষ্টরীকরণ"। কিন্তু "Registration" ও "Registrar"এর অনুবাদ "নিবন্ধন" ও "নিবন্ধক", কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং প্রাচীন তাম্র-শাসনসম্মত।

"আমাদের পরিভাষা সম্পর্কে অভিযোগ হইতে পারে যে আমরা অতিমাত্রায় সংস্কৃতের দ্বারস্থ হইয়াছি। কিন্তু বাংলায় পরিভাষা রচনা করিতে গেলে গত্যন্তর নাই। বাংলাও, তাহার স্বগোত্রীয় হিন্দি, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষার মত, আর এখন ইংরাজীতে যাহাকে বলে building language তাহা নহে, ইহা borrowing language হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; ইহা নিজের বিশিষ্ট উপাদানের সাহায্যে নূতন শব্দ আর গড়িয়া তুলিতে অভ্যস্ত নহে, মাতৃস্থানীয় সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণ করিয়া বা সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয়যোগে সংস্কৃত মতে নূতন শব্দ গঠিত করিয়া লইয়া ব্যবহার করে ; বাংলা, মারাঠী, হিন্দি প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষা এখন "পরতন্ত্র", আর সম্পূর্ণরূপে "স্বতন্ত্র" নহে। সংস্কৃতের সহিত বাংলার এবং অন্যান্য বহু প্রদেশের ভাষার সম্পর্ক নাড়ীর সম্পর্ক। সংস্কৃত শব্দ যত সহজে বাংলার সহিত মিশিয়া যাইবে এবং সহজে আর কোন ভাষার শব্দই মিশিতে পারিবে না। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তিকাল হইতে, অর্থাৎ বিগত আড়াই হাজার বছর ধরিয়া সংস্কৃতের সহিত এই সম্পর্কই চলিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া, সংস্কৃত ভাষা শব্দসম্পদে প্রায় অতুলনীয়, শব্দ সৃষ্টির এমন সুবিধাও ভারতবর্ষের আর কোন ভাষায়

পাওয়া যায় না। একমাত্র "কৃ" ধাতু হইতে "করণ", "করণিক", "মহাকরণ", "অধিকার", "অধিকর্তা" প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ রচনা চলিতে পারে। শুধু অসুবিধা এই যে এতদিন আমাদের মাতৃভাষা অনেকটা অবহেলিত ছিল বলিয়া আমরা এই সকল শব্দের বহু অর্থ ভুলিয়া গিয়াছি। ইংরাজী ভাষাকে আয়ত্ত করিবার জন্য আমরা এতদিন যে পরিশ্রম করিয়াছি, তাহার এক চতুর্থাংশও যদি আমরা আমাদের মাতৃভাষার আলোচনায় ব্যয় করি, তাহা হইলে যে সকল শব্দ আমাদের নিকট এখন অপরিচিত বোধ হইতেছে, সেগুলি আর অপরিচিত বা দুর্বোধ থাকিবে না।"

এই যুক্তি এই প্রথম প্রযুক্ত হইতেছে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অর্থাৎ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরী লিখিয়াছিলেন—

"...Bengalee, a language which is spoken from the Bay of Bengal in the south, to the mountains of Bootan in the north, and from the borders of Ramgur to Arakan.

"It has been supposed by some, that a knowledge of the Hindoosthanee language is sufficient for every purpose of business in any part of India. THIS IDEA IS VERY FAR FROM CORRECT; for though it be admitted, that persons may be found in every part of India who speak that language, yet Hindoosthanee is almost as much a foreign language, in all the countries of India, except those to the north-west of Bengal, which may be called Hindoosthan proper, as the French is in the other countiies of Europe. In all the courts of justice in Bengal, and most probably in every other part of India, the poor usually give their evidence in the dialect of that particular country, and seldom understand any other; ...

"The Bengalee may be considered as more nearly allied to the Sungskrita than any of the other languages of India; ...four-fifths of the words in the language are pure Sungskrita. WORDS MAY BE COMPOUNDED WITH SUCH FACILITY, AND TO SO GREAT EXTENT IN BENGALEE, AS TO CONVEY IDEAS WITH THE

UTMOST PRECISION, A CIRCUMSTANCE WHICH ADDS MUCH TO ITS COPIOUSNESS. On these, and many other accounts, it may be esteemed one of THE MOST EXPRESSIVE AND ELEGANT LANGUAGES OF THE EAST.''

সে যুগের আরও কয়েকজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মত অনুরূপ ছিল; তাঁহারা বাংলা-শব্দসম্ভার বৃদ্ধির জন্য প্রধানত সংস্কৃত ভাষাকেই আশ্রয় করিতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং জোর গলায় বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে বাংলা ভাষার শব্দকোষ পূর্ণাঙ্গ করিয়া তোলা সহজ, অর্থাৎ বাংলাতে সর্ববিধ পরিভাষা সৃষ্টির কাজ সহজেই হইতে পারে। কেরীর প্রথম পুত্র ফেলিক্স কেরী ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে বাংলা ভাষায় 'অ্যানাটমি'র একটি সুবৃহৎ অভিধান প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইঁহাদেরই চেষ্টার ফলে বাংলা দেশের আদালত প্রভৃতি সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে তৎকালে প্রচলিত ফারসীর ব্যবহার রহিত হয় এবং তাঁহারাই বাংলা ব্যাকরণ-অভিধানগুলিকে সংস্কৃত করেন। পরবর্তী কালে বিদ্যাসাগর মধুসূদন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ সকলেই সংস্কৃত ভাষার সাহায্যেই মাতৃভাষাকে পুষ্ট করিয়া বর্তমান সমৃদ্ধি আনয়ন করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে আজ যাঁহারা অভিযান করিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা নিজেদের প্রগতিমনোভাবসম্পন্ন মনে করিলেও আসলে তাঁহারা যুক্তিহীন সংস্কারেরই দাস হইয়া পড়িতেছেন।

এই প্রসঙ্গে পরিভাষা-সংসদের সদস্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয় যে নিবন্ধটি পাঠাইয়াছেন, তাহা এখানে মুদ্রিত করিতেছি।—

দেশী পরিভাষায় সংস্কৃতের উপযোগ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সরকার-নিযুক্ত পরিভাষা-সংসদ সরকারী কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষার প্রথম স্তবক প্রকাশ করিয়াছেন, এ দিকে মধ্যপ্রদেশেও ব্যবস্থা-পরিষৎ-সমূহে প্রযোজ্য ইংরেজী শব্দগুলির হিন্দী পর্যায় দিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

দুই প্রদেশ হইতে সমকালে প্রকাশিত পুস্তিকাদ্বয়ের বিষয়বস্তু এক নয়। পশ্চিমবঙ্গের পরিভাষায় আছে শাসনকার্যের উপযুক্ত শব্দ (terminology to be used in Public Services) আর মধ্যপ্রদেশের পরিভাষায় আছে

ব্যবস্থা-পরিষৎ সম্পর্কিত শব্দ (words of general use in the Legislative Assemblies)।

পরিভাষা-সংকলন বিষয়ে উভয় প্রদেশের মধ্যে কোনরূপ সহযোগ সম্ভবপর হয় নাই, তথাপি সংকলিত পরিভাষায় সাধারণ শব্দগুলির মধ্যে অদ্ভুত রকমের মিল দেখা যায়। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, যাঁহারা পরিভাষা সংকলন করিয়াছেন, তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল এইরূপ, যাহাতে নবনির্মিত পরিভাষা সমগ্র ভারতে গ্রাহ্য হইতে পারে। উভয় প্রদেশেই পারিভাষিকগণকে সংস্কৃতমূলক শব্দের উপর অধিক নির্ভর করিতে হইয়াছে।

কেহ কেহ বলিতেছেন, সংস্কৃত পদ বাংলার চলতি পথে অচল। সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে বাংলার গণমনের যোগ নাই। এমন শব্দ দিয়া পরিভাষা সৃষ্টি করিলে অপরিচয়জনিত উদ্বেগে পদে পদে কষ্ট পাইতে হইবে। এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ পরিভাষায় চলতি কথা ব্যবহারের পক্ষপাতী। ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মধ্যপ্রদেশের পরিষৎপাল শ্রীঘনশ্যামসিংহ গুপ্ত তাঁহার পরিভাষা-পুস্তিকার মুখবন্ধে প্রত্যুত্তর দিয়াছেন—

"The words in common parlance are loose and do not express fine shades of thought."

রবীন্দ্রনাথ চলতি ভাষা ব্যবহারের পক্ষে অনেক যুক্তি দিয়া গিয়াছেন এবং তিনি সংস্কৃতমূলক সাধু ভাষাকে কৃত্রিম ভাষা নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু দূরদর্শী কবি পরিভাষা সম্পর্কে সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন নাই। তিনি অকুণ্ঠবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন—

> "সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে বাংলা ভাষা অচল। কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে শব্দ এবং শব্দ বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে। পাশ্চাত্য ভাষাগুলিকেও এমনি করেই গ্রীক লাটিনের বশ মানতে হয়। তার পারিভাষিক শব্দগুলো গ্রীক লাটিন থেকে ধার করে নেওয়া কিংবা তারি উপাদান নিয়ে তারি ছাঁচে ঢালা।"—'বাংলা ভাষা পরিচয়' পৃ. ৫০

যাঁহারা সংস্কৃতের সঙ্গে অপরিচয়জনিত শঙ্কায় উদ্বেগ বোধ করেন, তাঁহাদিগকে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, excise customs, appraiser-এর মত ইংরাজী শব্দগুলির সহিতও জনমনের যোগ নাই। সাধারণ শিক্ষিত

লোকেও এই সকল পদের শব্দগত অর্থ ধরিতে পারে বলিয়া মনে হয় না কিন্তু নবগঠিত আগমশুল্ক, অন্তঃশুল্ক ও মূল্যনিরূপক শব্দের অর্থ সকলেই কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে এইরূপ আশা করা যায়।

প্রকৃতপক্ষে বারংবার প্রয়োগের ফলে শব্দের গহনতা দূর হইয়া যায়। বাংলায় বহুপ্রচলিত "বিসর্জন" পদের পরিত্যাগ অর্থটি সুপরিচিত না হইলেও কোন বাঙালী বালকের পক্ষেই প্রতিমা-বিসর্জনের অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় না। অভ্যাসের ফলে এইরূপ হইয়াছে। পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিবে। আজ যে শব্দটি কঠিন বোধ হইতেছে, অভ্যাসের গুণে উহার কাঠিন্য ক্রমে লোপ পাইবে। সাংবাদিকগণ উদ্যোগী হইলে নূতন পরিভাষা অল্প দিনে আয়ত্ত হইয়া যাইবে। তুর্কীতে যখন কেমাল পাশা দেশী ভাষার প্রবর্তন করেন, তখন সংবাদ-পত্রের সহায়তায়ই তিনি কৃতকার্য হইতে পারিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষ বহু ভাষার দেশ। সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রিক ঐক্য সুস্থিত রাখিবার জন্য একটা রাষ্ট্রভাষা চাই—এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন। এত দিন ইংরেজী ভাষা এ বিষয়ে কাজ করিয়া আসিতেছে। আমরা প্রয়োজনের তাগিদে ইংরেজী গ্রহণ করিয়াছি. সুতরাং রবীন্দ্রনাথের যুক্তিতে উহা আমাদের কৃত্রিম ভাষা। ভবিষ্যতে যদি হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হয়, তবে তাহাও ভারতের একাধিক প্রদেশের পক্ষে কতকটা কৃত্রিম ভাষারই কাজ করিবে। এইরূপ ভাষায় সর্বপ্রদেশ-সাধারণ শব্দ যত অধিক থাকিবে, ততই উহা অধিক লোকের বোধ্য হইবে। সংস্কৃত ভাষা বাংলার জননী কি অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহী—সে তর্ক না তুলিয়াও এ কথা অনায়াসেই বলা চলে যে, ইংরেজী অপেক্ষা সংস্কৃত ভাষা বাংলার অনেক বেশি আপন। সংস্কৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অস্বীকার করিয়া যিনি যতই আত্মাপহার করুন, এই প্রত্যক্ষ তথ্যটি না মানিয়া উপায় নাই যে ভারতবর্ষের দেশে দেশে ভাববিনিময়ের কাজে তৎসম ও তদ্ভব শব্দই এখনও শ্রেষ্ঠ বাহন রহিয়া গিয়াছে। ইহাই যদি প্রকৃত অবস্থা হয়, তবে সার্বপ্রদেশিক পরিভাষা নির্মাণে সংস্কৃতের উপযোগিতা অস্বীকার করিব কেন? প্রাচীন ভাষার আশ্রয় লইলেই নূতন প্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এরূপ মনোভাব দূর করিতে হইবে। এ ক্ষেত্রে প্রাচীনত্বের মর্যাদায় সংস্কৃতের আদর নাই, কিন্তু প্রয়োজনের খাতিরে তাহাকে না নিলে নয়

মধ্যপ্রদেশে প্রকাশিত হিন্দী পরিভাষা সংস্কৃতমূলক হইয়াছে, সে কথ

।ছি। পরিমলপাল গুপ্ত মহাশয় সংস্কৃত গ্রহণের পক্ষে এরূপ যুক্তি

"We have decided in favour of Sanskrit roots and the reasons are obvious. One important reason is that their words are common to most of the provinces of the Dominion of India. Hindi, Marathi, Gujarati, Bengali are all of Sanskrit origin and even in the South, the Dravidian languages, particularly Telugu, Canarese and Malayalam are highly nurtured by Sanskrit."—Foreword, p ii.

অন্য এক প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে সংস্কৃতের এক বড় গুণ এই যে, এই ভাষায় একই ধাতুর সহিত বিভিন্ন প্রত্যয় যোগ করিয়া সমগোত্রীর নানারূপ অর্থ প্রকাশ করা যায়। একটি উদাহরণ দিলে আমার কথা স্পষ্ট হইবে এবং অন্য ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের পার্থক্য ধরা পড়িবে।

কোন আইনের পাণ্ডুলেখের ইংরেজী নাম bill। ব্যবস্থা-পরিষদের সম্মতি লাভ করিলে এই Bill টি Law বা বিধিরূপে পরিণত হয়। ইংরেজী bill শব্দটির অর্থগত কোন বৈশিষ্ট্য নাই, law-এর সঙ্গে শব্দগত সম্পর্কও কিছু নাই। Bill যে law এর পূর্বরূপ তাহা বাচ্যার্থ দ্বারা মোটেই সূচিত হয় না। এই সকল কারণে বহুপ্রচলিত bill শব্দটি মধ্যপ্রদেশের পরিভাষায় পরিত্যক্ত হইয়াছে (Foreword iii দ্রষ্টব্য)। Bill এর হিন্দী প্রতিরূপ করা হইয়াছে বিধেয়ক। বিধেয় শব্দের অর্থ বিধানযোগ্য। সম্ভবত শব্দটির পারিভাষিক রূপ সূচনার জন্য স্বার্থে ক প্রত্যয় যোগ করা হইয়াছে। বিধেয়ক পদটি সুন্দর। আজ যাহা বিধেয়ক আছে, ব্যবস্থা-পরিষদের সম্মতি লাভ করিলে ভবিষ্যতে তাহা বিধিরূপে পরিণত হইতে পারে। সংস্কৃত শব্দ দ্বারাই এইরূপ অর্থগত সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য প্রকাশ সম্ভবপর হয়। অথচ বিধেয়ক বা বিধি কোনটিই দুর্বোধ বা শ্রুতিকটু নয়। পরিভাষা-সংসদও বহু বিদেশী শব্দ পরিভাষায় গ্রহণ করিয়াছেন।

সেকালের ভাষা বলিয়া সংস্কৃতকে পরিভাষার কার্যে অগ্রাহ্য করা যেমন নিন্দনীয়, অসংস্কৃত বলিয়া কোন বহুপ্রচলিত শব্দকে ভাষা হইতে নিষ্কাসন করাও তেমনই অবিধেয়। কিন্তু অনেক সময়ে শব্দ-সম্বন্ধে আরও নানা দিক বিবেচনা করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বন্দর শব্দটি ধরা যাইতে পারে। বাংলায় Port অর্থে বন্দর শব্দ চলিয়া গিয়াছে। Port Commissioner-কে

অনায়াসেই বন্দরপাল বা বন্দরমহাধ্যক্ষ বলা চলিতে পারে। Port Officerও বন্দরাধিকারিক হইতে পারেন। কিন্তু বন্দরপাল বলিলে হিন্দীভাষী জনগণ বানরপাল বুঝিবেন। অপর প্রদেশের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করা আবশ্যক। এইরূপ চিন্তার ফলেই বন্দরের সঙ্গে সংস্কৃত পত্তন পদটির কথা মনে আসে।

প্রাচীনকালে পত্তন শব্দ সাধারণ নগর অর্থেও ব্যবহার হইত, আবার নৌকাগম্য পুর অর্থেও প্রযুক্ত হইত। অর্থশাস্ত্রে (২২৮) কৌটিল্য পোতাধ্যক্ষ সম্পর্কে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন—

পত্তনাধ্যক্ষনিবন্ধং পণ্যপত্তনচারিত্রং নাবধ্যক্ষঃ পালয়েৎ ॥

অর্থাৎ বন্দরের অধ্যক্ষ (পত্তনাধ্যক্ষ) যেরূপ নিয়ম বাঁধিয়া দিবেন এবং বাণিজ্য স্থানে যেরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকিবে, নৌকাধ্যক্ষ তাহা মানিয়া লইবেন। ডক্টর শ্যামশাস্ত্রী পত্তনের অনুবাদ করিয়াছেন Port town। মঃ মঃ গণপতি শাস্ত্রী শ্রীমূলাটীকায় পট্টনের আভিধানিক অর্থ লিখিয়াছেন—

পট্টনং শকটৈর্গম্যং ঘোটকৈর্নৌভিরেব চ।

গাড়ি, ঘোড়া, নৌকা সবই যেখানে যাইতে পারে, এরূপ স্থানের নাম পট্টন অর্থাৎ বন্দর। আজও ভিজগাপটম, মসলিপটম প্রভৃতি বন্দর এই পত্তন বা পট্টন নাম বহন করিয়া শব্দের প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করিতেছে।

নায়াধম্মকহা নামক জৈনগ্রন্থে গম্ভীর-পোয়পট্টনের উল্লেখ আছে। গম্ভীর পোতপত্তন অবশ্যই deep harbour-কে বুঝাইত। এই পত্তন শব্দটি Port অর্থে গ্রহণ করিলে উহা ভারতের সকল প্রদেশে গ্রাহ্য হইতে পারিবে আর পত্তনপাল, পত্তনমহাধ্যক্ষ, পত্তনাধিকারিক প্রভৃতি পদও বেশ চলিবে। বন্দর শব্দ সার্বপ্রদেশিক প্রয়োগের বাহিরে বাংলায় নিবদ্ধ থাকিলে আপত্তির কারণ নাই।

আর একটি বহুপ্রচলিত ইংরেজী শব্দ আছে Police। বাংলা Police Department-এর নামকরণ সহজ নয়। কেহ যদি বলেন যে, পুলি বাংলায় চলিয়া গিয়াছে, সকলেই উহার অর্থ বোঝে, সুতরাং পরিবর্ত অনাবশ্যক, তবে আর কোন কর্তব্য থাকে না।

কোন কোন অঞ্চলের তাম্রশাসনে দাণ্ডপাশিক, চৌরোদ্ধরণিক প্রভৃ ভারী ভারী নাম পাওয়া যায়। এই সকল নামের সহিত সংশ্লিষ্ট মুদ্রাচি

দণ্ডধর রক্ষী পুরুষের প্রতিকৃতিও পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং অনুমান হয়, প্রাচীনকালে কোন কোন দেশে দাণ্ডপাশিক প্রভৃতি রাজকর্মচারীরা ছিলেন পুলিসের বড়কর্তা।

দাক্ষিণাত্যের পল্লবরাজবংশের প্রাচীন লিপিতে পুলিসের কর্ম বুঝাইবার জন্য আরক্ষা-পদের উল্লেখ আছে। শিবস্কন্দবর্মার তাম্রশাসনে (Epigraphia Indica, vol. i) প্রাকৃত ভাষায় 'আরখাধিকত' কথাটি পাওয়া যায়। সংস্কৃত আরক্ষাধিকৃত অর্থ Police officer। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে এবং সংস্কৃত কাব্য, নাটক ও কথাসাহিত্যে আরক্ষ, আরক্ষক, আরক্ষী প্রভৃতি শব্দ Police man অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দণ্ডপাশ অপেক্ষা আরক্ষা পদ পুলিসের অর্থ প্রকাশে যোগ্যতর শব্দ, অথচ স্বল্পাক্ষর ও সহজবোধ্য। সুতরাং আরক্ষা বিভাগ Police Department-এর সংজ্ঞারূপে চলিবে। আরক্ষাধ্যক্ষ, আরক্ষাধিকারিক, আরক্ষাপরিদর্শক প্রভৃতি শব্দ গঠনে কষ্ট হইবে না।

ভারতীয় মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভাষা সংকলন চলিতেছে। এই সময় যোগ্য ব্যক্তিগণের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। প্রস্তাবিত নূতন সংজ্ঞা ভাল হয় নাই, এমন কথা অনেকে বলিবেন। কিরূপ প্রতিশব্দ ভাল হইবে, তাহা জানিতে। পরিভাষা পুস্তিকার "মুখবন্ধে" পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কর্মসচিব মহাশয় লিখিয়াছেন, "সহায়তামূলক প্রস্তাব ও গঠনমূলক সমালোচনা সাদরে ও সাগ্রহে বিবেচিত হইবে।" এ সম্বন্ধে নাগরী-প্রচারিণী সভার *Hindi Scientific Glossary*-র ভূমিকায় (p. 3) প্রকাশিত মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য :—

A newly coined word is bound to appear strange and nothing is easier than to say that it is no good. What is really wanted is that better alternative words be suggested.

নূতন পরিভাষা নির্মাণের গুরুত্ব অনেক। রাষ্ট্র ও জাতির দূরবিসারী কল্যাণের সহিত ইহার সম্পর্ক আছে। সুতরাং ক্ষিপ্রতা ত্যাগ করিয়া এ পথে অবহিত পদে অগ্রসর হইতে হইবে।

—

যন্ত্রেরে করিয়া এত মন্ত্রণা যাদের,
কোনদিন মিটিবে না যন্ত্রণা তাদের।

গান্ধী-কথা (কথা-নাট্য)

ছেলে। আজ কি হচ্ছে মা ?

মা। কবি এবারে গান গাইবেন খোকন, তুমি স্থির হয়ে ব'স।

কবি। ঠিক বলেছ, মহাপুরুষ-বন্দনা স্থির চিত্তেই শুনতে হয়। পৃথিবীতে শ্রদ্ধার বড় অভাব হয়েছে মা।

মা। আপনি গান বাবা

কবি। (গান) পীড়িত পতিত দীন মানুষের জন্য
ধরণীতে হ'লে অবতীর্ণ।

মা। (ঐ সঙ্গে) তোমারে প্রণাম করি এ যুগের ভীষ্ম,
প্রণমি নূতন যুগ-বুদ্ধ,
মহাভারতের যীশু নমো নমঃ গান্ধী,
ত্যাগ-হোমানল পরিশুদ্ধ।

নমঃ কর বাবা।

ছেলে। কাকে নমঃ করব মা ?

মা। গান্ধীজীকে।

ছেলে। গান্ধীজী কি ঠাকুর যে, নমঃ করব ?

মা। ঠাকুর নন বাবা, তিনি মহামানব, তিনি মহাত্মা। তাঁকে ভ করলে পুণ্য হয়।

ছেলে। ভক্তি তো করছি মা, কিন্তু আমি যে তাঁর কথা কিছু জানি ন তুমি আমাকে গান্ধীজীর কথা বল মা।

মা। এই পৃথিবীতে হিংসা আর স্বার্থ বড় প্রবল বাবা, যাদের হাতে ক্ষম তারা প্রায়ই নিরীহ দুঃখী সাধারণ মানুষের উপর বিনা কারণে অত্যাচ উৎপীড়ন করে। ধর্ম দেশ জাতি, এমন-কি গায়ের রঙের পার্থক্য নি মানুষে মানুষে ভেদ ঘটায়। কাছের মানুষকে ঘৃণা ক'রে দূরে ঠে দেয়। সেই মহাপাপের ফলে আমাদের এই হতভাগ্য দেশে আমরা এ হীন, এমন পরাধীন হয়ে পড়েছিলাম, বাবা। মহাত্মা গান্ধী এই পীড়িত পতি ভীত সাধারণ মানুষের মনে বল দেবার জন্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন মানুষে মানুষে ভেদ দূর করবার জন্যে তিনি সর্বপ্রথম কাজে নেমেছিলেন দক্ষি আফ্রিকায়, সেখানকার সাদা-চামড়ার লোকরা ভারতবর্ষের কালো-চামড়া লোকদের মানুষ ব'লেই গণ্য করত না, যত রকমে পারত, অত্যাচার করত সে অনেক দিনের কথা খোকন, তুমি তখন জন্মাও নি।

ছেলে। ওই দেখ মা, দাদু আসছেন। দাদু অত হাসছেন কেন মা?

দাদু। হাসছি তোর মায়ের পাকা পাকা কথা শুনে। তখন ও-ও কি [illegible]য়েছিল নাকি? উনিশ শ সাত-আট সালের কথা। কবির নিশ্চয়ই সব [illegible]নে আছে!

কবি। মনে আছে বইকি! সে কথা কি ভোলবার?

দাদু। আমরা তখন কার্জ্জনের বঙ্গবিভাগ রদ করবার জন্যে বয়কট [illegible]ান্দোলন শুরু করেছি। কি সে উৎসাহ, আর কি সে উত্তেজনা! অত্যাচারী [illegible]ংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়াবার জন্যে বোমাবন্দুক ছুঁড়তে শিখলাম, [illegible]লকাতাকে কেন্দ্র ক'রে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে খুললাম স্বদেশীর আখড়া। [illegible]ল বেঁধে পথে পথে মায়ের বন্দনা-গান গাই, ঘরে ঘরে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করি, [illegible]িলিতি নুন ছড়াই পথে পথে, ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় ঘটা ক'রে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে [illegible]লি—আর গোপনে লোকচক্ষুর আড়ালে ছুরি ছোরা পিস্তল বোমা লাঠি [illegible]স্তি অভ্যেস করি। ব্রিটিশের তাঁবেদার সি. আই. ডি. পুলিসের দল, ঘরভেদী [illegible]ভীষণের দল—নিমকের খাতিরে দেশদ্রোহিতা ক'রে আমাদের পেছনে তাড়া [illegible]রে। এরই মধ্যে মজঃফরপুরে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে মারতে গিয়ে ধরা প'ড়ে [illegible]ফুল্ল চাকী করল আত্মহত্যা, ক্ষুদিরামের হ'ল ফাঁসি, মানিকতলার বাগান-[illegible]ড়িতে বারীন ঘোষের বোমার দল পড়ল ধরা। দেশের শত্রু এবং ঘরের শত্রুদের [illegible]াস্তি দেবার জন্যে আমরা কজন অন্ধকারে দুর্গম দুরূহ পথে ঘুরে বেড়াই।

এই যখন আমাদের অবস্থা, হঠাৎ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার সুদূর দক্ষিণ-[illegible]াফ্রিকা থেকে ভেসে এল এক শীর্ণ খর্ব কৃশকায় মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—না না, হিংসার পথ মানুষের পথ নয়, আমাদের পথ তো নয়ই। আমরা অসহায়, [illegible]রা অস্ত্রহীন, আমরা দুর্বল। আমাদের পথ একতার পথ, সত্যের পথ, [illegible]্যাগ্রহের পথ। ক্রূর কুটিল খল নৃশংস হিংসাকে, প্রবল দাম্ভিক হিংসাকে [illegible]ামরা আত্মিক বলে বলীয়ান হয়ে, শান্ত সংহত বীর্যবান অহিংসা দিয়ে [illegible]রোধ করব, জয় করব। সেই কঠোর সাধনা এখানে শুরু করেছি আমরা। ভারতবাসী, তোমরা যে যেখানে আছ, সত্যে আগ্রহান্বিত হও, অহিংস [illegible]্যাগ্রহ কর। এই আমাদের পথ।

চমকে উঠলাম আমরা, রাগ হ'ল আমাদের। মদমত্ত শক্তি-সুরাপায়ী [illegible]সুরের সঙ্গে খালি হাতে সামনাসামনি যুদ্ধ করতে নামবে কোন্ উন্মাদ! [illegible]হ হ'ল, লোকটা ব্রিটিশের ঘুষখোর চর; এই উৎসাহ-উদ্দীপনার মুখে

অহিংসা প্রচার ক'রে সত্যাগ্রত দেশকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেবে, নির্ব
ক'রে দেবে জীবন্ত মানুষকে, পণ্ড করবে আমাদের স্বদেশী-আন্দোলনে
আমরা রুদ্ধ করলাম কান।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে আবার সাগর পার থেকে ভেসে এল
কণ্ঠস্বর—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কণ্ঠস্বর—এবার ক্ষীণ নয়, সাফল্য-গৌর
দৃপ্তগম্ভীর। শুনলাম—"ভারতবাসী শোনো, নিষ্ঠাবান জনসেবক সৈনিক
সত্যাগ্রহ কখনও নিষ্ফল হয় না, আমরা এখানে তা প্রমাণ করেছি
১৮৯৩ সালে যখন এসেছিলাম এই দক্ষিণ-অফ্রিকায়, দেখেছিলাম ভারতবা
কাল-আদমিকে মানুষের মর্যাদা দেয় না এখানকার শ্বেতাঙ্গের দল, ভারতীয়
সবাই কুলি, পশুর অধম। ১৯০৬ সালে আবার, জারি হ'ল কালা-কানুন।
মর্মান্তিক অপমান থেকে আমরা আত্মরক্ষা করেছি অবিরত সত্যাগ্রহ ক'রে, পু
পুনঃ দৈহিক আঘাত সহ্য ক'রে, বারংবার কারাবরণ ক'রে। আজ ১৯১৪ সা
দীর্ঘ বাইশ বছর পরে অহিংস সত্যাগ্রহের সাহায্যে আমরা ফিরে পেয়ে
আত্মমর্যাদা। ব্রিটিশের কঠোর শাসন থেকে ভারতবর্ষের মুক্তির এই প
তোমরা কান পেতে শোন এখানকার সত্যাগ্রহীদের মর্মবাণী, পথের নির্দেশ ক
কর। মাতৃভূমির সেবার কাজে আমিও তোমাদের সহযোগিতা করতে আসছি

শুনতে পেলাম বিজয়ী সত্যাগ্রহীদের গান—

(কোরাস) মিথ্যাশাসন-বিদ্রোহী মোরা, মোরা সত্যাগ্রহী,
শত লাঞ্ছনা শত কারাগার অকাতরে চলি সহি।
সত্যে রাখিয়া অচল মতি,
মুক্তির পথে মোদের গতি—
অন্যায় যদি রাঙায় চক্ষু মোরা শঙ্কিত নহি।
সত্যের পথসন্ধানী মোরা মোরা সত্যাগ্রহী॥

মোরা অহিংস, মোরা নির্ভয়, বিধির বিধান মানি,
আত্মার নাই মৃত্যু কখনো—জেনেছি পরম বাণী।
অন্তরবলে আমরা বলী
হাসিমুখে দিই আত্মবলি
মিথ্যারে হানি মোরা সত্যের বিজয়-পতাকা বহি।
সত্যের পথে যাত্রী আমরা, মোরা সত্যাগ্রহী॥

ছেলে। ওই দেখ মা, দাদু আসছেন। দাদু অত হাসছেন কেন মা?

দাদু। হাসছি তোর মায়ের পাকা পাকা কথা শুনে। তখন ও-ও কি ন্মেছিল নাকি? উনিশ শ সাত-আট সালের কথা। কবির নিশ্চয়ই সব নে আছে!

কবি। মনে আছে বইকি! সে কথা কি ভোলবার?

দাদু। আমরা তখন কার্জ'নের বঙ্গবিভাগ রদ করবার জন্যে বয়কট ান্দোলন শুরু করেছি। কি সে উৎসাহ, আর কি সে উত্তেজনা! অত্যাচারী ংরেজকে এ দেশ থেকে তাড়াবার জন্যে বোমাবন্দুক ছুঁড়তে শিখলাম, লকাতাকে কেন্দ্র ক'রে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে খুললাম স্বদেশীর আখড়া। ল বেঁধে পথে পথে মায়ের বন্দনা-গান গাই, ঘরে ঘরে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করি, বলিতি নুন ছড়াই পথে পথে, লাঙ্কাশায়ারের কাপড় ঘটা ক'রে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফলি—আর গোপনে লোকচক্ষুর আড়ালে ছুরি ছোরা পিস্তল বোমা লাঠি :শ্তি অভ্যেস করি। ব্রিটিশের তাঁবেদার সি. আই. ডি. পুলিসের দল, ঘরভেদী বভীষণের দল—নিমকের খাতিরে দেশদ্রোহিতা ক'রে আমাদের পেছনে তাড়া রে। এরই মধ্যে মজঃফরপুরে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটকে মারতে গিয়ে ধরা প'ড়ে াফুল্ল চাকী করল আত্মহত্যা, ক্ষুদিরামের হ'ল ফাঁসি, মানিকতলার বাগান-াড়িতে বারীন ঘোষের বোমার দল পড়ল ধরা। দেশের শত্রু এবং ঘরের শত্রুদের াস্তি দেবার জন্যে আমরা কজন অন্ধকারে দুর্গম দুরূহ পথে ঘুরে বেড়াই।

এই যখন আমাদের অবস্থা, হঠাৎ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার সুদূর দক্ষিণ-াফ্রিকা থেকে ভেসে এল এক শীর্ণ খর্ব কৃশকায় মানুষের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—না না, । হিংসার পথ মানুষের পথ নয়, আমাদের পথ তো নয়ই। আমরা অসহায়, ামরা অস্ত্রহীন, আমরা দুর্বল। আমাদের পথ একতার পথ, সত্যের পথ, ত্যাগ্রহের পথ। ক্রূর কুটিল খল নৃশংস হিংসাকে, প্রবল দাম্ভিক হিংসাকে ামরা আত্মিক বলে বলীয়ান হয়ে, শান্ত সংহত বীর্যবান অহিংসা দিয়ে তিরোধ করব, জয় করব। সেই কঠোর সাধনা এখানে শুরু করেছি আমরা। ভারতবাসী, তোমরা যে যেখানে আছ, সত্যে আগ্রহান্বিত হও, অহিংস ত্যাগ্রহ কর। এই আমাদের পথ।

চমকে উঠলাম আমরা, রাগ হ'ল আমাদের। মদমত্ত শক্তি-সুরাপায়ী সুরের সঙ্গে খালি হাতে সামনাসামনি যুদ্ধ করতে নামবে কোন্ উন্মাদ! ন্দেহ হ'ল, লোকটা ব্রিটিশের ঘুষখোর চর; এই উৎসাহ-উদ্দীপনার মুখে

অহিংসা প্রচার ক'রে সত্যাগ্রহ দেশকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেবে, ক'রে দেবে জীবন্ত মানুষকে, পঙ্গু করবে আমাদের স্বদেশী-আন্দোলন আমরা রুদ্ধ করলাম কান।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতে আবার সাগর পার থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর কণ্ঠস্বর—এবার ক্ষীণ নয়, সাফল্য-গৌ দৃপ্তগম্ভীর। শুনলাম—"ভারতবাসী শোনো, নিষ্ঠাবান জনসেবক সৈনি সত্যাগ্রহ কখনও নিষ্ফল হয় না, আমরা এখানে তা প্রমাণ করে ১৮৯৩ সালে যখন এসেছিলাম এই দক্ষিণ-আফ্রিকায়, দেখেছিলাম ভারতব কাল-আদমিকে মানুষের মর্যাদা দেয় না এখানকার শ্বেতাঙ্গের দল, ভারতী সবাই কুলি, পশুর অধম। ১৯০৬ সালে আবার, জারি হ'ল কালা-কানুন মর্মান্তিক অপমান থেকে আমরা আত্মরক্ষা করেছি অবিরত সত্যাগ্রহ ক'রে, পুনঃ দৈহিক আঘাত সহ্য ক'রে, বারংবার কারাবরণ ক'রে। আজ ১৯১৪ স দীর্ঘ বাইশ বছর পরে অহিংস সত্যাগ্রহের সাহায্যে আমরা ফিরে পে আত্মমর্যাদা। ব্রিটিশের কঠোর শাসন থেকে ভারতবর্ষের মুক্তির এই তোমরা কান পেতে শোন এখানকার সত্যাগ্রহীদের মর্মবাণী, পথের নির্দেশ কর। মাতৃভূমির সেবার কাজে আমিও তোমাদের সহযোগিতা করতে আস

শুনতে পেলাম বিজয়ী সত্যাগ্রহীদের গান—

(কোরাস) মিথ্যাশাসন-বিদ্রোহী মোরা, মোরা সত্যাগ্রহী,
শত লাঞ্ছনা শত কারাগার অকাতরে চলি সহি।
সত্যে রাখিয়া অচল মতি,
মুক্তির পথে মোদের গতি—
অন্যায় যদি রাঙায় চক্ষু মোরা শঙ্কিত নহি।
সত্যের পথসন্ধানী মোরা মোরা সত্যাগ্রহী॥

মোরা অহিংস, মোরা নির্ভয়, বিধির বিধান মানি,
আত্মার নাই মৃত্যু কখনো—জেনেছি পরম বাণী।
অন্তরবলে আমরা বলী
হাসিমুখে দিই আত্মবলি
মিথ্যারে হানি মোরা সত্যের বিজয়-পতাকা বহি।
সত্যের পথে যাত্রী আমরা, মোরা সত্যাগ্রহী॥

আপনি অচল ব'লেই তোরা অচলাচল করিস বিচার,
সত্যেরে দুই পায়ে ঠেলে পূজা করিস কেবল মিছার।
পরের অধীন যাদের জীবন,
সবাই তারা হীন হরিজন—
এক হয়ে আজ দাঁড়া সবাই, সব হীনতা যাবে ঘুচি।
আপন জনে পর ক'রে হায়, হয় না রে কেউ শুভ্রশুচি॥

দু, তারপর দেখতে দেখতে এসে গেল বিয়াল্লিশ সালের ৮ই আগস্ট। তাঁর শেষ অস্ত্র—পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। বোম্বাইয়ের রাষ্ট্রীয় গৃহীত হ'ল তাঁর "ভারত ছাড়" প্রস্তাব। তাঁরই অনুপ্রেরণায় সমস্ত র্ষ সমবেতকণ্ঠে গান গেয়ে উঠল—

(রাস) আমাদের ঘুম ভেঙেছে, ও বিদেশী ফিরে যা রে—
তোদের বাঁধন কাটব ঠিকই যাই তো যাব ছারেখারে॥

ছারেখারে যেতেই হ'ল দাদু, স্বাধীনতা আমরা পেলাম, কিন্তু কি যে য়ে পেলাম! কূটকৌশলীদের চক্রান্তে ছেচল্লিশের আগস্টে ব্যাপকভাবে গেল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। আমার মত কত হতভাগ্য পিতা যে হ'ল, তোমার মত কত নিরপরাধ শিশু হ'ল পিতৃহীন! মা আর ীর চোখের জলে আর হাহাকারে কালো হয়ে গেল ভারতবর্ষের । ব্যবসা গেল, বাণিজ্য গেল, সম্পত্তি গেল, মানুষ গেল—দু ভাগে য়ে গেল আমাদের এই সোনার ভারতবর্ষ! দুঃখের নিশীথ রাত্রির আমরা পেলাম স্বাধীনতা। ১৯১৫ থেকে ১৯৪৭—দক্ষিণ-আফ্রিকার রতবর্ষেও গান্ধীজীর বাইশ বছরের জীবনপণ সাধনা জয়যুক্ত হ'ল সেই দুঃখার্জিত স্বাধীনতালাভের মধ্যে। যজ্ঞ পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে আত্মকলহের হোমানলে আত্মাহুতি দিলেন। সেই বেদনাময় ইতিহাস ান।

দাদু, আমরা ভগবানের পুণ্য নাম নিয়ে গান্ধী কথা শেষ করি, কারণ, আমাদের শেষ, তিনিই আমাদের চরম নির্ভর, পরম আশ্রয়। গাও তো তুমিও গাও মা।

(গান) এই হ'ল ভাল হে ভগবান।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
...প্রেস, ...মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শনিবারের চিঠি
২০শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৫

জীবন-বাণী

হাজার হাজার বছর হয়েছে পার—
এই ভারতের তপোবনতলে নিভৃত তপস্যায়
একান্তে বসি তাপসেরা যত লভিলেন অন্তরে
বাগ্দেবী-বরে কল্যাণবাণী অপূর্ব অপরূপ,
বাক্য-বিভূতি মস্তিষ্কের কোটরে জন্ম যার,
ঋক যজুঃ সাম—উপনিষদের রূপে
বিধৃত হইয়া সাধকজনের সাধনলব্ধ বাণী ;
হ'ল প্রচারিত কল্যাণে মানুষের।
ধ্যানাসনে বসি লভিলেন যাঁরা বাণীর আশীর্বাদ
ঋষি যে তাঁহারা, আমরা তাঁদের আজিও প্রণাম করি।

তার পরে দেখি পশ্চিমে পূবে দার্শনিকের দল
ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ বিচার করি
লিখিল সূক্ত সূত্র ও টীকা ভাষ্য সূক্ষ্ম অতি
সমাজ মানুষ ধর্ম জগৎ ধাতারে কেন্দ্র করি।
কথায় কথায় গড়িয়া উঠিল বাক্যের হিমালয়,
ছন্দে ও সুরে উথলি উঠিল শব্দের পারাবার,
জটিল কুটিল ন্যায়তর্কের ঘোরালো বচনরাশি—
এই ধরণীর সাধারণ যারা, তারা তা শোনে না কানে,
শুনিলেও তারা বোঝে না কথার মানে।'
কপিল কণাদ পতঞ্জলি ও অ্যারিস্টটল প্লেটো
কন্‌ফুসিয়াস লাওৎসে আর সেনেকা চার্বাকেরা
কেউ মহাজ্ঞানী কেউ উপাসক ক্ষুরধার বুদ্ধির,
আজও পণ্ডিতে প্রণাম তাঁদের জানান শ্রদ্ধাভরে।

আরো এসেছেন মহাকবি কবি ঋষিকল্প যে তাঁরা—
বাল্মীকি ব্যাস হোমর দান্তে ভার্জিল মিল্‌টন
কালিদাস আর শেক্সপিয়র, গ্যেটে, রবীন্দ্রনাথ

শ্লোকে শ্লোকে ঢালি অমৃতের ধারা মর্ত্যধরার শোকে,
মিলনে বিরহে প্রেমে ও ঘৃণায় ত্যাগে বীরত্বে তাঁরা
মাটির মানুষে স্বর্গদেবতা গড়ি
ভালবাসা দিয়ে হৃদয়-অর্ঘ্যে কাব্য সৃজন করি'
কালের বক্ষে লিখিয়া গেছেন নাম,
রসিক জনের শ্রদ্ধা প্রণাম লভিয়া আছেন বাঁচি।
শব্দব্রহ্ম সৃষ্টি এঁদের, বাণীর বাহক এঁরা,
হৃদয় অথবা মস্তিষ্কের পথে
এঁরা লভেছেন ভগবদ্‌কৃপা, বিলায়ে গেছেন তাই।
বাণী-গৌরবে প্রণম্য এঁরা—প্রণমি এঁদের পায়ে।

যুগ-প্রয়োজনে এসেছেন যাঁরা কর্মের অবতার
তাঁদের চরণে ঋষি কবি জ্ঞানী সবার নমস্কার।
দুঃখী ব্যথিত পীড়িত মানুষে করিতে পরিত্রাণ
অত্যাচারীর লাঞ্ছনা হতে, ইঁহাদের সম্ভব।
লীলাময় বিধি মানুষের প্রেমে মানুষের রূপ ধরি'
রাজার প্রাসাদে অথবা গরিব ছুতারের কুঁড়ে ঘরে
আপনি স্বয়ং নামিয়া আসেন সহজ আকর্ষণে—
যুগে একবার হয় সম্ভব এমন আবির্ভাব।
কর্মে তাঁদের বিশ্বের পাপ ধুয়ে যায়, যায় মুছে।
জীবনাশ্রিত তাঁহাদেরই বাণী চলে ধর্মের নামে—
এক হতে দুয়ে দুই হতে দশে দশ হতে অর্বুদে
বাণী তাঁহাদের ধর্ম হইয়া মানুষে ধারণ করে।
প্রতি দিবসের কাজে তাঁহাদের তাঁহারা থাকেন বেঁচে
প্রতিদিনকার সহজ কথার মাঝে;
বাণীরূপ ধরি চিরজীবী হয় তাঁদের জীবনটাই।
শ্রীরামচন্দ্র কৃষ্ণ বুদ্ধ জিনগুরু মহাবীর
প্যালেস্টাইন ও আরবমরুতে খ্রীষ্ট-মুহম্মদ
পতিত মথিত শ্যামল-বঙ্গে প্রেমী চৈতন্যের

বাণী তাই আজো সত্য ও সুন্দর—
জীবনে সে বাণী সার্থক হ'ল ধন্য হইয়া কাজে
হিত মনোহর রূপ ধ'রে আছে আদর্শ আশ্রয়ে।

আমাদের এই ইটকাঠ-ঘেরা লোহা-ইস্পাত-যুগে—
এ বস্তুবাদী জড়বিজ্ঞান-যুগে,
বিশ্বধ্বংসী স্বার্থদুষ্ট হীন হিংসার যুগে—
অবতাররূপে ভারতে তাঁহার পরম আবির্ভাব।
দূর পশ্চিম সমুদ্রতীরে বৈশ্যের ঘরে তিনি
জন্ম নিলেন, মানবসেবার সুকঠোর ব্রতে নামি'
ধরণী হইতে মুছিয়া ফেলিতে হিংসার বিভীষিকা
হিংসার হাতে অনায়াসে তিনি দিলেন আত্মাহুতি।
মহামানবের সারা জীবনের কাজ
বাণীরূপ নিয়ে উজ্জ্বল হ'ল বিশ্বজগৎ মাঝে—
মস্তিষ্কের কোটরে বিধৃত জ্ঞানের বাণী তা নয়,
কবি-হৃদয়ের নহে তাহা উচ্ছ্বাস,
দর্শন নয়, ধ্যানাসনে পাওয়া অপৌরুষেয় বাণী
নয় তাহা নয়। বাণীর পাপড়ি মেলি
জীবন তাঁহার উঠেছে ফুটিয়া পদ্মের শোভা ধরি';
কবিতা ও গানে বাণী দুই-চারি আমরা স্মরণ করি'
নর-অবতার গান্ধীচরণে নিবেদি নমস্কার।

* * *

এক

নূতন ধর্ম প্রচার করিতে চাহি নি আমি,
গড়িয়া তুলিতে চাহি না নূতন সম্প্রদায়,
এই ভারতের আমি দীনহীন সেবার কামী
দেবতা হবার নাই এতটুকু অভিপ্রায়।
মানবজাতির সেবক হইতে বাসনা মোর,
খুশি হব যদি সেই কাজে ছেঁড়ে জীবন-ডোর।

দলের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে যেন কভু না নামি,
চাহি যে বহিতে যে আছে যেখানে সবার দায়।
নূতন ধর্ম প্রচার করিতে চাহি নি আমি
গড়িয়া তুলিতে চাহি না নূতন সম্প্রদায়॥

সত্যেরে আমি করেছি গ্রহণ জীবনে মম
আমার মতে,
জেনেছি জগতে অহিংসা পথ মহোত্তম—
চলি সে পথে।
নূতন সত্য প্রচারের দাবি নয় আমার,
প্রাচীন সত্য নূতন আলোকে করি প্রচার,
কর্মের মাঝে যাচাই করি তা দিবসযামী
বাণী মোর সদা কর্মধারায় স্ফূর্তি পায়।
নূতন ধর্ম প্রচার করিতে চাহি নি আমি
গড়িয়া তুলিতে চাহি না নূতন সম্প্রদায়॥

দুই

লিখিতে বসিয়া নাহি ভাবি আমি কি যে বলিয়াছি আগে
নাহিক লজ্জা যদি আগে পরে ঘটে কিছু গরমিল,
আমি মানি সেই সত্যে মনে যা লিখিবার কালে জাগে
সত্য হইতে সত্যেতে তাই বাড়িয়াছি তিল তিল।
কি বলেছি ভেবে স্মৃতির উপরে চাপাই না বৃথা ভার,
কাজের বেলায় অবাক হয়েছি ঘটে নি কোথাও গোল—
অর্ধশতক আগে যা বলেছি ভিত্তি টলে নি তার
আসল যা তাহা রয়েছে অটুট, বদলেছে শুধু খোল॥

তিন

অহিংসা আর সত্যেতে মোর বিশ্বাস বাড়ে প্রতিটি দিন
আমি বেড়ে যাই যত এই দুয়ে ক'রে চলি আমি অনুসরণ—
নিত্য নূতন অর্থের যোগে করে তারা মোর মনোহরণ
যত বাজে, হয় মধুরতর যে অহিংসা আর সত্য-বীণ॥

চার

ভুল যদি হয় গান্ধীবাদ   সমূলে হউক তা বরবাদ,
সত্য এবং অহিংসার   ক্ষয় নাই জেনো নাই ক্ষতি,
সম্প্রদায়ের পড়িলে ফাঁস   গান্ধীবাদের হোক বিনাশ
মোর নামে যেন স্পর্শে না   কভু গোঁড়ামির দুর্মতি ।

পাঁচ

পুঁথি দিয়ে হয় না প্রচার
জীবনে পালিতে হবে নীতি,
সে জেনেছে সত্যের সার
কাজে যার জন্মেছে প্রীতি ।

ছয়

মাহাত্ম্য মোর একটু বাড়ে না মহাত্মা বিশেষণে
আমি যে গান্ধী—সেই গান্ধীই আছি ;
মহত্ত্ব ব'লে আমি যা জেনেছি শুধু সেই আচরণে
সকলের মাঝে হয়তো রহিব বাঁচি ॥

সাত

এই জেনেছি সার,
আমার 'পরে দেন নি বিধি
ভবিষ্যতের ভার ।
ঘটবে কি যে আরো পরে
নাই ভাবনা তাহার তরে,
যা ঘটে এই বর্ত্তমানে
হিসাব রাখি তার ।
আমার 'পরে দেন নি বিধি
ভবিষ্যতের ভার ॥
দুর্ভেদ্য যে প্রাচীরখানি
সামনে আছে খাড়া
আশিস্ সম তারেই মানি
দিই না তাতে নাড়া ।

যেটুকু পথ সামনে পড়ে
সুগম হউক মোদের তরে,
ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলে
কাটবে অন্ধকার।
আমার 'পরে দেন নি বিধি
ভবিষ্যতের ভার॥

আট

দুষিছে আমারে সবে, মত্ত আমি স্বল্প পরিবেশে,
ভারতের এক প্রান্তে অতি ক্ষুদ্র নোয়াখালি-গ্রামে—
বিশাল সমুদ্র ছেড়ে কেন সঁপি গোষ্পদেতে মন!
ভারত-সমস্যা যদি প্রাণ দিয়ে মিটাইতে পারি
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ব যত স্বভাবত হবে অবসান।
আমি কিন্তু ভিন্ন মত অন্তরেতে করি যে পোষণ,
শিখেছিনু যার কাছে শিখেছিনু বালকবয়সে
ছোট বড় বৃথা ভেদ, যথা পিণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডেও তথা
সূক্ষ্ম পরমাণু-বুকে অন্তহীন বিশ্বের প্রকাশ।
যেখানে যখন থাকি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পরিবেশে
করি যদি নিজ কাজ চলি যদি সত্য-ন্যায়-পথে
তা হ'লে নাহিক ভয়, বিশ্ব মোর গ্লানিমুক্ত হবে।
যারা রহে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ মোর আশেপাশে
যারা করে মোর 'পরে অহরহ একান্ত নির্ভর
তাদের দুঃখের বোঝা ভালবেসে না নামাই যদি
বিশ্বের মহিমা কিছু বাড়িবে না আমার চেষ্টায়।
ছোট পরিবেশে সেবি যে না পারে করিতে কল্যাণ
তাহার বৃহৎ কর্ম চিরদিন হইবে বিফল॥

নয়

বাহিরে শত্রু—তাহারে করি না ভয়,
মনের অরিরে মানি যে ভয়ঙ্কর,

কাম-ক্রোধ আদি পাশবিক রিপুচয়
তাহাদের ভয়ে কম্পিত অন্তর।
শত্রু ইহারা মোর অন্তরচারী
শাসনে যদি বা স্ববশে রাখিতে পারি,
বাহিরের বাধা সহজে করিয়া জয়
আমিই হইব আমার ভাগ্যধর।
বাহিরে শত্রু—তাহারে করি না ভয়,
মনের অরিরে মানি যে ভয়ঙ্কর॥

কামনা-বাসনা দেহেরে নিয়ত টানে
মন দেহে থাকে বাঁধা,
সংযম-বশে যে থাকে না সজ্ঞানে
লাগে যে তাহারি ধাঁধা।
অতি মনোহর ধরার বাসনা-জালে
জড়াইলে নাই মুক্তি তো কোনো কালে;
মোর কিছু নয়—এই যার পরিচয়
তারেই সতত রাখেন যে ঈশ্বর।
বাহিরে শত্রু—তাহারে করি না ভয়,
মনের অরিরে মানি যে ভয়ঙ্কর॥

দশ

আমারে তিনি গেলেন ল'য়ে বুড়া দেউলছায়ে
খানিক খোলা জমি
দাঁড়িয়ে তথা আছিল সারি সারি
দুর্ভিক্ষের কবলে পড়া আধমরাদের দল
দেহেতে প্রাণ আছে কি নাই বুঝিতে হয় ভুল,
নৈরাশ্যের যেন সচল ছবি—
পাঁজরে হাড় সকলি যায় গনা
দেহের শিরা চোখেতে যায় দেখা,
নাহিক পেশী, মাংস নাই জীর্ণ দেহ 'পরে,

শুষ্ক আর কুঞ্চিত ত্বক শুধু
ঢাকিয়া আছে হাড় কখানি দেখিলে বোঝা যায় ;
চোখে তাদের নাইকো জ্যোতি বক্ষে নাই আশা
একটি শুধু কাম্য মনে—মরণ হবে কবে।
একটি মুঠা অন্ন যাহা দয়ার শুধু দান
তাহারি লাগি যা-কিছু ব্যাকুলতা।
ভুলিয়া গেছে কাজের কথা মূল্য-বিনিময়ে ;
করিত কাজ হয়তো তারা পাইলে ভালবাসা ;
একটি মুঠা দয়ার দান উদরে পুরি তাই
রাখিতে প্রাণ দিনের পর দিন—
লজ্জা ঘৃণা মনেতে নাহি জাগে।
মানুষ হয়ে জন্মেছে যে এহেন দুর্দশা
ঘটেছে তার ভাবিতে পারি নাকো,
অথচ এরা নারী-পুরুষ মোদেরি ভাইবোন,
ভীষণতম মৃত্যুমুখে ছুটেছে তিলে তিলে।
নিরুপায়েরা চিরটাকাল কাটায় উপবাসে
ইচ্ছাকৃত নয় সে উপবাস—
ভাগ্যগুণে যেদিন তারা ভাঙে সে অনশন,
মোদের সুখী জীবন তারা ঘৃণার চোখে দেখে ;
দরদী কোথা দেখিবে ইহাদেরে ?

এগারো

মৃত্যুর মাঝে জীবন মোদের
ধ্বংসের মাঝে বাস,
এক নিমেষেই পারে যে ঘটিতে
চরম সর্বনাশ।
আকাশ-সৌধ করি কল্পনা
মিছা আমাদের যত জল্পনা—
ভঙ্গুরতার বহিছে সাক্ষ্য
অতীতের ইতিহাস ;

মৃত্যুর মাঝে জীবন মোদের
ধ্বংসের মাঝে বাস ॥

অনিশ্চয়ের মাঝে নিশ্চয়
ধাতার আশীর্বাদ,
ঘুচিবে চকিতে সব সংশয়
তাঁর যদি হয় সাধ।
সঁপিয়া নিজেরে চরণে তাঁহার
যদি কাঁধে নিই কর্মের ভার
সার্থক হবে জীবন—ঘুচিবে
মৃত্যুর মহাত্রাস।
মৃত্যুর মাঝে জীবন মোদের
ধ্বংসের মাঝে বাস ॥

বারো

বিবর্তন ও বিপ্লব আছে প্রয়োজন উভয়ের,
মানবজাতির উন্নতি মূলে দুয়ের সমান দান।
মোদের জীবনে মৃত্যু অমোঘ সত্য চিরন্তন
অমোঘ সত্য হ'লেও মৃত্যু বিপ্লব ঘোরতর।
জন্ম এবং জীবন-ধারণ ক্রমিক বিবর্তন
জন্ম হইতে মৃত্যুর মাঝে গতি তার অতি ধীর।
জন্মের পরে মৃত্যু না হ'লে মানবাত্মার গতি
থামে মাঝপথে—মর্ত্যজনের দুইই তাই প্রয়োজন।
এই জগতের সেরা বিপ্লবী আপনি যে ঈশ্বর,
প্রলয়-বন্যা তাঁহারই সৃষ্টি, তিনিই তোলেন ঝড়—
যেখানে শান্তি মুহূর্ত আগে সেথা হয় তোলপাড়।
তিলে তিলে অতি সযত্নে গড়া বিরাট নগাধিরাজে
এক নিমেষেই ধূলিসাৎ করি' সীমাহীন প্রান্তর
তিনিই করিতে পারেন সৃজন—সর্বশক্তিমান।
দেখেছি শান্ত নভোমণ্ডল—যত দেখিয়াছি তত

মন ভ'রে গেছে স্রষ্টার প্রতি বিস্ময়ে শ্রদ্ধায়,
সেই নীলাকাশ আলোড়িত হতে দেখেছি ঝঞ্ঝাবায়ে
মেঘে বিদ্যুতে বর্ষণে আর মুহুর্মুহু গর্জনে
পাগল হইয়া ধীরা প্রকৃতির দেখিয়াছি মাতামাতি,
দেখেছি স্বদেশে দেখেছি বিদেশে আমি
স্তম্ভিত ভয়ে দেখিয়াছি বহু বার।
এই বিদ্রোহ বিপ্লব আসে সৃষ্টিরই প্রয়োজনে,
বহু বিপ্লবে ভারাক্রান্ত মানুষের ইতিহাস—
জন্ম এবং মৃত্যু দোলায় দুলি মোরা অবিরাম।

[যাঁহারা গান্ধীজীর বাণীগুলি মূলে দেখিতে চান, তাঁহারা শ্রীনির্মলকুমার বসু সংকলিত *Selections from Gandhi* (Navajivan Publishing House, Ahmedabad) পুস্তকে ক্রমিক সংখ্যা-চিহ্নিত এই স্তবক-(passage)-গুলি দেখিতে পারেন—১—I II, ২—III, ৩—VII, ৪—VII, ৫—VIII, ৬—X, ৭—26, ৯—45, ১০—186, ১১—27, ও ১২—27। ৮-সংখ্যক বাণীটি 1947 সালের *Harijan*, p. 241]

বৃদ্ধ হিন্দুর আশা

[১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত এই রচনাটি সম্পর্কে রাজনারায়ণ স্বয়ং এইরূপ লিখিয়াছেন—

"আমি ইংরাজী ১৮৭৯ সালে দেওঘরে আসি, আসিবার এক বৎসর পরে এই পুস্তিকা ইংরাজীতে লিখিতে আরম্ভ করি। অদ্য (১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬) তিন বৎসর হইল ওই প্রস্তাব বাংলাতে অনুবাদ করিয়া নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশ করি। নবজীবনে প্রকাশিত প্রস্তাব শ্রীযুক্ত কুমার নীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি উহার ইংরাজী মূল প্রদেশীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত শ্রীরাজাগুডে নারায়ণ গজপতি রাও গারুর কূল্যে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তিকা সকল শ্রেণীর হিন্দুই পছন্দ। প্রচলিত হিন্দুধর্ম প্রচারক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, কুমার নীলকৃষ্ণ বাহাদুর, দ্বারভাঙ্গার বাবু চন্দ্রশেখর বসু, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্যারিষ্টার

মনোমোহন ঘোষ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি এই পুস্তিকার প্রশংসা করিয়াছেন।...ঈশ্বরেচ্ছায় সাকারবাদী হিন্দু ও নিরাকারবাদী হিন্দু উভয় প্রকার হিন্দুর সমবেত যত্নে যদি কখন মহাহিন্দু-সমিতি ভারতবর্ষে সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে।" ('আত্ম-চরিত' পৃ. ৯৪-৯৫)। গ্রন্থপ্রচারের মূল উদ্দেশ্য গ্রন্থকার প্রচ্ছদপটে একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রকট করিয়াছেন। শ্লোকটি এই—

"স্বল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা।
তৃণৈর্বগুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।"

এই প্রসঙ্গে এইবারের "সংবাদ-সাহিত্য" দ্রষ্টব্য।—স. শ. চি.]

ভূমিকা

অমরবৃন্দ কর্ত্তৃক স্তুত সকল হিন্দু শাস্ত্রে কীর্ত্তিত সকল হিন্দুর পরমারাধ্য পরব্রহ্মের উপর নির্ভর করিয়া, এই মহাহিন্দু-সমিতির প্রস্তাবনা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এক্ষণে সেই অক্ষয় পরম বেদিতব্য বিশ্বের পরম নিধান হিন্দুর চিরন্তন পৈতৃক দেবতার নামে সকল হিন্দু সম্মিলিত হউন, তাঁহার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।

এই প্রস্তাব গত শ্রাবণ মাসে নবজীবন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এক্ষণে তাহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইল।

মুসলমানদিগের যেমন National Mahommedan Association নামে জাতীয় সভা, ভারতপ্রবাসী ইংরাজদিগের যেমন Anglo-Indian Defence Association নামক জাতীয় সভা, ফিরিঙ্গীদিগের Eurasian and Anglo-Indian Association নামক যেমন জাতীয় সভা আছে, আমাদিগের ইচ্ছা সেইরূপ হিন্দুদিগের একটী জাতীয় সভা সংস্থাপিত হয়। যে প্রয়োজন দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া, ঐ ঐ জাতি ঐ ঐ জাতীয় সভা সংস্থাপন করিয়াছে, সেইরূপ প্রয়োজন হিন্দুদিগের অনেক আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দুদিগের উন্নতি সাধন করা সভার উদ্দেশ্য হইবে। মধ্যে মধ্যে এমন এক একটী কার্য্য গবর্ণমেণ্ট করিয়া বসেন যে, তদ্দ্বারা হিন্দুদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বত্ব ও অধিকারের উপর হস্তার্পণ হয়। সম্প্রতি এইরূপ একটী ঘটনা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট, পুরীর রাজার হস্ত হইতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের উপর তাঁহার বংশপরম্পরাগত

কর্ত্তৃত্ব কাড়িয়া লইয়াছেন।* ভারতবর্ষীয় সকল হিন্দুদিগের একটী সমিতি থাকিলে, যদি তাহা হইতে উক্ত অপহরণের প্রতিবাদ হইত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সমীপে তাহার কথার যেমন জোর হইত, এমন আর কিছুতেই হইবে না। কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দুঃখ নিবারণ জন্য এরূপ সমিতি সংস্থাপন করা যে আবশ্যক হইতেছে এমত নহে। দেববাণী সংস্কৃতের চর্চ্চা ভারতবর্ষে একপ্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলে হয়। সরস্বতী দেবী এক্ষণে গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া, রাইন নদীর উপকূলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমাদিগের যুবকদিগের ক্রমশঃ শারীরিক অবনতি হইতেছে। আমাদিগের বিদ্যালয় সকলে ধর্ম্মশিক্ষা না থাকা প্রযুক্ত যুবকদিগের নৈতিক অবনতি হইতেছে। তজ্জন্য এক্ষণকার লোকেরা ক্রমশঃ সংশয়বাদী, স্বার্থপর ও ইউরোপীয় বিলাসানুরাগী হইতেছে। আমাদিগের দেশের লোকে ক্রমশঃ পানাসক্ত হইতেছে। ভারতবর্ষে দিন দিন দরিদ্রতার বৃদ্ধি হইতেছে। এমন কি গবর্ণমেণ্ট সম্প্রদায়ের একজন† নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে পঁচিশ কোটী লোকের মধ্যে পাঁচ কোটী অর্দ্ধাসনে দিন যাপন করে। আমাদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল—এমন কি সামান্য দেশালাইটী পর্য্যন্ত বিলাত হইতে আমদানী করিতে হয়। ভারতবর্ষের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, যদি আমাদিগের স্বদেশীয় রাজা থাকিত, তবে এই দুরবস্থার প্রতিকার হইত। যখন তাহা হয় নাই, তখন সাধারণবর্গের সমবেত চেষ্টা দ্বারা তাহা হওয়া কর্ত্তব্য। হে হিন্দু মহোদয়গণ! আপনারা এই দারুণ দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য কি কোন চেষ্টা করিবেন না? আপনারা কি আলস্য নিদ্রায় চিরকাল যাপন করিবেন? পুরাকালে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে হিন্দু জাতির যে অগ্রণীপদ ছিল, সেই অগ্রণী পদে তাহাকে পুনঃস্থাপিত করিতে কি আপনারা সচেষ্ট হইবেন না? চিরকাল পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে কি এ কার্য্য কখন সাধিত হইতে পারে? গবর্ণমেণ্টের উপর সকল বিষয়ে এত নির্ভর করেন কেন? আপনারা কি এমন প্রত্যাশা করেন যে, যে অন্ন আপনারা ভক্ষণ করেন, তাহা গভর্ণমেণ্ট আপনাদিগের মুখে তুলিয়া

* পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের উপর পুরীর রাজার বংশপরম্পরাগত কর্ত্তৃত্বের উপর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের হস্তার্পণের যে কথা ভূমিকাতে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই প্রস্তাব মুদ্রিত হইবার সময় তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করেন।

† Sir W. W. Hunter.

দিবেন? তাঁহারা বিদেশীয় লোক। আপনারা কি প্রত্যাশা করেন যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল আপনাদিগেরই উপকার করিতে থাকিবেন? এমন নিষ্কাম ধর্ম্ম তাঁহাদিগের নিকট হইতে কখনই প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

হিন্দুদিগের উন্নতি সাধনার্থ কোন সভা করিতে গেলে তাহা ধর্ম্মমূলক করা চাই, যেহেতু হিন্দুরা অতি ধর্ম্মপরায়ণ জাতি। হিন্দু ধর্ম্মের নিয়মানুসারে আহার করে, ধর্ম্মের নিয়মানুসারে পান করে, ধর্ম্মের নিয়মানুসারে বেড়ায়, ধর্ম্মের নিয়মানুসারে নিদ্রা যায় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু কোন পত্র লিখিতে গেলে ঈশ্বরের নামে পত্র আরম্ভ করে। হিন্দু কোনখানে যাইতে হইলে, ঈশ্বরের নাম করিয়া বেরোয়। পৃথিবীতে কোন্ জাতি এমন ধর্ম্মপরায়ণ আছে? ইংলণ্ডের লোক যেমন "অগ্নিস্থান ও গৃহ" (Hearth and Home) বলিলে, কিম্বা জর্ম্মেনেরা পিতৃভূমি (Fatherland) বলিলে, যেমন উন্মত্ত হইয়া উঠে, তেমনি হিন্দুরা ধর্ম্মের নামে উন্মত্ত হইয়া উঠে। হিন্দু জাতির উন্নতি সাধনার্থ কোন সভা যদি ধর্ম্মমূলক না করিয়া সংস্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে বুনিয়াদশূন্য ও গাঁথুনিশূন্য অ'ল্গা ইষ্টকের বাড়ী যেমন প্রবল বায়ুর প্রথম ঝট্‌কাতে পড়িয়া যায়, তেমনি সভা বিধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনা। এই জন্য মহা-হিন্দু-সমিতিকে ধর্ম্মমূলক করা হইয়াছে। এই জন্য এইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে যে, ঈশ্বরের স্তব করিয়া সভা আরম্ভ হইবে এবং কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত দেব পূজা উপলক্ষে যে সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে, কারণ ভারতমাতার হিতার্থ একত্রিত হওয়া অপেক্ষা কোন্ ধর্ম্মক্রিয়া শ্রেষ্ঠতর?

মহাহিন্দু-সমিতি সংস্থাপন করিতে গেলে হিন্দু কাহাকে বলা যায়, তাহা নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। হিন্দুয়ানী খাওয়াদাওয়ার উপর নির্ভর করে না, এই কথা বলিলে পাঠকবর্গ বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার ন্যায় প্রমাণ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালী হিন্দুরা বন্যশূকর-মাংস ভক্ষণ করে না, রাজপুত হিন্দুরা করিয়া থাকে। বাঙ্গালী হিন্দুরা কুক্কুট-মাংস ভক্ষণ করে না—কিন্তু ব্রাহ্মণ ছাড়া মান্দ্রাজের সকল হিন্দুরা তাহা খাইয়া থাকে। পাঞ্জাবের শিখ হিন্দুরাও ঐরূপ করে। ইহা সকলেই জানেন যে, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমানদিগের সহিত ব্যবহারে হিন্দুদিগের পান পানির

আয়েব নাই। কাশ্মীরের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা বাজার হইতে মুসলমান ভৃত্য দ্বারা রুটি মাংস ক্রয় করিয়া আনাইয়া ভক্ষণ করেন, কেবল পরিবেশন সময়ে স্বজাতীয় লোকে হাতে করিয়া দেয়। তবে আহার সম্বন্ধে এক বিষয়ে নিয়মের কাঠিন্য আছে সন্দেহ নাই। গো-খাদককে কখনই হিন্দু বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, খাওয়াদাওয়ার উপর হিন্দুত্ব নির্ভর করে না। হিন্দুত্ব পরিচ্ছদের উপর নির্ভর করে না। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী হিন্দুদিগের পরিচ্ছদ ভিন্ন ভিন্ন। হিন্দুত্ব রীতিনীতির উপরেও তত নির্ভর করে না। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের রীতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন। ব্রাহ্মণদিগের কুশণ্ডিকা করিয়া বিবাহ ও বৈষ্ণবদিগের কণ্ঠি বদল করিয়া বিবাহ করা কত ভিন্ন, কিন্তু উভয়েই হিন্দু। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল হিন্দু জাতির কতকগুলি সাধারণ আচার ব্যবহার আছে। হিন্দুত্ব ধর্ম মতের উপর নির্ভর করে না। শাক্ত বৈষ্ণবের মধ্যে মতের প্রভেদ কত! সাধারণ হিন্দুর মত জৈন সম্প্রদায়ের মত হইতে কত বিভিন্ন, কিন্তু জৈনেরা হিন্দু। তবে হিন্দুত্ব কিসের উপর নির্ভর করে? যে যে বিষয়ের উপর হিন্দুত্ব নির্ভর করে, তাহা পশ্চাৎ উল্লিখিত হইতেছে। প্রথমতঃ ভারতীয় আর্য্যবংশোদ্ভব না হইলে হিন্দু বলা যায় না। অন্যান্য আর্য্য জাতির যে সকল শারীরিক লক্ষণ আছে, ভারতীয় আর্য্যদিগের তাহা আছে, তদ্দ্বারা তাহাদিগকে অনার্য্য জাতি হইতে পৃথক করা যায়। ভারতীয় আর্য্যেরা যে সকল জাতিকে আর্য্য শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত করিয়াছে, তাহাদিগকেও আর্য্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে যথা—মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ ছাড়া নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা ও যে সকল সাঁওতাল হিন্দু ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যে জাতি রামায়ণ ও মহাভারত ও অষ্টাদশপুরাণ জাতীয় পুরাকালীন ইতিহাস অথবা প্রবাদভাণ্ডার বলিয়া মান্য করে না, তাহাকে হিন্দুজাতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। তৃতীয়তঃ যে জাতির আদি ভাষা সংস্কৃত ও আধুনিক ভাষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন কোন ভাষা অথবা যে ভাষা আদৌ সংস্কৃত নহে, কিন্তু যাহাতে প্রচুররূপে সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, এমন কোন ভাষা—যেমন মাদ্রাজের ভাষা—সে জাতি হিন্দুজাতি। চতুর্থতঃ যাহারা হিন্দু তাহারা সংস্কৃত নাম অথবা সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন কোন নাম ধারণ করে। পঞ্চমতঃ যাহারা পরব্রহ্মকে অথবা কোন দেব অথবা দেবীকে পরব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, তাহারা হিন্দু।

পরব্রহ্মই হিন্দুদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা। এক স্থলে মাত্র এই নিয়মের ব্যভিচার আছে। জৈনেরা পরব্রহ্মের উপাসনা করে না, কিন্তু তাহারা হিন্দু। তাহাদিগের প্রধান দেবতা তীর্থঙ্কর, কিন্তু তীর্থঙ্কর সংস্কৃত নাম। জৈনেরা হিন্দু দেবদেবীকে তীর্থঙ্করের নিম্নপদস্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু যাহা হউক হিন্দু দেবতাতে বিশ্বাস থাকা প্রযুক্ত তাহারা হিন্দু বলিয়া গণ্য হয়। এই এক ব্যভিচারস্থল ব্যতীত পরব্রহ্মই হিন্দুদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা। হিন্দুদিগের ধর্ম্মমত ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম এক।

আমি আমার প্রস্তাবে ব্রাহ্মদিগকে এবং বিলাতফেরত ব্যক্তিদিগকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করিয়াছি। যখন পরব্রহ্মকে সকল হিন্দুশাস্ত্র কীর্ত্তন করিতেছে এবং পরব্রহ্মই হিন্দুদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা, তখন যাহারা তাঁহার বিশেষ উপাসক, তাহাদিগকে কেন হিন্দু বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না, ইহা বুঝিতে পারি না। হিন্দুশাস্ত্রে নিরাকার উপাসনা শ্রেষ্ঠাধিকার এবং সাকার উপাসনা কনিষ্ঠ অধিকার বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ব্রাহ্মেরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক তাঁহারা হিন্দু বলিয়া কেন গণ্য হইবেন না, তাহা বলিতে পারি না। যখন কবিরপন্থী, দাদুপন্থী, নানকপন্থী, শিখ, সাধ, চৈতন্যমতাবলম্বী বৈষ্ণব বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে অনন্তকুল বৈষ্ণব, যাঁহারা জাতিভেদ আদোবে স্বীকার করেন না, যখন জৈনেরা পর্য্যন্ত—যাঁহাদিগের প্রধান উপাস্য দেবতা সাধারণ হিন্দুর উপাস্য কোন দেবতা নহে, ইহারা পর্য্যন্ত যখন হিন্দু বলিয়া গণ্য হয়েন, তখন ব্রাহ্মেরা কেন হিন্দু বলিয়া গণ্য হইবেন না? যে সকল বিলাতফেরত ব্যক্তি হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে বিবাহাদি গার্হস্থ্য ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাঁহারা হিন্দু বলিয়া কেন গণ্য হইবেন না তাহাও বুঝিতে পারি না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গোখাদক কখনই হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহা যথার্থ কথা। কিন্তু আমরা জানি যে, যাঁহারা ইংরাজী খানা খান, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ গোখাদক নহেন। কোন বিশেষ হিন্দু বিলাতে গরু খাইয়াছেন কি না, কিম্বা এখনও খান কি না, সে বিষয়ে আমাদিগের খানাতল্লাসী করা কর্ত্তব্য নহে। প্রস্তাবিত মহাহিন্দু-সমিতির একটী নিয়ম এই যে, সমিতি গোরক্ষণে ও গোজাতির উন্নতি সাধনে যত্নবান হইবেন। এই নিয়ম জানিয়াও যে ব্যক্তি সমিতির সভ্য হইবেন, তাঁহাকে গোরক্ষায় যত্নবান, অতএব গোখাদক নহে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

মহাহিন্দু-সমিতিতে যোগ দেওয়ার প্রতি কোন হিন্দু কোন আপত্তি করিতে পারেন না, বিশেষতঃ যখন উহাতে খাওয়াদাওয়ার কোন ব্যাপার নাই।

আমাদিগের সকলেরই এই কথা হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, **আমরা যতই লইব ততই বাঁচিব, আর যতই ছাঁটিব ততই মরিব।**

ফাল্গুন, ১২৯৩ সাল। বৃদ্ধ হিন্দু

মহাহিন্দু-সমিতি নামে একটী মহাসমিতি সংস্থাপনের সূচনা।

"ছিন্ন, ভিন্ন, হীনবল,
ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল
করিতে কি ভয় ?"
জাতীয় সঙ্গীত।

(১) কেবল হিন্দুরা মহাহিন্দু-সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। যে কেহ হিন্দুকুলোদ্ভব ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মেতে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবেন তিনিই এই সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন। হিন্দুরা দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত; নিরাকারবাদী ও সাকারবাদী। বৈদান্তিক ও ব্রাহ্ম নিরাকারবাদী হিন্দু। হিন্দুসমাজের অধিকাংশ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে আন্তরিক বিশ্বাস না থাকুক, তথাপি যখন তাঁহারা বিবাহাদি গার্হস্থ্য ক্রিয়াতে প্রচলিত হিন্দু পদ্ধতির অনুসরণ করেন, তখন হিন্দু-সমাজের যেমন অন্যান্য শ্রেণীর লোকদিগকে হিন্দু বলিয়া গণ্য করা যায়, সেইরূপ হিন্দু তাঁহাদিগকেও গণ্য করা কর্ত্তব্য। বিলাত-ফেরত হিন্দুরা ইংরাজীতে কৃতবিদ্য এই দলভুক্ত। সকল প্রকার হিন্দু এই মহাহিন্দু-সমিতির সভ্য হইতে পারেন।

(২) হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা, হিন্দুদিগের জাতীয় ভাব উদ্দীপন করা এবং সাধারণতঃ হিন্দুজাতির উন্নতিসাধন করা মহাহিন্দু-সমিতির উদ্দেশ্য। হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিষয়ে স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। ধর্ম্ম যেমন হিন্দুদিগের প্রিয় পদার্থ, এমন আর কিছুই নহে। মহাত্মা রামগোপাল ঘোষের সময়ে নিমতলার ঘাটে শবদাহ বিষয়ক এবং বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবাসসময়ে শালগ্রাম শিলার অবমাননা উপলক্ষে যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহাতে ইংরাজীতে শিক্ষিত হিন্দু ও ব্রাহ্মেরা

সাধারণ হিন্দুদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ধর্ম্ম যেমন হিন্দুদিগের প্রিয় পদার্থ এমন আর কিছুই নহে এবং হিন্দুসমাজে কোন সম্প্রদায়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অধিকারের প্রতি হস্তার্পিত হইলে, সমস্ত হিন্দুসমাজ সমবেত হইয়া যেন একটী মনুষ্যের ন্যায় কার্য্য করে।

(৩) দ্বিতীয় পেরাগ্রাফের প্রথমে উল্লিখিত উদ্দেশ্য সকল সাধন করিবার জন্য মহাহিন্দু-সমিতি ভারতবর্ষস্থ সকল হিন্দুজাতির ঐক্যসাধন নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন। ইংরাজী ১৮৫৭ সালে করুণাময়ী শ্রীশ্রীমতী ভারত-সাম্রাজ্যেশ্বরী দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের রাজ্যভার-গ্রহণ উপলক্ষে তিনি যে মহা ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন, বিনীত অথচ আশ্বাসিত চিত্তে তাহার উপর নির্ভর করিয়া সমিতি উক্ত কার্য্য সাধন করিবেন। ইহা যথার্থ যে, হিন্দুদিগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অথবা জাতিভেদ সম্বন্ধীয় বৈচিত্র্য আছে। কিন্তু এক রাজার অধীন হওয়াতে রাজভক্তিতে ও রাজনৈতিক উন্নতির আশাতে সকল হিন্দুর ঐক্য আছে। এতদিন উক্ত ঐক্য নিগূঢ়রূপে বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে উক্ত রাজকীয় মহৎপত্রী সমস্ত হিন্দুজাতির দৃষ্টিসম্মুখে সেই ঐক্য জাজ্বল্যমানরূপে আনয়ন করিয়াছে। এক্ষণে সকল হিন্দু-সম্প্রদায় ও জাতি পরস্পর সদ্ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, এবং উক্ত রাজকীয় মহাপত্রী অনুসারে ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে এবং সাংসারিক উন্নতি ও সৌভাগ্যের সম্যক্ আশা লাভ করিয়াছে। এক্ষণে তাহারা অনায়াসে জাতীয় উন্নতি সাধন করিবার জন্য আপনাদিগের মতবিভেদ ও জাতি-বিভেদ ভুলিয়া ঐক্য ভাবে কার্য্য করিতে পারে। ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বর সকল হিন্দুর উপাস্য, তিনি আত্মার আত্মা ও হৃদিস্থিত, ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবী তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণের অথবা গুণের রূপকমাত্র। ঈশ্বর আত্মার আত্মা ও হৃদিস্থিত, এভাব অন্য কোন ধর্ম্মে নাই, কেবল হিন্দুধর্ম্মে আছে। হিন্দুধর্ম্মের এই সাধারণ ভাব, হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার যাহা ভারতবর্ষের সকল হিন্দু জাতির আছে, হিন্দুদিগের সাধারণ গৌরব-সূচক পুরাকালের মহিমার প্রবাদ—এই সকলকে পত্তন-ভূমি করিয়া, ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দু জাতির উল্লিখিত ঐক্য সাধন হইতে পারে। প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও উক্ত মহিমার প্রবাদ সকল অবলম্বন করিয়া পতিত জাতি উত্থিত হইতে সমর্থ হয়। আমাদিগের মুসলমান ভ্রাতাদিগের সহিত উক্ত ঐক্য সাধন হইতে পারে না, যে হেতু তাঁহাদিগের ধর্ম্ম আচার ব্যবহার, পুরাব

আমাদিগের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, পুরাকালীয় প্রবাদ হইতে বিভিন্ন। কিন্তু যখন আমরা একদেশবাসী ও এক রাজার অধীন, তখন তাঁহাদিগের সহিত অন্য ঐক্য না হউক, রাজনৈতিক ঐক্য অবশ্য সাধিত হইতে পারে। ইহার প্রমাণ, সুরেন্দ্র বাবুর কারাগার-গমন সময়ে মহারাজনৈতিক আন্দোলন এবং লর্ড রিপণের বিলাত গমন সময়ে তাঁহার অভিনন্দনে হিন্দুমুসলমানের ঐক্য। আমাদিগের সহিত মুসলমান ভ্রাতাদিগের ধর্ম্ম-বিষয়েও একপ্রকার ঐক্য সাধন হইতে পারে। সুরেন্দ্র বাবুর কারাগার উপলক্ষে জজ্ নরিস কর্ত্তৃক শালগ্রাম শিলার অবমাননা লইয়া যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহাতে উক্ত অবমাননার কার্য্য দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বত্ব ও অধিকার আক্রমণ করা হইয়াছে মনে করিয়া তাহার প্রতিবাদার্থ মুসলমানেরা হিন্দুর সহিত এক হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে পাটনা নগরে কোন মৌলবী উক্ত আক্রমণের বিপক্ষে বক্তৃতা করিতে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। এ প্রকার ঐক্যসাধন ব্যতীত মুসলমানদিগের সহিত হিন্দুদিগের গাঢ় সম্মিলন পূর্ব্বে উল্লিখিত কারণ সকল জন্য অসম্ভব। কিন্তু হিন্দুদিগের বিশেষ অধিকার ও বিশেষ প্রিয় বস্তু রক্ষা জন্য তাঁহাদিগের এইরূপ সম্মিলন হওয়া আবশ্যক। এই সূচনাপত্রের প্রণেতা হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। মহাদেশ-সাধারণ-সভা (National Congress) এবং প্রজাসমিতিতে (Mass-meeting) এই প্রকার ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত বিশেষ সম্মিলন হওয়া অসম্ভব। যে প্রণালীতে মহাহিন্দু-সমিতি সংস্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে, এইরূপ প্রণালী অনুসারে তাঁহাদিগের জাতীয় ভাবানুযায়ী আমাদিগের মুসলমান ভ্রাতাদিগের দ্বারা একটি মহা-মুসলমান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং এই উভয় সমিতি রাজনৈতিক আন্দোলনে একত্র কার্য্য করিতে পারে। মুসলমানদিগের সহিত রাজনৈতিক ঐক্যসাধনবিষয়ে জাতিগত প্রতিবন্ধক থাকিতে দেওয়া উচিত হয় না। আবার এদিকে আমাদিগের স্বজাতির অর্থাৎ হিন্দুজাতি উন্নতি জন্য যদি আমরা একটি সমিতি স্থাপন করা অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করি; মুসলমান ভ্রাতাদিগের সহিত গাঢ় সম্মিলন অসম্ভব বলিয়া মহাহিন্দু-সমিতি সংস্থাপন না করা বিধেয় নহে। সকল দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। আমাদিগের সকল কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্য হওয়া

(৪) মহাহিন্দু-সমিতির একটি জাতীয় ধ্বজা থাকিবে,* তাহাতে "ঈশ্বর ও মাতৃভূমি" এই বাক্য অঙ্কিত থাকিবে। এই বাক্যের নিম্নে একটি পদ্ম-পুষ্পের প্রতিকৃতি থাকিবে। পদ্মপুষ্প এ দেশে ঈশ্বরের সৃজন-শক্তি এবং দেব-পূজার সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ গণিত হইয়া থাকে। ইহা হিন্দু দেবদেবীর পৌরাণিক ইতিবৃত্তের সহিত সহস্র প্রকারে জড়িত রহিয়াছে। উহা এই দেশের ভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপও গণ্য হইতে পারে। যেমন গোলাপ পুষ্প ইংলণ্ডের চিহ্ন, মিসেলটো পুষ্প স্কটলণ্ডের চিহ্ন, শ্যামরক পুষ্প আয়র্লণ্ডের চিহ্ন, স্থলপদ্ম ফ্রান্সের চিহ্ন, তেমনি পদ্ম ভারতবর্ষের চিহ্নস্বরূপ গণ্য হইতে পারে। মহাহিন্দু-সমিতির প্রত্যেক সভ্য উক্ত সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও মহাবাক্য নিজ নিজ অঙ্গুরীয়ের উপর অঙ্কিত করিয়া তাহা ধারণ করিবেন। এইরূপ অঙ্গুরী ধারণ মহাহিন্দু-সমিতির সভ্যের একটি প্রধান লক্ষণ হইবে।

(৫) হিন্দুদিগের মতে সকল বিষয়েরই ধর্ম্মের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে। মহাহিন্দু-সমিতির অধিবেশনে হিন্দুসমাজের সকল প্রকার উন্নতি অর্থাৎ হিন্দুদিগের ধর্ম্ম শরীর, মন, নীতি, রাজনীতি, কৃষি এবং শিল্প সম্বন্ধীয় উন্নতি-বিষয়ক প্রস্তাব বিবেচিত হইবে। ধর্ম্মবিষয়ে কেবল সাধারণ হিন্দুবর্গের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সাধারণ স্বত্ব ও অধিকার বিষয়ক প্রস্তাব বিবেচিত হইবে। সাম্প্রদায়িক বিষয়ে যেমন ঘোরতর মনোবাদকারী তর্ক উঠিবার সম্ভাবনা, এই সাধারণ স্বত্ব ও অধিকার বিষয়ে সেরূপ তর্ক উঠিবার সম্ভাবনা নাই। সামাজিক বিষয় আদবে বিতর্কিত হইবে না। যেহেতু উহা হিন্দুসমাজের মধ্যে ঘোরতর বিবাদস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উহা আলোচনা করিতে গেলে সভ্যদিগের মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। সমাজসংস্কার কার্য্য স্বতন্ত্ররূপে সমাজসংস্কারকের হস্তে অর্পিত হওয়া কর্ত্তব্য। উক্ত বিষয় সকল সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠের পর প্রবন্ধের বিষয় লইয়া তর্ক হইবে। প্রস্তাব পাঠ ও তর্ক ব্যতীত

* "Patriotism, the life flowing out of national instincts, is one of the characteristic types of true spiritual life in a nation; and from this point of view, a banner, a flag, a color, an emblem of any kind that has become associated with a nation, must always be sacred. That nation is near destruction, if not already destroyed, that has no outward symbol of its unity round which and under which its sons can gather."

The "Dawn" quoted in the "Liberal" 9th April, 1884.

সমিতিতে এমন সকল বক্তৃতা পাঠ করা হইবে, যাহা ভারতের পূর্ব্ব-মহিমার স্মৃতি সভ্যদিগের মনে জাগরিত করিয়া এবং ভারতের বর্ত্তমান অনুন্নত অবস্থার প্রতি তাঁহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া, তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ ও জাতীয় ভাব অবতারিত এবং ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুজাতিদিগের মধ্যে ঐক্য সাধন করিতে পারে।

বক্তৃতার নমুনা

"হিন্দু নাম আমরা কখনই পরিত্যাগ করিতে পারি না। হিন্দু নামের সঙ্গে কত হৃদয়গ্রাহী ও মনোহর ভাব জড়িত রহিয়াছে। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই সরস্বতী-নদী-তীর-বাসী আদিম আর্য্যদিগের বরণীয় মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়, যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত মনুষ্যের নিকট সম্বন্ধ অনুভব করিয়া বলিয়া গিয়াছেন,—"ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং হি নো মাতা" "সখা পিতা পিতৃতমঃ পিতৃণাম্," "স্বাদু সখ্যং সাধ্বী প্রণীতি" "ত্বং অস্মাকং তবাস্মি।" "তুমি আমাদিগের পিতা, তুমি আমাদিগের মাতা" "তুমি সখা পিতা, পিতৃগণের মধ্যে পরম পিতা," "তোমার বন্ধুতা অতি সুস্বাদু, তুমি আমাদিগের, আমরা তোমার।" হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই তিত্তির ঋষির বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়া গিয়াছেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যোবেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।" "যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে আপনার হৃদয়াকাশে স্থিত বলিয়া জানেন, তিনি সেই জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত সকল কামনা উপভোগ করেন।" হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই বরণীয় আর্য্যমূর্ত্তি মাণ্ডুক্য আসিয়া উপস্থিত হয়েন, যিনি বলিয়াছেন, "শান্তং শিবমদ্বৈতং" "তিনি শান্তস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ এবং অদ্বৈতস্বরূপ।" যখন আমরা এই হিন্দু নাম উচ্চারণ করি, তখন আমাদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর জটাকলাপধারী ব্যাসের বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া আবির্ভূত হয়, যিনি বলিয়াছেন, "আত্মনঃ প্রতিকূলানি পরেষাং ন সমাচরেৎ।" "আপনার মঙ্গলের যাহা প্রতিকূল, পরের প্রতি তাহা করিবে না।" যখন আমরা এই হিন্দুনাম উচ্চারণ করি, তখন আমাদিগের মনের সম্মুখে মধুর স্বভাব অথচ স্বাধীনাত্মা বশিষ্ঠের বরণীয় মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, যিনি বলিয়াছেন "যুক্তিযুক্তং উপাদেয়ং বচনং

বালকাদপি অন্যৎ তৃণামিব ত্যজ্যমপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা।" "বালক যদি যুক্তিযুক্ত বাক্য বলে, তাহা উপাদেয়; আর স্বয়ং ব্রহ্মা যদি অযুক্তিযুক্ত বাক্য বলেন, তাহাও তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।" হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে, আমাদের মনশ্চক্ষু সম্মুখে সেই নবীন দূর্ব্বাদলশ্যাম ধীর প্রশান্তমূর্ত্তি আবির্ভূত হয়েন, যিনি পিতৃসত্যপালন নিমিত্ত চতুর্দ্দশ বৎসর কাল অরণ্যে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন ও সংযত মনের এবং পরস্পর বিপরীত গুণের সামঞ্জস্যের সর্ব্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, আমাদের মানসক্ষেত্রে সেই নন্দের নন্দন বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হয়েন, যিনি জ্ঞানীর শিরোমণি, প্রেমিকের শিরোমণি, যিনি ধর্ম্মবক্তার প্রধান, যাঁহার কথিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সকল কালের সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুকর্তৃক বেদের পরেই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মান্য হইয়া আসিতেছে, এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার কালেও ভারতবর্ষে ও ইয়ুরোপখণ্ডে উভয়ত্রই স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছে, যিনি ভক্তি ও প্রেমধর্ম্মের সংস্থাপক অথচ রাজনীতিজ্ঞ ও কৌশলীদিগের চূড়ামণি, যাঁহার বিচিত্র মহিমা কবীন্দ্রসকল স্বীয় স্বীয় রচিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থে যথোপযুক্ত রূপে বর্ণন করিতে পরাস্ত হইয়াছেন, এবং যাঁহার পরমাদ্ভুত চরিত্র মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ সূক্ষ্মরূপে ব্যবচ্ছেদ করিতে চিরকালই হার মানিয়াছেন ও মানিতেছেন। হিন্দু নাম উচ্চারিত হইলে, আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে যুধিষ্ঠির আসিয়া আবির্ভূত হয়েন, যাঁহার নাম ভারতবর্ষে ধর্ম্ম শব্দের প্রতিবাক্য-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দুনাম উচ্চারিত হইলে, সেই অলোক-সামান্য পুরুষ আমাদিগের মনশ্চক্ষু সম্মুখে উপস্থিত হয়েন, যিনি যুধিষ্ঠিরকে আপনার মৃত্যুসাধনের উপায় বলিয়া দিয়া অসাধারণ মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং শরশয্যার কঠোর যন্ত্রণার মধ্য হইতে পাণ্ডবদিগকে অশেষ অমূল্য ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ওই নাম উচ্চারিত হইলে, সেই মহামনা রাজর্ষি জনক আমাদিগের স্মৃতিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েন, যিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী থাকিয়াও, এক মুহূর্ত্ত অধ্যাত্ম যোগ হইতে স্খলিত হইতেন না। এই নাম উচ্চারণ করিলে, মহাত্মা পুরুকে স্মরণ হয়, যিনি এলেকজাণ্ডারের নিকট শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বন্দীভাবে নীত হইলে এবং এলেকজাণ্ডার "তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব" এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, "এক রাজা অন্য রাজার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, সেইরূপ করিবে" এই উত্তর দিয়াছিলেন।

হিন্দুনাম কি মনোহর! ঐ নাম কি আমরা কখন পরিত্যাগ করিতে পারি? এই নাম ঐন্দ্রজালিক প্রভাব ধারণ করে। এই নাম দ্বারা বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, রাজপুত, মাহারাট্টা, মাদ্রাজী—সমস্ত হিন্দুগণ এক হৃদয় হইবে; তাহাদিগের সকলের এক প্রকার উন্নত কামনা হইবে; সকল প্রকার স্বাধীনতা-লাভ জন্য তাহাদের সমবেত চেষ্টা হইবে। অতএব যে পর্য্যন্ত আর্য্য-শোণিতের শেষ বিন্দু আমাদিগের শিরায় প্রবাহিত হইবে, সেই পর্য্যন্ত আমরা এ নাম পরিত্যাগ করিব না। আমরা আমাদিগের জাতীয় ভাব কখন পরিত্যাগ করিব না। মহাত্মা নিউমান বলিয়াছেন, "জাতীয় ভাব প্রত্যেক সুস্থমনা ব্যক্তি সম্বন্ধে মাতা এবং স্ত্রীর ন্যায় প্রিয় ও পবিত্র বস্তু। আমরা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুনাম পরিত্যাগ করিয়া সম্যকপ্রকারে কি অন্য জাতির ক্রীতদাস হইব? আমরা কখনই এইরূপ ক্রীতদাস হইব না। আমাদিগের আভ্যন্তরিক সারবত্তা আছে। হিন্দুজাতির ভিতরে এখনো এমন সার আছে যে, তাহার বলে তাহারা আপনা-দিগের উন্নতি আপনারাই সাধন করিবে। হিন্দুজাতি অবশ্যই আপনা আপনি উন্নত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জাতিদিগের সমকক্ষ হইবে। হিন্দুরা প্রাচীন কালে তাহাদিগের ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতার জন্য বিখ্যাত ছিল। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও নীতি হিন্দুদিগের পৈতৃক অধিকার। বাহ্য বিষয় সম্বন্ধীয় সভ্যতা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সভ্যতা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু যেমন আমরা পূর্ব্বকালের আধ্যাত্মিক সভ্যতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করিব, তেমনি বাহ্য সভ্যতাও বৃদ্ধি করিব। আমরা আশা করি, এই রূপে আমাদিগের জাতি পৃথিবীর সকল জাতির অগ্রণী হইবে; কিন্তু আমরা যদি জাতীয় ভাব হারাই, তাহা হইলে এইরূপ অগ্রণী-পদ লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা ত রাজ্য বিষয়ে স্বাধীনতাভ্রষ্ট হইয়াছি। আবার কি সামাজিক রীতিনীতি বিষয়েও স্বাধীনতা আমাদিগকে হারাইতে হইবে? মহাকবি হোমর বলিয়াছেন, "যখনই মনুষ্য পরাধীন হয়, তখনই সে অর্দ্ধেক পুরুষত্ব হারায়।" যদি আমরা সর্ব্বপ্রকারে পরাধীন হইয়া পড়ি, আর কি আমাদিগের উঠিবার শক্তি থাকিবে? পরাধীনতাতে কি মনের বীর্য্য থাকে? মনের যদি বীর্য্য গেল, তবে উন্নতিলাভ কি প্রকারে হইবে? হিন্দুজাতি এই রূপে সর্ব্বপ্রকারে পর-হস্ত-গত হইয়া কি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে? আমার ত ইহা কখনই বিশ্বাস হয় না। আমার এইরূপ আশা হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল,

পুনরায় হিন্দুজাতি সেই বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ও ধর্ম্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে। মিল্‌টন স্বজাতির উন্নতি সম্বন্ধে এক স্থানে বলিয়াছেন "Methinks I see in my mind a noble and puissant nation, rousing herself like a strong man after sleep, and shaking her invincible locks; methinks I see her as an eagle mewing her mighty youth and kindling her undazzled eyes at the full mid-day beam."—আমিও সেইরূপ হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি "আমি দেখিতেছি, আমার সম্মুখে মহাবল-পরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীর-কুন্তল পুনরায় বীরত্বগৌরবে স্পন্দন করিতেছে এবং দৈববিক্রমে উন্নতির দিকে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে। হিন্দুজাতির কীর্ত্তি হিন্দুজাতির গরিমা, পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।"

এইরূপ এবং অন্যরূপ বক্তৃতা মহাহিন্দু-সমিতির সভ্যগণ নানাস্থানে বিঘোষিত করিবেন।

(৬) ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে মহাহিন্দু-সমিতির শাখা সকল সংস্থাপিত হইবে। এই সমস্ত শাখার সমষ্টি মহাহিন্দু-সমিতি বলিয়া গণ্য হইবে।

(৭) প্রত্যেক শাখায় একজন সভাপতি, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক থাকিবেন। কোন উপযুক্ত ব্যক্তি সভাপতির পদে নিযুক্ত হইবেন। যদি সংস্কৃতজ্ঞ ব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্য অথবা শাস্ত্রী-শ্রেণী মধ্যে তেমন উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে অন্য ব্যক্তিকে না করিয়া তাঁহাকেই উক্ত পদে মনোনীত করা যাইবে।

(৮) যে ঘরে শাখা-সভার অধিবেশন হইবে, তাহার দ্বারে নারিকেল ফল ও আম্রশাখাযুক্ত পূর্ণকুম্ভ ও কদলী বৃক্ষ সংস্থাপিত হইবে। যে গালিছা বা মাজুরির উপরে অধিবেশন হইবে, তাহার মধ্যস্থলে পুষ্পপূর্ণ পুষ্পপাত্র শোভার্থ রাখা হইবে। পূর্ব্বে উল্লিখিত ভারতীয় চিহ্নযুক্ত অর্থাৎ পদ্মপুষ্পের প্রতিকৃতি ও "ঈশ্বর ও মাতৃভূমি" এই বাক্য-অঙ্কিত ধ্বজা প্রতি অধিবেশনে সভাগৃহের উপরে সংস্থাপিত হইবে। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ধূনা পোড়ান

হইবে ও ধূপ, দীপ জ্বালা হইবে এবং শঙ্খধ্বনি করা হইবে। দিবসে অধিবেশন হইলেও দীপ জ্বালা হইবে।

(২) সম্পাদক, উপস্থিত সকল সভ্য যেরূপ আপনি আপনি বসিয়া গিয়াছেন, সেই অনুসারে সকলের কপালে চন্দনচিহ্ন ও গলায় মালা দিয়া সমিতির কার্য্য আরম্ভ করিবেন। তার পর সভাপতি সকল হিন্দু-সম্প্রদায়ের উপযোগী, ভগবদ্গীতা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত স্তব দণ্ডায়মান হইয়া পাঠ করিবেন; সভ্যেরাও তৎসময়ে দণ্ডায়মান থাকিবেন।

"ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব॥
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ।
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব।
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্॥"

"তুমি মুমুক্ষু ব্যক্তির জ্ঞাতব্য পরম ব্রহ্ম, তুমি এই বিশ্বের উৎকৃষ্ট আশ্রয়, তুমি সনাতন ধর্ম্মের রক্ষক ও নিত্য পুরুষ। তোমার আদি, মধ্য ও অন্ত নাই এবং তোমার প্রভাব অনন্ত। আমি দেখিতেছি তোমার বাহু অনন্ত, চন্দ্র সূর্য্য তোমার নেত্র এবং প্রদীপ্ত হুতাশন তোমার মুখ। তুমি স্বতেজে এই বিশ্বকে প্রদীপ্ত করিতেছ। তুমি আদিদেব, পুরাণ পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের পরম নিধান, তুমি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, তুমি পরমধাম। হে অনন্ত! তুমিই এই বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছ। তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় তোমাকে সহস্রবার নমস্কার। হে সর্ব্বাত্মন! তোমাকে সম্মুখে নমস্কার, তোমাকে পশ্চাতে নমস্কার। তুমি অনন্তপ্রভাব, তুমি অমিতবিক্রম, সকলই তোমার আয়ত্তাধীন অতএব তুমি সর্ব্বস্বরূপ। তুমি চরাচর ভুবনের পিতা, তুমি পূজ্য ও সর্ব্বাপেক্ষা

গুরু। ত্রিলোকে তোমার সমান কেহ নাই, তোমা অপেক্ষা অধিকও কেহ নাই। তোমার প্রভাব অসীম। তুমি স্তবনীয় ঈশ্বর, এই জন্য আমি তোমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছি; তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও।"*

সভাপতি উক্ত স্তব উভয় সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় পাঠ করিলে পর সকলে সাষ্টাঙ্গে ঈশ্বরকে প্রণাম করিবেন। তৎপরে সকলে দণ্ডায়মান হইলে সভাপতি বলিবেন, "ঈশ্বরের যে অমিত প্রভাব আমি এক্ষণে কীর্ত্তন করিলাম, সেই প্রভাবের অণুমাত্র আমাদিগের উপর অবতরণ করিয়া আমাদিগের সমিতির পবিত্র কার্য্যে সাহায্য প্রদান করুক। ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া যাহাকে আমি এই মাত্র কীর্ত্তন করিলাম, তিনি আমাদিগের প্রিয় সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করুন।" তৎপরে সভাপতি ঋগ্বেদের একটী মন্ত্রের কেবল মাত্র নিম্নলিখিত বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিবেন।

"একত্রে গমন কর, একত্রে কথা কহ, তোমাদিগের মন এক বলিয়া জান, তোমাদিগের মন এক হউক, তোমাদিগের হৃদয় এক হউক, তোমাদিগের চেষ্টা এক হউক, তাহা হইলে মঙ্গল তোমাদিগের অনুগামী হইবে।"

উক্ত মন্ত্রার্থ পঠিত হইলে পর, উপস্থিত সভ্য সকল উল্লিখিত দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিয়া সমস্বরে বলিবেন, "আমরা ঐরূপ করিব, আমরা ঐরূপ করিব; জাতীয় ঐক্যকে নমস্কার করি, জাতীয় ঐক্যকে নমস্কার করি।" তৎপরে সভাপতি ও অন্যান্য সভ্যগণ উল্লিখিত দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকিয়া সমস্বরে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই শোকার্দ্ধ তিনবার পাঠ করিবেন। তৎপরে উপবিষ্ট হইবেন। তৎপরে কোন সভ্য দণ্ডায়মান হইয়া নিম্নলিখিত আর্য্যনামাবলী পাঠ করিবেন। এই আর্য্যনামাবলীতে ভারতবর্ষের বিখ্যাত আর্য্যদিগের নাম উল্লেখিত আছে। মহাহিন্দু-সমিতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা সকল আপন আপন অভিমতানুসারে তাহাতে নূতন নাম সংযুক্ত করিতে পারেন। আর্য্যনামাবলী পঠিত হইলে পর সাধারণ হিন্দু মহাত্মাদিগের কীর্ত্তনপূর্ণ গান গীত হইবে। ঐ আর্য্যনামাবলী ও গান ইহার পরেই দেওয়া গেল।

* ভগবদ্গীতা হইতে সঙ্কলিত এই স্তোত্র জন্য আমি শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকটে ঋণী আছি। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা প্রকার আকারবাদীর সভার নিমিত্ত এই প্রকার অসাম্প্রদায়িক স্তোত্র না হইলে চলে না।

শনিবারের চিঠি, শ্রাবণ ১৩৫৫

আর্য্যনামাবলী

রাজা

(১) মান্ধাতা
(২) পুরুরবা
(৩) সগর
(৪) দিলীপ
(৫) ভগীরথ
(৬) অজ
(৭) দশরথ
(৮) পরশুরাম
(৯) শ্রীরামচন্দ্র
(১০) লব
(১১) কুশ
(১২) জরাসন্ধ
(১৩) দুর্য্যোধন
(১৪) যুধিষ্ঠির
(১৫) নন্দ
(১৬) মহানন্দ
(১৭) চন্দ্রগুপ্ত
(১৮) হরিশ্চন্দ্র
(১৯) তেজশেখর
(২০) বিক্রমাদিত্য
(২১) দেবপাল দেব

বীর

(১) রাম
(২) লক্ষ্মণ
(৩) শ্রীকৃষ্ণ
(৪) ভীম
(৫) অর্জ্জুন
(৬) ভীষ্ম
(৭) কর্ণ
(৮) দ্রোণ
(৯) কৃপ
(১০) বঙ্গদেশের বিজয় সিংহ
(১১) পুরু (সেকন্দার সাহার প্রতিপক্ষ)
(১২) কাশ্মীরের ললিতাদিত্য
(১৩) পৃথুরায়
(১৪) রাণা প্রতাপ সিংহ
(১৫) শিবজী
(১৬) যশোমন্তরায় হোলকার
(১৭) রণজিৎ সিংহ

বীরাঙ্গনা

(১) সীতা
(২) সাবিত্রী
(৩) দময়ন্তী
(৪) দুর্গাবতী
(৫) পদ্মাবতী
(৬) সমরশীর স্ত্রী কর্ম্মদেবী
(৭) পত্তুর মাতা কর্ম্মদেবী
(৮ পত্তুর ভগিনী কর্ণাবতী
(৯) পত্তুর স্ত্রী কমলাবতী

কবি

(১) বাল্মীকি
(২) ব্যাস
(৩) কালিদাস
(৪) ভবভূতি
(৫) মাঘ
(৬) শ্রীহর্ষ
(৭) জয়দেব

দার্শনিক

(১) ব্যাস
(২) বশিষ্ঠ
(৩) গৌতম
(৪) জৈমিনী
(৫) কপিল
(৬) পতঞ্জলি
(৭) কণাদ
(৮) শঙ্করাচার্য্য
(৯) মাধবাচার্য্য

পুরাবৃত্ত লেখক

(১) রাজতরঙ্গিণীর লেখকগণ

জ্যোতির্ব্বেত্তা

(১) বরাহমিহির
(২) ভাস্করাচার্য্য
(৩) আর্য্যভট্ট *

গীত।

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

আর্য্যগুণনিধিগণে করহে স্মরণ,
ধরাধামে সে নিধির নাহিক তুলন।
আর্য্য-শূর সম শূর, আর্য্য-কবি সম কবি,
আর্য্য-জ্ঞানী সম জ্ঞানী, মিলিবে কোথায় ?
খুঁজে এস, ত্রিভুবন।
মনে কর না এমন, পুনঃ হবে না কখন,
ভারত-আকরে এ হেন গুণ-রতন।

* সংস্কৃত ভারতবর্ষের বিশ্বজনীন ভাষা এবং সংস্কৃতে লিখিত পুস্তক সকল ভারতবর্ষের সকল হিন্দু জাতির সাধারণ সম্পত্তি হওয়াতে কেবল সংস্কৃত গ্রন্থকর্ত্তাগণের নাম ফর্দ্দে উল্লিখিত হইয়াছে।

(২)

য়ুনান জাগিল, ইটালী জাগিল,—
জাগিবে না কি ভারত পুনঃ ?
নব রবি সম জাপান উদিল,
উদিবে না কি ভারত পুনঃ ?
গাইবে নাকি দ্বিতীয় বাল্মীকি ? যোধিবে না কি দ্বিতীয় অর্জ্জুন ?
চিন্তিবে না কি দ্বিতীয় শঙ্কর ? গণিবে না কি দ্বিতীয় ভাস্কর ?
নব্য ভারত হবে কি ন্যূন ?

(৩)

আর্য্য-গুণ নিধি স্মরি, পদ-চিহ্ন অনুসরি
উন্নতি বন্ধুর পথে চলহ সকলে।
ধর্ম্মরূপ বর্ম্মপরি, ধৃতি অসি করে ধরি,
কুসমূহ * সনে রণ করহ সকলে।

(৪)

ঈশ্বর উপরে, সাহস অন্তরে,
লাগ লাগ ভারত উদ্ধারে।
অসুর-নিচয় হইবে হে জয়,
ধর্ম্ম যুদ্ধে কে বারিতে পারে ?
নিত্য স্বর্গ তার যে হে একবার
সে সমরে প্রাণ দিতে পারে।

আর্য্যনামাবলী পঠিত ও উক্ত গান গীত হইলে অধিবেশনের নিয়মিত কার্য্য আরম্ভ হইবে। নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

(ক) শাখা সমিতি অথবা সমস্ত সমিতি দ্বারা অনুষ্ঠায়মান হিন্দুজাতি সাধারণের উন্নতিসাধক কোন কার্য্য সম্বন্ধীয় পরামর্শ।

(খ) সমস্ত হিন্দুজাতির অথবা স্থানীয় হিন্দুদিগের সাধারণ কুশল-সাধক বিষয় সম্বন্ধীয় কোন লিখিত প্রস্তাব যদি কোন সভ্য পাঠ করিতে চাহেন, তাহা পাঠ করিবেন।

---

* সকল প্রকার মন্দ।

(গ) সভ্যদিগের দ্বারা উক্ত প্রস্তাবের বিষয় আলোচনা।

(ঘ) স্বদেশ-প্রেমোত্তেজক বক্তৃতা।

যদ্যপি সমিতির কোন অনুষ্ঠায়মান কার্য্য সম্বন্ধীয় কোন বিবেচনার বিষয় থাকে, প্রস্তাব পাঠ ও বক্তৃতা না হইয়া কেবল তাহাই আলোচিত হইবে। বক্তৃতা ও প্রস্তাব পাঠ অপেক্ষা কার্য্য অধিক প্রয়োজনীয়। সভার কার্য্যের পরে "বন্দে মাতরং," "জয় ভারতের জয়" প্রভৃতি জাতীয় সঙ্গীত সকল গীত হইবে। পরিশেষে জাতিসাধারণ রাজ-মঙ্গল-গীতি National Anthem গীত হইলে এবং সভাপতি আশীর্ব্বচন ঘোষিত করিলে সভা ভঙ্গ হইবে। জাতি-সাধারণ রাজ-মঙ্গল গীতি গীত হইবার সময় সকলে দণ্ডায়মান থাকিবেন।

(৯) স্বদেশ-প্রেমিক হিন্দু সীমন্তিনীগণ যে ঘরে সমিতির অধিবেশন হইবে, তাহার অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী অন্য কোন ঘরে বসিবেন। দুই ঘরের মধ্যে একটি পরদা ফেলা থাকিবে। সভার কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে অনুষ্ঠিতব্য ক্রিয়া-পদ্ধতিতে সমস্বরে বলিবার জন্য যে সকল বাক্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল বাক্য উচ্চারণ করিবার সময়ে তাঁহারা পরদার ভিতর হইতে পুরুষদিগের সঙ্গে যোগ দিবেন। এবং উল্লিখিত গীত সকলের মধ্যে প্রত্যেক গীত পুরুষেরা গাইলে পর, তাঁহারা তাহা গাইবেন। মান্দ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি যে সকল দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা প্রচলিত আছে, সেখানে উল্লিখিত পরদার আবশ্যক নাই, কেবল স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে স্ত্রীলোকের গাওনা হইতে পারে না, সে সকল স্থানে তাহা হইবে না।

(১০) যে স্থানে সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থানে যে ভাষা প্রচলিত, সেই ভাষাতে তাহার কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

(১১) মহাহিন্দু-সমিতির সভ্যেরা যাহাতে ভারতবর্ষের সকল স্থানের সভ্যগণ হিন্দি ভাষা ও দেবনাগর অক্ষর অবলম্বন করিয়া পরস্পর পত্র লিখেন ও আলাপ করেন, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিবেন। ঐরূপ আলাপের জন্য বিদেশীয় ভাষার সাহায্য লওয়া স্বদেশপ্রেমী হিন্দুদিগের পক্ষে লজ্জার বিষয়। বঙ্গদেশে ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যেখানকার প্রচলিত ভাষা হিন্দি নহে, তথাকার সভ্যদিগের উক্ত কার্য্যসাধন জন্য হিন্দি শিখা কর্ত্তব্য। যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা হিন্দি শিখেন, ইংরাজী ভাষা অগত্যা উক্ত আলাপের উপায় হইবে। ভারতবর্ষের কোন বিশেষ দেশে সংস্থিত ভিন্ন ভিন্ন শাখা সমিতির সভ্যেরা

পরস্পরকে অবশ্যই সেই দেশের প্রচলিত ভাষাতে পত্রাদি লিখিবেন। স্বদেশ-প্রেমী ও মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তিদিগের ইহাই করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের প্রত্যেক দেশের লোকসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করিলে, সেই দেশের অতি অল্প লোকেই ইংরাজী জানে, অতএব সেই সেই দেশের প্রচলিত ভাষাতেই সভার কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। কেবল ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের মধ্যে আলাপ অথবা তাহাদিগকে পত্র লিখিবার সময় হিন্দি (অগত্যা ইংরাজী) ব্যবহৃত হইবে।

(১২) প্রত্যেক গ্রাম বা নগর যেখানে শাখা সমিতি সংস্থিত, সে নগরে অথবা গ্রামে মধ্যে মধ্যে নগর-সংকীর্ত্তন হইবে, তাহাতে "ঈশ্বর ও মাতৃভূমি" "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" প্রভৃতি স্বদেশ-প্রেমোত্তেজক বাক্য-অঙ্কিত ধ্বজা সকল হস্তে বাহিত হইবে। ঐ নগরসংকীর্ত্তনে জাতীয় সঙ্গীত সকল গীত হইবে। যদ্যপি শাখার সভ্যেরা খোল করতাল ঐরূপ সঙ্গীতের উপযুক্ত অঙ্গ মনে না করেন, তাহা হইলে অন্য বাদ্য ব্যবহার করিতে পারেন।

(১৩) মহাহিন্দু-সমিতি যুবকদিগের জন্য ব্যায়ামাগার সংস্থাপন করিবেন এবং তাহাদিগকে ব্যায়ামাভ্যাস ও পৌরুষসূচক ক্রীড়া করিতে উৎসাহ প্রদান করিবেন। অস্ত্র-আইন প্রযুক্ত ভারতবর্ষের লোকরা বন্য পশু এবং বন্য পশু অপেক্ষা নির্দ্দয় দস্যু তস্কর হইতে এক্ষণে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষম। অস্ত্রের ব্যবহারের অভাবে তাহারা ক্রমে ভীরু ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। যে জাতি পৃথিবীর অন্য জাতি অপেক্ষা জনসংখ্যায় অধিক এবং এক সময়ে সাহস জন্য বিখ্যাত ছিল, সেই জাতি উক্ত আইন বশতঃ হীনবীর্য্য ও পৌরুষহীন হইয়া পড়িতেছে. ইহাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সেনা আহরণের উপায় ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে; অতএব মহাহিন্দু-সমিতি উক্ত আইন রদ করিবার জন্য অবিশ্রান্ত আন্দোলন করিবেন।

(১৪) মহাহিন্দু-সমিতি যত দূর সাধ্য, দেশীয় শিল্পে উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং যুরোপীয় শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যবহার হইতে বিরত থাকিবেন। আমরা এ বিষয়ে অনেক করিতে পারি, অল্প করিয়া যেন আমরা তাহাই "যত দূর সাধ্য" মনে না করি। মহাহিন্দু-সমিতি দেশীয় শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষালয় সকল এবং কাপড়ের কল প্রভৃতি সংস্থাপনে যত্নবান্ হইবেন।

(১৫) মহাহিন্দু-সমিতি ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতির জন্য এবং দিন দিন

গোজাতির যে অবনতি হইতেছে, তাহা নিবারণ জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিবেন। ভারতবর্ষের লোক কৃষিজীবী। গাভী যেমন তাহাদিগের উপকারী, এমন অন্য কোন জন্তু নহে; এ জন্য তাহারা গাভীকে অতি পবিত্র জীব জ্ঞান করে। গোদুগ্ধ হিন্দুজাতির প্রধান আহার। তাহা তাহাদিগের বলবীর্য্যের প্রধান কারণ। গোজাতির রক্ষা ও উন্নতিসাধন জন্য চেষ্টা যেমন সাধারণ হিন্দুজাতির ঐক্য সাধনের উপায়, এমন অন্য কিছু নহে। মহাহিন্দু সমিতি ভারতবর্ষে গোহত্যা নিবারণ জন্য বৈধ আন্দোলন ও বৈধ চেষ্টা করিবেন।

(১৬) মহাহিন্দু-সমিতির মফস্বলবাসী সভ্যেরা নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুদিগকে হিন্দুনীতি শিক্ষা এবং কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষালয় সকল সংস্থাপনে যত্নবান হইবেন এবং মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে প্রাচীন হিন্দুদিগের মহিমা ও ধার্ম্মিকতা বিষয়ে এবং তাহাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা মোচন এবং বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি সাধন জন্য এবং তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য সম্পাদন জন্য বক্তৃতা করিবেন।

(১৭) মহাহিন্দু-সমিতি আপনাদিগের অধীনে নানা স্থানে সংস্কৃত বিদ্যালয় সকল স্থাপন করিবেন। সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণে সমিতি যত্নবান হইবেন।

(১৮) মহাহিন্দু-সমিতির অধীনে ইংরাজী ভাষার বিদ্যালয় সকলে নীতিশিক্ষা দেওয়া হইবে। হিন্দুশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত নীতিশিক্ষা দেওয়া হইবে। নীতির কথা বলিতে গেলে ঈশ্বর আসিয়া পড়েন কিন্তু ঈশ্বরের কথা এমন ভাবে বলা হইবে যে, কোন হিন্দু সম্প্রদায়ের মানসিক কষ্টদায়ক না হয়।

(১৯) মহাহিন্দু-সমিতির অধীনে বিদ্যালয় সকলে সকল বিষয়ে বিশেষতঃ পুরাবৃত্ত ও ভূগোল বিষয়ে এমন সকল পুস্তক পড়ানো হইবে, যাহাতে মনে স্বদেশপ্রেম উত্তেজিত হয়।

(২০) মহাহিন্দু-সমিতির শাখা যে স্থানে স্থিত, সেই স্থানের শাখাসমিতি নূতন পুষ্করিণী খনন অথবা পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিবেন।

(২১) মহাহিন্দু-সমিতির সভ্যেরা দরিদ্র সভ্যদিগকে সাধ্যমত অর্থানুকূল্য করিবেন ও সাধারণ দরিদ্রের দুঃখ মোচনে যত্নবান হইবেন।

(২২) মহাহিন্দু-সমিতি বিদ্যালয়োত্তীর্ণ অতি দরিদ্র হিন্দুবালকদিগকে টাকা

ঋণ দিয়া, কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত করাইবেন। তাহাদিগের সচ্চরিত্রের প্রতিষ্ঠা-পত্র লইয়া ঋণ দিবেন। তাহারা ব্যবসায়ে সফল হইলে, নিরূপিত সময়ের মধ্যে সুদ সমেত উক্ত ঋণ পরিশোধ করিবে এমন অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দিবে। ব্যবসায়ে সফল না হইলে, তাহাদিগকে ঐ টাকা মাফ করা হইবে, কিন্তু এমন বিশেষ প্রমাণ দেখাইতে হইবে যে, অনতিক্রমণীয় কার্য্য বশতঃ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

(২৩) মহাহিন্দু-সমিতি বক্তা ও গায়ক ও কথক নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রেরণ করিবেন। ঐ সকল বক্তা ও গায়ক ও কথক আর্য্যকীর্ত্তি-কীর্ত্তন করিয়া লোকের মনে স্বদেশপ্রেমাগ্নি প্রজ্বলিত করিবেন, কিন্তু এই কীর্ত্তন সাম্প্রদায়িকভাবে হইবে না, সাধারণ হিন্দুভাবে হইবে। ইহারা নানা স্থানে মহাহিন্দু-সমিতির শাখা সংস্থাপনে ও সমিতির অন্যান্য কার্য্য সাধনে যত্নবান্ হইবেন।

(২৪) ভারতবর্ষের প্রত্যেক নগরে ও প্রত্যেক গ্রামে মহাহিন্দু-সমিতির শাখা সংস্থাপিত হইবে। এই সকল শাখা পরস্পর স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবেন; কিন্তু সকলেই সমিতির সাধারণ উন্নতি জন্য যত্নবান্ হইবেন। গ্রামস্থ সমিতি সকল নাগরিক সমিতির এবং নাগরিক সমিতি সকল মহানাগরিক সমিতির পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। মহানাগরিক শাখাসমিতি সকল নিম্নলিখিত নামে আখ্যাত হইবে।

(১) কলিকাতা শাখাসমিতি
(২) বোম্বাই শাখাসমিতি
(৩) লাহোর শাখাসমিতি
(৪) প্রয়াগ শাখাসমিতি
(৫) মান্দ্রাজ শাখাসমিতি।

সকল গ্রাম্য, নাগরিক এবং মহানাগরিক শাখার সমষ্টি মহাহিন্দু-সমিতি নামে আখ্যাত হইবে। ইহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে যে, প্রবল জাতীয় ভাবে গঠিত উক্ত গ্রাম্য সমিতি সকল ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের মহোপকারী হইবে।

(২৫) প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের প্রত্যেক দেশের মহানগরে সেই দেশের সকল শাখা-সমিতি হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণের একটি সাধারণ সভা হইবে

এবং প্রতি বৎসরে ভারতবর্ষের সকল স্থানের শাখা-সমিতি হইতে প্রেরিত প্রতিনিধিগণের মহাসভা হইবে। এই মহাসভার অধিবেশন কোন বৎসর কলিকাতা, কোন বৎসর বোম্বাই এইরূপ কোন মহানগরে হইবে। মহাদেশ সাধারণ সমিতি National Congress যাহা বৎসর বৎসর কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে হইতেছে, সেই মহাসমিতিতে মহাহিন্দু-সমিতির শাখা সকল প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন। সেই সকল প্রতিনিধি তথায় আমাদিগের মুসলমান ভ্রাতাদিগের সহিত একত্র কার্য্য করিবেন।

(২৬) প্রত্যেক সভ্যকে সভ্য হইবার পূর্ব্বে সমিতিকে প্রবেশ-দক্ষিণা স্বরূপ এক টাকা এবং বাৎসরিক দাতব্য অন্যূন এক টাকা দিতে হইবে।

এই অনুষ্ঠানপত্র এক্ষণে হিন্দুসমাজের বিবেচনার জন্য অর্পিত হইল। যদ্যপি ইহা কোন গ্রাম অথবা নগর অথবা নগরের বিশেষ পল্লীর ব্যক্তিদিগের মনোনীত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা একেবারেই শাখা সংস্থাপন করিতে পারেন, পরে ঐ সকল শাখা সভার মধ্যে যোগ সংস্থাপিত হইতে পারে। যে পর্য্যন্ত না এইরূপ যোগ সংস্থাপিত হয়, প্রত্যেক শাখার সভ্যেরা আপনাদিগের সংগৃহীত অর্থ কেবল সেই শাখার ব্যয়ে অর্পণ করিতে পারেন।

বৃদ্ধ হিন্দু

গান্ধীচরিত

দিনচর্য্যা

নোয়াখালি যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে বিহারে দাঙ্গা শুরু হইয়া গিয়াছিল। তাহারই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ গান্ধীজী ১৯৪৬ সালে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সোদপুরে থাকিতেই খাওয়ার পরিমাণ অর্ধেক করিয়া দেন; এবং এ কথাও বলেন যে, যদি বিহার শান্ত না হয় তাহা হইলে তাঁহাকে অনশন গ্রহণ করিতে হইবে। নোয়াখালি পৌঁছিবার পর বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট হইতে সংবাদ আসিল, বিহারে যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, এখন অবস্থা শান্ত এবং আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে। সেই সংবাদ পাইয়া গান্ধীজী পুনরায় ধীরে ধীরে আহারের মাত্রা বৃদ্ধি করিলেন। সেই জন্য নোয়াখালি জেলায় শ্রীরামপুর গ্রামে থাকার সময়ে প্রথমে তাঁহার যাহা আহার ছিল, ক্রমে তাহার কিছু পরিবর্তন হইতে লাগিল। কিন্তু আহার যেমনই হউক না কেন, গান্ধীজীর

দৈনন্দিন কাজের পদ্ধতির মধ্যে অনশন বা অর্ধাশনের কারণে সহজে ব্যতিক্রম ঘটিত না। এমন কি রেলে বা স্টীমারে যাতায়াতের সময়েও তিনি যথাসম্ভব দিনচর্যা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন।

ভোরে ওঠা তাঁহার বরাবরের অভ্যাস কিন্তু ঋতু অনুসারে বা কাজের তাগিদে কখনও কখনও ঘুমের সময় কমাইয়া দিতেন। শ্রীরামপুরে থাকার সময়ে তিনি বেঙ্গল টাইম পাঁচটা, অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম চারটার সময়ে উঠিতেন। বালিশের নীচে একটি টেঁকঘড়ী থাকিত, ঐটুকু ঘড়ীর মধ্যেও অ্যালার্মের ঘণ্টা ছিল। কিন্তু অভ্যাসের বশে প্রায়ই তিনি ঘণ্টা বাজিবার পূর্বেই উঠিতেন, এবং হয়তো ওঠার কয়েক মিনিট পরে শোনা যাইত, ঘড়ী বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে।

যে বিছানায় গান্ধীজী শুইতেন তাহার পাশে দুটি বেঞ্চিতে কাগজপত্র, লেখার সরঞ্জাম ইত্যাদি সাজাইয়া রাখা হইত, এবং পাশে একটি নীচু জল-চৌকিতে দুইটি বোতলে জল ও দাঁতন গোছানো থাকিত। দাঁতনের এক দিক আমরা শক্ত কোন জিনিস দিয়া ঠুকিয়া রাত্রে নরম কুচিতে পরিণত করিয়া রাখিতাম। উল্টা দিকে কিছুদূর পর্যন্ত আধাআধি চিরিয়া রাখা হইত, যেন দাঁতনের পর জিব-ছোলার কাজ উহার দ্বারা সহজে সমাধা হয়। একটি মোটা মুখওয়ালা তালমিশ্রীর শিশিতে অর্ধেক জল দিয়া দাঁতনটি রাত্রে ডুবাইয়া রাখা হইত; জল কম-বেশি হইলে গান্ধীজী নিজেই জল ঢালিয়া দেখাইয়া দিতেন, ঠিক কতটুকু রাখার প্রয়োজন। পাশে একটি ছোট শিশিতে মিহি কাঠকয়লার গুঁড়াতে নুন মিশাইয়া মাজন করিয়া রাখা হইত। আর একটি বড় বোতলে মুখ ধুইবার জল, ও একটি বহুদিনের ব্যবহৃত পরিষ্কার লোহার গামলা থাকিত। বিছানার নিকটে একটি হারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া খুব কম করিয়া রাখা হইত।

গান্ধীজী একসময়ে প্লুরিসিতে ভুগিয়াছিলেন, সেই জন্ম বরাবর তাঁহার সর্দির ধাত ছিল। অল্প ঠাণ্ডা লাগিলেই, বিশেষত বাংলা দেশের স্যাঁৎসেঁতে হাওয়ায় তাঁহার অতি অল্পেই সর্দি ধরিয়া যাইত। সেইজন্য ভোরে তিনি বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইতেন না।

ওঠার পরে মশারির বাহিরে হাত বাড়াইয়া খাটের নীচে রাখা পেশাবদান গ্রহণ করিতেন এবং তাহার পরেই দাঁতন করিতে আরম্ভ করিতেন, কোলের

উপরে লোহার গামলাটি থাকিত। বেশ ভাল করিয়া মাজনের সাহায্যে দাঁতন করিবার পর মুখ ধুইয়া ফেলিতেন। ব্যবহারের প্রত্যেক জিনিসটি প্রত্যহ ঠিক একই জায়গায় রাখা চাই। তিনি বলিতেন, এগুলি যদি ঠিক একই জায়গায় না থাকে, অভ্যাসবশে যদি এই সকল কাজ না চলে এবং প্রতিদিন জিনিস যদি আমাকে খুঁজিয়া লইতে হয়, তবে অকারণে খানিক সময় নষ্ট হয়। অতএব এগুলি যেন যন্ত্রের মত চলিতে থাকে, কোন জিনিস খুঁজিবার বা তাহার জন্য ভাবিবার প্রয়োজন যেন না হয়। গান্ধীজীর দাঁত একটিও ছিল না, তিনি মাড়ির উপরেই দাঁতন করিতেন, ভিতরে বাহিরে পরিষ্কার করিয়া দাঁতনের পর মুখ ধুইয়া ফেলিলে আমরা লোহার গামলা সরাইয়া লইতাম। তখন প্রার্থনার আয়োজন হইত।

শ্রীরামপুরে গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথমে শ্রীপরশুরাম ও আমি ছিলাম। তখন প্রার্থনার কাজ পরশুরাম চালাইতেন। মাসখানেক পরে আমাদের কাজকর্ম বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে অবসর কম হইতে লাগিল। তখন মনু গান্ধী আসিলেন, এবং প্রার্থনার কাজ তিনিই পরিচালনা করিতেন।

প্রার্থনার সময়ে গান্ধীজী বিছানার মধ্যে প্রথম অংশে বসিয়া থাকিতেন। প্রার্থনার সূচনায় লণ্ঠনের আলো খুব কম করিয়া, হয়তো বা একখানি খাতা দিয়া আড়াল করিয়া রাখা হইত। গান্ধীজী বিছানায় এবং আমরা নীচে একটি মাদুর বা কম্বলের উপরে অন্ধকারে বসিয়া থাকিতাম। সর্বপ্রথমে গান্ধীজী ইঙ্গিত করিতেন, 'নম্যো'। মনু তখন গভীর কণ্ঠে তিন বার ধীরে ধীরে বিলম্বিত তালে নিম্নলিখিত জাপানী বৌদ্ধ মন্ত্রটি উচ্চারণ করিতেন:

নম্যো হো রেঙ্গে ক্যো:।

—যাঁহারা বুদ্ধত্ব (আলোক) প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে নমস্কার। ইহার পরেই গান্ধীজী বলিতেন, 'দো মিনিটকি শান্তি', অর্থাৎ দুই মিনিটকাল আমরা নিস্তব্ধ হইয়া আত্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। গান্ধীজীর জপের জন্য একটি তুলসীর মালা ছিল। পুরানোটি কাহাকেও দিয়া দেন, তখন আবার ছোট রুদ্রাক্ষের মত বীজের আর একটি মালা বাজার হইতে খরিদ করিয়া আনা হয়। তাহাতে ১০৮ দানা ছিল, কিন্তু সে ব্যাপার পাটনা যাত্রার সময়ে ঘটে; অতএব নোয়াখালির সহিত তাহার সম্পর্ক নাই। যাহাই হউক, দুই মিনিট মৌনকালের মধ্যে গান্ধীজীর হাতে মালা থাকিত। তিনি কোন্ মন্ত্র জপ

করিতেন, তাহা বলিতে পারি না। দুই মিনিট কাল অতিবাহিত হইলে তিনি নির্দেশ দিতেন, "প্রার্থনা"। তখন মনু ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক পাঠ করিতেন :

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যসিদ্ধনম্॥

তাহার পর নিয়মানুক্রমে অন্যান্য শ্লোক পাঠ করিতেন। তাহার মধ্যে একটি বিশেষ ভাবে আমার মনে আছে :

ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং প্রাণিনামার্তিনাশনম্॥

—আমি রাজ্য বা স্বর্গ অথবা অপুনর্ভব বা মোক্ষ চাই না। দুঃখতপ্ত প্রাণীদের দুঃখের নাশ হউক—ইহাই আমার কামনা।

ওই সময়ে একটি ভজনগান হইত। মনুই গাহিতেন, কিন্তু তিনি বাংলা গান বেশি না জানায় আমাদের শিবিরে যে সকল সাংবাদিক বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রার্থনায় উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদেরই কেহ রবীন্দ্র-সঙ্গীত হইতে কিছু গান করিতেন। একদিন গান্ধীজী স্বয়ং একটি ইংরেজী কবিতা ওই সময়ে পাঠ করিলেন। সেটির আরম্ভ এইরূপ : Oh Lord ! Our help in ages past.

গান শেষ হইলে কিছুক্ষণ রামধুন বা নামসংকীর্তন হইত। কোন দিন হয়তো "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম", কোন দিন বা "নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে, নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে" এইরূপ কোনও কীর্তন হইত। গান্ধীজী মৌন অবস্থায় বসিয়া থাকিতেন, কিন্তু রামধুনের সময়ে গায়ের চাদরের ভিতর দিয়াও আমরা শব্দ শুনিতে পাইতাম, তিনি তালি দিয়া তাল রাখিতেছেন।

রামধুন কীর্তনের পর প্রত্যহ গীতা পাঠের নিয়ম ছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে একবার করিয়া সমগ্র গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় শেষ করা হইত। কোন্ দিন কোন্ অধ্যায় পাঠ হইত, তাহার তালিকা দিতেছি। শুক্রবার—১ম ও ২য় অধ্যায় ; শনিবার—৩য়, ৪র্থ, ৫ম অধ্যায় ; রবিবার—৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম অধ্যায় ; সোমবার—৯ম, ১০ম, ১১শ, ১২শ অধ্যায় ; মঙ্গলবার—১৩শ, ১৪শ, ১৫শ অধ্যায় ; বুধবার—১৬শ, ১৭শ অধ্যায় ; বৃহস্পতিবার—১৮শ অধ্যায়। যে

সময়ে গীতা পাঠ হইত, তখন গান্ধীজী বিছানায় শুইয়া পড়িতেন এবং মনোযোগ দিয়া সব শুনিতেন। পাঠের কোনও ভুল হইলে শুইয়া শুইয়াই তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন; কোনও শব্দ অসাবধানতার বশে ছাড়িয়া গেলে তাহা পূরণ করিয়া দিতেন। বিশুদ্ধ উচ্চারণের দিকে তাঁহার বিশেষ ঝোঁক ছিল। একদিনকার ঘটনা হইতে বিষয়টি স্পষ্ট হইবে।

সেদিন ২২এ নভেম্বর ১৯৪৬ সাল। আগাখান প্রাসাদে বন্দিনী অবস্থায় ২২এ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ সালে কস্তুরবা গান্ধীর দেহান্ত ঘটে। সেই অবধি, প্রতি ইংরেজী মাসের ২২ তারিখে ভোরবেলা সমগ্র গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় পড়া হইত। ডাঃ সুশীলা নায়ার এই রীতি প্রবর্তন করেন বলিয়া শুনিয়াছি। শ্রীরামপুর গ্রামে অবস্থানকালে ২২এ নভেম্বর সমগ্র গীতা পাঠ হইবে বলিয়া গান্ধীজী অপরাপর দিনের চেয়ে বোধ হয় এক ঘণ্টা আগে উঠিলেন। অন্যান্য দিনের মত প্রার্থনা চলিতে লাগিল, গীতাপাঠ একজনের উপরে ভার না দিয়া আমরা কয়েকজন ভাগ করিয়া লইলাম। শ্রীরামপুর গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর সমগ্র বাড়ীঘর দাঙ্গায় পুড়িয়া বা ভাঙিয়া গিয়াছিল। তিনি ভোরের প্রার্থনায় যোগ দিবার জন্য আগের রাত্রে আমাদের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার উপরে সেদিন ১১শ অধ্যায় পাঠের পালা পড়িল। অনুকূলবাবু সোজা বাংলা উচ্চারণে গীতাপাঠ করিয়া গেলেন, এবং এত দ্রুত পড়িতে লাগিলেন যে, আমাদের কানেও অনেক সময়ে শব্দগুলি যথাযথভাবে ধরা পড়িল না। অনুকূলবাবুর পরে আবার অপর কেহ পাঠ আরম্ভ করিলেন। সমগ্র গীতাপাঠ সমাপ্ত হইলে প্রার্থনাও শেষ হইল।

প্রার্থনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী উঠিয়া বসিতেন; তখন আমরা মশারি খুলিয়া ফেলিতাম। তিনি একটি ছোট জলচৌকি বিছানার উপরে বসাইয়া, লণ্ঠনের আলোয়ে তখন কাজে বসিতেন। সেদিন আমরা মশারি তুলিয়া সরিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, গীতাপাঠ কে কে করিয়াছে? অনুকূলবাবুকে ডাকিয়া তিনি তখন কতকগুলি কথা বলিলেন। বলার সময়ে তাঁহার ভঙ্গিতে কোনও উত্তেজনার লক্ষণ ছিল না বটে, কিন্তু যে কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে গভীর আবেগের পরিচয় পাওয়া গেল। তিনি ইংরেজীতে বলিলেন, 'আমি মৃতজনের স্মৃতিকে এরূপ পাঠের দ্বারা অবমাননা করিতে দিব না। সংস্কৃত উচ্চারণ কঠিন, কিন্তু গীতার

অর্থ এবং সম্যক্‌ উচ্চারণ তোমাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। কোনও কাজই ঢিলাভাবে করিও না।'

I will not allow you to insult the memory of the dead by such reading. I do not know if the departed soul knows what is happening here. I don't know, but I believe in some way it may be of some good to the soul. At least it is good for our soul.

Sanskrit is difficult, therefore I have taken sufficient pains to learn the correct pronunciation. Pandits in Kashi and Shrirangam read it correctly and I do not pretend to read it as well as they do. But you must learn both the meaning as well as the correct pronunciation before I permit you to read the Gita any more on a similar occasion. I would far rather that we should keep silent than do it in the present fashion.

Never slur over a thing. You never deceive anyone else except yourself.

এইখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে, উপরে উদ্ধৃত ইংরেজী অংশটুকু আমি নিজের ডায়েরি হইতে তুলিয়া দিলাম। কেবল সর্বপ্রথম বাক্যটি উহাতে লেখা নাই। আমার মনে ছিল। কিন্তু বড্ড কড়া শব্দ বলিয়া কি ভাবিয়া জানি না, ডায়েরিতে লিখি নাই; আজও স্মরণে আছে বলিয়া তাহা প্রকাশ করিলাম।

যাহাই হউক, পরদিবস অর্থাৎ ২৩এ নভেম্বর ১৯৪৬ সাল, শনিবার ছিল বলিয়া গান্ধীজী ৩য় হইতে ৫ম অধ্যায় পর্যন্ত আর আমাদের উপরে ভরসা না করিয়া নিজে পাঠ করিলেন, আমরা তাঁহার নির্দেশমত সামনে গীতা খুলিয়া ধীরভাবে শুনিতে লাগিলাম। গান্ধীজীর উচ্চারণ শুদ্ধ, তিনি নিজে খুব দ্রুত পড়িতেন না, এবং পড়ার সময়ে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া পড়িতেছেন, অর্থাৎ শুধু মন্ত্রপাঠই করিতেছেন না, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইত। গান্ধীজীর নিজের পাঠ ওই একবারই শুনিয়াছি। অপরাপর সময়ে সুশীলা নায়ার, সুশীলা পাই প্রভৃতি অনেকেরই গীতাপাঠ শুনিয়াছি। মনু ১৯-১২-৪৬ তারিখে শ্রীরামপুরে আসিবার পর তো নিয়মিতভাবেই পড়িত। ইঁহাদের সকলেরই উচ্চারণ শুদ্ধ নির্দোষ। কিন্তু পাঠ এত দ্রুত হইত যে, আমাদের মত শ্রোতার মনে অর্থাগম হইবার পূর্বেই দ্রুত শ্লোকপাঠের রথ ছুটিয়া চলিত. আমরা পিছনে পড়িয়া থাকিতাম।

দুইটি ঘটনা এইখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। ভোরের প্রার্থনার সময়ে আমরা চার-পাঁচজনের বেশি তো শ্রীরামপুরে প্রায়ই হইতাম না। সেখানে যে ভজন গান হইত, তাহা বাংলাতেই হইত। রবীন্দ্র-সংগীতের উপরেই আমাদের নির্ভর ছিল। এক-আধ দিন ঘটনাচক্রে, যেমন যীশুখ্রীষ্টের

জন্মদিন উপলক্ষ্য করিয়া, হয়তো কোনও গান পড়িয়া লওয়া হইত। একদিন দৈবাৎ সাংবাদিক বন্ধুদের মধ্যে কেহ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি মীরাবাঈয়ের একখানি ভজন হিন্দী ভাষায় গাহিলেন। গান এবং প্রার্থনা শেষ হইলে সকলে চলিয়া যাওয়ার পর গান্ধীজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে হিন্দী ভজনটি গাওয়া হইল, তাহা কি আমরা কেহ গাহিতে বলিয়াছিলাম? আমি বলিলাম, সংবাদিক বন্ধু স্বয়ং আপনার প্রীত্যর্থে উহা গাহিয়াছেন। গান্ধীজী তখন বলিলেন যে, তিনি বাঙালী হইতে চান এবং মনে প্রাণেই তাহা হইতে চান। সেইজন্য একান্তেও যখন প্রার্থনা হয়, তখনও যেন বাংলা দেশে বাংলা গানই গাওয়া হয়। উহা শুধু ভজন নহে, গুরুদেবের গান তাঁহার পক্ষে প্রতিদিন বাংলা ভাষার প্রথম পাঠ হইয়া দাঁড়ায়। গুরুদেবের গান তিনি মোটামুটি বুঝিতেন; মাঝে মাঝে কোনও প্রচলিত শব্দের অর্থবোধ না হইলে মানে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন।

আর একদিনের ঘটনা। সেদিন আমরা শ্রীরামপুর ছাড়িয়াছি। চণ্ডীপুর নামক গ্রামেও তিন-চার দিন অতিবাহিত হইয়াছে। ৭ই জানুয়ারি ১৯৪৭। সেইদিন হইতে গান্ধীজী প্রতিদিবস এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পদব্রজে যাত্রার সংকল্প লইয়া বাহির হইয়াছেন। আমরা সকাল ৭৷৷০ টায় মাসিমপুর অভিমুখে যাত্রা করিব; কিন্তু তখনও ভোরের অন্ধকার ঘন হইয়া রহিয়াছে। প্রার্থনার সময়ে গান্ধীজী গুজরাটীতে "বৈষ্ণব জন তো তেনে কহীএ জে পীড় পরাই জানে রে" গানটি গাহিতে বলিলেন এবং নির্দেশ দিলেন যেন বৈষ্ণব স্থানে মাঝে মাঝে 'ঈশাই' বা 'মুসলীম' শব্দপ্রয়োগ করা হয়। মনু গান গাহিতে লাগিল। অকস্মাৎ মশারির মধ্য হইতে ভারি গলায়, অনভ্যস্ত হইলেও মোটামুটি সাদাসিধা কিন্তু শুদ্ধ সুরে গান্ধীজীর গানের শব্দ বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। আমরা অবশিষ্ট দুই-চারজন অবাক হইয়া সেই শব্দ শুনিতে লাগিলাম।—

বৈষ্ণব জন তো তেনে কহীএ জে পীড় পরাঈ জাণে রে।
পর দুঃখে উপকার করে তোয়ে, মন অভিমান ন আণে রে॥
সকল লোকমাঁ সহুনে বন্দে, নিন্দা ন করে কেনী রে।
বাচ কাছ মন নিশ্চল রাখে, ধন ধন জননী তেনী রে॥
সমদৃষ্টি নে তৃষ্ণা ত্যাগী, পরস্ত্রী জেনে মাত রে।

জিহ্বা থকী অসত্য ন বোলে, পরধন নব ঝালে হাথ রে ॥
মোহ মায়া ব্যাপে নহি জেনে, দৃঢ় বৈরাগ্য জেনা মনমাঁ রে।
রামনামশুঁ তালী লাগী, সকল তীরথ তেনা তনমা রে ॥
বণলোভী নে কপট রহিত ছে, কাম ক্রোধ নিবার্ধা রে।
ভণে নরসৈঁয়া তেহ্নু দরসন করতাঁ, কুল একোতের তার্যাঁ রে ॥

—বৈষ্ণব জন তো তাহাকেই বলে যে পরের দুঃখ বুঝিতে পারে। অপরের দুঃখে যে তাহার উপকার করে, (কিন্তু) মনে কোনও অভিমান আসিতে দেয় না।

সকল মানুষকে বন্দনীয় বলিয়া মনে করে, নিন্দা কাহারও করে না; বাক্য, কাজ ও মন যে নিশ্চল বা স্থির রাখিতে পারে, তাহার জননী ধন্য।

সকল বিষয়ে যাহার দৃষ্টি সমভাবাপন্ন থাকে, যে তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়াছে, পরস্ত্রী যাহার নিকট মাতার স্থান গ্রহণ করিয়াছে, যাহার জিহ্বা ভুলিয়াও অসত্য বলে না, পরের ধনে যে হাত দেয় না;

মোহ এবং মায়া যাহাকে আচ্ছন্ন করে না, যাহার মনে দৃঢ় বৈরাগ্য বর্তমান, রাম নাম শুনিয়া যে তালি দেয়, তাহার তনুতে সকল তীর্থ বিরাজ করে;

যাহার মন বনে পড়িয়া আছ, যাহার মধ্যে কপটতা নাই, কাম এবং ক্রোধের বেগকে যে নিবারণ করিয়াছে,

নরসৈঁয়া বলিতেছেন, এমন লোকের দর্শন করিলে, সমগ্র কুল তরিয়া যায় ॥

প্রার্থনার পরেই গান্ধীজী কণ্ঠনের কাছে বসিতেন। নোয়াখালিতে প্রত্যহ তাঁহার প্রথম কাজ ছিল বাংলা পড়া। অক্ষর-পরিচয়ের জন্য নানা বই আসিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তাহার মধ্যে শ্রীঅনাথনাথ বসুর 'বড়দের পড়া' অবলম্বন করিয়া গান্ধীজী বাংলা শেখা আরম্ভ করিলেন। বইখানি বড়দের জন্য লিখিত, কিন্তু বাঙালী বয়স্কদের জন্যই লেখা হইয়াছে। অর্থাৎ ভাষা যাহাদের জানা আছে, তাহাদের লেখা ও পড়া শিখিবার জন্য ইহা যোগ্য বই। পাঠক্রম বেশ সহজ ধাপে ধাপে সাজানো। গান্ধীজী ইহাই পড়িতেন; কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি বলিলেন, বাংলা ভাষা তাঁহার জানা না থাকায় চলতি কথায় তাঁহার মাঝে মাঝে আটকাইয়া যাইতেছে। গান্ধীজী বলিতেন, বইখানি

বড়দের উপযোগী ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষার ব্যাপারে আমি তো বড় নয়, আমি শিশুদেরই মত। অতএব শিশুদের উপযোগী পুস্তকই আমার পক্ষে উপযোগী হইবে। সেই সময় নানা বই বাছিয়া হিন্দী ভাষায় লিখিত বাংলা শেখার উপযোগী আর একখানি বই আমরা অবলম্বন করিলাম। গান্ধীজী প্রত্যহ নিয়মিতভাবে হাতের লেখা লিখিতেন; প্রত্যহ অন্তত তিন চার লাইন না-দেখিয়া লেখা চাইই। একদিন আমায় বলিলেন, প্রতিদিন নিয়ম করিয়া অন্তত পাঁচ মিনিট বাংলা অভ্যাস করিতেই হইবে। অবশ্য এই পাঁচ মিনিট প্রায় রোজই দশ-পনরো মিনিটে পরিণত হইত। কিন্তু নোয়াখালিতে কোনদিনই পাঠের ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখি নাই। বিহারেও বাংলা পড়া চলিতে লাগিল, দিল্লীতে থাকার সময়ে শেষের দিকে তখনও বাংলা পড়া চলিতেছে, খবর পাইয়াছি। নোয়াখালি ছাড়িবার পর গান্ধীজী দিল্লী হইতে ১৯৪৭ সালের ৯ই মে পুনরায় পাঁচ দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তখন সঙ্গে হাতের লেখার অক্ষরে ছাপা দুইখানি বাংলা বই তাঁহার সঙ্গে ছিল। ছাপা অক্ষর পড়া ছাড়িয়া তখন তিনি প্রত্যহ ঐ বইগুলি হইতে কিছু কিছু পড়া অভ্যাস করিতেছেন। ছাপা এবং লেখা বাংলা অক্ষরের মধ্যে প্রভেদ তাঁহার চোখে বড় বেশি বলিয়া মনে হইত। সেই জন্য উহা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা ঠিক নিয়মিতভাবে তিনি দিনের পর দিন করিয়া চলিতেন। নিয়মের বা সংকল্প পালনের ব্যতিক্রম কিছুতেই ঘটিতে দিতেন না।

ভোরের বেলা ছাড়া অপর সময়ে অবসর পাইলেও বাংলা পড়ার অভ্যাস চলিত। একদিন সকালে পড়াইতে গিয়া দেখি, নূতন পাঠ আগে হইতে একটু পড়িয়া রাখিবার অবসর পান নাই। এক টুকরা কাগজে রহস্য করিয়া পেন্সিলে লিখিয়া আমাকে জানাইলেন:

A pupil to be worthy must make previous preparation for the lesson before the teacher. (সোমবার, ২৩ ১২-৪৬)

ইতিমধ্যে প্রায় ভোর ৫৷৷০ টার (বেঙ্গল টাইম) সময়ে গান্ধীজী বড় এক গ্লাস ভর্তি গরম জল খাইতেন। জলে তিন চামচ, অর্থাৎ প্রায় আধ ছটাক বা এক আউন্স মধু ও পাঁচ গ্রেন খাইবার সোডা মিশাইয়া দেওয়া হইত। সেই গরম জলের গ্লাসটি বাঁ হাতে কোন রুমাল বা ছোট কাপড়ের টুকরা দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া ডান হাতে একখানি কাঠের চামচ দিয়া গান্ধীজী অল্পে অল্পে

গরম জল পান করিতেন। তাহার আধ ঘণ্টা আন্দাজ পরে এক গ্লাসে প্রায় বারো আউন্স বা দেড় পোয়া লেবুর রস করিয়া আনা হইত। সচরাচর মোসম্বি অর্থাৎ শরবতী লেবু অথবা ঋতুঅনুসারে কমলালেবুর রস তৈয়ারি করা হইত ও তাহার সহিত এক আউন্স বা আধ ছটাক পাতিলেবুর রস চামচ দিয়া গুলিয়া দেওয়া হইত। ইহাই ছিল গান্ধীজীর প্রাতরাশ।

যে কোন কারণেই হউক, গান্ধীজীর গন্ধ সম্বন্ধে বোধ ছিল না। স্বাদের সম্পর্কে তিনি সাধনা করিয়াই উদাসীন হইয়াছিলেন। কমলা বা মোসম্বির রস পর্যাপ্ত পরিমাণে না হইলে আনারসের রসও কোনও কোনও দিন নোয়াখালিতে সকালে ঐ সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছে; গান্ধীজী কোনও দিন আপত্তি করেন নাই বা সে সম্পর্কে উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই।

ফলের রস করিবার জন্য কাচের এক রকম যন্ত্র পাওয়া যায়; লেবুটিকে পেটের কাছে আধাআধি ভাগ করিয়া মন্দিরের চূড়া অথবা বরণডালার শ্রীর মত ছুঁচালো অংশের উপরে চাপিয়া ঘুরাইলেই রস বাহির হইয়া পড়ে। আমরা যখন রস করিতাম, তখন খুব সাবধানে করিতাম; অর্থাৎ কোন অপচয় যাহাতে না ঘটে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতাম। কিন্তু মনু আসিবার পরে এ সকল ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করিলেন। সম্পূর্ণভাবে টিপিয়া সব রসটুকু বাহির না করিয়াও তিনি কমলা বা মোসম্বি ফেলিয়া দিতেছেন, ইহা লক্ষ্য করিতাম। অর্থাৎ যেখানে হয়তো দশটি লেবুতে আমরা কাজ সারিতাম, মনুর সেখানে এগারোটি লাগিয়া যাইত। অবশ্য লেবুর অকুলন আমাদের কোনদিন নোয়াখালিতে ঘটে নাই; গ্রামের নরনারী ও বাহিরের যাত্রীদলও প্রায়ই লেবু উপহার দিতেন। সেরূপ উপহার পাইলে গান্ধীজী সচরাচর সমবেত জনতার মধ্যে বালক-বালিকাদের ডাকিয়া ফল বিলাইয়া দিতেন। তাহা সত্ত্বেও আমাদের ভাণ্ডারে লেবুর অপ্রাচুর্য হইত না। গান্ধীজীর কড়া নির্দেশ ছিল, যেন একটি ফলও নষ্ট না হয়। ফলের রস খাইবার আগে হইতেই গান্ধীজী লেখার কাজ লইয়া বসিতেন। কোনদিন হয়তো কোন চিঠি পড়িয়া উত্তর দিতেন, বা গভর্মেন্টের নিকট নোয়াখালির অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানাইবার মত থাকিলে সে সম্বন্ধে পত্র লিখিতেন; মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে প্রেরণের জন্য হয়তো বা বিবৃতি রচনা করিতেন। কখনও কখনও দেখিতাম কোনও পুস্তক পাঠ করিতেছেন। আমাদের সঙ্গে বাংলা ভাষা শিক্ষার পুস্তক ভিন্নও প্রায়

৫০।৬০ খানি অন্য বইও ছিল। শ্রীরামপুর গ্রামে গান্ধীজী মোট ৪২ দিন ছিলেন বলিয়া আমাদের কিছু সম্পদবৃদ্ধি হইয়াছিল। অলডুস হাক্সলে লিখিত 'পেরেনিয়্যাল ফিলসফি' নামক পুস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া সুহরাবর্দি সাহেবের রচিত 'সেইংস অভ্ মুহম্মদ' প্রভৃতি বই বা প্রাকৃতিক চিকিৎসাবিধান সম্পর্কে হিন্দী ভাষায় লিখিত বইও আমাদের সঙ্গে ছিল। কদাচিৎ সেই পুস্তকের মধ্যে কোন একটি গান্ধীজী হয়তো কিছুক্ষণের জন্য পড়িতেন। কিন্তু তাঁহার বেশির ভাগ সময় চিঠিপত্র পাঠ করিতেই অতিবাহিত হইত। সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরও আলোচনা করিব।

ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে সাতটা বেলা হইয়া আসিত। সে সময়ে তিনি প্রাতর্ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেন।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

মুসাফিরের ডায়েরি

কষ্টিপাথর

শুক্লা একাদশীর রাত; জ্যোৎস্নাজড়িত নিশা। নদীর ধারে আমরা দুজন ব'সে গল্প করছি। মৃদুমন্দ বাতাসে নদীর শান্ত জলে অসংখ্য বীচিবিক্ষোভ জেগে উঠছে, আবার মুছে যাচ্ছে। এমনই কতশত প্রশ্ন মনে উদয় হয়—তারই খণ্ডবিচ্ছিন্ন আলাপ চলছিল। কাছে জেলেদের একটি মেছো নৌকা, তারই পাশে বাঁশের বেড়াজাল পাতা, কয়েকটা মাছ বন্দী হয়ে খলখল শব্দ করছে। ব্যাঙেরা তারস্বরে সমবেত সঙ্গীত জুড়ে দিয়েছে। ওপারে বালিয়াড়ির সাদা রেখার পারে বাবলাগাছের সারি—মাঝে দু-একটা কুটির। সমগ্র ছবিটা কেন যেন রঙের আভাস দেয় না—একটা উদাস ভাব জাগায়।

শুধু ব্যাঙের ডাক, বৃষ্টির তো কোন লক্ষণ নেই। গরমটা খুব বেশি—বর্ষাও দেরিতে নামবে।

এ যেন শুধু বাহ্য আড়ম্বর আছে আর প্রাণরসের প্রকাশ নেই।

ঢং ঢং ক'রে আমাদের প্রতিষ্ঠানের শোওয়ার শেষ ঘণ্টা বেজে উঠল। একটু সচকিত হয়ে ন'ড়ে-চ'ড়ে আবার মামুলী কথা কইতে লাগলুম। অনেকক্ষণ পরে একটা শেয়াল পাশ দিয়ে ছুটে গেল। রাত গভীরতর হয়েছে বুঝে উঠে পড়লুম, হাতে বাসনের গোছা তুলে নিলুম। শিবিরের সময়-মাপা

গণ্ডি-বাঁধা দিনের কর্মশেষে এসেছিলুম নদীতে বাসন ধুতে। স্বাধীনতার পূজারী আমরা, কিন্তু কি পরাধীন নিয়মতান্ত্রিক জীবন! আমরা দুজনে দুই কুটিরের বাসিন্দা। বড় ঘড়িটির দিকে চেয়ে দেখি, কাঁটা ঘুরে ঘুরে একটার কাছে এসে গেছে, অর্থাৎ বিলাতী মতে নতুন দিন আরম্ভ হয়েছে। নিতান্ত অন্যমনস্কচিত্তে চলেছি ঘরের পানে—আমার ঘরটা একটু একান্তে, শিবিরের ডাক্তারখানার কাছেই। সহবাসিনীরা নিদ্রামগ্ন—বাতি জ্বলেছে ক্ষীণভাবে, বাতাসে কম্পমান তার শিখা। ঘরের দাওয়ায় পা দিয়ে উঠতে যাব, হঠাৎ শুনলুম কে যেন খোনাগলায় ব'লে উঠল—পাঁনি দাঁও না—পাঁনি—বড় তেঁষ্টা।

ভয়ে পাথর হয়ে গেলুম, পা আটকে গেল, শিরদাঁড়া বেয়ে বিদ্যুতের শিহরণ ক্ষণেকের জন্য। "টুলুদি, একবার শুনুন না।"—ব'লে এগিয়ে দেখি—এক নারী-মূর্তি, অনাবৃত-বক্ষ, কোমরে একটু কাপড় জড়ানো, পেটটা ফোলা, বুকের হাড় জিরজির করছে, সরু হাত পা, কয়েকগোছা চুল মাথার এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে আছে, হাতে রূপার বালা।"

মুসলমানী মেয়ে।

বললুম, কে তুমি? কোত্থেকে এলে এখন?

আমি পাশের গাঁ নন্দদায় থাকি। জ্বর দেখাতে এসেছিলুম, রোদে আর জ্বরের ধমকে আর যেতে পারি নি। একটু পানি দাও।

আমার সাড়া পেয়ে অন্যেরা উঠে এল; বললে, দিদি, আমরাও এ শব্দ শুনেছি, কিন্তু আপনাকে ডেকে সাড়া না পেয়ে ভয়ে উঠি নি। কথাটা নেহাৎ অসঙ্গত নয়, রাত দুটো পর্যন্ত আমাকে ডেকে না পাওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ রাত জাগা আমার এক বিলাস। যা হোক কজনে ওকে প্রাণভরে জল খাইয়ে ধরাধরি ক'রে পাশে রোগীর ঘরে খাটে শুইয়ে দিল। ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনলুম, ফুঁড়ে ওষুধ দেওয়া হ'ল। ও একটু ঝিমিয়ে পড়ল, নীরবও হ'ল। আমরা যে যার শুতে গেলুম। ওর মাথার কাছে রইল জলের ভাঁড়।

বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না, ছটফট করছি। কিছু পরে মৃদু গোঙানির শব্দ ভেসে আসতে লাগল, তার আর বিরাম নেই। তবু উঠে দেখতে গেলুম না। ভাঙা ভাঙা ভাষায় ওর কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলুম যে, ও তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, স্বামী আছে, কিন্তু ভাত-কাপড়ের দায় বহন করে না, মা ও শাশুড়ী আছে। নিতান্ত দুঃখী, বহুদিন ভুগছে। সঙ্গী একজন বাহনরূপে এসেছিল, কিন্তু

বেগতিক দেখে ফেলে পালিয়েছে। কিন্তু ও এল কখন, কোথায় ছিল সারাদিন? সন্ধ্যাবেলাও আমি ঘরে ছিলুম, ওকে দেখি নি বা শুনি নি তো? এই তো স্ত্রীলোকের মূল্য—এই গরিবের জীবন।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। আকাশে সামান্য প্রভাতী রঙ ধরতেই উঠে গেলুম। কোথাও রোগীর চিহ্ন মাত্রও নেই। এ কি ভৌতিক কাণ্ড, না, আমার উষ্ণ মস্তিষ্কের স্বপ্নজাল? দীর্ঘ অবকাশের মাঝে মাঝে আবার কাতরানি শোনা গেল। শব্দ অনুসরণ ক'রে খুঁজে দেখি, সামান্য দক্ষিণে একটা বুনো আগাছার ঝোপের পাশে মাটিতে ও শুয়ে আছে—প্রায় বিবস্ত্র হয়ে। কোনও প্রশ্নের সাড়া পেলুম না। বুঝলুম, বিকারের ঝোঁকে উঠে এসেছে। বিকারের ঝোঁকেই আমার ঘরের বারান্দায় গিয়েছিল—হয়তো সারা সন্ধ্যা এমনই কোথাও প'ড়ে ছিল। সকল বিপদে যাকে প্রথম মনে পড়ে, সেই বিশুদার ঘরের দিকে ছুটলুম।

বিশুদা, ও বিশুদা, উঠুন শিগগির একবার বেরিয়ে দেখুন।

কি, হ'ল কি আবার? আপনার জ্বালায় আর ঘুমোবার জো নেই। ঘোড়া-টোড়া এল না কি?

না, ওসব নয়, আপনি আসুন না। মাঝে মাঝে ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে অন্যের গরু ঘোড়া আমাদের সব্জিবাগানে ঢুকে ক্ষতি করে আর ওঁর ডাক পড়ে।

সব ঘটনা বললুম। প্রতিষ্ঠানের চালককেও জানালুম। বিশুদা এসে দেখে বললেন, এর আয়ু আর ঘণ্টা দুই মাত্র। মরার আগে ওকে প্রতিষ্ঠান থেকে সরাবার জন্য ব্যস্ত হলেন অনেকে। আমি চাইলুম ওর আত্মীয়দের অন্তত খবরটা দিতে, না হ'লে যে দিনকাল, হিন্দুরা মেরে ফেলেছে ব'লে অপবাদ দেবে, হয়তো এই অজুহাতে দ্বন্দ্বের ছিদ্র হয়ে থাকবে। কেউই মানুষটার দরদের যে কিছু দরকার আছে, এদিকে নজর দিলুম না, নিজেরা নিষ্কলঙ্ক থাকতে চাইলুম। তৎক্ষণাৎ একজন নলদায় ছুটল।

তখন জাতীয় সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আমাদের প্রভাতফেরী ও সূত্রযজ্ঞর নিয়মিত ধারাবাহিক অনুষ্ঠান চলছে; আমরা ভোরে সারি বেঁধে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি দিয়ে গ্রামের পথে যাত্রা করলুম। আমার হাতে প্রেম ও সাম্যের প্রতীক চরকা। দু-এক পা গিয়ে আমি ফিরে এলুম, একটি সঙ্গিনীও এল। সে আর

বিশুদা ওকে ধ'রে ঘরে শুইয়ে দিল,—কাপড় বদলে দিল, সেই পরিত্যক্ত মলদুষ্ট কাপড়টা পুড়িয়ে, বিশোধক ওষুধ দিয়ে জায়গাটা ধুয়ে দিল।

স্বার্থপর ও শুশ্রূষাবিমুখ মন আমার এ কাজে নিতান্ত অনভ্যস্ত। আট-দশ হাত দূরে থেকে শুধু মূক দর্শক হয়ে রইলুম। চরকাটা মাটিতে প'ড়েই রইল। মনে হ'ল, মিথ্যে, এ সব মিথ্যে। এতদিন কর্মচক্রে আবদ্ধ থেকে নিজেকে ও পরকে ঠকিয়েছি। কতদিন কত বক্তৃতায়, কত বৈঠকে, কত ঘরোয়া ব্যক্তিগত আলোচনায় বিশ্বপ্রেম, মৈত্রী, ধনী-দীনের সমভাব, কিষাণ-মজদুর-রাজ, সমাজসেবা প্রভৃতির ফাঁকা বুলি আউড়েছি। সমাজের সেবা করার অমোঘ ব্যক্তিগত কর্তব্যের ঔচিত্য বুঝিয়েছি। নিজেও কি বুঝি গ'ড়ে তুলছি, এই অভিমানের অচলায়তনের স্বপ্নে মগ্ন থেকেছি। আজ যখন বিধাতা আমাকে কষ্টিপাথরে ঘ'ষে নিলেন, তখনই মেকি হয়ে গেলুম, একেবারে খাদে ভরা সোনার জলে মোড়া পিতল বেরিয়ে পড়ল। সারা ভারতের জনগণের দুঃখের কল্পনায় ম্লান ও ক্লিষ্ট যার চিত্ত, সেই আমি আজ একজন বাস্তব মানুষের মরণকালে পাশে দাঁড়াতে পারলুম না, একটা 'আহা' উচ্চারণ করতে পারলুম না, একবার মুমূর্ষুর শীতল আড়ষ্ট হাতখানা নিজের প্রাণময় হাতে ধরতে পারলুম না। না পেলুম সংসারী মায়ের অবুঝ মোহান্ধ স্নেহ, না পেলুম 'সন্ন্যাসী উপগুপ্তে'র প্রেমের প্লাবনস্নাত শুচিশুদ্ধ চিত্ত। তবু তো এ কালাজ্বরের রোগী; কলেরা নয়, বসন্ত নয়, যক্ষ্মা নয়। ভেদদৃষ্টি রয়েছে ষোল আনা। ও নিঃসহায়, পরম দরিদ্র, তাই তো ওকে উপেক্ষা করেছি, জ্বরকাতর ওকে একা ফেলে রেখে সুখশয্যায় শুয়েছি। আমি আবার ভেক্ নিয়ে হয়েছি গ্রামসেবিকা, গান্ধীশিষ্যা! গান্ধীজী, ওঁর এলাকায় কখনও এমন অঘটন ঘটতে দিতেন না। আমি শুধু তঞ্চকের বঞ্চনার পথ বেছে নিয়েছি। ঘরের নিশ্চিত কর্তব্যের স্থূল প্রয়োজনকে পিছনে ফেলে এসেছি, সংসার করার দায়বহনে ভয় পাই, আবার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের দাবিদাওয়ার সম্মুখীন হওয়ার অযোগ্য। নিজেকে কিছুতে সইতে পারছিলুম না, ক্ষমা করতে পারছিলুম না। এমন ভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে। কে এসে বললে, ও মারা গেছে।

একবার দেখতে গেলুম। নিস্পন্দ দেহ, আবক্ষ খাদি কাপড়ে ঢাকা। রুক্ষ রুগ্ন কয়েকগাছা চুল এলোমেলো ছড়ানো, খসখসে মুখের চামড়া, অত্যন্ত কুৎসিত অকরুণ আকৃতি। নেহাৎ অনাত্মীয় নির্বান্ধব পরিবেশে বিধর্মীর দেওয়া জল

খেয়ে ওর প্রাণ শেষ হ'ল। কেউ এক ফোঁটা চোখের জল ফেললে না, কাউকে ওর অন্তিম বাসনা জানিয়ে যেতে পারল না। ওর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার প্রিয়জনের মুখ ভেসে উঠল মনে, যদি তাদের এমন হ'ত, কি করতুম? এমনই নিশ্চিন্ত আরামে শয্যাশায়ী হতুম কি? কতদিন দর্পভরে মাকে বলেছি, বেশ, এ পথে দুঃখ পাই পাব, না হয় পথে প'ড়ে মরব।—সে মৃত্যু কি এমনই? মাগো—

ওর আত্মীয়ারা এল, এল ওর স্বামী। বিনিয়ে বিনিয়ে একটু কাঁদল। জীবনভোর অনাদৃত বঞ্চিত লাঞ্ছিত বুভুক্ষু অস্তিত্বে শেষে মরণের পর ও দুটো জিনিস পেলে, একটা আট টাকা দামের শবাচ্ছাদন বস্ত্র আর এই শিরোপা যে—ও খুব ভাল রাঁধতে পারত।

"মুসাফির"

পদচিহ্ন

তারপর চ'লে গেছে, সুদীর্ঘ আঠারো বৎসর।

উনিশ শো ষোল সাল, আর উনিশ শো চুয়াল্লিশ সাল। পনেরো বছরের গৌরীকান্ত আজ পঁয়তাল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ়।

আজ তেরো শত একান্ন সালের ১লা বৈশাখ। সুদীর্ঘকাল ধ'রে জীবন-যুদ্ধে কত আঘাত কত দুঃখ সহ্য ক'রে, জয় ক'রে, প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রে ফিরে এসেছে নবগ্রামে। তার মা কাশীর বউ একদা বর্ষণমুখর রাত্রে ভিজে মাটিতে যে পদচিহ্ন অঙ্কিত ক'রে নবগ্রাম থেকে সুগভীর বেদনা বুকে বহন ক'রে চ'লে গিয়েছিলেন কাশী, সেখান থেকে তিনি আর ফিরেন নাই। কিন্তু তাঁর কামনা পূর্ণ ক'রে গৌরীকান্ত ফিরেছে; গৌরীকান্ত আজ প্রতিষ্ঠাবান লেখক, জীবনে রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সাহিত্য-ক্ষেত্রে গিয়ে সে নূতন কথা বলছে। যারা দুঃখ দৈন্য কঠোরতম নির্যাতনকে বরণ ক'রে বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে মুক্তির গান গাইলে, তাদের কথা যাঁরা গেয়ে গেলেন, তাঁদের পথকেই সে অনুসরণ করেছে। তারা ছাড়াও অগণিত মানুষ, যারা অবহেলিত উপেক্ষিত হয়েও এই দুঃখবরণকারী মুক্তিসাধকদের নীরব সমর্থক মুগ্ধ মূক ভক্ত, যারা প্রাণের নীরব শক্তিকে এই সাধনার সঙ্গে যুক্ত করেছে নীরবে, তাদের কথা বলছে। দেশ শুনছে। কত কাল ধ'রে নবগ্রাম শুনে এসেছিল বহির্জগতের বাণী, বহির্জগতের ভাবের ঢেউ এসে তার তটভূমে আঘাত করেছে, আলোড়ন

তুলেছে, পুরাতনকে ভেঙেছে, নূতনকে গড়ার প্রেরণা দিয়েছে; তার মধ্যে নবগ্রামের হৃদয়ে উঠেছিল একটি তরঙ্গ, সেই তরঙ্গ বহির্জগতে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রচার করেছে নবগ্রামের কথা। এইটুকুই জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা ব'লে মনে করে গৌরীকান্ত। তাই সে দীর্ঘকাল পরে ফিরে এসেছে গ্রামে। প্রণাম করতে এসেছে।

কিন্তু কোথায় তার সে নবগ্রাম? নবগ্রাম আজ প্রায় শ্মশানে পরিণত হয়েছে। ত্রিশ বৎসরে বিরাট পরিবর্তন ঘ'টে গেছে। নাই, সে নবগ্রাম নাই, হারিয়ে গেছে কাল-সমুদ্রে। ধ্বংসস্তূপ, ধ্বংসস্তূপ, আর ধ্বংসস্তূপ! বর্ধিষ্ণু গৃহস্থদের মাটির কোঠাবাড়িগুলি ভেঙে পড়েছে। মানুষ নাই। তের শো পঞ্চাশের মহামারীতে প্রায় সব শেষ হয়ে গিয়েছে। যারা আছে তারা মানুষ নয়, দেহে মনে কোথাও আর কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব অবশিষ্ট নাই,—দেহ বলতে চর্মাবৃত কঙ্কাল, মন বলতে হতাশার নৈরাশ্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হতচেতন জৈব জীবন—এ ছাড়া আর কিছু নাই।

তাই তো আজ সকালে সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্যকে প্রণাম ক'রে বলেছিল, তের শো একান্ন সালের হে সূর্য-দেবতা, তোমার রশ্মিজাল থেকে সংহরণ কর সকল কল্যাণ, শুধু নবগ্রামের আকাশের উপর থেকেই নয়, এই দেশের সকল প্রাণীর উপর থেকেই, সংহরণ কর তোমার সকল কল্যাণকর রশ্মিজাল, জাগ্রত হও তুমি, মহা রুদ্রতেজে দগ্ধ কর, ভস্মীভূত কর, অবসান কর সকল যন্ত্রণার, সকল দুর্ভাগাদের, সকল বন্ধনের, উত্তাপে শুষ্ক কর সকল অশ্রু।

শান্তি বললে, এই কি আপনার বইয়ের সমাপ্তি?

গৌরীকান্ত বললে, এই শেষ।

শান্তি বললে, শেষ তো হয় নি।

হেসে গৌরীকান্ত বললে, ইতিহাসের শেষ হয় না। ইতিকথা, যা একটি মানুষকে অবলম্বন ক'রে চলে, তার শেষ আছে। তোমার আমার কথার শেষ আছে। নবগ্রামের কথার শেষ নাই।

চারু ক্লান্ত দেহে একপাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। জীর্ণ মলিন কাপড় তার পরনে, বয়স এবং দারিদ্র্যের ক্লান্তিরেখা তার মুখখানিকে শীর্ণ রেখাঙ্কিত ক'রে তুলেছে। গৌরীকান্ত তার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ওই আমার অতীত নবগ্রাম, আজ ওই রয়েছে বর্তমান জুড়ে। তুমি আমার ভবিষ্যতের নবগ্রাম।

শান্তির মুখখানি লাল হয়ে উঠল। সে বললে, আমি তো নবগ্রামের নই।

গৌরীকান্ত বললে, তুমি নবগ্রামেরই। কাশীতে তোমাকে দেখলাম যেদিন, সেদিনের কথা মনে আছে? রজনী-পিসীমা বললেন মাকে, এইটি আমার সৎ-ছেলে, এইটি মেয়ে। মা বললে, অবিকল বিশুর মত দেখতে। রজনী-পিসীমা বললে, তুমি ঠিক ধরেছ কাশীর বউ, ও ঠিক আমার ছোট কালের বিশুর মত দেখতে। দুজনেই বাপের মুখ পেয়েছে। ও যদি বিশুর মৃত্যুর পর জন্মাত কাশীর বউ, আমি ভাবতাম, বিশুই আমার ফিরে এসেছে আমার সতীনের কোলে। আমি কিন্তু সেদিন থেকেই দেখেছিলাম, তোমার মধ্যে বিশুদিকে। বিশুদির আত্মাকে আমি তোমার মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তুমি বি. এ. পাস ক'রে আজ মাথা উঁচু ক'রে বিশুদির বিদ্রোহকে সার্থক ক'রে এখানে এসে মেয়েদের শিক্ষার ভার নিয়েছ, আমার মনে হচ্ছে, বিশুদির বিদ্রোহ আজ বিপ্লবে পরিণত হয়েছে। তাই তো আশা করছি, কল্পনা করতে পারছি—তুমিই আমার ভবিষ্যৎ নবগ্রামের রূপ। তাই তো আশা করতে পারছি, এই ধ্বংস-স্তূপের মধ্য থেকে আবার একদা হবে নূতন সৃষ্টি—নব রচনা।

একটুখানি স্তব্ধ থেকে, আবার গাঢ়স্বরে সে বললে, নইলে আজ যা চোখে দেখেছি—নবগ্রামের রূপ, দীর্ঘ বৈদেশিক শোষণ, বিদেশীর চক্রান্তে সৃষ্ট তেরো শো পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ, মহামারী নবগ্রামের যে অবস্থা ক'রে দিয়ে গিয়েছে, তাতে তো কল্পনা করতে ভরসা পাই না, নবগ্রামের জীবনে, দেশের জীবনে, হয়তো সমগ্র পৃথিবীর জীবনেই কোনদিন আসবে না নবপ্রভাত। তোমায় দেখে ভরসা পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, শেষ হয়তো নূতন ক'রে রচনা করতে হবে।

শান্তি তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে, বিশুদিকে আপনি সত্যিই ভালবেসেছিলেন?

গৌরী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, আমার নবগ্রামের কাহিনীর মধ্যে সে কথা কি ফুল হয়ে ফুটে ওঠে নাই শান্তি?

শান্তিও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

গৌরীও নীরব হয়ে ব'সে রইল বাইরের দিকে তাকিয়ে। মনে পড়ছে আরও অনেক কথ। কাশীর কথা। রজনী-ঠাকরুণ নূতন ক'রে ঘর বেঁধেছিলেন কাশী গিয়ে। হঠাৎ এক সতীনের কঠিন রোগের সংবাদ পেয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। মৃত্যুকালে সতীন একটি ছেলে এবং একটি মেয়েকে সাশ্রুনেত্রে কাতর মিনতি

জানিয়ে রজনী-ঠাকরুণের হাতে সঁপে দিয়ে বলেছিলেন, ওদের ভার যদি আপনি নেন দিদি, তবেই তো— । আর তিনি বলতে পারেন নাই, চোখের জলে বুক ভেসে গিয়েছিল।

রজনী-ঠাকরুণ তাদের ভার নিয়ে তাঁকে নিশ্চিন্ত করেছিলেন। তারপর তাদের নিয়ে গিয়েছিলেন কাশী, নবগ্রামে থাকতে পারেন নাই। কাশীতে গিয়ে কাশীর বউকে বলেছিলেন, তুমি চ'লে এলে, আমি আর থাকতে পারলাম না ভাই। মনে হ'ল, এখানে যেন আমার ঠাঁইই নাই।

নবগ্রামের তখন জমজমাট অবস্থা। ঝলমল ঐশ্বর্যে দীপ্যমান পুরীর মত নবগ্রাম তখন উজ্জ্বল ঐশ্বর্যময়ী। সে আনন্দের হাটে তিনি থাকতে পারেন নাই। বিশেষ ক'রে কাশীর বউ চ'লে যাওয়ার পর ঐশ্বর্যময়ী আনন্দমুখর নবগ্রাম তাঁর কাছে আরও অসহ্য ব'লে মনে হয়েছিল।

দু বৎসর পর মুক্তি পেয়ে গৌরীকান্ত গেল কাশী। শান্তির দাদা অমল হ'ল তার বন্ধু। অমলকে দেখে গৌরীর মনে পড়ে নলিনী বাগচীকে। গৌরী যেদিন গান্ধীজীর প্রবর্তিত অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিলে, সেদিন অমলের চোখ দিয়ে আগুন ছুটে বেরিয়েছিল। উত্তর-ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অমলের পদচিহ্ন আঁকা আছে। অমলও নলিনীর মত পুলিসের গুলি খেয়ে মরেছিল। অমলের বোন শান্তি। তেজস্বিনী শান্তি নবগ্রামের শ্মশানে ফিরে এসেছে, ভবিষ্যতের নবগ্রামের রূপের আভাস নিয়ে। তার মা কাশীর বউ একদা যে পদচিহ্ন এঁকে গভীর রাত্রে গ্রাম ত্যাগ করেছিলেন, সেই পদচিহ্ন ধ'রে এসেছে শান্তি। তিনিই তাকে ছেলেবেলায় পড়িয়েছিলেন, তিনিই তার ইস্কুলে পড়ার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন। বলেওছিলেন, শান্তি, পারিস তো লেখাপড়া শিখে নবগ্রামে ফিরে যাস মা। আমার নিজের মেয়ে নাই, থাকলে তাকেই পাঠাতাম। বড় দুঃখ বড় অপমান ভোগ ক'রে সেখান থেকে চ'লে এসেছি। তুই সেখানে যাস। সেখানে গিয়ে মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের সক্ষম ক'রে তুলিস। তাদের বড় দুঃখ বড় লাঞ্ছনা।

শান্তি তাঁর কথা রেখেছে।

শান্তি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠল। বললে, আমি যে এইবার বাড়ি যাব গৌরীদা। রাত্রি কত হ'ল দেখুন তো?

রাত্রি? ঘড়ির দিকে চেয়ে চমকে উঠল গৌরীকান্ত। এ যে একটা বাজে!

একটা? তাই তো! তারপর হেসে ফেলে শান্তি বললে, নবগ্রামের লোকের খুব একটা বড় খোরাক হবে। যাকগে। আজ দুপুরে আপনাকে প্রণাম জানিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলাম, সেটা দেওয়া হয় নি। নিন। পয়লা বৈশাখের নববর্ষের প্রণাম।

কবিতাটি পড়তে পড়তে গৌরীকান্তের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ঠিক এই মুহূর্তে বাইরে থেকে কেউ ডাকলে, গৌরীকান্তদা! চমকে উঠল গৌরীকান্ত।—কে?

আমি চক্রধারী।

চক্রধারী!

হ্যাঁ। একবার আপনাকে যেতেই হবে। হালখাতায় যাঁরা এলেন, তাঁরাই বললেন, তিনি কই? দুবার এসে ফিরে গিয়েছি। দেখলাম—

দরজা খুলে বেরিয়ে এল গৌরীকান্ত। ডাকলে, এস শান্তি।

শান্তিও বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। গৌরীকান্ত দরজা বন্ধ ক'রে তালা দিয়ে বললে, চল।

শান্তি মৃদুস্বরে বললে, চারুদি?

থাক, ঘুমোক। তারপর আরও মৃদুস্বরে বললে, ও বেচারাকে আর মিথ্যা কলঙ্কের পাত্রী করা কেন বল? যা ঘটবে, সে আমাদের ভাগ্যেই ঘটুক। আমরা সইতেও পারব। পারবে না?

শান্তি তার দিকে তাকালে।

গৌরীকান্ত তার হাত ধ'রে বললে, না হয় নবগ্রামের ভবিষ্যৎ রচনার ব্রত আমরাই গ্রহণ করব হাতে হাত মিলিয়ে।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে গৌরী বললে, তোমার কবিতাটি বড় ভাল লাগল। ওই কবিতাটি দিয়েই শেষ করব আমার বই। শুধু পালটে দেব প্রথম কথাটি। 'হে গুরু'র জায়গায় 'জননী' কথাটি বসিয়ে দেব।

জননী, গ্রহণ কর রিক্ত নমস্কার
আজিকে নূতন বর্ষে, নব চেতনায়
ভবিষ্যের পদধ্বনি যেন শোনা যায়
অধুনার অন্ধকারে। লুপ্ত চারিধার
আলোকে প্রকাশমান হবে যে আবার।
তার মাঝে দেখি যেন মোর কল্পনায়,
নতশির পাঞ্চালীর রুক্ষকেশভার
বেণীতে সম্বদ্ধ হ'ল বিশ্বের সভায়।
দেখি যেন কঙ্কালের পঞ্জরে পঞ্জরে
জীবনের জয়গানে বিপ্লব সঞ্চরে।

শান্তির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

চক্রধারীর ওখানে ওরা এসে পড়েছিল। গৌরীকান্ত বললে, তুমি একটু অপেক্ষা কর চক্রধারী, ওঁকে আমি পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।

চক্রধারী হাত জোড় ক'রে বললে, আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে সাহস করি নি। কিন্তু যখন গৌরীদার কৃপায় আপনাকে পেয়েছি, তখন দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দিতেই হবে।

শান্তি বললে, আমায় মাপ করবেন।

ব'লে সে আপন পথে একাই এগিয়ে গেল।

গৌরীকান্ত বললে, দাঁড়াও শান্তি।

দরকার নেই। আমি একাই যেতে পারব।

বলতে বলতেই, অসমসাহসিনী অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল। গৌরীকান্ত ভবিষ্যতের সঙ্গে কল্পনা করেছিল ওর; ভবিষ্যৎ যেন চকিতের মত দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে, সূর্য উঠলে আবার কাল সকালে শান্তি আসবে।

হঠাৎ ছুটে এল বাউরীদের শম্ভু।

বাবু!

কি?

শিগগির চলেন মাশায়। চারুদিদিকে—

কি?

চারুদিদিকে সাপে কামড়েছে।

সাপে? কি সাপ রে?

আজ্ঞে সেই পেকাও গোখুরটা, আপনকাদের বাড়ির আশেপাশে ঘোরে—

সেই কালের সঙ্গে তুলনা করেছিল গৌরীকান্ত—সেই সাপটা?

কালের বিষে জর্জরিত চারু, দুঃখিনী চারু, অতীতের অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গেল?

গৌরীকান্ত উঠে আলোটা হাতে নিয়ে বললে, শম্ভু, তুই বালিকা-বিদ্যালয়ের দিদিমণিকে ডেকে আন্। বুঝলি? খবর পেলেই সে আসবে।

শেষ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী*

১৮৬৪-১৯১৯

১

ভূমিকা

"বন্দে মাতরম। বাংলা নামে দেশ তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ কাশী পার হ'য়ে মা পূববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ ক'রে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলা দেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, গাল-ভরা হাসি হ'ল।...এমন সময় মর্ত্যে কলির উদয় হ'ল। লোকে ধর্মকর্ম ছাড়তে লাগল। ব্রাহ্মণে-সজ্জনে অনাচারী হ'ল সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হ'ল। সকলে বেদবিধি অমান্য করতে লাগল। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি চঞ্চল হলেন। লক্ষ্মী ভাবলেন—হায়, আমি বাংলার লক্ষ্মী; আমাকে বুঝি বাংলা ছাড়তে হ'ল।"

—বাংলার এই রূপ যিনি দেখিয়াছিলেন, বাঙালী তাঁহাকে ভুলিয়াছে। এই সচল নদীমাতৃক দেশের মানুষের ভোলাটাই হয়তো স্বভাব—বাঙালী কাহাকেই বা মনে রাখিয়াছে! এক শত বৎসর পূর্বে বাঙালী কি ছিল, বাঙালী তাহা জানে না। তাই বাঙালী কোন কিছু ভুলিয়াছে বলিয়া দুঃখ হয় না—এখন দুঃখ হয় বাঙালী অকৃতজ্ঞ বলিয়া। উপরে যাঁহার লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্বপুরুষ বাঙালী ছিলেন না, বাঙালী হইয়াছিলেন। বাঙালী কোনও দিন বাংলা দেশকে এমন প্রাণ দিয়া ভালবাসে নাই, বাঙালীত্বকে কেহ এমন পূজা করে নাই, যেমন অবাঙালার সন্তান এই রামেন্দ্রসুন্দর করিয়াছেন। তিনি বাংলা দেশ ছাড়িয়া কখনও এক পা নড়িতে চাহিতেন না—'বন্দে মাতরম্‌' বলিয়া এই হতভাগ্য দেশের মাটি আঁকড়াইয়া তিনি আমৃত্যু পড়িয়া রহিলেন। বঙ্গভঙ্গের পর যে রাখীবন্ধন ও অরন্ধন-উৎসবে বাঙালী মাতিয়াছিল, তাহার সূচনা হইয়াছিল রামেন্দ্রসুন্দর আর

---

* রামেন্দ্রসুন্দরের পরিচয় ধারাবাহিক চারিটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।—স. শ. চি.

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায়। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর মনে জাগিয়া আছেন, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দর কোথায়? দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই কি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে?

বন্ধু ও সতীর্থ জানকীনাথ ভট্টাচার্য সত্যই লিখিয়াছিলেন:—"স্বদেশ-প্রীতিই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের নিয়ন্ত্রীশক্তি ছিল। তিনি দেশসেবায় স্বেচ্ছাকৃত সৈনিক ছিলেন, লেখনী ছিল তাঁহার নির্বাচিত অস্ত্র। ভারতের অতীত গৌরবে গৌরব বোধ করিতে ও বর্তমান অবনতিতে বেদনা পাইতে, তাঁহার মত আর কাহাকেও দেখি নাই। অতীত ও বর্তমানের এই সংমিশ্রণেই রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-চেষ্টার বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মধ্যে এক দিকে ছিল ঋষিসন্তান-সুলভ প্রশান্ত আধ্যাত্মিকতা, অপর দিকে ছিল বর্তমান মুহূর্তের দ্বন্দ্ব কোলাহল, ক্রন্দনবিলাপের সজীব অনুভূতি। এই ভারত-প্রেমের দ্বারাই তাঁহার জীবন-চরিত ও কার্যকলাপ বুঝিতে পরা যায়। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা যে একজন মহাপণ্ডিত বা অভিজ্ঞ শিক্ষক বা মহারথ সাহিত্য-সেবক হারাইয়াছি, তাহা নহে; আমরা জাতীয় আদর্শের ভাবোন্মত্ত প্রচারকও হারাইয়াছি।"

রামেন্দ্রসুন্দর দীর্ঘজীবী ছিলেন না, মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু ইহার মধ্যেই তিনি বাংলা সাহিত্যকে যে অক্ষয় সম্পদ্ দান করিয়া গিয়াছেন, আশা হয়, বাঙালী একদিন তাহার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিয়া ধন্য হইবে। বিজ্ঞান ও দর্শনকে এমন ভাবে আত্মসাৎ করিয়া বাংলা ভাষায় রূপদান করিতে তাঁহার মত আর কেহ পারে নাই; পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য জ্ঞান-সমুদ্রে অবগাহন করিয়া তিনি মাতৃভাষার ভাণ্ডারে বহু রত্ন উপহার দিয়াছেন, আমাদের দুঃখ, ভাণ্ডার-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাঙালী সে রত্নগুলির দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। এই গ্রন্থরত্নরাজি পড়িয়া হজম করিবার মত মনের দৃঢ়তা ও স্থৈর্য বাঙালীর আছে কিনা সন্দেহ হয়। বলহীন কখনও আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। বাঙালী যে দিন মনের শক্তি ফিরিয়া পাইবে, রামেন্দ্রসুন্দর সে দিন আবার বাঁচিয়া উঠিবেন।

রামেন্দ্রসুন্দর বলিতে আমরা শুচিশুভ্র একটি পূত চরিত্র বুঝি, কর্মনিষ্ঠা ও জ্ঞানসাধনায় যাহা কঠোর, নিঃস্বার্থতা ও অবারিত আনন্দে যাহা চিরপ্রসন্ন। এমন চরিত্রের প্রভাবে পড়িয়াও বাঙালী কাদা মাখিয়া বসিয়া আছে, ইহা

অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় তাহার আর কি হইতে পারে! তিনি নিজে বিদ্যার দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অর্জিত অমৃত জাতির ওষ্ঠ পর্যন্ত উঠিল কই! জন্মভূমি ও মাতৃভাষার কল্যাণে যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া গেলেন, জাতির জীবনে তিনি স্থান করিতে পারিলেন কই?

জন্ম : বংশ-পরিচয়

মুর্শিদাবাদ জেলায় শক্তিপুরের নিকট পূতসলিলা ভাগীরথী-তীরে টেঁয়া বৈদ্যপুর নামে গণ্ডগ্রাম অবস্থিত। ন্যূনাধিক দুই শত বৎসর পূর্বে, বন্ধুল-গোত্রীয় জিঝৌতিয়া ব্রাহ্মণ হৃদয়রাম ত্রিবেদী এই গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্বাচন করেন। তাঁহার প্রপৌত্র বলভদ্র জেমো-রাজবাটীতে লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা দয়াময়ীকে বিবাহ করিয়া জেমোয় বাস করিতে থাকেন। বলভদ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণসুন্দর, কৃষ্ণসুন্দরের দুই পুত্র গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দর। এই গোবিন্দসুন্দরই রামেন্দ্রসুন্দরের পিতা। তাঁহার পিতা, পিতৃব্য, পিতামহ সকলেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন; কেহ নাটক লিখিয়াছেন, কেহ কবিতা লিখিয়াছেন। এই কাব্যামোদী পরিবারে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ আগস্ট (১২৭১, ৫ই ভাদ্র) চন্দ্রকামিনী দেবীর গর্ভে রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম হয়।

ছাত্র-জীবন

রামেন্দ্রসুন্দরের ছাত্র-জীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল। এ সম্বন্ধে তিনি নিজে যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছিলাম [২৫ মে ১৮৭০]। পিতৃদেব পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতেন,—ক্লাসের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে পারিলে গৌরব নাই; কিন্তু ফাঁকি দিয়া উচ্চে উঠিবার চেষ্টা লজ্জাকর। সেই সঙ্গে স্বধর্মের প্রতি, স্বদেশের প্রতি ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলাম। বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগও সেই বয়সে পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল। পিতৃদেবের জ্যোতিষশাস্ত্রে ও গণিতে অসামান্য অধিকার ছিল। বাল্যকালেই তাহার ফলভাগী হইয়াছিলাম।

পাঠশালার বার্ষিক পরীক্ষায় প্রতি বৎসর প্রথম পুরস্কার পাইতাম

ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় [নবেম্বর ১৮৭৫] জেলার মধ্যে প্রথম স্থান ও বৃত্তি লাভ করি। ইতিমধ্যে বাঙ্গালা বহি পড়ায় নেশা জন্মিয়াছিল।

পরে কান্দি ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হই [২১ জানুয়ারি ১৮৭৬]। প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পাওয়ায় পিতৃদেবের দুঃখ হইয়াছিল। পরে আর এরূপ ঘটনা হয় নাই। ইংরেজী স্কুলে পড়িবার সময় বাঙ্গালা কবিতা লিখিতাম। এন্‌ট্রান্স পরীক্ষার বৎসরে পিতৃদেবের মৃত্যু ঘটে। এই দুর্ঘটনায় অবশ হইয়া পড়ি ও পরীক্ষার ফলে হতাশ হই। ১৮৮১ অব্দে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান পাইয়া ২৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করি।

পিতৃব্যদেবের সহিত কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কালেজে ভর্ত্তি হই। এই সময়টা পড়াশুনায় বড় অমনোযোগ ঘটে। পাঠ্য পুস্তক না পড়িয়া বাহিরের বহি (ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস পুস্তক) অধিক পড়িতাম। ফলে ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় [ইং ১৮৮৩] দ্বিতীয় স্থানে নামিতে হয়। ২৫৲ টাকা বৃত্তি ও আনুষঙ্গিক সুবর্ণ-পদক লাভ করি।

১৮৮৪ সালে পিতৃব্যের মৃত্যু পুনরায় অবসন্ন করিয়াছিল। বি-এ পরীক্ষাতেও তেমন যত্নপূর্ব্বক পড়িতে পারি নাই। এই সময়ে বিজ্ঞান গ্রন্থের অধ্যয়নে নেশা জন্মে। ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস পড়া একরূপ ত্যাগ করি। ১৮৮৬ সালে বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনারে প্রথম স্থান ও ৪০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করি। এই সময়ে 'নবজীবনে' আমার প্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দুই একটা প্রবন্ধ বেনামীতে লিখিয়াছিলাম।

পর-বৎসর পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে এম-এ দিবার জন্য প্রস্তুত হই। রসায়নের অধ্যাপক পেডলার সাহেব একটি "ক্লাস এক্সারসাইজ" দেখিয়া সন্তুষ্ট হন ও তখন হইতেই প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতে উৎসাহিত করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন; ওই পরীক্ষায় আমার কাগজ সম্বন্ধে তিনি সেই দিন আপনার অভিপ্রায় ক্লাসের সম্মুখে ব্যক্ত করেন;—"আমি এ পর্য্যন্ত যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি, তন্মধ্যে এই Out and out the best"—(কিঞ্চিৎ থামিয়া পুনর্ব্বার)—"Out and out the best।" তাঁহার ওই বাক্যে উৎসাহের সহিত প্রেমচাঁদের

জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রথম স্থান, আনুষঙ্গিক সুবর্ণপদক ও ১০০৲ টাকার পুস্তক পুরস্কার লাভ করি।

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পর-বৎসর প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলাম (১৮৮৮)। পরীক্ষকগণের এইরূপ মন্তব্য—"The candidate who took up Physics and Chemistry is perhaps the best student that has as yet taken up these subjects at this examination." অর্থাৎ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত যে সকল ছাত্র ফিজিক্স এবং কেমিষ্ট্রী লইয়াছেন, এই ছাত্রই তাহাদের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

পরে দুই বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবোরেটারিতে বিনা বেতনে বিদ্যাচর্চ্চা করিতে পেডলার সাহেবের অনুমতি লইয়াছিলাম। ('বঙ্গ-ভাষার লেখক,' পৃ. ৮০১-৩)

সাধারণ পাঠ সাঙ্গ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে আইন ক্লাসে যোগদান করিয়াছিলেন; এই সময়ে জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু আইন-অধ্যয়ন তাঁহার ভাল লাগে নাই, অল্প দিন পরেই তিনি উহার সহিত অসহযোগ স্থাপন করেন।

বিবাহ

কান্দি ইংরেজী স্কুলে অধ্যয়নকালে, ৬ মে ১৮৭৮ তারিখে, ১৪ বৎসর বয়সে, জেমোর রাজবাটীতে রামেন্দ্রসুন্দরের বিবাহ হয়। পাত্রী—ইন্দুপ্রভা দেবী, নরেন্দ্রনারায়ণের কনিষ্ঠা কন্যা।

অধ্যাপনা

ছাত্র-জীবনের গৌরবোজ্জল অধ্যায় সমাপ্ত হইলে শিক্ষা-বিভাগে রামেন্দ্রসুন্দরের একাধিক চাকরি জুটিয়াছিল, কিন্তু কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া তিনি সেগুলি প্রত্যাখ্যান করেন। "রামেন্দ্রসুন্দর কায়মনোবাক্যে বাঙালী হইয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতায় অবস্থান করিয়া বঙ্গ-ভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে, কলেজ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না হইতেই ইহাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল।...এই সময়ে রিপন কলেজে তাঁহাকে

লইয়া যাইবার জন্য লোক আনাগোনা করিতে লাগিল।" তিনি ১৮৯২ সনে রিপন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক-পদে প্রবিষ্ট হইলেন। কলেজে তাঁহার শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহারই প্রাক্তন ছাত্র প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—

"১৯০১ সালে আমি রিপন কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি।... তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীর একটু বিশেষত্ব ছিল।...রসায়নবিদ্যার হাতে খড়ি এই সময়েই আমাদিগকে করিতে হয়। নূতন বিদ্যার উপর বক্তৃতা দিয়া, বিষয়টিকে পরিস্ফুট করা সহজসাধ্য নয় বিবেচনা করিয়া, তরলমতি যুবকদিগের মনে রসায়ন-প্রীতি জাগাইবার জন্য তাঁহার উদ্ভাবিত প্রণালীকে আমরা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সে পদ্ধতি হইতেছে, প্রথমে কতকগুলি রাসায়নিক পরীক্ষা-প্রদর্শন (Practical Experiments। বিভিন্ন পদার্থের সংযোগে নূতন পদার্থ উৎপাদন করিয়া তিনি আমাদিগের মনকে 'নূতনের দিকে' আকৃষ্ট করিতেন। নূতনের মোহে আমরা নূতন জিনিসটিকে বুঝিবার চেষ্টা করিতাম। দর্শন-জনিত আনন্দ আমাদিগের কৌতূহলী মনকে জিনিসটার স্বরূপ জানিবার জন্য ব্যগ্র করিত। আর সকলেই স্বীকার করিবেন, এই কৌতূহল-সৃষ্টিই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। কৌতূহল না জন্মিলে জিনিসের প্রকৃত তথ্য যে কি, তাহা জানিতে পারা যায় না। এই জিনিসটা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি প্রথমে পরীক্ষা দেখাইয়া, পরে পরীক্ষিতব্য বিষয়গুলি বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেন। আর বোধ হয়, এই কারণেই আমি বিজ্ঞানের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি।

যথাসময়ে আমি এফ-এ পাশ করিয়া উক্ত কলেজেই তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম। পাস ও অনার্সে রামেন্দ্রবাবু পদার্থবিদ্যার অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার অধ্যাপনার আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, বরাবরই তিনি বাঙ্গালা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই বক্তৃতা দিতেন। মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষাদান সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না বুঝিয়া, প্রচলিত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া—গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসান না দিয়া, তিনি কখনও কখনও আমাদিগকে বাঙ্গালায় বুঝাইয়া দিতেন। আমরাও বিষয়গুলি সুন্দরভাবে বুঝিতে পারিতাম। ইংরেজী

ভাষাতে পরীক্ষা দিতে হইবে বলিয়া, তিনি বাঙ্গালায় বর্ণিত বিষয়গুলি আবার ইংরাজীতে বলিতেন। যাঁহারা তাঁহার পদতলে বসিয়া পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, পদার্থ-বিদ্যার জটিল বিষয়গুলি (Mathematical portions) দুরূহ অঙ্কপাত (Higher Mathematics) ব্যতিরেকে সহজে শিক্ষা দিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন—বোধ হয়, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এ বিষয়ে কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলেন না। আমার বোধ হয়, Tait-এর *Heat* নামক পুস্তকের তাপতত্ত্ব (Thermodynamics) নামক দুর্বোধ্য অংশ সহজ সরলভাবে হৃদয়গ্রাহী করিয়া বুঝাইতে তাঁহার মত কেহ পারেন কি না সন্দেহ।" (নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত: 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর,' পৃ. ১৫৭-৮৮)

১৯০৩ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ছয় মাসের অবসর গ্রহণ করিলে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁহার স্থলে অস্থায়ী ভাবে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। অবকাশ কাল পূর্ণ হইলে কৃষ্ণকমল আর কর্ম্মে যোগদান করিতে পারেন নাই। রামেন্দ্রসুন্দরই রিপন কলেজের অধ্যক্ষ-পদে স্থায়ী হইয়াছিলেন। "তাঁহার অধ্যক্ষতায় রিপন কলেজে বাস্তবিক রাম-রাজত্ব ছিল। কি অধ্যাপক, কি ছাত্র, সকলে নিজ নিজ কার্য্য করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইত। কাহারও কখনও মনে হইত না যে, প্রিন্সিপালকে খোশামোদ করিবার বা তুষ্ট রাখিবার জন্য কোনও প্রকার চেষ্টা করিবার আবশ্যকতা আছে।" এই প্রসঙ্গে রিপন কলেজের তৎকালীন অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাও উদ্ধারযোগ্য :—

"তিনি রিপন কলেজটিকে কেন এত প্রাণের বস্তুর মত আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, তাহা আমি বাহির হইতে বুঝিতাম না। ভিতরে আসিয়া সে রহস্যের সন্ধান পাইলাম। দেখিলাম, কলেজের যে দিক্‌টা যন্ত্রধর্ম্মী, সে দিক্‌টা তিনি যন্ত্রবৎই পরিচালন করিয়া যাইতেন। কিন্তু ইহার সবটা তো যন্ত্র নহে, যন্ত্রের মধ্যে যে কতকগুলি জীবন্ত মানুষ শিক্ষক ও ছাত্র নাম লইয়া আসিয়া ধরা দিয়াছে। তাঁহার আসল কারবার ছিল এই প্রাণ-সমষ্টি লইয়া। ছাত্র-সংখ্যা অপরিমেয়, সুতরাং তাহাদের সকলের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ পাতান অসম্ভব ব্যাপার; তথাপি যে অল্প কয়েকটি ছা

বি-এস-সি ক্লাসে তাঁহার বিজ্ঞান-ব্যাখ্যান শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিত, তাহাদের অধিকাংশের সহিতই তিনি আত্মীয়তা স্থাপন করিতেন। তিনি যে বঙ্গভাষায় অধ্যাপনা করিতেন তাহার প্রধান কারণ এই যে, বিদেশী ভাষার কৃত্রিম আবরণের মধ্য দিয়া যন্ত্রের কার্য্য চলিতে পারে, কিন্তু প্রাণের কারবার চলে না। তাঁহার নিকট প্রাণের কারবার ছিল, সেখানে তিনি যন্ত্রনীতির অধিকার স্বীকার করিতেন না। তাঁহার বিজ্ঞান-শ্রেণীর বাহিরে যে অগণিত ছাত্র ছিল, তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব ব্যাপার হইলেও, তিনি অনেক স্থলে পরিচয়ের সুযোগ খুঁজিতেন। এই ব্যাপার তাঁহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক ছিল। ছাত্রেরা কলেজের অধ্যক্ষের নিকট যে সকল আবেদন করে, অধিকাংশ কলেজেই সেই আবেদনপত্রগুলি আফিসের হাত দিয়া অধ্যক্ষের হাতে পৌঁছায়। কিন্তু রামেন্দ্রবাবু নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ আবেদনপত্র হাতে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিবে, এবং প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কহিয়া তিনি বিচার মীমাংসা করিবেন। ইহার ফলে এই দাঁড়াইত যে, প্রত্যহ অপরাহ্ণে যখন তিনি ঘরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিতেন, তখন সে ঘরে ছাত্রের ভিড় লাগিয়া যাইত। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র বিরক্তি ছিল না। ছাত্রদিগের সম্পর্কে তাঁহার কঠোর কোমল দুই মূর্ত্তিই দেখিয়াছি। এক দিকে যেমন দারিদ্র্য বা অক্ষমতাজনিত অভাব-অভিযোগের সহিত তাঁহার সহানুভূতি দেখা যাইত, অন্য দিকে তেমনি নৈতিক অপরাধের দণ্ডবিধানে তাঁহার বজ্রকঠোর দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইত। অপরাধী ছাত্রদিগকে জরিমানা করিয়া যে টাকা উঠিত, তাহা তিনি কলেজের সাধারণ অর্থকোষে না দিয়া, তদ্দ্বারা দরিদ্র ছাত্রদিগের সাহায্যকল্পে একটি অর্থভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন। ছাত্রদিগকে যখন কোন বিষয়ে অনুযোগ করিতেন বা উপদেশ দিতেন, তখন তিনি কেবল-মাত্র স্মরণ করাইয়া দিতেন যে, তাহারা ভারতীয় ছাত্র; তাহাদের আচরণের উপর ভারতের খ্যাতি-অখ্যাতি নির্ভর করিতেছে। ছাত্রদের আনন্দমিলনে যোগদান করিতে তিনি ভালবাসিতেন।...

কলেজের বিরাট্ যন্ত্রের মধ্যে অধ্যাপক-নামধারী আর একদল যে মানুষ ছিল, তাঁহাদের সহিতই তাঁহার প্রধান কারবার ছিল। বিপন

কলেজের অধ্যক্ষের জন্য কেন যে পৃথক্ খাসকামরা নাই, এ লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌স্পেক্টারদিগের নিকট তাঁহাকে অনেক বার কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে। তিনি বলিতেন,—'আমি এতগুলি লোক ছাড়িয়া একা এক ঘরে কি করিয়া থাকিব?' খাসকামরা থাকিলে, কলেজযন্ত্রের কাজ চালান-পক্ষে অনেক সুবিধা হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি তো এখানে শুধু কল চালাইতে আসেন নাই, সেটা তো একটা উপলক্ষ্য মাত্র, তিনি আসিতেন প্রাণবিনিময়ের আনন্দ উপভোগ করিতে। অপরাহ্ণে তিনি যখন আসিয়া আসন গ্রহণ করিতেন, তখন তাঁহার ঘরে একটা আনন্দলহরী ছুটিয়া চলিত। কখনও বা বৈদিক যজ্ঞ, কখনও বা ইহুদীজাতির ইতিহাস, কখনও বা প্রচীন গ্রীসের ব্যক্তিসর্ব্বস্বতা, কখনও বা বৌদ্ধদর্শন, কখনও বা বৈষ্ণবতত্ত্ব, এইরূপ একটা না একটা বিষয় লইয়া সরস আলোচনা চলিত। সে যে কি আনন্দের ব্যাপার ছিল, তাহা যাহারা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। এই সমস্ত আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল—নবীন অধ্যাপকদিগকে উদ্বুদ্ধ করা। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির বিরাট্ যন্ত্রের আওতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তাহাদের চিত্তবৃত্তি যাহাতে আলোকের দিকে প্রসারিত হইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে, সেই ছিল তাঁহার প্রধান চেষ্টা। তিনি প্রত্যেক অধ্যাপকের মনের গতি লক্ষ্য করিতেন এবং কখনও প্রশংসা দ্বারা, কখনও প্ররোচনা দ্বারা, কখনও বা তিরস্কার করিয়া সকলকে বাণীর সেবায় নিয়োগ করিতে চেষ্টা করিতেন। "চর্চ্চা কর, অনুসন্ধান কর, লেখ"—এ ছিল তাঁহার কথা। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কলেজে একটি অধ্যাপক-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। ইচ্ছা করিয়াই তিনি এই সঙ্ঘে কোন আইন কানুন বাঁধিতে দেন নাই। ইহার মধ্যে তিনি প্রাণের স্বচ্ছ লীলা দেখিতে চাহিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে হয় তিনি নিজে অথবা কোন অধ্যাপক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া উপস্থিত করিতেন। হয়ত বা বাহির হইতে দুই একটি বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে আহ্বান করিয়া আনা হইত। ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা শুশ্রূষু তাহাদিগকেও ডাকা হইত। সকলের সম্মুখে প্রবন্ধটি পঠিত ও আলোচিত হইত, এবং সর্ব্বশেষে মিষ্টান্ন জলযোগ সহকারে ব্যাপারটি মধুরেণ সমাপিত হইত। এই অধ্যাপক-সঙ্ঘের সম্মুখে তিনি যে ধারাবাহিক দার্শনিক প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাই সম্প্রতি 'জগৎকথা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

দর্শন ও বিজ্ঞানের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয়, শুধু আমাদের দেশে নহে, পাশ্চাত্যজগতেও অতি বিরল। কলেজ-সম্পর্কে তাঁহার আর একটি প্রিয়বস্তু ছিল 'রিপন-কলেজ-পত্রিকা'। এই পত্রিকা তাঁহারই উৎসাহে ও নেতৃত্বে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম দুই বৎসরের সংখ্যাগুলি দেখিলেই বুঝা যায়, রামেন্দ্রবাবুর প্রভাবে কলেজের অধ্যাপকবৃন্দের মধ্যে কেমন একটা সজীবতা আসিয়াছিল। তাঁহার উৎসাহ দেওয়ার প্রণালীই একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছিল। তিনি নিজের ছাঁচে সকলকে ঢালিতে চাহিতেন না। কাহার কোন্ দিকে স্বাভাবিক প্রবণতা, কোন্ বিষয়ে কাহার স্বাভাবিক অনুরাগ, এইটি লক্ষ্য করিয়াই তিনি কথা কহিতেন। এই ব্যাপারে তাঁহার চিত্তের উদারতা দেখিয়া অবাক্ হইতে হইত। কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য যখন গ্রন্থ ক্রয় করা হইত, তখন তিনি কেবল নিজের রুচি অনুসরণ করিয়া গ্রন্থনির্বাচন করিতেন না। সংস্কৃত সাহিত্য, বঙ্গসাহিত্য ও বিজ্ঞানের গ্রন্থ যে তাঁহার প্রিয় হইবে তাহা তো স্বাভাবিক। ইহা ছাড়া আধুনিক ইউরোপের দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, উপন্যাস, নাটক—কিছুই তাঁহার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইত না। নবীন অধ্যাপকেরা যে-সকল অতি-নবীন কাব্য-নাটকাদি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিতেন, তিনি নিজে না পাঠ করিলেও তাঁহাদের নিকট সে সকল গ্রন্থের সারমর্ম্ম শুনিয়া লইয়া কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিতেন। তাঁহার নিজের আলোচ্য বিষয়সম্পর্কীয় যে কোন রচনা নূতন প্রকাশিত হইত, তাহা তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্রয় করিয়া পাঠ করিতেন। তাঁহার মুখে আধুনিক দার্শনিক বের্গসোঁর দার্শনিক মত, বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মেণ্ডেলের বংশক্রমতত্ত্ব বা নবাবিষ্কৃত সংস্কৃত কবি ভাসের নাট্যগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার চিত্তবৃত্তির সজীবতার ও চিরনবীনতার পরিচয় পাইয়াছেন।" 'আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর,' পৃ. ১৪০-৪৪)

রামেন্দ্রসুন্দর অধ্যক্ষ-রূপে আমরণ—সুদীর্ঘ ১৬ বৎসর রিপন কলেজের সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে বিদ্যায়তনটির বহুবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অধ্যক্ষ জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য যথার্থ ই লিখিয়াছেন :—

"রামেন্দ্রসুন্দর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রিপন কলেজের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন, এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করেন। তখন ইহার

ছাত্রসংখ্যা আট শতের অধিক নহে; একটি হিন্দু গৃহস্থের আবাস-গৃহ এবং তৎসংলগ্ন একটি সুপ্রশস্ত খেলিবার ঘর, এই ছিল তখন কলেজ-ভবন; কলেজের গ্রন্থাগারে সামান্যই গ্রন্থ ছিল এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি ছিল না বলিলেই চলে। তিনি রাখিয়া গেলেন, সুপ্রশস্ত হল-মণ্ডিত এক বিশাল কলেজ-গৃহ, সুন্দর ও সুপুষ্ট গ্রন্থাগার, সুসজ্জিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশালা এবং আঠার শতের অধিক শিক্ষার্থী। এই যে সফলতা, ইহা কেবল কাল-পরিণতির ফলমাত্র নহে, অক্লান্ত উদ্যম ও কঠোর প্রয়াসের দ্বারা এ সিদ্ধি অর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। কত শত বিঘ্ন-বিপৎ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার কলেজ অভিভূত হয় নাই। প্রত্যেক পরীক্ষার পরেই তাঁহার বিদ্যালয় সংবর্দ্ধিত দীপ্তি ধারণ করিয়াছিল।" ('আচার্য্য রামেন্দ্র-সুন্দর,' পৃ. ১৩৩-৩৪)

ইউনিভার্সিটি কমিশন: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারসাধনোদ্দেশ্যে ১৯১৭ সনে স্যাডলার কমিশন নিযুক্ত হয়। রামেন্দ্রসুন্দর তখন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ। কমিশন তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন পাঠাইয়া তাঁহার অভিমত জানিতে চাহেন। উত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সকলের পাঠ করা উচিত। "লেখক প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য এই দুইটি ভাবের মধ্যে কোন একটি ভাববিশেষের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন না; প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য উভয়বিধ শিক্ষা হইতে যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু গ্রহণীয়, তাহা গ্রহণ করিয়া সেই ভাবধারার সম্মিলন ঘটাইয়া তাহা জাতীয় শিক্ষার উপযোগী করিয়া তুলিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।"* তিনি এই বলিয়া তাঁহার শেষ মন্তব্য করিয়াছেন:—

Western education has given us much; we have been great gainers; but there has been a cost, a cost as regards culture; a cost as regards respect for self and reverence for others, a cost as regards the nobility and dignity of life.

রামেন্দ্রসুন্দরের যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য পাঠ করিয়া কমিশন অতীব সন্তুষ্ট হন; তাঁহারা রিপোর্টে উহার অনেক স্থল উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ লিখিয়াছিলেন:—

"রামেন্দ্রসুন্দরের কথিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এইরূপ কৃতিত্বে

* শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী: 'রামেন্দ্রসুন্দর', পৃ. ২৪২, ২৪৫। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে (পৃ. ৩১৭-৩৪) রামেন্দ্রসুন্দরের সুদীর্ঘ মন্তব্যটি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

আমরা মুগ্ধ, এবং ইহার ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত একমত। আমরা শিক্ষাসংস্কারের জন্য যে সকল পরিবর্তন প্রস্তাব করিয়াছি, সেগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে, আশা করি তাঁহার সঙ্কল্পিত আদর্শ লাভ হইবে ও বিশ্ববিদ্যালয় নবজীবনের সৃষ্টিসাধন ও স্বাধীনতা দান করিতে পারিবে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুন্দর ভাবসমূহের মধুর সম্মিলন ঘটিবে।"*

সাহিত্যসাধনা

রামেন্দ্রসুন্দর নিজের সম্বন্ধে এক স্থলে বলিয়াছেন:—"যথাশক্তি বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবা করিব, এই আকাঙ্ক্ষা বাল্যকাল হইতেই পোষণ করিয়াছিলাম। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া তদর্থেই আমার প্রায় সকল শক্তি নিযুক্ত করিয়াছি।" প্রকৃতপক্ষে বাংলা-সাহিত্যের উন্নতিসাধন তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তিনি আশৈশব সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। এই সাহিত্যানুরাগ সম্বন্ধে তিনি নিজে যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

> "শৈশবেই বাঙ্গলা মাসিক-পত্রিকার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। আমার যখন আট বৎসর বয়স, আমি যখন গ্রাম্য পাঠশালায়, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়। আমাদের বাড়ীতে বঙ্গদর্শন যাইত। লুকাইয়া বঙ্গদর্শন পাড়তাম। সব বুঝিতাম না। বিষবৃক্ষের অধ্যায়ের হেডিংগুলা,—নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা, কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নদর্শন, পদ্মপলাশলোচনে তুমি কে;—ইত্যাদি হেডিংগুলা কিরূপে মনের উপর একটা চমক দিত। তখন বিষবৃক্ষের রস আস্বাদনের ক্ষমতা জন্মায় নাই—অথচ পড়িতাম, লুকাইয়া পড়িতাম।
>
> ক্রমে আর্য্যদর্শন বাহির হইল। তাহাতেই প্রথম জানিলাম যে আমরা আর্য্যজাতি, জানিয়া একটা অহমিকা জন্মিয়াছিল, তাহা মনে আছে। পরে বান্ধব বাহির হইল। বয়স্কদের মুখে প্রভাত-চিন্তার গুরুগম্ভীর প্রবন্ধগুলার প্রশংসা শুনিতাম, কিন্তু পড়িয়া আয়ত্ত করিতে পারিতাম না। এই পর্য্যন্ত মনে আছে, যখন এগারো বৎসর বয়স, তখন আর্য্যদর্শনে ও বান্ধবে নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধের সমালোচনা পড়িয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিলাম।

---

* শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী: 'রামেন্দ্রসুন্দর', পৃ. ২৪৫।

ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের সহপাঠীদের মধ্যে চারি পয়সা করিয়া চাঁদা তুলিয়া একখানা 'পলাশীর যুদ্ধ' কলিকাতা হইতে খরিদ করিয়া আনাই।

আর একটু বয়স হইলে পুরাণ বঙ্গদর্শনের, পুরাণ বান্ধবের, পাতা উল্টাইয়া পুরাতন কবিতা, পুরাতন প্রবন্ধ, পড়িতাম; পড়িয়া আনন্দ পাইতাম। ইস্কুলের পাঠ্য পুস্তকে যে রসের সন্ধান মাত্র পাওয়া যাইত না, তাহার আস্বাদন পাইয়া পুলকিত হইতাম। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাবের গাম্ভীর্য্য ও ভাষার ছটা তখন মোহ আনিত।...

বয়স হইল, সাহিত্যের রস-পিপাসা বাড়িল বটে, কিন্তু বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব প্রভৃতি ক্রমে অদৃশ্য হইল। অল্পজীবী মাসিক সাহিত্যের প্রতি রাগ হইতে লাগিল।

যখন কলিকাতায় আসিয়া কলেজে পড়িতেছি, তখন ঢাক বাজাইয়া নবজীবন বাহির হইল [শ্রাবণ ১২৯১]। সংবাদপত্রে ঘোষণা বাহির হইবামাত্র, দেহে নবজীবন সঞ্চারের স্ফূর্ত্তি লাভ করিলাম; ঘোষণামাত্র ৫১ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে কার্য্যালয়ে গিয়া মূল্য দাখিল করিয়া গ্রাহক হইয়া আসিলাম। মাসের ১লা তারিখে নবজীবনের প্রত্যাশায় ব্যাকুল হইয়া বসিয়া থাকিতাম, সূর্য্য অস্ত যাইত, রাত্রি নয়টা বাজিত, পত্রিকা না পাইয়া হতাশ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম।...

নবজীবনের প্রথম বর্ষেই হঠাৎ একদিন মাসিক-পত্রিকার লেখক হইয়া পড়িলাম। একটা প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিলাম। যে পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার, লেখক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, তাহাতে স্বনামে প্রবন্ধ পাঠাইতে সাহসী হইলাম না; বেনামীতে পাঠাইলাম। কিন্তু পত্রিকার চতুর সম্পাদক কিরূপে প্রবন্ধলেখককে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। নিজ নামেই প্রবন্ধটি বাহির হইল। সম্পাদকের ছুরিকার আঘাতে প্রবন্ধটি ক্ষতবিক্ষত হইয়া বাহির হইয়াছিল; তাহাতে আমি উপকৃত হইয়াছিলাম। গুরু মহাশয়ের বেত্রাঘাতের মত উহা আমি স্বীকার করিয়াছিলাম। বাঙ্গলা সাহিত্যে আমার গুরুমহাশয়ের সেই শাসন আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণে রাখিব।

তার পর নবজীবনে আরও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখি,—কতক স্বনামী, কতক বেনামী। এইরূপে আমার সাহিত্য-সেবার সূত্রপাত।...নবজীবনও

চারি [পাঁচ ?] বৎসরেই অন্তর্দ্ধান করিল। সাময়িক পত্রিকার উপর আমারও রাগ বাড়িল। কয়েক বৎসর গোসা করিয়া বাঙ্গলা মাসিক পড়া ছাড়িয়া দিলাম।

কালেজ হইতে বাহির হইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। কোন্ কাগজ পড়িব? বাঙ্গলা মাসিকের তুলনায় 'ভারতী' তখন বয়স্থা হইয়া পড়িয়াছে; হয়তো উহা হঠাৎ ফাঁকি হইয়া অন্তর্দ্ধান করিবে না। অতএব ভারতীর গ্রাহক হইলাম। মাননীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী তখন সম্পাদিকা। ভারতীতে হেঁয়ালি-নাট্য তখনও বোধ করি বাহির হইতেছে। ভারতীতেই আমি বলেন্দ্রনাথের রচনার প্রথম পরিচয় পাইলাম—ইহা একটা পরম লাভ মনে করিয়াছিলাম।

তখন কংগ্রেসের নূতন অভ্যুদয়—আমি তখন ঘরে বসিয়া উৎকট কংগ্রেস-ওয়ালা। কংগ্রেসের খবর পাইবার জন্য মন আনচান্ করিত। ভারতীতে কংগ্রেসের আলোচনা থাকিত;—ভারতীর প্রতি আকর্ষণের ইহাও একটা প্রধান কারণ।

নূতন বেশ-ভূষায় 'সাধনা' বাহির হইল। সাধনায় আমার নূতন করিয়া হাতে-খড়ি হইল। তখন আমি রিপন কালেজে আসিয়াছি—সম্পাদকের দল আমাকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। সাহিত্য-সম্পাদক আমাকে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিলেন। অনেকের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলাম। ভারতী-সম্পাদিকা শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলাম....

তদবধি কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতীর সাধ্যমত সেবা করিয়াছি। ('ভারতী,' বৈশাখ ১৩২৩)

রামেন্দ্রসুন্দর যখন বি.এ. পড়িতেছিলেন, সেই সময়ে বাংলা-লেখায় তাঁহার হাতে খড়ি হয়। ১২৯১ সালের পৌষ-সংখ্যা 'নবজীবনে' প্রকাশিত "মহাশক্তি" প্রবন্ধটিই তাঁহার লিখিত প্রথম রচনা। 'নবজীবনে' তাঁহার আরও কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, এ কথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। ১ম, ২য় ও ৪র্থ বর্ষের 'নবজীবনে' "লেখকগণের নাম"-এর বার্ষিক সূচীতে তাঁহার নামোল্লেখ আছে বটে, কিন্তু রচনার শেষে তাঁহার নাম না থাকায় কোন্ কোন্ রচনা তাঁহার লিখিত, তাহা বাছিয়া বাহির করা কঠিন। ৩য় বর্ষে প্রকাশিত

একমাত্র "সৃষ্টি-তত্ত্ব" প্রবন্ধ ছাড়া অপর কোন প্রবন্ধের নামোল্লেখ তিনি কোথাও করেন নাই। আমাদের অনুমানে 'নবজীবনে' প্রকাশিত এই রচনাগুলি তাঁহার :—

১ম ভাগ :	পৌষ	১২৯১	...	মহাশক্তি
২য় ভাগ :	বৈশাখ	১২৯২	...	বিবর্ত্তন
	অগ্রহায়ণ	১২৯২	...	মহাতরঙ্গ
	আষাঢ়	১২৯৩	...	জড় জগতের বিকাশ
৩য় ভাগ :	শ্রাবণ, ভাদ্র	১২৯৩	...	সৃষ্টি-তত্ত্ব
৪র্থ ভাগ :	শ্রাবণ	১২৯৪	...	বৈদেশিক সভ্যতা

দুরূহ ও জটিল বিষয় সর্বজনবোধ্য করিয়া ব্যাখ্যা করিতে রামেন্দ্রসুন্দর অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "প্রথম প্রথম কালীপ্রসন্ন ঘোষের ভাষা আমাকে একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল; তাঁর মত গমগমে ভাষায় না লিখলে মনের ভাব ভাল ক'রে প্রকাশ করা যায় না, এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল; সেই মোহপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। ক্রমশঃ দেখলাম যে, আমি যে সব কথা বলতে চাই, তা, ও ভাষায় চলবে না; আমার মনের ভাব প্রকাশ করবার জন্যে উপযুক্ত ভাষা গড়ে তুলতে হ'ল" (বিপিনবিহারী গুপ্ত : 'আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর,' পৃ. ৯০)। তাঁহার রচনার প্রসাদগুণ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যথার্থ ই লিখিয়াছেন :—

> "অনেকেই বলেন—কথাটাও সত্য—যে দর্শনই হউক বা বিজ্ঞানই হউক, ইতিহাসই হউক বা প্রত্নতত্ত্বই হউক—রামেন্দ্রবাবু যাহাই লিখিতেন, তাহাই যে শুধু প্রাঞ্জল হইত এমন নয়, সত্য সত্যই তাহার মধুরতায় প্রাণকে জল করিয়া দিত, পড়িতে কবিতার মত বোধ হইত, কল্পনায় মাখামাখি থাকিত, রসে ও ভাবে ভোর করিয়া দিত। তাঁহার 'মায়াপুরী'ই বল, 'বিচিত্র প্রসঙ্গ'ই বল, আর যে কোনও প্রসঙ্গই বল, সবই যেন কবিত্বময়। এ মহা কবিত্বের বীজও তিনি আপনার পূর্বপুরুষদের নিকট পাইয়াছিলেন।...এরূপ কাব্যামোদী পরিবারে যিনি জন্মিয়াছিলেন, যাঁহার বাল্যকাল কাব্যচর্চ্চায় অতিবাহিত হইয়াছিল, তাঁহার সকল কার্য্যেই, সকল লেখায়ই, সকল বক্তৃতায়ই যে কাব্যের গন্ধ থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি ?"

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ডানা

(পূর্বানুবৃত্তি)

চা খাওয়ার প্রস্তাবটার মধ্যে একটা নূতন আলোক যেন দেখতে পেলেন রূপচাঁদ। রোজই তিনি চা খেয়ে যান, কিন্তু আজ যেন এটাকে একটু অভিনব ব'লে মনে হ'ল। একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তারপর সহসা সোৎসাহে বললেন, দেখ, একটা কথা তুমি জেনে রাখ, আমি যখন তোমায় ভার নিয়েছি, তোমার ভয় নেই। তুমি যদি চাকরি করতে, তা হ'লে আমার পক্ষে সেটা সহজ হ'ত। টাকাকড়ির দিক থেকে নয়, লোকচক্ষুর দিক থেকে। একজন অপরিচিতা বিদেশিনীর এখানে থাকার একটা সঙ্গত অর্থ করতে পারত তারা, অবশ্য তাতেও যে তাদের মুখ বন্ধ হ'ত তা নয়, তবে আমার দিক থেকে দেবার মত একটা জবাবদিহি থাকত।

অপ্রত্যাশিতভাবে ডানা ব'লে উঠল, কে কি বলবে তা নিয়ে আমার ভাবনা নেই। আমার ভাবনা—

ব'লেই থেমে গেল সে মুচকি হেসে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন রূপচাঁদ। তবু চুপ ক'রেই রইল ডানা। কিন্তু রূপচাঁদ ছাড়বার পাত্র নন।

তোমার ভাবনাটা কি শুনিই না, যদি বলতে তোমার আপত্তি না থাকে।

আমার ভাবনা নিজেকে নিয়ে। নিজের কাছে যদি আমার আচরণ নিখুঁত হয়, তা হ'লে অপরের মতামতের তোয়াক্কা করি না। আমার নিজের আচরণ নিখুঁত হচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না।

৩

আর কিছু বলবার পূর্বেই চা নিয়ে চাকরটা প্রবেশ করল এবং টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম রেখে চা ছাঁকতে লাগল। রূপচাঁদ নীরবে নিবিষ্টচিত্তে চাকরটাকেই লক্ষ্য করতে লাগলেন। তার চেহারা, চলন, মুখভাব, পরিচ্ছদ, চা-ছাঁকবার ভঙ্গী—প্রত্যেকটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। এইটে তাঁর একটা স্বভাব। কোনও প্রশ্ন না ক'রে কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি লোকচরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করেন, এবং যখন সেটা করেন তখন কেউ বুঝতে পারে না যে, তিনি এত বড় একটা কঠিন কাজে লিপ্ত আছেন।

চা-পর্ব নীরবেই সমাধা হ'ল।

চা শেষ হতেই উঠে পড়লেন রূপচাঁদ।

চাদরটা দাও, এবার যাই—

ভানা চাদর আনতে পাশের ঘরে গেল। রূপচাঁদ পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন সেটার দিকে।

ভানা ফিরে আসতেই বললেন, একটা কথা তোমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে পারছি না। খোলাখুলি সেটা জিজ্ঞেস করাই ভাল বোধ হয়।

কি কথা?

আমি যে এখানে আসি যাই, তোমাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করি, এতে আর যে যা বলে আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু তোমার মনে কোন রকম সন্দেহ হয় না তো আমার সম্বন্ধে?

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন ভানার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। ঠিক সত্যি কথাটা সোজা ক'রে বলতে পারলে না ভানা। একটু হেসে বললে, সে রকম কোনও কারণ ঘটে নি তো এখনও।

ক্ষণকাল নীরব থেকে কথাটা প্রণিধান করলেন রূপচাঁদ। তারপর বললেন, যতক্ষণ তা না ঘটছে, ততক্ষণ আমাকে হিতৈষী আত্মীয় ব'লে মেনে নিতে আপত্তি নেই তা হ'লে?

এত ভূমিকা কিসের বলুন তো!?

তা হ'লে এইটে অসঙ্কোচে দিতে পারতাম তোমাকে। খামটা দেখালেন।

কি ওটা?

আমি চ'লে যাবার পর খুলে দেখো।

খামটার দিকে চেয়ে মনে মনে একটু ইতস্তত করতে লাগল ভানা। তারপর মনস্থির ক'রে ফেললে।

আচ্ছা, দিন।

খামটা দিয়েই বেরিয়ে গেলেন রূপচাঁদ।

ভানা খুলে দেখলে, একশো টাকার নোট রয়েছে একখানা, আর তার সঙ্গে ছোট একখানা চিঠি। ইংরেজীতে টাইপ করা। চিঠির মর্ম:—অতিশয় অসঙ্কোচে টাকাটা তোমায় দিচ্ছি। বন্ধুর সাহায্য হিসেবে নিতে যদি তোমার বিবেকে বাধে, ঋণ-স্বরূপই নিও। যখন সুবিধা হবে, শোধ দিও। বলা বাহুল্য, আমার দিক থেকে কখনও কোনও তাগাদা থাকবে না। নীচে কোনও নাম নেই।

ডানা নোটখানা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ নীরবে। রূপচাঁদ-বাবুর উপর রাগ হ'ল না। সঙ্কোচও হ'ল না তেমন কিছু তবে তার অজ্ঞাতসারেই তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল একটু। যে নিষ্ঠুর নিয়তি তার জীবনকে সুখের শিখর থেকে চ্যুত করেছে, তারই করাল ছায়া মুখের উপর পড়ল যেন ক্ষণকালের জন্য। মনে পড়ল একটা চিত্র। তারা যখন বর্মা থেকে পালায়, তখন পথে এক হিতৈষী প্রতিষ্ঠান তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। হাজার হাজার লোক পালিয়ে আসছিল, পালিয়ে আসছিল যথাসর্বস্ব ফেলে। তফাত ছিল না ধনী আর ভিক্ষুকে। ভীত পীড়িত ভগ্নহৃদয় বুভুক্ষু জনতার সেই মিছিলটা ভেসে উঠল তার চোখের উপর আবার। হিতৈষী প্রতিষ্ঠানটি সকলের খাওয়ার আয়োজন করেছিলেন একটি নদীর তীরে। জলের সুবিধার জন্যই সম্ভবত। আয়োজন বিশেষ কিছু নয়। মোটা চাল-ডালের খিচুড়ি আর শাক-সবজির একটা ঘণ্ট সারি সারি পাতা পেতে দিচ্ছিলেন সবাইকে। জাতিধর্মনির্বিশেষে দলে দলে আবাল-বৃদ্ধবনিতা তাই খাচ্ছিল সাগ্রহে বার বার চেয়ে চেয়ে। পথে উপর্যুপরি তিন দিন কোনও খাবার পাওয়া যায় নি। হঠাৎ দেখা গেল, একটি লোক খাচ্ছে না। খিচুড়ির দিকে চেয়ে পাতার সামনে ব'সে আছে চুপ ক'রে। লোভ মূর্ত হয়ে উঠেছে তার চোখের দৃষ্টিতে, কিন্তু খাচ্ছে না। হাত গুটিয়ে ব'সে আছে চুপ ক'রে। মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। গায়ে সিল্কের ময়লা পাঞ্জাবি, হাতে বেমানান-রকম উজ্জ্বল হীরের আংটি একটা। কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, আপনি খাচ্ছেন না কেন? লোকটি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে। তারপর নিজের পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন হতেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল একটু, বললে, হ্যাঁ, খাব। তবে আমার একটা অনুরোধ যদি রাখেন। কর্মকর্তা বললেন, কি বলুন? একটু ইতস্তত ক'রে লোকটি বললে, আমার পাতাটা যদি সরিয়ে একটা আলাদা জায়গায় দেন! কর্মকর্তা লোক ভাল ছিলেন, আলাদা জায়গাতেই খেতে দিলেন তাকে। ডানা পাশেই ছিল, সবিস্ময়ে শুনছিল সব। লোকটি পংক্তি থেকে আলাদা জায়গায় ব'সে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বোকার মত হাসতে হাসতে কর্মকর্তার দিকে চেয়ে বললে, আপনাকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না। এই কয়েকদিন আগেই আমি কোটিপতি

ছিলাম। আমার বাড়িতেই প্রত্যহ আড়াই শো কাঙালী ভোজন করাতাম। এখন আমি সর্বস্বান্ত, তবু ওদের সঙ্গে এক পংক্তিতে ব'সে খেতে পারছি না।... আবার ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর গপগপ ক'রে খেতে লাগল। ডানার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক সমস্ত ছেড়ে এসেছেন বর্মায়, একটি জিনিস কিন্তু ছেড়ে আসতে পারেন নি। অহঙ্কার। অনেক দিন পরে আজ আবার মনে পড়ল ছবিটা। মনে হ'ল, রূপচাঁদবাবুর টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে অশোভন আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করবে না সে।

হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ল। সকালবেলা আনন্দবাবু এসেছিলেন। নদীর ওপারের আকাশটা মনোহর হয়ে উঠেছিল তখন। সাদা মেঘের বিরাট একটা জাল টাঙিয়ে দিয়েছিল কে যেন নীল আকাশপটে। আনন্দবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কথাগুলো এখনও ডানার কানে বাজছে।

আপনি আর আমি কিন্তু ঠিক এক রকম দেখছি না। পৃথিবীতে কোনও দুটি লোক ঠিক এক রকম দেখে না, যদিও একই জিনিস দেখে।

তারপর অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তিনি চেয়েছিলেন আকাশের দিকে। মনে হ'ল, দৃষ্টি তাঁর হারিয়ে গেল যেন ওই নীল অসীমের মাঝখানে।

হঠাৎ বললেন, কাগজ আছে?

চিঠি লেখার প্যাড আছে একখানা।

দেবেন? একটা কবিতা লিখতাম তা হ'লে।

তার প্যাডে একটা কবিতা লিখে রেখে গেছেন তিনি।

ডানা টেবিলের কাছে স'রে গিয়ে কবিতাটা পড়ল আবার।

আকাশ কেবল বাহিরেই নাই, সখি,
মনেরও ভিতরে আকাশ রেখেছ ঢাকি
সে আকাশ ভরি' যে তারার ঝকমকি
গভীর নিশীথে দেখেছ কখনও তা কি?

তোমার আকাশে জাগিছে তোমারই ভাষা
হয়তো নয় তা সাবেক তপন তারা
আমার আকাশে কাঁপিছে আমার আশা
আপনার সুরে আপনি আত্মহারা

তোমার আকাশে যে রাগিণী শোন তুমি
আমার হয়তো শুনিতে আছে তা বাকি।

তোমার আকাশে যে ইন্দ্রধনু ছটা
তাহার মহিমা একাই দেখেছ তুমি
আমার আকাশে বরষার ঘনঘটা
আকুল করিয়া তোলে মোর মনোভূমি
তব অভিসার ছায়া পথে পথে যবে
ধ্রুবতারা পানে চেয়ে থাকে মোর আঁখি।

বাহির-আকাশে জাগে অনন্ত নীল
মনের আকাশে বহু বর্ণের খেলা
এ দুয়ের মাঝে আছে কি না কোনও মিল
তারই সন্ধানে বসেছে কবির মেলা
যুগ-যুগান্ত জাগিছে তন্দ্রাহীন
ছন্দে ছন্দে তাহারই হিসাব রাখি।

দুই, অম্বরে বাজে গম্ভীর বাণী
জানি না কি সুরে কে যে সঙ্গীত গাহে
কান পেতে আছে কবি গুণী সন্ধানী
শিল্পী তাহারে চিত্রে আঁকিতে চাহে
বৃথা সন্ধানে হয়তো জীবন কাটে
ভুল রঙ দিয়ে সত্যের ছবি আঁকি'।

ডানার সহসা মনে হ'ল, আনন্দবাবুর কবিতা আর রূপচাঁদবাবুর একশো টাকার নোট একই জিনিসের দুই রূপ, রসায়নশাস্ত্রে যাকে বলে অ্যালোট্রপিক মডিফিকেশন। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। মনের অন্ধকারে মনে হ'ল, প্রেতের মতন কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

৩

অতিশয় উত্তেজিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বৈজ্ঞানিক তাঁর নিজের বাড়ির পিছন দিকে। দোয়েলটা খুব ডাকছে নিমগাছের উঁচু ডালটায় ব'সে। এটা

তাঁরই দোয়েল, অর্থাৎ গত বছর যে পাঁচটা দোয়েলের পায়ে তিনি রিং পরিয়ে দিয়েছিলেন এটা তারই একটা, বাকি চারটেকে এখনও দেখতে পান নি তিনি। এটাকেও এতদিন খুঁজে পান নি। হঠাৎ আজ নজরে পড়েছে। বৈজ্ঞানিক তাঁর নোট-বুক বার ক'রে তাড়াতাড়ি তারিখটা লিখে নিলেন, দোয়েলটাকে কোথায় প্রথম দেখা গেল, তাও লিখলেন। হঠাৎ আবার সেই সন্দেহটা মনে জাগল। সমস্ত শীতকাল এদের এত কম দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, এরা বোধ হয় এ দেশে থাকেই না। শীত একটু কমলে তবে আসে। সিন্ধু করাচী প্রভৃতি স্থান থেকে এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে দোয়েলরা যে চ'লে আসে—এ কথা লাহা মশায় লিখেছেন। হয়তো শীতের সময় ওরা ওই অঞ্চলেই চ'লে যায়, কে জানে! শীতকালে ও-দেশের টেম্পারেচার কত থাকে একটু খোঁজ করতে হবে।···দোয়েলটা উড়ে গিয়ে বসল টেলিগ্রাফের তারের উপর। গানের ধরনটাও গেল বদলে। ধমকের সুর ফুটে উঠল। বৈজ্ঞানিক আশে-পাশে চেয়ে দেখলেন, কারণটা কি, নিশ্চয় আর কেউ এসেছে। দেখতে পেলেন না কিছু। পাখিটা লেজ খাড়া ক'রে তেড়ে যেতেই চোখে পড়ল আর একটা দোয়েল। এইটেই প্রত্যাশা করছিলেন। দ্বিতীয় দোয়েলটা তাড়া খেয়ে অপরাধীর মত পালিয়ে গেল কিছুটা দূর, কিন্তু কিছু দূর গিয়েই রুখে দাঁড়াল। তাৎপর্যটা বুঝতে বৈজ্ঞানিকের দেরি হ'ল না। এ কথা বইয়ে পড়েছেন এর আগে। প্রত্যেক পাখিরই নিজের নিজের এলাকা থাকে। নিজের এলাকায় কেউ কাউকে ঢুকতে দেয় না। দুটো এলাকার মাঝখানে থাকে খানিকটা 'এজমালি' এলাকা, সেখানে সব এলাকার পাখিই যেতে পারে। দ্বিতীয় দোয়েলটি প্রথম দোয়েলের এলাকায় ঢুকে যে বে-আইনী-কাজ করেছে তা বেশ জানে, তাই অপরাধীর মত স'রে পড়ল তাড়া খেয়েই। কিন্তু এজমালি এলাকায় গিয়ে, যেখানে তারও অধিকার আছে, সে আর বকুনি সহ্য করতে রাজী নয়। পালক ফুলিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়েছে। প্রথম পাখিটা তেড়ে গেল তার দিকে, দ্বিতীয়টা ভুড়ুক ক'রে স'রে বসল আর একটা ছোট ডালে আর তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল। অমরবাবুর মনে হ'ল, এটা গান তো নয়ই, হাহাকারও নয়, অনেকটা হুমকি-গোছের। ঘাড়ের রোঁয়াগুলো ফুলে উঠেছে, লেজটা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে বারংবার, মনে হচ্ছে—যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি বলছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু পিছু হটার ভাবও আছে। শেষ পর্যন্ত পালাতেই হ'ল

বেচারীকে। প্রথম পাখিটা এমন ছোঁ মেরে তেড়ে তেড়ে আসতে লাগল যে, টিকে থাকা অসম্ভব হ'ল তার পক্ষে। চোঁ-চা দৌড় দিলে বকুলগাছের পাশ দিয়ে। প্রথম পাখিটা আর পশ্চাদ্ধাবন করলে না, ফিরে এসে বসল নিম-গাছের সেই উঁচু ডালটাতে। এটা তার নিজের নিমগাছ, এর ত্রিসীমানায় দ্বিতীয় কোনও দোয়েলকে আসতে দেবে না সে আর। বৈজ্ঞানিক নিজের নোট-বুকে এই দোয়েলটির এলাকার ম্যাপ এঁকে নিলেন একটি। বকুলগাছ আর আমগাছের মাঝামাঝি জায়গাটা বোধ হয় এজমালি এলাকা। পূর্বদিকে নিমগাছ, পশ্চিমে মল্লিকের বাগানের দেওয়াল, উত্তরে মালিদের ওই ঘরটা আর দক্ষিণে আস্তাবল। প্রায় বিঘে দশেক জায়গা হবে। এইটুকুই মনে হচ্ছে এই দোয়েলটির স্বরাজ্য।...এক ঝাঁক টিয়া এসে বসল বকুলগাছটাতে, আমগাছের যে ডালটা সবচেয়ে উঁচু, তার উপর এসে বসল একটা পুরুষ টুনটুনি। কুচকুচে কালো রঙের উপর নীলের আভা বেরুচ্ছে। ডানার পাশে ছোট্ট একটু লাল জ্বলছে আগুনের মত। চি হুইটু, চি হুইটু, চি হুইটু...মুখ উঁচু ক'রে ডাকতে লাগল পাখিটা। সারি দিয়ে বাঁশপাতি পাখী উড়ছে একদল। চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল—দূর থেকে ভেসে আসছে পাপিয়ার অবিশ্রান্ত ডাক।

...ক্ষণিকের জন্য আত্মহারা হয়ে পড়লেন বৈজ্ঞানিক। তাঁর মনে হ'ল, তিনি যেন কোনও অবাস্তব স্বপ্নলোকে এসে হাজির হয়েছেন, যেখানে সুর আর রঙ ছাড়া প্রকাশের আর কোনও ভাষা নেই। সহসা যেন তিনি ভুলে গেলেন যে, দোয়েল পাখির জীবনের অনেক খুঁটিনাটি সংগ্রহ করতে হবে তাঁকে, অন্যমনস্ক হ'লে চলবে না। কিন্তু মনকে কি এমন ক'রে একমুখী ক'রে রাখা সম্ভব? একই মন সহস্র দিকে সহস্র ডানা মেলে উড়তে চাইছে যে অহরহ। দোয়েলের ডাকেই ঘোর ভাঙল বৈজ্ঞানিকের। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, নিম-গাছের উঁচু ডালে ব'সে প্রাণ খুলে গান গাইছে। এক ঝাঁক গিটকিরি যেন অদৃশ্য পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে বাঁশীর তানে ভর ক'রে। একটু আগেই যে এই পাখিই মারমুখী হয়ে উঠেছিল, তা কে বলবে! একটু দূরে টুনটুনি ডাকছে, টিয়ার ঝাঁক বসেছে পাশের বকুলগাছে, বাঁশপাতি পাখির ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে স্বচ্ছন্দে আশেপাশে, দোয়েলের তাতে আপত্তি নেই। দ্বিতীয় আর একটি দোয়েল এলে কিন্তু ও আর কিছুতে সহ্য করবে না তাকে। আত্মীয়-প্রীতি

মোটে নেই। কারই বা আছে? হঠাৎ মনে হ'ল বৈজ্ঞানিকের। আত্মীয়দের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক হয় না, কারণ তাদের সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্কটা এত উগ্রবক মুখ্য যে, প্রীতির সৌকুমার্য নষ্ট হয়ে যায়। তোমার সুখ-সুবিধায় ভাগ বসাতে উৎসুক তারা সর্বদা। তোমার ঐশ্বর্যে যদি ভাগ বসাতে দাও তাদের, ত তারা সুখী হবে না, হিংসায় জ্ব'লে মরবে। জটিল মনস্তত্ত্ব। এই জন্যে পৃথিবীর বড় বড় কাব্যের বিষয় বোধ হয় আত্মীয়-বিরোধ। বড় বড় গণিতের যেমন শক্ত শক্ত অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসেন, বড় বড় কবিরা তেমন জটিল মনস্তত্ত্বের রহস্য নিয়ে আত্মহারা হতে চান। থিয়োরিটা খাড়া ক'রে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ভাবলেন একটু। আশ্চর্য! অনাত্মীয়ের সঙ্গেই প্রেম হয় যার সঙ্গে কোনদিন চেনাশোনা ছিল না, সেই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ আগে সভ্যসমাজে লোকে বোনকেই বিয়ে করত, সে যখন আরও সভ্য হ' তখন এ প্রথা উঠে গেল। বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, পরের মেয়েকে গৃহি করার প্রথা শুধু যে প্রজনন-বিজ্ঞানের উপযোগিতার জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল, এ মনে করবার কোনও কারণ নেই। প্রজনন-বিজ্ঞান অনেক পরের ব্যাপার রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের সঙ্গে প্রেম জমে না—এই সত্যটাই মানুষ বোধ হ অনেক আগে আবিষ্কার করেছিল। আবার বৈজ্ঞানিক সচেতন হয়ে উঠলেন ...চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। দোয়েলটার দিকে আবার মন দিতে চে করলেন। ওই যে সঙ্গিনীটিও এসে নীচের ডালে বসেছেন। ভাবটা, যে কিছুই জানেন না। ওকে কেন্দ্র ক'রেই যে এখনই অত বড় যুদ্ধ একটা হ গেল, ওরই উদ্দেশ্যে উপরের শাখায় যে অমন সঙ্গীতচর্চা চলছে, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন যেন। ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গিয়ে আর একটা ডালে বসল যদিও গায়ের রঙ পুরুষ পাখিটার মতই, কিন্তু অত চকমকে কালো নয়, এক পাঁশুটের আভাস আছে। কিন্তু ওই পাঁশুটে কালোর মধ্যেই বেশ সুন্দর আছে একটি। পুরুষটার চেয়ে একটু বেশি মার্জিতও যেন। পুরুষ পাখি উড়ে গিয়ে আর এক জায়গায় বসল, আবার শুরু করল গান।

...পদশব্দ শুনে বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, রত্নপ্রভা আসছেন পিছনে একজন চাকর, তার মাথায় প্রকাণ্ড একটা আয়না।

রত্নপ্রভা বললেন, এটা কোথায় রাখব?

বৈজ্ঞানিক হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ছেলেমানুষের মত।

ওই নিমগাছটার তলায় রাখলে কেমন হয়! গাছপালা দিয়ে একটু ঘেরে
তে হবে কিন্তু। আর আমরা কোন্‌খানটায় বসব বল দিকি? কাছাকাছি
মাদেরও বসবার একটা জায়গা করতে হবে, ফোটো তুলব কিনা!

আমাদের ছোট তাঁবুটা এখানে টাঙিয়ে দিলেই তো হয়।

বেশ তো, তা হ'লে চমৎকার হবে।

ওই উঁচু জায়গাটায় দিই?

তা হ'লে তো গ্র্যাণ্ড হবে। গাছপালা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে কিন্তু।
নে তাঁবু-টাবু দেখে পাখিটা—

বুঝেছি। আগে তুমি খেয়ে নাও। চা ভিজিয়ে এসেছি।

ও, চল।

বৈজ্ঞানিক ফিরেই দেখলেন, কবিও আসছেন।

ও, আপনি এসে গেছেন! ভালই হয়েছে। আজ একটা এক্‌স্‌পেরিমেন্ট
রব ভাবছি।

কি?

দেখতেই পাবেন, আগে চা খেয়ে নেওয়া যাক, চলুন।

ক্রমশ

"বনফুল"

"বাদ"

সব "বাদ" বাদ দাও, মনে রাখ সার—
আপনি বাঁচিলে বাঁচে নিখিল সংসার।

"মুচব"

নেতা

টাকাকড়ি লোকজন করিয়াছ জড়ো,
শহীদ হইয়া সবে দেশকর্ম কর।
হাসিল হইলে কাজ জয়ধ্বনি দিয়া,
শোভাযাত্রা ক'রো মোরে পুরোভাগে নিয়া।

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ কথা

স্বাধীনতার এক বৎসর পরে

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। গান্ধীজীর মৃত্যুর পরেও ছ মাসের উপর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এমন সময়ে পথের মাঝখানে হয়তে পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখার দরকার, আমরা কতদূর আসিলাম এবং প আমাদের ঠিক আছে কি না! যে লক্ষ্যের দিকে আমরা যাত্রা করিয়াছিলা সেদিকে চলিয়াছি তো?

সম্প্রতি প্রায়ই কলিকাতার বাহিরে, কাছাকাছি জেলাগুলিতে ঘোরাফে করিতে যাই। কলিকাতার মধ্যেও বন্ধুবান্ধবদের কাছে তাঁহাদের দৈনন্দি দুঃখের সংবাদ পাই; কাপড় কালোদাম ভিন্ন খরিদ করিবার উপায় নাই রেশনের চাল খারাপ, গভর্মেণ্ট-আপিসে কংগ্রেসকর্মী অথবা আধাকর্মী কিং সিকিকর্মীর অবাধ গতি, জনসাধারণের উপরে তাঁহাদের মাতব্বরির সীমা নাই এমনই অসংখ্য দুঃখের কাহিনী। আমার মনে বারংবার প্রশ্ন জাগিতেছে, ধরি লইলাম, সমস্ত অভিযোগই সত্য। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য আমরা যখন সংগ্রা করিয়াছিলাম, তখন আমাদের মনে কি ছিল? কোন্ লক্ষ্যের অভিমুখে আম ছুটিয়াছিলাম?

ভাবিয়া মনে হইয়াছে যে, আমরা কংগ্রেসের নামেই আন্দোলন করি অথ হিংসার আশ্রয়ে বিপ্লবপ্রচেষ্টাই করি, আমরা সর্বপ্রথম ইংরেজকেই তাড়াইবা চেষ্টা করিয়াছিলাম, দূর-ভবিষ্যতের বিষয়ে তত ভাব নাই, দূরের সাধ্যের জ সাধনকে যথাযোগ্য ভাবে নির্মাণ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি নাই দ্রুত কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হইলে জার্মানির, সম্ভব হইলে জাপানে নিকট অস্ত্রসাহায্য সংগ্রহের চেষ্টাও করিয়াছি; আশু প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠা পরিচালনার ব্যাপারে অনাচার ও অধর্মকে আশ্রয় করিতেও পশ্চাৎপদ হই নাই আমাদের মনের পিছনে এইরূপ বিশ্বাস ছিল, যাহারা জীবন পণ করি দেশোদ্ধারের ব্রতে আগুয়ান হইতেছে, তাহারা কখনও স্বার্থ-দুষ্ট হইবে না সেই ভরসা ছিল বলিয়াই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে বিপ্লবের নেতৃত্ব সমধি পরিমাণে উদিত হইয়াছিল। বিপ্লব যত আগুয়ান হইবে, ততই ক্র সাধারণ চাষী মজুর জাতীয় মানুষ অগ্রণী হইয়া আসুক, এবং মধ্যবিত্তগণ ক্রমে তাহারা অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করিয়া দিক, পূর্বতন নেতাগণ জীবন-ভা

ইতে জীর্ণ পত্রের মত শুকাইয়া খসিয়া পড়ুক, ইহার জন্য বিশেষ কোনও ায়োজন অথবা চেষ্টা আমাদের ছিল না।

ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে, ভারতশাসনের ভার ইংরেজের পরিবর্তে ভারত-াসীর হাতে আসিয়া পৌছিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের যে গণতান্ত্রিক ত্তিকেন্দ্রগুলি গান্ধীজী আঠারো দফা গঠনকর্মের সহায়তা গড়িয়া তুলিতে াহিয়াছিলেন, তাহা কার্যে পরিণত হইবার পূর্বেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হইয়াছে। লে পরিশ্রমজীবীদের আয়ত্তে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা না আসিয়া পরশ্রমজীবীদের মায়ত্তে আসিয়াছে। প্রত্যেকেই দাবি করিতেছে যে তাহারাই পরিশ্রমজীবীদের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করে। যে দল আজ শাসনক্ষমতা লাভ করিয়াছে, সে দল বলিতেছে যে, নিপীড়িত শ্রেণীর মুক্তির দিকেই তাহারা দেশকে লইয়া চলিয়াছে; কিন্তু জগতের বর্তমান অবস্থায় এবং যখন রাষ্ট্রকে বিগত যুগের সমস্যারাজীর ঃজর টানিয়া চলিতে হইতেছে, তখন ইহা অপেক্ষা দ্রুতগতিতে চলা সম্ভব নয়। চলিবার চেষ্টা করিলে দেশকে আরও গুরুতর বাধার আঘাতে হয়তো পথ চলাই বন্ধ করিতে হইবে। আবার অপর পক্ষে যাহারা শাসনে অধিকারীবৃন্দের সমালোচনা করে, তাহারা বলিতেছে, তোমাদের দলের দ্বারা হইবে না। আমরা ভার পাইলে দেখাইয়া দিতে পারি, কি করিয়া জনসাধারণের স্বার্থ পুষ্টি করিতে হয়। ভবিষ্যতে ক্ষমতা-হস্তান্তরের জন্য সমালোচকদল বর্তমান অধিকারীদের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে অসন্তোষের সুযোগ লইতেছে এবং সেই অসন্তোষ বৃদ্ধি করার জন্য যথাযোগ্য চেষ্টা করিতেছে।

উভয় পক্ষের বাদানুবাদ শুনিয়া আমার মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। আজ যাহারা সমাজতন্ত্র অথবা কমিউনিজ্‌মের নামে বর্তমান শাসককুলকে সরাইয়া রাষ্ট্র-পরিচালনার ভার লইতে চায়, তাহারা অধিকারী হইলে অবস্থাটি কেমন দাড়াইবে?

রুশ দেশের অবস্থাই বিবেচনা করা যাক। সেখানে মস্‌কো ট্রায়েলের সময়ে প্রমাণিত হইয়াছিল যে, মৃত্যুঞ্জয়ী বীর, এমন কি বিপ্লবের নেতা হইয়াও মানুষের স্বার্থবুদ্ধি, ক্ষমতাপ্রিয়তা অনেক সময়ে দূর হয় না। ভারতীয় সাধনার ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিলেই যে মানুষ সকল সংস্কার-পাশ হইতে মুক্ত হয়, তাহা নহে। শ্মশানসাধনায় এক বিষয়ে সিদ্ধিলাভ ঘটিতে পারে। কিন্তু তেমন সাধুকেও মহান্তের গদিতে বসাইলে যে সকল

সংস্কারের বীজ তাহার অন্তরে দগ্ধ হইয়া যায় নাই, সেগুলি অবাধ ক্ষমতালাভের আবহাওয়ায় আবার অঙ্কুরিত হইয়া ওঠে। ইহা হইতে মুক্তির উপায় কি? রুশ দেশে যে পথ অনুসৃত হইতেছে তাহা হইল, ব্যক্তির বুদ্ধি ও চরিত্র অপেক্ষা পার্টির উপরে বেশি নির্ভর করা। পার্টিকে আবার বিশুদ্ধ রাখিবার চেষ্টায় অন্ত নাই। কিন্তু পার্টির ভিতরের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে সংশয়ের অবসান ঘটে না। লেনিনকে সময়ে সময়ে একা চলিতে হইয়াছে; অর্থাৎ তিনি সত্য লাভ করিয়াছেন, অপরে লাভ করে নাই—এই বিশ্বাসে পার্টি অপেক্ষা সত্যকেই তিনি নিবিড়তরভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই যে রিএক্‌শনারি মৎলববাজ ছিলেন, এমন নয়। রোজা লুক্সেমবর্গের মত ব্যক্তিও কোন কোন সময়ে লেনিনের মতের সহিত কিছুতে এক হইতে পারে নাই। অতি সূক্ষ্ম তর্কের দ্বারা, প্রয়োজন হইলে অতি উগ্র ভাষা বা বাক্যবাণের আঘাতের সহায়তায় তিনি পার্টিকে স্বীয় মতে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নিউ-ইকনমিক-পলিসি প্রবর্তনের সময়ে লেনিনকে লেফট্‌-উইং-কামউনিজ্‌ম-অ্যান-ইন্‌ফ্যাণ্টাইল ম্যালাডি নামক একটি গ্রন্থ লিখিয়া জনমতকে স্বপক্ষে আনবার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। তাহাতে যুক্তি প্রচুর আছে; কিন্তু যুক্তিকে গলাধঃকরণ করাইবার জন্য ঝালমসলা প্রচুর পরিমাণে মিশাইয়া বুদ্ধির এই খোরাকটিকে পরিবেশন করিতে হইয়াছিল।

তেমনই আবার পরবর্তী কালে রুশ দেশকে আত্মরক্ষার আশু প্রয়োজনে এক সময়ে জার্মানির ফাসিস্ট শক্তির সহিত অনাক্রমণের চুক্তি করিতে হইয়াছিল; যখন যুদ্ধ সমগ্র জগতে প্রবলভাবে চলিতেছে, সমগ্র বিশ্ব দুই যুধ্যমান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখনও এক পক্ষে থাকিয়া বহুদিন যাবৎ অপর পক্ষে অবস্থিত জাপানের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইয়াছে; আজও সমুদ্র-কূলবর্তী কুওমিনটাঙের গভর্মেণ্টের সঙ্গে মিতালি করিয়া চীনের কমিউনিস্ট শক্তির সম্পর্কে অন্তত বাহিরে উদাসীন ভাব ধারণ করিয়া থাকিতে হইতেছে। এই সকল জটিল ব্যাপারের মধ্যে কোন্‌টি নিপীড়িত জনগণের মুক্তির পোষক, কোন্‌টি নয়, তাহার সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ তো প্রায়ই দিশাহারা হইয়া যায়। সেই সন্দেহের অবস্থায় পার্টি বলিয়া দেয়, কোন্ পথ ঠিক, কোন্‌টি নয়। পার্টির মধ্যেও দেখিয়াছি, যেখানে স্বার্থবুদ্ধির প্রশ্ন উঠে না, সেখানেও মতের আকাশ-

পাতাল প্রবেশ হওয়া বিচিত্র নয়, এবং অবশেষে সুবুদ্ধিকে গলাধঃকরণ করাইবার কালে গালাগাল-মন্দের অনুপান কম দিতে হয় না। তাহার চেয়ে কঠোরতর উপায়ের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম। সবই মানিলাম ঠিক, না হয় সম্পূর্ণরূপে মানিয়াই লইলাম, রুশ দেশে কমিউনিস্ট পার্টি অভ্রান্ত গতিতে জনসাধারণকে মুক্তির অভিমুখে লইয়া চলিয়াছেন। এবং পার্টির মধ্যে যখনই মনে হইয়াছে কলুষ প্রবেশ করিতেছে, তখনই সংশোধনের জন্য বলপ্রয়োগ ছাড়া অপর কোনও অস্ত্র তাঁহারা পান নাই; অর্থাৎ অভিপ্রায়ের কখনও বিচ্যুতি ঘটে নাই।

ইহাতে হইল কি? পার্টি পরিচালনকার্যের দায়িত্ব লওয়ার পর উহা একটি শক্তিকেন্দ্রে পরিণত হইল। জগতের ইতিহাসে ব্রাহ্মণেরাও অপরিগ্রহ এবং অস্তেয় ব্রত অবলম্বন করিয়া অবশেষে অনাগারিক অবস্থায় সমাজ-পরিচালনার দায়িত্ব লইয়াছিলেন। কিন্তু নবব্রাহ্মণসমাজ ভাবিতেছেন, নিজেদের সংঘকে শুদ্ধ রাখিয়া জগতের উৎপাদন-ব্যবস্থাকে এমন দ্রুত পরিবর্তনের পথে লইয়া যাইবেন, প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাকে পুরুষকারের দ্বারা এত শীঘ্র সম্পাদিত করিবেন যে, অবস্থার গুণে স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন শোষকশ্রেণী আর দানা বাঁধিতে পারিবে না। এবং এই অবসরে পার্টিতে শক্তির কেন্দ্রীকরণে যে দোষটুকু হয়, তাহা শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা দূর করিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে না। রাষ্ট্র আয়ত্তের সময়ে ডিক্টেটরশিপ অপরিহার্য অস্ত্র, কিন্তু তাহার পরেই উইদরিং-অ্যাওয়ে-অফ-দি-স্টেটের পর্ব আরম্ভ হইবে। ধনতন্ত্রবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে কেন্দ্রীকরণ রচিত হইয়াছে, তাহার কাঁটা তুলিতে হইলে কেন্দ্রীকরণের অপর একটি কাঁটার প্রয়োজন। সেই উৎপাটনকারী কাঁটার নাম ডিক্টেটরশিপ-অফ-দি-প্রোলেটারিয়েট। কিন্তু কার্যত আজ আমরা দেখিতেছি, তাহার স্থলে ডিক্টেটরশিপ-অফ-এ-পার্টি-রেপ্রেসেন্টিং-দি-প্রলেটারিয়েট স্থাপিত হইয়াছে; এবং তাহারও আয়ুষ্কালের ক্ষীণতা সম্বন্ধে কোনও ভরসার সংবাদ পাইতেছি না।

আজ ভারতবর্ষে যে দল রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহারা কেন্দ্রীকরণে বিশ্বাসী না হইলেও সেই দিকেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন। যাঁহারা বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছেন, তাঁহারা তো খোলাখুলি কেন্দ্রীকরণেই বিশ্বাসী; কেবল তাঁহাদের কেন্দ্রীকরণের ধরণ-ধারণ স্বতন্ত্র। এই লইয়াই দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে।

রুশ দেশের মধ্যে শক্তির কেন্দ্রীকরণকেও সাময়িক ব্যবস্থা বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেছি না। কেন না, উৎপাদন-ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের ইচ্ছা থাকিলেও দেশরক্ষার ব্যাপারে যতক্ষণ মানুষ অস্ত্রশস্ত্রের উপরে নির্ভর করে, অর্থাৎ সেখানে কেন্দ্রীকরণ থাকিয়া যায়, ততক্ষণ সেই কেন্দ্রীয় শক্তির প্রভাবে উৎপাদন-ব্যবস্থাতেও বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয় না। যে রাষ্ট্র অস্ত্রবলের দ্বারা দেশরক্ষা করে, যে রাষ্ট্র সামরিক ক্ষমতাকে একান্তভাবে পুঞ্জীভূত করিলে তবেই প্রজার প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হয়, এবং এই পুঞ্জীকৃত শক্তি লইয়া অবস্থাবৈগুণ্যে কখনও জার্মানি, কখনও ইংলণ্ড আমেরিকা, কখনও বা কুওমিনটাঙের সঙ্গে মিতালি করিবার ক্ষমতা স্বীয় অধিকারে রাখিতে বাধ্য হয়, সেই রাষ্ট্রশক্তি জীবনের অর্থনৈতিক ব্যাপারে কখনও বিকেন্দ্রীকরণ স্বীকার করিতে পারে না। যে সেরূপ পরামর্শ দেয়, সে যুধ্যমান রাষ্ট্রকে আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ করিতেই বলে। অতএব যুদ্ধার্থে কেন্দ্রীকরণের ছায়াতলে অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা রোদের অভাবে ফ্যাকাশে রঙ ধরিয়া অকালে মরিয়া যায়।

ভারতবর্ষও আজ দেশরক্ষায় হিংসার নীতিকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। ফলে সে অমোঘভাবে যে কেন্দ্রীকরণের অভিমুখে চলিয়াছে, তাহার বিষয়ে চিন্তা করিয়া সাধারণ মানুষের মুক্তি বা স্ব-রাজের আলোর কিরণ দেখিতে পাইতেছি না। আজ ভারতশাসনের ধরণ-ধারন দেখিয়া, তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা শুনিয়া মনে হইতেছে, ইহার জন্য আংশিক পরিমাণে অধিকারীবৃন্দ যে দায়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহারা সংগ্রাম করিতে শিখিয়াছিলেন, রাজ্য-পরিচালনার অভ্যাস কখনও করেন নাই। সদভিপ্রায় থাকিলে এবং বুদ্ধিযুক্ত পরিশ্রম করিয়া লইলে হয়তো শিখিয়াও লইতে পারিতেন। কিন্তু সব দোষটুকু ব্যক্তিগতভাবে অধিকারীবৃন্দের উপরেই চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। আরও সূক্ষ্মতর দৃষ্টিতে বুঝিতে পারিতেছি, পার্টিকে দেবতায় পরিণত করার ফলে কতকগুলি দোষ জন্মিয়াছে, হিংসা এবং পরিচালনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে কতকগুলি দোষ জন্মিয়াছে। অতএব আজ যদি তথাকথিত বিপ্লবের দ্বারা বর্তমান শাসককুল পদচ্যুত হয় এবং সেই স্থলে সমালোচকদল গদিতে বসিতে পায়, তাহা হইলেই মুক্তির দিকে আমরা আগাইয়া যাইব, তাহা ভাবিতে পারিতেছি না। অধিকারীবৃন্দের ব্যক্তিগত দুর্বলতা বা অক্ষমতার বশে যাহা ঘটিতেছে, উভয়

অধিকারী তাঁহাদের পদে অধিষ্ঠিত হইলে, সেই দোষের নিরাকরণ সম্ভব। কিন্তু পার্টি-দেবতার প্রসাদে যে দুঃখের উদয় হয়, সমাজে শক্তির কেন্দ্রীকরণে যে দোষ দেখা দেয়, তাহা তো থাকিয়াই যাইবে। রুশ দেশের বর্তমান ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া সে বিষয়ে কোনও ভরসা পাইতেছি না।

কমিউনিজ্‌ম কিছু কিছু বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিছু পড়িয়া, কিছু শ্রদ্ধাসম্পন্ন কমিউনিজমে বিশ্বাসী বুদ্ধিমান ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করিয়া। কিন্তু একটি বিষয় আমার অমীমাংসিত থাকিয়া যাইতেছে। দ্বন্দ্বমূলক জগতে সকল অবস্থাএই প্রতিশক্তি কালে উদিত হয়। মানুষে মানুষে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে সংগ্রাম ইতিহাসে চলিয়া আসিতেছে, সেই শ্রেণী-সংগ্রামে যে হিংসার অস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেই হিংসার প্রতিশক্তি কি কখনও উদিত হইতে পারে না? হিংসার দ্বারা ফললাভ সুচারুরূপে হয় না, তবু হিংসাকেই মানবসমাজ বারংবার দ্রুত কার্যসিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করিয়াছে। তাহার নানা দোষ জানিয়াও, আরও উত্তম অস্ত্র নাই বলিয়াই মানবসমাজ হিংসা পরিবর্জন করিতে ভরসা পাইতেছে না। এইখানে প্রশ্নের উদয় হয়, হিংসারূপ মোটা অস্ত্রের দোষের সম্পর্কে যখন আমরা সচেতন হইতে আরম্ভ করিয়াছি, তখন তাহার প্রতিশক্তির প্রয়োগ কি মানুষের বুদ্ধির অতীত বস্তু হইবে?

ব্যক্তিগতভাবে আমার তো মনে হয়, ইহার সম্ভাবনা আছে। মানুষ পূর্বকালে ছেলেদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যাপারে তাড়ন করিত। পাগলের চিকিৎসার জন্য মারধোর করা তো প্রচলিত ঔষধ ছিল। অপরাধীকে সংশোধনের জন্য ওই একই অস্ত্র হাজার বছরেরও বেশি অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু আজ মনোবিজ্ঞান এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, শিশুশিক্ষার ব্যাপারে, পাগল অথবা অপরাধীকে সংশোধনের জন্য সম্পূর্ণ নূতন পথ গ্রহণ করা সম্ভব; মনোজগতে বস্তুত বিপ্লব সাধিত হইয়াছে। কিন্তু যেখানে একের পরিবর্তে বহুর প্রশ্ন আসিয়া পড়ে, সেখানে আজও আমরা মনে করি, বলপ্রয়োগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সমাজের কেন্দ্রশক্তিস্বরূপ রাষ্ট্র যাঁহারা অধিকার করিয়া আছে, তাহাদিগকে আসনচ্যুত করিতে হইলে, এবং সেই আসনে বসিয়া নূতন সমাজ-রচনার পথকে নিষ্কণ্টক করিতে হইলে, হিংসার ব্যবহার অপরিহার্য; অর্থাৎ প্রতিপক্ষের মনকে ভয় ভিন্ন ভালবাসা দিয়া কিছুতেই পরিবর্তন করা সম্ভবপর হইবে না।

এইখানে বুদ্ধিবিচারের দ্বারা আমার মনে হইয়াছে, গান্ধীজীর প্রবর্তিত সত্যাগ্রহের কৌশল পরীক্ষার যোগ্য। ছোট ছোট স্বার্থের দ্বন্দ্বে ইহার দ্বারা হিংসামূলক উপায় অপেক্ষা সুফল লাভ করা যায়, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বৃহত্তর স্বার্থদ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ইহার সম্যক্ পরীক্ষা হয় নাই। আমাদের দেশ যখন সত্যাগ্রহকে আশ্রয় করিয়া মুক্তিসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন সত্যাগ্রহের নূতন রণকৌশলটিকে সম্যক্‌ভাবে আয়ত্ত করা, অথবা তাহার মধ্যে কোনও ত্রুটি থাকিলে তাহাকে শুদ্ধতর করা অপেক্ষা আশু ইংরেজ-বিতাড়নের দিকেই আমাদের ঝোঁক ছিল। বহু রণক্ষেত্রে আমরা স্বীয় সংস্কারকে আদরে আঁকড়াইয়া ছিলাম বলিয়াও সত্যাগ্রহের যথাযথ পরীক্ষা হয় নাই। ঠিক বিজ্ঞানদৃষ্টি লইয়া কার্য করিলে হয়তো ভবিষ্যতে সত্যাগ্রহকে আমরা স্বীয় অভিজ্ঞতা দ্বারা আরও উত্তম অস্ত্রে পরিণত করিতে সমর্থ হইব। গান্ধীজী ইহাকে যতদূর শাণিত করিয়াছিলেন, উত্তরকালে হয়তো আমাদের দ্বারা উহার আরও উন্নতি সাধিত হইবে।

যাহাই হউক, আজ নবভারতে যে সকল দোষত্রুটি দেখিতেছি, তাহার বিরুদ্ধে আমার রাগ নাই। মনে হয়, যাহারা সত্যাগ্রহের অসম্পূর্ণ পরীক্ষার পর হিংসার অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, যাহারা পার্টিরূপ দেবতার পূজা প্রবর্তন করিতেছে, যাহারা জগতের দুঃখ নিবারণকল্পে কেন্দ্রীকরণের কাঁটা কেন্দ্রীকরণের দ্বারাই উৎপাটিত করিতে চায়, তাহাদের ব্যক্তিগত দুর্বলতাদোষের জন্য, সংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া থাকার জন্য যতটুকু অপরাধ ঘটিতেছে, তাহা না ধরিলেও মূলেই তাহারা এমন কতকগুলি বস্তুকে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে, যাহা অন্য বহু দোষের আকর। এমন অবস্থায় কংগ্রেসের বদলে সোস্তালিস্ট পার্টি, আর সোস্তালিস্ট পার্টির বদলে কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করি কেমন করিয়া? তাহারা সকলে আসলে পার্টি-দেবতার পূজক; ওই দেবতার পূজার মন্ত্রই এমন যে, তাহার দ্বারা নূতন শৃঙ্খলের রচনা হয়। এক উৎপাদন-ব্যবস্থা ভাঙিয়া অন্য উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়িবার কালে ধনকৌলিন্যের পরিবর্তে পার্টি-কৌলিন্যের উদ্ভব হয়। এবং বিপ্লবকৌশলই যেখানে হিংসার সাধনকে আশ্রয় করিয়া চলে, সেখানে হিংসার দাসত্ব আরও গভীরভাবে মানবসমাজের বুকে চাপিয়া বসে।

এই নাগপাশ হইতে গান্ধীজী মুক্তির উপায় আবিষ্কার করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মত ছিল, যে শক্তিকে আমরা পরাস্ত করিতে চাই,

সেই শক্তির প্রতিশক্তিকে অবলম্বন করাই একমাত্র সার্থক উপায়। কবিতার ভাষায় তিনি বলিতেন, দ্বেষকে প্রেমের দ্বারা জয় করিতে হইবে, হিংসাকে অহিংসার দ্বারা। কিন্তু সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে আরও মোটা ভাষায় তিনি বলিতেন, কেন্দ্রীকরণকে পরাস্ত করিতে হইলে বিকেন্দ্রীকরণ ভিন্ন উপায় নাই, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'।

নোয়াখালিতে সমস্যার সমাধান যখন প্রান্তীয় গভর্মেণ্ট এবং কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্টের সাধ্যের অতীত হইয়াছিল, যখন উভয় গভর্মেণ্ট সেখানে সৈন্য সমাবেশ করিয়া 'শান্তি' প্রতিষ্ঠিত করিলেও মূল রোগের নিরাকরণ করিতে পারেন নাই, তখন গান্ধীজী সম্পূর্ণ নূতন উপায়ে সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিলেন। নোয়াখালিতে নরহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংস, নারীর অবমাননা সবই ঘটিয়াছে। যে কোন সংগ্রামের মধ্যে এ তিনটি অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু গান্ধীজীর দৃষ্টিতে মূল সমস্যা ছিল অন্য। নোয়াখালির মুসলমান-জনতা স্থির করিয়াছিল যে, সংখ্যালঘু হিন্দুদের বলপ্রয়োগের বশে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে সংখ্যালঘু-সমস্যার আমূল সমাধান হইয়া যাইবে। অর্থাৎ একটি এলাকায় শুধু একই ধর্ম, একই পোশাক, একই ভাষা থাকিবে, ইহা তাহারা বলপ্রয়োগের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহার প্রতিকার গভর্মেণ্টের দ্বারা সম্ভব হয় নাই। গান্ধীজী বলিলেন, যদি সকল হিন্দু নোয়াখালি হইতে চলিয়াও যায়, আমি তাহাদের একক প্রতিনিধি হইয়া থাকিব, এবং আমার ধর্মবিশ্বাস স্বাধীনভাবে অনুসরণ করিয়াই থাকিব। মুসলমান-জনতাকে শাসন করিয়া নয়, তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া, কিন্তু স্বীয় ধর্মমত পুরাপুরি পালন করিয়া, তিনি তাহাদের অন্তর জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে ভিন্নধর্ম-পালনের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য একক সত্যাগ্রহীর মত সংগ্রাম করিয়াছিলেন।

দেশের অর্থনৈতিক সমস্যারও গান্ধীজী এইরূপ বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা সমাধান করিবার পথ দেখিয়াছিলেন। চরকা এবং অপর কুটিরশিল্পের সাহায্যে গ্রামবাসীগণ সমবায়-সমিতি গড়িয়া কি করিয়া অন্নবস্ত্রের সমস্যা মিটাইতে পারে, সে সম্বন্ধে বহু দিন উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, চাষ যৌথভাবে করিতে হইবে, গোপালন একা একা না করিয়া যৌথভাবে করিতে হইবে; এবং সেই সবই লাভের কড়ির জন্য নয়, তৎপরিবর্তে ব্যবহারের জন্য

করিতে হইবে। চুরি-ডাকাতি নিবারণের জন্ম পুলিসে যাহা পারে করুক, কিন্তু জনসাধারণ অন্তভাবে সচেষ্ট হইবে। চুরির ধন, শোষণের ধন কেহ ঘরে রাখিবে না; অতএব অস্ত্রের সাহায্যে তাহা রক্ষার প্রয়োজনীয়তাও থাকিবে না। তখনও যদি কোনও লোক শিক্ষা বা সংস্কারের দোষে চোর হয়, শোষক হয়, তবে সত্যাগ্রহের দ্বারা তাহাকে পরিবর্তিত করিতে হইবে, এই শিক্ষা গান্ধীজী দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত এবং সমবেত চেষ্টায় তিনি যে নূতন সমাজ-রচনার শিক্ষা দিতেন, সেখানে যে পরিশ্রম করে না তাহার স্থান নাই; সেখানে আর্থিক অধিকারের সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেরূপ সমাজের পক্ষে আত্মরক্ষার জন্ম—অর্থাৎ শোষণবিহীন সমাজে ব্যক্তিগত ব্যবহারের সম্পত্তি এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতা রক্ষার জন্ম—গান্ধীজী সত্যাগ্রহকেই অমোঘ অস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন; মানুষকে কেন্দ্রীকৃত সামরিক শক্তির সাহায্যে প্রাণরক্ষা অপেক্ষা 'আত্ম'-রক্ষার এই শুদ্ধতর পথকে আশ্রয় করিবার উপদেশ দিতেন।

বর্তমান ভারতের শাসকবৃন্দের অপরে যে-দোষ দেখান না কেন, সে কীর্তনে আমি যোগ দিতে পারিব না। কিন্তু এ দোষ তাঁহাদের দিব যে, গান্ধীজীর বিকেন্দ্রীকরণের আদর্শকে তাঁহারা সম্যক্‌ভাবে পরিপোষণ করিতেছেন না। কিন্তু এই দোষ দেখাইয়াই ক্ষান্ত থাকিলে অপরাধী হইতে হয়। জাতির জীবনে এক বৎসর কিছু নয় মানি। পুরাতন দিবসের পুঞ্জীভূত আবর্জনাস্তূপ বিপদ ঘটাইতেছে, তাহাও মানি। কি উপায়ে আমাদের পক্ষে বর্তমান অবস্থার মধ্যে বিকেন্দ্রীকরণের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া সম্ভব, তাহারই ইঙ্গিত দিয়া বর্তমান প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

আজ দেশের মধ্যে অন্ন এবং বস্ত্রের অভাব। যাহা উৎপাদন হইতেছে তাহা পর্যাপ্ত নয়, উপরন্তু যুদ্ধের প্রসাদে যাহাদের হাতে ছাপা টাকা জমিয়াছে, তাহারা বাজার আরও খারাপ করিয়া দিতেছে। ফলে যতটুকু চাল বা কাপড় দেশে উৎপন্ন হয়, তাহারও বণ্টন অত্যন্ত অসমভাবে ঘটিতেছে। নিতান্ত দরিদ্র যাহারা, অথবা যাহাদের কালোবাজারে যোগাড় করিবার ক্ষমতা নাই, ধরাধরি করিবার কেহ নাই, তাহাদের কষ্টের শেষ নাই। শোনা যায়, গভর্মেণ্ট মিলের মালিকদিগকে অনুরোধ উপরোধ করিতেছেন যেন উৎপাদন তাঁহারা বাড়ান। গভর্মেণ্ট নিজে এদিকে হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর এবং আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র

খরিদ করা ও সৈন্যবিভাগকে সুগঠিত করার ব্যাপারে এমনই বিব্রত যে, কলকারখানার জাতীয়করণ করিতে পারিতেছেন না। মিল-মালিকেরা ঝোপ বুঝিয়া কোপ বসাইতেছেন, তাঁহারা চান গভর্মেণ্ট জাতীয়করণের নীতি পরিহার করুন, অর্থাৎ মালিকদের লাভের কড়ি যেন কোনদিন খোয়া না যায়। গান্ধীস্মৃতি-তহবিলে চাঁদা দিবার শর্তস্বরূপ তাঁহারা নিজেদের সুবিধাজনক কতকগুলি দাবি করিতেও ইতস্তত করেন নাই। যদি আমরা ধরিয়াই লই, গভর্মেণ্টের আর্থিক দুর্বলতার কারণে, অথবা ধনীদের মন্দশক্তিকে দাবাইয়া রাখিবার মত পর্যাপ্ত শক্তির অভাবে তাঁহারা জোর করিতে পারিতেছেন না, ঘরে এবং বাহিরে এত ভার একসঙ্গে সামলাইতে পারিতেছেন না, তাহা হইলেও তো অন্য একটি উপায় আছে।

মিল-মালিকেরা না হয় নাই দিল সস্তায় কাপড়; বাকি ভারতবর্ষের তো হাত আছে এবং কাজের অভাবও দেশে যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। আজ সেই হাতে যদি চরকা চালাইয়া কাপড় গড়িয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দুঃখও মেটে, মিল-মালিকদের প্রভুত্বও ভাঙে। বুদ্ধিমান লোককে বলিতে শুনিয়াছি, চরকা কাটিয়া কি আমরা আবার গরুর গাড়ির যুগে ফিরিয়া যাইব? গান্ধীজীর উত্তর ছিল, 'বেশি কাপড়ের লোভে যদি আমাদের পরাধীনতার খাতায় দাসখৎ লিখিয়া দিতে হয়, তাহা অপেক্ষা স্বাধীনভাবে চরকা কাটিয়া কিছু কম কাপড় পরাও তো ভাল।'

'আর শুধু তাই নয়। পুরাতন ভারত চরকা কাটিয়াছিল, কিন্তু সে সঙ্গে সঙ্গে পরাধীনতার শৃঙ্খলও পায়ে পরিয়াছিল। আমরা চরকা কাটিব এবং ইহার জন্য নূতন সামাজিক পরিবেশ গড়িয়া তুলিব। আমাদের সুতাকাটা লাভের বা মজুরির জন্য নয়, মানুষের বস্ত্রাভাব মিটাইবার জন্য চলিবে। একা নয়, গ্রামের সকলের বস্ত্রাভাব মোচনের জন্য চরকা আশ্রয় করিয়া আমরা নূতন সমবায় সমাজ গড়িয়া তুলিব, তবেই চেষ্টা সার্থক হইবে। সেই নূতন সামাজিক আবেষ্টনে চরকা নূতন রূপ ধরিয়া অবতীর্ণ হইবে। আমরা চাষের ব্যাপারে, বস্ত্রের ব্যাপারে, গো-পালনের ব্যাপারে সমবেত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিব। একবার সমাজের নূতন ভিত্তি স্থাপিত হইলে, সেই মন ও বুদ্ধি লইয়া আমরা সমবেত অধিকারে উচ্চাঙ্গের কলকারখানা শ্রমলাঘবের উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই চালাইতে পারি। শ্রমলাঘব শ্রেণীবিশেষের জন্য নয়, সর্বমানবের জন্যই আমাদের কাম্য।'

কেহ কেহ বলিয়াছেন, এমন আকাশকুসুম রচনার দরকার কি? তাহার চেয়ে সমাজের শক্তিকেন্দ্রস্বরূপ রাষ্ট্রকে আয়ত্ত করা যাক। আয়ত্তে আসিলে সেই শক্তির দ্রুত প্রয়োগের দ্বারা ধনতান্ত্রিকদের কলকারখানাগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া, এবং রাষ্ট্রের অর্থে তাহার চেয়ে উন্নততর কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজতন্ত্র প্রবর্তন করাই তো ভাল। মানুষকে আমূল নূতন শিক্ষা দিয়া ব্যক্তিত্বের গণ্ডী হইতে সমাজের কল্যাণার্থে আত্মোৎসর্গের শিক্ষাও তো এইরূপ শক্তিশালী রাষ্ট্র করিতে পারে। এক-একজনকে ধরিয়া হৃদয়ের পরিবর্তনের পথে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে অনেক দিন লাগিবারই কথা।

গান্ধীজী বলিতেন, 'আমিও সমাজতন্ত্রের মত ব্যবস্থাই চাই, কিন্তু অহিংস সাধনার দ্বারা তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই। আর সমাজে বিপ্লবসাধন সকল মানুষ করে না, যাহারা সত্যাগ্রহী, তাহারা করে এবং তাহারা সংখ্যায় অল্প। অবশিষ্ট কোটি কোটি মানুষকে গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া সক্রিয় হইয়া উঠিতে হইবে।' গান্ধীজীর গঠনকর্মের অন্তরের কথা ছিল, ইহার সহায়তায় তিনি মানুষকে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, নূতন সমাজের নমুনা রচনায় অভ্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রেণী-সংগ্রামে লিপ্ত করিয়া মানুষকে ক্রোধের আশ্রয়ে জাগানো যায় বটে, কিন্তু স্থায়ীভাবে জড়তা দূর করিতে হইলে, গড়ার কাজই সর্বোত্তম উপায়—ইহাই গান্ধীজীর স্থির বিশ্বাস ছিল।

শুধু তাহাই নহে। ছোট ছোট সমবায়-কেন্দ্র রচনার দ্বারা মানুষ নূতন তালে চলিবার অভ্যাস করিলে তাহাদের দ্বারা সত্যাগ্রহের সংগ্রামও সহজে চলিতে পারে। সত্যাগ্রহে নীতি এক, কিন্তু পরিচালন কেন্দ্রগত না হইয়া বিকেন্দ্রীকৃত হয়। অর্থনৈতিক জীবনে যে আত্মপরিচালন-ক্ষমতা গড়িয়া উঠিবে, সত্যাগ্রহে তাহারই প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হইবে। দেশব্যাপী সত্যাগ্রহের ফলে সাধারণ মানুষ যখন ধনতন্ত্রের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তখন তাহাদের পক্ষে সহযোগিতা ও সমবায়ের ইটের পরে ইট গাঁথিয়া মুক্তির নূতন সৌধরচনা করাও সম্ভবপর হইবে।

শ্রীরামচন্দ্র বানরসেনার সাহায্যে সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন, সেখানে কাঠ-বিড়ালীরও স্থান হইয়াছিল। বানরের স্বভাব ভাঙা ও নষ্ট করা, কিন্তু তাহার শক্তিও গড়ার কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হইয়াছিল। আর কাঠবিড়ালী,

শ্রীরামচন্দ্রের নেতৃত্বে নির্ভর না করিয়া শুধু তাঁহার প্রতি প্রেমের বশে মুখে বালির দানা বহিয়া সেই সেতুরচনায় স্বীয় সাধ্যমত সহযোগিতা করিয়াছিল।

আজ দেশের গভর্মেণ্ট যখন ধনীকুলকে কাবু করিতে অসমর্থ, তখন তাঁহাদের উচিত হইবে গান্ধীজীর শিক্ষানুযায়ী অর্থনীতি ও আত্মরক্ষার ক্ষমতাকে বিকীরণ করার ব্যাপারে সহায়তা করা। এই বিকীরণের জন্য কার্যকরী প্রস্তাব করা যায় যে, গভর্মেণ্টের পক্ষে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ অপেক্ষা সমবায় বিভাগের উপরেই জোর বেশি দেওয়া কর্তব্য। একটি উদাহরণ দিতেছি। হুগলী জেলায় আরামবাগ মহাকুমায় স্থানে স্থানে বন্যা হয়, এবং চাষেরও বিশেষ অসুবিধা ঘটে। প্রকাণ্ড বাঁধ বাঁধিয়া, খাল কাটিয়া নদীকে অবশ্য বাগে আনা যায়। কিন্তু যতদিন গভর্মেণ্ট সে কার্য না করিতেছেন, ততক্ষণ কি প্রজা হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিবে? অতএব স্থানীয় কর্মীগণ চেষ্টা করিয়া কিছু চাঁদা তুলিলেন, নিজেরা খাটিলেন, গ্রামবাসীদের প্রাণে উৎসাহের জোয়ার আসিল, তাহারাও খাটিল। এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় গ্রীষ্মকালে নদীতে আড়াআড়ি কাঁচা বাঁধ বাঁধা হইল। ফলে যখন পাশের জমিতে জল উছলিয়া পড়িল, তখন চাষীরা দ্রুত বোরো ধানের চাষ করিয়া যথেষ্ট লাভবান হইতে পারিয়াছিল। অথচ বর্ষার মুখেই কাঁচা বাঁধটি মাঝখানে কাটিয়া দেওয়ার ফলে নদীর গতিরোধের দরুন কোনও ক্ষতি হয় নাই। এইরূপ ছোট ছোট সমবেত চেষ্টার ফলে মানুষের মধ্যে যে প্রাণসঞ্চার হয়, তাহা ভবিষ্যতে কলকারখানার আশ্রয়ে সম্পদশালী ভারতবর্ষ গড়ার পক্ষেও অন্তরায় হইবে না।

গত এক বৎসরের স্বাধীনতার মধ্যে দেখিয়াছি যেন এই-জাতীয় বেসরকারী-প্রচেষ্টায় মন্দা পড়িয়াছে। কোথায় উৎসাহ বাড়িবে, না, কমিয়া যাইতেছে। আগে খাদিকেন্দ্রেও ইংরেজ সরকারের আঘাতের অভাব ছিল না, তাহা সত্ত্বেও খাদির কাজ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু আজ খাদি-কেন্দ্রের বৃদ্ধি না হইয়া সবাই হাত-পা গুটাইয়া ভাবিতেছে, 'আর কি? দেশকে তো খাটিয়া খুটিয়া স্বাধীন করিয়া দিলাম; এবার গভর্মেণ্ট সুব্যবস্থার দ্বারা সকল অভাব দূর করিয়া দিক'। অর্থাৎ বহু গ্রামেই দেখিতেছি, মনের জড়তা যেন বেশ জাঁকিয়া আসিতেছে। তফাৎ এইটুকু, বিদেশী শাসনের সময়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রই যেমন পরের দ্বারা পরিচালিত হইত, আজও

সেই অভ্যাসের বশে আমরা চাহিতেছি, দেশীয় বা জাতীয় গভর্মেণ্ট যেন আমাদের হাত ধরিয়া সুখের রাজ্যের দিকে লইয়া যান। অর্থাৎ মনে মনে আমরা টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্রের কামনা করিতেছি। রাষ্ট্রের অপেক্ষা না রাখিয়া মানুষ প্রাণবান সমাজ গড়িয়া তুলুক, বহু নব নব সংস্থার সহায়তায় জীবনের পরিচালনা করুক, ইহা যেন আমরা চাহিতেছি না। মনে করিতেছি, অত খাটুনি আমাদের সহিবে না; আর দরকারই বা কি?

গভর্মেণ্ট যদি বিকেন্দ্রীকরণের জন্য সত্যসত্যই চেষ্টাও করেন, অন্য বাধা ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ মানুষের মনে জড়তার এই বাধাই তাঁহাদের সম্মুখে বিপুলতম বাধা হইয়া দাঁড়াইবে। অর্থাৎ সরবরাহ বিভাগের পরিবর্তে সমবায় বিভাগের বরাদ্দ বাড়াইলেই শুধু সমস্যার সমাধান হইবে না। মানুষের সঞ্চিত জড়তাকে বিপুল ধৈর্য এবং কর্মচেষ্টা সহকারে ভাঙিতে হইবে।

তাহার এক উপায় হইল, যোগ্য লোকের মারফৎ কয়েকটি জায়গায় গান্ধীজীর আদর্শে অর্থনৈতিক সংগঠন করা। যাঁহারা গান্ধীজীর গঠনকর্মের মূলনীতি স্বীকার করেন এবং তাহাকে কার্যকরী করিবার মত ভরসা ও বুদ্ধিকৌশল ধারণ করেন, তেমন লোককে দিয়া উৎপাদন এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সাধনের প্রয়োজন। যদি সেরূপ চেষ্টা কেন্দ্রে কেন্দ্রে সফল হয়, অবশিষ্ট মানুষের মনে উৎসাহের সঞ্চার হইবে, এবং তাহারা নিজের পায়ে দাঁড়াইয়া স্বীয় আর্থিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের শক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। গভর্মেণ্ট যদি এই কেন্দ্র গড়িবার সুযোগ দেন, অর্থাৎ প্রয়োজনমত মালমসলা আনা-নেওয়ার ব্যবস্থা করেন, অল্পস্বল্প টাকা কর্জ দিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। তাহার বেশি তাঁহারা পারিবেন না, রাষ্ট্রের পক্ষে করা উচিতও হইবে না।

গান্ধীজী রাষ্ট্রকে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তিনি বলিতেন, যে রাষ্ট্র যত কম শাসন করে, সে রাষ্ট্র তত ভাল। এক বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে গভর্মেণ্ট তো বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহাদের শক্তি কতটুকু, বাধা কোথায়, এবং কাহাদিগকেই বা আশ্রয় করিয়া শোষণবিহীন সমাজ গড়া সম্ভব হইবে। তাঁহাদের উচিত, গঠনকর্মের দ্বারা দেশের জড়তা-বর্দ্ধনকে শিথিল করা। যে সকল কর্মী সেই কর্মচেষ্টার দ্বারা মানুষকে সত্যাগ্রহের বলে বলীয়ান করিবার তপস্যায় রত থাকিবেন, গভর্মেণ্ট জানেন, তাঁহারাই

দেশের ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি। তাঁহাদের সাধনার ফলে ধনতন্ত্রীদের শক্তি এক সময়ে খর্ব হইবে, নূতন সমাজরচনার পথে বৃহৎ বাধা বিদূরিত হইবে। গভর্মেণ্ট আজ যে ধনীকুলকে বাগে আনিতে পারিতেছেন না, তাহারা যাহাতে আরও শক্তিশালী হইয়া উঠিতে না পারে, তাহার যথাযোগ্য আয়োজন করুন। যাহারা শক্তি বিকীরণের সাধনা করিতেছেন, তাঁহাদের কর্মচেষ্টাকে পোষণ করিয়া গভর্মেণ্ট প্রমাণ করুন যে, তাঁহারা গান্ধীজীর প্রদর্শিত উপায়ে শোষণ-বিহীন প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাজ রচনা করিতে চান।

আর জনসাধারণও যে সত্যসত্যই মুক্তির আলোয় উজ্জ্বল মনুষ্যসমাজ গড়িতে চান, কাঠবিড়ালীর মত নিজের শক্তি অতি অকিঞ্চিৎকর মনে হইলেও দেশের প্রতি প্রকৃত প্রেমের বশে সেই শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা বালির দানা বহিয়া আজিকার বিদ্বেষবিচ্ছিন্ন সংসারে মৈত্রী ও সাম্যের নব সেতুবন্ধনের যজ্ঞে যোগদান করুন; তবেই তাঁহাদের সমালোচনা এবং বর্তমান শাসনের বিরুদ্ধে অতৃপ্তি গঠনের পথে সার্থকতা লাভ করিবে।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

সংবাদ-সাহিত্য

গান্ধীজী গত বৎসর আগস্ট মাসে যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখন ২৩ তারিখে আলিপুরে উড্‌ল্যাণ্ড্‌স্‌ ময়দানে প্রার্থনার পরে এক বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতায় তিনি আল্লা-হো-আকবর এবং বন্দেমাতরম্‌ সম্পর্কে স্বীয় অভিমত জ্ঞাপন করেন। তাঁহার বক্তৃতার পরে যখন বাংলা অনুবাদ চলিত, সে সময়ে তিনি তাঁহার নিজস্ব কর্মীদের কাজ লাঘব করিবার জন্য স্বয়ং রিপোর্টারের জবানিতে বক্তৃতার সারমর্ম লিখিয়া দিতেন। গত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেই লেখা খাতা হইতে বন্দেমাতরম্‌ সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্যটুকু তাঁহারই নিজের লিপিতে প্রকাশ করা হইল।—

He then came
to Bande Mataram.
This was no religious
cry. It was purely
political cry. The
congress had to examine
it. A reference
was made Gurudev
about it. And when
both Hindu & Muslim
members of
the congress had
had to come to the
conclusion that

its opening lines
were free from
any possible objection.
And he was pleased that
they should be sung
together by all on
due occasion. It
should never bring
a chance to insult
or offend Muslims.
It was to be remembered
it was the cry that
had fired political
Bengal. Many
Bengalis had given
up their lives
for political freedom
with that cry on

their lips — ~~Fo~~ Though
therefore he felt
strongly about
~~The~~ Bande Mataram
as an ode to mother
India, he advised
his League friends
to refer the matter
to the League High
Command. We would
be surprised if in
view of the growing
friendliness between
~~the in~~ Hindus
& Muslims the League
High Command ob-
jected to the proscribed

Mataram
the song
and national cry
of Bengal which
sustained her
when the rest of
India was almost
asleep & which was
so far as I am aware
was acclaimed by
both the Hindus &
Muslims of Bengal.

[He then came to Bande Mataram. This was no religious cry. It was a purely political cry. The Congress had to examine it. A reference was made to Gurudev about it. And both Hindu and Muslim members of the Congress Working Committee had to come to the conclusion that its opening lines were free from any possible objection. And he pleaded that they should be sung together by all on due occasion. It should never be a chant to insult or offend Muslims. It was to be remembered it was the cry that had fired political Bengal Many Bengalis had given up their lives for political freedom with that cry on their lips. Though therefore he felt strongly about Bande Mataram as an ode to Mother India, he advised his League friends to refer the matter to the League High Command. He would be surprised if in view of the growing friendliness between Hindus and Muslims the League High Command objected to the prescribed lines of Bande Mataram, the national song and national cry of Bengal which sustained her when the rest of India was almost asleep and which was so far as I am (he was) aware acclaimed by both the Hindus and Muslims of Bengal.]

বৃদ্ধ হিন্দু রাজনারায়ণ বসুর "আশা" পুনর্মুদ্রণ ও প্রচারের প্রধান কারণ, আজ আমরা মর্মান্তিক ভাবে অনুভব করিতেছি যে, সমস্ত ভারতবর্ষের যাবতীয় হিন্দুরা ধর্মত এক এবং অভিন্ন হইয়া রাজনৈতিক ভিত্তির উপর ভারতবর্ষের মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি অন্য সকল ধর্মাবলম্বীর সৌহার্দ্যবন্ধনে বদ্ধ না হইলে প্রতিবেশী বিরুদ্ধ শক্তির হাতে আমাদের পরাজয় ও বিলুপ্তি অনিবার্য। আমাদিগকে দুর্বল দেখিয়া ভারতবর্ষেরই এক রাষ্ট্রনৈতিক অঞ্চল ভারতবর্ষের বুকের উপর বসিয়া দাড়ি উপড়াইতেছে। এই সকল দুর্গতি নিবারণের জন্য বৃদ্ধ রাজনারায়ণের মহাহিন্দু-সমিতির মত একটা কিছু অবিলম্বে গড়িয়া তুলিতে হইবে। যুগের প্রয়োজনে শর্তগুলির পরিবর্তন করিতে হইলেও বৃদ্ধ হিন্দুর মোদ্দা কথাটি আমরা যেমন করিয়া পারি অনুসরণ করিব। সেটি হইতেছে—

যতই লইব ততই বাঁচিব, আর যতই ছাঁটিব ততই মরিব।

* * *

এই প্রস্তাবে প্রকাশিত দুইটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। প্রথম—এই প্রস্তাব হইতে প্রমাণ হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম্" গীত রচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা জাতীয়-সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যে ইহা জাতীয়-সঙ্গীতরূপে গীত হইত, তাহার প্রমাণ এই প্রস্তাবে আছে। আমরা এতদিন পর্যন্ত শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, "বন্দে মাতরম্" ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জাতীয়-সঙ্গীতরূপে গীত হয়।

দ্বিতীয়—সমস্ত ভারতবর্ষকে একসূত্রে গাঁথিবার পক্ষে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের ভিন্নভাষাভাষী লোকেদের হিন্দী শিক্ষা ও প্রয়োগের কথা "বৃদ্ধ হিন্দু" কল্পনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও হিন্দীকে সর্বভারতীয় ভাষারূপে সমর্থন করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষার সাহিত্য ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠ হইলেও, যে কারণেই হউক, হিন্দী সর্বভারতীয় ভাষারূপে পরিগণিত হইয়া বসিয়াছে। ইংরেজীর বদলে হিন্দী আমাদের শিখিতেই হইবে—অবশ্য যদি আমরা ভারতবর্ষকে এক করিবার আশা করি। দেখিতে পাইতেছি, সত্তর বৎসর পূর্বে রাজনারায়ণ হিন্দীকে অর্থাৎ হিন্দীর দাবিকে স্বীকার করিয়াছেন।

এই প্রস্তাবে অন্যান্য বহু বিষয় লক্ষ্য করিবার ও অনুধাবন করিবার আছে। চিন্তাশীল পাঠকেরা তাহা নিশ্চয়ই করিবেন।

দৈনিক সংবাদ-পত্রে, সাময়িক-পত্রে এবং লোকের মুখে মুখে বিক্ষোভ-প্রসূত গভীর আর্তনাদের সঙ্গে একই প্রশ্ন শুনিয়েছি—গত পনেরোই আগস্ট হইতে চোদ্দই আগস্ট (আজ ১৪ আগস্ট) পুরা এক বৎসরে স্বাধীনতার নামে আমরা কি লাভ করিলাম? আমাদের দুঃখ বিন্দুমাত্র মোচন না হইয়া সকল দিকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে। কর্ণধার বদল হয়তো হইয়াছে, কিন্তু আমাদের কর্ণের উপর অত্যাচারের মাত্রা তো বিন্দুমাত্র কমে নাই। স্বাধীনতা পাইয়া আমাদের হইল কি!

ঠিক। কিছুই হয় নাই বটে, কিন্তু হইবে যে সে বিশ্বাস আমাদের আছে। কারণ, আমরা ইতিহাসে বিশ্বাস করি। এইচ. জি. ওয়েল্‌সের বিখ্যাত 'পৃথিবীর ইতিহাসের বহিঃরেখা' পুস্তকে একটি সদ্যযুদ্ধমুক্ত দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে—

"রণাঙ্গন-প্রত্যাবৃত্ত বিজয়ী বীরেরা এমনই ক্ষমতামদমত্ত ও ব্যসনাসক্ত হইয়া উঠিল যে, তাহারা আত্মপর ভেদ ভুলিয়া গেল, তাহাদের বীভৎস অভ্যাস তাহাদিগকে স্বজন ও স্বদেশের প্রতিও নির্মম করিয়া তুলিল। তাহারা নির্বিচারে অত্যাচার, লুণ্ঠন, নরহত্যা ও বলাৎকারে প্রবৃত্ত হইল, আত্মসুখপরায়ণ হইয়া পরস্বাপহরণ তাহাদের ধর্ম হইয়া উঠিল, দেশের শাসনভার নিতান্ত গায়ের জোরে তাহারা নিজেরাই গ্রহণ করিল। অরাজকতায় দেশ ছাইয়া গেল। পরে স্বভাবতই তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইল। এই আত্মঘাতী সংগ্রামের ফলে দেশের সমূহ সর্বনাশ ঘটিল। কিন্তু কালক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া ইহারাই দেশের কল্যাণ-অকল্যাণ যখন বিচার করিতে সক্ষম হইল, তখনই দেশ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিল।"

আমাদের পুরাণেতিহাসেও এই নজির আছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধজয়ের পর যদুবংশীয়েরা স্বদেশে ফিরিয়া যে মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বলে তাহারা বলী ছিল তাঁহাকেই অস্বীকার ও অপমান করিয়া পারস্পরিক কলহে যে কি ভাবে বিনষ্ট হইয়াছিল, সে কাহিনী আমরা সকলেই জানি। আমাদের দেশে বর্তমানে সেই ইতিহাসের পুনরাবর্তন ঘটিতেছে মাত্র, নূতন কিছুই ঘটে নাই। যাঁহারা দীর্ঘকাল ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিয়া ব্রিটিশ শত্রুকে পরাস্ত করিয়া বিজয়ী হইয়াছেন, তাঁহারা যদি এই মৌকায় নিজের নিজের কোলে ঝোল টানিয়া অপরের অসুবিধা ঘটাইতে থাকেন, তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। তবু

তো খুন-জখম-রাহাজানি-বলাৎকার পর্যন্ত ইহারা অবতরণ করেন নাই। আপাতত চুটাইয়া বিজয়-গৌরব ভোগ করিতেছেন মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন দলে স্বার্থের সংঘাতও আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আর ভয় নাই। আমাদের সত্যকার মুক্তির দিন সমাগত। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির এই বাৎসরিক সমাবর্তন-দিবসে এই মহা-আশ্বাসের সংবাদই আসল সংবাদ। তাঁহারা মদমত্ততায় মাতৃবন্দনা ভুলিয়া জনগণের মনস্তুষ্টির নামে আত্মোদরপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের বদহজম দেখা দিয়াছে। রোগ প্রকাশ পাইয়াছে, এইবার উপশমও হইবে। তাঁহারা রোগমুক্ত হইলে আমরা অচিরাৎ স্বাধীন হইব।

গত বৈশাখের 'শনিবারের চিঠি'তে রাজকৃষ্ণ রায় সম্বন্ধে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন:—"বাংলা নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিরাট্ সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া রাজকৃষ্ণ রায়ই সর্বপ্রথমে এই ছন্দে 'হরধনুর্ভঙ্গ' নামে পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনা করেন।" মনে রাখা দরকার, রাজকৃষ্ণের 'হরধনুর্ভঙ্গ' ও গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ' উভয় নাটকই ভাঙা অমিত্রাক্ষর বা আভিনয়িক গৈরিশী ছন্দে রচিত হইয়া একই বৎসরে—১২৮৮ সালে প্রকাশিত ও অল্প দিনের ব্যবধানে সাধারণ-রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় গত আষাঢ় মাসের 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত "ভাঙা অমিত্রাক্ষরের স্রষ্টা কে?" প্রবন্ধে কিন্তু লিখিয়াছেন:—"গৈরিশী ছন্দ মোটেই গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট নয়, তাঁর আগেই বাংলার তিন জন প্রতিভাধর অমর সাহিত্যিক ঐ ছন্দ নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে গিয়েছেন।" ইহারা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রাজকৃষ্ণ রায়। ব্রজেন্দ্রবাবু "বাংলা নাটকে" ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের কথাই বলিয়াছেন; কালীপ্রসন্ন তাঁহার কোন নাটকে এই ছন্দ ব্যবহার করেন নাই। বাকি রহিলেন—মধুসূদন ও রাজকৃষ্ণ। হেমেন্দ্রবাবুর মতে মধুসূদনই সর্বপ্রথম 'পদ্মাবতী নাটকে' মাঝে মাঝে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন; দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি 'পদ্মাবতী নাটক' হইতে চারিটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মধুসূদন তাঁহার গ্রন্থে চৌদ্দ অক্ষরের অমিত্রাক্ষরই লিখিয়াছেন, হেমেন্দ্রবাবু নিজে তাহাকে ভাঙিয়া ভাঙা অমিত্রাক্ষর করিয়াছেন। তাহাতেই গোল বাধিয়াছে।

হেমেন্দ্রবাবু প্রবন্ধটি লিখিবার সময় রাজকৃষ্ণ রায়ের 'হরধনুর্ভঙ্গ' নাটকখানি একবার দেখিয়া লইলে বোধ হয় লিখিতেন না যে, "গিরিশচন্দ্র স্বীকার করেছেন

যে, কালীপ্রসন্ন সিংহই তাঁর পথপ্রদর্শক। কিন্তু রাজকৃষ্ণের সামনে কোন্ আদর্শ ছিল, আজ আর তা জানবার উপায় নেই। আমরা তাঁহার অবগতির জন্য হরধনুর্ভঙ্গ নাটকের ভূমিকায় রাজকৃষ্ণ কি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অংশত উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমিতে [বেঙ্গল থিয়েটারে] উক্ত কবির মেঘনাদবধ কাব্যখানি নাটকাকারে সজ্জিত হইয়া, সর্ব্বপ্রথমে অভিনীত হয়। তাহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কোন স্থলেই বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের কথাবার্ত্তায় কোন নাটক অভিনীত হয় নাই। সেই প্রথম অভিনয়ের সময় আমরা অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের মুখে উক্ত ছন্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগাদি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা আজিও মনে জাগিয়া রহিয়াছে। সেই উচ্চারণ ও প্রয়োগাদিকে আমরা মেঘনাদবধ কাব্যের নূতন ও সুন্দর অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করি। অভিনয়কারিদিগের অভিনয়কালে মেঘনাদবধের চতুর্দ্দশাক্ষরাত্মক অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ, অঙ্গভঙ্গি ও বাগ্‌ভঙ্গির অনুগত হইয়া, আমাদের কর্ণে কেমন আর একতর নূতন ছন্দের ছাঁচ গড়িয়া দিয়াছিল। তখন বোধ হইয়াছিল, যেন মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে আর এক প্রকার অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রসূত হইতেছে। সেই আভিনয়িক ছন্দের পক্ষপাতী হইয়া, আমি এক সময়ে বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ও অসাধারণ-নট-চূড়ামণি ৺বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে, ঐরূপ ছন্দের নাটক সৃষ্টি করিয়া অভিনয় করিতে অনুরোধ করি, তাহাতে তিনি বলেন যে, 'এখন মাইকেলের অমিত্রাক্ষরই চলুক ; ক্রমে ক্রমে পাকিয়া কিছু কাল পরে রঙ্গ-ভূমির অভিনেতারা এই মাইকেলী ছন্দ হইতে আভিনয়িক ছন্দের মৌখিক কবি হইয়া অভিনয় করিতে পারিবেন।'...শরচ্চন্দ্র বাবুর সেই কথা আমার মনে জাগিয়া ছিল।..."

—

ভ্রম সংশোধন—এই সংখ্যায় ২৯৬ পৃষ্ঠার ৩য় পংক্তির "মুহুর্মুহু" স্থলে "মুহুমুহু" পড়িতে হইবে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
২০শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৫

গান্ধীচরিত

দিনচর্যা

প্রত্যহ সকালে এবং সন্ধ্যায় বেড়ানো গান্ধীজীর অভ্যাস ছিল। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে ওয়ার্ধাতে যখন তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই, তখন বিকালের ভ্রমণে দুই দিন আমরা যোগ দিয়াছিলাম। তখন লক্ষ্য করিয়াছিলাম, তিনি পায়ে চামড়ার চপ্পল পরিয়াও খুব দ্রুত হাঁটিতে পারেন, এবং এক মাইল যাওয়া ও এক মাইল ফিরিয়া আসা তাঁহার নিয়ম। কিন্তু ১৯৪৮ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীরামপুরে থাকার সময়ে তিনি আধ মাইল যাতায়াত অর্থাৎ এক মাইলের মত প্রাতর্ভ্রমণ করিতেন। প্রায় এক মাস পরে যখন তাঁহার শরীরের দুবলতা কাটিয়া গেল, তখন তিনি ভ্রমণের পরিমাণ বাড়াইলেন।

শ্রীরামপুরে আমরা যে বাড়িতে থাকিতাম, সেটি ছাড়িলেই দুই পাশে ধানের ক্ষেত, এবং তাহার মাঝে মাঝে সুপারি-নারিকেলের গাছে ঘেরা এক-একজন গৃহস্থের বাড়ি দেখা যাইত। ধানক্ষেতের আল ধরিয়া বা সরু পথে গান্ধীজী হাতে একটি পাঁচ ফুট আন্দাজ হালকা বাঁশের লাঠি লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। এই সকল পথে মাঝে মাঝে খাল বা নালা পড়িত। তাহার উপরে সুপারিগাছ পাতিয়া সাঁকো করাই নোয়াখালির রীতি। বড় হইলে বাঁশের ধরনি ও কাঠের পুল থাকিত। বেড়াইবার সময়ে শ্রীরামপুরে প্রত্যহ গান্ধীজী এমনই একটি সাঁকোর উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেন। সকালে শিশিরে মাঠ ঘাস ও সাঁকোর কাঠ সবই সিক্ত থাকিত বলিয়া তাঁহার পক্ষে পা পিছলাইয়া যাইবার আশঙ্কায় আমরা তাঁহার হাত ধরিবার চেষ্টা করিতাম। তিনি কিন্তু রোজই অপরের সাহায্য বিনা সাঁকোটি অতিক্রম করিতেন। প্রথম প্রথম দৌর্বল্যের জন্য পা ঠিকমত পড়িত না, এক-আধদিন পড়-পড় হওয়ার শেষ মুহূর্তে আমাদের কাঁধে ভর দিয়া সামলাইয়াও লইয়াছেন। বিহারের দাঙ্গা-নিবারণকল্পে তিনি যে অর্ধাশন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জনিত দুর্বলতা অবশ্য ক্রমশ কাটিয়া গেল।

গান্ধীজীর শরীর আর একটু সুস্থ হওয়ার পর তিনি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পরিভ্রমণ শুরু করেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের ব্যবস্থা অনুসারে প্রতিদিন ভোরে সমস্ত জিনিসপত্র গুছাইয়া আগামী গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকদের

মারফৎ সব পাঠাইয়া দেওয়া হইত, এবং তাহার পরে সকাল ৭॥০ টার সময়ে গান্ধীজী যাত্রা আরম্ভ করিতেন। অর্থাৎ তাঁহার প্রাতর্ভ্রমণের পরিবর্তে এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে যাত্রার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সতীশবাবু এমন ভাবেই সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যাহার ফলে দুই বা তিন মাইলের অধিক গান্ধীজীকে হাঁটিতে হইত না, আমরা নূতন ডেরায় আসিয়া পৌছাইতাম।

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ সালে আমরা হামচাদি নামে একটি গ্রাম ছাড়িয়া কাফিলাতলির অভিমুখে রওনা হইয়াছি। তখন শীতের শেষ, মাঠে ফসল নাই, ধানের ক্ষেতের ভিতর দিয়া আমাদের পথ কিছুদূর গিয়াছে। একটি ক্ষেত হইতে অপর একটি ক্ষেতে নামিবার সময়ে আল হইতে আমি লাফাইয়া পড়িলাম। গান্ধীজীর অসুবিধা হইবে মনে করিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, এবং তিনি আসিলে সেইখানে নামাইবার জন্য তাঁহার দিকে হাত বাড়াইলাম। কিন্তু গান্ধীজী সাহায্য না লইয়া, নিজের লাঠির সহায়তায় বেশ সহজভাবে আসিলেন ও হাসিয়া বলিলেন, এ কি শ্রীরামপুর পাইয়াছ? এখন বেশ জোর আসিয়া গিয়াছে। শরীরের দুর্বলতা স্বীকার করিতে গান্ধীজীর যেন লজ্জা বা বিরক্তি আসিত। শরীরের ক্ষমতা না থাকিলে অপরের সাহায্য সহজভাবে গ্রহণ করিতেন, কিন্তু শরীর যতক্ষণ চলে ততক্ষণ তাহাকে ছুটি দিতে চাহিতেন না।

১৯৩৮ সালে ২৪এ অথবা ২৫এ ফেব্রুয়ারি হইবে, পুরী জেলায় গান্ধী-সেবা-সংঘের এক অধিবেশন হয়। গান্ধীজীর জন্য একটি উঁচু মঞ্চ তৈয়ারি করা হইয়াছিল, তিনি জনসভায় তাহার উপর হইতে বক্তৃতা করেন। মঞ্চটিতে উঠিবার জন্য বাঁশের সিঁড়ি ছিল। আমার মনে আছে, গান্ধীজী যখন সেই সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবার আয়োজন করিতেছেন, তখন পার্শ্ববর্তী কেহ তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়াইয়া দেন। গান্ধীজী যে ভাবে ঝটকা দিয়া সেই হাত সরাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া আমার তখন মনে হইয়াছিল, শারীরিক দুর্বলতার ইঙ্গিত করিলেই তিনি যেন বিরক্ত হইয়া উঠিতেন।

সে কথা যাক্। এবার তাঁহার বেড়াইবার সম্বন্ধেই গল্প বলি। শ্রীরামপুর গ্রামে শীত খুব বেশি না হইলেও নোয়াখালির সেঁত-সেঁতে আবহাওয়ায় কেমন যেন ভাল লাগিত না। আমরা গায়ে গরম একটি আলোয়ান লইয়া বাহির হইতাম। গান্ধীজী ঘরের মধ্যে আলোয়ান ব্যবহার করিলেও প্রাতর্ভ্রমণের সময়ে পাতলা একখানি খাদির চাদর মুড়িয়াই বাহির হইতেন। সূর্যের তাপ

এবং আলোর প্রতি তাঁহার বড় টান ছিল, সকালের আলো পরিপূর্ণ ধারায় গায়ের উপরে ঢালিয়া পড়ুক, ইহার জন্যই তিনি খালি গায়ে চলিতেই ভাল বাসিতেন; কিন্তু ঠাণ্ডা জলো হাওয়ায় অস্বস্তি বোধ হওয়ার জন্যই যতটুকু না হইলে নয়, তেমনই একখান চাদর দিয়া দেহকে মুড়িয়া রাখিতেন।

শ্রীরামপুর গ্রামে প্রাতর্ভ্রমণের সময়ে অতি অল্পসংখ্যক সাথী তাঁহার সহিত থাকিতেন। হয়তো বা কাহারও বিশেষ প্রয়োজন থাকিলে গান্ধীজীর সঙ্গে সে সময়ে কোনও বিষয়ে আলোচনা করিতেন। কিন্তু সচরাচর তিনি এ সময়ে নীরবে চলাই ভালবাসিতেন। চলিতে চলিতে কখনও বা স্থানীয় চাষবাসের বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন, কখনও বা পথের পার্শ্ববর্তী ছোট ছেলেমেয়েরা পাঠশালার সামনে রৌদ্রে মাদুর পাতিয়া যেখানে সুর করিয়া পড়িতেছে তাহা দাঁড়াইয়া শুনিতেন, এবং আপন মনে ঈষৎ হাসিতেন। গান্ধীজীকে দেখিয়া বালকের দল পড়া বন্ধ করিলে আবার তাহাদের বলিতেন, 'পঢ়ো পঢ়ো'—পড়া বন্ধ করিও না।

শ্রীরামপুর গ্রামে গান্ধীজীর শরীরের দুর্বলতা যত কাটিয়া যাইতে লাগিল, ততই তিনি ভ্রমণের পরিমাণ এবং সময় অল্পে অল্পে বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। যে পথ ধরিয়া আমরা প্রত্যহ বাড়ি হইতে বাহির হইতাম, তাহার পাশে জনৈক মুসলমান চাষীর বাড়ি ছিল। তাঁহার নাম ইসমাইল খোন্দকার চৌধুরী। গান্ধীজী বেড়াইয়া ফিরিবার সময়ে মাঝে মাঝে এই সকল বাড়িতে প্রবেশ করিয়া কিছুক্ষণ গৃহস্থের সঙ্গে কথাবার্তা করিয়া আসিতেন এবং তত্ত্ব-তাল্লাশ করিতেন। ২রা ডিসেম্বর ১৯৪৬ সোমবার সকালে ইসমাইল মিঞার বাড়ি গিয়া তিনি আমাদের মারফৎ শুনিলেন, একটি ছোট ছেলের জ্বর হইয়াছে এবং গৃহস্বামীরও শরীর ভাল নাই, কয়েক দিন ধরিয়া পেট পরিষ্কার হইতেছে না।

চিকিৎসা করিবার সুযোগ পাইলে গান্ধীজীর বড় আনন্দ হইত। রোগীর সেবাকার্যে তিনি বস্তুত অতিশয় দক্ষ ছিলেন। সেদিন মৌন দিবস, তাই হাতে ছোট্ট একটি কাগজে লিখিয়া জানাইলেন, ইসমাইল মিঞার চিকিৎসার আয়োজন তিনি করিবেন। বেড়ানো শেষ হইলে আমরা তাঁহার নির্দেশমত ইসমাইল চৌধুরীকে এক খোরাক ম্যাগ সাল্‌ফ দিয়া আসিলাম, এবং ছোট ছেলেটিকে এনিমা দিবার জন্য আমাদের শিবিরে পাঠাইতে বলিলাম। ইসমাইল কিন্তু

রাজী হইলেন না। তাঁহার ইচ্ছা, এনিমা বাড়িতেই দেওয়া হোক, কি জানি বিপদ-আপদের কথা তো কিছু বলা যায় না। গান্ধীজী শুনিয়া জানাইলেন, বেলা দুইটার সময়ে আমরা যেন গরম জল ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখি, তিনি নিজে এনিমা দিতে আসিবেন।

কিন্তু ইহাতে আমাদের ঘোর আপত্তি ছিল। শ্রীযুক্ত পরশুরাম অথবা আমার কাজের চাপ যতই বেশি হোক না কেন, আমরা গান্ধীজীকে এইরূপ কাজের জন্য দুপুরে আধ মাইল দূরে দুর্বল শরীরে পাঠাইয়াছি, ইহা জানিতে পারিলে লোকে বলিবে কি? এই জন্য জোর করায় তিনি ছোট ছোট কাগজের টুকরায় আমাদের খুঁটিনাটি নির্দেশ লিখিয়া দিলেন। আমরা দুপুরে সেই নির্দেশমত রোগীর পরিচর্যা করিয়া আসিলাম। ছোট লেখাগুলি পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য নীচে প্রকাশ করা যাইতেছে,—

১। You understand what is meant. Mag Sulph to one patient. enema to another. When he comes here I shall give the enema.

২। In the morning, i. e. now if he has not eaten anything, I shall bring the enema here and give it. The only thing is that there shd. be clean hot water.

৩। When will the child be ready?

Then we shall come here at 2 o'clock. If he prefers it can be given tomorrow morning.

৪। This old man requires an ointment for his skin-disease. The ointment will come.

৫। The water should be no warmer than the fingers can bear.

Take ten ounces of such water and mix in it 2 teaspoonfuls of clean salt, stir well. The enema shd. be gently administered so that the water may be retained for a while. When it has acted and the water is expelled, administer an equal quantity of cold water without salt or anything else. Examine the contents of the stool each time to see whether any worm is expelled. If the 2nd. quantity is not expelled in a few minutes you may leave the patient asking the people to examine the stool and report upon the condition of the stool.

The patient shd. be given every night till further instructions ½ a dram of অজবেণ (জোয়ান) seeds properly cleaned.

Smear the nozzle with vaseline to ensure easy insertion. Boil it after to sterilise it.

আমরা শ্রীরামপুরে যে বাড়িতে থাকিতাম, তাহারই নিকটে অপর এক গৃহস্থের আশ্রয়ে কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু অবস্থান করিতেছিলেন। ইঁহারা পাঁচ-ছয় জন দুইখানি ঘরে আশ্রয় পাইয়াছিলেন বলিয়া কাজের চাপে সব সময়ে ঘরদোর, বিছানা বা টেবিলপত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত না। মাদ্রাজের 'হিন্দু'-পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী বাংলার ভিজা আবহাওয়ায় আসিয়া সর্দিজ্বরে পড়িলেন। মাথা অত্যন্ত ধরায় সারা রাত ঘুমাইতে পারেন নাই। গান্ধীজী সংবাদ শুনিবার পরে সকালে বেড়াইয়া ফিরিবার সময়ে সাংবাদিকগণের শিবিরের দিকে রওনা হইলেন। সঙ্গের বন্ধুরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া বাসি বিছানা মশারি তুলিয়া, কাগজপত্র যথাসম্ভব সুবিন্যস্ত করিয়া, মেঝেতে ছড়ানো কয়েক দিনের সঞ্চিত সিগারেটের গোড়া ঝাঁট দিয়া, ঘরের সব দরজা জানালা খুলিয়া কোন রকমে উহাকে গান্ধীজীর অভ্যর্থনার যোগ্য করিয়া তুলিলেন।

গান্ধীজী রোগীর দেহের তাপ পরীক্ষা করার পর মাথায় হাত বুলাইয়া, মাটির প্রলেপ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি নিজে প্রত্যহ দুপুরে পেটে মাটির মোটা প্রলেপ নিয়া কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিতেন বলিয়া পরশুরাম এই ব্যাপারে দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। গান্ধীজীর নির্দেশমত রোগীর কপালে প্রলেপ দেওয়া হইল, অন্য চিকিৎসারও ব্যবস্থা করা হইল। প্রলেপের ফলে মাথার যন্ত্রণার যথেষ্ট উপশম হইয়াছিল এবং রোগী নিদ্রালাভ করায় ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন।

শত কাজের মধ্যেও চিকিৎসা বা সেবার ব্যাপারে গান্ধীজীর পরম উৎসাহ ছিল, এ বিষয়ে তিনি কখনও ক্লান্তিবোধ করিতেন না। বিশেষ করিয়া প্রাকৃতিক চিকিৎসাপদ্ধতির সুযোগ পাইলে তাঁহার উৎসাহের অন্ত থাকিত না। যাঁহারা নোয়াখালিতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহারা সচরাচর অতি গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার জন্যই আসিতেন। তাঁহাদের অনেক সময়ে কুড়ি মিনিটের বেশি সময় দেওয়া যাইত না। সেরূপ অবস্থার মধ্যে প্রাকৃতিক চিকিৎসার দ্বারা নিজের একটি পুরাতন রোগের বিষয়ে উপদেশ লইতে আসিয়া একজন ভদ্রলোক আধ ঘণ্টারও বেশি সময় গান্ধীজীর কাছে পাইয়াছিলেন। অবশেষে তাগাদা দিয়া আমাদেরই জানাইতে হইল যে, অপরে অপেক্ষা করিয়া আছেন, অতএব বর্তমান রোগীকে উপস্থিত ছুটি দিতে হইবে।

২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭, আমরা রাত্রে সাতঘরিয়া নামক একটি গ্রামে রাত্রিযাপন করি। যে গৃহস্থের বাড়িতে আমরা ছিলাম, সে পরিবারের মধ্যে অনৈক উন্মাদ রোগী ছিলেন। তিনি একান্তে একটি ঘরে থাকিতেন এবং মধ্যে মধ্যে শব্দ করিতেন। গান্ধীজী ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। পরদিন ৩রা তারিখে আমরা সাতঘরিয়া হইতে সাধুরখিল যাইবার পূর্বে সোমবার মৌনদিবসে তিনি একটি ছোট্ট কাগজের টুকরায় কিছু লিখিয়া আমার হাতে দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম, তিনি লিখিতেছেন—

There is a lunatic here. Manu prescribed the right medicine. It is Ramnam. If a believer repeats it before him rhythmically long enough, he will surely get out of his insanity. Please tell the inmates this much. More from me later.

সকালের ভ্রমণ শেষ হইত। গান্ধীজী ফিরিয়া আসিয়া ঘরের বাহিরে চামড়ার স্যাণ্ডাল ছাড়িয়া খড়ম পরিতেন। বাড়িতে চলাফেরার জন্য তিনি সর্বদা খড়মই ব্যবহার করিতেন। বাহিরে যাইতে হইলে চামড়ার জুতা পরিয়া চলিতেন। সকালে ভিজা মাটিতে চলার ফলে জুতার তলায় কাদা ও ঘাসের চাবড়া জমিয়া থাকিত। আমরা একটি বাঁখারির টুকরা দিয়া তাহা চাঁছিয়া পরিষ্কার করিতাম এবং দাওয়ায় উল্টা করিয়া তাহা রোদে শুখাইতে দিতাম। কোন কোন দিন অসাবধানতা বশত বেশিক্ষণ রৌদ্রে থাকার ফলে চটিজোড়া শুকাইয়া বাঁকিয়া যাইত, তাহাকে আবার মোচড় দিয়া সিধা করিয়া বিকালে ব্যবহারের জন্য ঘরে তুলিয়া রাখিতাম।

সকালে বেড়ানো শেষ করিয়া গান্ধীজী শৌচাগারে যাইতেন। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত তাঁহার ব্যবহারের জন্য একটি কমোডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঘরের এক পাশে কাপড় দিয়া ঘেরা একটু জায়গায় কমোড রাখা থাকিত। ভ্রমণকালে কয়েকটি শিবিরে স্বতন্ত্র স্থানে কমোড বসানো হইত, কিন্তু শ্রীরামপুরে শুইবার ঘরের মধ্যেই আড়াল করিয়া তাহার অবস্থান ছিল। শৌচাগারে সাবান, গামছা প্রভৃতি রাখিবার জন্য একটি শেল্‌ফের ব্যবস্থা ছিল। গান্ধীজী শৌচাগারে প্রবেশ করিতেন, তখন অন্তরঙ্গ কেহ কেহ সে ঘরে যাইতে ইতস্তত করিতেন না। কমোডের উপরে গান্ধীজী, আমরা সাধারণভাবে যে রকম উবু হইয়া বসি, সেই ভাবে বসিতেন। পাশের তাকে গামছার পাশে বাংলা পড়ার বইও রাখিতেন, হয়তো বা কয়েক মিনিট সময় অপচয় না করিয়া কয়েক ছত্র তাহারই মধ্যে পড়িয়া লইলেন।

কমোড ইত্যাদি পরিষ্কার করার ভার সঙ্গীদের উপরে ছিল, বন্ধুবর পরশুরাম এবং পরে রামচন্দ্রন্ নামে একটি যুবক এই ভার লইয়াছিলেন। একদিন আমি একটি শিবিরে অতর্কিতে শৌচাগারে প্রবেশ করিয়া গান্ধীজীকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলাম। তিনি পরে আমাকে বলিলেন, এরূপ লজ্জা পাওয়ার আমার কোনও হেতু ছিল না। যাহা প্রকৃতিসিদ্ধ তাহাতে লজ্জা পাইবার কি আছে? গান্ধীজীর এই যুক্তি আমার মনে কোনও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কি না মনে নাই, কিন্তু একটি বিষয় আমার মনে তখন যথেষ্ট রেখাপাত করিয়াছিল। আমার মনে হইয়াছিল, গান্ধীজীর শরীর সম্বন্ধে বোধ আমাদের শরীর-বোধ হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নয় যে, তিনি নগ্নতাকে পছন্দ করিতেন, বরং শরীর সম্বন্ধে তাঁহার একটা উপেক্ষার ভাবই আমাকে বিস্মিত করিয়াছিল। কোনও অশোভন লক্ষণ তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত হইতে দেখি নাই, সকল কাজই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইত; কেবল ইহার ভিতরে দেখিতাম, তিনি আমাদের চলতি লজ্জা অথবা ঘৃণার ঊর্ধ্বে রহিয়াছেন, উপেক্ষার ভাবই তাঁহার মধ্যে প্রবল।

গান্ধীজী শৌচাগার হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন, খড়মের শব্দ শুনিয়া জানিতে পারিলেই তেল মাখাইবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইতাম। ইতিমধ্যে রান্নাঘরের পাশে একটি চালায় বড় মাটির হাঁড়ি বা টিনের কানেস্তারায় তাঁহার স্নানের জন্য গরম জল তৈয়ারি হইত।

তেল মাখার জন্য উঠানে একটু জায়গা চারিদিকে পর্দা দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইত এবং তাহার মধ্যে প্রায় কোমরের সমান উঁচু একখানি বা দুইখানি টেবিল জুড়িয়া শুইবার মত একটি উচ্চ আসন করা থাকিত। তাহার উপরে তেল মাখিবার জন্য একটি বিছানার মত পাতিয়া রাখা হইত। আসনটি বেশি উঁচু হইলে একটি জলচৌকির সাহায্যে গান্ধীজী তাহার উপর উঠিতেন, নয়তো মাটি হইতেই একেবারে তাহাতে চড়িতেন। আসনটির দিকে পিছন ফিরিয়া তাহার কানায় হাতের ভর দিয়া তিনি একটু চাপের ফলেই উঠিয়া পড়িতেন।

তেল মাখার সময়ে তাঁহার গায়ে আদৌ কোন কাপড় থাকিত না, উপরের খোলা রোদ সর্বাঙ্গে আসিয়া লাগিত। সকাল নয়টায় তেল মাখা আরম্ভ করিয়া আমরা দশটায় শেষ করিতাম।

গান্ধীজীর একদিন অন্তর দাড়ি কামানো হইত, এবং ইহার জন্য সেফ্‌টি রেজর ব্যবহার করা হইত। কামানোর জন্য আলাদা সাবান বা বুরুশ ব্যবহার না করিয়া হাত ধুইবার সাবানটি আমরা হাতে লইয়া হাতের সাহায্যে ঘষিয়া ঘষিয়া দাড়ি নরম করিতাম। এক-একটি ব্লেড যতদিন সম্ভব গান্ধীজী ব্যবহার করিতে বলিতেন। শেষের দিকে আর প্রায় যখন কামানো যায় না, তখনও কৃপণের মত তাহাকে ছাড়িতে চাহিতেন না। বলিতেন, আরও কিছুক্ষণ টান দাও, এমন তাড়াতাড়ি কিসের? এক-আধদিন কামানোর পর দেখিয়াছি, তিনি উল্‌টা ঘসিয়া দেখিতেছেন, বেশ ভাল ভাবে কামানো হইয়াছে কি না। হয় নাই, এরূপ মনে হইলে ক্ষুর দিয়া নিজেই আবার টান দিতেন। ভোঁতা ক্ষুরের টানে এক-আধদিন একটি আঁচিল হইতে দু-এক ফোঁটা রক্তপাতও ঘটিয়াছে, তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। স্নানের পরে সেখানে পরিষ্কৃত মাটির পুলটিস দিয়া দিতেন।

নূতন কলকৌশলের সম্বন্ধে গান্ধীজীর একটা সন্দেহ ছিল। ইহা লইয়া তিনি নিজে কখনও কখনও কৌতুক অনুভব করিতেন, আমরাও করিতাম। এক সময়ে জনৈক আমেরিকান বন্ধু গান্ধীজীর শিবিরে কতকগুলি উপহার সামগ্রী পাঠাইয়া দেন। তাহার মধ্যে সাবানের পরিবর্তে ব্যবহারের জন্য কিছু শেভিং ক্রীম আসিয়াছিল। একদিন অনুমতি লইয়া আমি তাহা মাখাইয়া কামাইবার চেষ্টা করিলাম। হয়তো মাখানোর পর পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘষা হয় নাই বলিয়াই হোক বা ক্ষুর সেদিন ভোঁতা ছিল বলিয়াই হোক, কামানো ভাল হইল না। কর্মশেষে গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন হইল? আমি উত্তর দিলাম, সুবিধা হইল না। কৌতুকের সুরে গান্ধীজী বলিলেন, "ওয়সা হোনা হি চাহিয়ে। কাঁহাসে হোগা?" 'হবেই তো, ভাল কামানো কোথা হইতে হইবে?'

তেল মাখানোর সময়ে গান্ধীজী প্রথমে চিৎ হইয়া শুইতেন, আমরা পেটে প্রথমে মাখাইতে আরম্ভ করিতাম। হেজেলিন স্নোর শিশিতে আধ শিশি সরিষার তেল ও বাকি অংশ পাতি লেবুর রস দিয়া খুব ঝাঁকানির সাহায্যে মিশাইয়া মিশাইয়া সারা গায়ে মাখানো হইত। পেটে যখন আমরা তেল মাখাইতাম, সে সময়ে তাঁহার হাতে কোনও বই থাকিত। শ্রীরামপুরে ওই সময়ের জন্য হিন্দী ভাষায় লিখিত প্রাকৃতিক চিকিৎসাবিধান সম্বন্ধে একখানি

বই নির্দিষ্ট ছিল। ঐ বইখানি তিনি আর অপর কোনও সময়ে পড়িতেন না। প্রত্যহ হয়তো এক পৃষ্ঠা, দুই পৃষ্ঠা বা আর কিছু পড়িতে পড়িতে কয়েক সপ্তাহের পরে তবে তাহা শেষ হইল।

পেটে তেল মাখানোর পর বুক এবং বুকের পর হাত দুইটিতে মাখাইতাম। তাহার পর পা। পায়ে মালিশ আরম্ভ হইলে গান্ধীজী চশমাটি খুলিয়া বই বন্ধ করিয়া ঘুমাইয়া লইতেন। অনেক দিন মুখে সকালের প্রখর রোদ পড়িত। পাশের বেড়ায় একটি ছাতা গুঁজিয়া আমরা মাথার উপরে ছায়া করিয়া দিতাম। এইভাবে কুড়ি মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত গান্ধীজী ঘুমাইয়া লইতেন। আমরাও অতি সন্তর্পণে আস্তে আস্তে তেল মাখাইয়া যাইতাম। অবশেষে তাঁহার ঘুম ভাঙিলে তিনি উপুড় হইয়া শুইতেন এবং আমরা পিঠে ও মাথায় ভাল করিয়া তেল মালিশ করিয়া কাজ শেষ করিতাম।

তেল মাখার পর্বে এক ঘণ্টা লাগিত। তাহার পর তিনি শৌচাগারে প্রবেশ করিয়া স্নানের জায়গায় যাইতেন। বড় টবে ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে গরম জল মিশাইয়া দেওয়া হইত। তিনি হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া যখন বলিতেন, আর দরকার নাই, তখন আমরা গরম জল ঢালা বন্ধ করিতাম।

গান্ধীজী প্রথম-মহাযুদ্ধের সময়ে বিলাতে থাকিতে প্লুরিসি রোগে ভুগিয়াছিলেন। সেই জন্য তিনি গরম জলেই স্নান করিতেন। শরীরের কাছে কাজ লইতে হইবে, অতএব তাহাকে ঠিকমত অবস্থায় রাখার জন্য তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না।

শ্রীরামপুরে স্নান তিনি নিজেই করিতেন। আমি জল ঢালিয়া দিতাম। স্নানের জন্য দুইটি ছোট গামছা লাগিত, পায়ের তলা পরিষ্কার করিবার জন্য একটি ঝামার টুকরা ছিল। আমি লক্ষ্য করিতাম, তিনি প্রত্যহ ঠিক একই ভাবে ও একই পর্যায়ক্রমে হাত পা ইত্যাদি রগড়াইয়া তেল তুলিতেছেন। স্নানের জন্য তিনি সাবান ব্যবহার করিতেন না।

স্নান শেষ হইলে শুকনা তোয়ালে দিয়া গা পরিষ্কার ভাবে মুছিয়া কাপড় পরিয়া বাহির হইতেন। অত্যন্ত পরিচ্ছন্নতা ভাল বাসিতেন বলিয়া, ঘসিয়া ঘসিয়া গায়ের তেল তুলিতে সময় যথেষ্ট লাগিত। কিন্তু এ ব্যাপারে কখনও তিনি তাড়াহুড়া করিতেন না। যে কাজটি যখন করিতেন, সে সময়ে সেই কাজটিকেই একান্ত ভাবে ভাল করিয়া করার বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ইহা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল।

গান্ধীজী ২০এ নভেম্বর ১৯৪৬ বৈকালে শ্রীরামপুর শিবিরে আগমন করেন। ২১এ এবং ২২এ তিনি নিজেই তেল মাখিয়াছিলেন, ২৩ তারিখ হইতে ১৯-১২-১৯৪৬ তারিখে মনু গান্ধী, শ্রীরামপুরে আসা পর্যন্ত আমি তেল মাখানোর কাজ করিতাম। মনু আসিলে পর তিনিই এ ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

প্রথম প্রথম তেল মাখানোর সময়ে একটি লক্ষণ দেখিয়া আমার বিস্ময় উৎপাদন হইয়াছিল। গান্ধীজীর গায়ের রঙ বেশ ফরসা ছিল। কিন্তু যাহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহা হইল তাঁহার গলার নীচে হইতে বুকের উপর অংশ অনেকখানি ব্যাপিয়া বেশ লাল রঙের ছিল। মুখে রক্ত জমিলে যেমন তাহা লাল হইয়া উঠে, তাঁহার বুকের উপরের অংশে যেন সর্বদাই সেই রকম লক্ষণ প্রকাশ পাইত।

পরমহংসদেব যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিতে যান তখন জামা খুলিয়া বুক পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এবং গায়ের উপরে সিঁদুর চড়ানো রঙ দেখিয়া নাকি বলিয়াছিলেন, ইহা যোগীপুরুষের বিশেষ লক্ষণ। গান্ধীজীর দেহে প্রথম এই লক্ষণ দেখিবামাত্র আমার পরমহংসদেবের উক্তি স্মরণ হইয়াছিল।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

ডানা

(পূর্বানুবৃত্তি)

গাছপালা দিয়ে ঢাকা ছোট তাঁবুটির মধ্যে অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে কবি আর বৈজ্ঞানিক ব'সে ছিলেন। নিমগাছের তলায় প্রকাণ্ড আয়নাটাও গাছপালা দিয়ে এমনভাবে রত্নপ্রভা রেখে দিয়েছিলেন যে, সেটাও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেমালুম খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

রুদ্ধশ্বাসে ব'সে ছিলেন বৈজ্ঞানিক দোয়েলের আগমন-অপেক্ষায়। কবি নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করছিলেন এক জোড়া শালিককে। সামনের চালাটার উপর ব'সে ঘাড় নেড়ে নেড়ে কত কথাই বলছে যে! ওর রূপ রঙ গলার স্বর কিছুই খারাপ নয়, কিন্তু প্রত্যহ দেখে দেখে এমন হয়ে গেছে যে, মনে আর কোনও চমক লাগায় না। কেমন যেন একটা অতিপরিচিত ঘরোয়া ভাব। শালিকদের মধ্যেও পুরুষ আছে নিশ্চয়, কিন্তু ওদের পুরুষ ব'লে মনেই হয় না। উৎক্রোশ

বা শিক্‌রেজাতীয় পাখিদের তো কথাই নেই, পুরুষ-দোয়েল বা নীলকণ্ঠেরও একটা পৌরুষ আছে যেন। শালিক পাখি কিন্তু অন্য রকম, অতিপরিচিতা প্রতিবেশিনী যেন। বৈজ্ঞানিক প্রায় নির্নিমেষে আয়নাটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন উপুড় হয়ে এবং কবির দিকে চেয়ে চুপিচুপি বললেন, আপনিও এমনই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন। কতক্ষণ যে থাকতে হবে ঠিক নেই।

কবি বললেন, আমার কষ্ট হচ্ছে না।

বৈজ্ঞানিক আর কোনও কথা বললেন না। গিরগিটির মত মাথা তুলে নিমগাছের পাতার আড়ালে ছোট্ট কি একটা পাখি চিকচিক ক'রে বেড়াচ্ছিল, সেইটেকে দূরবীন দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কবি অত দুরূহ প্রক্রিয়ায় লিপ্ত না হয়ে শালিকটাকেই লক্ষ্য করতে লাগলেন একাগ্রচিত্তে। মাথা নেড়ে নেড়ে ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে ফুলিয়ে কত কথাই বলছে! হঠাৎ মনে জেগে উঠল কবিতা।—

শালিকের সাথে মালিকের মিল যদিও আছে
কর্তার মতো হাবভাব তার মোটে নয়
আলিসার 'পরে গোয়ালের ধারে কিংবা গাছে
এ যাবৎ তার মিলিয়াছে যত পরিচয়
সে যেন কেবল গিন্নি।

ঘাড় নেড়ে নেড়ে ঝগড়া করে
খড়কুটো তুলে বাসা বানায়
পাড়াপড়শীর সঙ্গেতে ব'সে
সুখ-দুঃখের কথা জানায়
সুবিধা মতন পোকা মাকড়টা যা পায় খোঁটে,
সইতে পারে না আদিখ্যেতা বা ঠ্যাকার মোটে,
বেরাল নেউল সাপ দেখলেই চেঁচিয়ে ওঠে,
হয়তো বা মানে সিন্নি।
সে যেন কেবল গিন্নী।

এসেছে এইবার।

ফিসফিস ক'রে ব'লে উঠলেন বৈজ্ঞানিক। পিং শব্দ ক'রে শালিকটাও উড়ে গেল। তুড়ুক ক'রে কোথা থেকে নেমে এল একটা পুরুষ-দোয়েল। নেমেই ছোট্ট একটা ফড়িং ধ'রে এক ঝটকায় সেটাকে মেরে গলাধঃকরণ ক'রে ফেললে। তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল একটু। একটা ভাঙা ঘুঁটে প'ড়ে ছিল, সেইটেকেই ঠোকরাতে লাগল। তারপর হঠাৎ নিজের প্রতিচ্ছবিটাকে দেখতে পেলে আয়নায়। পাওয়ামাত্রই ল্যাজটা খাড়া হয়ে উঠল সোজা। চিকচিক ক'রে গলা থেকে শব্দের স্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল যেন ছুটো। তারপর ঘাড় ফুলিয়ে তুড়ুক তুড়ুক ক'রে নাচের ভঙ্গীতে এগিয়ে যেতে লাগল আয়নার দিকে। ল্যাজটা ঠিক খাড়া আছে। ক্লিক ক'রে শব্দ হ'ল। বৈজ্ঞানিক ফোটো নিলেন। দোয়েলটা তারপর তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করল, কিন্তু আয়নায় প্রতিহত হয়ে উড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। উড়ে গিয়ে বসল পাশের পেয়ারাগাছের ডালে আর সেখানে পুচ্ছ আস্ফালন ক'রে সুরের শায়ক বর্ষণ করতে লাগল সবেগে। তারপর হঠাৎ উড়ে গেল।

বৈজ্ঞানিকের চোখ থেকে আনন্দ যেন উপচে পড়ছিল।

দেখলেন?

হ্যাঁ, দেখলাম বইকি।

পাখিটার চোখ ছুটো লক্ষ্য করেছিলেন কি?

লক্ষ্য করবার ছিল নাকি কিছু?

বাঃ, ছিল বইকি! চোখের দৃষ্টিতে একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছিল। ওইটেই তো আসল। যখন ওরা প্রণয় নিবেদন করে, তখনও ওরা অমনই তুড়ুক তুড়ুক ক'রে নাচে, গানও গায়।

মানে, রাগ আর অনুরাগের চেহারা প্রায় একই রকম?—হেসে বললেন কবি।

না, তফাত আছে একটু। চোখের ভাবটা তখন বদলে যায়। অন্যরকম হয়।

অন্যরকম মানে?

মোলায়েম। অনেকটা এইরকম গোছের।

বৈজ্ঞানিক নিজের চোখ ছুটো ঢুলু ঢুলু ক'রে মোলায়েম দৃষ্টি বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কবি হেসে ফেলতেই কিন্তু লজ্জিত হয়ে পড়লেন একটু।

তারপর বললেন, দোয়েলদের স্ত্রী পুরুষ আলাদা আলাদা দেখতে। কিন্তু

যেসব পাখির স্ত্রী পুরুষ এক রকম এবং তারা যখন হাজার হাজার মাইল অতিক্রম ক'রে অন্য দেশে চ'লে যায়, তখন পুরুষ-পাখিরা স্ত্রী-পাখিদের চেনে কি ক'রে? ওই ভাবভঙ্গী দেখে। ইংরেজীতে ওকে বলে 'পশ্চারিং' (posturing)। ওদের তাড়া ক'রে যাওয়া আর প্রণয় নিবেদন করার ধরনটা প্রায় একই রকমের। স্বজাতের যে কোনও পাখি দেখলেই পুরুষ-পাখিটা ওই রকম 'পশ্চার' করতে থাকে। অচেনা পাখিটা যদি চুপ ক'রে থাকে কিংবা গুটিসুটি মেরে ব'সে পড়ে, তা হ'লে বোঝা যায় যে, সেটা স্ত্রী-পাখি। কিন্তু সে যদি ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় কিংবা তেড়ে আসে, তা হ'লে বোঝা যায়, সেটা পুরুষ-পাখি। দোয়েলের বেলায় কিন্তু ঠিক এ কথা খাটে না। কারণ স্ত্রী-দোয়েল দেখতে আলাদা। আমি দেখতে চাইছি, স্ত্রী-দোয়েলকে দেখে ওরা যেমন গান গায়, যেমন ভঙ্গী করে, পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখলেও ঠিক সে রকম করে কি না! একটু আগেই যা দেখলাম— দেখুন দেখুন, দেখলেন? একটা ঘুঘু একটা হাঁড়িচাঁচার পিছনে পিছনে ছুটছে। দেখেছেন? ওই দিক দিয়ে গেল।

দেখেছি। ঘুঘুর এমন মিলিটারি ভাব কেন?

হাঁড়িচাঁচা ঘুঘুর ডিম খেয়ে ফেলে যে।

বলেন কি! পাখি পাখির ডিম খায়?

খায় বইকি। কোনও পাখিই নিরামিষাশী নয়। হাঁড়িচাঁচাগুলো কাকের নিকট-আত্মীয় কিনা, সেইজন্যে আরও বেশি আমিষভক্ত।

কি বললেন নাম?

হাঁড়িচাঁচা, টাকাচোরও বলে কেউ কেউ। ইংরেজী নাম ট্রি পাই (Tree Pie), আর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ওর—

বৈজ্ঞানিক নামে দরকার নেই। খুব শ্রুতিকটু হবে নিশ্চয়। হাঁড়িচাঁচা নামটাও শ্রুতিকটু। টাকাচোরও সুবিধের নয়। পাখিটা দেখতে কিন্তু বেশ। হিন্দি নাম নেই?

আছে। কোট্রি, মহোখা।

সেদিন যে মহোখা ব'লে একটা পাখি দেখালেন, যার বাংলা নাম 'কুকো'?

হ্যাঁ, সেটাকেও মহোখা বলে—Centropus Sinensis—

কুকো নামটাও ভাল নয়। আমি ওর নাম দিয়েছি বাদামী-কালো। হাঁড়িচাচাকেও নূতন নাম দিতে হবে একটা।

চুপ চুপ, আর একটা দোয়েল এসেছে। ওই যে।

দোয়েলটা গাছের একটা উঁচু ডালে ব'সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গান ধ'রে দিলে। বৈজ্ঞানিক উদ্ভাসিত চোখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কবিও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ নীরবে ব'সে রইলেন দুজনে। পাখিটা গেয়েই চলেছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, চমৎকার! নয়?

কবি উত্তর দিলেন কবিতায়—

"সুরের আবেগে সুরের মেঘেতে সুরলোকে নাবে সুরের শ্রাবণ
সুরের ঝর্ণা, সুরের বন্যা, সুরের ফোয়ারা, সুরের প্লাবন।"

রত্নপ্রভা এসে হাজির হলেন অপ্রত্যাশিতভাবে।

ধরা-গলায় বললেন, সবজিবাগের বাড়িতে ডানা ব'লে যে মেয়েটি থাকেন, তিনি এসেছেন।

তাই নাকি?

শশব্যস্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক উঠে পড়লেন।

কবি কেবল বললেন, ও!

তাঁর চোখের দৃষ্টি কিন্তু অবর্ণনীয় হয়ে উঠল।

*

ডানা যদিও খুব সপ্রতিভভাবে ব'সে ছিল বাইরের ঘরটাতে, মনে মনে কিন্তু তার কুণ্ঠার অন্ত ছিল না। কুণ্ঠার কারণ, অন্তরে সে ভিক্ষাপাত্র হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্তরের ভিখারিণী-ভাবটাকে সে কিছুতেই অবলুপ্ত করতে পারছিল না। আত্মসম্মান বজায় রাখবার প্রেরণাতেই এসেছিল সে, কিন্তু কামনা করছিল, আহা, যদি অন্য রকম হয়ে যায়! গম্ভীরপ্রকৃতির রত্নপ্রভা তার সামনে খাবারের থালা এবং চায়ের পেয়ালা ধ'রে দিয়ে অতিশয় সম্ভ্রমসহকারেই অভ্যর্থনার আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁর মনে হচ্ছিল, এই বিপন্না বিদুষী বিদেশিনীকে যতটা আপ্যায়িত করা উচিত, ততটা তিনি ঠিক পারছেন না। কথা তিনি বেশি বলতে পারেন না। যার-তার সামনে মোটা ধরা-গলায় কথা বলতে তাঁর লজ্জাও করে। কালো-কোলো মুখখানিতে তাই একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠেছিল তাঁর। অক্ষমতাজনিত লজ্জা, অভিজাতসুলভ

ভদ্রতা এবং স্বাভাবিক গাম্ভীর্য মিশে এমন একটা জটিল ভাব হয়েছিল, স্বল্প পরিচয়ে যার মর্মোদ্ভেদ করা শক্ত। কখনও তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করছিলেন, হাসবার চেষ্টা করছিলেন কখনও, ইতস্তত ক'রে দু-চারটি কথা ব'লে সহসা আবার এত বেশি গম্ভীর হয়ে পড়ছিলেন যে, ডানা ঠিক বুঝতে পারছিল না—ব্যক্তিটি কি রকম! রত্নপ্রভাকে দেখে ডানার প্রথম বাঙালী ব'লেই মনে হয় নি। ভেবেছিল, মাদ্রাজী কিংবা সাঁওতাল আয়া বোধ হয়, বাঙালীর পোশাক প'রে আছে। পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেল। এ রকম বলিষ্ঠগঠন বাঙালী মেয়ে দেখা যায় না বড়। ইনিই অমরেশবাবুর স্ত্রী? রত্নপ্রভাও তন্বী ডানার মার্জিত মুখশ্রীতে, বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে, সপ্রতিভ স্বল্পভাষণে এমন একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন, যা সচরাচর দেখা যায় না এবং যা তিনি ইতিপূর্বে আর দেখেন নি. ভারি ভাল লেগে গেল মেয়েটিকে। কিন্তু এই ভাল-লাগাটাকে কিছুতেই তিনি ঠিকমত প্রকাশ করতে পারছিলেন না। এই বিদুষীর সঙ্গে ঠিক কি ভাবে আলাপ করলে যে শোভন হবে, সে রকম আলাপ করবার যোগ্যতাও তাঁর যে নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যতটা সম্ভব ততটা করা উচিত—এই জাতীয় জটিল মনস্তত্ত্বের জালে জড়িয়ে প'ড়ে তাঁর আচরণ সহজ হচ্ছিল না কিছুতেই, এবং সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ছিল তাঁর চোখে মুখে। আলাপ জমছিল না কিছুতে।

ডানা স্মিতমুখে চুপ ক'রে ব'সে ছিল। বৈজ্ঞানিক ও কবির পদশব্দ বারান্দায় শোনা গেল। বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরও। কবির সঙ্গে কথা কইতে কইতে তিনি ঘরে ঢুকলেন।

পাখিদের গান নিয়ে আপনারা কবিতা লিখছেন লিখুন, কিন্তু ও নিয়ে বেশ ভাল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লেখা যায়। বিদেশী লেখকরা লিখেওছেন। টার্নবুলের Bird Music বইখানা দেখেছেন আপনি? তাতে দেখবেন, পাখির সুরের বিশ্লেষণ করেছেন উনি। পাখিরা কেন গান গায়, সেই গানের মূল উপকরণ, মানে Component Elements কি কি—

তারপর হঠাৎ ডানার দিকে চেয়ে বললেন, ও, আপনি এসেছেন। নমস্কার নমস্কার। ভারি আনন্দিত হলাম, বসুন বসুন। আমরা দুজনে দোয়েল দেখছিলাম—

কবিও সহাস্য দৃষ্টি মেলে চাইলেন ডানার দিকে। তাঁর মনে হ'ল, যদিও প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু যদি যেত বেশ হ'ত যে, দোয়েলের গান আর ওই

ভানায় রূপ আসলে এক জিনিস। একটা কান দিয়ে মর্মে পৌঁছোয়, আর একটা চোখ দিয়ে। অমরবাবুকে বললে তিনি বোধ হয় হেসেই উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু আসলে কোনও তফাত নেই সত্যি।

ভানা বললে, আপনার কাছে একটু দরকারে এসেছিলাম।

কি বলুন তো?

আমি ঠিক করেছি, কলকাতা যাব। ভানা ক্ষণকাল থেমে রইল কি যেন একটু প্রত্যাশা ক'রে। বৈজ্ঞানিক বললেন, ও, তাই নাকি? বেশ তো ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে সর্বস্বান্ত হ'লে মনে যে রকম অবস্থা হয়, কবির মনের অবস্থা সেই রকম হ'ল অনেকটা। খবরটা শুনে বিবর্ণমুখে নির্বাক হয়ে রইলেন তিনি। ভানা বললে, কলকাতায় আমার তেমন চেনাশোনা কেউ নেই তো। আপনার যদি কেউ চেনাশোনা থাকে আর তাদের নামে আপনি যদি দু-একটা চিঠি দিয়ে দেন, তা হ'লে আমার একটু সুবিধে হয়।

বেশ তো, দিয়ে দেব। কলকাতায় আপনি গিয়ে আমার বাড়িতেও উঠতে পারেন। বাড়িটা তো খালি আছে, নয়?

না। সেটা কালীবাবুরা নিয়েছেন।—গম্ভীরভাবে বললেন রত্নপ্রভা। তাঁর চোখে হাসির আভা ফুটে উঠল।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে ছিল না। আচ্ছা, আমি চিঠি দিয়ে দেব।

ভানা বললে, আর একটা কথা। আমি প্রায় দু মাস হ'ল আপনার বাড়িতে আছি। তার ভাড়াটা কত?—চুকিয়ে দিয়ে যেতে চাই।

বাড়ি তো আমরা ভাড়া দিই নি।—ধরা-গলায় রত্নপ্রভাই আবার বললেন, আপনাকে থাকতে দিয়েছিলাম।

ভানা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। তারপর সামলে নিয়ে বললে, আবার অত খরচ ক'রে সারাচ্ছেন—

আপনি না থাকলেও সারাতে হ'ত। বাড়ি থাকলেই সারাতে হয়।

কথা কটি ব'লে রত্নপ্রভা স্বামীর দিকে চাইতে গিয়ে দেখলেন, তিনি ওধারে স'রে গিয়ে হেঁটে হয়ে শেল্‌ফে বই খুঁজছেন। রত্নপ্রভার বড় বড় চোখ দুটি মধুর রসিকতার রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল যেন কানায় কানায়। কিন্তু একটি কথা বললেন না তিনি। হাস্যদীপ্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন শুধু স্বামীর দিকে।

(৪৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

২

গ্রন্থাবলী : বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র "পত্র সূচনা"য় লিখিয়াছিলেন :—
"ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক, সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটি বাঙ্গালির সমুদ্ভাবের সম্ভাবনা নাই। যত দিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালিরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন তত দিন বাঙ্গালির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।" রামেন্দ্রসুন্দরের মনে সাহিত্য-সম্রাটের এই বাণী চিরজাগরূক ছিল। তিনি খাঁটি বাঙালী ছিলেন; মাতৃভাষাতেই তাঁহার গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা এই সকল গ্রন্থের একটি কালানুক্রমিক তালিকা দিতেছি। বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত।

১। প্রকৃতি। আশ্বিন ১৩০৩ (৭ অক্টোবর ১৮৯৬)। পৃ. ১৬৭।

"গত কয়েক বৎসরে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত মল্লিখিত প্রবন্ধের মধ্যে বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবগুলি এই পুস্তকে সংগৃহীত হইল। বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণ পাঠকের নিকট বিজ্ঞানপ্রচার বোধ হয় অসাধ্যসাধনের চেষ্টা; সিদ্ধিলাভের ভরসা করি না। প্রবন্ধগুলি নবজীবন, সাধনা, সাহিত্য, দাসী এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই কয়খানি পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। তিনটি প্রবন্ধের নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছি। প্রথম প্রস্তাবটি ব্যতীত অন্যত্র অধিক সংশোধন বা পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয় নাই। ঐ প্রথম প্রস্তাব বহুদিন পূর্ব্বে নবজীবনে সৃষ্টিতত্ত্ব নামে বাহির হইয়াছিল।"

সূচী :—সৌরজগতের উৎপত্তি, আকাশ-তরঙ্গ, পৃথিবীর বয়স, জ্ঞানের সীমানা, প্রাকৃত সৃষ্টি, প্রকৃতির মূর্ত্তি, হর্ম্মান হেলমহোলৎজ, ক্লিকোর্ডের কীট, প্রাচীন জ্যোতিষ, মৃত্যু, প্রাচীন জ্যোতিষ—দ্বিতীয় প্রস্তাব, আর্য্যজাতি, প্রলয়।

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (ফাল্গুন ১৩১৫) "হর্ম্মান হেলমহোলৎজ" প্রবন্ধটি বর্জ্জিত এবং দুইটি নূতন প্রবন্ধ—"আলোকতত্ত্ব" ও "পরমাণু" সংযোজিত হইয়াছে।

২। পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা (ফতেসিংহ জমিদারীর ইতিবৃত্ত)। ভাদ্র ১৩০৭, ইং ১৯০০।

"পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা একটি গৃহস্থবংশের ইতিবৃত্ত।...প্রকাশক পুণ্ডরীককুলের সহিত চারি পুরুষ ব্যাপিয়া অচ্ছেদ্য আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ; এই পঞ্জিকা প্রকাশ করিয়া আমি আমার একটা প্রধান কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলাম মাত্র।"

৩। জিজ্ঞাসা। ফাল্গুন ১৩১০ (১৬ মার্চ ১৯০৪)। পৃ. ৩২৮।

"বিবিধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত আমার দার্শনিক প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইল।"

দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে (১৩২১) প্রবন্ধগুলি প্রথম প্রকাশের তারিখ ধরিয়া সাজান

হইয়াছে ; "প্রকৃতি-পূজা" প্রবন্ধটি বর্জ্জিত, এবং তারকা-চিহ্নিত প্রবন্ধ চারিটি নূতন সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ; উহার সূচী এইরূপ :—সুখ না দুঃখ ?, সত্য, জগতের অস্তিত্ব, সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব, সৃষ্টি, *অতিপ্রাকৃত—প্রথম প্রস্তাব, অতিপ্রাকৃত—দ্বিতীয় প্রস্তাব, আত্মার অবিনাশিতা, কে বড় ?, মাধ্যাকর্ষণ, এক না দুই ?, অমঙ্গলের উৎপত্তি, বর্ণ-তত্ত্ব, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, *পঞ্চভূত, উত্তাপের অপচয়, ফলিত জ্যোতিষ, নিয়মের রাজত্ব, সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি, মুক্তি, *মায়া-পুরী, *বিজ্ঞানে পুতুলপূজা।

৪। বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা। চৈত্র ১৩১২, ইং ১৯০৬। পৃ. ১১।

"গত পৌষের বঙ্গদর্শন হইতে বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা পুনর্মুদ্রিত হইল।"

৫। মায়া-পুরী। ১৩১৭ সাল (১০ ফেব্রুয়ারি ১৯১১)। পৃ. ৩৯।

ইহা 'জিজ্ঞাসা'র ২য় সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

৬। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ১ আশ্বিন ১৩১৮, ইং ১৯১১। পৃ. ৭৫৪+৵০ শুদ্ধিপত্র।

"আনন্দাশ্রম হইতে প্রকাশিত মূল গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়াছি। অনুবাদে সর্ব্বতোভাবে সায়ণের ব্যাখ্যার অনুসরণের চেষ্টা করিয়াছি।" বৈদিক যজ্ঞের বিবরণ। ইহা সাহিত্য-পরিষৎ-অনুষ্ঠিত "ভারত-শাস্ত্র-পিটক" নামে বৈদিক গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ।

৭। কর্ম্ম-কথা। ১ বৈশাখ ১৩২০, ইং ১৯১৩। পৃ. ২১২।

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ—এই বাক্যকে আমি ভিত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়া প্রবন্ধগুলি দাঁড় করাইয়াছি। কর্ম্ম পরিত্যাগে মনুষ্যের ক্ষমতাও নাই এবং অধিকারও নাই, ইহাই আমার মুখ্য বক্তব্য।...প্রকৃতিপূজা নামক প্রবন্ধটি আমার জিজ্ঞাসা নামক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে দিয়াছিলাম। সেখান হইতে সরাইয়া এই গ্রন্থে স্থাপন করিলাম।"

সূচী :—মুক্তির পথ, বৈরাগ্য, জীবন ও ধর্ম্ম, স্বার্থ ও পরার্থ, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি, আচার, ধর্ম্মের প্রমাণ, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, প্রকৃতি-পূজা, ধর্ম্মের জয়, যজ্ঞ।

৮। চরিত-কথা। ৫ ভাদ্র ১৩২০ (৮ নবেম্বর ১৯১৩)। পৃ. ১০৩।

সূচী :—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, হর্ম্মান হেলমহোলৎজ (১ম সংস্করণের 'প্রকৃতি' হইতে গৃহীত), আচার্য্য মক্ষমূলর, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, রজনীকান্ত গুপ্ত (১), রজনীকান্ত গুপ্ত (২), বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৯। বিচিত্র প্রসঙ্গ। ভাদ্র ১৩২১, ইং ১৯১৪। পৃ. ২২৪।

রামেন্দ্রসুন্দর কর্ত্তৃক বিবৃত ও বিপিনবিহারী গুপ্ত কর্ত্তৃক নিজ ভাষায় লিখিত।

"দুই বৎসর ধরিয়া আমার দেহ অবসন্ন। আমার মগজের ভিতর যে কথাগুলা প্রকাশ পাইবার জন্য কিলবিল করিতেছিল, অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত সেগুলাকে বাহির করিয়া দিলেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমি ঋণী। নতুবা হয়ত উহা কোন কালেই বাহির হইত না। ...আমার বিবেচনায় বেদপন্থীর ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ misconception চলিত আছে ; এতদ্দ্বারা যদি তা'র কিছু নিরাকরণ হয়, তাহা হইলেই প্রচুর পুরস্কার হইবে। আমি বেদপন্থার ভিত্তি নিরূপণে কতকটা প্রয়াস করিয়াছি ; বৌদ্ধ ও খৃষ্টীয় পন্থার সহিত তাহার সম্পর্ক দেখাইবারও কতকটা চেষ্টা করিয়াছি।"

১০। শব্দ-কথা। ১ বৈশাখ ১৩২৪, ইং ১৯১৭। পৃ. ২৪৭।

"সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব এবং বাঙ্গলার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্পর্কে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম ;...শব্দ-কথা নাম দিয়া প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া প্রকাশ করিলাম। প্রায় সকল প্রবন্ধই সংশোধন করিয়াছি।"

সূচী :—ধ্বনি-বিচার, কারক-প্রকরণ, না, বাঙ্গলা কৃৎ ও তদ্ধিত, বাঙ্গলা ব্যাকরণ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা, শরীর-বিজ্ঞান পরিভাষা, বৈদ্যক পরিভাষা, রাসায়নিক পরিভাষা, বাঙ্গলার প্রথম রসায়ন গ্রন্থ।

[মৃত্যুর পরে প্রকাশিত]

১১। বিচিত্র জগৎ। ? (৮ আগস্ট ১৯২০)। পৃ. ৪৫৪।

"ভারতবর্ষ হইতে পুনর্মুদ্রিত"। সূচী :—বিজ্ঞান-বিস্তার বাহ্যজগৎ, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ, বাঙ্ময় জগৎ, জড়-জগৎ, বৈজ্ঞানিকের আকাশ, প্রাণময় জগৎ, প্রাণের কাহিনী, প্রজ্ঞার জয়, চঞ্চল জগৎ।

১২। যজ্ঞ-কথা। ১০ ভাদ্র ১৩২৭ (৩০ অক্টোবর ১৯২০)। পৃ. ১৮৪।

"যজ্ঞকথার প্রবন্ধগুলি প্রথমে...বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে পঠিত হইয়াছিল, এবং পরে 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল।"

সূচী :—অগ্ন্যাধান ও অগ্নিহোত্র, ইষ্টিযাগ ও পশুযাগ, সোম-যাগ, খ্রীষ্ট-যাগ, পুরুষ-যজ্ঞ।

১৩। নানাকথা। আশ্বিন ১৩৩১, ইং ১৯২৪। পৃ. ২৪৪।

সূচী :—আনি বেসান্ত, ইংরাজী শিক্ষার পরিণাম, সাহিত্য কথা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, পরাধীনতা, শিক্ষাপ্রণালী, রাষ্ট্র ও নেশন, সামাজিক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার, অরণ্যে রোদন, মহাকাব্যের লক্ষণ, আমিষ ভোজন, মাতৃমন্দির।

"এই সকল প্রবন্ধ আমাকে বহু পুরাতন ও লুপ্ত মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠা হইতে বহু অনুসন্ধানে ও পরিশ্রমে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে,...এই গ্রন্থের জন্য লেখকের নির্ব্বাচিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে বোধ হয় পুরাতন ভারতী পত্রে প্রকাশিত 'ব্রাহ্মণ কি খ্রীষ্ট ?' নামক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের আজও পর্য্যন্ত কোন সন্ধান করিতে পারি নাই।...শ্রীশীতলচন্দ্র রায়।"

১৪। জগৎ-কথা। ইং ১৯২৬। পৃ. ৩৮৯।

১৫টি প্রবন্ধের সমষ্টি। "এই পুস্তকের কিয়দংশ স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তা'র পরে রচনা শেষ করিয়া ত্রিবেদী মহাশয় ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাপা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল।"

পাঠ্য পুস্তক : রামেন্দ্রসুন্দর কয়েকখানি পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন ; সেগুলি—

Aids to Natural Philosophy. (14 Oct. 1891), pp. 123.

পদার্থবিদ্যা (সচিত্র)। (৩১ জুলাই ১৮৯৩)। পৃ. ১৩৯।
ভূগোল। চৈত্র ১৩০৪, ইং ১৮৯৮। পৃ. ১৭০।
বিজ্ঞান-পাঠ, ১ম ও ২য় মান। ১৩০৯ সাল (৩১ জুলাই ১৯০২)।
পৃ. ১৪০+৷০ ঈশানচন্দ্র ঘোষের সহযোগে লিখিত।
বিজ্ঞান-কথা।

রামেন্দ্রসুন্দর-লিখিত ভূমিকা: গুণগ্রাহী রামেন্দ্রসুন্দর কাহারও কিছু গুণের পরিচয় পাইলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই গুণের উৎসাহ দিতেন। দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন:—"তিনিই নিঃস্বার্থভাবে আমার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রাঙ্কন করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমার মহোপকার সাধন করিয়াছিলেন।" ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরস বেদান্ততত্ত্ব তাঁহারই অনুপ্রেরণায় রচিত হইয়াছিল। পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া তিনি অনেক গ্রন্থকারকে উৎসাহ দিয়াছেন। তাঁহার লিখিত ভূমিকা-সহ যে-কয়খানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার তালিকা:—

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মর্ম্ম: হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ... বৈশাখ ১৮১৯ শক (ইং ১৮৯৭)
স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী* ... ১৩১৪ সাল
ছড়া ও গল্প: ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৩১৭, কার্ত্তিক
সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস (৪র্থ সংস্করণ): রজনীকান্ত গুপ্ত ... ১৩১৮, বৈশাখ
কালের স্রোত: যোগেশচন্দ্র সিংহ ... ১৩১৮ সাল
ব্রতকথা: শ্রীকিরণবালা দাসী ... ১৩১৯ সাল
অভয়ের কথা ও ঠাকুরাণীর কথা: ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩২২ সাল
সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম, ৩য় খণ্ড ... ১৯৭৩ সংবৎ (ইং ১৯১৬)
চণ্ডীদাস-বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন': শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়-সম্পাদিত ১৩২৩ সাল (ইং ১৯১৭)

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা: প্রধানতঃ মাসিকপত্রের পৃষ্ঠায় রামেন্দ্রসুন্দরের লিখিত বিবিধ বিষয়ের অনেকগুলি রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে,—এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। এগুলির একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা দিতেছি:—

১৩০০, ভাদ্র ... 'জন্মভূমি' ... ফটোগ্রাফি
পৌষ ... 'সাহিত্য' ... বৈজ্ঞানিক সংবাদ

---

* এই দুইখানি গ্রন্থের ভূমিকা বা উপক্রমণিকা যথাক্রমে "বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর" নামে 'চরিত-কথা'য় ও "যজ্ঞ" নামে 'কর্ম্ম-কথা'য় স্থান পাইয়াছে।

১৩০১, ভাদ্র … 'সাহিত্য' … বৈজ্ঞানিক সংবাদ
১৩০২, ভাদ্র … 'মুকুল' … আমরা কি খাই ? (শিশুপাঠ্য)
আশ্বিন … ,, … মেরু-প্রদেশ ,,
ফাল্গুন … ,, … নিউটনের কীর্ত্তি ,,
১৩০৩, ১ম সংখ্যা … 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' … গৌরীমঙ্গল
১৩০৫, আশ্বিন … 'মুকুল' … গাছের আহার (শিশুপাঠ্য)
১৩০৬, ২য় সংখ্যা … 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' … কাশীরাম দাসের বংশপরিচয় ও কালনির্ণয়।
৩য় সংখ্যা … ,, … "অলঙ্কার শাস্ত্র" প্রবন্ধের আলোচনা
৪র্থ সংখ্যা … ,, … ভৌগোলিক পরিভাষা
… ,, … একখানি প্রাচীন দলিল
১৩০৭, ১ম সংখ্যা … ,, … চম্পককলিকা
৩য় সংখ্যা … ,, … ভাষাতত্ত্ব (আলোচনা)
৪র্থ সংখ্যা … ,, … "রাঙ্গামাটি বা কর্ণসুবর্ণ" প্রবন্ধের আলোচনা
১৩০৮, ১ম সংখ্যা … ,, … কাশীরাম দাস
… ,, … আর একখানি প্রাচীন দলিল
আশ্বিন … 'বঙ্গদর্শন' … অধ্যাপক বসুর নবাবিষ্কার (সচিত্র)
মাঘ-ফাল্গুন … 'প্রদীপ' … জড় ও চৈতন্য
১৩১০, ১ম সংখ্যা … 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' … ৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
চৈত্র … 'বঙ্গদর্শন' … গণেশপ্রসঙ্গ (আলোচনা)
১৩১২, বৈশাখ … ,, … রঘুবংশ ও পদ্মপুরাণ
… 'ভারতী' … বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
… 'ভাণ্ডার' (পৃ. ৩৬-৮) … "আজকালকার পল্লিক উদ্‌যোগগুলির সঙ্গে প্রাকৃত-সাধারণের যোগরক্ষার উপায় কি ?" প্রশ্নের উত্তর।
জ্যৈষ্ঠ … ,, (পৃ. ৮৫-৭) … "আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ এখনকার অপেক্ষা দুরূহতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা ভাল কি মন্দ ?" প্রশ্নের উত্তর।
… ,, (পৃ. ৯৬) … প্রশ্ন।
অগ্রহায়ণ … 'বঙ্গদর্শন' … স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩১৪, ১ম সংখ্যা … 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' … গ্রাম-দেবতা।

আশ্বিন	... 'প্রবাসী'	...	"ব্যাধি ও প্রতিকার" (আলোচনা)
১৩১৫, ১৮ মাঘ	... ২য় বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ	..	রাজসাহী সম্মিলনে বক্তৃতা
১৩১৬, চৈত্র	... 'সাহিত্য'	..	রমেশ-ভবন।
১৩১৭, বৈশাখ	... 'প্রবাসী'	..	লোকশিক্ষা।
আশ্বিন	... 'মানসী'	..	যন্ত্রবদ্ধ শিক্ষাপ্রণালী।
১৩১৮, মাঘ	... 'বঙ্গদর্শন'	...	অভিনন্দন।
১৩১৯, চৈত্র	... 'মানসী'	..	চট্টগ্রাম সাহিত্য-সম্মিলনে নিবেদন।
১৩২১, বৈশাখ	... 'মানসী' ও 'সাহিত্য'	...	সভাপতির অভিভাষণ
আশ্বিন	... 'মানসী'	...	৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩২৩, বৈশাখ	... ,,	...	স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী
	... 'ভারতী'	...	অম্লমধুর।

সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে রামেন্দ্রসুন্দরের রচনাবলী: ডক্টর শিশিরকুমার মৈত্র একটি প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। উহা উদ্ধারযোগ্য :—

"সাহিত্য-জগতেই ত্রিবেদী মহাশয়ের কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বঙ্গ-সাহিত্যে রামেন্দ্রবাবুর স্থান অতি উচ্চ, এ কথা বলিলে কিছুই বলা হয় না। কোনও কোনও বিষয়ে বঙ্গ-সাহিত্য বলিতে ত্রিবেদী মহাশয়কেই বুঝায়; ত্রিবেদী মহাশয় সে সকল বিষয়ের প্রাণ। মেটেরলিঙ্ককে বাদ দিয়া আধুনিক রোমাণ্টিক সাহিত্য যেরূপ হয়, গেরার্ড হাউপ্টমানকে ছাড়িয়া Realistic drama যেরূপ দাঁড়ায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিভাগে এবং কতক পরিমাণে ইতিহাস-বিভাগে, রামেন্দ্রবাবুকে বাদ দিলেও ঠিক সেইরূপ হয়। বাঙ্গালায় যে কত দূর উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে, ইহা রামেন্দ্রবাবু স্পষ্ট দেখাইয়া দেন। দার্শনিক গ্রন্থ, এবং উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ, বাঙ্গালাতে অবশ্য ত্রিবেদী মহাশয়ের পূর্ব্বে অনেক রচিত হইয়াছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও রামেন্দ্রবাবুর লেখার একটা বিশেষত্ব ছিল। যতই জটিল প্রশ্ন হউক না কেন, ত্রিবেদী মহাশয়ের অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তিবলে ও ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার গুণে তাহা অতি সরল বলিয়া প্রতিভাত হইত। গভীর বিষয়ের সরল ব্যাখ্যা করিতে তাঁহার মত নৈপুণ্য কাহারও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ত্রিবেদী মহাশয়কে বৈজ্ঞানিক বলা উচিত, কি দার্শনিক বলা উচিত, এ বিষয়ে অনেক তর্ক হইয়াছে। আমার মতে, এ তর্কের কোনও প্রমাণ নাই। যিনি যথার্থ দার্শনিক, তিনি বৈজ্ঞানিকও বটে। Aristotle এই জন্য দর্শনশাস্ত্রের সাধারণ সংজ্ঞা দিয়াছিলেন Metaphysics, অর্থাৎ—যাহা Physics-এর জ্ঞানলাভের পর, Physics-এর মূল তত্ত্বগুলি আলোচনা করিবার পর পাওয়া যায়। জর্ম্মান ভাষায়ও দার্শনিক চিন্তাকে Nachdenken বলে, (অর্থাৎ Denken বা বস্তু-চিন্তার পর যাহা উদিত হয়)। দার্শনিক চিন্তা সকল সময়েই Nachdenken, অর্থাৎ, এ চিন্তা অন্য সকল চিন্তার পর উদিত হয়, এ চিন্তা অন্য সকল চিন্তার বিষয়ের পুনশ্চিন্তা। সুতরাং দর্শনের আরম্ভ বিজ্ঞানের শেষে। ত্রিবেদী মহাশয়ের জীবনেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই। প্রথমে ডারউইন, ক্লিফোর্ড, হেল্মহোল্টস্ প্রভৃতি বিজ্ঞানাচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথে তিনি অগ্রসর হন। পরে অনেক দূর অগ্রসর হইবার পর চিন্তা করিতে থাকেন, 'কিরূপ পথ দিয়া এত দূর আসিলাম, আমার গন্তব্য কি, গন্তব্যে পঁহুছিতে হইলে, আমার এ পথ দিয়া আরও যাওয়া উচিত, কি এ পথ ছাড়িয়া অন্য রাস্তা দেখা কর্ত্তব্য?' 'প্রকৃতি'-শীর্ষক গ্রন্থে আমরা বিজ্ঞানের পূরা জোয়ার দেখিতে পাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে দুই জায়গায় যেন ভাঁটার টানের আভাস পাওয়া যায়। "জ্ঞানের সীমানা" ও "প্রকৃতির মূর্ত্তি"-নামক প্রবন্ধে গ্রন্থকারের যেন একটু খটকা উপস্থিত হইয়াছে, বুঝি বা বিজ্ঞান চরম সত্যে লইয়া যাইতে অক্ষম; বুঝি বা এত আড়ম্বর, এত আস্ফালন শেষে নৈরাশ্যের বিরাট্ শূন্যতায় পর্য্যবসিত হয়। এই খটকা হইতেই 'জিজ্ঞাসা'র উৎপত্তি। যদি বৈজ্ঞানিক সত্য চরম সত্য না হয়, তাহা হইলে কোথায় সত্যকে খুঁজিতে হইবে? 'জিজ্ঞাসা'র প্রথম প্রবন্ধ "সত্য"তে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। বিজ্ঞান ভূয়োদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা ভূয়োদর্শনের বাহিরে যাইতে অক্ষম। কিন্তু ভূয়োদর্শন ভূয়োদর্শনমাত্র; ভূয়ঃ শব্দের অর্থ ভূয়ঃ, চির নহে। ভূয়োদর্শন বহুকাল ব্যাপিয়া দর্শন বা সর্ব্বদেশ ব্যাপিয়া দর্শন নহে। চিরের সহিত তুলনায়, সর্ব্বের সহিত তুলনায়, ভূয়ঃও বহু নগণ্যমাত্র। উভয়ের তুলনা হয় না। মাধ্যাকর্ষণের বর্ত্তমান নিয়ম কালি ছিল, পরশু ছিল, শত বৎসর বা কোটী বৎসর আগেও ছিল, মানিলাম।

কিন্তু চিরকাল ছিল, তাহার প্রমাণ কোথায়? বিজ্ঞানের সত্য কাজে-কাজেই শাশ্বত বা চিরন্তন সত্যের কাছে লইয়া যাইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক সত্য কেবল ব্যাবহারিক সত্য, জীবনযাপনের সুবিধার জন্য গৃহীত সত্য। "বিজ্ঞানে পুতুলপূজা"-শীর্ষক প্রবন্ধ এবং রিপন কলেজে ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক জগৎ সম্বন্ধে তিনি যে সকল প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে বৈজ্ঞানিক সত্যের এইরূপ অশাশ্বততা সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। 'আমি আছি'—এ সত্য কিন্তু অন্য প্রকার সত্য। ইহা অপর কোন সত্যের উপর নির্ভর করে না। যদি কোনও সত্যকে নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য বলিতে হয়, তাহা এই সত্য। ত্রিবেদী মহাশয় তাই এক জায়গায় বলিয়াছেন—"আমার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। তর্কের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া যায়। যদি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কোন সত্য বা সিদ্ধান্ত থাকে, আমাদের অস্তিত্ব সেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য।" ত্রিবেদী মহাশয় এইরূপে দুই প্রকার সত্যের নির্দ্দেশ করেন। এক হইতেছে ব্যাবহারিক বা Pragmatic সত্য, জীবনধারণের সুবিধার জন্য মানিয়া লওয়া সত্য; আর এক হইতেছে, পারমার্থিক বা শাশ্বত সত্য, Absolute Truth।

ফলে দাঁড়াইল এই যে, 'আমি আছি' ইহাই চরম সত্য। কিন্তু এই আমি কি? আমি কখনও পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধে অভ্রভেদী শুভ্র গিরিশৃঙ্গ অবলোকন ও নিম্নে বেগবতী খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদীর কলকল নিনাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দ পাইতেছি। আবার কখনও আমি নিভৃত কক্ষে শান্ত স্তব্ধভাবে নিজের ক্রিয়াকলাপের পর্য্যালোচনা করিতেছি। এক আমি বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতে কখনও হাসিতেছি, কখনও কাঁদিতেছি, সর্ব্বদাই বিচলিত হইয়া আছি; আর এক আমি নির্ব্বিকার শান্ত স্তব্ধভাব। প্রথম 'আমি'কে জীবাত্মা বা phenomenal self এবং দ্বিতীয় 'আমি'কে পরমাত্মা বা transcendental self বলা যায়। এই দুই 'আমি' কিন্তু মূলতঃ একই। যে আমি পরমাত্মা, সে আমিও আবার জীবাত্মা; ইহা Kant-ও যেরূপ জোরের সহিত বলিয়াছিলেন, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য ঋষিরাও সেইরূপ বা ততোধিক জোরের সহিত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ত্রিবেদী মহাশয়ও ইঁহাদিগের সহিত যোগ দিয়া এই বিরাট্ সত্যকে পুনরায় ঘোষণা করেন।

আমি আপনাদিগকে এই সকল দার্শনিক technicalities লইয়া বিরক্ত করিতাম না। কিন্তু এই দুই প্রকার 'আমি'র সম্বন্ধের উপর ত্রিবেদী মহাশয়ের সমস্ত দার্শনিক মত নির্ভর করে। এক সাক্ষী চৈতন্য 'আমি' থাকিলেই তো হইত, এই দুই 'আমি'র কি প্রয়োজন? ইহার উত্তর ঋগ্বেদে আছে। 'কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি, মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ'—আমার মনে কাম উপস্থিত হইল, ইহাই জগতের সৃষ্টি-হেতু। অর্থাৎ, ইহা কামনা করিলাম—সেই কামনা হইতেই ইহার উৎপত্তি। আমি কামনা করিয়া নিজকে জগতের মধ্যে নিক্ষেপ করিলাম। এই নিক্ষেপের দরুণই আমার সহিত জগতের সুখ-দুঃখের বন্ধন, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন। এই নিক্ষেপণের আর এক নাম হইতেছে যজ্ঞ। পুরুষ নিজকে যজ্ঞীয় পশুরূপে আলম্ভন করিয়া জগৎ সৃষ্টি করে। 'তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতম্ অগ্রতঃ'; 'যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাঃ'—সেই পুরুষকেই যজ্ঞীয় পশুরূপে আলম্ভন করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন হইয়াছিল, সেই যজ্ঞ হইতেই যাবতীয় চরাচর জগতের সহিত সম্বন্ধ। এই জন্য ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন,—"এই বিশ্বব্যাপার এক মহাযজ্ঞ—বিশ্বকর্ম্মার সম্পাদিত যজ্ঞ। যজ্ঞ ত্যাগাত্মক—যাজ্ঞিকের পরিভাষায় দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগের নাম যজ্ঞ। কাজেই জীব যে জীবত্ব গ্রহণ করিয়া জগতে উপস্থিত আছেন—সংসার করিতেছেন, তাহা যখন মূলেই ত্যাগ, তখন যে যে কর্ম্ম ত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিশ্বযজ্ঞের অনুকূল।"

জগতের সহিত জীবের সামঞ্জস্য ত্যাগের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ত্যাগের সহিত ভোগের যথার্থ কোনও বিরোধ নাই। ঈশোপনিষৎ বলিয়াছেন,—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করিবে। ভোগ্য বস্তুই যখন ত্যাগের দ্বারা লভ্য, সমস্ত জগতের—এবং কাজে কাজেই সকল ভোগ্য বস্তুরই—যখন ত্যাগেতে সৃষ্টি, তখন ত্যাগের সহিত ভোগের কোনও জাতিগত পার্থক্য থাকিতে পারে না। ইহা ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার 'কর্ম্ম-কথা'র "যজ্ঞ"-শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। 'ত্যাগের সহিত ভোগের বিরোধ থাকিতে পারে না। ভোগের বিষয় এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহা জীবের আত্মত্যাগের বা আত্মপ্রসারণেরই ফল; জীব ত্যাগ স্বীকার করিয়া জীব হইয়াছে বলিয়াই এই ভোগের বিষয় সম্মুখে পাইয়াছে। অতএব ভোগ ত্যাগমূলক; ত্যাগই ভোগ।"

পৃথিবীর যাবতীয় কর্ম্মই যজ্ঞ, অর্থাৎ ত্যাগাত্মক—ইহা দেখান ও বোঝানই ত্রিবেদী মহাশয়ের 'কর্ম্ম-কথা' গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। এ কথার ঠিক মানে কি, একটু তলাইয়া দেখা উচিত। যাবতীয় কর্ম্মই ত্যাগ, অর্থাৎ, তাহা ethical, আবার কর্ম্মমাত্রই ঋত, অর্থাৎ—Cosmic process. কাজেই সমস্ত জাগতিক ব্যাপারই নৈতিক (Ethical), অথবা সমস্ত নৈতিক ব্যাপারই জাগতিক। সুতরাং Cosmic process এবং Ethical process মূলতঃ এক। "ধর্ম্মের জয়"-শীর্ষক প্রবন্ধে এই ঐক্যটি ত্রিবেদী মহাশয় পরিস্ফুট করিয়াছেন।

"যে নিয়তি সৌর জগতে গ্রহ-উপগ্রহগুলিকে আপনার নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ঘুরাইতেছে, যে নিয়তির বশে দিন-রাত্রি হয়, ভূমিকম্প ঘটে ও ঝঞ্ঝা-বায়ু বহে, অথবা যে নিয়তির বশে ম্যামথ ও ম্যাষ্টোডনের বাসভূমিতে মানুষ রেলপথ চালাইতেছে ও টেলিগ্রাফের তার খাটাইতেছে, সেই নিয়তি, এবং যে নিয়তি মানুষকে সৎ কর্ম্মে ও অসৎ কর্ম্মে প্রেরিত করে, যাহাতে সিদ্ধার্থকে গৃহত্যাগ করাইয়াছিল ও যীশুকে ক্রুসে ঝুলাইয়াছিল, এই নিয়তি, এই উভয় প্রকোষ্ঠের উভয় নিয়তির মধ্যে এক পরম ঐক্য বর্ত্তমান আছে।"

এইখানে একটু খট্‌কা বাধে। নৈতিক জীবন ও জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য তুলিয়া দিলে, নৈতিক জীবনের সারাংশই চলিয়া যায়। যাহা ঘটিতেছে, এবং যাহা ঘটা উচিত, এই দুই জিনিস এক হইলে, 'উচিত' শব্দের আর কোনও অর্থ থাকে না। ত্রিবেদী মহাশয়ের উদ্দেশ্য কিন্তু morality লোপ করা নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি প্রতিপন্ন করিতে চান যে, এই সাংসারিক বা ব্যাবহারিক জীবনে Morals-এর কোনও স্থান নাই। জগতে ধর্ম্মের জয় হয় না, নিয়তির জয় হয়। ধর্ম্মের ভিত্তি ব্যাবহারিক জগতে নহে, প্রাতিভাসিক জগতে। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা নিজের নিজের জগৎ আছে, যেখানে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, যেখানে আমরা নিজের অনুভূতি ও নিজের বিশ্বাস দ্বারা চালিত হই। ধর্ম্ম এই প্রাতিভাসিক বা intuitive রাজ্যে বিচরণ করে। ইহা সকলের সাধারণ সম্পত্তি নহে; ইহা প্রত্যেকের নিজস্ব সামগ্রী। আমার সহিত অনন্তের সম্বন্ধ, প্রতি দিনের মেশামেশি, প্রতি দিনের মাখামাখির সম্বন্ধ।

দুর্ভাগ্যক্রমে ত্রিবেদী মহাশয় প্রাতিভাসিক জগতের সত্তা পরিষ্কাররূপে নির্দ্দেশ করিবার পূর্বেই ইহধাম ত্যাগ করিলেন।...

কিন্তু তাঁহার প্রতিভা এই দুই বিভাগেই আবদ্ধ ছিল না। ইতিহাসে তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল। 'বিচিত্র প্রসঙ্গ'-নামক পুস্তক তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই পুস্তকে তিনি হিন্দুজাতির Culture-history অন্বেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ চেষ্টা নূতন। আমাদের Culture-history এ পর্য্যন্ত লেখা হয় নাই। কিরূপে যে হিন্দুর আচার-ব্যবহার কালের সহিত ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহার পরিষ্কার ছবি 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' দেখিতে পাওয়া যায়। নানা প্রসঙ্গ 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' উত্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বাক্ শব্দের ঐতিহাসিক আলোচনা ও কৃষ্ণের গোপালত্বের তাৎপর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বাক্ শব্দের আলোচনায় ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, ঋগ্বেদে বাক্‌দেবীর অর্চ্চনা ও শব্দব্রহ্মবাদ যাহা আছে তাহার সহিত গ্রীক ও খ্রীষ্টীয় Doctrine of Logos-এর মৌলিক সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই সাদৃশ্যটি রামেন্দ্রবাবু সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন, এবং তাহা হইতে এই অনুমান করিয়াছেন যে, বৈদিক শব্দ-ব্রহ্মবাদ গ্রীকরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে পাইয়াছিল,এবং পরে তাহা প্যালেষ্টাইনের খ্রীষ্টানদিগকে দেয়। এই মতের সমর্থনে ত্রিবেদী মহাশয় আর একটি বৈদিক অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা খ্রীষ্টানরা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিল। ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, বৈদিক যুগে যে পুরোডাশ-ভক্ষণের প্রচলন ছিল তাহা, এবং খ্রীষ্টানদিগের Eucharist ভক্ষণ একই জিনিস। কৃষ্ণের গোপালত্ব সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে, ইহা বৈদিক যুগে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে অনেক স্থানে বিষ্ণুকে 'গোপা' আখ্যান দেওয়া হইয়াছে। আবার এদিকে সোমক্রয়ের যে অনুষ্ঠান বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল, তাহাতে বাগ্‌দেবীকে গাভী-রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। নিরুক্ত-কার যাস্ক নৈঘণ্টুক কাণ্ডে গো-শব্দের একুশটি প্রতিশব্দ দিয়াছেন, যথা—ধেনু, শব্দ, বাণী, বাক্, ভারতী প্রভৃতি এবং ইহা দিয়া বলিতেছেন, 'এতে একবিংশতির্বাঙ্‌নামানি'। এই সকল কারণে ত্রিবেদী মহাশয় বলিতে চাহেন যে, বাক্—গো—ব্রহ্ম এবং এই জন্যই হিন্দুধর্ম্মে গাভীর এত সম্মান, এবং কৃষ্ণকে গোপাল-রূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

অনেক প্রসঙ্গ এই 'বিচিত্র প্রসঙ্গে' উত্থাপিত হইয়াছে।...যে দুইটির উপরে উল্লেখ করিয়াছি, তাহা হইতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, এ পুস্তকে কিরূপ গভীর ঐতিহাসিক আলোচনা আছে। বাস্তবিক, এরূপ পুস্তক বঙ্গভাষায় কেন, কোনও ভাষায় আছে কি না সন্দেহ। কোনও কোনও বিষয়ে Houston Stewart Chamberlain এর 'Foundations of the Nineteenth Century' নামক পুস্তকের সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। Chamberlain-এর পুস্তকে ইউরোপের Culture-history দিবার যথার্থ চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এ পুস্তকের এক মহা দোষ আছে। ইহা অত্যন্ত বেশী Dogmatic, গায়ের জোরে Chamberlain তাঁহার প্রিয় মতটি চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, জাতিই জগতের সকল উন্নতি-অবনতির মূল। ত্রিবেদী মহাশয়ের পুস্তকে কিন্তু Dogmatic ভাবের লেশমাত্র নাই।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও ত্রিবেদী মহাশয় অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন। বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্ব লিখিবার চেষ্টা ত্রিবেদী মহাশয় সর্ব্বপ্রথম করিয়াছেন। তাঁহার "ধ্বনি-বিচার" নামক প্রবন্ধে এ চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই। বাঙ্গালা শব্দের এরূপ বৈজ্ঞানিক বিচার কেহ কখনও এ পর্য্যন্ত করিতে সাহস করেন নাই। ('সাহিত্য,' শ্রাবণ ১৩২৬)

পত্রাবলী : রামেন্দ্রসুন্দরের লিখিত কয়েকখানি পত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহার দুইখানি মাত্র মুদ্রিত হইল; এগুলি পাঠে তাঁহার পাণ্ডিত্য চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যাইবে :—

জেমো, কান্দি ১লা জুলাই, ১৯১৬।

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,—আপনার পত্র পাইয়া যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদ পাইলাম। আনন্দ এই যে ঐ সকল দুরূহ প্রশ্ন আপনার চিত্তে উপস্থিত হইয়াছে—বিষাদ এই যে আপনার পত্রে একটা যেন অবসাদের ভাবের ছায়া আছে।

যে সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন তাহার উত্তর দেওয়া আমার সাধ্য নহে। মৃত্যুর সম্মুখে মানুষ চিরকাল ভীত, মরণকে জয় করিবার জন্য ইতিহাসের আরম্ভ হইতে মানবের চেষ্টা। যে চেষ্টায় মানব জাতির অগ্রণীগণ বিমুখ হইয়াছেন—সর্ব্বদেশের সুধীগণ যেখানে পরাহত হইয়া আসিয়াছেন,

আমার মত ক্ষুদ্র-ব্যক্তির নিকট সেই সেই উৎকট সমস্যার মীমাংসা পাইবেন কিরূপে? আমার নিকট যে উত্তর চাহিয়াছেন সে আমার প্রতি আপনার নিরতিশয় শ্রদ্ধার ফল।

খুব সম্ভব আপনি আমাকে কখনও দেখেন নাই। দূর হইতে কাগজ পত্রের খ্যাতিতেই আমার পরিচয় পাইয়াছেন। নিকটে আসিলে দেখিতে পাইতেন আমিও সাধারণ ক্ষুদ্র-মানবের ন্যায় অতি দুর্ব্বল ও ক্ষীণপ্রাণ জীব—আমাতেও কোনরূপ অসাধারণত্ব নাই। আপনিও যেরূপ জীবন-সমস্যার সমাধান না পাইয়া সংশয়-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতেছেন, আমার দশাও ঐরূপ। মরণের রহস্যের সম্মুখে জীবের প্রাণ ব্যাকুল—কোনো মীমাংসা পাইবার কোন উপায় বোধ করি নাই।

আপনার প্রশ্নগুলির আমি যে আলোচনা না করিয়াছি তাহা নহে। মনুষ্যমাত্রেই করে, আমিও করিয়াছি—হয়ত অনেকের চেয়ে একটু বেশী মাত্রাতেই করিয়াছি। কিন্তু উত্তরে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা একখানি ক্ষুদ্র চিঠিতে কিরূপে প্রকাশ করিব?

আমি যত দূর বুঝিয়াছি, যতক্ষণ মানুষের জীবভাব থাকিবে, তত দিন মরণের ভয় হইতে নিষ্কৃতি নাই—তত দিন religiousness-ই একমাত্র উপায়;—এই religiousness এর মোটামুটি দুইটা লক্ষণ, একটা optimistic.—তাহার চরণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা—ইহা রামপ্রসাদের ভাব,—আমি যখন মায়ের চরণ আঁকড়াইয়া আছি তখন কি ভয়—শমন বেটা কি করিবে? এইরূপ attitude কোনরূপ যুক্তিতর্ক সংশয়ের ধার ধারে না—জোর করিয়া যুক্তিতর্ক ঠেলিয়া ফেলা আবশ্যক। যে পারে সে-ই সফল হয়।

আর একটা দিক্ দৈন্যের দিক্—আমি পাপী তাপী দীন, আমার কি হইবে—হয়ত তিনি দয়া করিয়া টানিয়া লইবেন—যদি তিনি কূলে ধরিয়া উদ্ধার করেন তবেই রক্ষা। ইহাতে একটা নৈরাশ্য, Despondency আনে যে অতি উৎকট অবস্থা।

বৈষ্ণব ও Christian সাধুদের মধ্যে অনেককে এই পথে Slough of the despond-এর ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে—কেহ কেহ সম্পূর্ণ acquiescence দ্বারা শান্তিলাভ করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত খৃষ্টানদের মধ্যে

John Bunyan. আমাদের মধ্যে চরম দৃষ্টান্ত স্বয়ং চৈতন্যদেব। চৈতন্য-দেবের পক্ষে মরণের বিভীষিকা ছিল বলিলে অনুচিত হইবে—এখানে বিরহের যাতনা—প্রাণস্বরূপের সহিত বিরহ সম্ভাবনায় তিনি কেবলই হা হা করিয়া গিয়াছেন—শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শান্তি অনুভব করেন নাই। তাঁহাকে যদি ভগবান্ বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে তিনি মানুষকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য অভিনয় করিয়া গিয়াছেন,—কিন্তু যাঁহারা সাধনার পথে পথিক তাঁহাদিগকে অল্প-বিস্তর এই বিরহব্যথা ভোগ করিতে হয়।

ইহা সাধনোন্মুখ জীবের অবশ্যম্ভাবী বিধিলিপি। তাঁহারা মরণ জানেন না, বিরহ জানেন—অমরত্ব তাঁহাদিগের নিকট অর্থহীন, তাঁহারা মিলনের ইচ্ছায় ব্যাকুল।

মনে যতক্ষণ জীবভাব থাকিবে ততক্ষণ সংশয় যাতনা যাহা মরণ-ভয় হইতে উৎপন্ন তাহা থাকিবেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যতক্ষণ আপনার ব্রহ্মস্বরূপতার উপলব্ধি না ঘটে, ততক্ষণ মরণ-ভয় যাইবার নহে। আমিই ব্রহ্ম—আর কোনো ব্রহ্ম নাই—আমিই জগৎকর্ত্তা ও জগৎ-বিধাতা,—এই যে জন্ম মৃত্যু জীবন—এ সমস্তই আমার লীলাভিনয়—এইটুকু উপলব্ধি না হইলে বিরহভাব ঘুচিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ইহাও উপলব্ধির ব্যাপার—কোন চেষ্টা করিয়া তর্কদ্বারা এ উপলব্ধি ঘটিবে না।

আমার রচনার মধ্যে, 'জিজ্ঞাসা'র ও 'কর্ম্ম-কথা'র শেষ দিকে—এই কথাটি বুঝাইবার যৎকিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছি। যে চেষ্টায় স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য কৃতকার্য্য হন নাই, তাহাতে আমার মত কীট কত দূর করিবে!

যাহাই হোক আপনার মনের অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, আপনাকে দু'একখানা গ্রন্থ পড়িতে অনুরোধ করিতে পারি। যদি না পড়িয়া থাকেন, পড়িতে পারেন। বাঙ্গলায় ৺ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত 'অভয়ের কথা' গ্রন্থখানি পড়িবেন। ইংরাজিতে William James-এর *Varieties of Religious Experience* (Clifford Lectures) খানি পড়িতে পারেন। আমি religiousness-এর যে দুইটি দৃষ্টান্ত দেখাই তাহা আপনি ঐ পুস্তকে পাইবেন। এ বিষয়ে আলোচনার অন্ত নাই—আমি নিজে অবশ্য একটা সিদ্ধান্ত নিজের মনে খাড়া করিয়া তাহাই আশ্রয় করিয়া কতকটা শান্তিতে আছি। কিন্তু ক্ষুদ্র পত্রে আপনাকে তাহা কিরূপে বুঝাইব? উহা আমার জীবনব্যাপী

চেষ্টার ফল—এখন উহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি। জীবন-সমস্যার সম্বন্ধে আমি আপনাকে একটা attitude-এ বসাইয়া রাখিয়াছি—আপনাকে সহসা কিরূপে সেই attitude-এ আনিব ?

আমি কয়েক বৎসর হইতে মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্যে কাতর—সকল সময়ে চিঠি লিখিতে পারি না। আমার হস্তাক্ষর অতি অস্পষ্ট। এ জন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন।

পত্রদ্বারা এই দুরূহ বিষয়ের আলোচনা ত অসম্ভব বটেই, আমার শারীরিক অবস্থা মস্তিষ্ক-দৌর্ব্বল্যের হেতু আমি উহাতে একেবারেই পরাঙ্মুখ। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় আমার যে প্রবন্ধাবলি গত দুই বৎসর ধরিয়া বাহির হইতেছে, উহার শেষ ভাগে এই বিষয়ে কিছু আলোচনার ইচ্ছা আছে।

আপনি আমার প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন তজ্জন্য আমার নমস্কার লইবেন। ('সবুজ পত্র,' আষাঢ় ১৩২৬)

এপ্রিল ১৯১৮

পরম কল্যাণবরেষু,—একাদশী-তত্ত্ববিচার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছ। আমার মত ইংরাজীনবিশ অধ্যাপকের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছ, ইহা বিস্ময়ের বিষয়, এই বিষয়ে উত্তর দেওয়া আমার ধৃষ্টতা।

একাদশীতে বিধবাগণের নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মতে বাঙ্গালা দেশের কিয়দংশে চলিত আছে, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র এ ব্যবস্থা চলিত নাই। বাঙ্গালার বাহিরেও এই নিরম্বু উপবাস সর্ব্বত্র চলে না, ইহাই আমি জানি।

যখন ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুসমাজে ইহা প্রচলিত নাই, তখন ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে বলিয়াই বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালার বাহিরে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব নাই। তৎসত্ত্বেও অন্যত্র যখন নিরম্বু উপবাস চলে নাই, তখন শাস্ত্রের বিধিসম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। রঘুনন্দনাদি ব্যবস্থাদাতারা শাস্ত্রকার নহেন, শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থাদাতা মাত্র, শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা মাত্র।

যে কোন ব্রাহ্মণের স্বাধীনভাবে শাস্ত্রব্যাখ্যা ও শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিবার অধিকার আছে। রঘুনন্দনের সহিত অন্য ব্রাহ্মণের এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই প্রভেদ নাই। তবে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যবলে তৎকালে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি যে অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব সকলন করিয়াছিলেন তাহা

book of reference-রূপে অসামান্য। তদবধি বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিতেরা ঐ গ্রন্থখানি পঠন পাঠন করিয়াই সহজে ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী হইতেছেন। মূল ধর্ম্মশাস্ত্র গৃহ্যসূত্র এবং মনুসংহিতাদি ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ অধ্যয়ন করা কেহই আবশ্যক বোধ করেন না। কাজেই অদ্বিতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্ রঘুনন্দনের শিষ্যপরম্পরা কর্ত্তৃক বাঙ্গালাদেশে তাঁহারই মত চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরে অন্য মত চলিয়াছে। ফলে প্রকৃত তত্ত্বটি এই—

বেদগ্রাহী সমাজের সমস্ত বিধিনিষেধ শ্রুতিপ্রমাণ। শ্রুতি অর্থে বেদের ব্রাহ্মণবাক্য। বেদের ব্রাহ্মণবাক্যের সহিত বিরোধী হইলে কোন স্মৃতিই প্রামাণিক নহে। এমন কি ঋষিপ্রণীত কল্পসূত্রাদি গ্রন্থের এবং মন্বাদিপ্রণীত সংহিতা গ্রন্থের উপদেশও অগ্রাহ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অধিকাংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একাদশী-তত্ত্ববিষয়ে বেদের ব্রাহ্মণবাক্যে কিছুই পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। যে সকল বিধিনিষেধ গৃহ্যসূত্রাদি এবং মন্বাদির স্মৃতিশাস্ত্রে আছে, অথচ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে নাই, তাহা লুপ্ত বেদের অনুযায়ী বলিয়া ধরিতে হয়। গৃহস্থের দৈনন্দিন আচার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি ব্যবস্থা এই শেষোক্ত গ্রন্থমধ্যেও সমুদায় পাওয়া যায় না। তজ্জন্য পুরাণাদির আশ্রয় লইতে হয়। পুরাণ গ্রন্থগুলিকেও এই জন্য লুপ্ত বেদানুযায়ী স্মৃতি বলিয়া মান্য করা হইয়া থাকে। আধুনিক শাস্ত্রব্যাখ্যাতৃগণ যে সকল বিধিনিষেধের সমর্থন গৃহ্যসূত্রে বা মন্বাদি সংহিতায় পান নাই, তাহার জন্য পুরাণের এবং মহাভারতাদি ইতিহাসের আশ্রয় লইয়াছেন। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যকে এই জন্য বহু স্থানে পুরাণের প্রমাণ দিতে হইয়াছে। কিন্তু পুরাণ গ্রন্থগুলির প্রামাণিকতা লইয়া নানা গণ্ডগোল আছে। শঙ্করাচার্য্যের মত মনীষী মহাভারতের প্রমাণ অসঙ্কোচে আশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণের আশ্রয় লইতে সঙ্কুচিত হইয়াছেন।

প্রচলিত পুরাণ মধ্যে কোন্‌খানা খাঁটি, কোন্‌খানা জাল, কোন্‌খানায় কতটা প্রক্ষিপ্ত আছে, ইহা লইয়া পণ্ডিতসমাজে মতভেদ আছে। বৈষ্ণবেরা বৈষ্ণব-পুরাণকে প্রাধান্য দেন, শৈবেরা শৈব-পুরাণকে প্রাধান্য দেন; কাজেই পুরাণের প্রমাণ আশ্রয়ে যে সকল ব্যবস্থা, তাহাতে দেশভেদে ও কালভেদে নানা মুনির নানা মত দাঁড়াইয়াছে। কাজেই কোন ব্যবস্থাদাতা যদি রঘুনন্দনের দত্ত পৌরাণিক প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া অন্য প্রমাণ দেখান, তাহাতে বিস্মিত বা ক্ষুব্ধ হইবার হেতু নাই।

ফলে বাঙালা দেশে বিধবার নিরম্বু উপবাসের ব্যবস্থা ঘটনাচক্রে চলিয়া গিয়াছে, ইহাই আমার বিশ্বাস। কোন ব্যক্তি যদি সরলচিত্তে অন্য দেশাচার-চলিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহাতে প্রত্যবায় ঘটিবে, তাহা আমি মনে করি না। তবে মোটের উপর সংযমের পক্ষে ব্যবস্থাই সমাজরক্ষার অনুকূল।

রঘুনন্দনের মতে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত অন্য বর্ণ সংসারে নাই। ব্রাহ্মণের আচার শূদ্রেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন ভালই, না করিলে দোষ দেখি না। (শ্রীআশুতোষ বাজপেয়ী : 'রামেন্দ্রসুন্দর,' পৃ. ৩০০-৩)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজা

অসম্ভব বৃষ্টি নামল হঠাৎ।

অসময়ে। ঠিক ব্যবসা-কাজের সন্ধানে বেরুচ্ছিল রাজা, বাধা পড়ল। আর বৃষ্টি ব'লে বৃষ্টি, একেবারে মুষলধারে নামল। মোটা মোটা দড়ির মত ধারা, এক মুহূর্তে ঝাপসা ক'রে তুলল চতুর্দিক। জল পড়ার নলটা বেয়ে প্রবল বেগে জল নেমে আসছে, চারপাশে ছিটকোচ্ছে জল। দরজার পাশ থেকে স'রে আসে রাজা, কদর্য একটা ভঙ্গী ক'রে বলে, শা—লা!

রাজা কবি। রাজা পকেটমার। অর্থাৎ কবি ও পকেটমার একাধারে। একটু বিচিত্র, তবে অসম্ভব নয়। শুধু কবি নয়, কাব্য-পাঠক সে। লেখার বিষয়-বস্তুও একেবারে নব্য। আর পকেটমারই নয় কেবল, মাতালও বটে। মদের পয়সা জোটাতে পকেট কাটে, কি পকেট-কাটার টাকাটা ওড়ানোর জন্য মদ খায়, ঠিক বলা যায় না।

সব লোকেরই অতীত একটা থাকে। বিশেষ হ'লেই সেটা ইতিহাস হয়ে ওঠে। রাজা সেদিক দিয়ে দীন। অতি সাধারণ অতীত তার। ভদ্রসন্তান, বি.এ. পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দেয়। কারণ, হঠাৎ একদিন ও আবিষ্কার ক'রে বসে, পড়াটা কিছু না, অর্থোপার্জনই সব। অতএব কলেজের খাতা থেকে নামটা খারিজ ক'রে নেয়। মা-বাবা গত হয়েছিলেন আগেই। সংসারে দায় নেই কোন। বাড়ি ছিল একটা, সেটা বেচে দিয়ে কিছু নগদ পকেটে ক'রে রাজা বিশাল ধরিত্রীতে স্থান অন্বেষণে বেরুল। আপাতত কলকাতাই তার কাছে বিশাল ধরিত্রী হয়ে উঠল।

তার পরের কথাটা খুব সোজা। কবি সে, কাজেই জীবন দেখতে হবে, এবং জীবনটা হোটেলের মদের পাত্রে এবং বেশ্যার ঘরে আবদ্ধ আছে, এ তার দৃঢ় ধারণা হ'ল। যথোপযুক্ত সাঙ্গোপাঙ্গ জুটতে দেরি হ'ল না। রাজা আমাদের জীবন দেখতে লাগল। আস্তে আস্তে বিলিতী মালের বদলে দেনো মদের পার্টি হ'ল এবং বাঁচবার সহজ উপায়টাও বেরিয়ে গেল। তারপর থেকে সেই রাজা, কলেজ-জীবনের রাজা অতীত আশ্রয় করল, সরু দক্ষ হাতওয়ালা রাজার রাজত্ব শুরু হ'ল।

প্রায় পাঁচ বছরের কথা এ সমস্ত।

চন্দ্র-সূর্যের এক আকাশে ঠেলাঠেলির মত দুই রাজার এক দেহের অধিকার নিয়ে ঝগড়া মিটে গেছে বহুকাল। আছে একমাত্র ঐ কাব্য-প্রীতিটুকু, যা থেকেই ওডেন, স্পেন্সার, লয়েন্স, পাউণ্ড, এলিয়ট পড়ে আর আওড়ায়।

মোটামুটি এই হ'ল আমাদের রাজা।

সকালবেলাতেই এত ঘনঘটা ক'রে বৃষ্টি আসায় ওর সমস্ত মনটা খিঁচড়ে গেল। সাড়ে-আটটা বাজে। বড় রাস্তায় ট্রাম ধরতে হবে গিয়ে, দশটার পর অফিসের ভিড় আবার কমবে। ভেজা অবস্থায় অফিসপাড়ায় সারা দিনটা ঘোরাও অসম্ভব। আর পারা য'য় না। আবার স্বগতোক্তি করে, শালার বৃষ্টি—

নাঃ, কমবার কোন লক্ষণই নেই। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে অবিরলভাবে। রাস্তায় একহাঁটু জল জ'মে গেছে। সঙ্গীহীন গাড়িগুলো সশব্দে জলের মধ্য দিয়ে চ'লে যায়। ঢেউ ওঠে। গলির মোড়ে বড় রাস্তার ধারটায় নর্দমার নোংরা জল কাঁপতে থাকে। সামনে মল্লিকবাবুদের তেতলার কার্নিসে ভিজে কাক ব'সে ডানা ঝাপটায় আর আওয়াজ করে। তারও মনের অসুখ।

রাজা মাদুরে আধশোয়া হয়ে চোখ বোজে। কাল রাত একটা অবধি হৈ-চৈ গেছে, শরীরটা নরম। বেশ লাগছে, এমনই স্থাণুর মতন প'ড়ে থেকে বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ যদি শোনা যেত! রাজা হাই তোলে।

...রাজা ধড়মড় ক'রে উঠে বসল। কতক্ষণ কেটে গেছে? ঘড়িটার দিকে চায় ও, দশটা বেজে কয়েক মিনিট। মেজাজ ভয়ানক বিশ্রী হয়ে গেল। ভাল লাগছে না কিছু।

...বৃষ্টি ছেড়েছে। রাস্তার জল ক'মে এসেছে, লোকজন বেরিয়েছে পথে।

প্যাচ্ পেচে কান্না, চোখ দুটো জ্বালা করছে। রাজা চোখে মুখে জল দিয়ে চুল আঁচড়ায়।

কড়াটা ন'ড়ে উঠল সশব্দে। দরজা খুলে দিলে রাজা, ডাকপিওন একটা চিঠি হাতে গুঁজে দিয়ে বিদেয় নিলে।

চিঠি ?—অত্যাশ্চর্য ঘটনা! একখানা মোটা পুরু কাগজের লেফাফা, তার উপর সুন্দর মার্জিত হাতে লেখা রয়েছে ওর নাম। ব্যাপারটা কি ?

না, বেরুনো হ'ল না। ঘরে ঢুকল রাজা। ভয় ভয় করছে একটু, সাধারণত যা ঘ'টে থাকে, এ তো ঠিক তার মধ্যে পড়ে না! চিঠি ?— সত্যিই! কিন্তু ওকে কে লিখবে ?

সবল হাতে ছিঁড়ে ফেলে খামটা। নীল কাগজে সোনালী জলে ছাপানো আমন্ত্রণ-লিপি। 'বহ্নি চক্র' সংঘের বার্ষিক ঘরোয়া পুনর্মিলনী। কালকের তারিখ দেওয়া।—উল্টো পিঠে টানা-টানা হাতের লেখায় ছোট চিঠি।—

এ চিঠি পাবি কি না জানি না। পেলে নিশ্চয়ই আসবি।
খুব আশা ক'রে থাকলাম। —সুনীল

'বহ্নি-চক্র'। ওর কলেজ-জীবনের সহপাঠী আরও আটটি ছেলের সঙ্গে মিলে এই ঘরোয়া সংঘটা গ'ড়ে তুলেছিল। কত কথাই মনে পড়ে! তখনকার শত আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে আছে ওই নামটার সঙ্গে। ওরই দেওয়া নাম। বুদ্ধদেব, ওর বন্ধু বুদ্ধ, এঁকে দিয়েছিল সাইন-বোর্ডটা। সুনীলদের ঘরে ওদের সেই আড্ডা। কত অধিবেশন, উৎসব! কলকাতা থেকে গাইয়ে আর নাম-করা লেখকদের ধ'রে নিয়ে যাওয়া, টো-টো ক'রে ঘুরে চাঁদা আদায় করা দুপুরের কড়া রোদে, মাঝরাতে ঘাড়ে মই নিয়ে শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার সাঁটা।

'বহ্নি-চক্র'। নামটা সঙ্গে ক'রে আনল যেন তার গোটা কলেজ-জীবনটাকে। গৌরবময় দৃপ্ত প্রথম যৌবন, ক্রিকেট-ফীল্ড, ডিবেটিং সোসাইটি, সোশ্যাল, সাহিত্য-পরিষৎ···। গৌরী, স্নিগ্ধা, মায়া,—কি যেন তার নাম, রোল সাতষট্টি, ঠিক মনে পড়ছে না, সহপাঠিনীর দল সার বেঁধে দাঁড়াল। বুদ্ধ, সুনীল, আনন্দ, বিমল—দলের ছেলেগুলো। এ ছেলেমেয়েরা কোনদিন মরবে না, বুড়ো হবে না ওর কাছে, চিরটা কাল ওর মনে তাজা জীবন্ত থেকে যাবে। ···বহ্নি-চক্রের সাইনবোর্ডের ডগডগে লাল শিখাওয়ালা চাকাটা বোঁ-বোঁ ক'রে

ঘুরছে, মধ্যের সপ্তাশ্ব-বাহিত রথে উদয়গিরির প্রান্তসীমায় অর্দ্ধলুক্কায়িতদেহ বল্লাধারী সূর্য্যদেব হাসিমুখে চেয়ে আছেন।...

ইতিহাসের সামগ্রী জীবনের স্পর্শ পাচ্ছে।

কিন্তু এ ঠিকানা ওরা পেল কোথা থেকে? ওর এ আড্ডা তো কেউ জানে না! ও আবার তলায় সইটা পড়ে। সুনীল। ওই তা হ'লে এখনও সম্পাদক। ওরা কেউ আজও ছাড়ে নি সংঘকে।—কিন্তু ঠিকানা পেল কেমন ক'রে?

কিন্তু ও কথাটাই কি বড় কথা? যেখান থেকেই পাক, ওরা ওকে ডেকেছে, 'বহ্নি চক্রে'র অধিবেশনে ওকে ডেকেছে। ও যাবে, হ্যাঁ, ও যাবেই। সুনীল ডাকছে, বুদ্ধ ডাকছে, পাঠ্যজীবন-সখারা ডাকছে, ওর ফেলে-আসা অতীতটা তার ভালবাসা-ঝগড়া-হাস-কান্না সমেত ডাকছে। যাবে ও।

যাবে?—আয়নায় মুখটা দেখে ও। গত পাঁচ বছরের জীবন তার চোখকে ঠেলে দিয়েছে কালিময় গর্ত্তে, সেখান থেকে সেই রাগেই বোধ হয় চোখ দুটো জলজল করতে থাকে শ্বাপদের চোখের মতন। মুখের দু পাশে দুটো কদর্য রেখা। হাসলে কালো ঠোঁটের ওপর সাদা ছাতার পেছনে কালচে মাড়ি আর নষ্ট দাঁতের সারি দেখা যায়। চুলে তেল পড়ে নি কতকাল, লম্বা-লম্বা চুল। যাওয়া কি উচিত হবে?

তা ছাড়া, আর এক কথা। ওরাও কি এখনও তেমনই আছে? সংসারের চাপে প'ড়ে সজীবত্ব তাদের কি অটুট আছে? হয়তো রাজা তাদের দেখবে একেবারে অন্যরকম। সে সরল উচ্ছলতা ওদের মধ্যে থেকেও অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওর মনে ওদের যে রূপ, সে তো অবিনশ্বর, সেখানে রাজা সে ছেলেগুলিকে ধ'রে রেখে দিয়েছে আজও।

ঠিক দুপুরবেলায় হতাশভাবে রাজা মদের বোতল খোলে।

ওর অনিশ্চয়তা আর দ্বিধার বোধ হয় এর থেকে ভাল ওষুধ আর ছিল না। বুকের ভেতরটা কেমন করতে থাকে, উন্মত্ত মস্তিষ্ক জলতে থাকে, থুঁতনিটা থরথর ক'রে কাঁপছে, গলা দিয়ে কি ঠেলে উঠছে!—মাতাল হয়ে রাজা কাঁদছে।

কিন্তু সঙ্কল্প তার স্থির হয়ে গেছে। পরদিন ভোরে তার গাড়ি, পৌছবে বিকেলে, রওনা হবে আবার ভোরে। কয়েক ঘণ্টা মাত্র।

বিকেলবেলায় রাজা নামল মফস্বল স্টেশনটাতে। আকাশ ঢেকে আছে

দ্রুত-ধাবমান নীচু মেঘে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। বাইরের সিঁড়িটার কাছে এসে দাঁড়াতেই পুরনো জায়গাটা যেন তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাল। হাওয়ায় একটা পরিচিত গন্ধ। তাজা সবুজ ভেজা গাছেরা, লম্বা লম্বা ঘাসেরা, রাস্তার কাদা মিলে পাঠাচ্ছে গন্ধটাকে। একেবারে প্রাণের মধ্যে গিয়ে অনুরণন তোলে। কতকাল পায় নি এ মিশ্র গন্ধের আভাস! আশ্চর্য, কাদাকে এখানে বিরক্তিকর তো বোধ হয় না!

রাজা খুশি হয়ে হাঁটতে থাকে। ট্রেনে সমস্ত দুপুরটা প্রায় জেগে জানলায় ব'সে কাটিয়ে দিয়েছে। প্রথম দিকে একটা ঘুমের ঝোঁকে এক স্বপ্ন তাকে চমকিত ক'রে তুলেছিল।

…তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল আবার সেই পুরনো জীবন। ও যেন আবার তার সেকেণ্ড ইয়ারে ফিরে গিয়েছিল।

পরিষ্কার ও দেখতে পেলে, ভাত বেড়ে মা ডাকছেন।

খোকা, অ খোকা, আয়। কতক্ষণ ভাত নিয়ে ব'সে থাকব?

ও যেন লাফাতে লাফাতে ঢুকল, কি, বুড়ীয়া মাই! হ্যাঁ হ্যাঁ, সে কথা আর বলতে? কি মাছ, ইলিস? গুড্, মেটার, দিয়ে ফেল চটপট, সময় হয়ে গেছে।

মা পাখা হাতে বসলেন। গরম ভাতে হাওয়া করতে করতে বললেন, আজ একটু তাড়াতাড়ি আসবি বাবা।

ও সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। গালাগালিটায় বেশি অভ্যস্ত সে, এত আদরের স্বরে কথা বলাটা ঠিক সুবিধেজনক ঠেকল না তার কাছে। খুব আস্তে আস্তে বলে, কি ব্যাপার?

কাল ষষ্ঠী। তাই বিকেলে একটু কলা-টলা এনে দিবি আর কি। অন্য দিকে তাকিয়ে থাকেন মা।

জল খেয়ে ঝনাৎ ক'রে গেলাসটা রাখে রাজা, তারপর তড়বড় ক'রে উঠে পড়ে। বলে, তখনই বুঝেছি। ওসব হবে না। অন্য কেউ যাবে, আমার খেলা আছে।

তাড়াতাড়ি পালাতে চায় ও।

মা বলেন, আহা, ওরে বাঁদর, অম্বল খেয়ে গেলি নে?

দাও, হাতে দাও।—রাজা হাত পাতে।…

মার হাসিমুখটা তার পরই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে মিলিয়ে যায়। ওর ঘুম ভেঙে গেছে। গায়ে একটু ঘাম, চোখে একটু জল। আর ঘুম হয় নি।

মা তার কিছুদিন পরেই হাঁপানি-জ্বরে মারা গেছেন। ভাল ক'রে চিকিৎসা হয় নি। যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনিই ওদের সংসারটা টিকিয়ে রেখেছিলেন। সারা জীবনটা এক হাতে দশজনের কাজ ক'রে যেতেন। আর সবাইয়েরই মত অতি সাধারণ মা।

রাজা ভাবে, মার মত লোক মরতে পারেন না। ওর মনের মধ্যে চিরকাল স্নেহময়ী তিনি, তার শত উচ্ছৃঙ্খলতা স'য়ে যাবেন, সান্ত্বনা দেবেন শোকে।

শুধু মা কেন, ওর তখনকার আত্মীয়ের দল সবাই তার মনে আজও বেঁচে আছে, কোনদিন মরবে না। আর বাড়বেও না কোনদিন সেসব বন্ধু। চিরকাল কিশোর বয়সের উদ্দাম পড়ুয়া থেকে যাবে। অস্ফুট স্বরে সে বলে, যতদিন—যতদিন আমি বাঁচব।

চির-পরিচিত আবেষ্টনী, প্রতিনিয়ত দেখা খুঁটিনাটি, ওকে আনন্দে উচ্ছল ক'রে তোলে। মেঘের ফাঁক থেকে সূর্যটা হঠাৎ বেরিয়ে এসে কড়া রোদ দিতে থাকে। ঘাসে পাতায় জল চকচক করতে আরম্ভ করল।...

মনে প'ড়ে যায়, ও বর্ষার পরম ভক্ত ছিল। মেঘ দেখলে ওর মন অকারণ খুশি হয়ে উঠত। কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের বর্ষাকাব্য তাকে প্রায় পাগল ক'রে তুলত। আশ্চর্য, এতদিন এ সমস্ত ভুলে সে ছিল কোথা? এই তার জানা প্রিয় যথার্থ স্থান। ওই তো দেখা যায় বনমালী কবরেজের বৈঠকখানা, তারপর থেকে সার দিয়ে ওদের পাড়ার বাড়িগুলো। ওই উঁচু তেতলাটায় থাকত গৌরীরা, এখনও কি আছে?

গৌরী ওর সহপাঠিনী। নম্র সংযত, ফর্সা মেয়েটি, কটা চোখ। দেখতে নিশ্চিতভাবেই সুন্দর নয়। ও কিন্তু তার মধ্যে কোথায় লাবণ্য বের ক'রে নিয়েছিল খুঁজে। দোহারা ছোটখাটো মেয়েটির সলজ্জ কথা তার কানে মধুবর্ষণ করত সেকালে। হয় নি হয়তো কিছুই, কিন্তু কলেজের দেওয়াল-কবিদের সমর্থন পেয়ে বেশ ছড়িয়ে গিয়েছিল তাদের বন্ধুত্বের কথা। এ ভাল লাগার মূল্য হয়তো নেই কিছুই, কিন্তু আজও নিষ্পাপ পবিত্রতার কথা শুনলে গৌরীর কথাই মনে প'ড়ে যায় তার। কেমন আছে সে, কোথায় আছে?

আবেগভরে ভাবে সে, ভাল থাকুক, সুখে থাকুক গৌরী, নিষ্পাপ কুমারী গৌরী, কল্যাণ হয় যেন তার।

মোড়টা ঘুরতেই পাড়ায় এসে পড়ে রাজা। ওদের পুরনো বাড়ি, যেটা ও এখান থেকে চ'লে যাবার সময় বেচে দিয়েছিল, সেটা পার হয়ে যায়। একটা ছোট ছেলে খেলা করছে সেই উঠনে; ওপাশ থেকে একটি কমবয়সী বউ একটি বছর বারো-তেরো বয়সের ছেলেকে উৎসাহিত করছে কোণের গাছ থেকে পেয়ারা পাড়তে। ওদের সেই পেয়ারা গাছ! ওরা এখন ও-বাড়ি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। নতুন বাসিন্দা, নতুন মুখ সব।

...সন্ধ্যের আলো জ্ব'লে উঠল রাস্তায়। বড় রাস্তার মুখে সুনীলদের বাড়ি, উজ্জ্বল আলোর ফালি তির্যকভাবে এসে পড়েছে রাস্তায়। ভেতর থেকে অট্টহাস্য ঝলকে ঝলকে মেদিনী কম্পিত করছে।

সারাটা বিকেল কাদায় কাদায় ঘুরেছে রাজা। চেনা শহরটাকে আবার দেখেছে ঘুরে, চেনা মুখ বহু দেখেছে, আলাপ করেছে অনেকের সঙ্গে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে রাজা সোজা ঘরে ঢুকে গেল:—সেই ফরাশটা, দেওয়ালে সেই পুরনো সাইনবোর্ড, রঙ কিছু জ্ব'লে গেছে, তবু ঝকমক করছে। ভেতরের দরজার মাথায় ওর লেখা কবিতাটা, বহ্নি-চক্রের জন্মের সময় লেখা। ব'সে আছে সুনীল, ব'সে আছে আনন্দ, কোণ ঘেঁষে ব'সে বুদ্ধ; ফরাশের মাঝে ব'সে বিমল, তার পাশে ছোট খোকা, অমর, প্রবীর, জিতেন—। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজা এক এক ক'রে চোখ বুলিয়ে গেল, ওরা কেউই বিশেষ বদলায় নি।

পরমুহূর্তে একটা গগনবিদারী শোরগোল। বহুদিনের অদেখা অপ্রত্যাশিত পরম বন্ধুর দর্শনে উল্লসিত আট জোড়া সবল ফুস্ফুসের স্বাগত হুঙ্কার।

আরে, কে ও? রাজা বটেক?

আজু মঝু গেহে শ্যাম আওল।

হু-রা—চালাও পান্সি! রাজা আ গয়া।

কেয়াবাৎ! Colin Clouts come home again!

এখানে ব'স্—O Mary, go and put the kettle on. A little tea is indicated.

তারপর, রাজা, চিঠি পেয়েছিলি তবে?

রাজা, একটা নতুন কবিতা লিখলাম আজ। শুনতে হবে কিন্তু।

বুদ্ধদেবই প্রথম অনুভব করলে, ব্যাপারটা বড় ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে।

থাম্ তো তোরা। সবে ট্রেন থেকে নেমেছে, একটু জিরুতে দে।

জিরনো হ'ল। অমরের কবিতা শুনল রাজা। আনন্দ পেটুক মানুষ, অথচ ক্রমাগত অজীর্ণে ভোগে, পেটে টোকা মারে আর খায়। তার পেটের অবস্থা শুনতে হ'ল। সকলের খোঁজখবর নিলে। জিতেন নতুন ডেপুটি হয়েছে, ছোট খোকা প্রফেসর। আনন্দের ব্যবসা ফুলে উঠেছে, অমর ওকালতি ফেঁদেছে এখানেই। সুনীল কোন্ ছাত্র-সংহতির সম্পাদক, বেশ নাম করেছে। বুদ্ধ উদীয়মান কমার্শিয়াল আর্টিস্ট, কাজকর্ম ভালই করছে। অন্যান্য সহপাঠীদের খবর পেল, জীবিকার্জন ক'রে চলেছে নানা জায়গায় ছড়িয়ে প'ড়ে। গৌরীর খবরও পেল, বিয়ে হয়ে গেছে তার।

চোখ বুজে তাকিয়া ঠেস দিয়ে ব'সে থাকল ও। এই তো সে, স্বপ্নে নয়, বাস্তবে, সব-চেনা জগতে বন্ধুদের মধ্যে ব'সে নিশ্চিন্তে। ওদিকটায় বুদ্ধ আর অমরে ঝগড়া লেগেছে। হাসি এল ওর। খুব চেনা ঝগড়াটা, প্রায় প্রতিনিয়তের ঘটনা। কবিতা নিয়ে অমরকে খ্যাপাচ্ছে বুদ্ধ। এরা সবাই তেমনই আছে।

সুনীল ব'লে চলেছে, ওরা প্রতি বছর এ দিনটিতে এখানে এসে জমে, যেখানেই যে থাকুক না কেন। শুধু ওরা আটজন, আর কেউ না। রাজার খবর তো এতদিন পাওয়া যায় নি—

রাজা চোখ খুলে প্রশ্ন করে, কিন্তু কোথা থেকে পেলি আমার ঠিকানা?

কেন? কদিন আগে যে বড়দার সঙ্গে তোর কোথায় দেখা হয়েছিল!

রাজার মনে প'ড়ে যায়। মাসখানেক আগে ট্রামের মধ্যে দু মিনিটের দেখা হয়েছিল বটে সরোজদার সঙ্গে। ঠিকানাও বোধ হয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন তিনি, কেন যে ও সত্যি কথাটা বলেছিল, তা ও জানে না। তিনি তবে ভোলেন নি কথাটা।

সুনীল বলে, ওসব যাক। তুই কি করছিস, বল্? আমাদের মধ্যে সব-চাইতে ওস্তাদ ছিলি তুই—

রাজা বলে। অনর্গল মিথ্যা কথা বলে। এত সুন্দর ক'রে গল্পটা জমিয়ে আনে যে, নিজেরই ভাল লাগে। মধ্যপ্রদেশে কোন স্টেটে ও মাইনিং

অফিসার। মাইনে? মোটামুটি আর কি। ফ্রী কোয়ার্টার, তা ছাড়া এটা ওটা। হ্যাঁ, তবে হঠাৎ বিয়ে করেছে, তাই খবর দেওয়া হয়ে ওঠে নি। ছেলে হয়েছে একটা। ছেলের নাম? ভাল নাম তো রাখা হয় নি, রাজা ডাকে মুন্না বলে, ও খোকন ব'লে ডাকে। হুঁ, সুন্দরী। আছে ভালই, পাহাড়ে জায়গা, খাওয়াটা ভাল। মাস দুয়েকের ছুটি পেয়েছে, কলকাতায় এসে আছে। হ্যাঁ, নিয়ে আসবে বউকে, তবে দুদিন বাদে। কাল আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে। ওদের কার বিয়ে।

রাজা কথা বলছে। রাজা, বহ্নি-চক্রের রাজা, কলেজের দলের নেতা, বন্ধুদের ভালবাসা আর গর্বের বস্তু। কতদিন পরে দেখা!

তারপর হাসি, গান, তবলা-হারমোনিয়ামের আওয়াজ। রাত বাড়ে। খাবার ডাক আসে। খাওয়া। একসঙ্গে সারি দিয়ে তুমুল হট্টগোলের সঙ্গে নয়টি ছেলে খাচ্ছে। অনেকদিন পরে কত আনন্দের সঙ্গে খেল রাজা।

অনেক রাতে আর সবাই চ'লে গেল, আনন্দ আর বুদ্ধ থেকে যায় এখানে। বাইরের ঘরে ফরাশের উপর শুয়ে পড়ে ওরা তিনজন। সুনীল আলো নিবিয়ে ভেতরে চ'লে গেল।

মধুর, জীবনটা মধুর। দুঃখ মধুর, আনন্দের স্মৃতি মধুর। অজানা কারণে একা একা ব'সে দীর্ঘশ্বাস ফেলা মধুর। নিজের অদেখা রহস্যময়ী পৃথিবী সম্বন্ধে অন্যের ভ্রমণকাহিনী পড়া, সেও মধুর।

আজ থেকে হোক তার নতুন পথে যাত্রা। মদ সে আর খাবে না, ক্লেদাক্ত সঙ্গ ছাড়বে। কালকাতাতেই আর ফিরবে না কোনদিন। একটা চাকরি জুটবে না তার এখানে?… থাকবে, এখানেই থাকবে।—মা, গৌরী, বুদ্ধ, সুনীল, আনন্দ, কলেজ, প্রিন্সিপালের ভুঁড়িওয়ালা চেহারা, ইংরেজীর নতুন অধ্যাপকের লাজুক মুখ, …মা, গৌরী, গৌরী, মা…সব কেমন জড়িয়ে যাচ্ছে তারপরে। কুয়াশা…ঘাস থেকে সুগন্ধ উত্থিত হচ্ছে। জলভরা মেঘের ফাঁক দিয়ে দিয়ে হলদে চাঁদের দুরন্ত যাত্রা,…রামগিরি পাহাড়, উত্তরীয়-সম্বল কঙ্কালসার মূর্তি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে দাঁড়িয়ে, হাওয়ায় তার চুল উড়ছে, মণিবন্ধ তার কনকবলয়ভ্রংশরিক্ত…

কশ্চিৎকান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তঙ্গমিতমহিমা বর্ষভোগ্যে ন ভর্তুঃ॥

যক্ষের শাপবর্ষ অতিক্রান্ত···উড়ে চলেছে কামনার মোক্ষধামে···স্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে যেখানে অনন্ত সৌন্দর্যের চিরনিকেতন···

পাশ ফিরে শুল রাজা। বুদ্ধের নাক ডাকছে।

···ভোর পাঁচটায় ওর গাড়ি। সাড়ে চারটেতে সুনীল ওকে তুলে দিলে। শান্ত তপোসমাহিত ব্রাহ্মমুহূর্ত। রাজা বুক ভ'রে নিশ্বাস নেয়। পরিষ্কার, ঠাণ্ডা বাতাস। মেঘ জ'মে আছে আকাশে। বৃষ্টি নামে নি এখনও। রাজা মুখ ধুতে গেল।

মাসীমা রাত থাকতে উঠে চা-জলখাবার ক'রে ব'সে আছেন। মায়ের জাত! মাসীমার সঙ্গে খানিক গল্প করে রাজা। বড় আনন্দ পেলে মনে ও। কয়েক ঘণ্টা মাত্র। কিন্তু সুধায় রইল ভ'রে একেবারে। ওকে আসতেই হবে চ'লে, ও বুঝতে পারে

সময় হয়ে যায়। বাইরের ঘরে গিয়ে ও কাপড় পরতে আরম্ভ করে। বন্ধুরা ঘুমোচ্ছে গভীরভাবে। ও ডাকবে না ওদের। বেচারারা বড় ক্লান্ত হয়ে রয়েছে। গেঞ্জিটা মাথায় গলাতে গলাতে ভাবে, ওদের সঙ্গে দেখা করতে আবার আসবে ও। ফিরে আসবে। নিজে নিজেকে বোঝানোর জন্যই যেন আপন মনে বলে, ফিরে আসব। আবার ফিরে আসব।

পাঞ্জাবিটা পাচ্ছে না রাজা। আলনার অন্য কাপড়ের তলায় চাপা প'ড়ে গেছে বোধ হয়। খুঁজতে থাকে।

সুনীল এসে ব'লে গেল একটু দাঁড়াতে। মাসীমা আমসত্ত্ব দেবেন, সেটা ও নিয়ে আসছে। সঙ্গে যাবে স্টেশনে।

ঐ পাঞ্জাবিটা, ঐ নীল শার্টের তলায়। শার্টটা তোলে ও, কি একটা প'ড়ে গেল বুকপকেট থেকে ওর পায়ের ওপর।

মানিব্যাগ। একটা মোটা বোঝাই মানিব্যাগ। সরু দক্ষ আঙুলগুলো শিরশির ক'রে ওঠে, কি করছে বোঝবার আগেই ব্যাগটা তুলে নেয় রাজা। বুকটা একটু কাঁপে। ঘুমন্ত বন্ধুদের দিকে একটা চাহনি হেনে ও ব্যাগটা খুলে ফেলে। একতাড়া নোট। নিশ্চয়ই আনন্দের ব্যাগ, দোকানের ক্যাশ হবে। ব্যাগটা রেখেই দেয় ও নীল শার্টের পকেটে। তারপর পাঞ্জাবিটা পরে।

মাথাটা ঝিমঝিম করছে। জিভটা মোটা হয়ে গিয়েছে হঠাৎ —এর মানে ওর অতীতকে, সুধাময় অতীতকে একেবারে মুছে ফেলা।

কুয়াশাটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।—বহ্নি-চক্রের সূর্যসারথী এক হাতে বল্গা ধ'রে, আর এক হাতে কশা অর্ধোত্থিত। চোখ দুটো নাচছে আনন্দে, উজ্জ্বল হাস্যদীপ্ত মুখ, কবাটবক্ষের পাশ দিয়ে কুয়াশা ঘৃণ্য বিসর্পিল গতিতে উঠছে—উঠছে। ঢেকে গেল, ছেয়ে গেল মিত্রদেবের মুখ।···মা, গৌরী, মা—মেঘদূত, আনন্দ···সবাই সেই কুয়াশার আবরণের ওপারে চ'লে গেল। রাজা দু হাত তোলে তাদের সরানোর জন্য।

অন্য দরজা দিয়ে সুনীল বেরিয়ে ডাকছে। ট্রেনের সময় হ'ল। হাতে একটা কাপড়ের টুকরোয় বাঁধা আমসত্ত্ব।

কই, রাজা, দেরি করিস না, যদি যেতে হয়। সময় হয়ে এল।

এই যাই।—রাজার চমক ভাঙে। একটা ঢোঁক গেলে সে। বেরুবার আগে আনন্দের দিকে সচকিত কটাক্ষে চায়, তারপর পটু আর্টিস্টিক সরু আঙুলে নির্বিকারভাবে ব্যাগটা তুলে নেয় নীল শার্টের পকেট থেকে।

শ্রীঋত্বিককুমার ঘটক

পাগলা-গারদের কবিতা

চিচিং ফাঁক

চুরি-চৌকস চল্লিশ চোর সুদূর পথের বাঁকে
অদৃশ্য হয়ে যায়। আলিবাবা চুপি চুপি সেই ফাঁকে
গুহার সুমুখে রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে হাঁকে
অতি সাবধানী অতি মৃদু সেই ডাক,
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক!"

* * *

আশেপাশে কেহ আছে নাকি? কেহ শুনিছে কি সেই স্বর?
নাই, কেহ নাই। পাতায় পাতায় আছে শুধু মর্মর,
উদাসী হাওয়ার না-দেখা পরশে একান্ত নির্ভর,
ঝোপের আড়ালে আছে ঝিঁঝিঁদের ঝাঁক।
যেন কানে কানে আলিবাবা কহে, "খোল দ্বার সত্বর,
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক!"

গাছের আড়ালে অতি সাবধানে গোপনে রয়েছে বাঁধা
পিঠে ঝুলি-সহ অতি প্রশান্ত বিশ্বাসী দুটি গাধা,
একজন হ'ল কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বাকিটি তাহার দাদা,
শোনে দুই ভাই বিস্ময়ে হতবাক্
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক !"

* * *

হতে বহু দূর ভেসে আসে সুর, বাঁশি বাজে মাঠ-পারী,
কে যেন কোথায় ঘাট-পারে ব'সে গায় গান ঘাট-পারী,
আলিবাবা আজ চোরের ওপর করবেই বাটপাড়ি
ইন্‌শা-আল্লা, বরাতে যা থাকে থাক্
বন্ধ দ্বারের সম্মুখে তাই ডাকে মৃদু হাঁক ছাড়ি
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক !"

* * *

হায় দুনিয়ার দৌলত, তুমি জান যে জবর যাদু,
সাধুরে বানাও চোর তুমি ভাই, চোরেরে বানাও সাধু,
কত হাঁদারে যে চালাক বানাও, চালাকেরে কর হাঁদু,
শাক দিয়ে মাছ, মাছ দিয়ে ঢাকো শাক,
আলিরে ডাকাও মৃদু স্বরে, যেন নাতিরে ডাকিছে দাদু,
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক !"

* * *

ঘায়েল হয়েছে অনেক বছর, খেয়ে অতীতের থাবা,
মহাবিশ্বের সাথে মহাকাল অনেক খেলেছে দাবা,
কত বাপ হ'ল ঠাকুরদা, আর কত ছেলে হ'ল বাবা,
কত না পদ্ম হেসেছে কত না পাঁক ।
আজ কোথা সেই চল্লিশ চোর ? কোথা সেই আলিবাবা ?
তবু মনে হয় আজো শুনি তার ডাক,
"চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক, চিচিং ফাঁক !"

ফাঁকি

যারে ফাঁকি দিতে করিনু চেষ্টা
ফাঁকি দিয়ে গেল সেই যে শেষটা
পকেট-কাটার পকেট গেল সে কেটে ।

তারি কথা ভেবে উদাসী চিত্ত
থেকে থেকে করে করুণ নৃত্য,
সে নাচের জের সহজে কভু কি মেটে ?

যে-ই শোনে সে-ই কহে সহাস্য
"এ যেন গীতার নূতন ভাষ্য,
সেয়ানার সাথে সেয়ানার কোলাকুলি ।
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন,
সরিষার বীজ করিলে বপন
সরিষার ফুলে ভরিতেই হবে ঝুলি ।"

রামেরে খাওয়ালে পচানো ভেটকি
ফাঁপিতে পারে না শ্যামের পেট কি ?
উদোর পিণ্ডি পড়ে না বুদোর ঘাড়ে ?
নিজে নেব যদি নিজেরি ঝুঁকি
বেঁচে তবে আর জগতে সুখ কি ?—
'দুত্তোর' ব'লে ভাবি আমি বারে বারে ।

চাঁদ ও তুমি

চাঁদ ডুবে গেছে মেঘের আড়ালে
তবু আমি চেয়ে আছি ।
মনে মনে ভাবি, তুমি কোথা আজ ?,
আমি তো রয়েছি বাঁচি ।
স্বাধীন রয়েছি গণ্ডির মাঝে,
কাটে রাত দিন কাজে ও অকাজে,
হাসি পেলে হেথা হাসি হি-হি ক'রে
নাচ পেলে পরে নাচি ।

তুমি একবার ঢেকেছিলে মুখ
সুন্দর কালো চুলে

হয়তো সে কথা তুমি ভুলে গেছ,
আমি তো যাই নি ভুলে
আর ভোলে নাই জানি মহাকাল,
আজো মনে করে সকাল বিকাল,
কচ্‌ কচাকচ্‌ কাটে সে সময়
হাতে অনন্ত কাঁচি।
তুমি কোথা আছ নাহি জানি আজ
আমি তো রয়েছি বাঁচি।

গহীন রাতে

আজি এই গহীন রাতে
শূন্য হাতে
গাইব যে গান আপন মনে
সঙ্গোপনে বিজন ছাতে
যদি তা হাওয়ায় ভেসে
চ'লে যায় তোমার দেশে,
দু কানের ভেতর দিয়ে
মরমে পৌঁছে শেষে
তোমায় করে আনমনা—
হয়তো আমি জানব না গো
জানব না গো জানব না।

নিরালায় তাই তো ভাবি
তোমার দাবি,
কেনই বা আর দিয়ে ফাঁকি
লুকিয়ে রাখি মনের চাবি ?
আমি যে আপন-ভোলা,
রেখে দিই দুয়ার খোলা,
তুমি সেই সুযোগ নিয়ে
যদি দাও দোদুল-দোলা

আমায় ক'রে আনমনা
তখন আমি কোনই মানা
মানব না গো মানব না।

তারার প্রতি

ওগো অগুনতি তারা,
জানি নে তোমরা কারা,
কে আমি তোমরা জান নাকো নিশ্চয়,
তবু আমাদের হোক দেখাদেখি, না-ই হ'ল পরিচয়।

চাঁদের প্রতি

"বন্ধু হে চাঁদ, পিছন ফিরিয়া বারেক দাঁড়াও ভাই,
পৃষ্ঠে তোমার কৃষ্ণ পাহাড় দেখিব আছে কি নাই,
সম্মুখে যেমন দেখি।
ক্ষণিকের তরে অনুরোধ রাখিবে কি ?"
অনুরোধ চাঁদ রাখিত হয়তো, কিন্তু দেখিল কবি
উজল আলোকে সারাটা আকাশ ভরিয়া দিয়াছে রবি।

অদার্শনিক

কোথা হতে আসি, কোথা চ'লে যাই,
আমি নাহি চাই জানতে
মাস-কাবারেতে যদি পারি ভাই
মোটা টাকা ঘরে আনতে
জীবাত্মা আর পরমাত্মায়
কোথা মিল আর তফাত কোথায়,
ভেবে হেন যা-তা ঘামাই নে মাথা
মনে মনে বলি "বেশ তো
মিল থাকে ভাল, না থাকে না থাক্,
দুয়ে যেথা খুশি যাক্ বা না যাক্,"
আমি শুধু দেখি পকেটে আমার
আছে কি না আছে রেস্তো।

* * *

"চিরদিন জয়ী ধর্মের আলো"
এই কথা শুনি বার বার,
আমি তো দেখছি বেশ আছে ভাল
যারা করে চোরা-কারবার।
গৌর, মহাত্মা এবং বুদ্ধ
গিয়েছেন ব'লে তাঁহারা স্বদ্ধ
প্রেম-হাতিয়ারে করিতে যুদ্ধ
ল'য়ে অহিংসা-ডাণ্ডা,
আমি তো দেখছি, প্রেম দিতে গেলে
প্রেম-পাত্রেরা ঠেলে দেয় ফেলে,
ঠাণ্ডার প্রতি গরম সবাই
গরমের প্রতি ঠাণ্ডা।

* * *

শুনি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আসন
পেল যে ভারতবর্ষ,
তার নাকি একমাত্র কারণ
ত্যাগের মহা আদর্শ।
না জুটলে পরে ভোগের খরচা
আপনি আসবে ত্যাগের চর্চা,
হাতের পাঁচ তো রয়েছেই ত্যাগ,
ভোগ করি তাই দিল্‌খুল
কি সত্য আর কি যে অসত্য
বুঝি নাকো অত তত্ত্ব-ফত্ত্ব
খাও দাও আর ফুর্তি উড়াও
এই বুঝি ভাই বিল্‌কুল্‌।

আগুন

ওরে ভাই, আগুন লেগেছে মোর মনে
কেমনে লাগাল কে যে
একদম জানি নে যে
কেন বা লাগাল কোন্‌ ক্ষণে!

কোথায় বা দমকল!
কোথা পাইপের জল?
আগুন নিভাতে ডাকি কাহারে?
নদীরা যদিও জানি
সাগরেতে ঢালে পানি
উৎপাত করে আগে পাহাড়ে।
দুটি চোখ জুড়ে মোর
নেমেছিল ঘুম-ঘোর
সহসা জাগিনু এ লগনে
জেগে দেখি, হায় হায়,
করি আমি কি উপায়?
আগুন লেগেছে মোর মনে।

একটি কথা

তুমি আমায় বলেছিলে—হয়তো তোমার নেই মনে—
"আমার মনের ফুল-বাগানে রাখব তোমায় মালী।
তুমি আমার বাগান সেঁচে
সেরা সেরা কুসুম বেছে
যেমন খুশি তেমন ক'রে গাঁথবে মালা খালি।"
আজকে মনে পড়ল তোমার শেষ-না-করা সেই কথা।
মালী আমায় কর নি তো, হয় নি গাঁথা মালা।
তবুও আমি আপন মনে
হেথায় ব'সে সঙ্গোপনে
তোমার তরেই সাজিয়ে রাখি আমার বরণ-ডালা।

খবরদার

দুই চোখে মোর দূরবীন আছে,
রসনায় আছে ক্ষুরধার।
আমার সামনে প'ড়ো না কেউ
খবরদার!

সচিবের শালা, লাটের বেহাই
মোর কাছে কারো নেই কো রেহাই,—
খুঁত পেলে আমি ভূত ছাড়াবই
ঝাড় ফুঁক দিয়ে জোরদার
আমার সামনে প'ড়ো না কেউ
খবরদার !

ঘুঘু দেখেছ কি ? দেখ নাই ফাঁদ ?
দেখাব আস্তে আস্তে।
ভেবেছ কি হবে আকাশের চাঁদ
কাস্তে ?
অচেনার মত চলি চুপি চুপি
বহুরূপ ধ'রে আমি বহুরূপী,
পণ্ডিত দেখি পণ্ডিতি করে
সর্দারি করে সর্দার
ভাব দেখি যেন পানের সঙ্গে
জর্দার।

এমনিতে আমি নিরীহ নেহাৎ
সহজে যাই নে লাগতে,
ক্ষেপে গেলে তবু সময় পাবে না
ভাগতে।
বাঘের পেছনে লাগে যথা ফেউ
আমার পেছনে লেগো নাকো কেউ,
মাথা চ'ড়ে গেলে দেখি নে তফাত
ছোড়দার সাথে বড়দার
আমার পেছনে লেগো না কেউ
খবরদার !

অ. কৃ. ব.

নিজের কথা

ছেলেবেলা

বয়স তখন দশ কি বারো, দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে প্রতি বৎসর মামার বাড়ি যেতাম। উৎসব সমারোহেই হ'ত। কলকাতা থেকে সেরা বাইজীর নাচ, মথুর সার যাত্রা, থিয়েটার বায়স্কোপ, ব্ল্যাক আর্টের ম্যাজিক ইত্যাদি পুজোর কয়দিন অষ্টপ্রহর ধ'রে চলত। তার সঙ্গে লাখ লাখ লোকের ভিড়। সারা রাজসাহী ডিভিশন থেকে লোক যেন ভেঙে পড়ত তাজহাটের রাজবাড়িতে। আত্মীয় বা অপরিচিতের পার্থক্য ছিল না, উপর-ক্লাসের টিকিট কিনে রংপুরে এসে পড়তে পারলেই হ'ল। বাড়তি লোকের থাকবার স্থান হ'ত শিকারের বড় বড় শৌখিন তাঁবুতে।

আমার কাজ ছিল চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে প্রতিমা গড়া দেখা। সেবার ষষ্ঠীর সপ্তাহ খানেক আগে এসে পড়েছিলাম। ঠাকুরের উপর লাল মাটি লেগে গিয়েছে, বাঁশের চাঁচাড়ি দিয়ে গঠনের উপর পালিশ চলেছে ; রঙ আর ঘামতেল পড়তে দিন কতক বাকি।

রংপুর বালির দেশ, লাল মাটি আসত বাইরে থেকে, তৈরি হতে মাস খানেক সময় লাগত। তৈরি এঁটেল মাটি টেপাটেপি করলেই একটা না একটা রূপ বেরিয়ে আসত। আমি মাটি নিয়ে সাপ ব্যাঙ গড়তাম, বড় ভাল লাগত। মাটির মধ্যে কত রকমই অস্পষ্ট রূপ দেখতাম, কিন্তু কিছুতেই বার ক'রে আনতে পারতাম না। মানুষের চেহারার প্রতিই ছিল আমার বিশেষ আকর্ষণ। চেহারা নিজে গড়তে না পারলেও মাটির ভিতর দৃষ্টি আমার চ'লে যেত, ওদের দেখতাম আমি ঠিক। মানুষ গড়ায় নাজেহাল হয়ে গেলে পটুয়াকে বলতাম আমার দুঃখের কথা। পটুয়া ছিল আমার দরদী, সময় নষ্ট করছি ব'লে কখনও কড়া কথা বলে নি, বরং অবসর পেলে ভোজবাজির খেলার মত কয়েকটা আঙুলের টিপনিতেই চমৎকার মানুষের মুখ গ'ড়ে দিত। কখন কখন গোটা মানুষটাই তৈরি ক'রে দিয়েছে। আমি অবাক হয়ে তার কারিগরি দেখতাম। কত সময় অবনতমস্তকে বলতে চাইতাম, তোমার বিদ্যা আমাকে কিছুটা দিয়ে দাও। কিন্তু বলা আর হ'ত না। ভদ্রলোকের ছেলের পটুয়ার বিদ্যা মারার মতলব শুনলে তখনকার দিনে জাতপাতের প্রশ্ন উঠে পড়ত। লোক-নিন্দার ভয়ে লুকিয়ে প'টোকে শ্রদ্ধা করতাম।

একদিন বড়সড় কিছু গড়বার ইচ্ছে হ'ল, তার সঙ্গে দুষ্টবুদ্ধিও মাথায়

খেলছিল। রীতিমত প্রকাণ্ড সাপ গড়লাম, গোক্ষুরো সাপ। ফণা ধরিয়ে কার্তিকের পিছন থেকে ময়ূরের পায়ের তলায় মাথা খাড়া করিয়ে দিলাম।

আহারান্তে দিবানিদ্রা শেষ ক'রে, পটুয়া কাজে লাগতে যাচ্ছিল। প্রতিমার কাছে আসতেই 'বাপ রে' ক'রে উঠল। পরক্ষণেই চণ্ডীমণ্ডপে হৈ-হৈ-রৈ-রৈ কাণ্ড। লাঠিসোঁটা নিয়ে লোকজন ছুটে এল। প'টো দূর থেকে দেখিয়ে দিলে, ভয়ঙ্কর ফণাধরা বিষধর। ধপাধপ লাঠি পড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত কে একজন ব'লে বসল, আরে, ছ্যাঃ! এ যে মাটি! আশ্চর্যজনক আবিষ্কৃতিতে, একদিনেই আমার নাম বেরিয়ে গেল, ছেলেটা গড়ে ভাল। সেই দিন থেকেই বাহবার উৎসাহে গড়ার দীক্ষা পেলাম। আমার মূর্তিগঠনশিক্ষার প্রথম গুরু পটুয়া। পটুয়াকে আজও গুরু ব'লেই মানি, শ্রদ্ধেয়কে স্মরণ ক'রে মাথা নত করি।

লেখাপড়ায় আর মন বসে না। ক্লাসের ভিতরেই নিরিবিলি কোণের বেঞ্চে পুতুল-গড়া শুরু ক'রে দিলাম। বয়েসের পক্ষে ষণ্ডামার্ক ছিলাম, ছেলেরা ভয় পেত, কেউ ধরিয়ে দিত না। ধরা পড়লাম স্বভাবদোষে গড়তে গড়তে একদিন বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলাম। রূপ ধরার ঝোঁক আমাকে এমনই পেয়ে বসেছিল যে, হাতের নাগালে কি ঘটছে জানবার অবকাশ ছিল না।

গোঁফওয়ালা মানুষের মুখ গ'ড়ে চলেছি, বেপরোয়া মর্দানা গোঁফে তখন চাড়া দিয়ে দিয়েছি, এমনি সময় মাথার উপর দারুণ গাঁট্টা পড়ল। কার এত বড় স্পর্ধা! মুখ তুলতেই দেখি, একজোড়া জীবন্ত গোঁফ, আমাদের জুনিয়ার মাস্টার আয়নায় মুখ দেখার মত পুতুলটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। পুতুলের গোঁফের সহিত মাস্টার মশাইয়ের তা দেওয়ার ভঙ্গীতে বেশ মিল ছিল। অভিজ্ঞ ব্যক্তি ইঙ্গিতকে অর্থপূর্ণ ক'রে নিলেন, অকস্মাৎ কানে টান পড়ল। কান টানলেই মাথা আসে, উঠতে হ'ল।

বড় রকমের চরিত্রশুদ্ধির ব্যবস্থা হ'ত হেডমাস্টার মশাইয়ের ঘরে। তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। জরুরী কেস স্থগিত রাখতে হ'ল। জুনিয়ার মাস্টারকে মুখ ভ্যাংচানির নথি হাজতে র'য়ে গেল, পুতুল আলমারিতে বন্ধ হ'ল, বিচারের সময় এক্সিবিট হিসাবে ব্যবহৃত হবে ব'লে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারের আগেই সাজা প্রস্তুত থাকে। আমার সম্বন্ধেও নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি।

আমি জামিনে খালাস পেলেও কুকীর্তির বিশদ বিবরণ সহ রেজিস্টারি পত্র গেল বাবুজীর—আমার পিতার—কাছে। চিঠি প'ড়ে তিনি কিছুই বললেন না। দিন কতক কথা বলা বন্ধ ক'রে দিলেন। পিতামাতার একমাত্র সন্তান, আদুরে ছিলাম; বাবুজীর ব্যবহারে মনে ব্যথা পেলাম।

ক্লাসে আর পুতুল গড়া চলে না। স্কুল পালাতে আরম্ভ করলাম। স্কুলের সামনেই ওয়েলিংটন স্কোয়ার, তারই একটা ঝোপে বাঁদর পাখি গড়তাম। সময়টা কাটছিল ভাল, কিন্তু সুখ বেশিদিন সইল না।

ক্লাসে অনুপস্থিতির খবর হাত-ফেরতা হতে হতে হেডমাস্টার মশাইয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছল। তলব পড়ল খাস-কামরায়। তখন আমি তারিফের লোভে সদ্য-গড়া বাঁদর ছেলেদের দেখাচ্ছিলাম, রসভঙ্গ হয়ে গেল। হুকুমের পিছনে তাড়া ছিল, পুতুলটা গুছিয়ে লুকোবারও সময় পেলাম না, তাড়াতাড়ি কোঁচায় ঢেকে কাঠগড়ার দিকে চলতে লাগলাম।

হেডমাস্টার বেজায় রাশভারী মানুষ। আচকান জোব্বা শামলা প'রে স্কুলে আসতেন। চশমার উপর দিয়ে দূরের মানুষ দেখতেন। ঐ চাহনির খপ্পরে প'ড়ে গেলে ছেলেদের একটা না একটা সাজা সুনিশ্চিত ছিল। শাসন করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ, আমি মহৎ কর্তব্য-সাধনে সহায় হয়ে দাঁড়ালাম।

স্কুল পালানোর খবর দিয়েছিল গেটের বুড়ো দরোয়ান। আমাকে নাকি কিছুতেই আটকানো যায় না, পাঁচিল টপকানো আমার নিত্য পেশা। দরোয়ানের পাওনা ঘুষ সেই দিনই কেবল দিতে পারি নি। প'টোপাড়ায় মাটির ফরমাশ দিতে টিফিনের সব পয়সা খরচ হয়ে গিয়েছিল। লোকটা কি ডাহা মিথ্যাবাদী! সোজা গেট দিয়ে ওরই ইশারায় বেরিয়ে যাই, আর ব'লে দিলে কিনা পাঁচিল টপকাই!

নিমকহারামের উপর রীতিমত চ'টে গিয়েছিলাম। রাগে দাঁত কড়মড় করছিল। শব্দটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল বোধ হয়। শাস্তিদাতা মুখের সামনে বেত ধ'রে বললেন, এতবড় স্পর্ধা, দুষ্কর্ম ক'রে আবার দাঁত-কড়মড়ানি?

চরিত্রশুদ্ধির ব্রহ্মাস্ত্রকে বেকার বসিয়ে রাখা গেল না। সপাং ক'রে বেত এসে পড়ল আমার পিঠের উপর। মারের পরেই শুদ্ধির দক্ষিণা চেয়ে বসলেন, অর্থাৎ আমাকে ভাল ছেলের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। প্রমাদ গুনলাম।

অকস্মাৎ এমন একটি প্রতিশ্রুতির চাহিদা আসবে কল্পনাও করতে পারি নি। চলতি প্রথায় শাস্তির পর আসামী কয়েদখানা থেকে খালাস পেয়ে থাকে। স্কুল-খানায় এ সুবিধাটুকু থেকেও বঞ্চিত হলাম।

ইতিমধ্যে হেডমাস্টার মশাই হলফ শোনবার জন্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, হাতের বেত থেকে থেকে কেঁপে উঠছে। বিচার ক'রে দেখলাম, বরং আর এক ঘা বেত পিঠে সওয়া চলে, কিন্তু ভাল ছেলে হওয়া ধাতে সইবে না. বিশেষ ক'রে যাদের দৃষ্টান্ত আমার সামনে ধরেছেন তারা আমার চক্ষুশূল। কোন উত্তর না দিয়ে নির্বাক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলাম। অপর দিকে শুদ্ধির লগ্ন উত্তীর্ণ হয়ে যায়, শাস্তিদাতার ধৈর্য শেষ সীমানায় এসে ঠেকেছে, অচিরাৎ একটা কিছু হেস্ত-নেস্ত না হ'লেই নয়। 'কি হে বাছাধন!' ব'লেই মাস্টার মশাই সর্ব শক্তি প্রয়োগে আমার কাঁধ ধ'রে ঝাঁকুনি দিলেন। এইরূপ ঘনিষ্ঠতার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ঝাঁকুনিতে পিচ্ছিল মাটি হাত ফসকে পড়ল ঝকঝকে পরিষ্কার মেঝের উপর। একেবারে যাচ্ছেতাই কাণ্ড!

প্রত্যক্ষ বাঁদর আত্মকথা কবুল করতেই একটি বিরাট হুঙ্কার শুনলাম, তার-পরে আদেশ পেলাম, গাধার টুপি প'রে গেটের সামনে বেঞ্চির উপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, ছুটির পরেও আধ ঘণ্টা। অসম্ভব প্রত্যাশা, যে সুবোধ বালক স্কুলে ঢোকবার আগে থেকেই ছুটির ব্যবস্থা নিজে ক'রে নেয়, তারই উপর বন্দী হবার আদেশ! আদেশ মানা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। মহামান্য মুকুট প'রে অভিষেকের স্থানে উপস্থিত হলাম। আমাদের জুনিয়ার মাস্টার আমাকে বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়ে হৃষ্টচিত্তে ফিরে গেলেন।

তখন টিফিনের ঘণ্টা পড়েছে, ছেলেরা খাবার-মুখে আমার চারপাশে ঘুরছে। ক্ষিধের ভিতরে রায়টের সূচনা হয়েই ছিল, গাল-ফোলা ছেলেদের দেখে উত্তেজনা বেড়ে উঠতে লাগল। ভিতরের গোলমালের শব্দ বাইরে থেকে শোনা যায়, অথচ শান্তি-স্থাপনের কোনরূপ উপায় নেই।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল, পা বদলে কোন প্রকারে শাস্তির সম্মানকে ঠেকা দিয়ে খাড়া রেখেছি। ক্লাসে ফেরার ঘণ্টা পড়ল, ছেলেদের কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টির দাহন থেকে রেহাই পেলাম।

দাঁড়িয়েই আছি, যে নালিশ করেছে সে-ই আমার পাহারায়। দরোয়ান জবরদস্ত তামাকখোর। ছিলিমে টিকের আগুন তার কখনও নেবে না।

লোকটা নতুন ক'রে তামাক সাজার জন্যে ঘরে ঢুকল, পোড়া তামাক ভাঙা বালতিটার ভিতর ফেলে দিয়ে। জ্বলন্ত অগ্নির আধার আমার দৃষ্টিকে ক্ষণে ক্ষণে টেনে নিতে লাগল। কে যেন কানের পাশে চুপিচুপি ব'লে গেল, তোমার উদ্ধারের ব্যবস্থা ওই বালতির ভিতর লুকানো আছে।

মরচে-ধরা ভাঙা বালতি, বয়েসের দোষে বাতিল হওয়ায় দরোয়ানের ডাস্টবিন হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঘরোয়া জঞ্জাল সে ওর ভিতরেই গুছিয়ে রাখে। আমি দেখলাম, ওই বালতির তোবড়ানো কাঠামোর সঙ্গে আমার মাথার টুপির বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। ভাবলাম, দরোয়ানকেও আমার মত সম্মানিত করলে দোষটা কি হয়? চিন্তার সঙ্গে কাজ আমার দ্রুত হয়ে থাকে। কর্তব্য সম্বন্ধে প্রস্তুত হতে সময় লাগল না।

দরোয়ান ফিরে এসে মাঘের রোদ পোয়াবার ব্যবস্থা ক'রে নিলে আমার দিকে পিছন ফিরে। বালতি আমার বেঞ্চির কাছেই। ধীরে—অতি ধীরে বেঞ্চি থেকে নামলাম, অতি সন্তর্পণে বালতিটা তুলে নিয়েই খপ ক'রে দরোয়ানের মাথায় চেপে বসিয়ে দিলাম; তারপরই রাস্তার দিকে দৌড়। সামনে একটা বন্ধ ভাড়াটে-গাড়ি যাচ্ছিল, পিছনে উঠে বসলাম। প্রকাণ্ড গেট খোলা; বালতি মাথায় দরোয়ান সেখানে, হাত প্রসারিত ক'রে কানা-মাছি খেলছে; তার সঙ্গে বিকট চীৎকার। নিশ্চয় টিকের আগুন টেকো মাথায় কাজ শুরু ক'রে দিয়েছিল। তা পুড়ুক, লোকটার দিশাহারা অবস্থা আমাকে আনন্দে মশগুল ক'রে তুলেছিল। ইতিমধ্যে স্কুলের এলাকা ছাড়িয়ে খানিকটা এসে পড়েছি, হঠাৎ ছাদের উপর থেকে চাবুকের ডগা আমার মাথার কাছে এসে পড়তে লাগল, গাড়োয়ান নিশ্চয় টের পেয়েছে, বিনা ভাড়ায় চলেছি। বেশিক্ষণ উৎপাত সহ্য করা চলল না, একটু একটু ক'রে আন্দাজি মারের চাবুক মুখের কাছে এগিয়ে আসছিল। শেষ পর্যন্ত গাড়োয়ান ছাদের উপর উঠে এল নাকি? চুরি ক'রে আরাম ভোগ পরিত্যাগ করতে হ'ল, গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।

কলকাতায় মামার বাড়ি চৌরঙ্গীতে ঠিক যাদুঘরের পিছনে। ছুটির আগে ওখানে যেতে সাহস পেলাম না। আমার সম্বন্ধে সন্দেহ-বাতিক লোকের লেগেই থাকে। অসময়ে বাড়ি ফিরলেই চার ধার থেকে প্রশ্ন শুরু হয়ে যাবে, ছুটির আগে এলি কেন? নিশ্চয় কোন দুষ্টুমি করেছিস, ইত্যাদি। অপর দিকে

ক্ষিদেয় নাড়ী ওলট-পালট খাচ্ছে। ভবানীপুরে নিজেদের বাড়ি যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত মনে হ'ল ; সেখানে আমার খোঁজখবর কেউ রাখে না।

খেলাতচন্দ্র স্কুল থেকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট মাইল তিন-চার হবে। অনেকটা পথ হেঁটেই পাড়ি দিতে হ'ল।

মাঝ-পথে গোরার সঙ্গে গণ্ডগোল না বাধলে এরূপটি হ'ত না। লোকটা ট্রামে যাকে পাচ্ছিল তারই উপর ছিপটি চালাচ্ছিল। ট্রাম ভর্তি লোক, একজনও কিছু বলে না। এগিয়ে গেলাম প্রতিবাদের জন্যে, এই সময় সাহেবের টাকার থলি থেকে টাকা প'ড়ে গেল, নীচু হয়ে কুড়ুনো শুরু করতেই পাশ থেকে ঝাপটে ধ'রে নাকের ডগা কামড়ে ধরলাম। আমার কীর্তি দেখে পাশের দুজন লোকও সাহেবকে চেপে ধরলে, এর ভিতর নাকের ডগা সাহেবের মুখ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার মুখের ভিতর চ'লে এসেছে, তার সঙ্গে চাঁদার মারও বেধড়কা চলেছে। নাক ফেলতেও পারি না, গেলাও যায় না। মুহূর্তে ব'সে প'ড়ে লোকগুলোর পায়ের তলা দিয়ে বেরিয়ে এসে ট্রাম থেকে নেমে পড়লাম, তখনও রক্তাক্ত মুখের ভিতর জ্যান্ত মানুষের নাক গাল ফুলিয়ে রেখেছে। দৌড়তে দৌড়তে মনে হ'ল, নাকটা স্পিরিটে রাখতে হ'লে পকেটে পুরে ফেলা ভাল। যাদুঘরের কাছাকাছি ঘটনাটি ঘটেছিল। মাঠের পাশে গাছের আড়ালে কাজটা সেরে ফেললাম। চলতি ট্রাম ইতিমধ্যে আমাকে ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা চ'লে গেছে। তবু সাবধানের মার নেই, কোঁচায় মুখ মুছে সদর স্ট্রীটে ঢুকে পড়লাম। তারপর এ-গলি সে-গলি ক'রে বাড়িমুখো পথ ধরলাম।

যখন বাড়ি এসে পৌঁছলাম, তখন বেলা পাঁচটার কাছাকাছি, আমার ঠাকুরদার আহারের সময়। রাত্রের ভোজন এই সময় তিনি সারতেন। সময়টি আমার ইষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে ব্রাহ্মমুহূর্ত। তাঁর আহার্য সব নীচের তলায় থাকত তাঁর নিজের হেঁসেলে। সেখানে চাকরবাকর তো দূরের কথা, সরকারী রাঁধুনী-বামুনদেরও ঢোকবার অধিকার ছিল না। পাচকের দল সংস্কৃত জানত না ব'লে ঠাকুরদা তাদের অব্রাহ্মণ বলতেন।

এ বাড়িতে কেউ 'বাছা রে' ব'লে খেতে দিতে আসবে না জানতাম, কারণ মা মামার বাড়িতে। ঠাকুরদা আমাকে কেওড়া-বাগদীর স্তরে ফেলে দিয়েছিলেন, কারণ ছিল যথেষ্ট, সাহেবী ম্লেচ্ছাহারে আমি আসক্ত ছিলাম, তাছাড়া

উপর দেহবর্ণ ছিল কালোর দিকে। পরিবারভুক্ত প্রায় সকলেই দুধে-আলতা-গোলা রঙ না হ'লেও, বেজায় ফরসা। ক্ষত্রিয়কুলে অনার্যের দেহবর্ণ আসায় ছোট জাতে নেমে গিয়েছিলাম। এই সুযোগে ঠাকুরদার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে নিই :—নাম, হরিপ্রসাদ রায় চৌধুরী, প্রায় আশি বৎসরের পুরাতন মানুষ; জমিদারি ছিল প্রধান পেশা, দ্বিতীয় পাণ্ডিত্যের প্রচার, আধ্যাত্মিক জ্ঞান-বিতরণের আড়ালে আত্মবিজ্ঞপ্তি। আশির ঘরে পা দিলেও একটিও দাঁত পড়ে নি, মাথায় চুল কাঁচায় পাকায়। ঝাড়া ছ ফুট সাড়ে তিন ইঞ্চি লম্ব ছিলেন, মাপের জুতো বাজারে কিনতে পাওয়া যেত না।

ভবানীপুরে তিনি একজন নামজাদা ব্যক্তি। খেলাতচন্দ্র স্কুলের হেডমাস্টার অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত মানুষ। হেডমাস্টার মশাই কেবল ছেলে পড়িয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন, ঠাকুরদা মাস্টার পড়িয়ে ছাড়তেন। দার্শনিক কূটতত্ত্বের বিচারের জন্য বিখ্যাত পণ্ডিতদের তাঁর দ্বারস্থ হতে দেখেছি। এদিক দিয়েও আমি দাদার চক্ষুশূল ছিলাম, সংস্কৃত না জানার জন্য। শুধু আমি নই, চাকর-বাকরদেরও অনেক সময় তিরস্কৃত হতে দেখেছি, মোট কথা পাণ্ডিত্যের বোঝা তাঁর উপর ভর করেছিল, নিজের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে খেয়াল রাখার অবসর পেতেন না।

এইবার কাজের কথায় নামি। ক্ষিধের কথা। বাড়ি ঢুকে বিপদসঙ্কুল কেন্দ্র-গুলি নিরাপদ ব'লেই মনে হ'ল। সোজা চ'লে গেলাম ঠাকুরদার খাস হেঁসেলের দিকে, পথ খোলা, কেউ কোথাও নেই। যথাস্থানে পৌঁছে দেখি, বড় হালুইয়ের চ্যাপটা কড়াইতে একরাশ সদ্য-প্রস্তুত ক্ষীরের পানতুয়া রাখা আছে। উনুনের পাশেই মিষ্টি তোলার বৃহৎ হাতা, তুলে নিলাম এক হাতা। ব্যস্ততায় কতক-গুলো উনানের ভিতর প'ড়ে গেল। বেজায় গরম খাদ্য, মুখে পোরা যায় না কলতলায় গেলাম ঠাণ্ডা ক'রে নেবার জন্যে। তখন আস্বাদের কথা ভুলেছি কোন প্রকারে কিছু ভিতরে পুরে দেওয়াই প্রধান কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রথায় এক হাতা, দু হাতা, তিন হাতা ক'রে কড়াইয়ের ভার কমতে লাগল পোড়া ক্ষীর যে বেতারে এস. ও. এস.-এর বার্তা পাঠাতে পারে—এ কথা একবারও মনে আসে নি। কথায় বলে, যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়। দুর্ভাগ্য পিছু নিয়েছিল, এস. ও. এস. ফলপ্রদ হয়ে উঠল।

আমি যখন কলে পানতুয়া ঠাণ্ডা করছি, সেই সময় পিসীমা হেঁসেলে ঢুকে

চীৎকার ক'রে উঠলেন, সব গেল, বাবুজীর পানতুয়া সব কে তুলে নিয়েছে! পরক্ষণেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন চোর ধরতে, আমাকে বামাল সমেত সামনেই পাওয়া গেল। আমাকে দেখেই বললেন, এ যে দেবী! এমন স্নেহপূর্ণ আহ্বান জীবনে কখনও শুনি নি, কথাটা শেষ ক'রেই রাইট অ্যাবাউট টার্নের সঙ্গে কুইক মার্চের অনুকরণে ঠাকুরদাকে খবর দিতে চ'লে গেলেন।

ব্যাপার গুরুতর হয়ে উঠল, স'রে পড়াই তখন ঘটনাটিকে লঘু করার একমাত্র পথ। বাকি পানতুয়াগুলো গলাধঃকরণ ক'রে এগুতে লাগলাম বাইরের দিকে। খুড়ীমার ঘর, পড়বার ঘর পার হয়ে, সিঁড়ি-বারান্দায় আসতেই শুনলাম, উপর থেকে ঠাকুরদা হুকুম দিচ্ছেন, উসকো পাকড় লে আও। থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম, দপ ক'রে মাথায় আগুন জ্ব'লে উঠল, চাকরে আমার গায়ে হাত দেবে! ফিরে গেলাম সরকারী হেঁসেলের দিকে। হেঁসেলের রোয়াকে রাশ রাশ চেলাকাঠ চারটি বৃহৎ উনুনের রসদ যোগাবার জন্য সাজানো থাকত। একটি মোটা কাঠ বেছে নিয়ে ফিরে এলাম বারান্দায়। এই সময় হুকুম তামিলের জন্য, দাদার খাস খানসামার দল লাইনবন্দী হয়ে নীচে নামতে শুরু করেছে। কাছাকাছি এসে পড়তেই কাঠ তুলে জানিয়ে দিলাম, আর এক পা এগুলেই মাথা ফাটবে।

এসব বিষয়ে আমি যে সত্যবদ্ধ মানুষ, তা পুরাতন ভৃত্যেরা জানত। শেষ বয়সে অঙ্গহানি করার মত প্রভুভক্তি তাদের ছিল না, পিছিয়ে পড়ল। দুটি নতুন-বাহাল ছোকরা সাহস দেখানোর লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। তাদের স্ফীত বক্ষ দেখে কর্তব্য স্থির ক'রে ফেললাম, সময় থাকতে কাউকেও কাবু না করতে পারলে চাকরের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে হবে, এটা বাড়াবাড়ি। মুনিব ও নফরে তখনকার দিনে এইরূপ ঘনিষ্ঠতার প্রচলন ছিল না। সামনের ছোকরা এগিয়ে আসতে তার কব্জির উপর এক ঘা চালালাম। সঙ্গে সঙ্গে তার গতি থেমে গেল। এমন একটি দৃষ্টান্ত চোখের সামনে দেখেও পিছনের দ্বিতীয় ছোকরার বেপরোয়া ভাব কাটে নি। তাকে আর নামতে দিলাম না, নিজেই এগিয়ে গিয়ে তার মাথার উপরই দিলাম বাকি কর্তব্যের সমাধা ক'রে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল, কপাল চোখ নাক রক্তে চুপচুপে হয়ে উঠল। বাড়িতে তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। লোক ছুটল বাবুজীকে খবর দিতে।

তাঁকে রাত আটটার আগে যে পাওয়া যাবে না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত

ছিলাম। মামার সঙ্গে রেসে গিয়েছিলেন, রেসে হার-জিত যাই হোক, বাড়ি ফিরে যে তর্ক চলবে, তাতে দশটা এগারোটা কাবার হয়ে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ইতিমধ্যে খেয়ে নিয়ে বিছানায় ঢুকে পড়তে পারলে রাতটা অন্তত নির্বিঘ্নে কেটে যাবে। কালকের কথা কাল। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মাথা ঘামানো আমার ধর্মের বাইরে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ার জন্যে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় দেখি, উপর থেকে স্বয়ং পিসীমা নেমে আসছেন—করালমূর্তি, মাঝপথ থেকেই হুকুম দিলেন, দাঁড়া। কি উদ্দেশ্যে দাঁড়াতে বললেন, বোঝা গেল না; নীচে এসেই খপ ক'রে আমার হাত ধ'রে পড়ার ঘরের দিকে টানতে লাগলেন। পিসীমার উপর চেলাকাঠ চালানো যায় না, পিছু নিতে হ'ল। ঘরের ভিতর ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ ক'রে দিলেন। তার পর বাইরে গোখরো সাপের ছোবল-মারার মত আওয়াজ উঠতে লাগল। জানলার কাছে এসে দেখি, পিসীমা জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছেন। কাজ হাঁসিলের খবর ঠাকুরদাকে জানানো দরকার ছিল, হাঁপানি সত্ত্বেও উপরে উঠে গেলেন।

ঘরে তখন আলো-আঁধারি জমকে বসেছে। দাঁড়িয়ে ছিলাম জানলার পাশে। ভাবতে লাগলাম, এত দেরিতেও বাড়ি না ফিরলে, বাবুজী যে কাজেই থাকুন অস্থির হয়ে উঠবেন, চারধারে লোক ছোটাবেন আমাকে খুঁজতে, হয়তো নিজেও বেরিয়ে পড়তে পারেন। বাবুজীর উৎকণ্ঠিত মুখ চোখের সামনে দেখছিলাম। যে কোন প্রকারে হোক, এখান থেকে বেরুনো দরকার। দেড় ইঞ্চি গোল লোহার গরাদে চাড় দিতে লাগলাম, তিন চার বার চেষ্টা করতেই গরাদ বেঁকে গেল, পথ খোলা, বেরিয়ে পড়লাম রাস্তার দিকে। ঠিক সময়মত মামার বাড়িতে পৌঁছতে না পারলেও রাত্রের মত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ক'রে নিতে পেরেছিলাম।

পরের দিন সকালেই বাবুজী আমাকে ডেকে পাঠালেন। সামনে এসে দাঁড়াতেই জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়িতে কি কাণ্ড ক'রে এসেছিস? কাজ নেই, কর্ম নেই, একটা মানুষের মাথা ফাটিয়ে দিলি? কথাটা শেষ হবার আগেই দেখলাম, খেলাত স্কুলের ছাপ-মারা খাম বাবুজীর হাতে। ওর ভিতর কি থাকতে পারে অনুমান করা শক্ত নয়, বিপদের উপর বিপদ ঘনিয়ে উঠছিল। একটা যা হোক কিছু হয়ে গেলে বাঁচি, বাবুজী চিঠিটা মোচড়াতে মোচড়াতে

ধীরে ধীরে বললেন, এ রকম ছেলে বাঁচার চেয়ে মরা ভাল, তোমার লেখাপড়াও আর চলবে না, স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

বিপদের পিছনে এইরূপ একটি আশীর্বাণী লুকিয়ে ছিল, জানতাম না, আনন্দের উচ্ছ্বাসে আপন মনে বলেছিলাম, ভালই হয়েছে। বাবুজী কথাটা শুনলেন, তারপর আমাকে একলা ফেলে চ'লে গেলেন।

দশ-বারো দিন কথা বন্ধ, বাবুজী ভুলেও আমাকে কাছে ডাকেন না। বেশি দিন এইরূপ ব্যবহার সহ্য করতে পারলাম না, অন্য কোন স্কুলে ভর্তি ক'রে দেবার জন্যে নিজেই আবেদন জানালাম। ভদ্রলোকের মান রক্ষা হ'ল, ছেলের সুমতি দেখে বাবুজী হৃষ্টচিত্ত হয়ে উঠলেন।

ভবানীপুরে সাউথ সুবারবান স্কুলে ভর্তি হলাম। কড়কড়ে নতুন বই পেয়ে বাস্তবিক পড়াশুনার ঝোঁক চেপে গেল। ইতিহাস ও ইংরেজীতে ভাল ছেলেদের সঙ্গে টক্কর চলল, কিন্তু অঙ্কের মাস্টার আমাকে কুনজরে দেখেছিলেন, কিছুতেই শূন্যের বেশি দিতেন না। ভিন্ন ক্লাসে পরীক্ষক বদলাল, কিন্তু শূন্য আমার কপালে ঠিক টিকে গেল। প্রতি বৎসর অঙ্কে ফেল মারতাম, তথাপি ক্লাস-প্রোমোশন জুটে যেত অন্য বিষয় ভাল করতাম ব'লে।

শেষ পর্যন্ত ক্লাসে ওঠা বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়াল। পড়ার আর শেষ নেই। ঘণ্টা ও সেকেণ্ড ধ'রে জ্ঞান-চর্চায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। স্কুল-পালানো অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছিলাম, পুনরায় নেশা ফিরে আসতে লাগল। সৎ উদ্দেশ্যে সুযোগ যেন আমার জন্যে ওত পেতে থাকত। স্কুলের পিছনেই প'ড়ো বাগানে কাজ খুঁজে পেলাম। মজার জায়গা, চারধারে ফল-ভর্তি টোপাকুলের গাছ, তাদেরই ছায়ায় ছোট্ট একটি ডোবা। কুল খাওয়া, মাছ ধরা এবং হেলে সাপ আছড়ে মারা,—দিন কতক আরামে চলল। কিন্তু একই স্থানে আটক পড়ায় মন উসখুস করতে লাগল নতুন কাজের জন্য।

স্থান পরিবর্তনের সুবিধা পেলাম, সার্কাস পার্টিতে। গৃহস্থ চালের ব্যাপার, চার আনার বেশি টিকিটের দাম নেই। অধিকারীর সঙ্গে দেখা ক'রে জানালাম, আমি সাইকেলের খেলা দেখাতে পারি। পরীক্ষায় পাস হতে ক্লাউনের খেলা দেখাবার ভার পেলাম, মাইনে ভালই, মাসে তিরিশ টাকা। সার্কাসে খেলা দেখিয়ে যখন নাম কিনছি, বাহবার তাড়ায় বুক ফুলিয়ে চলি, তখন ক্লাসের স্পেশাল বেঞ্চে আমার অনুপস্থিতির সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। ক্লাউনের খেলায়

একদিন ধরা প'ড়ে গেলাম। ক্লাসময় র'টে গেল, আমি সার্কাস করি। তারপরই পাসের চাহিদা এমনই বেড়ে উঠল যে, শেষ পর্যন্ত নাজেহাল হয়ে সার্কাস ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম।

স্কুলে ফিরে আসা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। একদিন তর্কের মাঝে কে একজন ব'লে বসল, ভারি তো বুক ফুলিয়ে চলিস, অপ্‌শনাল ক্লাসের দরজা ভাঙতে পারিস? সকলেই জানত, গায়ের জোর বা সাহস দেখানোর সুবিধা পেলে সহজে পিছপাও হতাম না। আসল কথা, কোণের বেঞ্চি আমার অভাবে ঝিমিয়ে এসেছিল, একটা নতুন কিছু না হ'লে চলছিল না।

ঠিক হয়ে গেল, তিনতলার জ্ঞান মাস্টারের ঘর হাঁ করিয়ে রাখতে হবে। তিনি আবার দরজা বন্ধ ক'রে ছেলে পড়াতেন। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে এমন একটি সম্মোহন-শক্তি ছিল যে, ভাল পড়ুয়ারাও কাট-ছাঁট টীকার সংস্কৃতিতে আসক্ত হয়ে পড়ত। জ্ঞানবাবুর ক্লাসের ছেলেরা যে কখনও ফেল করে না, এ খ্যাতি সর্বজ্ঞাত। এমনই একটি জাঁদরেল মাস্টারের ক্লাসে ডাকাতির ভার পড়ল আমার উপর।

টিফিনের ঘণ্টা পড়তেই সদলবলে উপরে উঠে গেলাম। মহড়ায় মহড়ায় ঘাঁটি আগলাবার জন্যে বিশ্বস্ত ছেলেরা দাঁড়িয়ে গেল, কিছুমাত্র বিপদের সম্ভাবনা থাকলেই হাত-ফিরতি খবর কাজের জায়গায় এসে পৌঁছবে।

মোটা কব্জাওয়ালা প্রকাণ্ড দরজা, কুস্তির প্যাঁচে ধ'রে পায়ে ঠেকার ওপর চাড় দিতে লাগলাম। অল্পক্ষণের ভিতরই ফল পাওয়া গেল, বুক চিতিয়ে পিছনের ভক্তদের দিকে ফিরতে দেখি, কেউ কোথাও নেই। বুঝলাম, বিপদ বিনা-নোটিসে কাছে এসে পড়েছে, কোন দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে নীচে নেমে আসছিলাম। মাঝপথে সাক্ষাৎ যম শ্যামবাবুর (সহকারী প্রধান-শিক্ষক) সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগে যাবার যোগাড়। টিফিনের সময় মাস্টারও আরাম করে, শ্যামবাবু বেরুলেন রোঁদে। আমার চলার ভঙ্গীতে নিশ্চয় সন্দেহজনক কিছু ছিল, জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন, এই রকম ক'রে নামছ কেন? ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলাম, উত্তরটা গুছিয়ে দিতে পারলাম না, ব'লে ফেললাম, এই রকম ক'রেই তো নাবি। আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে তখনকার মত ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু ঠিক বুঝলাম, ও-ছাড়া ছাড়াই নয়, চাহনির ভিতর কি একটা অভিসন্ধি র'য়ে গিয়েছে।

টিফিনের ঘণ্টা শেষ হতেই দেখি, অঙ্কশাস্ত্রের বিখ্যাত মাস্টার শ্যাম বোস আমাদের সংস্কৃত ক্লাসে ঢুকছেন। জ্ঞানবাবু হ'লে ট্রেসপাসের নালিশ ঠুকে দিতেন, আমাদের পণ্ডিত মশাই বেজায় নিরীহ ব্যক্তি, মঞ্চ থেকে নেমে এসে কাঁচুমাচু ক'রে দাঁড়ালেন। যেন তিনিই একটা কিছু দোষ ক'রে ফেলেছেন। শ্যামবাবু ধীর পদবিক্ষেপে সোজা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। সামনে এসেই জিজ্ঞাসা করলেন, হিস্ট্রির ক্লাসের দরজা ভাঙল কে? অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম, খবরটি যেন এমনই অসম্ভব যে, স্বচক্ষে দেখলেও বিশ্বাস করবার উপায় নেই। শ্যামবাবু উচ্চাঙ্গের অভিনয়ে ভোলবার পাত্র নন। একটি জবরদস্ত 'হুঁ' শব্দ উচ্চারণ ক'রে আমাকে লাইব্রেরিতে আসতে বললেন।

লাইব্রেরিতে মাস্টাররা গিজ্‌গিজ করছেন। এই ঘণ্টায় ছেলেরা আবার বই নিতে আসে। সকলের সামনেই শ্যামবাবু বেয়ারাকে বেত নিয়ে আসতে বললেন।

খোকার দলে ফেলার মত বয়স তখন আমার ছিল না। ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ি। ভিড়ের মাঝে শাসনের ব্যবস্থায় শ্যামবাবুকে অভদ্র ভাবতে কিছুমাত্র দ্বিধা এল না।

বেত হাতে আসতেই দেখি, তাঁর মুখের রেখাগুলো ক্ষণিকের মধ্যে কুমীরের চামড়ার মত হয়ে গেল। আমাকে কোন প্রশ্ন না ক'রেই হাত পাততে বললেন। বিনা আপত্তিতে আজ্ঞা পালন করলাম। বেত কশানোকে শ্যামবাবু ফাইন আর্টের পর্যায়ে তুলে ফেলেছিলেন, সাহেবী চালে ওস্তাদ মুষ্টিযোদ্ধার মত মুহূর্তে চার-পাঁচ ঘা একই জায়গায় বসিয়ে দিলেন। তারপর জানালেন, ওই দরজা তুই ছাড়া স্কুলে আর কেউ ভাঙতে পারে না। শাস্তিদানের এইরূপ কৌশল মিডিভ্যাল যুগেও প্রচলন ছিল কিনা সন্দেহ। ওস্তাদী মারের কেরামতিতে হাতের তালু কেটে গিয়েছে, রক্তের ধারায় মেঝে লাল হয়ে উঠেছে, আমি স্থির হয়ে হাত পেতেই দাঁড়িয়ে আছি। কিছুমাত্র কাতরধ্বনি না শুনে শ্যামবাবুও কেমনতর হয়ে গিয়েছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আর মারবেন? ভদ্রলোক আমার কথা শুনে বিচলিত হয়ে পড়লেন। আস্তে 'না' ব'লে, বেয়ারাকে ফার্স্ট এডের সরঞ্জাম আনতে বললেন। মহান কৃপা ভোগ করার প্রয়োজন ছিল না, তাঁর আদেশের উপর রীতিমত গলা চড়িয়ে

বেয়ারাকে হুকুম করলাম, আমার বইগুলো ওপর থেকে নিয়ে আসবার জন্যে। বকশিশখোর বেয়ারা কার আদেশ পালন করবে, ঠিক করতে পারছিল না; হতভম্বের মত হয়ে গিয়েছিল। কথা না শুনলে হাড়গোড় ভেঙে দেওয়া যে আমার অভ্যাস আছে, সে খবর সে রাখত।

লাইব্রেরিতে সকলে তখন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে। শ্যামবাবুর আদেশের ওপর হুকুম চালনায় অশুভ ঘটনার আশঙ্কায় সকলেই আতঙ্কিত। শ্যামবাবু তখন ঊর্ধ্বলোক থেকে নেমে এসেছেন, সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন, বড্ড লেগেছে? হেসে উত্তর দিলাম, আপনার কৃপায় কয়েদখানা থেকে অব্যাহতি পেলাম। আর বেশি কিছু বলবার ছিল না, নমস্কার ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

ক্রমশ

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

শক্তি প্রার্থনা

অন্ত নাহিক—নাহিক অন্ত যন্ত্রণার,
দুর্বহ লাগে অতি অথর্ব জীবন-ভার,
জবাব চাহিছে আমার নিকট লক্ষ দিন,
দিনে দিনে বাড়ে অতি দুর্বহ অন্নঋণ।
ক্লেদশয্যায় লজ্জিত হয় জীবনবোধ,
সমস্ত ঋণ করিতে হইবে—হইবে শোধ।
অক্ষি খুলিতে আজিকে সাহস নাহি, যে হয়,
অপকীর্তির স্বাক্ষর লেখা বিশ্বময়।
ম'রে যেতে চায় জীবনানন্দ ছন্দময়,
লক্ষ লোকের দীর্ঘশ্বাস মোর মলয়।
চিত্তে চেতনা চাবুক চালায় বারংবার,
জ'মে ওঠে গ্লানি নিত্য আত্মবঞ্চনার,
লক্ষ্যবিহীন লাগিছে চিত্তে লক্ষ ভাব—
প্রতি মুহূর্ত করিছে তিক্ত বিষস্রাব।
বুকে এসে বাজে ব্যঙ্গমুখর বিশ্বলোক,

বলে, এ ক্লিন্ন ছলনা কুয়াশা ছিন্ন হোক।
অসাড় সত্তা নীরবে মানিছে এ পরাজয়,
শম্বুক সম চাহে যে হইতে সে অক্ষয়।
হে উদ্দীপ্ত রক্তনেত্র বজ্রধর,
কাঙালের মত প্রার্থনা করি শক্তি দাও
যৌবন মোরে লাঞ্ছনা করে নিরন্তর
অতি নির্মম বিদ্রূপ করে জীবনটাও।
ধ্বস্তচেতন ভীরু দুর্বল সত্তা মোর,
কিছুতে ভাঙিতে পারে না মিথ্যা কুয়াশা-ডোর,
রুদ্ধ গুহায় ফুঁসিছে চিত্ত ক্ষুব্ধকাম
অশ্রু-আসার হতেছে নিত্য অবিশ্রাম।
উৎকেন্দ্রিত হতে পারি সেই শক্তি কই?
আত্মরতির গ্লানি হতে মোর মুক্তি কই?
সত্য বরণ করিতে চিত্তে জাগিছে ত্রাস,
ক্লৈব্য করাল করেছে কঠিন সর্বনাশ,
হর্ষ আকুল হাওয়ায় স্বর্ণশীর্ষ দিন
তমিস্রলোকে শূন্যগর্ভে হয়েছে লীন।
গজমতি লোক ভেঙেছে মিনার ধসেছে আজ,
ব্যাজস্তুতির সুরে হাওয়া বয় বিশ্বমাঝ।
কান্না, কান্না, তার তরে শুধু কান্না হায়,
ভেঙে পড়ে মন অন্তবিহীন যন্ত্রণায়।
হে উদ্দীপ্ত রক্তনেত্র বজ্রধর,
বারে বারে শুধু প্রার্থনা করি শক্তি দাও,
যৌবন মোরে লাঞ্ছনা করে নিরন্তর,
আমায় এবার সত্যসন্ধ মুক্তি দাও।
সহে নাকো আর নিত্য আত্মসঙ্কোচন,
কণায় কণায় জাগাও চণ্ড বিস্ফোরণ,
চুরমার কর কুয়াশাগ্লানির অন্ধকার,
সাহসে সমুখে দাঁড়াইতে পারি প্রাপ্যটার।

তা যদি না পারি তা হ'লে আমায় মৃত্যু দাও—
চরম মৃত্যু—পরম মৃত্যু—চিহ্নহীন।
সত্তারে মোর শূন্য মূল্যে কিনিয়া নাও,
পরশ আমার নাহি বয় যেন আগামী দিন।
নিদারুণ ভয় করিতেছে গ্রাস আজ আমায়,
ভেঙে পড়ে মন প্রচণ্ড এই প্রার্থনায়।
তবুও আমার তবুও আজিকে সত্য চাই
রজ্জুর মত ধরিয়াছে চিপে বিশ্বটাই।
হায় রে! কি লাভ হৃদয়বিলাসী প্রার্থনায়,
সান্ত্বনা খোঁজা সুলভ আত্মবঞ্চনায়!
নিষ্ঠুর হয়ে আজি উল্লাসে সত্যটাই—
বক্ষে আমার নাই নাই হায় শক্তি নাই।
তাই বার বার প্রার্থনা করি বজ্রধর,
আমারে তোমার দারুণ দহন-বজ্র দাও,
ভেঙে ফেলি এই নগ্ন লোভের সূত্র সব
নয় ভেঙে দিই অর্থবিহীন জীবনটাও।

অসিতকুমার

ডানা

(৪০০ পৃষ্ঠার পর)

ডানা বললে, আমার আর কিছু বলবার নেই তা হ'লে। আপনাদের এই অকৃত্রিম ভদ্রতার মূল্য দিতে যাওয়া বর্বরতা, কিন্তু কি ক'রে যে এর প্রতিদান দেব বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ ডানা থেমে গেল। তার নীচের ঠোঁট দুটো ঈষৎ কেঁপে উঠল যেন। কিন্তু তা এত ঈষৎ যে, কারও চোখে পড়ল না।

কবি এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন। জীবনটা যে স্বপ্ন, যা দেখছি সবই মায়া—এ ধরনের কোনও বৈদান্তিক চিন্তাকে আঁকড়ে ধ'রে তিনি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছিলেন না। মর্মান্তিক দুঃখটাকেই তিনি উপভোগ করবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল—

মলয় হাওয়া চলিয়া গেল
আসিল ছুটে আঁধি
তবু যে লাগে ভালো,
তোমারি তরে বিজন ঘরে
বসিয়া একা কাঁদি
জ্বালি আশার আলো।
কাননে পথে মেতেছে ঝড় কি গরজন তুলি
শিহরি ভাবি বুকেতে যারে ধরিয়াছিল ধূলি
মুছিয়া গেল বুঝি রে সেই চরণরেখাগুলি
ঘনাল ঘন কালো,
তবুও লাগে ভালো।

ডানা থেমে যেতেই তাঁর ঘোরটা কেটে গেল যেন সহসা। ডানার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, আপনি স্কুলে যে চাকরি নেবেন কথা হচ্ছিল, তার কি হ'ল ?

সেটা না নেওয়াই ঠিক করলাম। মাস্টারি তো কখনও করি নি, ও আমি পারব না।

বিবর্ণমুখে কবি উত্তর দিলেন, ও। যা বলছেন তা এক হিসেবে অবশ্য ঠিক, কিন্তু আবার আরম্ভ করলে দেখতেন হয়তো অন্যরকম।

ও আমার ভালও লাগে না।

চলুন, আমরা ভিতরে যাই।—রত্নপ্রভা ডানার দিকে চেয়ে বললেন। তারপর কবির দিকে ফিরে বললেন, আপনাদের আরও চা চাই নিশ্চয় ?

বৈজ্ঞানিক বই খুঁজতে খুঁজতে বললেন, চা নয়, কফি।

আচ্ছা।

ডানাকে সঙ্গে নিয়ে রত্নপ্রভা ভিতরে চ'লে গেলেন।

বৈজ্ঞানিক একটা পাতলা গোছের বই শেল্‌ফ থেকে বার ক'রে সেটার ধূলো ঝাড়লেন।

টার্নবুলের বইখানা পেয়েছি। পাখির গান আর ভাষা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন ভদ্রলোক। পাখিরা কেন গান গায়, তার কারণ নির্ণয়

করবার চেষ্টাও করেছেন। তাঁর মতে বসন্তঋতুই পাখিদের গান গাইবার একটা প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় দিয়েছেন প্রণয়লীলা—মানে, Nuptial Display।

তাড়াতাড়ি বইটার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

এই যে, তৃতীয় কারণ দিচ্ছেন Rivalry—মানে, প্রতিযোগিতা; Defiance, অর্থাৎ যুদ্ধং দেহি ভাব এবং Assertion of Rights—মানে, নিজের অধিকার জাহির করা। আর চতুর্থ কারণ হচ্ছে, Joy and high spirits—মানে, আনন্দ ফূর্তি। আমরা এখনই যে দোয়েলটাকে লক্ষ্য করলাম, এর সবগুলোই তার মধ্যে পাওয়া গেল, কি বলেন? কিন্তু দাঁড়ান—

আবার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

এই যে।

কি?

পাখির ডাককে ইনি বারো দফায় ভাগ করেছেন। দেখা যাক, দোয়েলের মধ্যে সবগুলো পাওয়া যাচ্ছে কি না। Song Proper—মানে, রীতিমত গান, শুনেছি; Little Song—মানে, ছোটখাট গান, শুনেছি; Phrases—মানে এমনই ডাক, শুনেছি; Chirrups, নিজেদের মধ্যে আলাপ, শুনি নি; Call Notes—আহ্বান, শুনি নি; Flight Notes—মানে ওড়বার ডাক, শুনি নি; Alarm Notes—ভয়ের ডাক, শুনি নি; Love Notes—প্রণয়-সম্ভাষণ, শুনেছি; Imprecations—অভিশাপ, শুনেছি; Cradle Notes—বাচ্চাদের সঙ্গে ওরা যে সব কথা বলে, শুনি নি; Grief Notes—ব্যথা পেলে যে ভাবে ডাকে, বোধ হয় শুনি নি। Drumming of woodpecker—এ অবশ্য আলাদা জিনিস—

কবি যদিও মনমরা হয়ে পড়েছিলেন একটু, তবু জিজ্ঞেস করলেন, এত রকম ডাক আছে? একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলুন তো। প্রথমটা কি হ'ল?

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন বৈজ্ঞানিক।

প্রথমটা হ'ল Song Proper—মানে, পুরোদস্তুর পাবলিক গান। দোয়েল যে গানটা কোনও উঁচু ডালে ব'সে একটানা গেয়ে যায়, তার ইচ্ছেটা, যেন সবাই এ গান শুনুক। Little Song হচ্ছে ওরই ছোট সংস্করণ। আর Chirrups হচ্ছে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, চড়ুই বা ছাতারে যা ক্রমাগত করছে।

দোয়েলের মধ্যে সেটা লক্ষ্য করি নি কখনও। দোয়েল গম্ভীর পাখি, বাজে বকবক করতে শুনি নি। Phrases—মানে, এমনই একটানা ডাক, কাক যেমন কা-কা করে বা ঘুঘু যেমন একটানা ডেকে যায়, দোয়েলের শিসটা এই ধরনের বলতে পারেন। Call Notes হচ্ছে যখন একটা পাখি আর একটা পাখিকে ডাকে কিংবা একদল পাখি যখন আর একদল পাখিকে ডাকে, তখন সেই ডাককে Call Note বলে। একদল বক বা হাঁস যখন উড়ে যায়, দেখবেন, একটা বা দুটো ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে। দোয়েলের শিসটাকে Call Noteও বলা যেতে পারে। শিস দিয়ে অনেক সময় সঙ্গিনীকে ডাকে ওরা, আলাদা কোনও Call Note শুনেছি ব'লে তো মনে হয় না Flight Notes হচ্ছে ঠিক ওড়বার সময় অনেক পাখি একটা ডাক দিয়ে তবে ওড়ে। শালিক পিং ক'রে একটা শব্দ করে, কোকিল খুব তাড়াতাড়ি কু-কু-কু-কু ক'রে উড়ে যায়। দোয়েল নিঃশব্দে ওড়ে, ওর Flight Note শুনি নি, Alarm Noteও শুনি নি। ভয় পেলে কিংবা উত্তেজিত হ'লে Alarm Note শোনা যায়। সাপ বা বেড়াল দেখলে শালিকরা যে ভাবে ডাকে, তাই হচ্ছে Alarm Note। Love Notes মানে ভালবাসার ডাক; দোয়েলের Love Notes ভারি মিষ্টি। শোনাব একদিন আপনাকে। Imprecation হচ্ছে গালাগালি, ফিঙের মুখে প্রায় শুনবেন। দোয়েলরা একটা মৃদু কের্‌র্‌র্ গোছের শব্দ করে। Cradle Notes, শালিক-চড়ুইয়ের শোনা যায়, যখন তারা বাচ্চাদের খাওয়ায়। দোয়েলের শুনি নি, এবার শুনতে হবে, বুঝলেন। আমার গোয়াল আর আস্তাবলের কার্নিসে ওরা বোধ হয় বাসা করবে, তখন শোনা যাবে। Grief Notes দোয়েলের কখনও শুনি নি, তবে শীতের সময় ওরা যে করুণ ডাক ডাকে, তাকে Grief Notes বলা যায়। সাধারণত কষ্ট পেলেই—

মুন্সিকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল।

হুজুর, পাখিগুলো বড্ড বেশি ডাকছে আজ সকাল থেকে।

তাই না কি! খেতে দিয়েছিলি তো?

হাঁ হুজুর। খাবার তো আজকাল কষ্ট নেই। মল্লিকবাবু আজকাল রোজ অনেক ফড়িং পাঠিয়ে দেন।

কবি জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ পাখিগুলো?

সেই রেডস্টার্টগুলো, যাদের নাম দিয়েছেন আপনি ফুলকি। এই

সময় ওরা ফিরে যায় কিনা, তাই ছটফট করছে বোধ হয়। চলুন, দেখি গিয়ে।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কফির সরঞ্জাম নিয়ে একজন চাকর এসে হাজির হ'ল।

কফিটা খেয়েই যাওয়া যাক তা হ'লে, কি বলেন? মুন্সি, তুই এগো, আমরা আসছি।

কবির কিছুই ভাল লাগছিল না। যন্ত্রচালিতবৎ তিনি কফির একটা পেয়ালা তুলে নিলেন।

বৈজ্ঞানিক কফি খেতে খেতে আড়চোখে কবির দিকে একবার চেয়ে দুষ্টু ছেলের মত একটু হেসে বললেন, আজ কিন্তু আবার এমন একটা কাজ করতে হবে, যা হয়তো আপনার মনঃপূত হবে না ঠিক।

কি?

আরও কয়েকটা রেডস্টার্ট ডিসেক্‌ট করতে হবে। দেখতে হবে, ওদের ওভারি (ovary) আর টেস্‌টিস্‌(testes)গুলোর অবস্থা কি এখন।

কবি কফিতে চুমুক লাগিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলা হ'ল না, রত্নপ্রভা এসে পড়লেন। রত্নপ্রভা এসে এমন একটা কথা বললেন, যা অপ্রত্যাশিত, যা শোনামাত্র কবির অসাড় মন সজাগ হয়ে উঠল নিমেষে।

রত্নপ্রভা বললেন, আচ্ছা, তুমি তো একজন প্রাইভেট সেক্রেটারির জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছ, তোমার ডিক্‌টেশন নেবার জন্যে, তোমার প্রবন্ধ টাইপ করবার জন্যে। এঁকেই সেই কাজটা দাও না। উনি বি. এ. পাস, শর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং জানেন। উনি মাস্টারি করতে চান না, এই ধরনের কাজ খুঁজতেই উনি কলকাতা যাচ্ছেন।

বেশ তো। উনি যদি থাকতে রাজী হন, আমার কিছু আপত্তি নেই।

উনি রাজী আছেন। তবে উনি আলাদা থাকতে চাইছেন, এক বাড়িতে থাকতে একটু ইতস্তত করছেন। রত্নপ্রভার গম্ভীর মুখে একটা হাসির আভা ফুটে উঠল।

যেখানে আছেন, সেখানেই থাকতে পারেন। আমার কাজের সময় পেলেই হ'ল।

অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে কবি ব'লে উঠলেন, সে তো চমৎকার হবে।

চলুন, রেডস্টার্টগুলো দেখি গিয়ে. ডাকছে কেন! বেরিয়ে পড়লেন। কবি সোৎসাহে বললেন, দেখুন, যদিও প্রথম প্রথম আপনার ওই ডিসেকশন ব্যাপারটায় আমার খুব খারাপ লাগত, এখন কিন্তু ভেবে দেখছি, ও রকম খারাপ লাগার কোনও মানে নেই। যা কর্ত্তব্য তা করতে হবে।

খারাপ-লাগা ভাল-লাগাটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। প্রথম প্রথম আমারও খারাপ লাগত, এখন কিন্তু বেশ লাগে।

ঠিক।

দুজনে হন হন ক'রে অগ্রসর হতে লাগলেন।

ক্রমশ

"বনফুল"

রোগ

কানাকড়ি দাম নেই, এ জীবন তবু ভাল লাগে,
সমুদ্র ক্ষয়ে না মধু, মধু নয় পৃথিবীর ধূলি,
অমৃতের পুত্রদের শিয়রে অমোঘ মৃত্যু জাগে,
সব জানি, তবু আমি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সব ভুলি।

সত্যকে দেখি নি চোখে, যে দেখেছে দেখি নাই তাকে—
দর্শনের কাঁটাতার জীবনের ফুলের বাগানে;
দ্বারপাল ঋষিবৃন্দ পাহারায় পালা ক'রে হাঁকে,
'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।'

অনেক সুন্দর মুখ আর্ষবাক্যে হয়েছে পাষাণ,
অনেক প্রাণের তৃষ্ণা শেষ হ'ল মৃগতৃষ্ণিকায়;
জীবনের মাঝে আছে জীবনের মুস্কিল আসান,
কী আশায় ঊর্দ্ধ্ববাহু মহর্ষিরা আকাশে তাকায়।

সাগরে জঙ্গলে রবে পৃথিবীর পুত্রেরা—মানুষ
অনন্তের অন্ধকারে ফেটে যাবে নিষ্ফল ফানুষ।

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

আবোল-তাবোল

শুষ্কং কাষ্ঠং

মহারাজ বিক্রমাদিত্য নগরভ্রমণে বেরিয়েছেন। সঙ্গে ছিলেন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রবীণ কবি বররুচি ও উদীয়মান নব্য-কবি কালিদাস।

ভবভূতি ভারি রাশভারী লোক ছিলেন, এদের মত বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াতেন না। দণ্ডকারণ্যের গুরুগম্ভীর বর্ণনা শুনে মহারাজ পর্যন্ত তাঁকে ভয় ক'রে চলতেন।

পথে যেতে যেতে সামনে দেখতে পেলেন, প্রকাণ্ড একখণ্ড শুক্‌নো কাঠ। মহারাজের কাব্যপিপাসা জেগে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন, কিমেতৎ? অর্থাৎ, পদ্য ক'রে বল, ওটা কি?

অনুষ্টুপের একটি চরণ রচনা ক'রে বররুচি বললেন, শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে।

মহারাজ মুচকে হেসে কালিদাসের পানে চাইলেন, সেকালে যাকে 'স্মিতহাস্য' বলত। কালিদাস বললেন, নীরসতরুবরঃ পুরতো ভাতি। ছন্দটা আমার ঠিক মনে নাই, বোধ হয় শার্দূলবিক্রীড়িত। বাংলা ছন্দে তারে নাচা, এক চাকার সাইকেল চড়া, শূন্যে ঝোলা, ঘোড়দৌড় এবং ঘোড়ার পিঠে বাঁদর চড়া প্রভৃতি সব রকমের কশরৎ থাকলেও বাঘের খেলা নাই। অবিলম্বে এই অভাব পূরণ করা উচিত। আগেরটিও অনুষ্টুপ কিনা ছন্দঃশাস্ত্র না দেখে সঠিক ক'রে বলতে পারি না।

সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমাদিত্য গলা থেকে মুক্তার মালা খুলে কালিদাসের গলায় পরিয়ে দিলেন। সেকালের রাজারা এক ডজন ক'রে মুক্তার মালা সব সময় নিজেদের গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন, কখন কি কাজে লাগে। বিদ্যোৎসাহী!

আমার মনে হয়, বিক্রমাদিত্য নব্য-কবির প্রতি অন্ধ স্নেহের বশবর্তী হয়ে বৃদ্ধ কবির প্রতি অবিচার করেছিলেন। ললিতলবঙ্গলতা নয়, প'ড়ে ছিল এক-খানা শুক্‌নো কাঠ—অমসৃণ, কদাকৃতি। ওর যোগ্য কবিতা ছিল ঐ 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে'। যেমন বিষয়, তেমনই তার কাঠখোট্টাই ভাষা। তবু বররুচি রাজার খাতিরে তিন-তিনটে অনুপ্রাস যোজনা করেছিলেন।

নীরস তরুবর বলতে বড় জোর একটা মস্ত বড় মরা গাছ বুঝায়। পুরতঃ মানে সম্মুখে, মেনে নিলাম। স্বর্ণ, রৌপ্য, এমন কি কাঁচ প্রভৃতি উজ্জ্বল

পদার্থ ভাতি—'আভাতিবেলা লবণাম্বুরাশি' সূর্যকিরণোজ্জল সমুদ্রতীরের সমুজ্জল বর্ণনা, স্বীকার করি; কিন্তু রোদে পুড়লে কাঠের রঙ আরও কালো হয়, চকচক করা তো দূরের কথা। লালিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে কালিদাস বিষয়-বস্তুকে বিকৃত করেছিলেন।

আমি হ'লে, উজ্জয়িনীর বাজার থেকে বুড়ো বররুচিকে দু আনার বাদাম-ভাজা আর কালিদাসকে দু পয়সার কাঁচা কদমা কিনে দিতাম। তাতে বররুচির রুচি খুলত, কালিদাসের হ'ত বস্তুজ্ঞান।

প্রগতি

যৌবনের জোয়ার ক'মে এলেই স্বাস্থ্য নিয়ে একটা ম্যানিয়া জন্মে সবারই মনে। বন্ধুরও তাই হয়েছিল।

তিনি যখন মটরশুঁটি দেওয়া বাঁধাকপির তরকারি খেতেন, তার আস্বাদের কথা তাঁর মনেই আসত না; শুধু ভাবতেন, কি খেলেন, ভিটামিন-এ, না, ভিটামিন-বি?

শাঁখআলুর রস নিংড়ে চুমুক দিতেই ভিটামিন-বি'র কার্যকলাপ স্মরণ ক'রে পুলকিত হতেন। চিবিয়ে খাওয়ার উপায় ছিল না।

কমলালেবু, ডাবের জল আর টম্যাটো খাবার সময় মানসনয়নে ভিটামিন-সি'র দিব্যমূর্তি ধ্যান করতেন।

বিস্বাদ এবং অখাদ্য কুঁড়া-মাখা চালের ভাত ভিটামিনের খাতিরে অম্লান-বদনে গলাধঃ করতেন। এমন কি, কড্‌লিভার অয়েলের দুর্গন্ধও তাঁর নাকে ঠেকত না।

কিন্তু এত ক'রেও তাঁর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি দেখা গেল না। অথচ, তাঁরই প্রসাদভোজী উৎকলীয় পাচকের নধরকান্তি তাঁর মনে ঈর্ষার উদ্রেক করত।

সহজ স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের জন্য চাই যৌবনের ক্ষুধা, রসনাতৃপ্তির উগ্র বাসনা। ভিটামিন নিয়ে যিনি যত বেশি মাথা ঘামাবেন, তাঁর স্বাস্থ্য সেই পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হবে।

মনে হয়, প্রগতি-সম্বন্ধে যে সাহিত্য যত অধিক সজাগ, তার গতি তত মন্থর। চাই যৌবন, চাই ক্ষুধা, চাই তৃপ্তি, তবেই সে পাবে স্বাস্থ্য, সুন্দর সহজ সরল গতি।

ব্যস্ত কেন?—শুক্‌নো পাতা ঝরবেই,
নূতনকে জায়গা দিতে পুরাতন সে সরবেই!

জনমত

পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে একখানা হারানো খাতা খুঁজে পেলাম। যৌবনে লেখা গান, কবিতা, গল্প—এই সব। কতকগুলো তার ভাল লাগল। পাঠিয়ে দিলাম ভিন্ন ভিন্ন মাসিক-পত্রিকায়।

মাসিক-পত্রিকার নিয়ম এই যে, ডাকটিকিট দেওয়া না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো হয় না। ভাবলাম, আমি তো আর ডাকটিকিট দিচ্ছি না, অতএব পাত্রপক্ষের যদি মেয়ে পছন্দ না হয়, লজ্জার কোন কারণ থাকবে না।

লেখাগুলোর কতক করলে নিরুদ্দেশ যাত্রা, বাকি কয়েকটা আসরে গিয়ে জায়গা পেলে।

আমার দুর্ভাগ্য, জনৈক সম্পাদক ভদ্রতা ক'রে ডাকটিকিট না থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি কবিতা ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। দুঃখপ্রকাশ ক'রে চিঠিও দিয়েছেন একটা। ভরসা দিয়েছেন, আমার (বর্তমানে ৬০-এর কাছাকাছি) ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, তবে ভবিষ্যতে তাঁর পত্রিকায় কবিতা পাঠাবার আগে, আমি যেন একটা প্রাথমিক জনমত সংগ্রহ করি।

সম্পাদক দুঃখিত হ'লেও, আমার কোন দুঃখের কারণ ছিল না; বেশ মনে আছে, কবিতাগুলি ডাকবাক্সে ফেলেই আমি অনুতপ্ত হয়েছিলাম।

আমার আসল দুঃখের কথাটা মন দিয়ে শুনুন—

ডাকপিয়ন যখন প্যাকেটটি দিয়ে যায়, আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না। পড়্ তো পড়্, অমনোনীত কবিতা সব একেবারে নাতি-নাতনীদের হাতে। ঘরে ফিরে আসতেই তারা আমায় ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের নিজের রচা একটি উৎকৃষ্ট কবিতা আওড়াতে লাগল—

পদ্য লেখে লুকিয়ে গো,
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

ব'সে পড়লাম। সবচেয়ে ছোট নাতনীটি আমার কোলে ব'সে আমার সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে সস্নেহ হাস্যে বললে, ঘাসে লোঁ।

ক্রমে তাদের তৈরি ছড়াটা পাড়ায় পাড়ায় র'টে গেল। আমাকে দেখলে

পেলেই সকল পাড়ার ছেলেমেয়েরা ঘিরে দাঁড়ায় আর সমস্বরে ওটা আউড়ে যায়।

বিস্কুট লেবেনচুস ঘুষ দিলাম। কিন্তু ফল হ'ল উল্‌টো। ক্রমেই আমার কবিযশ সকল পল্লীতে ছড়িয়ে পড়ল।

এখন আর কেউ বলতে পারবে না যে, আমার পিছনে জনমত নাই।

শ্রীভোলা সেন

এদেশ-ওদেশ

পশ্চিম-বাংলার জেলা। জেলার শেষপ্রান্তে গিয়ে মোটর-বাস থামে, আরম্ভ হয় রেল-লাইন—পাকিস্তানে। রেল-লাইনের পাশে খোয়া-বাঁধানো রাস্তার শেষে মোড় ঘুরতেই পশ্চিম-বাংলার পিচ-বাঁধানো রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে সারি সারি মোটর-বাস, যাত্রী নিয়ে সদরে যাতায়াত করে। রেল-লাইন বরাবর কিছুদূর পর্যন্ত এপারে ভারত-ডোমিনিয়ন, অধিকাংশ লোক বলে হিন্দুস্থান; ওপারে পাকিস্তান। এপারের বাড়ি, ঘর-দোর, চালের কলকে ঘেঁষে রেল-সীমানার তার চ'লে গিয়েছে। এপার ওপারের ছেলেরা তারের বেড়ার ওপর দিয়ে লাফ দেয় আর বলে, এই গেলাম হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্তানে, পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্থানে; এপারের বাড়ির পেচনের দরজা খুলে নির্দিষ্ট সময়ে ঝি-চাকর চুবড়ি ক'রে কি সব ফেলে দেয় তারের বেড়ার ওপারে। লোকে বলে, ওর মধ্যে নতুন কাপড়, আরও কত কি থাকে! ঠিক বলতে পারে, যারা আগে থেকেই ব্যবস্থা ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে ওগুলো কুড়োবার জন্যে।

সীমানা দিয়ে হাঁটবার সময় এপারের কুলী বনশিয়ার মাথা থেকে সরষের বস্তা পিছলে পড়ে ওপারে। আবার কখনও ও বিশ্রাম করতে ব'সে যায় চিনির বস্তা মাটিতে রেখে গুমটি-ঘরের পাশে। বিশ্রামান্তে আবার বস্তা মাথায় নিতে এদিক ওদিক নড়াচড়া করতে হয়। ভারসাম্য রাখতে গিয়ে লোক-দেখানো অনিচ্ছায় হেলে পড়ে ও-রাজ্যের দিকে। বস্তা প'ড়ে যায়। বনশিয়া হা-হুতাশ করতে থাকে, যেন সত্যিই ও বিপন্ন বোধ করছে। বস্তা উঠে যায় কাছের গরুর গাড়িতে। বনশিয়াও চ'ড়ে বসে; বস্তা তুলে নেবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকে ক্ষীণভাবে, ওকে নিয়েই রওনা হয় গাড়ি ওপারের রাস্তা দিয়ে। মণ্ডল

সাহেব বিড়ি এগিয়ে দেয় বন্‌শিংয়াকে। ওরটা ধরিয়ে দেয়, কা্‌ি শেষ হবার আগে নিজেরটাও ধরিয়ে নেয়।

টিউবওয়েলে জল নিতে আসে ছোট ছোট বা্‌ ত নিয়ে ওপার থেকে এপারে। ওদের কল নাকি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। জল ন্‌ে যায় দুর্গা পোদ্দারের দোকান হয়ে, বালতি ঘরের মধ্যে রেখে একটু এগিয়ে যায় পান খেতে। পোদ্দার জিজ্ঞেস করে, ক পয়সার পান খেতে যাচ্ছ? কেউ বলে এক পয়সা, কেউ বলে দু পয়সা, কেউ-বা আরও বেশি। এগিয়ে যায় আর বলতে থাকে, বালতিটা রইল ভাই, ফিরে এসেই নিয়ে যাব। একটু পরে ফিরে আসে, ততক্ষণে য পয়সার পান খাবে বলেছিল তত সের চিনি বালতিতে দেওয়া হয়ে গিয়েছে। এপার পেরিয়ে যাবার সময় লোক দেখলেই শোনাতে থাকে, কি বিশ্রী টিউবওয়েল, বড্ড বালি উঠছে আজকাল। নতুন কোন উপায় আবিষ্কারের আগে ধরা না পড়া পর্যন্ত চলতে থাকে ওপারের লোকদের এপার থেকে চিনি নেবার ফন্দি।

পচা শুঁইয়ের শ্বশুরবাড়ি ওপারে। সপ্তাহে তিন দিন ওর স্ত্রীকে যেতে হয় বাবার অসুখ দেখতে। রোজই প'রে যায় নতুন শাড়ি, ফেরবার সময় লোকে দেখে, ছেঁড়া কাপড় প'রে ফিরছে।

মুক্তালাল সরাওগীর ট্রাকে ওড়ে জাতীয়-পতাকা। সীমানার ধারে এসে ট্রাক ব্যাক্‌ ক'রে চ'লে যায় এপারের এলাকা ছাড়িয়ে। পেছনের কবাট খুলে যায়, নেমে পড়ে কেরোসিন, কাপড়ের গাঁট আর করোগেটেড টিন।

ঈশ্বরমলের দোকানে সাওমু বর্মা কাপড় নিতে আসে। হাটে বেতের ঝুড়ি আর পাটের দড়ি বিক্রি ক'রে যা পেয়েছে ওতেই কেনা চলবে হয়তো।

কত দিব্যার হোবে?

ঈশ্বরমল তখন ব্যস্ত ওপারের ওর আত্মীয় কোন শেঠজীর সঙ্গে গোপন কথা নিয়ে। সাওমু শোনে, কিছু বোঝেও বা।

বুলেক না ভাই, কত দাম?—আবার জিজ্ঞেস করে সাওমু।

দশ টাকা।—ঈশ্বরমলের বেশি কথা বলবার সময় নেই।

ই ধুতি এক বছর আগেও কনুটোলে তিন টাকায় পাছি। এখন অত দাম?

ঈশ্বরমল রহস্য করে, বাড়ি চলিয়ে যা, যো কাপড় বাড়িমে আছে, উত্তে পট্টি লাগাইয়া লে, নয়তো কলাপাতা পিন্ধিয়ে থাক্‌।

সাওস্থ ভাবে স্ত্রীর কথা। হাটে আসবার সময় বলেছিল একটা ধুতি কিনে আনতে, দুজনাই পরতে পারবে। আর সাওস্থরই বেশি দরকার। এর পর বাইরে বের হওয়া ভার হবে।

বেরিয়ে আসে সাওস্থ দোকান থেকে। আজ আর হ'ল না, সামনের হাটে যদি হয়।

শশী হালদারকে ঘিরে ধরেছে অনেকে, মাছের চুবড়ি নিয়ে নাকি ওপার থেকে এপারে আসছিল।

তোর বাড়ি এদিকে, তুই ওদিকে যাস কেন রে ছালা?—সমবেত কণ্ঠস্বরে নিখুঁত উচ্চারণসম্পন্ন আত্মীয়তা।

দাম বেশি প্যাছে যে উধার।—শশী বলে।

ছালা, এদিকে বাড়ি ক'রে, ওপারে মাচ বেচে বড়লোক হতে চাইছ? লাটছাহেবি তোমার দেখাচ্ছি। এগিয়ে আসে ওরা, হট্টগোলের মাঝে চুবড়ি যায় প'ড়ে, মাছগুলো ছিটকে পড়ে এদিক ওদিক, তুলে নেয় আশেপাশের লোক আগস্ট দাঙ্গায় ছেটানো লুটের মালের মত। ভিড়ের মাঝে ভাল বোঝা যায় না, খাকী পোশাক পরা লোকটাও একটা মাছ তুলে নিল কি না!

শশী হালদার কেঁদে ওঠে। লছমন সিং আর আবদুল্লা বিড়ি ধরায় হাফ-প্যাণ্টের পকেট থেকে বার ক'রে।...

দুপুর-রাতে ছুটে আসে জমিরুদ্দিন এপারের ডাক্তারের কাছে।—বাবু, এই ইন্‌জাকশনটা দাও, ছাওয়াল আমার বাঁচে না বুঝি। মফিজ ডাক্তার বলছে, ওবুধটা পালেই নাকি ভাল হয়্যা যাবি।

নেবে কেমন ক'রে? ধ'রে ফেলবে যে।

যেমন কর্যা হয় দেন বাবু, আমি লিয়া যামু।—অনুনয় করতে থাকে জমির।

দাম এনেছিস?

এই তিন টাকা তুমি নেন বাবু; ছাওয়াল ভাল হ'লি আরও দিমু, অখুশি করবার লোক হামি না।

ওর দেরি সয় না।

বাড়ি যা, হোমিওপ্যাথিক জল নিয়ে যা পঞ্চাশ শিশি, ও টাকাতেই হবে। নয়তো তোর মফিজ ডাক্তারের কাছে যা তোর 'ইন্‌জাকশন' নিতে।—ডাক্তার দর-কষাকষি করতে চায়।

মোর গাঁয়ের ডাক্তারের কাছে থাকলি কি আর তুমার কাছে আসি? দেন বাবু, ছুটা পায়ে পড়ি।—শেষ চেষ্টা করে জমির।

হবে না, বেরিয়ে যাও।

জমির চ'লে আসে।

এপারে থেকে পাহারাদার হাঁকে, কে যায়?

জমির বলে না কিছু। ছুটে আসে কজন, খুঁজে দেখে কিছু নিয়ে যাচ্ছে কি না, না পেয়ে ফিরে যায়।

ওপারের সিপাই ডাকে, কোথায় বাড়ি?

এপারেই।—এগিয়ে চলে জমির।

সুরয সিং হাঁকে, কোই বিড়ি-উড়ি হ্যায়?

হ্যায় জরুর। আইয়ে দোস্ত্।

জ্ব'লে ওঠে দেশলাইয়ের কাঠি, দুজনের মুখের আভাস শুধু পাওয়া যায়। সিগারেট ধরিয়ে ফেরে উল্টো দিকে। ভারী জুতোর শব্দ শোনা যায়।

বাড়ি ফেরে জমির। দরজার কাছে আসতেই শোনে কান্নার রোল। বুঝতে পারে সবই। সাদা কাপড়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে তিন টাকাতে যতটুকু পাওয়া যায়।

* * *

একদল সীমান্তরক্ষী পাঠশালাকে ঘিরে বসিয়েছে আস্তানা। আশপাশের পুকুরের মাছের নাকি হিসেব নেওয়া হয়ে গিয়েছে। রোজ মাতব্বর প্রধানদের খাসী, হাঁস, মুরগীর হিসেব আসছে। রক্ষীদের জন্যে রোজ নিয়মিতভাবে একটা না একটা আহার্য পাঠাতে হবে। বক-রাক্ষসের দোসর। সীমান্তরক্ষীদের অধিনায়ককে মাস্টার সাহেব বলে, হুজুর, আপনাদের দেখে ছেলেমেয়েরা ভয় পায়; স্কুল-ঘরের পাশ ছেড়ে সেক্রেটারি সাহেবের বৈঠকখানার কাছে যদি আস্তানা নেন তবে বেশ হয়।

উত্তর পায়, দেশের স্বাধীনতা কেবল আরম্ভ হ'ল। কত কাজ! জিনিসপত্র চালান হয়ে গেলে তোমাদেরই তো অসুবিধে। এ বোঝ না মাস্টার সাহেব? তোমার বর্ণবোধ শিক্ষা দেওয়া আর আলেমগিরি দুদিন বন্ধ থাকলে কোন দোষ নেই। জান, গত যুদ্ধের সময় শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় ব'লে ধরা হয় নি। সে সংকট কালের জের চলেছে আজও, তোমার পাঠশালায় অসুবিধে করতে তাই বাধে নি।

সাপ্তাহিক কোন এক পত্রিকা আর লোকমুখ থেকে যা জানতে বা শুনতে পারে, মাস্টার তার বেশি কোন খবর পায় না। এবার হুজুরের কথায় বুঝতে চেষ্টা করে, সত্যিই কি লেখাপড়া শেখানোর দরকার তেমন কিছুই নেই? শিক্ষা কি অপেক্ষা করতে পারে দেশের সুদিনের জন্যে? ভাবতে বসে মাস্টার, হুজুরের এই চাকরি যোগাড় করতে কি লেখাপড়া শিখতে হয় নি? আজ যাঁরা শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে বাদ দিলেন, তাঁদের "বাদ দেওয়া হ'ল" এই ফতোয়া লিখতে লেখাপড়া শিখতে হয় নি? এত বড় যুদ্ধটা হ'ল, চিঠিপত্র, খবরাখবর পাঠানোতে কি লেখাপড়ার সাহায্য নিতে হয় নি? সাপ্তাহিক কাগজে সে দেখেছে, যুদ্ধের সময় বিলেতে লেখাপড়া বন্ধ রাখা হয় নি। কেমন ক'রে এ জায়গা থেকে ও-জায়গায় ছাত্রদের নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, সে সংবাদও তার মনে আছে। তেমন যুদ্ধে তো আমাদের দেশ জড়িয়ে পড়ে নি!

ভাবতে ভাবতে মাস্টার খেই হারিয়ে ফেলে। পাঠশালা বসবার সময় হয়ে গিয়েছে, এসেছে মাত্র দুজন ছাত্র। হাজিরা-খাতায় দুজন ছাত্র উপস্থিত থাকলে বেতন বন্ধ হয়ে যাবে। কি করবে মাস্টার?

এক রাস্তা পার হয়ে এসেছে দুটো গাড়ি। ছুটে যায় দুজন রক্ষী। তারপর কি হয় ভাল বোঝা যায় না। তবু মাস্টার দেখে, গাড়ি রেখে গাড়োয়ানেরা ওদের সঙ্গে কি সব ফিস্‌ফিস করে।

ছাত্র আর আসবে না, মাস্টার বেরিয়ে পড়ে।

গাড়ি ততক্ষণ রওনা হয়েছে। পেছনের গাড়োয়ান দেখে মাস্টারকে।

আরে মাস্টার সাহেব, তোমার ইস্কুল-ফিস্কুল আর হবি না। এখন ওসব বাদ দিয়্যা—

তোমার ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাও না কেন?—মাস্টার জিজ্ঞেস করে।

উ এতখন শীতলাপুরের হাটে কাপড় ব্যাচছে। আজ আবার লিয়া যাচ্ছি, ইবার তুমাদের আর কাপড়ের চিন্তা থাকবি না। গাড়োয়ান যেন কণ্ট্রোলারের ভূমিকায় অভিনয় করে।

কাপড় নিয়ে আসছ ভিন দেশ থেকে, ওরা কিছু বলে না?

আরে, বুলে তো সবাই, আবার বুলেও না। দৌলতরামের দোকানে কিনলে উই সব ঠিক করি ছাছে। তবে মাস্টার, তুমি যদি এ ব্যাবসা কর, মোকে সাথে লিও—দৌলতরামকে কিছু বেশি দিব্যার হবি, তা হোক—দেখো কি

লাভ! এপারে মাল আন্তা ক্যালছ, কি বাস্, টাকা সুদে আসলে উঠ্যা আসবি।
হাতে তালি দিয়ে ওঠে গাড়োয়ান।

প্রলোভন। সর্পের প্রলোভন চিরকাল চলছে এমনই ক'রে নানা ভাবে। পরাজয় হয় সুনীতির, বিচ্যুতি হয় আদর্শের। কিন্তু এ কোন্ স্বাধীনতা? জনগণকে বঞ্চিত করবার স্বাধীনতা, অর্থলোলুপতাকে বে-আব্রু বেহায়ামিতে টেনে আনবার স্বাধীনতা, মনুষ্যত্বকে পশুত্বের ধাপে নামিয়ে আনবার অবাধ স্বাধীনতাই কি দেখা দিল দুশো বছরের পরাধীনতার পর? আত্মার মুক্তির চিন্তা পড়ল পেছিয়ে, লোকে দাস হয়ে পড়ল অর্থের, পিশাচ-মনোবৃত্তির আর তথাকথিত আভিজাত্যের।

মাস্টার ভাবে, তবে কি পরাধীনতা ঘুচল না তাদের, যারা নানা নির্যাতনের মাঝেও ভেবেছিল, একদিন এর শেষ হবে, অমারাত্রির শেষে সুদিন আসবে, ভুলে যাবে সবাই দুঃখ-দুর্দশার বিভীষিকা?

মাস্টার ভোলে নাই আজও—যুদ্ধের বাজারে ফুড-কমিটি পরিদর্শনে এসে হ্যাজাকের আলোর নীচে ব'সে ভূরিভোজের পর কণ্ট্রোলার সাহেব বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সেক্রেটারি সাহেবের চিনি আর কেরোসিনের বরাদ্দ। মংলু মাঝি পাঁকাঠির বোঝা জ্বালিয়ে আসছিল সাহেবের কাছে আবেদন করতে, এক ছটাক কেরোসিনে কুলোয় না, একটু বাড়িয়ে দিতে। দূর রাস্তা, আগুন নিভে গিয়েছিল কিছুদূর আসতেই। গুগরী বিলের পাশ কাটবার সময় কোন্ এক বিষাক্ত সাপের কামড়ে মংলু ম'রে প'ড়ে ছিল বিলের ধারে। এই বিলেরই পাশে কবর দেওয়া হয়েছিল মকবুল শেখের নাতনীকে। ডাক্তার বলে, অতবড় অসুখে দিনের পর দিন গুড় মিশিয়ে পথ্য দেওয়াতেই নাকি মেয়েটা মারা গেল। এক কণা চিনির জন্যে মকবুল কতদিন ঘুরেছে সেক্রেটারি সাহেবের বাড়ি। ওর সেই এক কথা—কতবার বলেছি কণ্ট্রোলার সাহেবকে চিনির বরাদ্দ বাড়িয়ে দিতে, তা উনি বলেন—উপায় নেই। আমি কি করব ভাই? কিন্তু সবাই তো দেখেছে, বিশেষ বিশেষ সময়ে কিছুরই অভাব হয় না। দিনের মত আলো জ্ব'লে থাকে সারারাত, মাতব্বর প্রধানদের ভূরি-ভোজও বাদ থাকে না। শুধু নিজেরা বলাবলি করেছে, সেক্রেটারি সাহেব আর মণ্ডলদের গোপন আলোচনা চলেছে সুযোগমত সারারাত। সোজাসুজি বলতে সাহস হয় নি, আধ পোয়া চিনি আর এক ছটাক কেরোসিনের বরাদ্দও যদি ঘুচে যায়!

দেখেছে এ সবই।

দেখছে আজও। এস. ডি. ও. আর কণ্ট্রোলার, সার্কেল অফিসার আর দারোগা সবাইকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সেলাম ঠুকে চলত যারা খদ্দরের বদলে পাতলা ধুতি পাঞ্জাবি প'রে, কংগ্রেসের ছায়া মাড়াতেও যারা ভয় পেত, আজ তারা হয়েছে মস্ত দেশকর্মী, মিটিংকা কাপড়া পরছে, ওদের কারের বনেটে উড়ছে জাতীয়-পতাকা, খবরের কাগজ পড়ছে আর জয়গান করছে জওহরলালের, রাজেন্দ্রপ্রসাদের, আর সবারই। এদেরই এক দলের মধ্যে সোনা চাঁদির দর আর শেয়ারের বাজারের খবর জানবার জন্যে খবরের কাগজ নিয়ে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যাচ্ছে।··

আর এক সীমান্তে। জেলা-বোর্ডের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে গরুর গাড়ি। চকভরতের পুলিস-ঘাঁটিতে পেল বাধা।

কি আছে?

কিছু না।—উত্তর আসে ভেতর থেকে।

জরুর, দেখেগা হামলোক। সিপাই বেরিয়ে আসে। বের হয় এক বস্তা চিনি, কয়েক গ্রোস দেশলাই, কাপড় কয়েক জোড়া। টান দিয়ে নামাতেই নেমে আসে তোষক। দুদিক ধ'রে উঁচু করতেই ভারী হয়ে পড়ে নীচের দিক। তোষকের মুখ খুলে ফেলতেই দেখা যায় কয়েক থান কাপড়।

বেপরোয়া গাড়ির মালিক জিনিস রেখেই চ'লে যায় গাড়ি হাঁকিয়ে। ওপারের রাজ্যে ঢুকেই গাড়ি থামায়।—তুমাদের বড় রাস্তা দিয়্যা নাই বা গেলাম! কত জায়গায় পাহারা দিবা? চকহলুদের মাঠ বা চালাইভিটার ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা দিয়্যা গেলে ঠেকায় কোন্ শালা? সাট্রাগাঁয়ের জংলা রাস্তা দিয়্যা গেলে ধরবি কে? আশু বাগদী, অর্জুন মালো, না, তোমাদের রাজ্যের পিলেওয়ালা মুচকুন্দ রাজবংশীর দল?

গাড়োয়ানও সায় দেয়—আশু, অর্জুন কিছুই বুলবে না। জানের ডর নাই? মাথা কাটি ফেলি, মোর রাজ্যে চলি গেলে, ধরে কোন্ সমুন্দীর ব্যাটা?

সত্যিই তো। অর্জুনের বাড়ির মেয়েরা রোজ ভোর না হতে মাঠ ফিরে আসে, আশুর গরু ছাগল জমির আল পার হয়ে পাতা ঘাস খেতে যায় ওপারে। বটগাছের ছায়ায় এপার ওপারের লোক ব'সে জটলা করে, তামাক

খায়। ঝগড়া লাগাতে কতক্ষণ, দেরিও হবে না হয়তো মাথা-ফাটাফাটি আর খুনজখমের মহড়া শুরু হতে।...

খড়ের গাড়ি আটকে দিয়েছে অদূরে।

দে বাবা, ছাড়ি দে, দু পয়সা বেশি পালি হামাগের রাজ্যেরই তো টাকা বেশি হবি।

চাঁদা দিয়ে যা চ্যারিটি ফাণ্ডে।

চারদিক ফাঁদে তো দিব্যারই হবিই হামাগের লাগি, ই তো।—বের ক'রে দেয় যথোচিত দক্ষিণা। গাড়ি রওনা হয়।

এপারে পড়ে এদিকের রক্ষীদের হাতে। নিয়ে আসে শুল্ক-বিভাগের লোকের কাছে—উনি এদিকেই আসছিলেন। বই খুলে ভদ্রলোক দেখতে থাকেন, কত ট্যাক্স দিতে হবে।

বাবু, ই রামেন্দির বাবুর খেড়। ঘর ছাওয়াবার হবি, তাই নিয়্যা যাচ্ছি। সবুর করেন, বাবুকে নিয়্যা আসি।—গাড়ি রেখে গাড়োয়ান বাবুকে ডাকতে যায়।

রামেন্দ্রবাবু। বছর পেরোয় নি, কংগ্রেসের মেম্বার হয়েছেন। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল গোছের, তবুও সাধারণ লোকের মাঝে ইতিমধ্যে একটু প্রতিপত্তি হয়েছে। জওহর-কোট গা থেকে খোলেন না কোন কালেই; গান্ধীটুপির এক দিকে 'জয় হিন্দ' ও অন্য দিকে অশোকচক্রের ছাপ।

ছুটে আসেন জওহর-কোটের বোতাম খুলে। কোন্ আইনে আটকেছেন? —জিজ্ঞেস করেন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে।

বই খুলে আইন দেখিয়ে দেন ল্যাণ্ড কাস্টমসের লোক।

ফেলে দিন ওসব। নিজের জমির ধানের খড় নিতে ট্যাক্স লাগবে, মগের মুলুক, না?—রামেন্দ্রবাবুর রাগ কমে না।

আজ্ঞে, এ তো কংগ্রেসী মুলুক, মগের কেন হবে?—কর্মচারীটি সবিনয়ে উত্তর দেন।

সে তোমার কাছে জানতে হবে না ছোকরা, গাড়ি ছেড়ে দাও।

স্বাধীন দেশের আইনে বাধা আছে ছেড়ে দেবার।—উত্তর আসে।

আচ্ছা, দাঁড়াও।—লোক জড়ো হয়ে গিয়েছে, মাতব্বরি ফলানোর এই সুযোগ ছাড়বেন না রামেন্দ্রবাবু।—যাচ্ছি এবার কংগ্রেসের সেক্রেটারি সুবোধ-বাবুর কাছে। জওহর-কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে রওনা হন।

দাঁড়িয়ে থাকে উৎসুক জনতার মাঝে, আর. এস. পি. আই.-এর রামরাখে ছুবে, ফরোয়ার্ড ব্লকের কেষ্ট সেন। পরখ করে, সরকারী লোক কংগ্রেসের ভয়ে খড়ের গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন কি না!

'৪২-এর বিখ্যাত নেতা শতদলবাবু এলেন। সত্যিকারের নেতা, দুঃখ-দুর্দশার মাঝে লোকে সান্ত্বনা খোঁজে ওঁর কাছে, পায়ও। রামেন্দ্রবাবু মানিব্যাগ বের ক'রে ফেলেন, সরকারের প্রাপ্য দিতেই হবে। শতদলবাবু, সুবোধবাবু তাই পরামর্শ দিয়েছেন। হৈ-চৈ ওঁরা পছন্দ করেন না।

তবুও কি হৈ-চৈয়ের জায়গা এটা! দিনে লক্ষ গুজব ছড়িয়ে যায়, শহরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। পানের দোকান, চায়ের স্টল আর মোটর-অফিসে ছোট ছোট দল আলোচনা করে,—ও রাজ্যের রেল-স্টেশনের কাছেই এ রাজ্যের সীমানা আরম্ভ ব'লে গাড়ি নাকি আর থামবে না; জেলার সদর নাকি বদলি হয়ে সত্তর আশি মাইল দূরে কোথায় হবে, তারই তোড়জোড় চলছে সরকারী মহলে; '৪২-এর আন্দোলনে নাম করেছিল ব'লেই নাকি এ জায়গা ভারত ইউনিয়নে পড়েছে।

খবরের কাগজের ওপরে লাল কালি দিয়ে লেখা পোস্টার এঁটে দেওয়া হয় এখানে সেখানে, ওতে থাকে সর্বহারাদের নেতাদের বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনের আবেদন, আরও কত কি! কারবালা মাঠে হয় বামপন্থীদের সভা, কংগ্রেস-ময়দানে বসে প্রবীণ জননায়কের সভাপতিত্বে বিরাট সভা। সভার পেছনের লোকেরা ঘুরে বেড়ায় এ সভা থেকে ও সভা, আর যতক্ষণ থাকে কেবলই আলোচনা করে বক্তাদের বিষয়ে। চিনাবাদামের খোসা কটকট ক'রে ভাঙে, আলগোছে বাদামগুলো মুখের ভেতর দেয় আর জাবর কাটতে থাকে কথার ফাঁকে ফাঁকে। বক্তৃতামঞ্চে হয়তো ততক্ষণ হরিপদবাবু গান্ধীজীর নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই হু-হু ক'রে কেঁদে উঠেছেন, অভিভূত হয়ে গিয়েছে সভার আদ্ধেক লোক, স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে। ওদিকে আরম্ভ হয়ে যায় গান্ধীজী আর নেতাজীর তুলনা কারবালা মাঠে।

সভার শেষে বসে সুবোধবাবুর বাসায় বৈঠক। শুরু হয় শান্তবাবুর ডাক্তারখানায় বামপন্থীদের সচীৎকার আলোচনা। এমনিই হয়—প্রায়ই।···

বাড়ি ফিরছেন শতদলবাবু। জীপ থামিয়ে এক হোমরা-চোমরা সাহেব

বেরিয়ে এলেন ওঁর কাছে। সেপাই ঠুকল সেলাম, বছর কয়েক আগে ঠুকতে চেয়েছিল ব্যাটন ঐ শতদলবাবুর মাথায়।

নমস্কার। সাহেবের মুখে খোশামুদি ফুটে ওঠে, একটু আলাপ ছিল আপনার সঙ্গে—কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল।

আসুন।—শতদলবাবু ও সাহেব এগিয়ে যান। লোকে ভাবে, কি পরিবর্তন, পর্বতই হজরতের কাছে যাচ্ছে আজকাল!

আলোচনায় বসেছেন শতদলবাবু ও সাহেবটি। গোপন আলোচনা।···

গোপন আলোচনা এখনও হয়তো চলছে ঈশ্বরমল মাড়োয়ারীর গুদামে। ঠিক হয়ে গিয়েছে, দুপুর রাতে ট্রাক আসবে, তারপর···

আলোচনা চলছে সুবোধবাবুর বাসায়। গান্ধীজীর গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীতে মনোনিবেশ করতে হবে। খবরের কাগজ নিয়ে শুয়ে আছেন রামেন্দ্রবাবু, তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেছেন বামাকান্ত পাট্টাদার, হরিপদ ঘোষ, রাজেন্দ্রবাবু, কাগজ কলম নিয়ে লিখছেন সুবোধবাবু। সিদ্ধান্ত হ'ল, শহরের ধারে কাছের গ্রামে বামাকান্তবাবুরাই যাবেন। শতদলবাবুকে অনুরোধ করা হবে দূরের গ্রামে যেতে, সঙ্গে থাকবে চিরকাল যারা ভলাণ্টিয়ারি ক'রে এসেছে, নেতার পদে উন্নীত হতে যাদের হয়তো জীবনই কেটে যাবে।

কথাবার্তা শেষ হয় নি এখনও সাহেব আর শতদলবাবুর, সেদিনকার বে-আইনী ব্যাপার নিয়ে—কাপড়ের গাঁট রাতারাতি উধাও হয়েছে মোটর-স্টেশন থেকে। সংখ্যালঘুদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কংগ্রেসের কাছে ওরা নালিশ জানিয়েছে পুলিস জুলুমের বিরুদ্ধে, ওদের কাগজে রিপোর্টও চ'লে গিয়েছে।

বড় দারোগা ছুটতে ছুটতে এলেন খবর নিয়ে। বেরিয়ে এলেন সাহেব, উৎসুক হয়ে উঠলেন রাজেন্দ্রবাবুরা।

পাওয়া গিয়েছে, স্যার! গোটা গাঁটটাই জমির নীচে পুঁতে ফেলে তার ওপর পাট বুনে দিয়েছিল, সরাবার সময় পায় নি!—স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন বড় দারোগা।

সাহেব ব'লে ওঠেন, দেখলেন শতদলবাবু, যুদ্ধের মরশুমে ব্ল্যাকমার্কেট আর অভিনব মতলববাজির যে ধর্ম প্রচারিত হয়েছে, তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে হিন্দু

মুসলমান সবাই, এদেশ ওদেশ হ'লে কি হবে? সারা পৃথিবীর লোক যেন এই ধর্মে দীক্ষিত হতে চলল।

শতদলবাবু হেসে ওঠেন। হেসে উঠলেন রাজেন্দ্রবাবু আর সকলে। হেসে উঠেছে নিশ্চয়ই তৃপ্তির হাসি, শান্তবাবুর ডাক্তারখানায় জমায়েৎ বামপন্থীরা, ইলেকশনে দক্ষিণপন্থী প্রার্থীর স্বভাব-চরিত্র নিয়ে প্রাচীরপত্র দেবার সিদ্ধান্তে।... হেসে উঠেছে হয়তো ঈশ্বরমল হাতে মালপত্র চালান দেবার চুক্তি অন্তে, নোটের তাড়া পেয়ে।...

কিন্তু কাঁদে কারা?

কাঁদে শশী হালদার, সাওত্থ আর জমিরউদ্দিনের দল, যারা আজও বুঝতে পারে নি, দেশ স্বাধীন হয়ে ওদের কতটুকু লাভ হ'ল! শিউরে ওঠে আজও মংলু মাঝির দলের লোক, যাদের চোখে ভেসে ওঠে গুগরী বিলের পাশে সর্পদষ্ট মংলুর পাণ্ডুর মুখ, আজও যারা সভয়ে চোখ বোজে কবরের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় মকবুলের নাতনীর মৃত্যুকাতর মুখ স্মরণ ক'রে।

শ্রীঅমলচন্দ্র চক্রবর্তী

স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-সংস্কার

ভারতে বনিয়াদী শিক্ষার জনক মহাত্মা গান্ধী পল্লীবাসীর কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বাস্তব-জীবনের অন্নবস্ত্রের সমস্যা-সমাধানকারী প্রাথমিক শিক্ষার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, বনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা, গ্রামবাসীর শিক্ষা। ভারতে প্রাচীন সভ্যতা ছিল আরণ্যক সভ্যতা, সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসকের আমলে নগর শহর গড়িয়া উঠিলেও মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৭·১ জনই এখনও গ্রামে বাস করে, শহরে বাস করে মাত্র ১২·৯ জন। গ্রামকে শহরে পরিণত করা চলিবে না, কেন না ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, ইংলণ্ডের মত শিল্পপ্রধান নয়। কাজেই গ্রামবাসীকে গ্রামে রাখিয়াই স্বাস্থ্যকর রুচিসম্মত জীবনযাপনে শিক্ষিত করা এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও কুটীরশিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে শিক্ষা দেওয়াই বনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য। গান্ধীজী চান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কর্মমুখর গ্রামে নাগরিকের কর্তব্য, অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, অন্নবস্ত্রের সমস্যা সমাধানে সক্ষম সুস্থ সবল পল্লীবাসী। স্বরাজ-সাধনার ক্ষেত্রে যেমন

মহাত্মাজী সংগঠন এবং প্রতিটি মানুষের আত্মশক্তি উদ্বোধনের চেষ্টা করিয়াছেন, শিক্ষাক্ষেত্রেও তেমনই তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া পল্লীর পুনরুজ্জীবন ও গ্রামবাসীর আত্মবিশ্বাস দৃঢ় করিবার উপায় নির্দেশ করিয়াছেন।

কোন কাজের মধ্যে দিয়া শিক্ষাদান শিশুর মনোবিজ্ঞানসম্মত প্রণালী। যে বয়সে বালকবালিকা অঙ্গপ্রত্যঙ্গসঞ্চালনকারী কর্মে আনন্দ লাভ করে, সে সময়ে তাহাদিগকে নীরস পুঁথি মুখস্থ করাইয়া যে নির্জীব শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা তাহাদের মানসিক বা দৈহিক কোন দিকেরই মঙ্গল সাধন করে না। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালী তাই অবৈজ্ঞানিক ও প্রাণহীন।

বনিয়াদী শিক্ষার প্রধান সমালোচ্য বিষয় এই যে, নিম্ন হইতে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত একটি সুসম্বদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীর অঙ্গহিসাবে ইহা প্রথম হইতেই পরিকল্পিত হয় নাই। গান্ধীজী বলিয়াছেন, ভারতের সাত লক্ষ পল্লীতে ভারতের আত্মা বাস করিতেছে ; কাজেই পল্লীর শিক্ষার চিন্তাই তাঁহার কাছে প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে।

পল্লীর সংখ্যা বেশি হইলেও শহরেও বালকবালিকা রহিয়াছে। তাহাদের শিক্ষার কি ব্যবস্থা হইবে? তাহা ছাড়া, পল্লীর বালক হইলেই যে সকলেই কৃষি অথবা অন্য কোন বৃত্তিমূলক কুটীরশিল্প শিখিয়া চৌদ্দ বৎসর বয়সের পরেই অর্থোপার্জনে ব্রতী হইতে হইবে তাহারই বা কি নিশ্চয়তা আছে? পল্লীর বালক-বালিকাকে যদি আবশ্যিকভাবে বনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাত বৎসর কাল শিক্ষা লাভ করিতে হয়, তবে তাহার ফলে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হইতে সক্ষম ভাবী প্রতিভাকে আমরা পাকা কারিগরে পরিণত করিয়া তাহার বৃহত্তর প্রতিভার বিকাশে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারি। দেশে কৃষিশিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির যেমন প্রয়োজন আছে, তেমনই বিশ্বের সভ্যসমাজে স্থান-লাভের যোগ্য উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, আইনজ্ঞ, সাহিত্যিক প্রভৃতিরও প্রয়োজন আছে। দেশে দেশে স্বাধীন ভারতের সাম্য মৈত্রী-মুক্তির বাণী উন্নতশিরে বহন করিয়া লইয়া যাইবার যোগ্য ভারতবাসীর যেমন প্রয়োজন হইবে, বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারে দানের উপযুক্ত গৌরবময় সংস্কৃতি-সভ্যতাও ভারতকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। কোন জাতির সাংস্কৃতিক মৃত্যু (cultural

death) ঘটিলে শুধু রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা তাহার গৌরববৃদ্ধি করিতে পারে না। বস্তুত সুস্থ সবল জীবন যাপন ও জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণবিকাশের জন্যই স্বাধীনতার প্রয়োজন।

বনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যতালিকা প্রণয়নকারী জাকির হোসেন কমিটি সমালোচনার উত্তরে বলিয়াছেন—

"এই পরিকল্পনার মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষার কোন উল্লেখ না থাকায় অনেকে শঙ্কান্বিত হইয়াছেন যে, হয়তো আমরা উচ্চশিক্ষার সংকোচ সাধন করিতে চাহিতেছি; কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে, আমরা শুধু সাত বৎসরের জন্য বনিয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখিয়াছি। এই পরিকল্পনা সর্বজনীন আবশ্যিক বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য। এই নূতন প্রণালী অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করিবার সময় এমন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, যাহাতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের যোগ্য ছাত্রগণ তাহাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়।"

অর্থাৎ বনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং সেখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছিবার স্বাভাবিক সোপান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে রাখিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের উদ্যমের উত্তাপে বহুদিনের সঞ্চিত উদাসীনতার বরফস্তূপ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রাথমিক ব্যবস্থা অনুযায়ী শিক্ষকের নূতন শিক্ষা-প্রণালী-শিক্ষাকাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা আশার লক্ষণ সন্দেহ নাই। নূতন ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করিবার পরই ইহার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া মাধ্যমিক শিক্ষাকেও ঢালিয়া সাজিতে হইবে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এ পর্যন্ত কোন কর্মচাঞ্চল্যের আভাস পাওয়া যাইতেছে না।

ভারতবর্ষ প্রাচীন দেশ, গৌরবময় ইহার ঐতিহ্য। জ্ঞানে গরিমায়, সম্পদে শক্তিতে একদা এই পুণ্যভূমি বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল। ইহার বিদ্যাপীঠ দেশদেশান্তরের বিদ্যার্থীকে আকর্ষণ করিয়াছিল। দুর্গম দুরূহ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া তাহারা ভারতের আলোকতীর্থে উপনীত হইত। ভারতীয় সভ্যতার শান্তশ্রী, ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনা ও ভারতবাসীর জীবনে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের সমন্বয়ে যে পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার মূল এ দেশের শিক্ষার আদর্শের মধ্যে নিহিত। কালচক্রের আবর্তনে ভারতের সে শান্ত তপোবনের যুগ চলিয়া গিয়াছে। ভারতের নির্মল

আকাশে ধূলিঝঞ্ঝার কালবৈশাখী বহুবার তাণ্ডব নৃত্য করিয়া গিয়াছে। অনেক যুগ পরে স্বাধীনতার সূর্যোদয়ে ভারতীয় গৌরবের পুনরভ্যুদয়ের যুগ আসিয়াছে। শিক্ষা ও সভ্যতা, সম্পদ ও সমৃদ্ধি, শক্তি ও শান্তির জন্য দেশবাসীকে নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধন করিবার সময় শিক্ষাবিদ্‌দিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিক্ষার উপরই দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ভর করিতেছে।

সার্জেণ্ট-শিক্ষা-পরিকল্পনায় সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো রচনা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা চালু করিতে যে পরিমাণ টাকার হিসাব ধরা হইয়াছে, তাহা বহন করা বর্তমান ভারতের পক্ষে অসাধ্য। পল্লীবাসী অধিকাংশ বালকবালিকার জন্য গান্ধীজী যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহা প্রাথমিক শিক্ষা হিসাবে উৎকৃষ্ট, শুধু সকল ছাত্রকেই বনিয়াদী বিদ্যালয়ে শেষ শ্রেণী পর্যন্ত ধরিয়া না রাখিয়া প্রতিভাবান কতককে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সার্জেণ্ট-পরিকল্পনায় যে সুপারিশ করা হইয়াছে, তাহা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

বনিয়াদী বিদ্যালয়কে নিম্ন বনিয়াদী ও উচ্চ বনিয়াদী এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া নিম্ন বনিয়াদীর শিক্ষাশেষে অর্থাৎ ১১+ বয়সে ছাত্রদের একটি নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং ছাত্রদের বুদ্ধি, সামর্থ্য, রুচি, গৃহের পরিবেশ, বংশের ধারা প্রভৃতি বিচার করিয়া উপযুক্ত মনে করিলে তাহাদিগকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হইবে। অন্য ছাত্রেরা উচ্চ বনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়কেও সাধারণ বিদ্যাভবন (Academic School) ও শিল্পবিদ্যাভবন (Technical School)—এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে হইবে। শিল্পবিদ্যার দিকে আকৃষ্ট মেধাবী ছাত্রদিগকে শিল্পবিদ্যা-ভবনে মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে, যাহাতে সেখান হইতে তাহারা উচ্চতর শিল্পশিক্ষার জন্য ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগে প্রবেশ করিতে পারে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, আইন, চিকিৎসা-বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ছাত্রগণ সাধারণ মাধ্যমিক বিদ্যাভবন হইতে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে। কোন ছাত্রের প্রতিভা কিছু দেরিতে বিকাশ হইয়াছে দেখা গেলে, তাহাকে উচ্চ বনিয়াদী বিদ্যালয় হইতেও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করার সুযোগ থাকিবে।

বনিয়াদী বিদ্যালয় হইতে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য নির্বাচনকালে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ছাত্রসমাজের যে স্তরেই হোক না কেন, তাহার বুদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশ ঘটিলে তাহা দ্বারা যদি দেশের যে কোন দিকের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বোঝা যায়, তবে তাহার আত্মোন্নতির সুযোগ দিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারও অবশ্যকর্তব্য হইয়া উঠিবে; মাধ্যমিক শিক্ষার অনুষঙ্গ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনও করিতে হইবে। শিক্ষাকে একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা (continuous process) বলিয়া গণ্য করিয়া প্রাথমিক উচ্চতম স্তর পর্যন্ত ছাত্রদের বিভিন্ন রুচি, সামর্থ্য ও দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের জাতীয় শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষার কোন একটি পর্যায়কে পৃথক করিয়া এককভাবে তাহার প্রণালী নির্ধারণ করিতে গেলে সমগ্র সমস্যার মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা দেখা দিতে পারে। ইহা দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে না।

দ্বিতীয়ত, শুধু কুটীরশিল্পের প্রসার হইলে এবং পল্লীবাসীর অন্নবস্ত্রের অভাব মিটিলেই দেশে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সংঘটিত হইবে না। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগ চলিতেছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিবিধ যন্ত্রশিল্পের প্রসার জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির জন্যই করিতে হইবে। কুটীরশিল্পকে যন্ত্রশিল্পের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করিয়া সমাজ-জীবনে পল্লী ও শহরের মধ্যে সহযোগিতার সেতু স্থাপন করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, স্বাধীন ভারতের জন্য শিক্ষার সংস্কার পরিকল্পনা করিবার সময় ভারতের মূল প্রাণশক্তির প্রতি যথাযোগ্য দৃষ্টি দিতে হইবে। সাত্ত্বিক ভাবের প্রাধান্য ও অধ্যাত্ম শক্তিই ভারতীয় আর্যসভ্যতার শক্তিকেন্দ্র। এই আধ্যাত্মিক শক্তির জন্যই পরাধীনতার নিষ্পেষণে ভারতবাসী তাহার সকল বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়া মানসিক শক্তির দিক হইতে একেবারে দেউলিয়া হইয়া যায় নাই। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে শ্রীঅরবিন্দ সাপ্তাহিক 'ধর্ম' পত্রিকায় "আমাদের আশা" শীর্ষক প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এখন স্মরণ করিবার, মনন করিবার এবং তদনুযায়ী কাজ করিবার সময় আসিয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, গৌরব, বল, মহত্ত্বের মূলে আধ্যাত্মিক শক্তি। ...বার ভারতবাসীর বিনাশকাল আসন্ন বলিয়া সকলের প্রতীতি হইবার কথা

ছিল, আধ্যাত্মিক বল গুপ্ত উৎস হইতে উগ্র-স্রোতে প্রবাহিত হইয়া মুমূর্ষু ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে, আর সকল উপযোগী শক্তিও সৃজন করিয়াছে। এখনও সেই উৎস শুকাইয়া যায় নাই, আজও সেই অদ্ভুত মৃত্যুঞ্জয় শক্তির ক্রীড়া হইতেছে।...ভারতের শক্তি অন্তর্মুখী হইয়াছে, যখন আবার বহির্মুখী হইবে, আর সেই স্রোত ফিরিবে না, কেহ রোধ করিতে পারিবে না। সেই ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা ভারত প্লাবিত করিয়া, পৃথিবী প্লাবিত করিয়া অমৃত-স্পর্শে জগতের নূতন যৌবন আনয়ন করিবে।"

বহুদিনের রুদ্ধ অন্তর্মুখী শক্তি আজ বহির্মুখী হইতে চলিয়াছে। এই বিকাশের পথ, দেশের এবং মানবের কল্যাণে ইহাকে নিয়োগের পথ চিন্তানায়ক-দিগকে রচনা করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-সংস্কারে শিক্ষাবিদ্‌কে এই বহির্মুখী শক্তির বহুমুখিতা স্মরণ রাখিয়া, বর্তমানকালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বলিষ্ঠ আদর্শনিষ্ঠা, দূরদৃষ্টি ও বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিতে হইবে। জাতীয় জীবনের অভ্যুদয়, বহুবিচিত্র সমৃদ্ধি ও শক্তি, আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবনের পরিপূর্ণতা ও সুসমঞ্জস মিলন—ইহাই হইবে নব ভারতের আদর্শ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ

সংবাদ-সাহিত্য

কায়েদে আজম জিন্নাহ সাহেবের দেহান্ত ঘটিয়াছে। যে পাকিস্তান রাষ্ট্র তাঁহার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে জন্মলাভ করিল, তাহা আজ শোকে মুহ্যমান। ভারতবর্ষেরও সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহার জন্য শোক জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বিদেশী রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র-নেতাগণ জিন্নাহ সাহেবের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কিছুকাল হইতে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতেছিল বলিয়া জনরব শোনা গিয়াছিল। বিগত ১৫ই আগস্ট তিনি স্বাধীনতার বার্ষিক উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আকস্মিক হইলেও নিতান্ত অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে হয় নাই। আমরা ১৯৪৮ সালের মধ্যে এক দিকে জিন্নাহ সাহেবকে, অপর দিকে গান্ধীজীকে হারাইলাম। একজনকে স্বাভাবিক ভাবে, অপরজনকে অস্বাভাবিক ভাবে।

এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, জিন্নাহ সাহেব একদিন ভারতবর্ষের

জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণের অগ্রণী ছিলেন। শুধু তাই নয়, গান্ধীজী যখন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়ীভাবে ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন, তখন তিনিই ভারতবাসীর প্রতিনিধি হইয়া গান্ধীজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। অথচ অবশেষে একদিন জিন্নাহ্ সাহেব এমন একটি অবস্থায় উপনীত হইলেন, যখন তিনি বলিলেন, হিন্দু এবং মুসলমানের পক্ষে স্বাধীনভাবে একই রাষ্ট্রে বাস করা সম্ভব নয়, কারণ, তাহাদের জাতি, ধর্ম, আচার সবই পরস্পরবিরোধী। উভয়ের স্বার্থের মধ্যেও কোনও সমতার স্থান নাই। ইহা হইতেই অবশেষে পাকিস্তানের জন্ম হয়।

কিন্তু পাকিস্তান গঠনের পরেই জিন্নাহ্ সাহেব সেই রাষ্ট্রে যে বিভিন্ন ভাষা এবং ধর্মানুসরণকারী মানুষ বাস করিবে, ইহা স্বীকার করিলেন। এমন কি সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় স্বীয় স্বার্থ বলি দিবেন, তাহাও ঘোষণা করিলেন। অর্থাৎ যে টু নেশন থিওরির তিনি প্রবর্তক ছিলেন, পরোক্ষভাবে সেই থিওরি তাঁহারই নিকট প্রচণ্ড আঘাত প্রাপ্ত হইল।

জিন্নাহ সাহেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিচার করা সম্ভব নয়, হয়তো বা শোভনও হইবে না। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তাঁহার প্রবর্তিত রাষ্ট্রীয় আদর্শের জন্য বহু মুসলমান আত্মবলি দিয়াছে ও আজও দিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। তিনি যাহা মুসলিম সমাজের স্বার্থের অনুকূল বলিয়া বিবেচনা করিতেন, কোনও ধন অথবা মানের প্রলোভনে সে পথ হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করার কথা স্বপ্নেও কেহ ভাবিতে পারিত না। কিন্তু ভক্তদলের আনুগত্য বা ব্যক্তিবিশেষের আন্তরিকতা সত্যের প্রমাণ নহে। সত্যের প্রমাণ কালের দেবতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিয়া যান।

আলেকজাণ্ডার বা নেপোলিয়ান, হিটলার বা মুসোলিনিরও ভক্তের অভাব ছিল না। তাঁহারাও মানুষের মানদণ্ডে ক্ষুদ্র ছিলেন না, জীবিতকালে এবং মৃত্যুর পরেও তাঁহাদের ভক্তের অভাব ঘটে নাই। কিন্তু নেপোলিয়নকে আমরা বিস্ময়ের সহিত স্মরণ করি, মানুষের ইতিহাসে আকস্মিক প্রতিভার মত ধারণা করিয়া থাকি। তাঁহারা ভাঙিয়া গিয়াছেন এবং ভাঙার ভিতর দিয়া হয়তো বা কিছু গড়িয়াও গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই গড়ার কাজের দ্বারা যাহাদের স্বার্থপুষ্টি হইয়াছিল, তাহারা সংখ্যায় অনেক হইলেও শোষিত ও

অবহেলায় পঙ্গু জনসমূহ হইতে ভিন্ন। যে মহাপুরুষগণ ভাঙা অপেক্ষা গড়ার কাজে প্রতিভা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্র আকস্মিকতার লক্ষণে বিস্ময়কর না হইলেও কালের দেবতা অবশেষে তাঁহাদের ললাটে জয়তিলক অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন. সাধারণ মানুষের অন্তরলোকে তাঁহারাই স্থায়ী আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কায়েদে আজম জিন্নাহ মানুষের অন্তরে যদি সেই আসনের অধিকারী হন, তবেই আমরা ভারতবাসী হিসাবে নিজেদের ধন্য বলিয়া মনে করিব, কেন না তিনিও শেষ পর্যন্ত ভারতবাসীই ছিলেন। কি জানি, মহাকাল কাহার জন্য কোথায় কোন্ আসন রচনা করিয়া রাখিয়াছেন!

—

হায়দ্রাবাদে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, এইমাত্র সংবাদ পাইলাম, তাহা শেষও হইয়া গিয়াছে। যাহারা প্রত্যহ রাজাকার সম্প্রদায়ের অত্যাচারের জঘন্য কাহিনী শুনিয়া অসহায় অবস্থায় অন্তর্দাহে কষ্ট পাইতেছিলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্রগতির সংবাদে এবং নিজামের আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে তাঁহাদের সকলের মুখে হাসি ফুটিয়াছে। আজ সর্দার প্যাটেল গৌরবের সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, হায়দ্রাবাদ রাজ্যে হিন্দু এবং মুসলমান জনতা উভয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছেন, ও সমগ্র ভারতবর্ষে হায়দ্রাবাদ-সমস্যাকে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা হিসাবে কেহ দেখে নাই। ভারতীয় ইউনিয়নে কোথাও হায়দ্রাবাদকে উপলক্ষ্য করিয়া সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটে নাই। অর্থাৎ সমগ্র ভারতে হিন্দু এবং মুসলমান আজ ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে আচরণ করিতেছে। ইহা স্বস্তির সংবাদও বটে, আশা এবং আনন্দের সংবাদও বটে। আচম্বিতে প্রহারের ফলে যদি হায়দ্রাবাদে মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে, তাহাও অবহেলার বস্তু হয় না।

কিন্তু বিষয়টির সম্বন্ধে ভাবিয়া আজ অন্য একটি কথা মনে হইতেছে। গান্ধীজী জাতীয় ঐক্যবোধের জন্য যে সাধনপদ্ধতি আমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে হিন্দুমুসলমানের ঐক্য ও অস্পৃশ্যতাবর্জন দুইটি প্রধান সাধন ছিল। আমরা যে তাহার জন্য কিছু করি নাই এমন নহে। অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত আমরা একদিন খিলাফৎ-আন্দোলন সমর্থন করিয়াছিলাম। কিন্তু ভারতের বাহিরে একটি রাষ্ট্রের সুখদুঃখের সহিত ভারতীয় মুসলমানের অন্তর

এত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত, ইহা স্বীকার করার ফলে একদিন মুসলমান-সমাজ নিজেদের ভারতীয়ত্বকেই খোয়াইয়া বসিয়াছিল। যাহারা খোয়ায় নাই, তাহাদের সংখ্যা অথবা প্রভাব একদা নগণ্য ছিল, আজ ঘটনাচক্রে বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু মুসলমানের মনে স্বতন্ত্র-জাতীয়তার বীজ প্রচ্ছন্নভাবে রোপিত হওয়ার কারণে অবশেষে সেই বিষবৃক্ষের ফলস্বরূপ যখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িল, তখন এক এক ধমকে আমরা অস্পৃশ্যতাবর্জনের জন্যও সাময়িকভাবে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছি। 'হিন্দুমুসলমান এক হো' অথবা 'অস্পৃশ্যতা নিপাত যাক' ইত্যাদি স্লোগানের পিছনে আমাদের আন্তরিকতার অভাব ছিল তাহা নয়। তাহা কেবল স্থায়ী সামাজিক পরিবর্তন সাধনে সমর্থ হয় নাই।

গান্ধীজী যেমন অস্পৃশ্যের মন্দির-প্রবেশের অধিকারে বিশ্বাস করিতেন, হিন্দুর ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে যোগসূত্রের সন্ধান করিতেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিতেন যে, যতদিন অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, ততদিন মানবসমাজের স্থায়ী কল্যাণ হইতে পারে না। তাই আমাদের হৃদয়াবেগকে সমর্থন করিলেও তিনি উপদেশ দিতেন যেন আমরা সাময়িক ভাবকে স্থায়িত্ব দিবার জন্য জীবনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বীয় চেষ্টায় বিপ্লব সাধন করিতে পারি। সেইটি হইলে তবে স্বাধীন ভারতের জীবনরথ সুপথে চলিতে সমর্থ হইবে।

কেরোসিন বা পেট্রোলে আগুন না দিলে তাহাতে আঁচ হয় না, কিন্তু বাহিরে খোলা জায়গায় আগুন দিলে বিস্তর ধোঁয়া হয়, ঘরবাড়ি পুড়িয়াও যায়। কিন্তু মোটরের ইঞ্জিনের মধ্যে বাঁধিয়া যদি পেট্রোলে আগুন ধরানো যায়, তখন তাহার জোরে মোটরকার চলিতে থাকে।

আজ হায়দ্রাবাদকে উপলক্ষ্য করিয়া সরদার প্যাটেলের মুখে আমরা সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমান প্রজার মধ্যে যে অভেদের সংবাদ পাইতেছি, হয়তো বা যে বুদ্ধি প্রহারের চোটে খুলিয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া ভাববিলাসীর মত আহ্লাদ করিবার সময় আমাদের নাই। যদি উহাকে সার্থক করিতে চাই, তবে সমাজে সার্থক পরিবর্তন করিয়া যেখানে যেখানে অসমতা বা শোষণ রহিয়াছে, তাহার স্থায়ী সংশোধনের দ্বারা মজবুত ইঞ্জিনের মত দৃঢ় সমাজ গড়িয়া তাহার অভ্যন্তরে হিন্দু ও মুসলমানের এই নবজাগ্রত ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্য-বোধকে বাঁধিয়া স্বাধীন ভারতের রথকে চালু করিতে হইবে।

এ কাজ ব্যক্তিবিশেষের নয়, মিলিটারির নয় ; রাষ্ট্রের একারই বা সাধ্য কি যে, এই মৌলিক আর্থিক ও সামাজিক বিপ্লবসাধন করে। আমরা সকলে যদি চাই, সকলে নিজের মনকে প্রস্তুত করি এবং পরিবর্তনের অনুকূলে ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত হই, তবেই স্বাধীন ভারত ধন্য হইবে। নয়তো হাউই বাজির মত ক্ষণিকের জন্য আলোর খেলা দেখাইয়া, অবশেষে ফাঁকা হাউইয়ের খোলের মত তাহা পৃথিবীর পৃষ্ঠে পড়িয়া থাকিবে।

সেই অপঘাত হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য চাই স্থায়ী উৎসাহ, স্থির ও সাধু লক্ষ্য এবং নূতন ভারত গড়িবার জন্য সংকল্প, পরিশ্রম এবং স্বার্থবলি দিবার উৎসাহের প্রাচুর্য।

—

এতদিন জানিতাম, যাহার আর কিছু হয় না, সে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি শেখে, নয়তো ইস্কুলের মাস্টারি করে। আজ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শিক্ষার উন্নত অবস্থা দেখিয়া ইস্কুলগুলি সংস্কারের দিকে আমাদেরও মন গিয়াছে। যাঁহারা অবহেলিত শিক্ষককুলের দুঃখে দুঃখী, তাঁহারা বলিতেছেন, শিক্ষকদের নিম্নতম বেতনের হার বৃদ্ধি করা হোক, কেন না, যুদ্ধের কল্যাণে কুলি-মজুর শিক্ষকের চেয়ে আজ বেশি রোজগার করিয়া থাকে।

বেতনের হার বৃদ্ধি করা যে উচিত, এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। কেবল বাধা হইল, ট্যাঁকে পয়সা নাই। গভর্মেণ্টের সমালোচকগণ বলিতেছেন, কংগ্রেসের এক সময়ে আদর্শ ছিল, দেশের উর্ধ্বতম মাহিয়ানা ৫০০্-র বেশি হইবে না। আজ মুদ্রাস্ফীতির দরুন না হয় তাহা তিন গুণই হইল, কিন্তু শুধু ভারতের রাষ্ট্রগৌরবের অজুহাতে ঋষিতুল্য, এক সময়ে শাকান্নভোজী, লাটসাহেবকে এত অধিক বেতন দেওয়ার সার্থকতা কোথায়? সমালোচকগণের এই আপত্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিব না। কেবল এইটুকু বলিব, রাষ্ট্রের গৌরবার্থে রাষ্ট্রপালকে যদি আর্থিক মর্যাদা বেশি দিতে হয়, তবে সমগ্র সমাজের কল্যাণার্থে শিশু-পাল শিক্ষকদিগকে আমরা ৩৪৷৹ নিম্নতম বেতন দিয়া অমর্যাদা করিব কেন?

আমাদের ভাঁড়ে যে টাকা নাই, তাহা গান্ধীজী জানিতেন। এবং ইহাও হয়তো তিনি অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি আমরা অস্ত্রবলের দ্বারাই আত্মরক্ষার চেষ্টা করি, তবে আশু ভবিষ্যতে চার আনার জমিদারি রক্ষার জন্য

বারো আনা দিয়া পাইক পেয়াদা পুষিতে হইবে। অর্থাৎ দরিদ্র ভারতবর্ষকে রক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর খরচ বৃদ্ধি পাইলে জাতির গঠনমূলক কাজে ভাঁটার টান পড়িবে।

তাই তিনি অন্য পথ ধরিয়াছিলেন। বুনিয়াদী শিক্ষার মূল একটি লক্ষণ হইল যে, সাত বছর শিক্ষাকালের মধ্যে ছাত্র যে-শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া লেখাপড়া শিখিবে, সেই শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের দ্বারা তাহার পড়ার চালু খরচ উঠিয়া যাইবে। সরঞ্জামী খরচ অন্য ভাবে সংগৃহীত হইবে, কিন্তু ছাত্রদল সাত বছরে শিক্ষকের মাহিয়ানা স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ আয়ের দ্বারাই পূরণ করিতে সমর্থ হইবে। তিনি মনে করিতেন, এ নীতি ব্যতিরেকে দরিদ্র ভারতবর্ষে শিক্ষার বিপুল বিস্তার কখনও সম্ভব হইবে না।

গান্ধীজীর নীতি, আমরা যতদূর জানি, বাংলা গভর্মেণ্ট মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহারা 'বুনিয়াদী' নামক এক শিক্ষা প্রবর্তনের সংকল্প করিয়াছেন, কিন্তু সে বুনিয়াদী শিক্ষা গান্ধীজীর বুনিয়াদী শিক্ষা হইতে স্বতন্ত্র। সেখানেও শিল্পকে আশ্রয় করা হইবে, কিন্তু শিল্পটির লক্ষ্য থাকিবে ছাত্রের সৃজনী-প্রতিভার বিকাশ সাধন করা, রোজগারের চেষ্টা করিলেই নাকি ছাত্রের সৃজনী-প্রতিভা নষ্ট হইয়া যাইবে! অর্থাৎ লক্ষ্মীর সহিত সরস্বতীর সংযোগ ঘটিলেই নাকি শিক্ষার জাত হারাইয়া যাইবে! ইহার অর্থ দাঁড়ায়, আমাদের ছাত্রেরা পরিশ্রমলব্ধ অর্থের উপর নির্ভর না করিয়া পরশ্রমলব্ধ অর্থের দ্বারাই পুষ্ট হওয়াকে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিবে। যাহার দ্বারা রোজগার সম্ভব, সেরূপ শিল্প শেখার বিরুদ্ধে এই শুচিবায়ুগ্রস্ত মনোভাবের উৎস কোথায় তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। যাহাই হউক, ইহার ফলে যে শিক্ষাপদ্ধতি গভর্মেণ্টের প্রসাদে বুনিয়াদী নাম লইয়া অবতীর্ণ হইতে চলিয়াছে, তাহার সকল ব্যয়ভার গভর্মেণ্টকেই বহন করিতে হইবে এবং ছাত্রের শ্রমলব্ধ অর্থ রাষ্ট্রের আর্থিক দায়কে হালকা করিতে পারিবে না।

এদিকে আবার গভর্মেণ্টের টাকা নাই, তাই শিক্ষকদের মাহিয়ানার হারও বাড়াইবার উপায় নাই।

এক উপায় আছে। শোনা যায়, কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্টের অনেক টাকা। অতএব প্রাদেশিক গভর্মেণ্টের নূতন শিক্ষাপদ্ধতিকে যদি গান্ধীজী-প্রদত্ত 'বুনিয়াদী' নাম দেওয়া যায়, তবে হয়তো গান্ধীভক্তর হাতীর পিঠে চড়িয়া দিল্লী

হইতে কিছু টাকা প্রাদেশিক শিক্ষা-তহবিলে পৌছাইয়াও যাইতে পারে। অবশ্য বুনিয়াদী কথাটা তো গান্ধীজীর পেটেন্ট করা ছিল না। অপরে অন্যবিধ শিল্পসংযুক্ত শিক্ষাকেও 'বুনিয়াদী' নাম দিয়া চালাইতে পারেন, কেন্দ্রীয় গভর্মেণ্টের প্রসাদবর্ষণে পুষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু এরূপ আচরণে সততার অভাবরূপ দোষ জন্মায়। আর যে শিক্ষাপদ্ধতির মূলেই সততা নাই, তাহা 'শিক্ষা' কেমন করিয়া হয়, সেই কথাটি আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

শিক্ষকের মর্যাদা বাড়াইবার জন্য যদি দেশপালকদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে হয়, তবে ভারতমাতা নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করিবেন না। আর যদি পয়সা আমাদের না-ই থাকে, তবে সততার সহিত খাটি বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি অনুসরণ করিয়া দেখাই যাক না, তাহার দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতিতে বিপ্লব সাধন করা যায় কি না, আত্মমর্যাদাযুক্ত, স্বীয়-পরিশ্রমপুষ্ট ছাত্রদল এবং নিবেদিতাত্মা শিক্ষকের চেষ্টায় নূতন সমাজ গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় কি না।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রের ন্যায় সাহিত্য ক্ষেত্রেও দেখিতেছি চোরা-কারবার শুরু হইয়া গিয়াছে! 'সমাচার দর্পণ' নামে বাংলা সংবাদপত্র হইতে অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রয়োজনীয় সংবাদগুলি সঙ্কলন করিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক বৎসর পূর্বে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' নামে একখানি আকর-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহার সমালোচনা-প্রসঙ্গে আমরা 'প্রবাসী'তে (পৌষ ১৩৩৯) লিখিয়াছিলাম :—

"ভবিষ্যতে যাঁহারা এই পুস্তকের সাহায্যে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস লিখিতে বসিবেন ব্রজেন্দ্রবাবু কর্তৃক আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত উপকরণগুলি তাঁহাদের এতই নিতান্ত আপনার মনে হইবে যে, ব্রজেন্দ্রবাবু হিসাব হইতে বাদ পড়িবেন।"

আমাদের কথাগুলি এত অল্প দিনের মধ্যেই যে এমন বর্ণে বর্ণে ফলিয়া যাইবে তাহা অবশ্য কল্পনা করিতে পারি নাই। আজকাল অনেকেই যে বিনা-স্বীকৃতিতে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' হইতে অনেক সংবাদ পুস্তকে বা পত্রিকায় বেমালুম আত্মসাৎ করিতেছেন— ইহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। এই সকল লেখক—পাছে নিজেদের গবেষণার গুরুত্বের হানি হয়, এই চিন্তায় ব্রজেন্দ্রবাবুর সঙ্কলন-গ্রন্থখানির নামোল্লেখ না করিয়া সংবাদগুলি যে সুপ্রাচীন 'সমাচার দর্পণ' হইতে গৃহীত, এইরূপ জাহির করিতেছেন; শতাধিক বর্ষ পূর্বে

প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণে'র জীর্ণ সংখ্যাগুলি যে তাঁহারা কখনও চর্মচক্ষে দেখেন নাই, ইহা আমরা হলফ করিয়া বলিতে পারি। দুইটি নমুনা দিতেছি :—

গত শ্রাবণ-সংখ্যা 'মাসিক বসুমতী'তে সম্পাদক মহাশয় "কাশীধাম" প্রবন্ধে "সেকালের সংবাদপত্র হইতে" কয়েকটি সংবাদ সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। কোন্ সংবাদপত্র হইতে গৃহীত, তাড়াতাড়িতে তাহার উল্লেখ করিতে ভুল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যে-যে তারিখে সংবাদগুলি প্রকাশিত তাহার নজীর মুদ্রিত হইয়াছে। সংবাদপত্রখানি যে সেকালের 'সমাচার দর্পণ', এবং সংবাদগুলি যে 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' হইতে হুবহু উদ্ধৃত, তাহা না বলিলেও চলিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু-লাহিড়ী-গবেষক, অধ্যাপক শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও ওই একই পথের পথিক। তিনি স্বকীয় 'বাংলা উপন্যাস' গ্রন্থে ('বাঙ্গালা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'তেও বটে) লিখিতেছেন :— "...প্রথম দৃষ্টান্ত পাই ১৮২১ সালে—'সমাচার দর্পণে' 'বাবু' চরিত্র আলোচনায়। সম্পাদক তাঁহার কাগজের দুইটি সংখ্যায়—২৪শে ফেব্রুয়ারি ও ৯ই জুন, ১৮২১—বড়লোকের আদুরে গোপাল শিক্ষা-চরিত্রহীন ছেলের জীবনযাত্রা ও মতিগতির একটি সংক্ষিপ্ত, ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনা দিয়াছেন।" পড়িলেই মনে হইবে, শ্রীকুমার-বাবু বুঝি বা 'সমাচার দর্পণ' পত্রের সংখ্যাগুলি পাঠ করিয়াই এইরূপ মন্তব্য করিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁহার গুপ্ত মূলধন—ব্রজেন্দ্রবাবুর 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'। ব্রজেন্দ্রনাথের গ্রন্থখানির নামোল্লেখ করিলে পাছে গবেষণার originality কর্পূরের মত উবিয়া যায়, এই জন্যই এরূপ সতর্কতা।

—

সংযোজন :—৪০৪ পৃষ্ঠায় রামেন্দ্রসুন্দরের ভূমিকা সম্বলিত গ্রন্থের যে তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, অনবধানতাবশত তাহাতে এই পুস্তকখানির নাম বাদ পড়িয়াছে :—খুকুমণির ছড়া : যোগীন্দ্রনাথ সরকার ... ১৩০৬, আষাঢ়।

—

আগামী আশ্বিন-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' পূজা-সংখ্যারূপে মহালয়ার পূর্বেই বাহির হইবে। মূল্য প্রতি বৎসরের ন্যায় বারো আনা ধার্য হইয়াছে।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
২০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৫

গান্ধী-চরিত

দিনচর্যা

স্নানের পরেই খাওয়ার পালা। গান্ধীজীর খাওয়ার সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, তিনি দিনে ছয় পয়সার বেশি খান না। কথাটির কবে কোথায় উৎপত্তি হইয়াছিল, জানি না; কিন্তু ইহার জন্য গান্ধীজীকে মাঝে মাঝে অকারণ তিরস্কার শুনিতে হইয়াছিল। গান্ধীজী খাওয়ার সম্বন্ধে এই নিয়ম পালন করিয়া চলিতেন যে, শরীরকে সুস্থ এবং কর্মক্ষম রাখিবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহা দিতেই হইবে। বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে স্বভাবতই আহারের পরিমাণ এবং অর্থব্যয় বিভিন্ন হইবে। প্রয়োজনকে তিনি যেমন স্বীকার করিতেন, তেমনই এক বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতেন, যেন শুধু স্বাদের লোভে আমরা কোনও খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট না হই। অস্বাদব্রতকে দেশসেবকের পক্ষে পালনীয় ব্রত বলিয়া তিনি বিবেচনা করিতেন; তাঁহার মতে উহা ব্রহ্মচর্যের সহায়। কিন্তু শুধু অভিমানবশত কঠোরী ব্রতের তিনি বিপক্ষে ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ৺মহাদেব দেশাই লিখিয়া গিয়াছেন:

Whilst Gandhiji insists, as we have seen, on a village worker living on a villager's diet not costing say three annas a day, he is far from insisting on starvation or mortification of the flesh. To a worker who has imposed on himself a strict regimen involving only one meal a day, consisting generally of 15 tolas of rice boiled, *amti* (made of vegetables and *dal*) and butter milk, all costing only one anna per day, Gandhiji wrote:

'Your meal is very meagre, it is starvation diet. In my opinion, you are not making full use of the instrument that God has put at your disposal. Do you know the story of the talents that were taken away from him who did not know how to use them, or having known would not use them?

'Mortification of the flesh is a necessity when the flesh rebels against one; it is a sin when the flesh has come under subjection and can be used as an instrument of service. In other words, there is no inherent merit in mortification of the flesh.—(*Selections from Gandhi*, No. 609)

১৯৪৫ সালে ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজী যখন বাংলা পরিভ্রমণে আসেন, তখনকার তাঁহার দৈনিক আহারের ফর্দ দিবার পরে আমি নোয়াখালিতে তাঁহার দিনচর্যার বিষয়ে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করিব।—

ভোর ৫॥০টা—মোসম্বি বা কমলার রস ১৬ আউন্স।

সকাল ৭টা—ছাগদুগ্ধ ১৬ আউন্স ও ফলের রস ৮ আউন্স।

বেলা ১২টা—ছাগদুগ্ধ ১৬ আউন্সকে ফুটাইয়া ৪ আউন্স করা। সিদ্ধ তরকারি ৮ আউন্স। কাঁচা তরকারি ৮ আউন্স, যথা—গাজর, মূলা, টমেটো। কাঁচা পাতা ২ আউন্স, যথা—ধনেপাতা, পালং শাক।

বেলা ২॥০টা—ডাবের জল।

বিকাল ৫টা—ছাগদুগ্ধ ১৬ আউন্সকে ফুটাইয়া ৪ আউন্স করা। দুধে সিদ্ধ খেজুর ১০ আউন্স। সামান্য ফল, নারিকেল।

শ্রীরামপুর-নোয়াখালিতে যখন গান্ধীজী অবস্থান করিতেছিলেন, তখনকার খাবার কিন্তু অন্য রকম ছিল। ভোরে মধু, গরম জল এবং ফলের রসের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। স্নানের পর দুপুরে তিনি যাহা খাইতেন, এবার তাহা বর্ণনা করিতেছি।

গান্ধীজীর জন্য রান্না একটি ছোট কুকারে হইত। কুকারটির মধ্যে তিনটি বাটি। একটিতে প্রায় এক পোয়া আন্দাজ তরকারি বাটিয়া তাল করিয়া রাখা হইত, আর একটিতে এক পোয়া বা ৮ আউন্স ছাগলের দুধ। তরকারি বলিতে কুমড়া ঝিঙে হইতে আরম্ভ করিয়া পালং শাক পর্যন্ত থাকিত। সব জিনিস প্রথমে কুরানি দিয়া কুরাইয়া পরে শিলে বাটিয়া একটি ডেলায় পরিণত করিয়া সিদ্ধ করা হইত। তাহাতে নুন, মশলা অথবা তেল কিছুই থাকিত না; গান্ধীজী তেল আদৌ খাইতেন না।—

ইহা ছাড়া রান্না জিনিসের মধ্যে খাকড়া নামে এক প্রকার কড়কড়ে গুজরাটী রুটি গান্ধীজী নিত্য আহার করিতেন। পাঁচ আউন্স আটাতে পাঁচ গ্রেন খাইবার সোডা ও আড়াই গ্রেন নুন মিশাইয়া ছাগ-ঘৃতের ময়ান ও একটু জল দিয়া খুব কড়া করিয়া মাখা হইত। তাহার পর তাহা বেলিয়া শুধু তাওয়ার উপর শক্ত করিয়া শুকনা সেঁকা হইত। জিনিসটি কড়কড়ে পাঁপরের মত হইলেও ময়ানের গুণে খাস্তা হইত। প্রথম আমরা যখন শ্রীরামপুরে পৌঁছাই, তখন মৌখিক উপদেশ শুনিয়া পরশুরাম ভাল খাকড়া করিতে পারেন নাই। খুব পাতলা করিয়া না বেলার ফলে ভাল সেঁকা হয় নাই। ২৬এ নভেম্বর ১৯৪৬, গান্ধীজী সবে স্নান সারিয়া ঘরে আসিয়া শুনিলেন যে, রান্না

হইয়া গিয়াছে, খাকড়ার আয়োজন হইতেছে। শুনিয়াই পূর্বদিনের খাকড়ার অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়াই বোধ হয়, তিনি খড়ম পরিয়া খটখট শব্দ করিয়া রান্না-ঘরে উপস্থিত হইলেন, এবং চাকি-বেলুন লইয়া পরিপাটিভাবে খাকড়া বেলিতে শুরু করিয়া দিলেন। আমরাও শিখিয়া লইলাম এবং ইহার পর আর খাকড়া সম্বন্ধে কোনদিন কোন অভিযোগের কারণ ঘটে নাই। গান্ধীজীর নানাবিধ ছবি তোলা হইয়াছে, কিন্তু রান্নাঘরের মধ্যে তিনি রুটি বেলিতেছেন, এমন ছবি কোথাও দেখি নাই।

খাকড়া ভিন্ন অপর যাহা যাহা গান্ধীজী খাইতেন, এবার তাহার তালিকা দিতেছি।

৮ আউন্স ছাগদুগ্ধের সঙ্গে ১ আউন্স পাতিলেবুর রস। সিদ্ধ তরকারির সঙ্গে তিন চামচ ঈস্ট পাউডার (Yeast)। একটি বাতাবিলেবুর মত বড় গ্রেপ ফ্রুট নামক টক লেবুতে দুই চামচ গ্লুকোজ মিশাইয়া খাইতেন। কিছু কাঁচা তরকারি, যথা—মুলা, গাজর, ফালি করিয়া কাটা। ইহার পর বেলা একটায় একটি ডাব ও তাহার শাঁস খাইতেন। বিকালবেলায় প্রার্থনা-সভায় যাইবার পূর্বে ৪॥০টার সময়ে গান্ধীজী আহার করিতেন। তখন আট আউন্স দুধ লেবুর রস না দিয়া, পেঁপে প্রভৃতি ফল ও সকালের মত সিদ্ধ তরকারি। ইহার পর আর তিনি রাত্রে কিছু খাইতেন না।

গান্ধীজীর খাওয়ার মধ্যে কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল। তিনি অত্যন্ত ধীরে ধীরে খাইতেন—সময় প্রায় ৪০ মিনিট বা তাহার বেশি লাগিত। তবে ঐ সময়ের মধ্যে তিনি চিঠিপত্রের কাজ অথবা খবরের কাগজ শুনিয়া লইতেন। খাইবার জন্য কাঁটা এবং চামচ ব্যবহার করিতেন। চামচটি সেবাগ্রামে কেহ কাঠের তৈয়ারি করিয়া দিয়াছিলেন। পান করিবার জন্য, বিশেষত ডাবের জল খাইবার জন্য কাঁচের ছোট একটি নল ছিল, ব্যবহারের পর তাহা পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া রাখা হইত। স্বাদের দিকে গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল না, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। সিদ্ধ তরকারি যাহা খাইতেন, তাহাতে নুন মশলা তো আদৌ থাকিত না। উপরন্তু দুর্গন্ধ ঈস্ট পাউডার মিশাইয়া চামচ দিয়া তৃপ্তিসহকারে তিনি তাহা খাইতেন। এমনও কোন কোন দিন দেখিয়াছি, দুধের সঙ্গে ঐ পদার্থটিকে মিশাইয়া তিনি আহার করিতেছেন।

এক-আধ দিন তরকারি বেশি মনে হইলে প্রয়োজনের মত লইয়া বাকিটি

আমাদের জন্য রাখিয়া দিতেন। আমরা লবণ, মশলা ও কিঞ্চিৎ ঘৃত সহযোগে তাহাকে গলাধঃকরণের যোগ্য করিয়া তাঁহার অন্তরালে খাইতাম।

চিবাইয়া খাইতে ভাল বাসিতেন বলিয়া গান্ধীজীর বাঁধানো দাঁত ছিল। সে দাঁতগুলি খাবার সময়ে পরিলে মুখের গড়ন যেন বদলাইয়া যাইত এবং কথা বলিলে আমাদেরও একটু কান পাতিয়া শুনিতে হইত, কারণ উচ্চারণের কিছু প্রভেদ মনে হইত। খাইবার সময় ছাড়া গান্ধীজী বাঁধানো দাঁত কখনও ব্যবহার করিতেন না। প্রত্যহ বুরুশ দিয়া সেটিকে মাজিয়া জলে ভিজাইয়া রাখা হইত। জিনিসপত্রে গান্ধীজীর বড় যত্ন ছিল। কিন্তু হারাইয়া বা ভাঙিয়া গেলে, যদি সোজাসুজি দোষ স্বীকার করা হইত, তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিরক্ত হইতে দেখি নাই।

বিগত আগস্ট (১৯৪৭) মাসে যখন তিনি শেষবার পাটনা হইতে কলিকাতায় আসেন, তখন তাঁহার দাঁতের পাটি খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পাটনায় খবর পাঠানো হইল, শ্রীযুক্তা মৃদুলা সারাভাই সংবাদ দিলেন যে উহা পাটনায় নাই। আমরা প্রস্তাব করিলাম, যে নূতন এক জোড়া এখানে করাইয়া লওয়া হউক। গান্ধীজী কিছুতেই রাজি হইলেন না। বলিলেন, নিশ্চয়ই জিনিসপত্রের মধ্যে কোথাও ঢুকিয়া গিয়াছে। অনেক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন আমার জনৈক ডাক্তার বন্ধুকে সংবাদ দেওয়ার বিষয়ে প্রস্তাব করিলাম। গান্ধীজী বলিলেন, দাঁতের যে রকম দাম, তাহাতে নতুন করানোর প্রয়োজন নাই। তর্ক-বিতর্কের পর বলিলেন, আচ্ছা, যদি দামের মধ্যে মজুরি বেশি হয়, তাহা হইলে তোমার বন্ধুকে বলিতে পার, আর যদি দাঁত কিনিতে তাঁহার খরচ বেশি হয় তবে সে বেচারাকে লোকসানে ফেলিও না। যখন বলিলাম, ডাক্তার আমার বিশেষ বন্ধু, তখন হাসিয়া লিখিলেন, সেজন্য তোমার বন্ধুকে সাজা দিও না। সোমবার ছিল বলিয়া লিখিয়াই কথাবার্তা চলিতেছিল। যাহা যাহা সেদিন (বেলেঘাটা, ২৫-৮-১৯৪৭) লিখিয়া দিয়াছিলেন, পাঠকের অবগতি ও কৌতুকের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

১। Then the set is lying buried somewhere in the luggage. It cannot be lost. I am in no hurry. Do not want to spend money.

২। We must now know what the intrinsic value is. If it is anything approaching what the dentists charge, I wd. love to go without a set. If it

is largely the labour then you may trouble the dentist and see what he can do.

৩। Who is the man who will do it ?

৪ Don't think of punishing [him] like that. Let us wait and hear from Mridula. I am in no hurry.

যাহাই হোক, অবশেষে গান্ধীজী রাজি হইলেন, এবং সারারাত জাগিয়া বন্ধুবর দাঁত বেলেঘাটাতে বসিয়াই গড়িয়া দিলেন, কারণ পরের দিনই আমাদের সকালে নোয়াখালি চলিয়া যাইবার কথা। অবশ্য ঘটনাচক্রে তাহা আর ঘটিয়া উঠে নাই।

খরচের বিষয়ে গান্ধীজী অতি সতর্ক হইলেও, কৃপণ কখনও ছিলেন না। কারণ, আমার মনে আছে, পণ্ডিত জওহরলালকে একবার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চিঠি পাঠানোর প্রয়োজন হয়। চিঠিখানি যাহাতে গভর্মেণ্টের হাতে না যায় অথচ অত্যন্ত দ্রুত পৌঁছায়, সেজন্য নোয়াখালি হইতে কুমিল্লা এবং কুমিল্লা হইতে বিশেষ পত্রবাহক এয়ারোপ্লেনের সাহায্যে উহা দিল্লী পর্যন্ত লইয়া যান। বোধ হয়, একখানি চিঠির ডাক-খরচ কয়েক হাজার টাকা পড়িয়া গেল। খরচাদির সম্পর্কে গান্ধীজী যে নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন, তাহা একটি পুরানো লেখা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

Because an institution happens to have plenty of funds it does not mean that it should anyhow spend away every pice that it possesses. The golden rule is not to hesitate to ask for or spend even a crore when it is absolutely necessary and when it is not, to hoard up every pie although one may have a crore of rupees at one's disposal.—(*Selections from Gandhi*, No. 741).

বহুদিন পূর্বে রিচার্ড গ্রেগ নামক জনৈক আমেরিকান, গান্ধীজীকে প্রশ্ন করেন যে তিনি অপরিগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই পুস্তকপাঠ ও পুস্তকসংগ্রহের বিলাসকে সংযত করিতে পারিতেছেন না। গান্ধীজী তাঁহাকে স্বীয় মতামত জানাইয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।—

As long as you derive inner help and comfort from anything you should keep it. If you were to give it up in a mood of self-sacrifice or out of a stern sense of duty, you would continue to want it back, and that unsatisfied want would make trouble for you. Only give up a thing when you want some other condition so much that the thing no longer has any attraction for you, or when it seems to interfere with that which is more greatly desired—(*Selections from Gandhi*, No. 150).

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, খাইবার সময়ে গান্ধীজী কিছু কিছু কাজ করিতেন। চিঠিপত্র শুনিতেন বা চিঠি কম থাকিলে তাঁহার নিকট খবরের কাগজ পড়া হইত। নোয়াখালিতে নিয়ম ছিল, খাইবার সময় চিঠি এবং বেলা তিনটায় চরকা কাটার সময়ে খবরের কাগজ পড়া।

খাইবার পরে লোহার গামলাটিতে মুখ ধুইয়া হাত মুখ মুছিয়া গান্ধীজী বিশ্রাম করিতেন। বিশ্রামের সময়ে তিনি শুইয়া থাকিতেন, এবং আমরা তাঁহার পায়ে ঘি মালিশ করিয়া দিতাম। পা জানালার সামনে মেলিয়া তিনি শুইয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেন, আমরা মালিশ করিয়া যাইতাম। গান্ধীজীর পায়ের তলা খুব পরিষ্কার ছিল, এবং ক্রমাগত বগুলা-যুক্ত খড়ম পরার কারণে বুড়ো আঙুলের নীচে ও আঙুলের মাঝখানে এবং উপরিভাগে কড়া পড়িয়া গিয়াছিল। বয়সের জন্যই বোধ হয়, পা প্রায় ঠাণ্ডা হইয়া থাকিত, অর্থাৎ রক্ত চলাচল আমাদের মত অত সহজভাবে হইত না। সেইজন্য ঘি দিয়া ঘষার ব্যবস্থা ছিল। পরে অবশ্য একটি ন্যাকড়া দিয়া পরিষ্কার করিয়া মোছানো হইত।

প্রথম প্রথম আমি যখন মালিশ করিতাম, তখন একদিন ঘুমাইয়া পড়ার কারণে মোছানোর সময়ে আঙুলগুলি টানাটানি করিয়া ফাঁক করিয়া মোছাই নাই। ফলে সামান্য তেলা তেলা ভাব থাকিয়া গিয়াছিল। গান্ধীজী ঘুম ভাঙার পর তাহা লক্ষ্য করিয়া ন্যাকড়া দিয়া তাহা পরিপাটিভাবে মুছিতে লাগিলেন এবং আমাকে বলিলেন, তাঁহার ঘুমের কারণেও যেন আমি পা মুছিয়া ফেলায় অবহেলা না করি।

বিশ্রামের পর গান্ধীজী চিঠিপত্র লইয়া বসিতেন। যে-সকল চিঠি নিজের উত্তর দিবার প্রয়োজন আছে, সেগুলির উত্তর লিখিয়া নকল করিবার পর অবশেষে ডাকে দিবার জন্য আমাদিগকে দিতেন। চিঠি লেখার মধ্যে একটি ব্যাপার ছিল। যে-সকল চিঠি আসিত তাহার প্রত্যেক খামখানির প্রান্ত কাঁচি দিয়া কাটা হইত—খামটি ভাল হইলে অর্থাৎ তাহার কাগজ পুরু হইলে, তাহা কাটিয়া একটু ছোট খামে পরিণত করার ব্যবস্থা ছিল। লেখা অংশের উপরে সাদা কাগজ মারিয়া গান্ধীজী পুনরায় উহা ব্যবহার করিতেন। সাথীদের মধ্যে কাহারও উপর ভার থাকিত, সে যেন প্রত্যহ ছয়খানি খাম এইরূপে পুনরায় ব্যবহারের যোগ্য করিয়া দেয়। যে-খাম অচল তাহা কাটিয়া ভিতর পিঠের সাদা

অংশ প্রবন্ধ লেখার জন্য বা অন্য কোনও নির্দেশ দিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। টেলিগ্রামের উল্টা পিঠ, কোনও চিঠির শেষে অব্যবহৃত সাদা অংশ—কিছুই নষ্ট হইত না। গান্ধীজীর কাছে তাহার পুরা ব্যবহার হইত।

চিঠি লেখার কাজ কিছু হইলে বেলা একটায় গান্ধীজী ভাবের জল খাইতেন। এবং কিছুক্ষণের জন্য পেটে, এবং কখনও কখনও কপাল ও চোখের উপরেও মাটির প্রলেপ দিয়া শুইয়া থাকিতেন। মাথার শির তাঁহার ফোলাই থাকিত, তাহা ছাড়া ক্রনিক এমিবিয়েসিস (amoebiasis) রোগ তো তাঁহার ছিলই। তিনি বলিতেন, রোগ হইয়াছে বলিয়া নয়, রোগ যাহাতে না হয়, সেইজন্য প্রত্যহ তিনি মাটির ঠাণ্ডা পটি ব্যবহার করিতেন। শরীর যাহাতে কর্মঠ অবস্থায় থাকে তাহার জন্য যত্ন বা চেষ্টার তাঁহার অভাব ছিল না।

মাটির পটি প্রায় আধ ঘণ্টা থাকিত। সে সময়টুকুর মধ্যেও কিছু কিছু কাজ হইয়া যাইত। একদিন জনৈক ফরাসী সাংবাদিক ওই সময়ে তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা কহিয়া গেলেন। কিন্তু সচরাচর তখন কথাবার্তার সময় ছিল না। বেলা তিনটা নাগাদ গান্ধীজী সুতা কাটিতে বসিতেন। সেই সময়ে কেহ না থাকিলে খবরের কাগজ পড়া হইত। জরুরী সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন থাকিলে ঐ সময় হইতে বিকাল সাড়ে চারটা পর্যন্ত বিভিন্ন বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সময় ধার্য করা হইত। সে বিষয়ে পরবর্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

গান্ধীজী একটি বিষয়ে বড় বিরক্ত হইতেন। ঘরের বাহির হইতে কেহ উঁকি মারিয়া দেখিতেছে, অথবা জানালার খড়খড়ি তুলিয়া তিনি কি করিতেছেন তাহার দিকে চাহিয়া আছে, ইহা জানিতে পারিলে তিনি ডাকিয়া বলিতেন, ভাই, যদি কোনও দরকার থাকে ভিতরে আসিয়া ব'স। এমনও হইয়াছে যে, কেহ কেহ শুধু তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন। আমরা তাঁহাদের সুযোগ বুঝিয়া ঘরে বসাইতাম, তাঁহারা কিছুক্ষণ কর্মরত গান্ধীজীকে দর্শন করিয়া দূর হইতে প্রণাম জানাইয়া চলিয়া যাইতেন। গান্ধীজীও হাত তুলিয়া তাঁহাদিগকে নমস্কার করিতেন, এবং খুশিমনে আপন কাজে লিপ্ত থাকিতেন। এক-আধদিন স্বীয় কাজে ব্যস্ত আছেন, প্রণাম লক্ষ্য করেন নাই, সে জন্য কাহাকেও কাহাকেও বিরক্ত হইতে দেখিয়াছি। আবার গ্রামের মেয়েদের দেখিতাম, তাঁহারা বাহির হইতে শুধু দর্শন করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়াই দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন।

শ্রীরামপুরে একদিন কাজের তাড়াহুড়ায় ব্যস্ত রহিয়াছি, কয়েকজন গ্রাম্য-বন্ধু গান্ধীজীর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উঁকিঝুঁকি মারিতেছিলেন। গান্ধীজী তাঁহাদিগকে হিন্দীতে কিছু বলেন, সম্ভবত বসিতেই বলিয়াছিলেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই এবং যেমন ভাবে ছিলেন, তেমন ভাবেই রহিয়া গেলেন। অল্পক্ষণ পরে আমি আসিলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, Are they observing my asinine qualities? বুঝিলাম, গান্ধীজী বিরক্ত হইয়াছেন। আগন্তুক বন্ধুদের বুঝাইলাম, তাঁহারা যদি দর্শন করিতে চান ঘরের মধ্যে আসুন। তাঁহারা কথাটা বুঝিয়া ঘরে মাদুরের উপরে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া দণ্ডবৎ করার পর প্রস্থান করিলেন।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

বিষামৃত

কারো বা আকাশে গ্রীষ্ম; স্মরভস্ম হর-কোপানলে—
সূর্য যেন শংকরের ক্রোধোদ্দীপ্ত তৃতীয় নয়ন;
কারো বা বিরহ নামে আষাঢ়ের দুরন্ত বাদলে—
শূন্য মন্দিরের বুকে নিদ্রাহারা কণ্টক-শয়ন।
কারো ভাগ্যে বর্ষা-রাতে প্রেয়সীর অভিসার চলে,
রতিবন্ধু প্রজাপতি ক'রে দেয় বাসর-মিলন;
আষাঢ়ের বিভাবরী ঘন হয় বরমাল্য-গলে,—
পুষ্প আর পুষ্পতনু,—স্পর্শরসে একই আস্বাদন।

সমুদ্র মন্থন ক'রে উঠেছিল কমলা-বসুধা,
মৃণ্ময় রসের ভাণ্ডে জমা তার অমিয়-গরল;
সম্ভোগের শেষ নেই, যত তৃপ্তি তত বাড়ে ক্ষুধা,
বিরহ-মিলন-চক্রে মর্ত্যলীলা চলে অবিরল:
কারো বা কপাল-গুণে কণ্ঠ জুড়ে শুধু হলাহল,
কেহ বা জীবনভরে অবহেলে পান করে সুধা।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য

ডানা

৪

মন্দাকিনী খুব ভোরেই উঠেছেন সেদিন। উঠেই প্রথমে তিনি গেলেন ঘুঁটেগুলো দেখতে। কাল রাত্রে এক-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঘুঁটেগুলো ভিজে গোবর হয়ে গেল বোধ হয়। গিয়ে দেখেন, ঘুঁটেগুলো ভিজে তো গেছেই, একপাল গোশালিক এসে তছনছ করছে সেগুলোকে। ঠুকরে মাড়িয়ে চীৎকার চেঁচামেচি ক'রে কি কাণ্ডই যে বাধিয়েছে মুখপোড়ারা! নিরুপায় ক্ষোভে তাঁর চোখে জল এসে গেল যেন। একে আজকাল কয়লা কাঠ কিছুই পাওয়া যায় না, চাকর-বাকর নেই, ঠিকে ঝি এবেলা ওবেলা কোন রকমে বাসনটা মেজে দিয়েই পালায়, নিজের হাতেই কাল ঘুঁটে দিয়েছিলেন। সমস্ত ভিজে গেছে। গোশালিকগুলো নিমগাছটার উপর ব'সে কলরব করছিল, সেদিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে গেলেন তিনি সুন্দরীর গোয়ালে। গোয়ালেও যা দেখলেন, তা আনন্দজনক নয়। গোয়ালের চাল ছাওয়ানো নেই ভাল ক'রে, সুন্দরী সমস্ত রাত ভিজেছে বৃষ্টিতে। বাছুরটার সারা গায়ে গোবর। সুন্দরীর পিছনের পা দুটোও গোবরে মাখা। সব পরিষ্কার করতে হবে নিজেকে। হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা শক্তি সঞ্চারিত হ'ল তাঁর; উৎসাহের উৎসমুখ অবারিত হ'ল সহসা; নিজের অজ্ঞাতসারেই জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি। খাদ্য পেলে পুলকিত হয় যেমন ক্ষুধার্ত, কাজ পেলে তেমনই আনন্দিত হন মন্দাকিনী। দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে তিনি বাছুরটাকে সরিয়ে বাঁধলেন, সুন্দরীকে বাইরে বার ক'রে দিলেন। আমগাছটার দিকে একবার চাইলেন, খুব মুকুল এসেছিল, বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল সব। ক্ষণকাল ধৌত-পরাগ মুকুলগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, পাপে ভ'রে রয়েছে পৃথিবী, তাই এই সব অনাসৃষ্টি হচ্ছে। গরুর দুধ নেই, খেজুরগুড়ে গন্ধ নেই, অসময়ে বৃষ্টি। সুন্দরীকে বেঁধে গেলেন তিনি বাড়ির মধ্যে। রান্নাঘরের একটা উনুন পরিষ্কার ক'রে নিকিয়ে কাঠের জালে চা করতে হবে। নিজের জন্যে নয়—ওঁর জন্যে। তারপর রান্নাঘর ধুয়ে উনুনে ডালের হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়ে চান করতে যাবেন তিনি। ততক্ষণ ঠিকে ঝিটা এসে যাবে, বাজার ক'রে আনবে, তারপর বাসন মাজবে, জল তুলবে, ঘরদোর পরিষ্কার করবে। ততক্ষণ মন্দাকিনীর স্নান সারা হয়ে যাবে, পুজোও সারা হয়ে যাবে। তারপর পাথরের গ্লাসে ক'রে একটি পুরো গ্লাস চা খাবেন তিনি। চা খেয়ে তারপর বাকি রান্নাটা করবেন। কি

চ'লে যাবে। আনন্দবাবু তো চা খাবার পরই রোজ বেরিয়ে যান বাইনাকুলার হাতে ক'রে পাখি দেখতে। বারোটার আগে কোনও দিন ফেরেন না। এই সময়টুকুর মধ্যে মন্দাকিনী টুকিটাকি নানা কাজ করেন। সুন্দরীর তদারক করেন, খাবার করেন, বিকেলের জন্য পরোটা তরকারি করতে হয়, মাঝে মাঝে দু-একটা শৌখিন খাবারও করেন জিনিসপত্র ফেলে। কাল গোয়ালার কাছ থেকে দুধ কিনে ক্ষীর ক'রে রেখেছেন রাত্রে, আজ মালপোয়া করার ইচ্ছে আছে। সোৎসাহে তিনি উনুন পরিষ্কার করতে লাগলেন। পরিষ্কার ক'রে কাঠের ঘরে গেলেন কাঠ আনতে। কাঠের ঘরের চালাটাও শত-ছিদ্র, জল প'ড়ে সব কাঠ ভিজে গেছে। ওরই মধ্যে থেকে বেছে বেছে কিছু কাঠ নিয়ে এলেন তিনি, পুরোনো খবরের কাগজ আর সামান্য কেরোসিন তেল দিয়ে ধরালেন সেগুলো। একটু ধ'রেই নিবে গেল আবার। বেশি কেরোসিন দিলে ধ'রে যেত। কিন্তু উনুন ধরাবার জন্যে বেশি কেরোসিন আজকাল খরচ করা চলে না। পয়সা ফেললে বাজারে মিলবে না। রাত্রে পড়াশোনা করবার করবার জন্যে ওঁর তেল চাই। শুয়ে শুয়ে না পড়লে ঘুমই হয় না। যত সব বদ অভ্যাস! ঘরে আলো জ্বললে তাঁর তো ঘুমই আসে না। এই দুঃখে ওঁর কাছে শোওয়া ছেড়েই দিয়েছেন তিনি আজকাল। পাশের ঘরে শোন। উনি একা ঘরে পড়েন শুয়ে শুয়ে। কখনও বা উঠে লিখতে ব'সে যান। অদ্ভুত মানুষ! না, কেরোসিন আর খরচ করা চলবে না। হেঁট হয়ে উনুনে ফুঁ দিতে লাগলেন আর গজগজ ক'রে গাল পাড়তে লাগলেন। আনন্দমোহনকে নয়, নিজের অদৃষ্টকেও নয়, বিধাতাকে। মন্দাকিনীর ধারণা, ওই মুখপোড়াই দুষ্টুমি ক'রে মাঝে মাঝে গোলমাল ক'রে দেয় সব। খোকনের প্রতি তাঁর যে মনোভাব, বিধাতার প্রতিও তেমনই। এও তাঁর মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস, শত দুষ্টুমি সত্ত্বেও খোকনকে যেমন শেষকালে হার মানতে হয় তাঁর কাছে, বিধাতাকেও তেমনই হবে। সেই ছেলেবেলায় পুণ্যি-পুকুর থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত তিনি যে পথে নিষ্ঠাভরে চ'লে এসেছেন, সেই পথেই তিনি লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। বিধাতার সাধ্য নেই, তাঁকে আটকায়। মাঝে মাঝে তিনি দুষ্টুমি ক'রে পথের মাঝখানে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন—মনের জোর আছে কি না পরীক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু ওসবে দমবার লোক মন্দাকিনী নন। কিন্তু দুষ্টুমি করার তো একটা সীমা থাকা উচিত, অসময়ে বৃষ্টি ক'রে শুকনো

কাঠগুলো ভিজিয়ে দেশসুদ্ধ লোকের চোখকে ধোঁয়ায় জ্বলিয়ে দেওয়ার মানে হয় কোনও? মন্দাকিনী হেঁট হয়ে হয়ে ক্রমাগত ফুঁ দিতে লাগলেন।

কবি সকালে উঠে মুখ ধুয়েই গিয়েছিলেন ছাতে। মনটা খুব প্রসন্ন ছিল। অকারণ পুলকে ঝলমল করছিল সমস্ত অন্তঃকরণ। মোটা মোটা ঠোঁট দুটোকে কুঁচকে শিস দেবার চেষ্টা করলেন একটু। রাত্রের বৃষ্টিতে সব মলিনতা ধুয়ে গেছে যেন। গাছপালার শ্যামশোভা আরও উজ্জল হয়ে উঠেছে। দোয়েল পাখিটা ইউক্যালিপটাস গাছের ডালে ব'সে ডেকে চলেছে অবিরাম। ফিঙে একটা ব'সে আছে টেলিগ্রাফের তারে। নীলকণ্ঠ উড়ে এসে বসল একটা। কালো কালো দুর্গাটুনটুনিরা ডাকছে ক্রমাগত। হঠাৎ চোখে পড়ল, উত্তর দিকে কাস্তু-বর্ণ একটা মেঘ লম্বিত রয়েছে, তাতে রোদের আভা লেগেছে, মনে হচ্ছে একটা অপরূপ পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে কেউ যেন। মনে পড়ল কুমারসম্ভবের শ্লোক—

যত্রাংশুকাক্ষেপ বিলজ্জিতানাং যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্
দরীগৃহদ্বার বিলম্বিবিম্বাস্তিরস্করিণ্যো জলদা ভবন্তী।

কল্পনায় জেগে উঠল, হিমালয়ের গুহাভ্যন্তরে নগ্না কিন্নরীকুলের লজ্জা-নিবারণের জন্য মেঘ যবনিকার মত ঢেকে দিয়েছে গুহামুখ। অদ্ভুত কল্পনা কালিদাসের! স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ সেদিকে। কিটকিরিভরা এক ঝাঁক সুর আছড়ে পড়ল সহসা তাঁর চেতনায়। উজ্জয়িনী থেকে ফিরে আসতে হ'ল, নেমে পড়তে হ'ল হিমালয় থেকে। ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন, নিমগাছের উপর একঝাঁক পাখি ডাকছে। তাড়াতাড়ি নেবে গেলেন নিজের তেতলার ঘরটিতে। দূরবীনটা নিয়ে দেখতে লাগলেন ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে। জানলার ভিতর দিয়ে নিমগাছটা স্পষ্ট দেখা যায় আরও। বিস্মিত হয়ে গেলেন দেখে। গোশালিকের ঝাঁক। গোশালিকের এত রূপ! এত সুর তার কণ্ঠে! যে গোশালিকের দল একটু আগে মন্দাকিনীর ক্রোধের কারণ হয়েছিল, তারাই জাগাল কবির মনে কবিতা।—

রূপ যে তোমার নতুন ক'রে
দেখতে পেলাম আজকে মিতা
ও গোশালিক, দেখতে পেলাম
তুচ্ছ নও, রূপান্বিতা!

দেখতে পেলাম ভোরের আলোয়
মানিয়েছে বেশ সাদায় কালোয়
ঠোঁটে তোমার রঙ মেহেদি
চোখ মেলে তো দেখিই নি তা।

দোয়েল শ্যামা বুলবুলিরা
সুর-গরবে অহঙ্কারী
শুনুক তারা কণ্ঠে তোমার
উঠছে সুরের কি ঝঙ্কারই

অতি-চেনার বোরখা প'রে
দাঁড়িয়েছিলে ঘরের দোরে
বেরিয়ে এলে বোরখা খুলে
অর্থ টা তার বলবে কি তা ?
রূপ যে তোমার নতুন ক'রে
দেখতে পেলাম আজকে মিতা।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে মন্দাকিনী প্রবেশ করলেন। ক'রেই বললেন, তোমার কি ভীমরতি ধরেছে নাকি! রাঁধুনী বামুন রাখতে চাইছ, টাকা কোথায় অত ?

রাঁধুনী বামুন!

স্বপ্নলোক থেকে নেবে এলেন কবি এবং নেমে এসেই সচেতন হলেন পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে।

একটা মৈথিল বামুন এসেছে। বলছে, তুমি নাকি রূপচাঁদবাবুকে বলেছিলে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। এই খরচই কুলোতে পারছি না, আবার বামুন কেন ?

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন কবি।

বললেন, হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে রূপচাঁদকে। এসেছে বামুন ? রাখ না। খেটে খেটে মরবার যোগাড় হয়েছে যে।

মন্দাকিনী মনে মনে প্রীত হলেন একটু। মুখে কিন্তু বললেন, খাটলে আবার মানুষে মরে নাকি ? কাজকর্ম না থাকলে সমস্ত দিন করবই বা কি ?

কাজের ভাবনা কি? এস না, দুজনে মিলে পাখি দেখি। কি অদ্ভুত যে—হয়েছে।—হেসে ফেললেন মন্দাকিনী। নাও, চা-টা খেয়ে নাও, পেয়ালাটা নিয়েই যাই।

কবি ডিশে ঢেলে ঢেলে চা খেতে লাগলেন। চলকে খানিকটা চা প'ড়ে গেল কাপড়ে।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন মন্দাকিনী, আবার কাপড়ে চা ফেললে তো! সমস্ত কাপড়গুলোতে দাগ হয়ে গেছে! চায়ের দাগ সহজে কি উঠতে চায়?

কবি হেসে বললেন, ওঠাবার দরকার কি, থাক্ না।

ওসব নোংরামি আমি দেখতে পারি না।

দুজনেই চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। গোশালিকের কলরব আবার উদ্দাম হয়ে উঠল নিমগাছে। কবির চোখ আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সমস্ত চা-টা ডিশে ঢেলে এক নিমিষেই পান ক'রে ফেললেন সবটা।

বামুনটাকে রাখ, বুঝলে? পাখি যদি একবার দেখতে আরম্ভ কর, তা হ'লে বুঝবে, কি চমৎকার জিনিস ও। এই গোশালিকই এতদিন অচেনা ছিল আমার কাছে।

কবি হঠাৎ একটা প্রত্যাশাভরা দৃষ্টি তুলে চাইলেন তাঁর স্ত্রীর দিকে। মনে একটা ক্ষীণ আশা জাগল, গোশালিকের মধ্যে তিনি যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে নূতন রূপ আবিষ্কার করেছেন, তাঁর প্রৌঢ়া গৃহিণীর মধ্যেও হয়তো তিনি আজ তেমনই আবিষ্কার ক'রে ফেলবেন সঙ্গিনীকে, যে শুধু তাঁর সন্তানের জননী নয়, সংসারের কর্ত্রী নয়, যে তাঁর কবি-মানসের বিবিধ বিচিত্র খেয়ালের সহচরী। মন্দাকিনীর উত্তর শুনে কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মস্থ হতে হ'ল তাঁকে।

ঝাঁটা মারি আমি গোশালিকের মুখে। সমস্ত ঘুঁটেগুলোকে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে, নখ দিয়ে খুঁড়ে তছনছ করেছে একেবারে।

ও বেচারাদের চ'রে খেতে হবে তো। ওদের তো আর পেনশন নেই আমার মত।

এর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনই অনুভব করলেন না মন্দাকিনী। ঘরের কোণে যে ফুল-ঝাড়ুটা রাখা ছিল, সেটা নিয়ে তিনি কবির বই-রাখা শেল্ফ-

(৩১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৩

পরিষদের কর্মক্ষেত্রে

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এক স্থলে বলিয়াছেন :—"রামেন্দ্র দেশহিতের জন্য তিনটি অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, একটি সাহিত্য-পরিষৎ, একটি সাহিত্য-সম্মিলন, আর একটি সাহিত্য-পরিষদের মন্দির।" কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য।

"১৩০০ সালের ৮ই শ্রাবণ [১৮৯৩, ২৩এ জুলাই] তারিখে শোভাবাজারের শ্রীযুক্ত মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে ও আশ্রয়ে বীম্‌স্‌ সাহেবের প্রস্তাব [১২৭৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' দ্রষ্টব্য] কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য 'বেঙ্গল একাডেমি অব্‌ লিটারেচার' প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রেঞ্চ একাডেমি ইহার আদর্শ ছিল, এবং শ্রীযুক্ত লিওটার্ড নামক একজন ফরাসী ভদ্রলোক এই সভা-স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুর এই সভার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী সম্পাদক ছিলেন।...

"একদিকে ইংরাজি সাহিত্যের, এবং অন্য দিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বন পূর্বক বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন, সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল।...সভার কার্য্যবিবরণাদি ইংরাজি ভাষাতে লিপিবদ্ধ হইত, এবং দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার নামক মাসিক পত্রিকাখানির অধিকাংশ ইংরাজিতেই লিখিত হইত। একাডেমি অব লিটারেচারের কার্য্যকলাপে এইরূপ ইংরাজিবহুলতা দেখিয়া কতিপয় সভ্য আপত্তি করেন, এবং জাতীয়-সাহিত্যানুরাগী কোন কোন ব্যক্তি প্রতিবাদও করিতে থাকেন। একাডেমি অব লিটারেচার এই নাম সম্বন্ধেও অনেক আপত্তি-সূচক কথা উপস্থিত হয়। এই হেতু শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল এম. এ., সি. এস মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে একাডেমি অব লিটারেচারের প্রতিশব্দ স্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ নাম পরিগৃহীত হয়। তন্নিমিত্ত সভার পত্রিকাখানি দি বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, এই উভয় আখ্যায় আখ্যাত হইয়া বাহির হইতে থাকে। ফল কথা, ইংরেজি-বহুলতার নিমিত্ত আপত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায়, এবং দেশীয় ভাবে দেশীয় সাহিত্যালোচনার আবশ্যকতা ক্রমশঃ বুঝিতে পারায়, বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচারকে পুনর্গঠিত করিয়া নূতন ভিত্তির

উপর স্থাপিত করিতে অনেকে ইচ্ছুক হইয়া উঠেন।...সভ্যগণ পূর্ব্বোক্ত স্থানে ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ [২৯ এপ্রিল ১৮৯৪] রবিবার অপরাহ্নে পূর্ব্বোল্লিখিত বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার, বর্ত্তমান ভিত্তির উপর পুনর্গঠিত করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ নামে অভিহিত করেন।...ফলতঃ ওই ১৭ই বৈশাখের অধিবেশনকেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম অধিবেশন বলিতে হইবে।" (১৫শ ও ১ম বার্ষিক বিবরণী)

বেঙ্গল একাডেমি অব লিটারেচার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রূপান্তরিত হইবার অব্যবহিত পরেই, ১৪ই শ্রাবণ (২৯ জুলাই ১৮৯৪) তারিখে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। পরবর্তী ২৪এ অগ্রহায়ণ অন্যতর সম্পাদক-রূপে তিনি পরিষদের কর্ম্মে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাকে পরিষদে আকৃষ্ট করেন তাঁহার বন্ধু ও প্রতিবেশী রজনীকান্ত গুপ্ত; তিনি তখন 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র সম্পাদক। রামেন্দ্রসুন্দর লিখিয়াছেন:—"ছয় বৎসর পূর্ব্বে আমি তাঁহার সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলাম। তদবধি পরিষদের সম্পর্কীয় সকল কার্য্যসম্পাদনেই আমি তাঁহার সহচর ছিলাম" ('সাহিত্য', জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭)।

"দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমান শিশু পরিষৎকে ধাত্রীক্রোড় হইতে বাহির করিয়া মুক্ত প্রাঙ্গণে বিচরণের স্বাধীনতা দেওয়া উচিত," এই চিন্তা রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, সমাজপতি প্রমুখ অনেকেরই মনে উদয় হইতেছিল। ইহার ফলে ১৩০৬ সালের ৪ঠা ফাল্গুন (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯০০) তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবন হইতে ১৩৭।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়। স্থান পরিবর্ত্তনের ফলে পরিষদের সভ্য-সংখ্যা আশাতীত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ভাড়াটিয়া বাড়ীর কয়েকখানি সংকীর্ণ ঘরে স্থান সঙ্কুলান হইবার কথা নয়। কি করিয়া পরিষৎকে নিজস্ব ভবনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, এই চিন্তাই তখন প্রবল হইল। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখ পরিষদের কয়েকজন বন্ধু কাশীমবাজারের বিদ্যোৎসাহী বদান্য মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর শরণাপন্ন হইলেন; মহারাজও তাঁহাদের বিমুখ করিলেন না, হালসীবাগানে আপার সারকুলার রোডের উপর প্রায় ৭ কাঠা জমি দান করিলেন। মন্দির নির্ম্মাণের আয়োজন চলিতে লাগিল। পরিষদের অক্লান্ত কর্ম্মী ব্যোমকেশ মুস্তফী একদিন রামেন্দ্র-

বাবুকে বলিলেন, আপনার কল্পনা-মত পরিষদ্-ভবন নির্মাণ করিবার মত টাকা কোথায়? উত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠেন, দেশের কাজে যদি টাকা না পাওয়া যায়, তা হ'লে চলুন, সব বন্ধ ক'রে আমরা বাড়ী গিয়ে ব'সে থাকি। অর্থাভাবে পরিষদের কাজ অসম্পূর্ণ থাকিবে, এ চিন্তা রামেন্দ্রসুন্দরের নিকট অসহ্য ছিল। টাকা সংগ্রহ হইতে লাগিল, এজন্য রামেন্দ্রসুন্দর ভিক্ষাপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেও সংকোচবোধ করেন নাই। একমাত্র তাঁহারই চেষ্টায় লালগোলা-নিবাসী রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় মন্দিরের দ্বিতল নির্মাণের সমুদয় ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

১৩১৫ সালের ২১এ অগ্রহায়ণ (৬ ডিসেম্বর ১৯০৮) নবনির্মিত মন্দিরে পরিষদের গৃহ-প্রবেশ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন রামেন্দ্রসুন্দরের আনন্দ-বিহ্বল মূর্তি ভুলিবার নহে; তিনি প্রাণের কামনা ব্যক্ত করিয়া ওই বৎসরের কার্যবিবরণীতে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"সাহিত্য-পরিষদের নূতন মন্দির বঙ্গের সাহিত্যসেবকগণের সম্মিলনকেন্দ্র-স্বরূপ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহারা এই কেন্দ্রস্থলে সমবেত হইয়া সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আলাপ ও পরামর্শ করিবার ও পরস্পর আত্মীয় সম্পর্কে আবদ্ধ হইবার সুযোগ পাইবেন। জ্ঞানান্বেষিগণ এই মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া নব নব তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত রহিবেন, এবং দেশ মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার দ্বারা স্বদেশকে উন্নতিমার্গে প্রেরণ করিবেন। অতীত কালের মহাপুরুষগণের স্মরণ-নিদর্শন সগৌরবে বহন করিয়া এই মন্দির বঙ্গবাসীমাত্রের তীর্থস্বরূপে পরিণত হইবে। অনাগত ভবিষ্যতে পরিষদের এই সকল ও অন্যান্য উচ্চ আশা যে পূর্ণ হইবে, পরিষৎ এখন তাহার স্বপ্ন দেখিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালীর একমাত্র গৌরবের বস্তু। এই পতিত জাতির যদি উদ্ধারসাধন হয়, তাহা সাহিত্যের বলেই হইবে, এ কথা ধ্রুব সত্য।" (১৫শ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী)

রামেন্দ্রসুন্দর যখন পরিষদে যোগদান করেন, তখন উহার শৈশবাবস্থা। যতই দিন গিয়াছে, তিনি উহাকে বলিষ্ঠ ও কর্মিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরিষদ্‌ই তাঁহার ধ্যান-ধারণা ছিল। তাঁহার একখানি পত্রে আছে:— "আমি চিরজীবন পরিষদের সেবকের কার্য করিয়া যাইব, ইহাই আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা।" পরিষদে তাঁহার কার্যকালের হিসাব এইরূপ:—

১৩০১, ২৪ অগ্রহায়ণ	...	অন্যতর সম্পাদক
১৩০২-৩	...	কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য
১৩০৪-৫	...	আয়ব্যয়-পরীক্ষক
১৩০৬-১০	...	পত্রিকাধ্যক্ষ
১৩১১-১৮	...	সম্পাদক
১৩১৯	...	অসুস্থতাবশত সাময়িকভাবে অবসর গ্রহণ
১৩২০-২১	...	কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্য
১৩২২	...	সহকারী সম্পাদক
১৩২২, ৩১ ভাদ্র—১৩২৩	...	সহকারী সভাপতি
১৩২৪-২৫	...	পত্রিকাধ্যক্ষ
১৩২৬, ১৮-২৩ জ্যৈষ্ঠ (৬ দিন)		সভাপতি

পরিষদের অনুষ্ঠিত প্রায় সকল সৎকর্মের মূলেই রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা প্রবর্তনে ও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নির্ণয়ে পরিষদের যে চেষ্টা, সে চেষ্টা প্রধানত রামেন্দ্রসুন্দরেরই চেষ্টা। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের আলোচনার প্রবর্তনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ যে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, সে সফলতার মূলেও রামেন্দ্রসুন্দরের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"সাহিত্য-পরিষদের জীবনের দ্বিতীয় বৎসরে এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা হইয়াছিল। কিন্তু সে সময় সে আবেদন সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। বাঙ্গালা সাহিত্য যে উচ্চ শিক্ষার বিষয় হইতে পারে, তাহা স্বীকারে বিশ্ববিদ্যালয় তখন কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দান বা পরীক্ষা গ্রহণ প্রকৃষ্টভাবে চলিতে পারে, এ কথাও তখন অনেকের নিকট উপহাস্য হইয়াছিল। উক্ত আবেদনে কেবল এইটুকু ফল হইয়াছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম করিয়াছিলেন, ফার্ষ্ট আর্টস ও বি-এ পরীক্ষায় কোনও পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করিলে বাঙ্গালা রচনা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারিবেন। সম্প্রতি নব সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্য-পরিষদের তাৎকালিক প্রার্থনা প্রায় সম্পূর্ণভাবে পূরণ করিয়াছেন, ইহা অতীব আনন্দের বিষয়। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তিত নূতন নিয়মের ফলে মধ্যপরীক্ষায় ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা সাহিত্য প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য পাঠ্য ও অবশ্য শিক্ষণীয় বলিয়া

নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় শিক্ষার্থীরা ইচ্ছা করিলে, বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে পারিবেন এবং বাঙ্গালা ভাষাতেই উত্তর লিখিতে পারিবেন, ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে।...সাহিত্য-পরিষৎ আশা করেন যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির সহিত এমন দিন আসিবে যে, উচ্চশিক্ষার বিষয়ীভূত যাবতীয় শাস্ত্র, যাহা এখন ইংরাজীতে অধীত ও অধ্যাপিত হয়, তাহার অধ্যয়ন-অধ্যাপন এবং পরীক্ষা গ্রহণ সমস্তই আমাদিগের মাতৃভাষাতেই সম্পাদিত হইবে।" (১৫শ সাংবৎসরিক কার্যবিবরণী)

মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় ও অবিচলিত শ্রদ্ধা-বুদ্ধিসম্পন্ন না হইলে যে কোন জাতিই বড় হইতে পারে না, এ কথা রামেন্দ্রসুন্দর বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন, আর এই জন্যই তিনি পরিষদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন। পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার সম্বন্ধে সত্যই লিখিয়াছিলেন—

"রামেন্দ্রবাবুর অনুবাদিত বৈদিক গ্রন্থ হইতে আমরা জানিয়াছি যে, এই বিশাল বিচিত্র সৃষ্টি প্রজাপতির বিরাট্ আত্মত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রজাপতি আত্মবলি দিয়াছিলেন বলিয়াই এই সৃষ্টি সম্ভাবিত হইয়াছিল। ত্রিবেদী-মহাশয়ের জীবন-ব্রতের মধ্যেও ঐ জাতীয় আত্মত্যাগের আমরা নিদর্শন পাই। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সাহিত্য-পরিষদের জন্য নিজেকে বলিস্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন। এই বিশাল আত্মত্যাগের উপরই পরিষদের অভ্যুদয় প্রতিষ্ঠিত। রামেন্দ্রসুন্দর যশ, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সমুদয় বিসর্জ্জন দিয়া, একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় পরিষদের সেবায় আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আজ যে পরিষদের এত সমৃদ্ধি ও সার্থকতা, এত প্রসার ও প্রতিপত্তি, ইহার মূলে রামেন্দ্রসুন্দরের বিপুল আত্মত্যাগ।"

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন

১৩১২ সালের ৪ঠা শ্রাবণ বঙ্গব্যবচ্ছেদের সংবাদ ঘোষিত হইলে দেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। রামেন্দ্রসুন্দর তখন পরিষদের সম্পাদক। তিনি মাঝে মাঝে সহকারী সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বসিয়া পরিষদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে জানাইলেন, "বাঙলা দেশ এবং বাঙালী জাতি

সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য হইতে পারে, সাহিত্য-পরিষৎ যদি সেই সমস্ত বার্ত্তা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন, তাহা হইলে পরিষদের জীবন সার্থক হইবে। এই কার্য্যের জন্য সমস্ত বাঙলা দেশ ব্যাপিয়া সমস্ত বাঙালী জাতিকে যথাসম্ভব জাগাইয়া তোলা পরিষদের সম্প্রতি মুখ্য কর্ত্তব্য। আপাততঃ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কলিকাতায় না করিয়া বাঙলার ভিন্ন ভিন্ন নগরে পর্য্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত করিলে কার্য্যটার সূচনা হইতে পারে।"* প্রস্তাবটি রামেন্দ্রসুন্দরের মোহ জন্মাইয়াছিল। তিনি পরিষদের ১৩১২ সালের কার্য্যবিবরণে এই প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য জাতীয় ঐক্যবন্ধন রক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। বঙ্গবিভাগের পর এই কথাটা অনেকের মনে স্পষ্টভাবে উঠিয়াছিল। এই বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য বর্ষে বর্ষে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন নগরে সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়া সাহিত্য-সেবীদিগের মিলন-সাধন এবং বাঙ্গলার প্রাদেশিক ভাষা, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস ও বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা চলিতে পারে। স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভে গত ভাদ্র মাসে টাউনহলে পরিষদের সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি ঐ প্রস্তাব সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে ঐরূপ বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন করিতে অনুরোধ করেন। প্রস্তাবকর্ত্তার সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝা গিয়াছিল যে, বিলাতের British Association for the Advancement of Science তাঁহার প্রস্তাবের আদর্শ ছিল। ঐ সমাজ কেবল বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা করেন; পরিষৎ এই উপলক্ষে বঙ্গের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যের আলোচনা করিবেন, এই মাত্র প্রভেদ ছিল।"

রামেন্দ্রসুন্দর একবার যে কাজের ভার গ্রহণ করিতেন, তাহা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না করিয়া ছাড়িতেন না, কোন বাধা-বিঘ্নই তাঁহার সঙ্কল্পকে টলাইতে পারিত না। তিনি বলিয়াছেন, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের লোকবল ও ধনবল আমার অজ্ঞাত ছিল না। সেই ক্ষীণ শক্তি লইয়া পরিষৎ কিরূপে এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, সেই চিন্তা বহুরাত্রি আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়াছে।"

* অভিভাষণ : 'মানসী', বৈশাখ ১৩২১, পৃ. ৪২০।

রামেন্দ্রসুন্দর ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারী ব্যোমকেশ মুস্তফীর ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং সাহিত্যবান্ধব কাশীমবাজারাধিপতি মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে ১৩১৪ সালের ১৭ই-১৮ই কার্তিক কাশীমবাজারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন—রবীন্দ্রনাথ। সভাপতির অভিভাষণের পর পরিষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে অপূর্ব রচনাটি পাঠ করিয়াছিলেন, স্থানাভাবে তাহার কিয়দংশমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"বাঙ্গলার ইতিহাসে বর্ত্তমান যুগকে আমরা দল-বাঁধার যুগ আখ্যা দিতে পারি। আজিকার হাওয়ার গতি দল-বাঁধার দিকে। যিনি যেখানে আছেন, তিনি সমানধর্ম্মা ব্যক্তিকে খুঁজিয়া লইয়া তাহার সহিত দল পাকাইতেছেন।...সকলের দেখাদেখি আমরাও জোট বাঁধিয়া এখানে আজ উপস্থিত হইয়াছি। সকলেই যদি দল বাঁধিতে চান, আমরাই বা দল না বাঁধিব কেন?...আমাদের বন্ধুগণ, যাঁহারা নানা স্থানে নানারূপ দল বাঁধিতেছেন, তাঁহারা সকলেই এক একটা কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিয়া লইয়াছেন।...আমরা সাহিত্যসেবী, আমরা দল বাঁধিয়া কি করিব? আমরা কর্ম্মক্ষেত্র কোথায় পাইব? আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র কিরূপ হইবে?

বলা বাহুল্য, আমাদের দলের সহিত অন্যান্য দলের একটু পার্থক্য আছে। কোন শরীরী জড়পদার্থ লইয়া সাহিত্যের কারবার চলে না, অশরীরী ভাব-পদার্থ লইয়া সাহিত্যের কারবার। আমরা ভবের হাটে বেচা-কেনা লেনা-দেনা করিয়া থাকি। আমাদের নিকট যাহার মূল্য অধিক, হাতে তাহা ধরা দেয় না, ছুঁইতে গেলে তাহা ধুঁয়ার মত ও বাষ্পের মত হাত হইতে সরিয়া পড়ে। কঠিন ধরাপৃষ্ঠে পা ফেলিয়া আমরা বিচরণ করি না; আমরা পাখীর মত বায়ুমার্গে উড়িয়া বেড়াই। এই উড্ডয়ন-কার্য্যে আমাদের আর কোন লাভ নাই; লাভের মধ্যে কেবল আনন্দ। এই আনন্দের জন্যই আমাদের যা কিছু পরিশ্রম এবং যা কিছু চেষ্টা, এবং বলা বাহুল্য, এই পরিশ্রম-স্বীকারে আমরা কুণ্ঠিত নহি। কেন না, এই চেষ্টাতেই আমাদের জীবনের সাফল্য।...

বাঙ্গলা দেশের বাঙ্গালী জাতির ধারাবাহিক ইতিহাস নাই; কিন্তু বাঙ্গলা দেশের অতি পুরাতন সাহিত্য আছে। সেই সাহিত্য বাঙ্গালীর

পক্ষে অগৌরবের বস্তু নহে। এমন কি, সেই সাহিত্যই বাঙ্গালীর পক্ষে একমাত্র গৌরবের ধন। চণ্ডীদাস মধুর রসের সুধার ধারা ঢালিয়া যে সাহিত্যকে আর্দ্র করিয়াছেন, রামপ্রসাদ তাঁহার মায়ের চরণে আপনাকে নৈবেদ্য-স্বরূপে অর্পণ করিয়া যে সাহিত্যে ভক্তিরসের স্নেহ সেচন করিয়াছেন, সেই সাহিত্য শিরে ধরিয়া, ভবের বাজারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অধিকারে আমাদিগকে বাধা দিতে কেহ সাহস করিবে না।

বসুমতীর বড়বাজারের প্রদর্শনীতে বাঙ্গালীর পক্ষে আর কোন পণ্যদ্রব্য দেখাইবার আছে কি?...জাতির সহিত জাতির ও রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের জীবনদ্বন্দ্বের বিকট কোলাহল, যাহা শত শতাব্দের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আজ পর্য্যন্ত মানবের ইতিহাসে ধ্বনিত হইতেছে, সেই কোলাহলের মধ্যে বাঙ্গালীর ক্ষীণ কণ্ঠ শ্রুতিগোচর হয় না বলিলেই চলে। বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের আশা ও ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা যাহাই হউক, বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসে বাঙ্গালীর বৈশ্যবৃত্তির ও বীরবৃত্তির কীর্ত্তিকথা লইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে আমরা কখনই সাহসী হইব না। নাই বা হইলাম! তজ্জন্য লজ্জিত বা কুণ্ঠিত হইবার হেতু দেখি না। বাঙ্গলার পুরুষপরম্পরাগত সহস্র বৎসরের ধারাবাহিক সাহিত্য রহিয়াছে। সেই সাহিত্য লইয়া আমরা ভবের হাটে উপস্থিত হইব; সেখানে কেহ আমাদিগকে ধিক্কার দিতে পারিবে না।

বাঙ্গলার ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু এই সাহিত্য হইতে আমরা প্রাচীন বাঙ্গালীর নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় পাই। সে কালের বাঙ্গালী কিরূপে কাঁদিত, কিরূপে হাসিত, তাহার অন্তরের মর্ম্মস্থলে কখন কোন্ স্বরে ধ্বনি উঠিত, তাহার আশার কথা, আকাঙ্ক্ষার কথা, তাহার স্বপ্নের কথা, এই প্রাচীন সাহিত্য হইতে আমরা জানিতে পারি। পৃথিবীতে কয়টা জাতি এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে? যাহারা এত দিনের এমন সাহিত্য দেখাইতে পারে, তাহাদিগকে আপনার অস্তিত্বের জন্য লজ্জিত হইতে হইবে না।...

বিধাতা কি মনে করিয়া এই পতিত জাতির মধ্যে আজ একটা নূতন হাওয়া তুলিয়াছেন; এবং সেই হাওয়ার বেগেই নীয়মান হইয়া আধুনিক বঙ্গের সাহিত্যসেবীরা আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। হাওয়ার

গতিবিধি নিরূপণ করিয়া আমাদের গন্তব্য পথের নির্ণয় করিতে হইবে।...

"বন্দে মাতরম" এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, শ্যামাঙ্গিনী জননীকে যে মূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি আমাদের উপস্থিত যুগধর্ম্মের অনুকূল মূর্ত্তি। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোন বাঙ্গালী মায়ের এই মূর্ত্তি এমন স্পষ্টভাবে দেখিতে পান নাই এবং সেই মূর্ত্তিকে ইষ্টদেবতারূপে স্বীকার করিয়া তদুপযোগী সাধনার সময় পান নাই।... সে মূর্ত্তি মায়ের ষোড়শী মূর্ত্তি, মা যাহা ছিলেন, অথবা কমলা মূর্ত্তি, মা যাহা হইবেন। এই মূর্ত্তি তিনি দেখিয়াছিলেন, আর ভক্তি-বিহ্বল-স্বরে ডাকিয়াছিলেন,—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।

অতঃপর আর বলিতে হইবে না, আমাদের যুগধর্ম্মের লক্ষণ কি? বঙ্গের সাহিত্যগুরু আমাদিগকে যে লক্ষ্য ধরিয়া যাইতে বলিয়াছেন, বঙ্গের সাহিত্য-সেবীমাত্রকেই সেই লক্ষ্যের অভিমুখে চলিতে হইবে।...

এই সাহিত্য-সম্মিলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত থাকিতে পারে। এই সভাস্থলে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারা অনেকেই অনেক উদ্দেশ্য লইয়া এখানে আসিয়াছেন। কেহ বা এই সাহিত্য-সম্মিলনকে বঙ্গের দুঃস্থ সাহিত্যসেবকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে বলিবেন; কেহ বা ইহাকে সাহিত্যিকগণের স্বার্থরক্ষিণী সভায় পরিণত করিতে চাহিবেন; কেহ বা বাঙ্গালা সাহিত্যের আবর্জ্জনা অপসারণের জন্য সম্মার্জ্জনী হাতে লইতে উপদেশ দিবেন; কেহ বা বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে গ্রাম্য অপভাষা নির্ব্বাসনের জন্য কমিশন বসাইতে অনুরোধ করিবেন। এই সমুদয় উদ্দেশ্যের সহিতই আমার সহানুভূতি

আছে। এ সকলই কাজের কথা ও পাকা কথা, তাহা আমি সন্দেহ করি না। কিন্তু যে কাজেই লিপ্ত থাকুন, একটা উচ্চতর লক্ষ্যকে সর্ব্বদা সম্মুখে না রাখিলে চলিবে না। আপনার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াও আমরণ সকলে মিলিয়া একটা উচ্চ লক্ষ্য, একটা মহৎ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে পারি।...

যে মায়ের পূজা করিব বলিয়া বাঙ্গালী আজ ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে, আমরা সাহিত্যসেবী, আমরাও আমাদের সামর্থ্য অনুসারে সেই মায়ের পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইব।...কিন্তু আমরা কিরূপে সেই মায়ের অর্চ্চনা করিব? আমরা যে মায়ের কোলে অবস্থান করিয়া তাঁহার স্তন্যপানে বর্দ্ধিত হইয়াছি, সেই মাকে আমরা ভাল করিয়া চিনিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। যে দিন আমরা মাকে চিনিতে পারিব, সে দিন আমাদের সাধনা পূর্ণ হইবে। কিন্তু এখনও আমাদের সাধনা আরম্ভ হয় নাই; আমরা সাহিত্য-সম্মিলনে উপস্থিত হইয়া যদি সেই চিনিবার উপায় বিধান করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলেই সাহিত্য-সম্মিলন সফল মনে করিব।"

জাতীয় চিত্রশালা: রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত তাঁহার প্রবন্ধে একটি সারস্বত-ভবন প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"সাহিত্য-পরিষদের সম্প্রতি একটি আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়াছে, সেই আকাঙ্ক্ষাটি আমি আপনাদিগকে পরিষদের পক্ষ হইতে জানাইতে চাহি।...সাহিত্য-পরিষৎ একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চাহেন, যেখানে বসিয়া আমরা বাঙ্গলা দেশকে ও বাঙ্গালী জাতিকে প্রত্যক্ষভাবে ও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইব, সেইখানে বসিয়া আমরা বঙ্গভূমির বর্ত্তমান অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে পারিব ও অতীত ইতিহাসের সম্যক্‌রূপে আলোচনার সুযোগ পাইব।

সেই মন্দিরের এক পার্শ্বে একটি পুস্তকালয় থাকিবে, সেখানে বাঙ্গলা ভাষায় রচিত মুদ্রিত-অমুদ্রিত, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থ সংগৃহীত হইবে, বঙ্গের নানা স্থান হইতে সংগৃহীত হাতেলেখা প্রাচীন পুঁথি সেইখানে স্তূপাকৃতি হইবে।...

মন্দিরের অন্য স্থানে আমরা বঙ্গের সাহিত্যিকগণের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইব।...

আর এক স্থানে বাঙ্গলার পুরাতত্ত্বের উপাদান সংগৃহীত হইবে। বাঙ্গলার যেখানে যে তাম্রশাসন বাহির হয়, যেখানে যে মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহা সেই স্থানে সজ্জিত হইবে। পাষাণের উপর বা ইষ্টকের উপর উৎকীর্ণ লিপিসমূহের প্রতিলিপি সুরক্ষিত হইবে। বঙ্গের পরিত্যক্ত রাজধানীসমূহের ভগ্নাবশেষের ছায়াচিত্র উহাদের পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করাইবে।...

আর এক স্থানে বাঙ্গলার কর্ম্মবীরদের স্মৃতিচিহ্নের সংগ্রহ থাকিবে। প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম হইতে রামগোপাল ঘোষ ও কৃষ্ণদাস পাল পর্য্যন্ত সকলেরই কোন না কোন নিদর্শন দেখিয়া আমরা পুলকিত হইব। কর্ম্মীদের পার্শ্বে পণ্ডিতদের স্থান থাকিবে।...

বাঙ্গলার বিখ্যাত জমিদার-বংশের ইতিবৃত্ত আমরা জানিতে পারিব। বাঙ্গলার ফুলফল, লতাপাতা, গাছপালা, জীবজন্তু, শিল্পসম্ভারের নমুনা দেখিয়া আমরা বঙ্গভূমিকে চিনিয়া লইব।...

এই মন্দিরকেই আমি মাতৃমন্দির নাম দিতে পারি, ও এই মন্দিরের মধ্যে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভারকে আমি মাতৃপ্রতিমা নাম দিতে পারি।"

রামেন্দ্রসুন্দর কেবলমাত্র এই আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানাইয়াই নিবৃত্ত হন নাই; তিনি অনতিবিলম্বে—১৩১৬ সালে নবনির্ম্মিত পরিষদ্-মন্দিরের একটি প্রকোষ্ঠে ঐতিহাসিক দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও রক্ষার জন্য চিত্রশালার সূচনা করিয়াছিলেন। বাঙালীর নিজস্ব চিত্রশালা স্থাপনের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা।

দরিদ্র সাহিত্যসেবী লোকবল জোগাইতে পারে,—ধনবল তাহাদের কোথায়? এই জন্য ভাগলপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে (২ ফাল্গুন ১৩১৬) পরিষৎ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর 'সারস্বত-ভবন' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব পুনরায় স্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন:—

"বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন যখন কাশীমবাজারে আহূত হয়, সেই অধিবেশনের প্রথম দিনে আমি সেই সমবেত সাহিত্য-সেবকগণের সম্মুখে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম।...তার পর দুই বৎসর গত হইল, কিন্তু আমাদের সেই মানস-স্বপ্ন, বঙ্গের সেই সারস্বত-

ভবন এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বটে, কিন্তু সেই সারস্বত-ভবনে যে সকল উপকরণ সঞ্চিত হইবে, তাহার সংগ্রহ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।...

কাশীমবাজার-সম্মিলনে যে সংকল্প হইয়াছিল, আপনারা সেই সংকল্প-সমাধানে সাহায্য করুন। সাহিত্য-পরিষৎ ইচ্ছা করেন যে, সেই সঙ্কল্পিত সারস্বত-ভবন রমেশ-ভবন নামে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হউক। স্বর্গগত রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতিনিদর্শনরূপে এই রমেশ-ভবনের ভিত্তি বাঙালীর হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরের প্রথম মাসে বঙ্গমাতার সুসন্তান রমেশচন্দ্র যে দিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন, সাহিত্য-পরিষদের পক্ষপাতী বন্ধুগণ সেই দিনকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসে নূতন পরিচ্ছেদের সূচনার দিন মনে করিয়া শ্লাঘাবোধ করেন।...আমি সাহিত্য-পরিষদের আদেশক্রমে রমেশচন্দ্রের স্মৃতিবিষয়ে উদ্যোগী হইবার জন্য আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। এই সারস্বত-ভবন অপেক্ষা যোগ্যতর স্মৃতিনিদর্শন আর কিছু হইতে পারে না।...রমেশচন্দ্রের ভারতব্যাপী বন্ধুগণ, যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন, সমাজে তাঁহার সখা ছিলেন, গৃহে তাঁহার সুখদুঃখের ভাগী ছিলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গের সারস্বত-ভবন, বঙ্গের সারস্বত ভাণ্ডার, বঙ্গের জাতীয় চিত্রশালা, যেখানে প্রাচীন বঙ্গ আপনাকে উদ্‌ঘাটিত করিবে, যেখানে বর্ত্তমান বঙ্গ নিরীক্ষিত ও আলোচিত হইবে, যেখানে ভবিষ্যৎ বঙ্গ আশার ও আকাঙ্ক্ষার চিত্রে চিত্রিত হইবে, বঙ্গের ভারতী যেখানে পূজা পাইবেন, বঙ্গের লক্ষ্মী যেখানে আপন ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিবেন, সেই সরস্বতীভবন,—সেই রমাভবন, সেই রমেশভবন প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি, অট্টালিকা নির্ম্মাণ আমাদের অসাধ্য হয়, এখন কুটীর-নির্ম্মাণেই আমরা তৃপ্ত হইব। বঙ্গের সরস্বতী কুটীরমধ্যেই চিরকাল অর্চ্চনা পাইয়াছেন; বঙ্গলক্ষ্মী কুটীর-সঞ্চিত শস্যসম্ভারের অভ্যন্তরেই বিরাজ করিতেছেন; বঙ্গসন্তান রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য কুটীর-কল্পনাও অযুক্ত হইবে না।" ("রমেশ-ভবন"; 'সাহিত্য,' চৈত্র ১৩১৬)

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাণের কামনা ব্যর্থ হয় নাই। ১৩২১ বঙ্গাব্দে কাশীম-

বাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর রমেশ-ভবন নির্মাণের জন্য পরিষদের সংলগ্ন সাত কাঠা ভূমি দান করেন। অনেকের নিকট হইতে অর্থসাহায্যও পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু মন্দির নির্মিত হইবার পূর্বেই রামেন্দ্রসুন্দরের ডাক পড়িয়াছিল। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে রমেশ-ভবনের একতল ও ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে দ্বিতলের নির্মাণকার্য সমাধা হইয়াছে।

সম্মিলনে সভাপতিত্বঃ ১৩২০ সালের ২৭-২৯ চৈত্র কলিকাতা টাউন-হলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৭ম অধিবেশন হয়। রামেন্দ্রসুন্দর সম্মিলনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অভিভাষণে তিনি যে-সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন, আজিকার দিনেও সেগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য। আমরা তাঁহার ভাষণ হইতে যৎসামান্য উদ্ধৃত করিতেছি :—

"দেশের মধ্যে যে একটা নূতন হাওয়া বহিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই কয়েক বৎসর মধ্যেই এ দেশের কতিপয় বিজ্ঞানসেবী যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাতে ভবিষ্যৎ আশামণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এত কাল আমরা সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী ছিলাম। দূরদেশে কে কি নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছে, গলা বাড়াইয়া দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব থাকিতাম ; কে কি নূতন কথা বলিতেছে, তাহা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ থাকিতাম। যাহা দেখিতাম এবং শুনিতাম, তাহাই প্রচার করিতে পারিলে আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল, ইহাই আমরা জানিতাম। এইরূপে দেখিয়া এবং শুনিয়াই আমাদের জীবন ধন্য হইল মনে করিতাম। স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করিয়া জগতের নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার আমাদের দ্বারা যে হইতে পারে, সে ক্ষমতা যে আমাদের থাকিতে পারে, এ বিষয়েই আমাদের সন্দেহ ছিল। বোধ করি এখনও বিশ বৎসর অতীত হয় নাই, Asiatic Society-র তাৎকালিক সভাপতি Sir Alexander Pedler কতকটা ক্ষোভের এবং কতকটা তিরস্কারের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, Asiatic Society-র কাগজপত্র হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এদেশের লোক স্বাধীন বৈজ্ঞানিক আলোচনায় একান্ত অক্ষম। বিশ বৎসর একটা জাতির জীবনে অধিক দিন নহে, কিন্তু Asiatic Society-র এখনকার সভাপতি বোধ হয় সেইরূপ

মন্তব্য প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করিবেন। Asiatic Society-র পত্রিকা বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রমাণ পাওয়া যাইত না, পাশ্চাত্য দেশের বিবি বৈজ্ঞানিক সভার পত্রিকা উদ্‌ঘাটন করিলেই আজকাল তাহার প্রচুর প্রমা পাওয়া যাইবে। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এই সভার শোভাবর্দ্ধনের জন্ম উপস্থিত নাই, কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের কৌমুদীতে এই সভা প্রদীপ্ত হইতেছে। সভাস্থলে আর যে সকল নমস্য বিজ্ঞানাচার্য্যগণকে সমবেত দেখিতেছি, তাহাতে কেবল এই সাহিত্য-সম্মিলনী যে দীপ্তি লাভ করিয়াছে, এমন নয়, বঙ্গদেশের এই সাহিত্য-কেন্দ্র হইতে যে আলোকের বিকিরণ আরম্ভ হইয়াছে এবং যাহা ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিয়া দেশ বিদেশে প্রতিফলিত হইবে, তাহা মনে করিয়াই আমার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। বঙ্গের এই ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীকে আমি সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। বঙ্গজননীর আশীর্ব্বা তাঁহাদের মস্তকের উপরে মঙ্গল-পুষ্পের ন্যায় বর্ষিত হউক। যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া আমি তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া আছি, তাহা আমার জীবনের এই অপরাহ্ণ কালে ভগ্নদেহে সামর্থ্য দান করিবে। পৃথিবীর নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বক্ষেত্রে অধঃশয্যায় শয়ানা আমার প্রাচীনা জননী ধূলিশয্যা পরিত্যাগ করিয়া গৌরবের মুকুট পরিয়া জগতের সম্মুখে পুনরায় দণ্ডায়মান হইবেন, এই আশা অন্তিম দিনে আমার বলাধান করিবে।...

বিজ্ঞানমন্দিরে যাঁহারা সাধক, তাঁহারা যে ভাষা ব্যবহার করেন, তাহা অন্যের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। সাধনামন্দিরের বহির্দ্দেশে আসিয়া প্রাকৃত জনের নিকট তাহাদের বোধ্য ভাষায় আত্মপ্রকাশে তাঁহারা স্বভাবতঃ সঙ্কোচ বোধ করেন; অথচ তাঁহাদের সাধনালব্ধ ফলের আস্বাদনের প্রত্যাশায় অসংখ্য নরনারী মন্দিরের বাহিরে ঊর্দ্ধমুখে ও শুষ্কহৃদয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখিতেছেন। তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলে চলিবে না। বৈজ্ঞানিকের যাহা অর্জ্জন করেন ও আহরণ করেন, জনসাধারণ তাহার ফলাকাঙ্ক্ষী এবং ফলভোগে অধিকারী। বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম বস্তুতই নিষ্কাম ধর্ম্ম। কর্ম্মেই তাঁহাদের অধিকার; ফলে তাঁহাদের একেবারে অধিকার নাই। যাহা কিছু তাঁহারা আহরণ করিবেন, মুক্তহস্তে তাহা তাঁহাদিগকে বিতরণ করিতে হইবে। বিতরণ বিষয়ে অধিকারী নির্ব্বাচন চলিবে না।...
বিজ্ঞানবিদ্যাকে সাধারণের উপভোগ্য করিতে পারা যায় কি না, এক

চেষ্টায় কোন লাভ আছে কি না, ইহা লইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা বাদানুবাদ চলিতে পারে। ইংরেজীতে বলিলে Scienceকে popularise করা চলে কি না এবং করা উচিত কি না, ইহা লইয়া মতভেদ আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও Lord Kelvin অথবা P. G. Tait Herman Helmholtz, William Kingdom, Clifford প্রভৃতির মত ভাস্বরদ্যুতি জ্যোতিষ্ককে আলোক বিতরণ করিয়া ধরাধামের অজ্ঞান-তিমির অপসারণে প্রবৃত্ত দেখিতে পাই। এই কয়টা নাম উল্লেখের পর বোধ করি আর কেহ মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিবেন না যে, প্রাকৃত জনের সম্মুখে বিজ্ঞান প্রচারে নিযুক্ত হওয়ায় কোনরূপ লজ্জা বা অগৌরবের হেতু আছে।... ...

বাঙলা ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে। এ বিষয়ে অবহিত হইবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। মাতৃভাষাকে এতদর্থে সুগঠিত করিয়া লইবার জন্য যে যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক, আপনাদিগকেই তাহা করিতে হইবে। সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞান-শাখা যদি বঙ্গভাষার এই অঙ্গের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব নিরর্থক হইবে না।

আমাদের বাঙলা ভাষা বর্ত্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অপুষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞান-বিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য, তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি। আমি আশা করি, এই সাহিত্য-সম্মিলনে যাঁহারা বিবিধ বিজ্ঞানের আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের কৃতকার্য্যতাই আমার বাক্য সমর্থন করিবে। এমন এক সময় ছিল, যখন স্কুল এবং কালেজের শিক্ষক এবং অধ্যাপকগণ আপনাদের মধ্যে এবং ছাত্রগণের সহিত কথোপকথনে বাঙলার ব্যবহার বেয়াদবি বলিয়া গণ্য করিতেন। এখনও সর্ব্বত্র সেই ভাব চলিত আছে কি না জানি না। ক্লাসে বসিয়া অধ্যাপনার সময় বাঙলার ব্যবহার বোধ হয় এখনও অধিকাংশ স্থলে লজ্জার হেতু বলিয়া বিবেচিত হয়। আমি স্বয়ং অধ্যাপনা-ব্যবসায়ী। বিজ্ঞান-বিদ্যার সহিত আমার আর কিছু সম্পর্ক না থাকুক, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্ধারণ অনুসারে পদার্থবিদ্যা এবং রসায়ন-বিদ্যার অধ্যাপনাই আমার জীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছি এবং সেই জন্য অন্ততঃ জীবিকার অনুরোধে যৎকিঞ্চিৎ

বিজ্ঞান আলোচনাও আমাকে করিতে হইয়াছে। অধ্যাপকের আসনে বসিয়া বাঙলা ভাষায় অধ্যাপনা যদি আপনারা অপরাধ বলিয়া গণ্য করেন তাহা হইলে আমার মত অপরাধী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসঙ্ঘ মধ্যে খুঁজিয়া মিলিবে না।" ('মানসী,' বৈশাখ ১৩২১)

পরিষদের গুণগ্রাহিতা: পরিষৎ চিরদিনই গুণের সমাদর করিয়া আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে তাঁহার বহু বৎসরের সাহিত্যসেবার উপলক্ষ্য করিয়া পরিষৎ টাউন-হলের এক বিরাট্ সভায় কবির দীর্ঘায়ু কামনা করেন (১৪ মাঘ ১৩১৮)। এই উপলক্ষ্যে রামেন্দ্রসুন্দরই পরিষৎ-সম্পাদকরূপে কবিকে (স্বরচিত) অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখনও সমুদ্রপার হইতে সম্মান লাভ করেন নাই। এই প্রসঙ্গে পদ্মনাথ ভট্টাচার্যকে লিখিত (৫ অগ্রহায়ণ ১৩২০) রামেন্দ্রসুন্দরের একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—

"রবীন্দ্রবাবুকে যদি সে সময়ে সংবর্দ্ধনা করা না হইত, এবং আজি বিলাতের সার্টিফিকেট দেখিয়া আমরাও সম্মান দেখাইতে উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে লোকে বলিত না কি যে, আমরা স্বদেশী হইয়াও দেশের এত বড় লোকটাকে আদর করিলাম না বা চিনিলাম না; আর আজ সাহেবী সার্টিফিকেট দেখিবামাত্র অমনি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। তাহা হইলে বাংলা দেশের মুখখানা কতটুকু হইত? একেই তো কথা আছে, বিলাতি প্রশংসা-পত্র না দেখিলে আমাদের নিজের শাস্ত্রেও ভক্তি হয় না। ইহার পর বিদেশের সম্মান দেখিয়া স্বদেশীকে সম্মান করিতে প্রবৃত্ত হইলে নিদারুণ লজ্জায় পড়িতে হইত না কি? আমি তো বোধ করি বিলাত যাইবার পূর্ব্বে যে কোন একটা উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রবাবুর প্রতি যে আদর দেখান হইয়াছিল, তাহাতে দেশের মুখ রক্ষা হইয়াছে…৫ই অগ্রহায়ণ ১৩২০।" ('সাহিত্য,' শ্রাবণ ১৩২৭)

মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সেবক ও পরিষদের চিরসুহৃৎ রামেন্দ্রসুন্দরের প্রতি কথঞ্চিৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে পরিষৎ তাঁহাকে 'বিশিষ্ট সদস্য' নির্বাচিত করিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন:

"আলোচ্য বর্ষে বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়কে পরিষদের অন্যতম বিশিষ্ট-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত করিতে পারিয়া পরিষৎ

নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছেন। প্রচলিত নিয়মানুসারে সাহিত্য-সংসারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে পরিষৎ নানা উপায়ে সম্মানিত করিতে পারেন এবং এই সমস্ত উপায়ের মধ্যে বিশিষ্ট সদস্য নির্ব্বাচন সর্ব্বপ্রধান। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের বিদ্যা ও মনীষা সম্বন্ধে কিছু বলা নিতান্ত অনাবশ্যক। তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব ও বিদ্যার খ্যাতি সর্ব্বজনপরিজ্ঞাত। এই মাতৃপূজার মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য এবং ইহার উন্নতিকল্পে তিনি যাহা করিয়াছেন ও করিতেছেন, সে জন্য তিনি দেশীয় সর্ব্বসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। বিশেষতঃ তিনি অদ্যাপি অসুস্থ শরীরে পরিষদের জন্য যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার নিকট যথোপযুক্তভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন অসম্ভব।" (একবিংশ বার্ষিক কার্য্যবিবরণ)

ইহার দুই মাস পরে পঞ্চাশদ্বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এক বিরাট সান্ধ্য-সম্মিলনে তাঁহাকে অভিনন্দন ও সম্বর্ধনা করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন (৫ ভাদ্র ১৩২১)। পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পরিষদের পক্ষ হইতে রূপার পাতে খোদিত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। উহার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যৌবনের প্রারম্ভেই তুমি যেরূপ বিদ্যাবত্তা ও গুণবত্তা প্রকাশ করিয়াছিলে, তুমি যে পথেই যাইতে, তাহাতেই প্রভূত ধন-সম্পদ্ ও যশঃ উপার্জ্জন করিতে পারিতে, কিন্তু তুমি সে সকল পদই ত্যাগ করিয়া দারিদ্র্য-মণ্ডিত অধ্যাপনা ও মাতৃভাষার সেবাই জীবনের ব্রত করিয়াছ এবং আত্মত্যাগ ও আদর্শ চরিত্রের পরমোজ্জ্বল ও মহিমময় দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ। তুমি বিজ্ঞানকে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে নামাইয়া আনিয়াছ এবং যাঁহারা বিজ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের একজন অগ্রণী হইয়াছ।

তুমি একাধারে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং সাহিত্যসেবী। অতএব বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের ত্রিধারা তোমাতে সংযুক্ত হইয়া তোমার হৃদয়-ক্ষেত্রকে পুণ্য প্রয়াগে পরিণত করিয়াছে।

বিশেষতঃ তুমি গত বিংশতি বর্ষাধিক কাল যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও ঐকান্তিক অধ্যবসায় সহকারে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে

উন্নতির পথে পরিচালিত করিয়াছ, তাহাতে পরিষৎ তোমার নিকট চিরদিন ঋণী ও কৃতজ্ঞ থাকিবে।"

এই অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পাদরি এন্ড্রুস সহ, বোলপুর হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি রামেন্দ্রসুন্দরকে চন্দন দান করিয়া স্বরচিত ও স্বহস্তলিখিত যে অভিনন্দন-পত্রখানি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য :—

ওঁ

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

হে মিত্র, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গসাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্র মুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎসমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ়, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃতরস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্ব্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান প্রেম ও কর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্য-পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্য্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ, বীর্য্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিং হবামহে

প্রিয়জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি, নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি, তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘজীবনে আহ্বান করি, দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি।
৫ই ভাদ্র ১৩২১

পরিষৎ-প্রদত্ত সম্মানের উত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর বিনয়নম্র বচনে স্বল্প কথায় যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার কয়েক ছত্র এইরূপ :—

"আমার প্রতি পরিষদের আচরণকে সম্মান বা সংবর্দ্ধনা বলিলে উভয় পক্ষেই অনুচিত হইবে। পরিষদের সহিত আমার সেব্য-সেবক-সম্পর্ক। এত কাল ধরিয়া আমি পরিষদের পরিচর্য্যা করিয়াছি—একান্ত ভক্তের মত 'কায়েন মনসা বাচা' পরিচর্য্যা করিয়াছি। পরিষৎ আমাকে এই অধিকার দিয়াছিলেন; আজি যদি পরিষৎ তজ্জন্য আমাকে পারিতোষিকের যোগ্য মনে করিয়া থাকেন, তাহা আমি শ্লাঘ্য মনে করিব। পরিষদের প্রসাদ আমি শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম।"* ('সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩২২)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বালু

নির্মাণ করিতে গৃহ বালু লাগে পাঁচ হাজার মণ;
বালুকা-ভিত্তির 'পরে আমাদের বৃথা আয়োজন
মনে হতে পারে, কিন্তু গুপ্ত কথা গুণীজন জানে—
দেড় টাকা মণ বালি যদি তা মগরা হ'তে আনে।
বইঁচ-পাণ্ডুয়া হতে মোটা-দানা আনা যদি হয়
এক শত বাট টাকা শত মণে পড়িবে নিশ্চয়।
বালুর মাহাত্ম্য-কথা এতদিনে রে গৃহস্থ শোন্—
সিমেন্টের সহযোগে বালু হয় শ্রীপেটেন্ট-ষ্টোন।

---

* গত মাসে পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রামেন্দ্রসুন্দরের রচনার যে তালিকা দিয়াছি, তাহাতে ১৩৩৪।৩৫ সালের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে প্রকাশিত "বেদ-কথা" নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধটির নাম বাদ পড়িয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের আর একটি রচনারও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে; উহা "ধূলি" নামে একটি প্রবন্ধ, মানকুমারী বসুর 'শুভ-সাধনা' পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধটি সম্ভবতঃ রামেন্দ্রসুন্দরের 'বিজ্ঞানকথা' হইতে গৃহীত। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

ইতিহাস-রচনার প্রণালী ও ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব

১

এই যে দেশময় ইতিহাস-চর্চার একটা প্রবৃত্তি জাগরূক হইয়াছে, এই কেহ কেহ দুঃখ করিয়া বলিতেছেন 'ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছোটগল্পকে বা মাসিকের পৃষ্ঠা হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছে' এ সু-খবর যদি সত্য হয়, ত জাতীয় মনের এই বিকাশ সম্বন্ধে সাহিত্য-নেতা ও পরিষৎগুলির এক গুরু কর্তব্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আর বেশি দিন অবহেলা করিলে চলিবে ন আমাদের কর্তব্য, এই নবজাগ্রত ইতিহাস-সেবার চেষ্টাকে সমবায়-সূত্রে বাঁ এই উদ্যমকে উপদেশ দ্বারা সংযত ও উচিত পথে চালিত করি, যেন বাঙাল মস্তিষ্কের অপব্যয় না হয়, যেন শ্রমের সর্বোৎকৃষ্ট ফল উৎপাদন হয়, যেন য বা প্রণালীর দোষে ঐতিহাসিক কারিগরের প্রস্তুত দ্রব্যগুলি অঙ্গহীন বা ভ আকার ধারণ না করে। সুধীমণ্ডলীই এই কাজ করিতে পারেন। ব্যা বিশেষ একাকী এই কাজ করিতে সক্ষম নহেন, তাঁহার অধিকারও সাধার স্বীকার না করিতে পারে। সকলেই জানেন যে, কারিগর যেরূপ যন্ত্র হা পায় এবং যেরূপ প্রণালীতে কাজ করে, তাহার প্রস্তুত দ্রব্যও তেমনি হ মহামেধাবীর সুদীর্ঘ পরিশ্রমের ফলও যন্ত্রের দোষে বিশ্রী ও অকার্যকর হ আর উচিত প্রণালী অবলম্বন না করিলে সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।*

ইতিহাস-চর্চার যাহা শ্রেষ্ঠ পন্থা তাহা বৈজ্ঞানিক পন্থা। দেশকালভে বা বিষয়ের পার্থক্য অনুসারে এই পন্থাটি ভিন্ন হয় না, কারণ জ্ঞানের ক্ষে সকল বিভাগেই ইহা সমান কার্যকর, এবং সর্ববিধ সত্যের অন্তরে ইহা নিহি রহিয়াছে। আমরা যদি জাতীয়তার অভিমানে মত্ত হইয়া, এই প্রথা য ইউরোপীয়গণ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে অবহেলা করি, ত আমাদেরই ক্ষতি হইবে। জগৎ অগ্রসর হইবে; শুধু আমরা মধ্যযুগে পা থাকিব; আমাদের রচিত ইতিহাস বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ সুতরাং অশুদ্ধ হইবে

---

* ইতিহাস-রচনার প্রণালী সম্বন্ধে গভীর ও সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানিতে হইলে নিম্নলিখিত পুস্তক পড়া উচিত—(১) *Historical Evidence* by George, (Oxford University Pre (২) *History and Historians in the 19th Century* by Gooch (Longman), *Cambridge Ancient History* (chapters on the Gr. & Roman Historians)

এবং বিদেশীরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যে ইতিহাস রচনা করিয়া যাইতেছেন, তাহাই সত্যের বলে বলীয়ান্ হইয়া কিছুদিন পরে আমাদের প্রাচীন ধরনের ঐতিহাসিক জল্পনা-কল্পনাকে পরাস্ত করিবেই করিবে। কারণ, ঋষিবাক্য মনে রাখিবেন—"সত্যই জয় লাভ করে, অসত্য করে না।"

ঐতিহাসিকের কি উদ্দেশ্য তাহা বুঝিলে ইতিহাস লিখিবার শ্রেষ্ঠ প্রণালী জানিতে পারা যায়। প্রকৃত ইতিহাস অতীতকে জীবন্ত করিয়া চোখের সামনে উপস্থিত করে; আমরা যেন সেই সুদূর কালের লোকদের দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের ভাবে ভাবি, তাহাদের সুখ দুঃখ আশা ভয় আমাদের হৃদয়ে অনুভব করি। এইরূপে অতীতকাল সম্বন্ধে অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ সত্য উপলব্ধি করাই ইতিহাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির উপর ইতিহাস দাঁড়াইয়া থাকে। যদি সেই সত্য নির্ধারিত না হইল, যদি অতীতের একটা মনগড়া ছবি খাড়া করি অথবা আংশিক ছবি আঁকিয়াই ক্ষান্ত হই, তবে তো কল্পনার জগতেই থাকিলাম। তারপর সে বিষয়ে যাহাই লিখি বা বিশ্বাস করি তাহা বালুকার ভিত্তির উপর তেতলা বাড়ি নির্মাণের চেষ্টা মাত্র।

সত্য নির্ধারণের প্রণালী কি? সর্বপ্রথমে নিজের মনকে এই কার্যের উপযোগী করিয়া তোলা। যশ, ধন বা প্রতিপত্তি লাভের লালসা দূর করিয়া নিজের অন্তরের অনুরাগ বিরাগ দমন করিয়া, সব পূর্ব-সংস্কার ত্যাগ করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে;—

মোরা সত্যের পরে মন
আজি করিব সমর্পণ!
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্যধন।

সত্য প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, সাধারণের গৃহীত হউক আর প্রচলিত মতের বিরোধী হউক, তাহা ভাবিব না। আমার স্বদেশ-গৌরবকে আঘাত করুক আর না করুক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিব না। সত্য প্রচার করিবার জন্য, সমাজে বা বন্ধুবর্গের মধ্যে উপহাস ও গঞ্জনা সহিতে হয়, সহিব; কিন্তু তবুও সত্যকে খুঁজিব, বুঝিব, গ্রহণ করিব। ইহাই ঐতিহাসিকের প্রতিজ্ঞা। ভারতের অতি প্রাচীনকালের কথা, মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতির

রাজকাহিনী যদি কাল্পনিক বলিয়া ধরি, তবে হিন্দুধর্মের গ্লানি হইবে, এই যে আমাদের একটি স্বাভাবিক ধারণা আছে, তাহা উচ্ছেদ করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে প্রমাণ না পাইলে কিছুই বিশ্বাস করিব না।

প্রামাণিক ঘটনা হইতেই ইতিহাসের আরম্ভ। এই জন্য ইউরোপে ইতিহাস রচনায় এক ক্রমোন্নতির ধারা দেখিতে পাই। জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত পুরাতন মত পুরাতন গ্রন্থ ঠেলিয়া সরাইয়া দেওয়া হইতেছে। আইনের পুস্তকের মত ইতিহাসেরও ক্রমাগত নূতন সংস্করণ কিনিতে হইতেছে। পিতামহের সময় হইতে আগত বিশ্বাসের মূল পরীক্ষা করিয়া, সেই পুরাতন অট্টালিকাগুলি ক্রমাগত নির্মমভাবে ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহাদের স্থানে নূতন নূতন গৃহ রচিত হইতেছে। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত কিছু পরে দিতেছি।

সভ্যতা, সমাজ ও বিশ্বাসের বৃদ্ধি ও পরিবর্তন ইতিহাসের বিষয়ের মধ্যে বটে। ইহার মানবের লিখিত সাক্ষী না পাইলেও মানবের হাতের কাজ কত যুগ ধরিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে সঞ্চিত আছে। কিন্তু ইতিহাস বলিতে আমরা সাধারণত যাহা বুঝি, তাহার আরম্ভ প্রামাণিক ঘটনা হইতে। প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য সংগ্রহ ও বিচার করা ঐতিহাসিকের সর্বপ্রথম কার্য। এই মূল মন্ত্রটি এত সহজ, আপনারা প্রত্যহ আদালতে, সাংসারিক কাজে, ইহার এত ব্যবহার করেন যে, ইহার ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক বোধ হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের নানা প্রদেশে লিখিত আধুনিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় যে, ইতিহাসের ক্ষেত্রে এ নিয়ম আমরা এখনও স্বীকার করি নাই।

সাক্ষ্য পাইলেই আপনারা তিনটি প্রশ্ন করেন—

(১) সর্বাগ্রে কে এজাহার দিয়াছে? সেই first information-এর নকলটা সংগ্রহ হইয়াছে তো? পুলিস ডায়েরির গোপনীয় নকল কি করিয়া পাওয়া যায়?

(২) এই সাক্ষীটি ঘটনা জানিবার কি সুযোগ পাইয়াছিল? এ কি স্বচক্ষে দেখিয়াছে, না, পরের কথা শুনিয়া বলিতেছে?

(৩) মোকদ্দমার কোনও পক্ষের সহিত ইহার স্বার্থ জড়িত আছে কি?

প্রত্যেক ইতিহাস-লেখককেও পদে পদে এই প্রশ্ন তিনটি করিতে হয়।

ঘটনা সম্বন্ধে যাহারা কিছু লিখিয়া গিয়াছে, তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত, শ্রেণী বিভাগ, পরস্পরের উক্তির বিরোধভঞ্জন ও সমালোচনা করিয়া, তবে ইতিহাস লেখা আরম্ভ করা উচিত। প্রথমে এইরূপ তালিকা (critical bibliography) সংগ্রহ না করিয়া রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যে মহা ভ্রম তাহা আমরা এখনও সম্পূর্ণরূপে বুঝি না।

বর্ণিত ঘটনার সর্বপ্রথম ও প্রধান সাক্ষীর উক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। সমসাময়িক লেখক না থাকিলে, ঘটনার যত অদূরবর্তী সাক্ষী পাওয়া যায় ততই ভাল। পুরাতন বিবরণ সংক্ষিপ্ত বা কর্কশ ভাষায় লিখিত হইলেও, আধুনিক সময়ের সুদীর্ঘ ও সুললিত বর্ণনার উপরে তাহাকে স্থান দিতে হইবে। আদি গ্রন্থ পাইলে অনুবাদ ব্যবহার করা অনুচিত।

অথচ আমাদের দেশের অনেক ঐতিহাসিকের নিকট মুড়ি মুড়কি এবং সীতাভোগের একই দর। ঘটনা সম্বন্ধে যাহারাই দু কথা লিখিয়া গিয়াছে, সকলেই সমান বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া আমরা মানিয়া লই; বিচার করি না, সমালোচনা করি না, সত্যের আদি উৎসে পৌঁছিতে চেষ্টা করি না। এই দেখুন, পাঠান যুগের ভারত-ইতিহাস লিখিতে গিয়া আমরা ফিরিশ্‌তা এবং আল্‌বাদায়ুনীর উপর, এবং সপ্তদশ শতাব্দীর মুঘল সম্রাটগণ সম্বন্ধে খাফি খাঁর উপর অন্ধ ভক্তি করিয়া নিজ নিজ গ্রন্থ রচনা করি। অথচ এই তিন লেখকই বর্ণিত ঘটনার অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ওই ওই যুগের সমসাময়িক বিবরণ হইতে শুধু সংকলন করেন। আমরা সেই সব সমসাময়িক বিবরণ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি না; তাহা গ্রহণের উপযোগী এ কথাও মনে মনে বিশ্বাস করি না। একজন সমসাময়িক সাক্ষীর বিরুদ্ধে হাজার জন পরবর্তী যুগের নকলনবিস খাড়া হইলেও ঘটনা সম্বন্ধে তাহাদের সাক্ষ্যের কোন মূল্য নাই; তাহাদের কথা সমালোচনা হইতে পারে, ইতিহাসের মূল উপাদান নহে,—এই সত্যটি কার্যত মানিয়া লই না।

আবার, সাক্ষীটি সত্য জানিবার কতটুকু সুযোগ পাইয়াছিল, তাহা দেখা আবশ্যক। এই যেমন, শাহজাহানের পুত্র শুজা আরাকানে মারা যান; সেখানে হিন্দু-মুসলমানের যাতায়াত নিষেধ ছিল, মগরাজা ও ওলন্দাজ পর্তুগীজ ভিন্ন অন্য বিদেশীকে তাঁহার রাজ্যে ঢুকিতে দিতেন, এই ইউরোপীয় বণিকগণ শুজার শেষ দশা সম্বন্ধে যে সংবাদ ভারতে তাহাদের কুঠীতে প্রেরণ করে, তাহা

বর্নিয়ারের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে কিছু কিছু, এবং আর্ভিন-অনূদিত মানুশীর আত্ম-জীবনীতে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হইয়াছে। অথচ আমাদের লেখকেরা অন্য সব স্থান হইতে নানা গুজব সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধ পূরণ করেন, এই দুই গ্রন্থ দেখেন না, দেখিলেও ইহাদের উক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করেন না।

আদি সাক্ষীর অনুসন্ধান করায় বিলাতে ইতিহাসক্ষেত্রে কি রাষ্ট্রবিপ্লবের ন্যায় পরিবর্তন হইতেছে, তাহার দুই-একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। চার শত বৎসর ধরিয়া ইংলণ্ডরাজ ৩য় রিচার্ড ইতিহাসে নরপিশাচ বলিয়া বর্ণিত হইয়া আসিতেছেন। অধুনা সার্ ক্লেমেণ্টস্ মার্কহাম্ এই বিশ্বাসের ভিত্তি পরীক্ষা করিয়া ইহাকে মিথ্যা ব'লিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা পড়িয়া আসিতেছি যে, স্পেনের ভিসিগথ বংশীয় শেষ রাজা রডেরিক্ তাঁহার সেনাপতি জুলিয়ানের কন্যার প্রতি অত্যাচার করায় জুলিয়ান মুসলমানদের ডাকিয়া রাজাকে বিনষ্ট করে। কিন্তু ডোজি প্রভৃতির অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণ হইয়াছে যে, এই বিবরণটি উপন্যাস মাত্র; রমণীর প্রতি অত্যাচারের গল্প ঘটনার ছয় শত বৎসর পরে একজন ইটালীয় সন্ন্যাসী প্রথম রচনা করে; জুলিয়ান বলিয়া কেহ ছিল না; যে স্পেনদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মুসলমানদের পক্ষ লয়, তাহার নাম আর্বান; রডেরিক স্পেনরাজ্যের ন্যায্য অধিকারী ছিলেন না, ইত্যাদি। ফলত আরবদের স্পেন-বিজয়-কাহিনী একেবারে নূতন করিয়া লিখিতে হইতেছে; পুরুষগণের নাম ও চরিত্র, ঘটনাপরম্পরা, ঘটনার কারণ পর্যন্ত বদলাইয়া দিতে হইতেছে। নেপোলিয়ন সম্বন্ধে তিয়র্ (Thiers) যে ইতিহাস লিখিয়া যান, এবং যাহা আমাদের দেশে আদৃত অ্যাবটের নেপোলিয়ন-চরিত্রের মূল, তাহা নানা দেশের সরকারী কাগজপত্র ও গোপনীয় চিঠি অনুসন্ধানের ফলে এখন শিক্ষিত সমাজে কাব্য বলিয়া ঘৃণায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। অথচ এই নব অনুসন্ধানের ফল যেখানে একত্রীভূত করা হইয়াছে সেই Holland Rose's *Life of Napoleon I.*-এর নাম পর্যন্ত আমরা অনেকে শুনি নাই। সেই অ্যাবট্ লইয়াই আমরা নেপোলিয়ান জোসেফিন প্রভৃতির চরিত্র বর্ণনা করিতেছি। আমাদের দ্বিতীয় নীলমণি টডের "রাজস্থান"ও যে অনেক স্থলে অবিশ্বাসযোগ্য উপন্যাস মাত্র, এ কথা আমরা ভাবি না।

আসল গ্রন্থ বর্তমান থাকিতে অনুবাদের উপর নির্ভর করা যে কি ভুল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গ্র্যাণ্ট ডফের 'মারাঠা জাতির ইতিহাস' এক

উপাদেয় গ্রন্থ; অথচ ডফ সাহেবের পণ্ডিত ভুল করায় এই গ্রন্থে আফ্‌জল খাঁর দূতের নাম শিবাজীর দূতকে দেওয়া হইয়াছে। এটি নগণ্য বিষয় নহে; আফজল খাঁর দূত যদি শিবাজীর টাকা খাইয়া নিজ প্রভুকে বধ্যভূমিতে ভুলাইয়া আনিত তবে সে বিশ্বাস-ঘাতক হইত; শিবাজীর দূতের পক্ষে ওই কাজ তত দূর নীতি-গর্হিত নহে। সেই মত, Dow's *History of Hindostan* নামক একখানা ইংরেজী গ্রন্থ অনেকে মুঘল-সম্রাটের অতি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস মনে করিয়া তাঁহার মত উদ্ধৃত করেন; অথচ ডাও সাহেব সমসাময়িক ও প্রামাণিক কোন ফার্সী গ্রন্থ ব্যবহার করেন নাই, এবং যে সব নব্য ফার্সী গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছেন, তাহারও বিশুদ্ধ বা অবিকল অনুবাদ দেন নাই; অধিকাংশ স্থলেই নিজের কল্পনাবলে সুরঞ্জিত কাহিনী লিখিয়াছেন। ডাও সাহেবের জীবন-কালেই সার্ উইলিয়ম জোন্‌স্ এবং বিখ্যাত গীবন্ তাঁহার লেখা অসত্য ও বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া গিয়াছেন। এখন পণ্ডিত সমাজে কেহই ডাও-এর গ্রন্থকে ইতিহাস বলিয়া মানেন না। সমসাময়িক লেখককে অন্ধভাবে বিশ্বাস করিয়া পূর্বে গ্রীস দেশের ইতিহাস রচিত হইত। কিন্তু এখন প্রস্তর-ফলক, মুদ্রা, প্রভৃতির সাহায্যে এবং যুক্তিসঙ্গত সমালোচনার ফলে গ্রীস ইতিহাসে যে কি মহাপরিবর্তন হইয়াছে, তাহা বিউরী (Bury) প্রণীত *History of Greece* পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। সেইরূপ, ইসলামের অভ্যুদয় ও আদি যুগের বিশুদ্ধ ইতিহাস *Cambridge Medieval History*তে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে অনেক ভ্রম দূর করে।

অতএব যদি মারাঠী ভাষাবিদ্ লেখক শুধু গ্র্যাণ্ট ডফ্ অবলম্বনে এবং ফার্সী-জানা লেখক ডাও অবলম্বনে ইতিহাস লেখেন, তবে সে পুস্তকের মূল্য কি? তাহা আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে পারে না। এরূপ গ্রন্থের আমরা কেন আদর করিব? এরূপ উপগ্রন্থ, মহাগ্রন্থের গায়ে পরগাছা গ্রন্থকে বিলাতে rechauffee বলে, অর্থাৎ বাসি চপ্ কট্‌লেট্ পরদিন গরম করিয়া টাট্‌কা জিনিস বলিয়া বেচিবার চেষ্টা করা হইতেছে, এরূপ মাল। বাংলা সাহিত্যে যদি এইরূপ গরম-করা বাসি ইতিহাসের বেশি কাট্‌তি হইতে দেওয়া যায়, তবে সাহিত্য-ভোক্তাদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ শঙ্কিত হইতে হইবে। এরূপ গ্রন্থের নির্মম সমালোচনা করা একটি অবশ্যকর্তব্য কার্য, যদিও ইহা অত্যন্ত অপ্রীতিকর। এ কাজ ব্যক্তিবিশেষ না করিয়া সুধীমণ্ডলী করিলে ভাল দেখায়, এবং তাহাতে বেশি ফল হয়।

যেখানে অনুবাদ ব্যবহার না করিলে চলে না, সেখানে সর্বশেষে রচিত অথবা সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অনুবাদটি অবলম্বন করিতে হইবে। এই দেখুন, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীর ইংরেজী দুই অনুবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রাইস্ ও অ্যাণ্ডারসন্ নামক দুই জন সাহেব বাহির করেন; তাহা কোন অশুদ্ধ ফার্সী পুঁথি অবলম্বনে লিখিত, এবং অনুবাদকেরাও অনেক স্থলে অর্থ ভুল বুঝিয়াছেন। ওই পুস্তকের বিশুদ্ধ ফার্সী পাঠ অবলম্বন করিয়া রজার্স সাহেব যে ইংরেজী অনুবাদ রচনা করেন, তাহাতে মূল্যবান ভৌগোলিক টীকা ও সংশোধনী যোগ করিয়া দিয়া বেভরিজ সাহেব তাহা কয়েক বৎসর হইল প্রকাশ করিয়াছেন। যদি আমরা প্রথমোক্ত অশুদ্ধ ইংরেজী অনুবাদের বাংলা অনুবাদ করি, রজার্সের অনুবাদ দেখা আবশ্যক বিবেচনা না করি, তবে এরূপ অনুবাদে বঙ্গ-সাহিত্য পরিপুষ্ট হইল, এ কথা বলা যায় না। সেই মত, চীন পর্যটকদিগের ভ্রমণকাহিনীর, মানুশীর গ্রন্থের এবং অশোকের অনুশাসনের একাধিক ইংরেজী অনুবাদ আছে। তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদটিই বাংলা লেখকেরা ব্যবহার করুন, এই বলিয়া জেদ করা সুধীমণ্ডলীর কর্তব্য।

কখন কখন বাধ্য হইয়া অনুবাদের অনুবাদ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু কোটেসনের কোটেসন তস্য কোটেসন কেন ব্যবহার করিব? ইংরেজীতে একটি বড় কাজের কথা আছে, "Always verify your references," অর্থাৎ যাঁহার মত উল্লেখ করিলে, তিনি ঠিক সেই কথাগুলি বলিয়াছেন কি না তাহা ভাল করিয়া দেখিবে। আমি যে পরের বচনটি তুলিয়া দিলাম, তাহা কাহার বচন এবং কোন্ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত তাহা নির্দেশ না করিলে সাহিত্যিক অসাধুতা হয়, এবং ভ্রম-সংশোধনেও বাধা পড়ে।

ইতিহাস-লেখক বিস্তৃত ও বিশুদ্ধ প্রমাণ-পঞ্জী দিতে বাধ্য। আইনের পুস্তক যেমন গুঁড়ি গুঁড়ি অক্ষরে ছাপা নজিরের উল্লেখে পূর্ণ না হইলে চলে না, তেমনি ইতিহাসও বর্জাইস অক্ষরের ফুটনোটে আবৃত হওয়া আবশ্যক; ইহা পাণ্ডিত্য ফলাইবার উপায় নহে। ইহা না থাকিলে গ্রন্থের মূল্যহানি হয়। প্রত্যেক প্রকৃত ঐতিহাসিক প্রতি পৃষ্ঠার পাদদেশে টীকা দিয়া তাহাতে প্রামাণিক গ্রন্থের নাম, সংস্করণ বা প্রকাশের বৎসর, পৃষ্ঠাঙ্ক প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শুদ্ধ করিয়া উল্লেখ করা অবশ্যকর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করেন। আমাদের বড় দোষ যে আমরা অনেকেই নিজের রচিত ইতিহাস বা প্রবন্ধে এইরূপ

দি-বৃত্তান্তের নাম ও পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লেখ করার পরিশ্রমটুকু সহিতে চাহি না ;
তো প্রথমে কতকগুলি গ্রন্থের নাম মাত্র করিয়া ছাড়িয়া দিই। ইহাতে
মাদের জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত ভ্রমগুলি সংশোধন করিবার উপায় থাকে
এবং জ্ঞানপিপাসু পাঠকও নিজে আদিবৃত্তান্ত পড়িয়া কোন বিষয়ে বেশি
নিবার পথ দেখিতে পান না।

এই যে-সব প্রণালী এ পর্যন্ত নির্দেশ করিলাম, তাহা হিসাব রাখার মত শুধু
রিশ্রমের কাজ, ইহাতে বিশেষ মেধার আবশ্যক নাই। আমরা যদি এই কাজ
বশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করি এবং আলস্য ত্যাগ করি, তবে আমাদের মধ্যে
কলেই এ কাজ করিতে পারেন।

এখন ইতিহাস রচনার আরও উচ্চতর সোপানে চড়া যাউক। ইতিহাস-
খক ব্যক্তিগত ভ্রম-সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন; একই ঘটনার উপর
ন্ন দিক হইতে আলোকপাত করিবেন। শত্রুপক্ষ ইহা বলিয়াছে, মিত্রপক্ষ
হা বলিয়াছে, বিদেশী ভ্রমণকারী এরূপ দেখিয়া গিয়াছে, স্বদেশী কবি ওরূপ
াক্ষ্য দিয়াছে—এই সকল তথ্য একত্র করিয়া, তাহার মধ্যে কোন সাক্ষীটি
বশ্বাসযোগ্য এবং কতদূর পর্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য তাহা স্থির করিলে, তবে অতীত
টনার প্রকৃত স্বরূপ জানা যায়। যদি ইতিহাসে কোন পক্ষ প্রথমে এক তরফা
ডক্রী পান, তবে তাহা একদিন আপসেট্ হইবেই হইবে. কারণ জগতের
ানের আদালতে আপীল কখনও তমেয়াদি-দোষে বারিত হয় না; শত শত
ৎসর পরেও অন্যায় মতের বিরুদ্ধে নালিশ করা চলে; আপীলের চূড়ান্ত সীমা
ত্য নির্ধারণ পর্যন্ত গিয়া তবে থামে। যদি মার্জনা করেন, তবে আমার নিজের
অভিজ্ঞতা হইতে দুটি দৃষ্টান্ত দিতে চাই। আমি এখন মিরজুমলার আসাম ও
কুচবিহার জয়ের ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত আছি; এজন্য এক পক্ষে মুঘল
সংবাদদাতার ফার্সী গ্রন্থ ও বাদশাহী ফার্সী ইতিহাস, অপর পক্ষে আসামীদের
লিখিত বুরঞ্জী এবং একজন ডাচ্ জাহাজী সৈন্যের কাহিনী ব্যবহার করিতে
হইতেছে। সেই মত, শিবাজীর ও শম্ভাজীর কার্যকলাপের জন্য মুঘল বাদশাহ-
দিগের পক্ষে লিখিত ফার্সী ইতিহাস, দুই জন সমসাময়িক নিরপেক্ষ হিন্দুর লিখিত
ফার্সী ইতিহাস. বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদের জন্য লিখিত ফার্সী
ইতিহাস, মারাঠী ভাষায় লিখিত বখর ও পত্রাদি. এবং ইউরোপীয় (ইংরেজী,
ফরাসী ও পর্তুগীজ) বণিকদের সাক্ষ্য,—এই পাঁচ প্রকার বিভিন্ন উপাদান
সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

ঘটনার সত্য নির্ধারণ করিয়াই ঐতিহাসিকের কার্য শেষ হইল না। অতীত যুগের বাহ্য আবরণ,—তাহার গায়ের চামড়াটি, চক্ষুর সম্মুখে সহজে আনা যায়; কিন্তু তাহার হৃদয়টি দেখাইতে না পারিলে প্রকৃত ইতিহাস হয় না। শুধু রাজা, রাজ্যপরিবর্তন, যুদ্ধবিগ্রহ লইয়া ইতিহাস নহে। ইতিহাস দর্শন নামের যোগ্য, কিন্তু পদে পদে দৃষ্টান্ত নজীর দেখাইয়া এই দর্শন লিখিতে হয়। দার্শনিক না হইলে প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক হওয়া যায় না। কিন্তু এরূপ লেখক ক্ষণজন্মা পুরুষ, আমাদের পরিষৎ বা সম্মিলন তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং সুধীমণ্ডলীর চেষ্টায় এ মহাকার্যের যতদূর সাহায্য হইতে পারে, কেবল তাহার বিষয়েই আমি বলিব।

(১) প্রত্যেক বিভাগের প্রধান প্রধান বিষয়ে ও শাখায় যে কয়খানি বই হইতে নূতনতম ও সর্বাধিক মূল্যবান জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে, তাহার তালিকা প্রকাশ। সেই বিষয়ে দেশী বিদেশী পণ্ডিতমণ্ডলী এ পর্যন্ত কত দূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার ঠিক বিবরণ এই সব বই হইতেই আমরা পাইব। পূর্বে অর্জিত জ্ঞানের সিঁড়ির উপর না দাঁড়াইলে আমরা বিদ্যা-বৃক্ষের উচ্চতর শাখায় চড়িতে পারি না।

(২) পরিষৎ ও অন্য সুধীমণ্ডলী অথবা মহানুভব জমিদারগণ এই সব সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক, প্রাচীন মুদ্রার সচিত্র তালিকা, লণ্ডন ও বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিদ্বয়ের গত ৩০ বৎসরের পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান অ্যাণ্টিকোয়েরি ও এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, সার্ভেয়ার-জেনেরালের আপিস হইতে প্রকাশিত ১ ইঞ্চ=৪ মাইল স্কেলের ভারতবর্ষের ম্যাপ, প্রভৃতি অত্যাবশ্যক উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রখিবেন। সেগুলির মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া এক-এক বাক্স গ্রন্থ ক্রমান্বয়ে সমস্ত শাখা-পরিষৎ ও মফস্বলের বিশ্বাসযোগ্য পুস্তকালয় ঘুরিয়া আসিবে। আমাদের গবর্মেণ্ট চিকিৎসা-বিভাগে এইরূপ ভ্রাম্যমাণ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া মফস্বলের ছোট ছোট শহরের ডাক্তারদের জ্ঞানের বিস্তার ও নবীনতার উপায় করিয়া দিয়াছেন।

(৩) মূল পরিষদের এক বিভাগ খুলিতে হইবে, যাহার নিকট আবেদন করিলে জিজ্ঞাসু নিজের চর্চার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কর্তৃক রচিত প্রমাণ-পঞ্জী পাইবেন। পরিষৎ বাছিয়া ইতিহাসের প্রতি শাখার জন্য এক বা দুই জন বিশেষজ্ঞ স্থির করিবেন, এবং জিজ্ঞাসুর পত্রখানি উপযুক্ত শাখার বিশেষজ্ঞের

নিকট পাঠাইয়া দিবেন, তিনি তাহার উত্তর দিবেন। এই সব বিশেষজ্ঞের নাম ও ঠিকানা পরিষৎ-পত্রিকায় সর্বদা ছাপা থাকিবে, এবং তাঁহারা জিজ্ঞাসুদের নিকট যে-সব সমালোচনাপূর্ণ প্রমাণ-পঞ্জী (critical bibliography) পাঠাইবেন, তাহাও প্রকাশিত হইবে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের 'মডার্ন রিভিউ'য়ে শিখ ইতিহাস সম্বন্ধে এরূপ একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। তাহাতে এখন যোগ দেওয়া আবশ্যক।

আমাদের সম্মিলন বঙ্গভাষা-ভাষীদিগের। সুতরাং ইতিহাস-চর্চার অত্যাবশ্যক গ্রন্থগুলি বাংলা আকারে সাধারণের হাতে দিতে না পারিলে আমাদের কর্তব্যে ত্রুটি হইবে। এই দেখুন, প্রতি বৎসর শত শত বঙ্গভাষী সংস্কৃত পরীক্ষা দেয়; তাহারা ইংরেজী জানে না, এবং অসংখ্য বাংলা মাসিকের পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি খুঁজিয়া পড়িবার অবসর এবং সুযোগও তাঁহাদের নাই। সুতরাং ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে যে সব নব নব সত্য ইংরেজীতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এই সব ছাত্রদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাহারা প্রত্নতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাস সম্বন্ধে এখনও মধ্যযুগে বাস করিতেছে, মানবজ্ঞান যে এতদিনে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহার কিছুই জানে না, অথচ তাহাদের মধ্যে অনেক মেধাবী ও মৌলিকতাসম্পন্ন ছাত্র আছে; দেশ সম্বন্ধে, তাহাদের পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে, নিজ ধর্ম জাতি সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হইতে শুধু দ্বিভাষী নয় বলিয়া ইহারা যে চিরবঞ্চিত হইয়া থাকিতেছে, ইহা কি পরিতাপের কথা নয়? প্রাচীন লেখমালার উদাহরণ হিন্দীতে গ্রন্থাকারে একত্র ছাপা হইয়াছে; বাংলায় হয় নাই। (নবপ্রকাশিত গৌড়লেখমালা আংশিক গ্রন্থ।) ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ রচিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং ম্যাকডনেলের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস যে এ পর্যন্ত বাংলায় অনুবাদ করা হয় নাই, ইহা আমাদের মণ্ডলীর পক্ষে লজ্জার বিষয়। গুজরাতী ভাষা বাংলার চেয়ে কত কম লোকে বলে, অথচ গুজরাতী ভাষার সেবকগণের আগ্রহ, শ্রমশীলতা ও দূরদর্শিতার ফলে সর্ববিধ বিভাগের পুস্তকের অনুবাদে গুজরাত ছাইয়া গিয়াছে। আর আমরা বঙ্কিম-রবীন্দ্রের মৌলিকতার গর্ব করিয়া অলস হইয়া বসিয়া আছি। লোকশিক্ষার দিকে দৃষ্টি নাই, অথচ এই লোকশিক্ষার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়ার ফলে ক্রমে গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে সাধারণের জ্ঞানের সীমা বঙ্গের লোকসমষ্টির জ্ঞানের সীমাকে অতিক্রম করিবে। তখন

বাঙালীর মানসিক প্রাধান্য কোথায় থাকিবে? পুনা ও বরোডা ভ্রমণ করিয়া তথাকার স্কুলগুলি দেখিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, আর বিশ বৎসরের মধ্যে মারাঠাগণ জ্ঞানের বিস্তৃতিতে বাঙালীদিগকে পিছু ফেলিয়া যাইবে।

ইতিহাসের জ্ঞান জাতীয় উন্নতির প্রথম সোপান। যে-পরিমাণে অতীত জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করিব, যে-পরিমাণে অতীতের উপদেশগুলি বর্তমানে লাগাইতে পারিব, সেই পরিমাণে আমাদের জনগণ-মন উচিত-পথে ধাবিত হইবে, আমাদের সমবেত শক্তি ফল প্রসব করিবে। আর, যে পরিমাণে আমরা অসত্য বা অর্ধসত্য লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব, সেই পরিমাণেই আমাদের জাতীয় উন্নতিতে বাধা পড়িবে, জনসমষ্টির শ্রম বিফল হইবে।

ইতিহাস কাব্য নহে। চিত্তবিনোদক ললিত আখ্যান অথবা শুষ্ক গবেষণাই ইহার চরম ফল নহে। অধ্যাপক সীলী সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন, রাষ্ট্রনেতার সমাজনেতার পক্ষে ইতিহাস সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, পথ-প্রদর্শক, মহাবন্ধু। ইতিহাসের সাহায্যে অতীত কালের স্বরূপ জানিয়া সেই জ্ঞান বর্তমানে প্রয়োগ করিতে হইবে। দূরবর্তী যুগে বা দেশে মানবভ্রাতারা কি করিয়া উঠিলেন, কি কারণে পড়িলেন, রাজ্য সমাজ ধর্ম কিরূপে গঠিত হইল, কি জন্য ভাঙিল, সেই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের নিজের জীবন্ত সমাজের গতি ফিরাইতে হইবে। অতীত হইতে উদ্ধার করা সত্য ও দৃষ্টান্তের দীপশিখা আমাদেরই ভবিষ্যতের পথে রশ্মিপাত করিবে। ইহাই ইতিহাসচর্চার চরম লাভ।

মহাকবিদের সম্বন্ধে সত্যই বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা অমরধামে গমন করিবার পরও পৃথিবীতে নিজ নিজ আত্মা রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা হইতে আমরা শিখি—

ব্যক্তিগত গৌরব কি? লজ্জার বিষয় কি?
লোকে কিসে বল লাভ করে, কিসে পঙ্গু হয়?—(কীট্স্।)

সেইরূপ আমরা বলিতে পারি যে, প্রকৃত ঐতিহাসিক জনসঙ্ঘকে ব্যক্তিসমষ্টিকে শিখান, কিসে জাতীয় উত্থান পতন, রোগ স্বাস্থ্য, নবজীবন লাভ ও মৃত্যু ঘটে। এই মহাশিবতন্ত্র, এই জাতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র সাধনা বিনা সত্যনিষ্ঠা বিনা, ক্রমোন্নতির অদম্য স্পৃহা বিনা, লাভ করা সম্ভব নহে।—(১৩২২ সালের চৈত্র মাসে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ)

২

আমি প্রবাসে গিয়া প্রথমেই ইতিহাস-চর্চা আমার জীবনের ব্রত বলিয়া র্বাচন করি, আর নানা প্রবাসভূমিতে থাকিয়া ইতিহাসরচনা, ঐতিহাসিক ।্যসংগ্রহ ও তদুপযোগী নূতন ভাষাশিক্ষা এই সব কাজ আরম্ভ করি এবং শেষ বাস-বাস পর্যন্ত তাহারই অনুসরণ করি। এই বহুবর্ষব্যাপী কাজের মধ্যে কটা কথা সত্যই আমার মনে জাগিত যে, ভারতের ইতিহাস লিখিতে হইলে ঙালীর পক্ষে পর-প্রদেশে বাস এবং দীর্ঘভ্রমণ যেমন উপকারী, এমন আর ছুই নহে। এ কথা যে দিল্লী বা আগ্রা, রাজস্থান বা মহারাষ্ট্র প্রদেশের তিহাসরচনার ক্ষেত্রে সত্য, তাহা আপনারা সহজেই মানিয়া লইবেন। কিন্তু নিজ ংলার ইতিহাস লিখিতে যিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহার পক্ষেও বাহিরে প্রবাস ভ্রমণ অত্যাবশ্যক। কারণ একে তো দেবভাষা ও আর্যধর্ম, সাহিত্য ও স্কৃতির বন্ধনে সব ভারতীয় প্রদেশগুলি পরস্পরের সহিত জড়িত, তাহার পর, অতীত যুগে কত বঙ্গাধীপ বঙ্গের বাহিরে নিজ নিজ বিজয়বাহিনী লইয়া য়াছিলেন, আর পর-প্রদেশীয় কত রাজা আমাদের এই বঙ্গভূমিতে নিজ ভিযান প্রেরণ করেন। আমাদের ধর্মপ্রচারকের ও আমাদের দিগ্বিজয়-আকাঙ্ক্ষী ওতদের চক্ষে নিখিল-ভারত একই দেশ ছিল, তাঁহারা প্রাদেশিক সীমানার ড়া ভ্রূক্ষেপ না করিয়া লঙ্ঘন করিতেন। ভারতের ভিতর আচার-ব্যবহার র ও সাহিত্য, ধর্ম ও কলার এত আদানপ্রদান হইয়া গিয়াছে যে, বঙ্গের হিরের ভারত না জানিলে বঙ্গের সভ্যতার ধারাও বুঝা যায় না, বঙ্গদেশের কৃত সম্পূর্ণ ইতিহাস পর্যন্ত লেখা যায় না।

সুতরাং তুলনামূলক ঐতিহাসিক চর্চা অত্যাবশ্যক। এই কাজে প্রবাসী ঙালীরা একটি বড় সহজ স্বাভাবিক সুবিধা ভোগ করিতেছেন। পুরাতন রতের নানা বিভাগের নিদর্শন তাঁহাদের চারিদিকে। তাঁহারা শুধু চোখ লিয়া দেখিবেন, এগুলি হইতে ঐতিহাসিক সত্য বাহির করিবেন, আর ত্যগুলি সমবেত করিয়া অতীতের অবিকল ছবি অঙ্কিত করিবেন। বঙ্গে এই দর্শনগুলি নাই, বঙ্গে থাকিয়া আমরা এ সুযোগ পাই না।

তাহার পর ভাষার কথা। প্রাচীন ভারতের, এমন কি, মধ্যযুগীয় ভারতের কৃত অবস্থা জানিতে হইলে, শুধু বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার অভ্যাস করিলেই লবে না। সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত অথচ এখন পর্যন্ত জীবিত কত কত

-প্রাদেশিক ভাষা ভারতে প্রাচীন শিলালেখা ও গ্রন্থের অর্থবোধ অনেক স্থা যে সাহায্য করে, তাহা বিশুদ্ধ কালীদাসী সংস্কৃত হইতে পাওয়া যায় না। অ মধ্যযুগের ভারতকে জানিতে হইলে হিন্দী ফারসী ও মারাঠী ভাষায় দক্ষ হইলে একপদও অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। প্রবাসে কার্য উপলক্ষে আপনা সকলেই এসব প্রাদেশিক ভাষাগুলির দুই-একটি শিখিতে বাধ্য হন, সুতর ঐতিহাসিক উপকরণসংগ্রহ এবং তাহার অর্থগ্রহণ আপনাদের পক্ষে কিছুম কষ্টসাধ্য নহে, যেন দৈনিক কাজের মধ্যে।

তাহার উপর প্রবাসের চারিদিকে কত কত অ-বাঙালীর জাতি আচা ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া স্থানীয় গীতি ও কথা শুনিয়া আমার মনের মধ্যে এব একটি অপরিচিত নবরাজ্যের দ্বার খুলিয়া যায়—সংকীর্ণতা, প্রাদেশিকতা ঘুচি যায়—সত্য সন্ধানের প্রধান যন্ত্র দুইটি, অর্থাৎ উদারতা ও দীর্ঘদৃষ্টি লাভ হয় এ সুযোগগুলির বঙ্গে আবদ্ধ বাঙালীর পক্ষে দুসাধ্য।

তাই আমি প্রার্থনা করি,প্রবাসী বাঙালীরা এই পরম সুযোগগুলির সদ্ব্যবহা করুন—তাঁহাদের মধ্যে ভারতের পুরাতত্ত্ব, তত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, ধর্মবিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে মৌলিক গবেষণা করিবার জন্য শত শত প্রবীণ তাঁহাদের কষ্টলব্ধ অবসর শত শত যুবক তাঁহাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম নিবেদিত করুন, যে আমাদের মত বৃদ্ধদের তিরোধানের পর ইতিহাস-চর্চার এবং ইতিহাস-রচনা ধারা সদানীরা জাহ্নবীর মত প্রবাহিত হইতে থাকে, যেন ঐতিহাসিক সত্য-সন্ধানীরা "যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী"র হইয়া জ্ঞানের পথ অবিরাম মুখরিত করিতে থাকেন।

এই শাখায় আগত আপনারা সকলেই ইতিহাস-সাহিত্যিক, অন্তত ইতিহাসপ্রেমী। তাই অতি বৃদ্ধ কারিগরের মত আমি আমাদের কারখানার দুটি মূলমন্ত্র আপনাদের নিকট বলা উচিত মনে করি। প্রথমটি এই যে, বর্তমান যুগে সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে এবং বিজ্ঞানের শক্তি সর্বত্র প্রবাহিত হইবার ফলে ইতিহাস এক দিক থেকে বিজ্ঞানের শাখাবিশেষে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ ইতিহাসের আদি উপকরণগুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া, ধুইয়া, গলাইয়া, বিশ্লেষণ করিয়া তবে আমরা তাহাকে কাজে লাগাইতে পারি, তাহা হইতে প্রকৃত তথ্য বাহির করিতে পারি। আর এ-যুগের নিয়মই এই যে, আমাদের নিজ নিজ চর্চার বিশেষ বিষয়টির উপর যথাসম্ভব সব দিক হইতে আলোকপাত

করিতে হইবে, সমস্ত বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন শ্রেণীর উপকরণ একত্র করিতে হইবে। ইহা অতি কষ্টসাধ্য এবং ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ইহার ফলে ইউরোপে এখন আর একজন সার্বভৌম পণ্ডিত কোন গ্রন্থ সমগ্র একা লেখেন না, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের সমষ্টি করিয়া তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে সেই বিষয়টির জ্ঞানের ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে কর্ষণ করা হয়। এক-একজন বিশেষজ্ঞ এক-একটি অধ্যায় অথবা এক-এক খণ্ড গ্রন্থমাত্র রচনা করেন। ইহাই বর্তমানে অনুসৃত ইউরোপীয় রচনাপদ্ধতি; পণ্ডিতমণ্ডলীর পরস্পর সহযোগ বিনা রচনায় এত উচ্চ উৎকর্ষ সাধিত হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু ইতিহাসকে বিজ্ঞান বলিলে ভুল হইবে। ইতিহাস প্রণালীতে বিজ্ঞান হইলেও বাহ্যকলেবরে এবং অন্তরের উদ্দেশ্যে সাহিত্যকলা। এই সত্য না মানিলে মহা ক্ষতি হয়, ঐতিহাসিকের জীবনব্যাপী শ্রম পণ্ড হয়। ইতিহাসকে যে আর্যগণ ইতিকাব্য নাম দেন, সেটা বিদ্রূপের বিষয় নহে, এই নামের মধ্যে একটি নিগূঢ় মানব-সত্য নিহিত আছে। ব্যক্তিবিশেষকে ঘিরিয়া কাল্পনিক উপকরণ লইয়া কাব্য রচিত হয়, অথচ ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয় জনসমষ্টির উত্থানপতন, দেশের উপর, দশের উপর জননায়কের প্রভাব এবং ইহার উপকরণ সত্য—মানবের চেষ্টায় যতটুকু সত্য খুঁজিয়া বাহির করিতে পারা যায়, তাহাই। কিন্তু যে আকারে ইতিহাস গ্রন্থটিকে গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহার যে অন্তর্নিহিত মন্ত্রটিকে বাক্যে পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতে হইবে, তাহার কথা ভাবিলে ইতিহাস ও কাব্যকে একই শ্রেণীর সাহিত্য বলা উচিত। একজন ইংরেজ লেখক নেপোলিয়নের যুদ্ধবর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, সর্বোচ্চ প্রতিভাশালী সেনাপতি ও চিত্রকরের প্রতিভা একই প্রণালীতে একই পথ দিয়া চলে, একটি বিখ্যাত অভিযান (ক্যাম্পেন) যেন একটি অতুলনীয় তৈলচিত্র। ঠিক সেইরূপ সর্বোচ্চ ইতিহাস-লেখকও প্রকৃতই চিত্রকর, তিনি চিত্র আঁকেন ভাষার তুলি দিয়া—প্রকৃত মানব-মানবীর ভাব ও কর্ম তাঁহার রঙের মসলা। এই চিত্ররচনার দ্বারাই ইতিহাসের অন্তরের সার পাঠককে দেখানো যায়, ইতিহাস গ্রন্থ চূড়ান্ত সফলতা লাভ করে।

কারণ ইতিহাসের প্রকৃত প্রতিপাদ্য বিষয় ইহা নহে যে, কোন্ কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং কখন ঘটিয়াছিল। ইতিহাস দেখাইবে যে, অতীত ঘটনাগুলি কেন ঘটিয়াছিল, কিরূপে ঘটিয়াছিল। প্রাচীন গ্রীক ট্রাজেডিতে যেমন অদৃষ্টের

অনিবার্য প্রতাপ প্রমাণ করা হইত, আমাদের ইতিহাসও তেমনই সত্যকার জগতের কার্যকারণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দেখাইয়া দেয়—মানব-সঙ্ঘের চিত্তের ভাব ও উদ্যম কোন্ পথে চলিয়াছিল, জাতীয় জীবনে পূর্বপুরুষদের দত্ত মনোবৃত্তি ও সভ্যতার প্রভাব কতদূর গিয়া দাঁড়ায়, মহাপুরুষ জননেতারা কিরূপে দেশমধ্যে বিপ্লবের সমান পরিবর্তন সংঘটিত করেন, নূতনকে ঝড়ের মত আনিয়া দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া জাতিকে নবীন পথে প্রচলিত করেন, এই সব মনস্তত্ত্বের কথা কাব্যের তুলিতে ইতিহাসে প্রকাশ করিতে পারিলে তবে সে ইতিহাসগ্রন্থ প্রকৃত ফলবান হইবে, অমর হইয়া থাকিবে—নচেৎ নহে।

এইজন্য ঐতিহাসিকের পক্ষেও কল্পনাশক্তির আবশ্যক। সত্যের ভিত্তিতে স্থাপিত সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র তথ্যের সমাবেশের ফলে গঠিত, সংযত নিয়ন্ত্রিত কল্পনার সাহায্যে অগ্রসর, কবির মহান গঠনশক্তিতে রচিত, ভাষা ও ভাবের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যে পুটপাক ঔষধের মত যে ইতিকাব্য, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস নামের যোগ্য। জাতিবিশেষের দেশবিশেষের অদৃশ্য জীবনধারা এই ইতিকাব্যের ভাষায় ফুটিয়া উঠিবে, তাহার প্রাণের প্রক্রিয়াগুলি আর অতীতের সমাধিগর্ভে নিশ্চল হইয়া থাকিবে না, চলচ্চিত্রের মত পাঠকের সম্মুখে জীবন্ত দৃশ্য মান হইবে। ইহাই ইতিহাসের গূঢ়তত্ত্ব। (১৩৪১ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে প্রদত্ত অভিভাষণ)

শ্রীযদুনাথ সরকার

স্বাধীনতা-সঙ্গীত

নবীন সূর্য উঠিয়াছে ওই
পূর্ব অচল পারে,
পবিত্র আজি, নির্মল তনু
স্নিগ্ধ কিরণধারে।
বল জয়! বল জয়! বল জয়!
নূতন অভ্যুদয়!
নূতন যুগের যাত্রা হ'ল রে শুরু
দূর হয়ে গেল হৃদয়ের দুরু-দুরু,
অশোকচক্র-লাঞ্ছিত পতাকায়
নব-জীবনের নবীন দীপ্তি ভায়,
নির্ভয়ে এস ত্রিবর্ণ-ধ্বজতলে
নব-প্রভাতের দ্বারে।
বল জয়! বল জয়! বল জয়!
নূতন অভ্যুদয়!
দুর্যোগভরা রাত্রির অবশেষ
জয়ধ্বনিতে ভ'রে যাক সারা দেশ,
স্বর্গ হইতে পুণ্য এসেছে নামি
স্বাধীন ভারতে পথিক অগ্রগামী
ভাসাও তরণী দিগ্‌দিগন্তে আজি—
শান্তির পারাবারে!

শ্রীশান্তি পাল

স্বাধীনতা-দিবস

১৯৪৭ সাল—১৫ই আগস্ট

প্রভাত-ফেরীর গানের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। শহরের ছেলেমেয়েরা গান গাহিয়া চলিয়াছে—

"ছিঁড়িল বন্ধন, টুটিল শৃঙ্খল
নূতন প্রভাতে কে তোরা যাবি চল্—"

স্বাধীন ভারতে প্রথম প্রভাত। দেশের নেতৃবৃন্দের হাতে শাসন-রশ্মি তুলিয়া দিয়া বিদেশী-রাজ সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা আজ ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা। বহুজনের বহুদিনের স্বপ্ন আজ সফল হইয়াছে। বন্ধন ছিঁড়িয়াছে, শৃঙ্খল টুটিয়াছে। বাঁকিয়া-পড়া মেরুদণ্ড সোজা করিয়া, মাথা উঁচু করিয়া, জীবন-যাত্রার পথে চলিবার অধিকার পাইয়াছে ভারতবাসীরা। জাতীয়-জীবনের ইতিহাসে অতি স্মরণীয় দিন আজ।

অতএব আর বিছানায় পড়িয়া থাকা ঠিক নয়; উঠিয়া শুদ্ধ-শান্ত চিত্তে আজিকার প্রভাতকে অভিবাদন করা উচিত।

'বন্দে মাতরম্' বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। গৃহিণী ও ছেলেমেয়েরা দেখিলাম
ার আগেই উঠিয়াছেন। অন্য দিন গৃহিণী বেলা আটটা পর্যন্ত শয্যালগ্না
থাকেন। ছেলেমেয়েগুলি চা না খাওয়া পর্যন্ত চাঙ্গা হইয়া উঠে না।
কলের মনেই একটি নব-উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে; ঘুমের ঘোর
গাছে। স্বাধীন জীবনের প্রথম প্রভাতে আশাপ্রদ লক্ষণ।
উপর হইতে ছেলেমেয়েদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। পতাকা-
ানের জন্য প্রস্তুত হইতেছে তাহারা। তিন টাকা খরচ করিয়া
জাতীয়-পতাকা কিনিয়া আনা হইয়াছে। মশারির ডাণ্ডায়
ানো হইবে। পতাকা-উত্তোলনের সম্মান বাড়ির কাহার
াহা স্থির করিবার জন্য কাল একটি পারিবারিক সভা হইয়া
মামি স্বয়ং। বড় মেয়েটি আমার নাম, বড় ছেলেটি
করে। সংখ্যাধিক্যের উপরে আমার নাম বাতিল
া, আমিও আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর পক্ষে ভোট
গা-উত্তোলনের ভার গৃহিণীর উপরে পড়িয়াছে।
হাকে একটি বক্তৃতা করিতে হইবে। বক্তৃতা
াল রাত্রি জাগিয়া সেটি মুখস্থ করিয়াছেন।

আম
হইয়া
আজ স
কাটিয়া গি
ছাদের
উত্তোলন অনুষ্ঠ
একটি খদ্দরের
বাঁধিয়া সেটিকে ওড়
হাতে দেওয়া হইবে, ই
গিয়াছে। সভাপতি
আমার স্ত্রীর নাম প্রস্তাব
হইয়া যায়। বলা বাহু
দিয়াছিলাম। কাজেই পতা
কথা আছে, উৎসব-সভায় তাঁ
আমি লিখিয়া দিয়াছি। তিনি ক

যাহাদের বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস নাই তাহারা জানে, বক্তৃতা দেওয়ার আগের সময়টা কি সাংঘাতিক! মুখে আহার রোচে না, চোখে ঘুম আসে না, সারাক্ষণ মনে দারুণ অস্বস্তি। গৃহিণীর সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙার ইহাও কারণ হইতে পারে।

ছাদে উঠিতেই সকলে হৈ-হৈ করিয়া উঠিল, বাঃ রে! এত দেরি! হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে আসুন। বাড়ির পতাকা তুলতে দেরি হ'লে আবার শহরে যাব কখন?

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। মাথার উপর মেঘহীন আকাশ; পূর্বাকাশে নবীন সূর্য প্রসন্ন হাস্যে দীপ্তিমান। এই ভারত হইতেই প্রথম স্তুতিগান উঠিয়াছিল তাঁহার; শ্রদ্ধানতচিত্তে তাঁহার মহিমা-কীর্তন করিয়াছিল এই ভারতের ঋষিবৃন্দ। ভারতের কত উত্থান, কত পতন, প্রতিভার চরমতম বিকাশ, মোহাচ্ছন্নতার চরমতম গ্লানি, সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে প্রতিষ্ঠা, দুর্ভাগ্যের গভীরতম গহ্বরে অবলুণ্ঠন, চোখ মেলিয়া দেখিয়াছেন। আজ ভারত আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, সৌভাগ্য-সৌধের প্রথম সোপানে পা দিয়াছে। প্রসন্ন হাস্যে আশীর্বাদ করিতেছেন তিনি।

প্রতি বাড়িতে জাতীয়-পতাকা উড়িতেছে—কোনটি খদ্দরের, কোনটি সিল্কের। সারা পাড়াটিতে আনন্দ-চাঞ্চল্য। বাড়িতে বাড়িতে শঙ্খধ্বনি হইতেছে, মাঝে মাঝে পটকার শব্দ। দূরে একটা বাড়িতে রেডিওতে স্বদেশী গান বাজিতেছে।

নীচে নামিলাম। রান্নাঘরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, গৃহিণী খাবার তৈয়ারি করিতেছেন। পতাকা-উত্তোলন অনুষ্ঠানটিকে শুধু মনের পক্ষে নয়, রসনার পক্ষেও তৃপ্তিকর করিয়া তুলিবেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া কহিলেন, যাও, তৈরি হয়ে এস, তোমাদের আবার পাড়ায় একবার যেতে হবে তো!

পাড়ার ছেলেরা পাড়ায় পতাকা-উত্তোলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছে। সকলকেই চাঁদা দিতে হইয়াছে, যাহার যেমন সাধ্য। জেলা-কংগ্রেসের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন। পাড়ার মাঝখানে কতকটা পড়ো জমি আছে। সেইখানেই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে। পাড়ার ছেলেদের উৎসাহের সীমা নাই। নিজেরাই ঝোপ-ঝাড় কাটিয়া জমিটা পরিষ্কার করিয়াছে। সামনে দেবদারুপাতা দিয়া গেট তৈয়ারি করিয়াছে।

চারিধারে খুঁটি পুঁতিয়া আম্রপল্লব টাঙাইয়াছে। স্কুলে-পড়া ছেলেমেয়েরা কুচ-কাওয়াজ শিখিতেছে, সামরিক কায়দায় পতাকা-অভিবাদন-প্রণালী রপ্ত করিতেছে। পাণ্ডা-ছেলেরা কাল সারারাত্রি ঘুমায় নাই, হৈ-হৈ করিয়াছে। কাহার একটা গ্রামোফোন সংগ্রহ করিয়া স্বদেশী-গান বাজাইয়াছে ও পটকা ফুটাইয়াছে।

পাড়ার একটি ছেলে আসিয়া বেলা আটটায় সভাস্থানে উপস্থিত হইবার জন্য বলিয়া গেল।

স্ত্রীকে কহিলাম, হরিসাধনবাবুর ছেলেমেয়েদের ব'লে পাঠালে না কেন?

স্ত্রী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, খুব তাড়াতাড়ি মনে করিয়ে দিয়েছ তো! ভুলেই গিয়েছিলাম।

গৃহকর্ত্তা-সুলভ গাম্ভীর্যের সহিত কহিলাম, তাড়াতাড়ি খবর পাঠিয়ে দাও। বাড়িতে অসুখ; আজকার দিনেও ছেলেমেয়ে দুটো মুখ চুন ক'রে ঘুরে বেড়াবে! আসুক, একটু আনন্দ করুক—

স্ত্রী কহিলেন, খবর কালই দেওয়া হয়েছে। এতক্ষণে হয়তো এসে গেছে তারা। উপরে গিয়ে ভাল ক'রে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পাবে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তা ছাড়া আজ দুপুরেও এখানে খাবার জন্যে নেমন্তন্ন করেছি ওদের।

অপ্রতিভভাবে কহিলাম, তাই নাকি! বেশ বেশ!—বলিয়া সরিয়া পড়িলাম।

যথাসময়ে ছাদে আসিয়া দেখিলাম, সব প্রস্তুত। গৃহিণী একটি লালপাড় গরদের শাড়ি পরিয়াছেন। মুখে গাম্ভীর্য। একটি শতরঞ্চি পাতা হইয়াছে। এক দিকে একখানি ছোট চৌকির উপর মহাত্মা গান্ধীর ছবি। ছেলেমেয়েরা সকলে দাঁড়াইয়া আছে। বড় মেয়ের হাতে শাঁখ। হরিসাধনবাবুর ছেলে-মেয়ে দুটিও আসিয়াছে দেখিলাম। মেয়েটির পরনে মলিন ফ্রক, মাথায় ঝাঁকড়া চুল রুক্ষ বিশৃঙ্খল। ছেলেটির পরনে ছেঁড়া এখানে-ওখানে-তালি-মারা হাফ-প্যাণ্ট; পা খালি। দুইজনে লজ্জিত মুখে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। মেয়েটির নাম টুনু। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা কেমন আছেন? টুনু ম্লান মুখে জবাব দিল, ভাল নাই। আপনাকে যেতে বললেন একবার।

গৃহিণীকে কহিলাম, আরম্ভ হোক এবার!

ছেলেমেয়েরা 'বন্দে মাতরম্' গান শুরু করিয়া দিল।

গান শেষ হইল। মশারির ডাণ্ডা একটি ছাদের আলিসার সঙ্গে দড়ি দিয়া বাঁধা হইয়াছিল। গৃহিণী একটি টুলে চড়িয়া পতাকাটি ডাণ্ডার মাথায় পরাইয়া দিলেন। মেয়ে ঘন ঘন শাঁখ বাজাইতে লাগিল। বাকি ছেলেমেয়েরা বন্দে মাতরম্ হাঁকিল। সকলে জাতীয়-পতাকাকে অভিবাদন করিলাম।

তারপর গৃহিণী মুখস্থ-করা বক্তৃতা গড়গড় করিয়া বলিয়া গেলেন। আমাকেও কিছু বলিতে হইল। বলিলাম, আজ যে পতাকা দেশের বুকে তোলা হ'ল, আমরা যেন তার উপযুক্ত হতে পারি।

তারপর চা ও খাবার আসিল। খাওয়া-দাওয়ার পরে টুনুকে বলিলাম, আমি একটু পরে যাচ্ছি, তোমার বাবাকে বল গিয়ে।

গৃহিণী কহিলেন, স্নান ক'রেই তোমরা দুজনে চ'লে এস, বুঝলে ?

ছেলেমেয়ে দুটি ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইয়া চলিয়া গেল।

যথাসময়ে পাড়ার অনুষ্ঠানে হাজির হইলাম। পাড়ার সকলেই উপস্থিত। কংগ্রেসের নেতা মহাশয়ও আসিয়াছেন। একটি দামী চকচকে নূতন মোটর-গাড়িতে আসিয়াছেন। গাড়িটি কোন বড়লোক মাড়োয়ারীর সম্ভবত। নেতা মহাশয়ের পরিধানে খদ্দরের ধুতি, ঢিলা-হাতা আজানুলম্বিত খদ্দরের পাঞ্জাবি; পায়ে স্যাণ্ডেল। মুখে প্রবল গাম্ভীর্য। আরও অনেক জায়গায় পৌরোহিত্য করিতে হইবে তাঁহাকে। সেইজন্য সভার কাজ শুরু করার জন্য তাড়া দিতেছেন।

একদল ছেলেমেয়ে সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া 'বন্দে মাতরম্' গান গাহিতে শুরু করিল। ছেলেদের পরিচ্ছদ নানাবিধ। কাহারও হাফ-প্যাণ্ট, হাফ-হাতা শার্ট; কাহারও পায়জামা, জওহরী-কোট; কাহারও বা ধুতি পাঞ্জাবি। মেয়েরা সকলে শাড়ি পরিয়াছে, আঁচল কোমরে জড়ানো। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে সব। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে কাহারও স্বাস্থ্য ভাল নয়। স্বাস্থ্যহীনতার চিহ্ন দেহে ও মুখে সুস্পষ্ট। তবু আজ তাহাদের মুখগুলি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দ। নিত্য দেখে তাহারা, সংসারে তাহাদের কত অভাব, কত কষ্ট, কত অশান্তি! তাহাদের বাবা ভাই আত্মীয়স্বজনরা শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও যথেষ্ট উপার্জন করিতে পারে না। স্বল্প আয়ে সংসারের

সাধারণ খাদ্য ও পরিধেয়ের ব্যবস্থা করিতেই তাহাদের বাপ-মায়েরা হিমসিম খাইয়া যায়, ভদ্রতার মুখোশ বজায় রাখিবার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করিতে করিতে প্রতি মুহূর্তে তাহাদের প্রাণ ক্ষয় হয়। বর্তমান তাহাদের নিরানন্দময়, ভবিষ্যৎ অনির্দেশ্যতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিদেশী রাজারা এতদিন শাসন ও শোষণ করিয়াছে, কিন্তু প্রজাদের জীবনকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সাচ্ছল্য-সাফল্যময় করিবার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নাই। স্বাধীন জীবনে এ অবস্থার পরিবর্তন আসিবে নিশ্চয়। দেশের লোকের জীবনযাত্রা সুগম হইবে; যোগ্যতা অনুসারে উপার্জনের ব্যবস্থা হইবে; যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ পাইবে প্রত্যেকে জাতি-ধর্ম-শ্রেণীনির্বিশেষে। দেশের লোকের দেহে স্বাস্থ্য, মনে সজীবতা, প্রাণে শক্তি, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্য আসিবে। ইহারই স্বপ্ন দেখিতেছে বোধ হয় ছেলেমেয়েগুলি। এই সুখ-স্বপ্নের আভা পড়িয়াছে তাহাদের মুখে।

দূরে পিছনে দাঁড়াইয়া পাড়ার বাউরীদের স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়েরা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলির কাপড়-চোপড়ের বালাই নাই; কোমরে তেল-চিটা ঘুনসি। পুরুষদের কোমরে খাটো ময়লা একখানা করিয়া কাপড় জড়ানো। মেয়েদের, দুই-চারজন যুবতী মেয়ে ছাড়া, পরনে মলিন জীর্ণপ্রায় শাড়ি। যেমন করিয়া পূজার সময়ে দূরে এক পাশে দাঁড়াইয়া পূজা দেখে, এখনও তেমনই দূরে দাঁড়াইয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া দেখিতেছে। কি ব্যাপার হইতেছে জানে না। ভাবিতেছে, বাবুদের ছেলেদের কোন উৎসব বা তামাশা হইতেছে। দূরে দাঁড়াইয়া দেখিবার অধিকার ছাড়া আর কোন অধিকারের অনুভূতি তাহাদের নাই। তবে যদি কাঙালী-ভোজন হয়, এক পাশে বসিয়া একপাতা খাইবার আশা আছে। পাড়ার ছেলেরা ইহার ব্যবস্থাও করিয়াছে। দুপুরে দুইখানা করিয়া লুচি ও একমুঠা করিয়া বোঁদে দেওয়া হইবে পাড়ার 'ছোটলোক'দের প্রত্যেককে। তখন তাহারা দল বাঁধিয়া ছুটিয়া আসিবে; সামান্য ভিক্ষা-প্রাপ্তিতেই মুখে আনন্দ ফুটিবে সবারই।

ছেলেমেয়েদের গান শেষ হইল। জমিটার মাঝখানে একটা লম্বা বাঁশ পোঁতা হইয়াছে; তাহার মাথায় দড়ি বাঁধিয়া পতাকা তুলিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পতাকাটি মাঝ-পথে কাত হইয়া ঝুলিতেছে। নেতা মহাশয় আগাইয়া গিয়া দড়ি ধরিয়া টান দিলেন; পতাকাটি সরসর করিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল, অন্তরাল হইতে পাড়ার

মহিলারা উলুধ্বনি করিতে লাগিলেন; দম দম শব্দে পটকা ফাটিতে লাগিল। পতাকাটি একেবারে বাঁশের মাথায় উঠিয়া বাতাসে পতপত করিয়া উড়িতে লাগিল। ছেলেমেয়েরা মিলিটারী কায়দায় পতাকাকে অভিবাদন করিল। তারপর গান ধরিল, "কদম কদম বাঢ়ায়ে যা—"। গানের মাঝখানে দলপতি হাঁক দিল, ডাইনে ফেরো—। ছেলেমেয়েরা একযোগে আদেশ পালন করিল। আবার হুকুমের হাঁক হইল, সামনে আগাও।

ছেলেমেয়েরা গান গাহিতে গাহিতে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

অনুষ্ঠান শেষ হইল। নেতা মহাশয় বিদায় লইলেন। আমিও শহরের অনুষ্ঠান দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

হরিসাধনবাবুকে একবার দেখিয়া যাইতে হইবে। তাঁহার বাড়ি আমার বাড়ি হইতে একটু দূরে। প্রথমে সেইখানেই যাওয়া স্থির করিলাম।

সদর-রাস্তা হইতে বাঁ-হাতি একটা সরু গলি দিয়া কতকটা গেলেই একটা প'ড়ো জমি। বর্ষায় আগাছার জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারই মাঝ দিয়া একটি অপরিসর পায়ে-চলা পথ। জমিটার ও-পাশে নীচু মাঠ; মাঠের ওপারে একটা পুরানো বাগান; বাগানের এক পাশে মদের ভাঁটি। দিনের বেলা বেলা তিনটা পর্যন্ত এ দিকটায় লোক-চলাচল বেশি থাকে না। তিনটার পর হইতে পাড়ার ও বেপাড়ার বাউরী, মুচী, মেথর ও অন্যান্য শ্রমিক-শ্রেণীর লোকেরা ক্রমাগত দলে দলে মদের ভাঁটির দিকে যাইতে থাকে। সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত মাতালদের বেয়াড়া ও বেসুরা কণ্ঠের গানে, অসম্বন্ধ প্রলাপ ও বিলাপে স্থানটার নির্জনতা ঘুলাইয়া উঠে।

এই জমিটার এক পাশে হরিসাধনবাবুর বাড়ি—মাটির; খড়ের ছাউনি। বাড়িটি হরিসাধনবাবুর নিজের নয়; ভাড়া করা। শহরের জনৈক ব্যবসাদার তাহার রক্ষিতার জন্য বাড়িটি তৈয়ারি করিয়াছিল। পাখি অনেকদিন পলাইয়াছে, জীর্ণ পিঞ্জরটা কোন মতে টিঁকিয়া আছে। হরিসাধনবাবু নাম-মাত্র ভাড়া দিয়া এখানে বাস করিতেছেন।

বাড়ির সামনে চোরকাঁটার জঙ্গল। কোঁচা বাঁচাইয়া যাইতে হইল। সদর-দরজা খোলা ছিল। বাড়ি ঢুকিতেই উঠান; উঠান পার হইলেই পাশাপাশি দুইটি ছোট কুঠরি; সামনে লম্বালম্বি অপ্রশস্ত বারান্দা। ডান দিকের

কুঠরিতে তক্তাপোশের উপর মলিন শয্যায় বালিশ ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন হরিসাধনবাবু। অস্থিচর্মসার দেহ। বুকের হাড়গুলা চামড়া ঠেলিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়াছে। হাত ও পা কাঠির মত সরু। পায়ের পাতা ফুলিয়া উঠিয়া গোদের মত দেখাইতেছে। মুখও ফোলা; চোখ দুইটা প্রায় ঢাকা পড়িয়াছে। রক্তশূন্যতার জন্য সারা দেহ হলদে হইয়া উঠিয়াছে। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। যেন নির্বাপিত-প্রায় ধূম-মলিন দীপশিখা। মাথায় বড় বড় রুক্ষ কাঁচা-পাকা চুল। মুখ গোঁফ ও দাড়িতে আচ্ছন্ন। ক্রমাগত হাঁফাইতেছেন। বুকটা হাপরের মত দুলিতেছে।

আমাকে দেখিয়া ক্ষীণকণ্ঠে টানিয়া টানিয়া কহিলেন, এস ভাই, ব'স।

হরিসাধনবাবুর স্ত্রী মাটিতে বসিয়া একটা কাঁসার বাটিতে ঔষধের শিশি হইতে ঔষধ ঢালিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া একটু ঘোমটা টানিলেন। তারপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া, স্বামীকে ঔষধ খাওয়াইয়া, জল খাওয়াইয়া, আঁচলে স্বামীর মুখ মুছাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

কহিলাম, কেমন আছেন?

হরিসাধনবাবু ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, ভাল নয়। গলা হইতে সাঁই সাঁই শব্দ হইতে লাগিল।

কহিলাম, ওষুধে কোন কাজ হচ্ছে না? মুখ কুঁচকাইয়া, ঘাড় নাড়িয়া হরিসাধনবাবু কহিলেন, না। বিনা পয়সার ওষুধ তো।—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, কাল ভারি কষ্ট গেছে সারারাত। এক মিনিট ঘুমোতে পারি নি। তার ওপর সারারাত হাঙ্গামা। হরদম পটকা ফুটিয়েছে ছেলেগুলো।—দম লইয়া কহিলেন, স্বাধীনতা পেয়েছে ব'লে ফুর্তিতে অস্থির হয়ে গেছে সব। আরে, কাদের স্বাধীনতা হ'ল বুঝে দেখ্ আগে, তারপর ফুর্তি করবি। আবার হাঁপাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, স্বাধীনতা পাওয়া গেলেও আমার মত লোকদের কি সুবিধে? দু বেলা পেট ভ'রে খেতে পাব আমরা? রোগ হ'লে চিকিচ্ছে হবে আমাদের? ছেলেপিলে মানুষ হবে আমাদের? কিছু হবে না। পরাধীন থাক, আর স্বাধীনই হও, শালগ্রামের শোওয়া-বসা দুইই সমান।

কহিলাম, সুবিধে হবে বইকি! দেশের যাঁরা কল্যাণকামী নেতা, তাঁরাই তো কর্ণধার হলেন।

হরিসাধনবাবু কহিলেন, কর্ণধার তো হলেন, কিন্তু তাঁদের কর্ণ ধারণ ক'রে থাকবে যে দেশের বড়লোকগুলো। তাদের স্বার্থ বজায় ক'রেই চলতে হবে তাঁদের। জনসাধারণের সুখ-সুবিধার কতদূর কি ব্যবস্থা হবে, ভগবান জানেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, বড়লোকগুলোকে তো চিনলে ক বছর ধ'রে। কারও মুখের দিকে তাকায় না ওরা; নিজেদের স্বার্থ ষোল আনার উপর আঠারো আনা দেখে; টাকার পাহাড় জমিয়েও টাকার লোভ মেটে না ওদের—যেমন ক'রে হোক টাকা চাই; দেশের লোক না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরলেও কিছু যায় আসে না ওদের। ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, জন্তু-জানোয়ারেরও অধম। উত্তেজনায় ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিলেন।

চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে হরিসাধনবাবু কহিলেন, অর্থের স্পৃহা যে ভদ্র শিক্ষিত লোককেও কত অবিবেচক করে, আমাদের বড় বড় ডাক্তারদের দেখলেই বুঝতে পারবে। মাসে হাজার হাজার টাকা রোজগার করে, তবু আমাদের মত গরিবের বাড়িতেও পুরো ফী নেয়। এতটুকু দয়া হয় না। একটিবার ভেবে দেখে না, তাদের একটা পুরো ফী আমাদের মত লোকের সমস্ত পরিবারের এক সপ্তাহের আহার।

টুনু ও তাহার ছোট ভাই ঘরে ঢুকিল। হরিসাধনবাবু কহিলেন, কোথায় গিছলি? একটু পাখা কর্ দেখি। টুনু একটা পাখা লইয়া পাখা করিতে লাগিল। ছেলেটি মায়ের কাছে চলিয়া গেল।

হরিসাধনবাবু কহিলেন, কাল রাত্রে যা হ'ল, ভাবলাম, বুঝি হয়েই গেল। অনেক কষ্টে সামলালাম। বাঁচব না আর বেশিদিন। ওষুধ নাই, পথ্য নাই, বাঁচব কি ক'রে? কহিলাম, মাখনবাবু কি আসছেন না? ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, মাখনবাবুর কোন ত্রুটি নাই। দিনে একবার আসেন, দেখেন, ওষুধ দেন। একটি পয়সা নেন না। বড় ভাল লোক। কিন্তু কিছু জানেন না তো। গুরুপদ ডাক্তারকে যদি একবার দেখাতে পারতাম! শহরের বড় ডাক্তার। সেরে উঠব না আর জানি, তবু একটু ভাল চিকিচ্ছে হ'লে যদি কিছুদিন টিঁকে যেতে পারি। ছেলেটাকে যদি পাস ক'রে একটা ভাল চাকরি-বাকরি করতে দেখি তো নিশ্চিন্তে মরতে পারি। তবে টাকা চাই। স্ত্রীর গায়ে এক টুকরো রাংও নাই; সব বিক্রি হয়ে গেছে। তবে বাসন-কোসন দু-চারখানা এখনও আছে, যদি বাঁধা দিয়ে কিছু পাওয়া যায়—

কহিলাম, ওসব থাক্। গুরুপদবাবুর কাছে যাব আজ। বুঝিয়ে বললে হয়তো ফী নেবেন না। ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিলেন, পাগল! তা কি আসবে? ফী পাবে না জানতে পারলে কোন অছিলা ক'রে পাশ কাটিয়ে যাবে, দেখো তার চেয়ে বরং—

বাধা দিয়া কহিলাম, আপনি ও নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক নিয়ে আসব ওঁকে। আমার সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ—

বেশ, যদি পার তো ভালই। তোমার উপকার— যাক্, ও কথা ব'লে আর অপমান করব না তোমার।

বাহিরে আসিলাম। হরিসাধনবাবুর কথা মনে ভাসিতে লাগিল। জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছেন। স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না তাঁহার। পনরো আনা শিক্ষিত বাঙালীর মত অন্তরের যোগ ছিল। কিন্তু শাস্তি পাইয়াছেন রীতিমত। মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রাম্য স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। ১৯৩২ সালের আন্দোলনের সময়ে তাঁহার বোর্ডিঙের ছেলেরা কয়েকটি হাঙ্গামায় জড়াইয়া পড়ে। জাঁদরেল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই অপরাধে তাঁহাকে বরখাস্ত করেন। কর্তৃপক্ষদের কাছে অনেক আবেদন-নিবেদন করিয়াছেন; কোন ফল হয় নাই। অনেক স্কুলে নীচু ক্লাসের শিক্ষকতার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। সরকারী সাহায্য বন্ধ হইয়া যাইবার ভয়ে, কেহ তাঁহাকে চাকুরি দিতে সাহস করে নাই। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া ভদ্রলোক বিব্রত হইয়া পড়েন। শেষে আমাদের শহরে আসেন। ওই মাটির বাড়িটা অতি অল্প টাকায় ভাড়া লইয়া বাস করিতে শুরু করেন। সেই সময়ে আমার সঙ্গে আলাপ হয়। আমি কয়েকটি টিউশনি যোগাড় করিয়া দিই। তাহাতেই কোন মতে দুই বেলা দুই মুঠা অন্নের সংস্থান হয়। দুর্ভিক্ষের বৎসরে কষ্টের সীমা ছিল না। লঙ্গরখানা হইতে লাপসি আনাইয়া খাইতে হইয়াছিল অনেকদিন। এই সময়ে ভদ্রলোক অসুস্থ হইয়া পড়েন। টিউশনিগুলি হাতছাড়া হইয়া যায়। স্ত্রীর সামান্য অলঙ্কার যাহা ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতে হয়। কাজেই চিকিৎসা নিয়মিতভাবে হয় নাই। ফলে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে আগাইয়া গিয়াছেন। বৎসর তিন আগে বড় ছেলেটি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া তাঁহার এক আত্মীয়ের অনুগ্রহে কোন এক

সওদাগরী আফিসে অতি সামান্য বেতনে কেরানীর চাকরিতে ঢুকিয়াছে। তাহা ছাড়া দুই-তিনটি টিউশনি করে। নিজের খরচ চালাইয়া যাহা বাঁচে, পাঠাইয়া দেয়। তাহাতেই কোন মতে দুই বেলা অনশনকে ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছে। ছেলেটি চাকরি করিতে করিতে আই. কম. পাস করিয়া বি. কম. পড়িতেছে। পাস করিতে পারিলে চাকরিতে উন্নতি হইবে—আফিসের বড়বাবু আশা দিয়াছেন। এইটি চোখে দেখিয়া যাইবার জন্য হরিসাধনবাবু জীবনকে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছেন।

শহরের দিকে চলিলাম। কতকটা যাইতেই রাস্তার ধারে রায় বাহাদুর সঞ্জীব সোমের বাড়ি ইনি অবসরপ্রাপ্ত পুলিসের বড় সাহেব। বারান্দায় ইজি-চেয়ারে বসিয়া আছেন। পরনে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি। ড্রয়িং-রুমে রেডিওতে স্বদেশী গান বাজিতেছে। উপরে তাকাইয়া দেখিলাম, বাড়ির মাথায় জাতীয়-পতাকা উড়িতেছে বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া একটা মোটর-গাড়ি, তাহার সামনে একটা পতাকা। ছেলেমেয়েরা খদ্দরের ধুতি শাড়ি পরিয়া আনন্দ কলরব করিতেছে। জন দুই মিস্ত্রী বাড়ির কার্নিসে বিদ্যুতের তার বসাইতেছে। রাত্রে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা হইতেছে সম্ভবত।

স্বাধীনতা-দিবস অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে করিতেছেন রায় বাহাদুর। অথচ সারা জীবন ধরিয়া স্বাধীনতার স্রোতকে প্রাণপণে রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ইনি। সামান্য দারোগা ছিলেন প্রথমে। জন কয়েক বিপ্লবীকে ধরিয়া পদোন্নতি হয়। কাঁথিতে লবণ-আন্দোলনের সময় সেখানে পুলিসের কর্তা ছিলেন। অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন সেখানে। মেদিনীপুরে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সময়ে শহরবাসী, তথা জেলাবাসীদের উপরে নির্মম নির্বিচার নির্যাতন চালাইয়াছিলেন। আজ স্বাধীনতার সূর্য উঠিতে না উঠিতেই অভিনন্দন জানাইতেছেন। পেনশনটি যাহাতে নির্বিবাদে ভোগ করিতে পারেন, পুত্রকন্যার জীবনযাত্রা যাহাতে বিঘ্ন-সঙ্কুল না হয়, এই আশায় বোধ হয়। যাহাদের একদিন নির্যাতন করিয়াছেন, অনুগ্রহ-প্রত্যাশায় তাহাদের দরজায় দরবার করিবেন সর্বাগ্রে।

পাশের একটা রাস্তা হইতে একটি মিছিল বাহির হইল। শহরের নিকটবর্তী পল্লীগ্রাম হইতে আসিতেছে সম্ভবত। মিছিলের মাথায় একটি লোক ঘোড়ায় চড়িয়া পতাকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহারই পিছনে

কয়েকজন লোক নাকাড়া বাজাইতেছে। তাহাদের পিছনে সারিবদ্ধ জনশ্রেণী। ভিড়ের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে শিঙ্গা বাজিয়া উঠিতেছে; মাঝে মাঝে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ও নেতাদের জয়ধ্বনি। দলের মধ্যে মুসলমান দেখিলাম অনেক। ইহারাও সানন্দে যোগ দিয়াছে। শুভলক্ষণ নিশ্চয়ই। দেশের মুক্তি আসিয়াছে। মুক্তি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, দেশের জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বসাধারণের। প্রত্যেকের জীবন বন্ধন-মুক্ত হইল; পূর্ণ পরিণতি লাভের পথ পরিষ্কৃত হইল প্রত্যেকের। মুক্তির আনন্দ সকলে সমানভাবে উপভোগ করিবেন না কেন? চিরদিনই তো করিয়াছে। বিপদে-আপদে, কাজে-কর্মে, সুখে-দুঃখে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরের পাশে দাঁড়াইয়াছে। সাম্প্রদায়িকতার বাধা কখনও একে অপরের কাছ হইতে বিযুক্ত করে নাই। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিকদের কুটিল চক্রান্তে দেশের যাহারা আশু ভবিষ্যতে পদ-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার লোভে জাতির দেহে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকাইয়া দিয়াছে, যাহার ফলে এক সম্প্রদায় আর এক সম্প্রদায়ের সান্নিধ্য সহ্য করিতে পারিতেছে না, এক অপরকে নির্মূল করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা যে দেশ ও জাতির কত অকল্যাণ করিয়াছে, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার নেশায় আজ হয়তো তাহা বুঝা যাইবে না; কিন্তু নেশা কাটিলে যখন বুঝা যাইবে, তখন প্রতিকারের উপায় থাকিবে না। তবু আজ হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহাদের সত্যকার মনের অবস্থা, ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি যাহাই হোক, আজ সব পিছনে সরাইয়া রাখিয়া আনন্দের দিনে আত্মীয়ের মত যোগ দিয়াছে—ইহা আনন্দের কথা বইকি!

মিছিলটি দ্রুত পার হইয়া গেল। দলে দলে আরও অনেক লোক চলিয়াছে। রিক্‌শা করিয়া অনেক মহিলাও যাইতেছেন। ইহারা শহরের লোক। জাতীয়-পতাকা উত্তোলনপর্ব দেখিতে যাইতেছেন। আমিও ধীরে ধীরে ভিড় বাঁচাইয়া অগ্রসর হইলাম। হঠাৎ ক্রিং ক্রিং বাইকের ঘণ্টির সতর্কধ্বনি ও গুরুগম্ভীর কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গান শুনিয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইতেই দেখিলাম, আমাদের বিশ্বম্ভর বিশ মাইল বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। পরনে আপাদমস্তক খদ্দর, বুকে স্বরাজ-পতাকা আঁটা। এক হাত হ্যাণ্ডেলে, আর এক হাত সুর-সাধনা-নিরত ওস্তাদের ভঙ্গীতে সম্মুখে প্রসারিত। চোখে মুখে

উত্তেজনা, কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' গান। আমাকে দেখিয়া বাইকে ব্রেক করিয়া নামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চলেছেন নাকি? আসুন পা চালিয়ে। হাতঘড়ি দেখিয়া কহিল, আর বেশি দেরি নাই, আমাকে আবার ওপ্‌নিং সঙ্‌টা গাইতে হবে। চললাম আমি।—বলিয়া বাইকে চড়িয়া ঘণ্টি বাজাইতে বাজাইতে ও 'বন্দে মাতরম্' গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

বিশ্বম্ভর আবার কংগ্রেসী হইল কবে হইতে? এতদিন তো তাহাকে কম্যুনিস্টদের পাণ্ডা বলিয়া জানিতাম। কংগ্রেস বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসের নেতারা পুঁজিপতিদের অর্থদাস, ধনিক ও বণিকদের ধ্বংস ও মজুর-রাজ প্রতিষ্ঠা না হইলে দেশ ও জাতির মুক্তি নাই, মস্কো নিখিল-বিশ্বের নর-নারীর তীর্থস্থান, স্তালিন নির্যাতিত মানবের পরিত্রাতা, ইত্যাদি বলিয়া গলাবাজি করিয়াছে। হঠাৎ রাতারাতি কংগ্রেসী বনিয়া গেল! শুধু বিশ্বম্ভর কেন, অনেকেই তো তাই। ভারতের চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী শতকরা কয়জন? আন্দোলনের হিড়কে অনেকে হয়তো জেলে গিয়াছে, অনেকে খদ্দর পরিয়াছে, দুই-চারজন মহাত্মা গান্ধীর অনুকরণে কটি- বস্ত্রধারী হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেসের আদর্শকে মনে-প্রাণে অনুসরণ করিয়াছে কয়জন? কংগ্রেসের কাজে নিঃস্বার্থভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে কয়জন। আমরা স্বাধীনতা চাহিয়াছি বটে, স্বাধীনতা লাভের জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি, কতটুকু কষ্ট সহ্য করিয়াছি? চাকুরে চাকুরি করিয়াছে, ব্যবসায়ী বেপরোয়া ব্যবসা চালাইয়াছে, চাষী চাষ করিয়াছে, মজুর মজুরি করিয়াছে মেয়েরা মন-প্রাণ দিয়া সংসার করিয়াছে। দেশের জন কয়েক নেতা, কয়েক সহস্র কর্মী আন্দোলন চালাইয়াছেন, পুলিসের হাতে মার খাইয়াছেন, বন্দুকের গুলিতে মরিয়াছেন, ফাঁসি গিয়াছেন, আজীবন জেলে পচিয়াছেন, অনশনে প্রাণ দিয়াছেন। আমরা বাহবা দিয়াছি, কখনও ভাবাবেগে অশ্রুপূরিতলোচন হইয়া উঠিয়াছি; কখনও রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিয়াছি; বৈঠকখানায় বসিয়া মজলিস করিয়া চা, সিঙাড়া ও সিগারেটের সদ্ব্যবহার করিতে করিতে গলা বাজি করিয়াছি; সভা-সমিতিতে হুঙ্কার ছাড়িয়াছি; খবরের কাগজে ও মাসিকের পৃষ্ঠায় কড়া কড়া প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ও গান লিখিয়া ছাপাইয়াছি আবার নিশ্চিন্ত-চিত্তে নিজ নিজ কর্মে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছি। দেশসেবকদের অশেষ দুঃখ, লাঞ্ছনা, নির্যাতন, অকাতরে জীবনদান আমাদিগকে নিজ নিজ

জীবন-পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করিতে পারে নাই। আমরা কোন দিন বিশ্বাস করিতে পারি নাই—কংগ্রেসের মুক্তি-আন্দোলন এত শীঘ্র সাফল্যমণ্ডিত হইবে। যদি বিশ্বাস করিতে পারিতাম তাহা হইলে দেশের জন্য না হোক, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বৎসরে চার আনা পয়সা খরচ করিয়া কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ রাখিতাম। বাক্যে-ব্যবহারে, পরনে-করণে এতটা ঔদাসীন্য দেখাইতাম না। আজ হঠাৎ কংগ্রেসের হাতে শাসনভার তুলিয়া দিয়া ইংরেজ এ দেশ হইতে বিদায় লইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে; আমরা হকচকিয়া গিয়াছি। যে যতটা পারি সামলাইয়া কংগ্রেসের দলে ভিড় করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি। যে দুঃখের অনলে পুড়িয়া মানুষ খাঁটি হয়, সে আগুনের আঁচ পর্যন্ত আমাদের গায়ে লাগে নাই। আমাদের চরিত্রের খাদ যাহা ছিল, তাহা পুরোপুরি আছে। আমরা বাহিরে খাঁটি সাজিয়া সুযোগ-সুবিধায় ভাগ বসাইবার জন্য ছুটাছুটি শুরু করিয়াছি।

কতকটা আসিতেই এক দল মেয়ে বাঁ-হাতি একটা রাস্তা হইতে বড় রাস্তায় আসিয়া শহরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্কুল ও কলেজের মেয়ে অধিকাংশ। পরনে মিলের কালোপাড় সাদা শাড়ি, কোমরে আঁচল জড়ানো। নবজীবনের প্রত্যাশায় মুখগুলি আভাময়। গান গাহিয়া চলিয়াছে—"জাগে নব ভারতের জনতা, একজাতি একপ্রাণ একতা—"

এক পাশে সরিয়া পথ ছাড়িয়া দিলাম। তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে সব। সারা দেহে আনন্দের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে। আগামী কালে বাংলার যে ছেলেদের সকল বাধা বিপত্তি বিরোধ অবিচার অতিক্রম করিয়া ভারতের মধ্যে অগ্রণী হইতে হইবে, তাহাদের ভাবী জননী ইহারা। যে জাতীয়-পতাকা আজ সাড়ম্বরে তোলা হইতেছে, তাহাকে অনবনমিত রাখার গুরুভার যাহাদের, তাহাদের বুকের রক্ত দিয়া লালন-পালন করিয়া শিক্ষায় দীক্ষায় শৌর্যে বীর্যে চরিত্রগরিমায় দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষ করিবার দায়িত্ব ইহাদের। যে আনন্দের দীপ আজ সারা দেশের প্রত্যেকটি মানুষের বুকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহা অনির্বাণ রাখিবার দায়িত্ব ছেলেদের চেয়ে ইহাদের এক বিন্দু কম নয়, এ সম্বন্ধে তাহারা যেন আজ হইতে সচেতন হইয়া উঠে।

মেয়েরা চলিয়া গেল। পিছনে পিছনে চলিলাম। কতকটা যাইতেই প্রচণ্ড ঝড়-ঝড়-ঝড়াং ঝড়-ঝড়-ঝড়াং শব্দে শশব্যস্তে পাশ কাটাইয়া

দাঁড়াইলাম। একটা পুরাতন, রঙ-চটা, ঝড়ঝড়ে মোটর গাড়ি বেসুরা ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে ছুটিয়া চলিয়া গেল। গাড়ির আরোহীকে চিনিলাম। জেলার সি. আই. ডি.র বড়কর্তা। বিপুল দেহ; কোলা ব্যাঙের মত মোটা থ্যাবড়া নাক; নাকের নীচে কড়া বাটারফ্লাই গোঁফ। মাথার সামনেটায় বিস্তৃত টাক—পালিশ-করা ব্রোঞ্জের পাতের মত চকচকে। পরনে পুলিসের খাকী পোশাক। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই মুখ ফিরাইয়া লইলেন। বৎসর কয়েক আগে ইঁহার সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ হইয়াছিল আমার। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময়। আমার একজন আত্মীয় ও ছাত্র এই জেলার এক পাড়াগাঁয়ের স্কুলে মাস্টারি করিত। ভদ্রলোক স্থানীয় থানার দারোগা ছিলেন। কোথায় ঘুষ লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; ছেলেটি বাগড়া দেওয়ায় সুবিধা হয় নাই। আন্দোলন আরম্ভ হইবার মাস কয়েক পরে, একদিন রাত্রে গ্রামের পোস্ট-অফিসের খড়ের ঘরে আগুন লাগিল। ভদ্রলোক ছেলেটিকে ধরিয়া গারদে পুরিয়া দিলেন। ছেলেটির বিধবা মা আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। ছেলেটি নির্দোষ, ঘটনার দিনে নাকি বাড়িতেই ছিল না। আমি দারোগাবাবুর কাছে গিয়া তাঁহাকে বিস্তর অনুরোধ উপরোধ করিলাম। কিছুতেই কোন কথা শুনিলেন না। ছেলেটির জেল হইয়া গেল। শুধু ঐ ছেলেটিকে নয়, ঐ সময়ে আরও পঁচিশ-ত্রিশজন ছেলেকে ভদ্রলোক বিনা-অপরাধে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। সরকার বিশেষ পারদর্শিতার জন্য পুরস্কৃত করেন তাঁহাকে। অল্পদিনের মধ্যেই পদোন্নতি হয়। এখন তো অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছেন। ইনিও আজ স্বাধীনতা-দিবস উৎসবে সবেগে যোগ দিতে ছুটিয়াছেন।

চলিতে শুরু করিলাম। কিছুক্ষণ পরে, বাজখাঁই কণ্ঠে—"মহাত্মা গান্ধীকি জ্যায়, জহরলালজীকি জ্যায়, নেতাজীকি জ্যায়' শুনিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম—একটা রিক্শা প্রাণপণে ছুটিয়া আসিতেছে। রিক্শাওয়ালার দিকে তাকাইয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। ভদ্রলোকের ছেলে, নাম পশুপতি। শহরেই বাড়ি। বেঁটে, মোটা, লোমশ দেহ; মুখে এক মুখ দাঁত; দুই পাশে দুইটা গজদন্ত ঠোঁটের কোণ ঠেলিয়া উঁচাইয়া আছে। মুখে দাড়ির জঙ্গল, মাথায় বড় বড় চুল। পশুপতি নাম সার্থক উহার। শহরে 'পাগলা পশু' বলিয়া খ্যাত। পাগল ঠিক নয়, ভান করে মাত্র। পুলিসের স্পাই ছিল

যুদ্ধের সময়ে। চা ও খাবারের দোকানে বসিয়া যুদ্ধের আলোচনা করিত; হিটলারের জয়গান করিত; ইংরেজের পতন অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যদ্বাণী করিত। নানা চমকপ্রদ খবর বানাইয়া লোককে হকচকাইয়া দিত। ওদিকে গোপনে পুলিসকে শিকারের সন্ধান দিত। যুদ্ধের সময়ে অনেক লোককে ফাঁসাইয়াছে সে। এখন রেশনের দোকান করে। গরিব লোকদের নামের চিনি কেরোসিন ও কাপড় কালো দামে বিক্রয় করিয়া রোজগার করে মন্দ নয়। সাপ্লাই-বিভাগের কর্তাদের দালালের কাজ করে। তাহা ছাড়া আর একটি কাজ —পুলিসের লোকদের জন্য বাউরী মেয়ে সংগ্রহ করিয়া দেয়। পশুপতির পরনে খদ্দরের ধুতি, পরনে খয়র রঙের খদ্দরের পাঞ্জাবি, মাথায় খদ্দরের টুপি, তাহাতে ছোট একটি জাতীয়-পতাকা আলপিন দিয়া আঁটা। রিক্‌শার ভিতরে তাকাইয়া দেখিলাম, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল ও নেতাজীর ছবি পাশাপাশি বসানো। রিক্‌শার সামনের ডাণ্ডায় বাঁধা একটা বাঁশের কঞ্চির মাথায় জাতীয়-পতাকা উড্ডীয়মান। আমাকে দেখিয়া পশুপতি থমকিয়া দাঁড়াইল; এবড়ো-খেবড়ো দাঁতগুলা বাহির করিয়া হাসিয়া, ড্যাবডেবে চোখ দুইটা চাড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—মহাত্মা গান্ধীকি জ্যায়, জহরলালজীকি জ্যায়, নেতাজীকি জ্যায়। তারপর লাফাইতে লাফাইতে দ্বিগুণিত বেগে ছুটিতে শুরু করিল।

ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলাম। পাশ দিয়া একটা কালো ঝকঝকে মোটর পার হইয়া গেল। শহরের গুরুপদ ডাক্তার চলিয়াছেন। অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম। আর ডাক্তারের বাড়িতে ছুটিতে হইবে না। ঐখানেই পাওয়া যাইবে তাঁহাকে। দিবারাত্র অর্থোপার্জনে ব্যস্ত থাকেন ভদ্রলোক। আজ বোধ হয় বিশ্রাম লইবেন। কাজেই ডাকিয়া আনাও যাইবে। স্বাধীনতা-দিবসে মনের সুর যদি উঁচু পর্দায় বাঁধা থাকে তো ফীটা রদ করাইবার জন্য বেশি বাক্‌বিস্তারের প্রয়োজন হইবে না।

পাশের একটা গলি হইতে রিক্‌শারোহণে বাহির হইলেন—রায় সাহেব রাঘবেন্দ্র। বেঁটে মোটা চেহারা; মেটে রঙ; ভারী মুখ; ফোলা-ফোলা গাল; ভোঁতা চিবুক, চিবুকের নীচে থলথলে মাংসের থাক। মাথায় বড় বড় চুল, সামনের দিক হইতে পিছনে উলটানো; পিছনে বব-করা। ছোট-ছোট চোখ দুইটি চাতুর্যে চকচক করিতেছে। গালে পান; ফোলা গাল আরও

ফুলিয়া উঠিয়াছে। পরনে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি ও চাদর। হাঁকিয়া কহিলাম, নমস্কার, চলেছেন নাকি? রিক্‌শাওয়ালাকে থামিতে বলিয়া রায় সাহেব ভুরু নাচাইয়া কহিলেন, যাব না! বলেন কি! জাতীয় জীবনের স্মরণীয় দিন আজ! কাল রাত্রে জহরলালের স্পীচ শুনেছেন? রেডিও নাই, শুনবেন কি ক'রে? বাংলায় তর্জমা করেছি, 'সেবকে'র বিশেষ সংখ্যায় বেরুবে আজ, পড়বেন। রায় সাহেব স্থানীয় পত্রিকা 'সেবকে'র সম্পাদক। কহিলাম, আপনি তো হিন্দু-মহাসভার পাণ্ডা, আপনাদের—। বাধা দিয়া রায় সাহেব কহিলেন, না না, পাণ্ডা নয়, সাধারণ সভ্য। তা অবশ্য হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক হিসাবে। কিন্তু আমি তো শুধু হিন্দু নয়, ভারতীয়ও তো; সে হিসাবে কংগ্রেসেরও সভ্য। তা ছাড়া, হিন্দুসভার সভ্য ব'লেই তার অন্যায় নির্দেশ মানতে হবে নাকি? মুসলমানরা তো স্বাধীনতা-দিবস পালন করতে অস্বীকার করে নি। যাক ও কথা। যাচ্ছেন তো ওখানেই। আসুন না, রিক্‌শায় জায়গা হবে।

রিক্‌শাওয়ালার পাতলা ডিগডিগে চেহারা রায় সাহেবের ভার বহনেই জখম হইয়া উঠিয়াছে। আবার ভারবৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখিয়া সকাতরে তাকাইল। কহিলাম, ধন্যবাদ। থাক্‌গে, আপনি চলুন রায় সাহেব। রায় সাহেব হাত নাড়িয়া কহিলেন, আর রায় সাহেব না, ওটা ছেড়েই দিলাম। স্বাধীন ভারতে দাসত্বের তকমা সহ্য হবে না আর। কহিলাম, তাই নাকি? ভাল।

আচ্ছা, চলি তা হ'লে।—বলিয়া রায় সাহেব প্রস্থান করিলেন।

আশেপাশে লোক ছুটিতেছে। কেউ রিক্‌শায়, কেউ মোটরে, অধিকাংশ পদব্রজে। সকলের গন্তব্য স্থান একই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠীর সামনে বিস্তৃত মাঠে পতাকা-উত্তোলনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পতাকা তুলিবেন জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট। নিজ নিজ বাড়িতে পতাকা উঠিয়াছে সবারই। তবু ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। কারণ ঐ অনুষ্ঠান সর্বসাধারণের। যেন বাড়ির পূজা, আর বারোয়ারী পূজা। যেন বাড়ির তোলা-জলে স্নান, আর সরোবরে সকলে মিলিয়া অবগাহন। একটা আনন্দ পারিবারিক, আর একটি সর্বজনীন। একটা পরিবারের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে কয়েকটি মনের যোগাযোগ, আর একটি সর্বজন-মনের সঙ্গে সংযোগ। এই সর্বজনীন অনুষ্ঠানের মধ্যে এই কথাটি মনে-প্রাণে বুঝা যাইবে, স্বাধীনতা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের নয়, জাতিধর্মনির্বিশেষে সর্বসাধারণের। ইহা রক্ষার

দায়িত্বও সর্বসাধারণের। স্বাধীনতা-দিবস অনুষ্ঠানের এই তাৎপর্য সকলের হৃদয়ঙ্গম করিতে পারাই এই অনুষ্ঠানের সার্থকতা।

হনহন করিয়া একটা লোক পাশ দিয়া পার হইয়া গেল। ঢ্যাঙা, কাহিল, কালো। পরনে হাফ-হাতা খাটো টুইলের পাঞ্জাবি, খাটো ধুতি, পায়ে তালিমারা জুতা। লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতেছে। ডাক দিলাম, ওহে, অত তাড়াতাড়ি কেন? দাঁড়াও না। লোকটি থমকিয়া দাঁড়াইল, মুখ ফিরাইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, আর দেরি নয়, যাবেন তো পা চালিয়ে আসুন।

লোকটির নাম পাঁচুগোপাল। মনিহারী দোকান ছিল। যুদ্ধের বাজারে উঠিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের বাজারে যাহাদের দোকান কোন কালে ছিল না তাহাদের নূতন করিয়া পত্তন হইল, আর পাঁচুর পুরাতন দোকান উঠিয়া গেল, তাহার হেতু হিটলার। হিটলারই পাঁচুর স্কন্ধে ভর করিয়া তাহাকে সর্বস্বান্ত করিয়াছে। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে হিটলার যে কত ক্ষতি করিয়াছে, পাঁচুই তাহার প্রমাণ। অথচ পাঁচুর মত হিটলারের হিতৈষী কয়জন ছিল!

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে পাঁচু পাঁচখানি বাংলা-ইংরেজী খবরের কাগজ কিনিয়া দোকানে বসিয়া খুঁটিয়া খুঁটিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিত। যুদ্ধের খবরগুলির মাথা খাটাইয়া এমন ভাষ্য করিত যে, শঙ্করভাষ্যও হার মানিয়া যায়। দোকানে খরিদ্দার আসিলে বিরক্ত হইত, বলিত, কি তেল-সাবান স্নো-ক্রীম কিনে বেড়াচ্ছেন! দুনিয়াতে কি হচ্ছে একবারটি ভেবে দেখুন গে না বাড়িতে ব'সে। শেষে বলিয়া দিত, মশায়, আরও দোকান আছে, সেখানে যান না, আমাকে বিরক্ত করেন কেন? যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় জার্মানরা যখন ঝড়ের মত দুর্নিবার বেগে আগাইয়া চলিয়াছিল, তাহাদের নির্মম আঘাতে শহরের পর শহর উন্মূলিত তরুর মত ভূলুণ্ঠিত হইতেছিল, পাঁচুর তখন তুরীয় অবস্থা। স্নানাহার ভুলিয়া সারা শহর চষিয়া বেড়াইত, পরিচিত কাহাকেও দেখিলেই পাকড়াও করিয়া যুদ্ধের খবর শুনাইত, হিটলারের পঞ্চমুখে প্রশংসা করিত। বলিত, আরে, কল্কি অবতার মশায়! যত পাপের আবর্জনা পাহাড়ের মত জমেছে, সব পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে সত্যযুগ এনে দিয়ে তবে যাবে। এত বড় মহাপুরুষ পৃথিবীতে জন্মেছে কি কখনও? এত বড় বীর, এত বড় ধার্মিক? যেমন নির্মল-চরিত্র, তেমনই নির্লোভ। এত বড় দেশের মালিক, একটা পয়সা ব্যাঙ্কে নাই।

মেয়েমানুষের মুখ পর্যন্ত দেখে না। তা ছাড়া সদাচারী। মাছ মাংস স্পর্শ করে না, শুনেছি, স্নান ক'রে গীতার এক অধ্যায় পাঠ না ক'রে নাকি চা খায় না। নামেই খ্রীষ্টান, আচারে আচরণে গোঁড়া হিন্দুকেও হার মানিয়ে দেয়। ইংরেজরা যখন 'বিসমার্ক' ডুবাইয়া দিল, পাঁচু সাত দিন শয্যাশায়ী ছিল। যুদ্ধের শেষ দিকটাতে জার্মানদের যখন ভাগ্য-বিপর্যয় শুরু হইল, পাঁচু একবারে দমিয়া গেল। মুখ তুলিয়া কাহারও সহিত কথা বলিত না, দোকান খুলিত না, ঝ'ড়ো কাকের মত মূর্তি করিয়া এখানে-সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইত। শেষে দোকান যখন উঠিয়া গেল, বাড়িতে বসিয়া নিঃশব্দে দাদার ধমক-অপমান, স্ত্রীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করিত।

পাঁচুর সঙ্গ লইতেই সে জোরকদমে ছুটিতে শুরু করিল। কহিলাম, এত ছুটছ কেন? পাঁচু মুখ ফিরাইয়া কহিল, ছুটব না! বলেন কি! কি ব্যাপারটা হচ্ছে বলুন দেখি? আগাগোড়া যদি না দেখলাম তো করলাম কি এত দিন ধ'রে? মহামানবের মহাদান সারা দেশের লোক মাথা পেতে নিচ্ছে, সেই দৃশ্য—

বাধা দিয়া কহিলাম, মহামানবটি কে? অ্যাটলি, ক্রিপ্স, মাউণ্টব্যাটেন, ইংলণ্ডেশ্বর—

পাঁচু থমকিয়া দাঁড়াইয়া আমার দিকে তাকাইল। পাঁচুর মাথার সামনে দিকটায় ঢালাও টাক। মুখটায় ঘোড়ার মুখের আদল সুস্পষ্ট; মুখে গোঁফদাড়ি স্বল্প; ছোট ছোট চোখ; সেই চোখ দুইটার দৃষ্টি দুইটা সঙ্গিনের মত খোঁচাইতে লাগিল। পাঁচু মিনিট দুই চুপ করিয়া থাকিয়া সক্ষোভে বলিতে লাগিল, সোজা জিনিসটা সোজাভাবে দেখতে জানেন না আপনারা, এইটাই হয়েছে আসল গলদ। এত বড় লোকক্ষয়ী যুদ্ধটা বৃথা হয় নি। এর পিছনে ছিল একজন মহামানবের মহৎ উদ্দেশ্য। সেই মহামানব মহাপ্রাণ হিটলার; মহৎ উদ্দেশ্য—জগৎ থেকে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস। তবে প্রত্যেক মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের পথেই মহতী বাধা; কাজেই, কাজের শেষ দেখে যেতে পারলেন না, অকালে আত্মগোপন করতে হ'ল। কহিলাম, খবরের কাগজে তো লিখেছে, হিটলারের মৃত্যু হয়েছে। ঘাড় নাড়িয়া কহিল, মৃত্যু হয় নি। মৃত্যুঞ্জয়ী বীর তিনি, এত সহজে তাঁর মৃত্যু হয় না। উত্তরমেরুতে বরফ-গুহায় তপস্যা করছেন; শক্তি সঞ্চয় করছেন। এবার দৈহিক শক্তি নয়, আত্মিক শক্তি।

ইংরেজরা জানে। তাই মানে মানে সাম্রাজ্যের জাল গুটোতে শুরু করেছে—

আমাদের স্বাধীনতা তা হ'লে—

হ্যাঁ, হিটলারের জন্যে। এই কথাটি মনে প্রাণে বোঝা দরকার সবারই। স্বাধীনতার পতাকা যখন উঠবে, এই কথাটি ভাববেন যে, আর কারও জন্যে নয়—একমাত্র সেই মহাপুরুষের জন্যে স্বাধীনতা পেয়েছেন আপনারা।

আবার ছুটিতে শুরু করিল। আমিও চলিতে লাগিলাম। কতকটা গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এখন কি করা হচ্ছে? দোকান? ডান হাতটা চিত করিয়া দিয়া সে কহিল, সে গয়া। ওঃ, যতদিন ছিল, বাড়িতে একেবারে অতিষ্ঠ ক'রে দিয়েছিল মশায়! একে মনের সেই দারুণ অবস্থা, তার ওপরে দিনরাত খেচাখেচি। এখন আর মুখে কথাটি নাই কারও। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দাদাকে বলেছি একটা সেলাইয়ের কল কিনে দিতে, দর্জীর দোকান করব।

কহিলাম, কাটছাঁট শিখেছ নাকি?

মাথায় ঝাঁকানি দিয়া কহিল, ও একরকম শেখাই। স্বাধীন ভারতে তো আর ফ্যাশান-ট্যাশান থাকবে না। খদ্দরের পাঞ্জাবি আর ফতুয়া, বালিশের অড় সেলাই করতে জানলেই হবে।

হঠাৎ কানের কাছে মুখটা আনিয়া কহিল, তা ছাড়া একটা গাঁথবার চেষ্টায় আছি। কংগ্রেস গভর্মেণ্ট তো! যারা কংগ্রেসের কাজ করেছে, তাদের আর বেকারবৃত্তি করতে হবে না।

কহিলাম, তুমি কংগ্রেসের কাজও করেছিলে নাকি?

ভ্রূ নাচাইয়া কহিল, করি নি! বলেন কি! পিকেটিং করেছিলাম গাঁজার দোকানে।

জেলে তো যাও নি।

সখেদে কহিল, না নিয়ে গেলে যাব কি ক'রে? ধ'রে নিয়ে গিয়ে যদি ছেড়ে দেয়, সে কি আমার দোষ? আমি তো চেষ্টার কসুর করি নি। মাথা নাড়িয়া কহিল, আপনি না জানলেও শহরসুদ্ধ সবাই জানে, আমি একজন কংগ্রেস-কর্মী। আর আপনিই বা জানবেন না কেন? সেদিনের কথা। মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌শনে পাড়ার সব ভোট যোগাড় ক'রে দিলাম

কংগ্রেসকে। মাথার ঝাঁকানি দিয়া কহিল, আমার জন্যে ভাবতে হবে না কাউকে, আমার হয়ে যাবে।

মাঠের সামনে পৌঁছিলাম। লোকে লোকারণ্য, তিল ফেলিবার জায়গা নাই। দূরে আদালতের বাড়িগুলি দেখা যাইতেছে। মাথায় মাথায় জাতীয়-পতাকা উড্ডীয়মান। ১৯৩০-৩১ সালের আন্দোলনের কথা মনে পড়িল। স্কুল ও কলেজের ছেলেরা আদালত-গৃহের মাথায় জাতীয়-পতাকা তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পুলিস-সাহেব ছিলেন খাঁটি সাহেব। দেশী কুত্তা-বাচ্চাদের দুঃসহ স্পর্ধা দেখিয়া ক্রোধে আত্মহারা হইয়া উঠেন। তাঁহার আদেশে পুলিস—আমাদের দেশের লোক, সমস্ত ছেলেকে রুলের বাড়ি মারিয়া আধ-মরা করিয়া ছাড়িয়া দিল। মারের চোটে একটি ছেলে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। শুধু আমাদের এখানেই নয়, সারা দেশের জেলায় জেলায় এই কাণ্ড ঘটিয়াছিল। সেই সব সাম্রাজ্যবাদী দাম্ভিক বিদেশীর দল কোথায় গেল? তাহারা চোখ মেলিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছে কি? আর আমাদের দেশের পুলিস, যাহারা আজ ভিজা বিড়াল সাজিয়া মুখে স্বদেশী বুলি কপচাইতেছে, তাহাদের এ সব কথা মনে পড়িতেছে কি?

পাঁচুগোপালের পাছু পাছু ভিড় ঠেলিয়া চলিয়াছি। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে, দেশের নেতৃবৃন্দের জয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। নানা রাস্তা দিয়া স্বদেশী গান গাহিতে গাহিতে জনস্রোত বিশাল জনসমুদ্রে আসিয়া মিশিতেছে।

অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া ঠেলিয়া অনুষ্ঠান-স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম।

শহরের ও জেলার কংগ্রেসের মাতব্বরেরা সকলে সমুপস্থিত। সকলেই খদ্দরধারী। মুখে গাম্ভীর্য। কংগ্রেসের তরুণ কর্মীরা প্রচণ্ড উৎসাহে শৃঙ্খলা-বিধানে ব্যস্ত। অত্যন্ত উদ্ধত উন্নাসিক ভাব। এই অনুষ্ঠান যে একমাত্র তাহাদেরই নিজস্ব ব্যাপার, বাকি সকলে রবাহুত দর্শকমাত্র, ভাবে ভঙ্গীতে ইহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, ধনী ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট ডাক্তার ও উকিল, জমিদার ও কন্ট্র্যাক্টর, মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সভ্যবৃন্দ আসিয়াছেন। অনেক সরকারী কর্মচারীও উপস্থিত হইয়াছেন। দুই-চারজনের পরিধানে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি। পুলিস-কর্মচারী আসিয়াছেন কয়েকজন; পরিধানে পুলিসের পোশাক, কিন্তু হাবে ভাবে পরমবৈষ্ণবসুলভ বিনয়-বিগলিত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সম্মুখে উল্লাসোচ্ছল কোলাহল-মুখর জনারণ্য। পুরোভাগে এক দিকে স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা, আর এক দিকে স্কুল ও কলেজের ছাত্রীরা ও শহরের প্রগতিসম্পন্না মহিলাবৃন্দ। মাঝখানে মাস্টার, অধ্যাপক, উকিল, মোক্তার, কেরানী ইত্যাদি শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ভিড়। পশ্চাতে শহরের ও শহরের আশেপাশের পল্লীগ্রামের হাজার হাজার লোকের বিরাট সমাবেশ। ইহার মধ্যে আছে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জাম-জায়গার আয়ভোগী সাধারণ ভদ্রলোক, জোতদার, মহাজন, ছোটখাটো ব্যবসাদার, শিল্প-জীবী, কৃষক ও মজুর। ইহাদের স্বার্থ বিভিন্ন, অনেক ক্ষেত্রে একের স্বার্থ অন্যের পরিপন্থী। তবু আজ একটি বৃহৎ আনন্দ-তরঙ্গে হাজার হাজার মানুষের হাজার ধরনে বাঁধা হাজার রকমের মনের তারে একই সুর বাজিয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ হরিসাধনবাবুর কথাটা মনে পড়িল, স্বাধীনতা তো পাওয়া গেল, কিন্তু কাহাদের স্বাধীনতা? ঐ নবলব্ধ প্রভাবে স্ফীতগণ্ড কংগ্রেসী নেতা ও কর্মীদের, স্বার্থ-সর্বস্ব অর্থলোভী ব্যবসায়ীদের, অভাবকণ্টকিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের, দারিদ্র্য জর্জর জনগণের? স্বাধীন জীবনের সুখ-সুবিধার যে স্বপ্ন প্রত্যেকের চোখে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ঐ হৃদয়হীন বিবেক-বিচারশূন্য ব্যবসায়ীর—যে অর্থের লোভে দেশবাসীর খাদ্যে বিষ মিশাইতে দ্বিধা করে না, দেশবাসীর খাদ্য ও পরিধেয় লইয়া জুয়া খেলে, ঐ জবরদস্ত জমিদারের—যে প্রজাপীড়ন করিয়া নিজের সুখ-সম্পদ বৃদ্ধি করে, ঐ কুসীদজীবী মহাজনের—যে নিরক্ষর সরলবুদ্ধি কৃষকদের ঠকাইয়া তাহাদের জীবন যাত্রার স্বল্প সম্বলকে নিজের সিন্দুকে ঢোকায়, ঐ অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের—দুর্গম জীবন-যাত্রাপথে যাহারা দিশাহারা, ঐ দীন দরিদ্র কৃষক ও মজুরদের—যাহারা বংশানুক্রমে পশুর মত জীবন যাপন করিয়া মনে ও প্রকৃতিতে পশুর মত হইয়া উঠিয়াছে, ঐ সব স্বপ্নের প্রকৃতি তো এক হইতে পারে না। একসঙ্গে সকল স্বপ্নের সাফল্য অসম্ভব। কাহাদের স্বপ্ন সফল হইবে?

হঠাৎ জনসমুদ্র গর্জন করিয়া উঠিল, বন্দে মাতরম্। চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম, জেলা-কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি মহাশয় পতাকার দড়ি ধরিয়া টানিতেছেন, পতাকা সরসর করিয়া উপরে উঠিতেছে। জনসমুদ্র পুনঃ পুনঃ হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিল, বন্দে মাতরম্, মহাত্মা গান্ধীজীকি জয়, জহরলালজীকি জয়—

কে একজন হাঁকিয়া উঠিল, নেতাজীকি জয়। এখানে ওখানে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি উঠিল।

পতাকা উপরে উঠিয়া পতপত করিয়া উড়িতে লাগিল।

সকলে পতাকাকে অভিবাদন করিলাম। বক্তৃতা হইল না। সভাপতি মহাশয় ফতোয়া দিলেন, বিকালবেলায় এই মাঠে সভা হইবে; এই মাঠে কংগ্রেসের মাতব্বরেরা বক্তৃতা করিবেন; সকলে যথাসময়ে যেন উপস্থিত হন। কংগ্রেসকর্মীরা হাঁকিয়া হাঁকিয়া সভাপতি মহাশয়ের আদেশ উপস্থিত জনমণ্ডলীকে জানাইয়া দিল।

ইহার পর মুক্তি-সংগ্রামের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন-পর্ব। এক পাশে খানিকটা জায়গার উপরে শহীদ-স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। সাঙ্গোপাঙ্গ সমভিব্যাহারে সভাপতি মহাশয় সেই স্থানের দিকে চলিলেন। অনেকে অনুসরণ করিল। বাকি জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

আমি ডাক্তারবাবুর খোঁজে শ্যেনদৃষ্টিতে এদিকে ওদিকে তাকাইতে লাগিলাম। এখানে আসিয়াছেন নিশ্চয়। হঠাৎ চোখে পড়িল, দূরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছেন। ভদ্রলোককেও চিনলাম। মিউনিসিপ্যালিটির একজন ধুরন্ধর পাণ্ডা। ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়া হাজির হইলাম। আমাকে দেখিয়া কহিলেন, জয় হিন্দ, কি খবর? নমস্কার করিয়া কহিলাম, জয় হিন্দ। ডাক্তারবাবু কহিলেন, স্বাধীনতা তো পাওয়া গেল, এর পর?

কহিলাম, এর পরের সমস্যাই তো আসল সমস্যা ডাক্তারবাবু। আসন্ন ঝড়ের মুখে মাঝ-দরিয়ায় হাল ছেড়ে দিয়ে মাঝি তো স'রে পড়ল। হাল আর বৈঠা ধরবার ভার যাঁরা নিয়েছেন, তাঁরা এ কাজে অনভ্যস্ত, অনভিজ্ঞ। ঢেউ কাটিয়ে, ধাক্কা সামলে কূলে পৌঁছানো যাবে, না, মাঝ-দরিয়ায় তলিয়ে যেতে হবে, এইটাই তো ভাববার কথা

ভদ্রলোকটি মুচকি হাসিয়া মুরুব্বিয়ানার সুরে কহিলেন, কিছু চিন্তা নাই। স্বায়ত্তশাসন তো কতকগুলো প্রতিষ্ঠানে আমরা আগেই পেয়েছি, তা কৃতিত্বের সঙ্গে চালিয়েও যাচ্ছি। সারা দেশের স্বায়ত্তশাসনেও কোন অসুবিধা হবে না। উপযুক্ত লোকের তো দেশে অভাব নাই।—বলিয়া ভাবে ভঙ্গীতে নিজের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ডাক্তারবাবু কহিলেন, কাজের ভার না

পেলে তো যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রমাণ দেওয়া যায় না। তবে যাঁরা ভার নিয়েছেন, তাঁদের বিদ্যা-বুদ্ধি, হৃদয়ের শক্তি, চরিত্রের সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশবাসীর প্রতি দরদ, স্বার্থত্যাগের তো প্রমাণের অভাব নাই। গুরু দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে, তা এঁরা বহন করতে পারবেন না, এ সম্বন্ধে আগে থেকে সন্দিহান হওয়া উচিত নয় কারও। হাতঘড়ি দেখিয়া কহিলেন, এখনই অনেক দূর পাড়ি দিতে হবে, জরুরী কেস—

কহিলাম, আমার একটু দরকার ছিল আপনার সঙ্গে—

কি বলুন দেখি, বাড়িতে অসুখ নাকি?

বিস্ময়ের আভাস ফুটিল মুখে ও কথার সুরে। ওঁর মত বড় ডাক্তারকে সচরাচর ডাকি না আমরা। হোমিওপ্যাথ ডাকিয়া কাজ চালাই। অবশ্য নেহাৎ বাড়াবাড়ি হইলে ওঁদের ডাকিতেই হয়। কহিলাম, না, আমার বাড়িতে নয়। আমাদের পাড়ার একজন ভদ্রলোককে একবার দেখতে হবে।

কে বলুন দেখি?

নাম বলিতেই ডাক্তারবাবু কহিলেন, হ্যাঁ, সেই ভদ্রলোক তো কোথায় মাস্টারি করতেন, গোলমালে প'ড়ে চাকরি গেছে। আমাকে একবার ডেকেছিলেন বটে, অনেকদিন আগে। ওষুধের ব্যবস্থাও ক'রে দিয়েছিলাম। তারপর আর খবর দেন নি।

কহিলাম, ওষুধ তো নিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন নি। আজকাল দাম জানেন তো। অভাবী মানুষ—

এক টুকরা বাঁকা হাসি হাসিয়া শ্লেষের সুরে কহিলেন, ওষুধ না কিনতে পারেন তো ডাক্তার দেখিয়ে লাভ কি? ডাক্তারের মুখ দেখলেই তো রোগ সারবে না।

ভদ্রলোক সায় দিয়া কহিলেন, সত্যিই তো। মিছিমিছি ওঁদের সময় নষ্ট। তা ছাড়া রোগী টেঁসে গেলে দুর্নাম।

কহিলাম, ভদ্রলোকের অসুখটা খুবই বেড়ে উঠেছে। তবে ওঁর বিশ্বাস, আপনি একবার দেখলেই হয়তো সেরে উঠবেন। ডাক্তারবাবু হাসিয়া কহিলেন, তাই নাকি! আমি দেখলেই সেরে উঠবেন? আমার ওষুধ খেতে হবে না? কহিলাম, ওষুধ খাবেন বইকি, নিশ্চয় খাবেন। তবে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের চেহারা দেখলেও রোগী আদ্ধেক সেরে যায়।

ভদ্রলোক আমার কথায় সায় দিয়া কহিলেন, তা সত্যি। ডাক্তারবাবুর মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিলাম, আজ কি একটি বার যেতে পারবেন? ডাক্তারবাবু কহিলেন, এখন তো অসম্ভব। শুনলেনই তো, অনেক দূর যাচ্ছি। সন্ধ্যের আগে ফিরতে পারব ব'লে মনে হয় না।

কহিলাম, সন্ধ্যের পরে কি খবর নেব?

বেশ, নেবেন। আচ্ছা, আমি চলি।

মিউনিসিপ্যালিটির ভদ্রলোককে কহিলেন, যাবেন নাকি? চলুন, নামিয়ে দোব আপনার বাড়ির সামনে।

কাছেই তাঁহার গাড়ি দাঁড়াইয়া ছিল। দুইজনে গিয়ে গাড়িতে উঠিলেন।

শহরের ভিতর দিয়া চলিলাম। অত্যন্ত ভিড়। প্রত্যেক দোকানের মাথায় স্বরাজ-পতাকা উড্ডীয়মান। চা-খাবারের দোকানগুলা সরগরম। খরিদ্দার অধিকাংশ মফস্বলের। সকাল হইতে এতখানি মেহনত করিয়া ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া উঠিয়াছে সকলে। দোকানীদের নূতন-করিয়া-ভাজা বাসি মাল আকণ্ঠ গিলিতেছে। স্বাধীনতা-দিবস-পর্ব সারিয়া থলি হাতে বাজারের দিকে ছুটিয়াছে অনেকে। আজিকার মত দিনে একটু ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। তরি-তরকারি যাহাই হউক, মাছ একটু নিশ্চয়ই দরকার। দাম যাহাই হউক। মাংস তো পাওয়া যাইবে না। পাঁঠাদের আজকার দিনটির মত বাঁচিয়া থাকিবার সনদ মিলিয়াছে—দিল্লীর দরবার হইতে।

পাশের একটা গলিতে ঢুকিয়া পড়িলাম। দিনেশবাবুর বাড়ি যাইতে হইবে। দিনেশবাবু আমার ভূতপূর্ব অধ্যাপক। পূর্ববঙ্গে বাড়ি। তাঁহার পুত্রবধূ এখানের মেয়ে-স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস। সেই সূত্রে এখানে বসবাস করিতেছেন। তাঁহার পুত্র জীবিত নাই। বিপ্লবী ছিল সে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইয়াছিল তাহার। কারাবাসেই মৃত্যু হইয়াছে। সে খবর দিনেশবাবুকে দেওয়া হয় নাই। তিনি এখনও জানেন, পুত্র তাঁহার বাঁচিয়া আছে একদিন বাড়ি ফিরিবে। নিদারুণ রোগের আক্রমণে চোখের দৃষ্টি হারাইয়াছেন অনেকদিন, পুত্রবধূর বৈধব্য-দশা চোখে দেখিতে পান না। ভারত স্বাধীনতা পাইয়াছে, এই খবরে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। কবে তাঁহার ছেলে বাড়ি ফিরিবে—এই আশায় দিন গনিতেছেন।

মাঝে মাঝে তাঁহার কাছে গিয়া বসি। ছেলের গল্প ছাড়া আর কোন কথা বলেন না। মাতৃহীন শিশুকে মানুষ করিয়াছিলেন তিনি। ছেলের মত ছেলে, যেমন বুদ্ধি, তেমনই গায়ে শক্তি। স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় সকলের সেরা ফল করিত, গায়ের জোরে সব ছেলেদের মাথার উপরে থাকিত। এম. এ.-তে রেকর্ড মার্ক পাইয়াছিল অর্থনীতিতে। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, ছেলে আই. সি. এস. পরীক্ষা দেয়। দিলে পাস করিতই সে। ছেলে রাজী হইল না। পূর্ববঙ্গের কোন এক বে-সরকারী কলেজে চাকুরি লইয়া চলিয়া গেল। সেইখানে বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসিল। বৈপ্লবিক কর্মে যোগ দিল। চরিত্র ও কর্মশক্তি-মহিমায় দেখিতে দেখিতে দলের নেতা হইয়া উঠিল। দিনেশবাবুর এক বন্ধু পুলিসে চাকরি করিতেন। তাঁহার কাছে খবর পাইয়া তিনি ছেলেকে নিজের গুরুতর অসুখের খবর দিয়া বাড়ি আনাইলেন। সুন্দরী শিক্ষিতা একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিলেন। কলিকাতার এক কলেজে চাকরি যোগাড় করিয়া দিলেন। ছেলে কলিকাতায় বসিয়া বিপ্লবের কাজ চালাইতে লাগিল। পুলিসের তাহা অগোচর রহিল না। হঠাৎ একটা ব্যাপারে ধরা পড়িল সে। বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইল তাহার। দিনেশবাবু এই আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না। নিদারুণ রোগে পড়িলেন; চোখের দৃষ্টি গেল; চাকরি গেল। গ্রাসাচ্ছাদন চালাইবার জন্য তাঁহার পুত্রবধূ চাকরিতে ঢুকিতে বাধ্য হইলেন।

মাঝে মাঝে ছেলেকে চিঠি লেখেন তিনি। নিজে লিখিতে পারেন না; পুত্রবধূকে দিয়া লেখান, কবে আসবি? চোখে দেখতে পাব না কোনদিন; একবার তোকে ছুঁয়ে মরতে চাই, বাবা।

চিঠি জমা থাকে বউমার একটি বাক্সে। বাক্স ভর্তি হইয়া গেছে চিঠিতে। চিঠির জবাব আসে মাস খানেক পরে; জবাব লেখেন বউমা, পড়িয়া শুনান—আর দেরি নাই, বাবা। ভারতের বুকে জোঁকের মত ব'সে যারা রক্ত চুষে ফুলে উঠেছে, খ'সে পড়বে তারা শীগগির। পরাধীনতার বেড়ি প'রে কারাবাসে ঢুকেছিলাম, শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে মাথা উঁচু ক'রে বেরোব।

বাবার দুই চোখ হইতে জল পড়ে, বর্ষার অপরাহ্ণের মত আর্দ্র ম্লান হাসি হাসেন।

ছোট একতলা বাড়ি। সামনে এক ফালি রোয়াক। ভিতরে ঢুকিতেই

অপরিসর উঠান, সামনে বারান্দা। বারন্দায় একটি ডেক-চেয়ারে বসিয়া ছিলেন দিনেশবাবু। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। জীর্ণশীর্ণ দেহ। রঙ ধবধবে ফরসা। আবক্ষলম্বিত দাড়ি কাশফুলের মত সাদা। মাথায় এলোমেলো দুধের মত সাদা চুল। পরিধানে খদ্দরের খাটো ধুতি, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া। ডান হাতটি কোলের উপরে ন্যস্ত। অনবরত কাঁপিতেছে হাতটি। বাম পাশে একটি ছোট টেবিলের উপরে একটি আনকোরা খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জাবি; একটি খদ্দরের জাতীয়-পতাকা।

আমার পায়ের শব্দে সচকিত প্রশ্ন করিলেন, কে? আমি আগাইয়া গিয়া কহিলাম, আমি। বৃদ্ধের মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল; নিস্তেজ কণ্ঠে কহিলেন, ওঃ, তুমি! এস, ব'স। পাশে একটা টুলে বসিলাম। বৃদ্ধ কহিলেন, সকালের গাড়িতে এল না তা হ'লে। দুপুরে একটা গাড়ি আছে, না? সেটাতে তা হ'লে আসবে নিশ্চয়।

প্রশ্ন করিলাম, কে?

কেন? আমাদের শিবু। ছাড়া পেয়ে গেছে নিশ্চয়। আজই তো আসবার দিন। স্বাধীনতার প্রথম দিন আজ। বাড়িতে বাড়িতে উৎসব। তারাও আজ নিজের নিজের বাড়িতে এসে উৎসব করবে। স্বরাজ-পতাকা, খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি আনিয়ে রেখেছি। সে এসে স্নান ক'রে শুদ্ধ-শান্ত হয়ে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে বন্দে মাতরম্ গান গাইতে গাইতে পতাকা তুলবে। তারই জন্যে তো অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছি ভোরবেলা থেকে। বন্দে মাতরম্ গান তার শুনেছ তো? সমস্ত প্রাণ দিয়ে গায়। শুনলে মনে হয়, মা যেন মূর্তি ধ'রে চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাও তখনকার দিনে ভয়ে ভয়ে গাওয়া, পুলিস শুনতে পেলেই চোখ রাঙিয়ে তেড়ে মারতে আসত; আজ স্বাধীন ভারতে দাঁড়িয়ে মুক্তির হাওয়ায় বুক ভ'রে নিয়ে গাইবে মায়ের গান, প্রাণ ভ'রে শুনব। কতদিন শুনি নি!—বৃদ্ধ উত্তেজনায় হাঁপাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, দুপুরের গাড়িতে আসবে নিশ্চয়ই, কি বল? বউমাকে রান্না করতে বলেছি। কি কি খেতে ভালবাসত সবই তো জানে। হ্যাঁ হে, কইমাছ বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না? বড় প্রিয় ছিল তার। কহিলাম, শিবুদাদা ছাড়া পান নি সম্ভবত। দৃষ্টিহীন চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া সবিস্ময়ে কহিলেন, কেন? ছাড়া পাবে না কেন? সবাই পেয়েছে—

সব রাজবন্দী তো এখনও ছাড়া পান নি।

সে কি! দেশের মুক্তি হয়েছে, দেশের জন্যে যারা জীবন ক্ষয় করেছে, তাদের মুক্তি হয় নি?

হবে, পরে। জাতীয় সরকার কর্মভার হাতে নিয়ে সকলকে মুক্তি দেবেন।

সক্ষোভে কহিলেন, তবে এ উৎসবের অর্থ? এ যে সোনা ফেলে আঁচলে গেরো! যারা মাতৃপূজার ঘট স্থাপন করলে, বুকের রক্ত দিয়ে মায়ের বেদীকে মার্জনা করলে, জীবনের সব সুখ-সম্ভাবনাকে উৎসর্গ ক'রে দিলে মায়ের উদ্দেশে, তারা রইল অন্ধকার কারাবাসে বদ্ধ হয়ে, আর বাইরে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে জাঁকজমক ক'রে মায়ের পূজো হতে লাগল।

কহিলাম, আমাদের নেতারা তাঁদের স্মরণ করেছেন বক্তৃতায়—

তীব্রকণ্ঠে দিনেশবাবু কহিলেন, তবে তো সব দুঃখ ঘুচে গেল আমাদের! দয়া ক'রে তাদের কথা স্মরণ করেছেন! এ দয়াটা নাই বা করতেন।—উত্তেজনায় মুখ লাল হইয়া উঠিল, ঠোঁট দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সামলাইয়া কহিলেন, পশ্চিম-বঙ্গের কথা জানি না, পূর্ববঙ্গে কত ঘরে কত বাপ-মা, ভাই-বোন, স্ত্রী, কত আশা নিয়ে পথের পানে তাকিয়ে ছিল আজ; কতদিন পরে তাদের ছেলে, ভাই, স্বামী বাড়ি ফিরবে; তারা আজ মুখ শুকনো ক'রে ঘরের কোণে ব'সে চোখের জল ফেলতে লাগল, উৎসবে যোগ দিলে না।

কহিলাম, পূর্ববঙ্গের কেউ তো যোগ দিলে না। তারা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আমাদের কাছ থেকে।

তাও তো বটে। স্বাধীনতা পেলাম আমরা, কিন্তু কি হবে এ স্বাধীনতা নিয়ে, যা সবাই মিলে ভোগ করতে পারলাম না, যা সবার মনে মুক্তির আনন্দ আনলে না?

চুপ করিয়া রহিলাম। দিনেশবাবু গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তা হ'লে আসবে না এখন? খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি ও পতাকা বাম হাত দিয়া ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, কি আর হবে এসবে, রেখে দিকগে তুলে। পতাকা তুলতে হবে না আমাদের। গভীর হতাশার সহিত কহিলেন, হয়তো আসবেই না, ছাড়বেই না হয়তো তাদের। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারা মাথা তুলে দাঁড়ায়, প্রতিবাদ করে, প্রত্যাঘাত করে, তাদের শাসক মাত্রেই ভয় করে,—শাসক দেশীই হোক, আর বিদেশী হোক। শাসকই বদলেছে, দেশের,

শাসন-পদ্ধতি তো বদলায় নি। যখন বদলাবে, তখন হয়তো মুক্তি পাবে। তখন আমি থাকব না।

কহিলাম, তা কি হয়! ছেড়ে দেবে সবাইকে, আজ না হোক, দুদিন পরে।

সোৎসাহে কহিলেন, দেওয়াই তো উচিত। সসম্মানে তাদের এনে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত করা উচিত। দেশের জন্যে যারা এত দুঃখ ভোগ করলে, জীবনের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট করলে, দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে, দেশের সরকারের উচিত, সব কাজের আগে তাদের সব ক্ষয় সব ক্ষতি পূরণ করা; তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি, প্রতিভা, কর্মশক্তি, যা এত দিন বৃথা নষ্ট হ'ল, তাকে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োগ করা।

কহিলাম, সবই হবে।

সক্ষোভে কহিলেন, হবে তো, কবে? নিজের নিজের ব্যবস্থাই করবে তোমাদের নেতারা। এদের কথা কারও মনে থাকবে ব'লে মনে হয় না। যারা দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে, সভা-সমিতি ক'রে তাদের শুকনো শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে, কিন্তু তাদের অসহায় বাপ-মা আত্মীয়-স্বজনদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন ব্যবস্থা হবে কি? কিছু হবে না। তেলা মাথাতেই তেল ঢালা হবে, যেমন বরাবর হয়েছে; রুখু মাথায় খড়ি উড়তে থাকবে চিরদিন।

চুপ করিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, চোখে দেখতে পাই নে; নড়তে-চড়তে পারি নে; মরণের প্রতীক্ষা করছি প্রতি মুহূর্তে; তবু ভগবানের কাছে সর্বদা এই প্রার্থনা করছি, মরবার আগে যেন সে ফিরে আসে; যেন দেখে যেতে পাই, সে সংসারী হয়েছে, সন্তানের পিতা হয়েছে। এ কি অসম্ভব প্রার্থনা? ভগবান পূর্ণ করবেন না কিছুতেই? আমার মরণের সঙ্গে সঙ্গে বংশের ধারা শেষ হয়ে যাবে, অভাগী মেয়েটা একেবারে অনাথা হয়ে যাবে? ভেবে রাতে চোখ বুজতে পর্যন্ত সাহস হয় না আমার।

বউদিদি এক কাপ চা আনিলেন। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স। ছিপছিপে গঠন। ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ। পরিধানে শুভ্র বিধবার বেশ। মুখের গঠন সুন্দর। চোখ দুইটিতে ক্লান্ত বিষণ্ণতা। নাক ও চিবুকের গঠন মনের দৃঢ়তার পরিচায়ক। মুখের ভাবে আজীবন কৃচ্ছ্রব্রতী তপস্বিনীর শান্ত বৈরাগ্য। মাথায় অল্প অবগুণ্ঠন। শুভ্র সীমন্তরেখার দুই পাশের চুলে দুই-এক

গাছি পাকা চুল রুপার তারের মত চিকমিক করিতেছে। কহিলেন, বাবা, আপনি চা খাবেন ?

বৃদ্ধ জবাব দিলেন, না মা, থাক্। আশা করেছিলাম, এখনই আসবে, একসঙ্গে ব'সে খাব। এল না ; আসবেও না। আমার নাম করিয়া কহিলেন, বলছে, ছাড়া পায় নি ওরা। ধুতি পাঞ্জাবি পতাকা রেখে দাওগে তুলে। আজ স্বাধীনতা-দিবস নয় আমাদের। ও যেদিন বাড়ি আসবে, সেই দিন থেকেই আমাদের স্বাধীন জীবন শুরু হবে, সেই দিনই উৎসব হবে আমাদের।

কিছুক্ষণ পরে চলিয়া আসিলাম। দরজার কাছে বউদিদি দাঁড়াইয়া ছিলেন ; জলভরা মেঘের মত থমথমে মুখ ; আমাকে দেখিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, ঠাকুরপো, আর কতদিন ওঁকে ভুলিয়ে রাখব ? আর তো পারছি না।—বলিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িতেই দেখিলাম, আনন্দ-প্রবাহ আগের মতই বহিয়া চলিয়াছে। মনে হইল, যেন একটি হিম-শীতল অন্ধকার গুহা হইতে বাহির হইয়া সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশের নীচে, আনন্দ-উচ্ছল পরিবেশের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বাহিরে এত আলো, এত উল্লাস, এত উদ্দীপনা—ইহার একটি কণাও সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করে নাই। আজিকার দিনেও সেই গুহাবাসীরা দুর্ভাগ্যের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে দূরে সরিয়া রহিল। কেহ তাহাদের ডাকিয়া বাহিরে আনিল না। শুধু এই শহরেই নয়, সারা বাংলা দেশে, সারা ভারতে, এমনই কত শত নর-নারী আজিকার আনন্দ উৎসবে যোগ দিল না ; তাহাদের কথা দেশের জনসাধারণের বা তাহাদের নেতৃবৃন্দের, কাহারও মনে পড়িল না।

সামনের দিকে আগাইয়া চলিয়াছি আর একজন এমনই গুহাচারিণীর সংবাদ লইবার জন্য। আমার এক বন্ধুর বোন বীণা। বন্ধু বড়লোকের ছেলে, নিজে বড় ব্যবসায়ী। শহরে প্রকাণ্ড বাড়ি। বাবা বাঁচিয়া নাই, সে-ই এখন বাড়ির কর্তা। বীণা তাহার ছোট বোন। বীণার স্বামীও ব্যবসা করিত ; কলিকাতায় ফার্নিচারের দোকান ছিল। বাড়ি ও দোকান দুইই ছিল পার্ক স্ট্রীট। নির্ভেজাল মুসলমান-পল্লী। বাড়িটি ছিল দোতলা। নীচের তলায় দোকান, উপর-তলায় বীণারা বাস করিত—বীণা, বীণার স্বামী আর বীণার মেয়ে।

একটি মাত্র মেয়ে বীণার, আর সন্তান হয় নাই। মেয়েটির বয়স বছর পনরো। এই পল্লীতে অনেকদিন বাস করিতেছিল, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্প্রীতি ছিল। কলিকাতায় হাঙ্গামা শুরু হইবার পরও প্রতিবেশীরা বরাবর তাহাদের সাহস দিয়াছিল। কিন্তু দুর্বৃত্তের দল যখন আক্রমণ করিল, প্রতিবেশীরা সাহায্য করা দূরে থাক্, অনেকে আক্রমণকারীদের দলে যোগ দিল। দোকান লুঠ হইল, বীণার স্বামী দোকানেই খুন হইল। দুর্বৃত্তের দল দোতলায় উঠিয়া বীণাদের সর্বস্ব লুঠ করিল, বীণার পনরো বছরের মেয়েকে তাহার বুক হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল; বীণাকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় ফেলিয়া চলিয়া গেল। স্বামী-সন্তানহীনা বীণা জনৈক সহৃদয় প্রতিবেশীর সাহায্যে এখানে চলিয়া আসিল। তারপর হইতে সে তাহার দাদার বাড়িতেই বাস করিতেছে।

বীণাকে ছোটবেলা হইতে দেখিয়াছি। হাসি গানে গল্পে, আনন্দে, প্রাণের প্রাচুর্যে উৎসের মত উচ্ছ্বাসময়ী। বিবাহের আমিই ঘটকালি করিয়াছিলাম। বরের নাম করিয়া ঠাট্টা করিলে কৃত্রিম রাগে মুখ লাল করিত, কথা বন্ধ করিত, আবার যাচিয়া কথা বলিত। বিবাহের পরে তাহার কলিকাতার বাসায় গিয়াছি। তখন সে স্বামীর সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী। কলস্বনা স্রোতস্বিনী তখন বৃহৎ নদীর মত বিপুল বিস্তারে ও গাম্ভীর্যে গৌরবময়ী। কত আপ্যায়ন, কত সেবা, কত স্নেহ ও শ্রদ্ধা! মেয়েটিও তেমনই, দেখ্‌তে যেমন সুশ্রী, তেমনই মিষ্ট স্বভাব। নিজের মামার মত শ্রদ্ধা করিত আমাকে। বীণার সাজানো সুখের সংসার একদিনে ছারখার হইয়া গেল, রাজরাণী পথের ভিখারী হইল।

বীণার কাছে মাঝে মাঝে যাই। মস্ত বড় বাড়ির একান্তে একটি ছোট ঘরে থাকে সে। সারাদিন চুপচাপ বসিয়া থাকে। এখন আর কাঁদে না; অশ্রুপাথার মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। যাই, কাছে বসি। একই কথা, কোথায় কেমন করিয়া আছে মেয়ে। শুষ্ক শীর্ণ কণ্ঠে কহে, মরতে পারছি না শুধু তারই জন্যে। যদি জানতে পারি, সে ম'রে গেছে, তা হ'লে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।

আজ স্বাধীনতা-দিবস। বন্ধু আমার কংগ্রেস-পন্থী। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। বাড়িতে উৎসব চলিয়াছে নিশ্চয়। সকলের মুখে হাসি, মনে আনন্দ। আত্মীয়-

স্বজনদের আনন্দময় সংস্রব হইতে দূরে নিজের অন্ধকার ঘরটিতে একলা বসিয়া চারিপাশে শোকের তোমানল জ্বালিয়া দুশ্চর তপস্যাব্রতী সন্ন্যাসিনীর মত বীণা তিলে তিলে নিজেকে দগ্ধ করিতেছে। কেহ তাহার কাছে যাইতেছে না, পাছে তাহার শোকের কালিমা আজিকার নির্মল আনন্দটিকে মলিন করিয়া তুলে।

বীণাদের বাড়িতে গেলাম। মস্ত বড় দোতলা বাড়ি। বাড়ির মাথায় প্রমাণ সাইজের রেশমী স্বরাজ-পতাকা উড়িতেছে। বাড়ির সামনে বাগানে ছোট ছেলেমেয়েরা ভাল ভাল পোশাক পরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সারা বাড়িটাতে একটি আনন্দময় চাঞ্চল্য। বাড়িতে ঢুকিতেই বন্ধুর মায়ের সহিত দেখা হইল। সস্নেহ-আপ্যায়ন করিলেন, কুশল প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার অন্যান্য মেয়েরা আসিল, সকলের মুখে চোখে হাসি ঝলমল করিতেছে। উৎসবের ঢেউ লাগিয়াছে সকলের মনে। রান্নাঘর হইতে রান্নার সুগন্ধ নাকে আসিতেছে। ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে নিশ্চয়। মা কহিলেন, অমর বলছিল তোমার কথা। যেতে পারলে না। ভারি ব্যস্ত তো আজ ওরা। এসেছ, ভালই করেছ। একেবারে নাওয়া-খাওয়া সেরে যাবে। মেয়েরা আবদারের সুরে মাকে সমর্থন করিল। হাঁ বা না—কিছুই না বলিয়া প্রশ্ন করিলাম, বীণা কোথায়? মায়ের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। কহিলেন, আছে ওর ঘরে। ঘর থেকে তো বেরোয় না; দিনরাত চুপ ক'রে ব'সে থাকে, আর ভাবে। কি যে করব ওকে নিয়ে? যাবে নাকি ওর কাছে? যাও, পার তো বুঝিও। আজকের দিনটাতেও যদি একবার বাইরে এসে সকলের সঙ্গে বসে, দাঁড়ায়! হাসি ফুর্তি ওর ফুরিয়ে গেছে জানি, তবু অদৃষ্টকে তো মেনে নিতে হবে। রোগেও কত মেয়ের স্বামী সন্তান একসঙ্গে ম'রে যায়। তা সামলেও তো তারা বাঁচে, সাধারণ মানুষের মত খায়-দায়, গল্প করে, ও যে কিছুতেই পারছে না তা! সকলের মুখের দিকে তাকিয়েও তো ওর সামলানো উচিত।

মায়ের কথায় বিরক্তির রেশ। শোককে আমরা বেশি দিন সহ্য করিতে পারি না। নিরবচ্ছিন্ন শোক সুমধুর সুর-সঙ্গতির মধ্যে বেয়াড়া বেসুরের মত মনের গায়ে কাঁটা ফুটাইতে থাকে। পারিপার্শ্বিক প্রশান্তিকে ঘুলাইয়া তুলে। মন বিরক্ত হয়, বিরূপ হয়।

একতলার এক প্রান্তে একটা ঘরে থাকে বীণা। বীণার ছোট বোন

আমাকে বীণার ঘর পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। ঘরে ঢুকিলাম। অন্ধকার ঘর। এক পাশে মেঝের উপর বীণা বসিয়া আছে। ডাকিলাম, বীণা! মুখ তুলিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিল কিছুক্ষণ, যে মন ওর অন্তরে ব্যাপৃত ছিল, তাহাকে যেন বহু চেষ্টায় দৃষ্টির সঙ্গে যোগ করিল, তারপর উদাস-কণ্ঠে কহিল, দাদা! আসুন —বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বসুন।

এক পাশে একটা মাদুর পাতা ছিল। এক দিকে বীণার স্বল্প শয্যা গুটানো। মাদুরে বসিয়া কহিলাম, তুমি ব'স। বীণা নীরবে শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এক বৎসরের মধ্যে বীণা কত বদলাইয়াছে! শীর্ণ মলিন দেহ, পারিপাট্যহীন অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ। মাথার চুলগুলা এলোমেলো, রুক্ষ। চোখ দুইটা কোটরে ঢুকিয়াছে, চোখের কোলে কালি। মুখে নৈরাশ্যময় সুগভীর ঔদাস্য। শোক যেন মূর্তিমতী হইয়া সামনে দাঁড়াইয়া আছে। এই দিগন্তগ্রাসী গাঢ় শোকান্ধকারে সান্ত্বনার ক্ষীণ দীপ জ্বালিয়া কি হইবে? চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বীণা কহিল, খুকীকে আর পাওয়া যাবে না! আমার চোখের সামনে তিনি গেছেন। তাঁকেও আর পাওয়া যাবে না জেনেও মনকে বোঝাতে পারি। ভোলবার চেষ্টা করতে পারি; হয়তো ভুলতেও পারি একদিন। মেয়েটাকে যে কিছুতেই ভুলতে পারি না দাদা! কিছুতে ভুলতে পারি না, ফুলের মত মেয়ে আমার হিংস্র জানোয়ারদের হাতে গিয়ে পড়েছে। দিনরাত কত অত্যাচার, কত যন্ত্রণা সহ্য করছে! আমি মা হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে কি ক'রে বেঁচে থাকি? সবাই বলে, ভুলে যা, মনে কর্ ম'রে গেছে ব'লে। তা কি সম্ভব? যদি সত্যি ম'রে গেছে খবর পাই, তা হ'লেও নিশ্চিন্ত হতে পারি। কিন্তু তাও তো পাচ্ছি না। চুপ করিয়া রহিলাম। বীণা বলিতে লাগিল, তোমাদের স্বাধীনতা এসেছে, দেশের রাজশক্তি তোমাদের নেতাদের হাতে এসেছে; তোমাদের নেতারা হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছেন; যারা পশুর দলকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে লেলিয়ে দিয়ে হিন্দুর সর্বনাশ করেছে, তারাও নাকি রাতারাতি সাধুপুরুষ হয়ে উঠে অহিংস-মন্ত্র জপ করতে শুরু করেছে; তোমাদের নেতারা তাদের সব দোষ ক্ষমা ক'রে কোল দিয়েছেন; তাদের সঙ্গে মিলে ভাঙা-চোরা তালি দিয়ে জোড়া দেবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু যে হতভাগিনীরা পশুদের গহ্বরের

মধ্যে প্রতিদিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে, তাদের কথা তো কেউ ঘুণাক্ষরে বলছেন না—কি তোমাদের নেতারা, কি দেশের আর কেউ! একবার মুসলমানদের বলছেন না, তাদের ফিরিয়ে দাও! তাদের ফিরিয়ে না দিলে তোমাদের সঙ্গে মিত্রতা আমাদের হবে না!

কহিলাম, নেতারা তো অন্যায় করেন নি বীণা। দেশে তো শান্তি স্থাপন করতে হবে! না হ'লে স্বাধীনতা পাওয়া তো কোন দিন সার্থক হবে না। বীণা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, কে বলছে দাদা, শান্তি চাই না? কে বলছে, তোমাদের স্বাধীনতা ব্যর্থ হোক? তবু, সেই সব হতভাগিনীদের ফিরিয়ে আনতে হবে না? আমার মত যারা স্বামী-সন্তান—সর্বস্ব হারিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুকের আগুন এমনই জ্বলতে থাকবে?

কহিলাম, রথ যখন চলে, তার চাকার তলায় পথের ধুলো গুঁড়ো হবেই। ধুলোকে বাঁচিয়ে চলা তো সারথির চলে না, বীণা। আমাদের জাতীয় জীবনের রথ চলেছে স্বাধীনতার পথে, দেশের মানুষকে অনেক রকমের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। সব দেশেই হয়েছে। এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে হবে যে, আমাদের বুকের উপর দিয়েই চ'লে গিয়ে রথ স্বাধীনতায় পৌঁছেছে।

পথের ধুলোর তাতে সান্ত্বনা কোথায় দাদা? স্বাধীনতায় পৌঁছে কে আর পথের কথা ভাবে, বল? পথের ধুলোর কথা ছেড়ে দাও।—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বীণা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, আজ সারা দেশে কত আনন্দ! বাড়িতে বাড়িতে উৎসব! আমাকে তো ছোটবেলা থেকে জানেন। স্বাধীনতার স্বপ্নও দেখতাম একদিন; ছেলেদের মত কষ্ট সহ্য করবার সুযোগ পাচ্ছি না ব'লে নিজেকে ধিক্কার দিতাম। আজ স্বাধীনতা পাওয়ার দিনে সকলের সঙ্গে উৎসবে যোগ দিতে পারছি না, সবাই বিরক্ত হচ্ছে।—এ কি সাধ ক'রে? পারছি না কিছুতে যোগ দিতে। এগুতে গেলেই মনে হচ্ছে, সারা দেশের লোক তাদের কথা ভুলেছে ব'লে আমরাও তাদের ভুলব? যে আনন্দের বন্যায় তাদের স্মৃতি নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে নিয়ে যাচ্ছে, আমরাও কি ক'রে তাতে সাঁতার দিই? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আজ যেখানে তারা আছে, সেখানেও সবাই হয়তো আনন্দে মেতে উঠেছে। কালীপুজোর রাত্রে বলির পশুদের মত উন্মত্ত জনতা থেকে দূরে দাঁড়িয়ে তারা ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপছে। বলির পশুরাও ওদের চেয়ে ভাল। তাদের মৃত্যু আসবে এক মুহূর্তে। আর

ওদের মৃত্যু চলবে দিনের পর দিন, তিল তিল ক'রে। এই দীর্ঘায়িত মৃত্যু, মর্মন্তুদ যন্ত্রণার কথা আজ আনন্দের দিনে একটি বারও কি কেউ ভাবছে, দাদা? বড় বড় আদর্শের, বড় বড় ভাবের, বড় বড় কথার দেওয়াল গেঁথে তাদের কান্নার শব্দকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন তোমাদের নেতারা। কিন্তু মা-বাবা ভাই-বোনদের কাছ থেকে তা কি আড়াল ক'রে রাখা যায়? সে কান্না যে তাদের প্রাণের মধ্যে এসে তীরের মত বিঁধছে সারাক্ষণ।

বাড়ি ফিরিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। একটা চিঠি আসিয়াছে দেখিলাম। বন্ধুর চিঠি। পূর্ববঙ্গের এক গ্রামে বাড়ি। ডাক্তারি পাস করিয়া আজ বিশ বৎসর ধরিয়া গ্রামে প্র্যাক্‌টিস করিতেছে। মুসলমানপ্রধান গ্রাম। চারপাশের গ্রামগুলিতেও মুসলমানরাই সংখ্যায় গরিষ্ঠ। বন্ধুর বাবা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তেজারতি কারবার ছিল তাঁর। বন্ধু ও ডাক্তার হিসাবে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। গত বৎসর নোয়াখালীতে মুসলমানরা যখন হিন্দুমেধ যজ্ঞ শুরু করিয়াছিল, ঐ গ্রামের মুসলমানরাও—নোয়াখালীর মত অতটা ফলাও করিয়া না হউক—ছোটখাটো রকমের শুরু করে। ফলে, গ্রামের কয়েকটি বর্ধিষ্ণু পরিবার হৃত-সর্বস্ব হইয়া পথের ভিখারী হয়, কয়েকটি হিন্দু রমণী তাহাদের স্বামী-পুত্রের চক্ষের সামনে ধর্ষিতা ও ধর্মান্তরিতা হয়, এবং সেই হতভাগিনীদের চক্ষের সামনে তাহাদের স্বামী-পুত্রেরা নৃশংসভাবে নিহত হয়। সেই সময়ে মুসলমানদের দলপতির দয়ায় বন্ধু নিষ্কৃতি লাভ করে। এখন বিরোধের অগ্নিশিখা নিবিয়াছে বটে, আগুন নিবে নাই, আপাত-নিবৃত্তির ভস্মাচ্ছাদনের তলে তেমনই গনগন করিতেছে। ফলে যাহারা গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারা আর ফিরিতে সাহস করে নাই। যাহারা কোনমতে গ্রামে টিকিয়া ছিল, অবিরত অপমান অবিচার ও অত্যাচারের অঙ্কুশাঘাতে তাহাদের জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

অতি দীর্ঘ চিঠি। নানা নির্যাতন-কাহিনীতে ভরা। প্রতিদিনের জীবন-যাত্রা দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। বহু পুরুষের পিতৃভূমি শত্রুভূমিতে পরিণত। যাহারা একদা আপন ছিল, তাহারা পর হইতেও পর। শ্রদ্ধা প্রীতি স্নেহ ও সহানুভূতির সুদৃঢ় বন্ধন ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। হিন্দু পুরুষ ও

মেয়েদের অবস্থা যুদ্ধে বন্দী ও বন্দিনীর চেয়েও শোচনীয়। মাথা উঁচু করিয়া সহজ মানুষের মত চলা-ফিরা করিবার উপায় নাই। পদে পদে লাঞ্ছনা ও অপমান। সামাজিক জীবনের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত তাহারা। নারীত্বের চরম লাঞ্ছনার সম্ভাবনা সর্বদাই শাণিত খড়্গের মত উদ্যত হইয়া আছে মেয়েদের চক্ষের সম্মুখে। নিজেদের পুরুষদের উপর নির্ভরতা হারাইয়াছে মেয়েরা। এক দিকে মৃত্যুর অতলস্পর্শ গহ্বর, আর এক দিকে জীবনব্যাপী যন্ত্রণার অগ্নিকুণ্ড; মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহারা নিদারুণ ভয়ে পলে পলে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। হিন্দু গ্রামবাসীরা, যাহাদের সামর্থ্য আছে, ভিটে-মাটির মায়া কাটাইয়া পশ্চিম-বঙ্গে চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। যাহাদের সামর্থ্য নাই, মুখ বুজিয়া সমস্ত অপমান সহ্য করিতেছে। মুসলমানরা মাঠের ধান কাটিয়া লইয়া যাইতেছে, গোয়ালের গরু খুলিয়া লইয়া যাইতেছে, ঘরের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে, এমন কি কন্যা-বধূদের বাড়ি হইতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। নিষ্ফল ক্রোধে, নিরুপায় ক্ষোভে চাহিয়া দেখিতেছে তাহারা। মনে সাহস নাই, দেহে শক্তি নাই, হাতে হাতিয়ার নাই, নিজেদের মধ্যে একতা নাই, সর্বোপরি আত্মসম্মান ও আত্মীয়াদের সম্ভ্রমরক্ষার জন্য প্রাণ দিবার মত নির্বিচার নির্ভয়তা নাই। কোনমতে টিকিয়া থাকা, বাঁচিয়া থাকাই ইহাদের উদ্দেশ্য। যদি ধর্ম পরিবর্তন করিলে নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারা যায়, ইহারা হয়তো একদিন তাহাই করিতে দ্বিধা করিবে না। ফলে পূর্ববঙ্গে হিন্দু বলিয়া আর কেহ থাকিবে না।

শেষে লিখিয়াছে, ভাই, তোমাদের বড় আনন্দের দিন। তোমাদের দিগন্তে স্বাধীনতার স্বর্ণাভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমরা কি পাইলাম? স্বাধীনতার সংগ্রামে আমরা কি কোনদিন কাহারও পশ্চাতে ছিলাম? কাহারও চেয়ে কম দুঃখ, কম ক্লেশ ভোগ করিয়াছি আমরা? দেশ-মাতৃকার মুক্তিকল্পে আমাদের ছেলে-মেয়েরা দুঃসাহসিক কর্ম-প্রচেষ্টায়, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগে, নির্বিচার জীবনদানে, কোনদিন কি দ্বিধা করিয়াছে? দেশের মুক্তি-যজ্ঞে স্বামী-পুত্র-কন্যাকে বলি দিয়া যে মেয়েরা মর্মান্তিক বেদনাকে আজীবন নিঃশব্দে সহ্য করিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা কি পূর্ববঙ্গে কম? বঙ্গ-ভঙ্গ-বিপ্লব, অসহযোগ-আন্দোলন, লবণ-সত্যাগ্রহ, আগস্ট-বিপ্লব ইত্যাদি বিভিন্ন বিক্ষোভ ও আন্দোলনের মধ্যে দুলিতে দুলিতে আমরাও তোমাদের মতই আসমুদ্র-

হিমাচল সমগ্র ভারতের মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। বিদেশী শাসকেরা আমাদের মুক্তি-প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিবার জন্য বিরোধ ও বিদ্বেষের বিষে আমাদের দেশবাসীর এক বিরাট অংশের মনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিলেও আমরাও আশা করিয়াছিলাম, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি দেশপূজ্য নেতাদের চরিত্র, আচরণ, স্বার্থত্যাগ, আত্মবলি, ও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর প্রতি প্রেম, বিষঘ্ন ওষধির মত বিষ-ক্রিয়া নিঃশেষে নাশ করিবে ; চল্লিশ কোটি ভারতবাসী একজাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া, এক-প্রাণতায় অনুপ্রাণিত হইয়া, একযোগে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিবে, ভারতকে আবার পূর্ব-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবে। আমাদের নেতৃবৃন্দের অশেষ চেষ্টা, ঐকান্তিক আগ্রহ সত্ত্বেও ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হইল। তবু তোমাদের সৌভাগ্য যে, তোমরা ভারতের মূল দেহে আশ্রয় পাইলে ; আমরা বিচ্ছিন্ন অংশে বিরোধীদের মধ্যে পড়িয়া রহিলাম। যে বিচ্ছেদের সম্ভাবনাকে প্রাণপণে বাধা দিয়া আসিয়াছি এতদিন, সেই বিচ্ছেদকে স্বীকার করিতে হইবে আমাদের। না স্বীকার করিলে সর্বপ্রকার অত্যাচার ও লাঞ্ছনার সম্ভাবনা উদ্যত হইয়া থাকিবে। কাজেই স্বাধীনতা-দিবসে তোমরা যখন স্বাধীন ভারতের পতাকাকে অভিবাদন করিবে, সেই সময়ে আমরা ইহাদের কড়া পাহারায় পাকিস্তানের পতাকাকে অভিবাদন করিব।

তাহাতেও নিষ্কৃতি পাইব বলিয়া মনে হয় না। এ দেশে যদি ধন প্রাণ ও মান বজায় রাখিয়া বাস করিতে হয়, তো নিজেদের ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি হয়তো ধর্ম পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হইবে।

ভাই, তোমাদের আনন্দের দিনে আমাদের কথা ভুলিয়া থাকিও না। মনে রাখিও, প্রায় দুই কোটি হিন্দু মর্ম-যাতনায় আর্তনাদ করিতেছে। তোমাদের দিগন্তব্যাপী আনন্দধ্বনির মধ্যে একবার কান পাতিয়া তাহাদের আর্তনাদ শুনিবার চেষ্টা করিও।

সর্বশেষে লিখিয়াছে—ভাই, এমন করিয়া এখানে বাস করা সম্ভব হইবে না। গ্রাম ছাড়িতেই হইবে। পূর্বপুরুষের ভিটা জন্মের মত ছাড়িয়া যাওয়ার কষ্ট ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ বুঝিবে না। পূর্বপুরুষদের ধর্ম কর্ম, সামাজিক শুভ অনুষ্ঠান, জন্ম ও মৃত্যুর স্মৃতি ইহার প্রত্যেকটি ইট কাঠ মৃত্তিকাকণার সহিত

জড়াইয়া আছে। বাসগৃহের পাশেই দেবমন্দিরে বাস্তুদেবতা কত পুরুষ ধরিয়া পূজা পাইতেছেন। বাগানের এক প্রান্তে সারি সারি পিতা-পিতামহের স্মৃতি-মন্দিরে কতদিন ধরিয়া সংসারের সকলে মিলিয়া নিত্য-নিয়মিতভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া আসিয়াছি। এখান হইতে চলিয়া গেলে দেবতার পূজা বন্ধ হইবে, স্মৃতি-মন্দিরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিবে না। বিধর্মীরা দেবতাকে কলুষিত করিবে, মন্দির ও মঠ ভাঙিয়া মাঠ করিয়া দিবে। মা এখন হইতে কান্নাকাটি শুরু করিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। এখন তোমাকে অনুরোধ, তোমাদের ওখানে যেমন করিয়া হোক আমাদের জন্য একটু মাথা গুঁজিয়া থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দাও। বহুদিনের বন্ধুত্বের দাবিতে এই অনুরোধ করিতেছি। আশা করি, নিরাশ করিবে না।

দুপুরে হরিসাধনবাবুর ছেলে-মেয়ে দুইটি খাইতে আসিয়াছিল। মেয়েটি কহিল, কাকাবাবু, মা জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে কি? কহিলাম, দেখা হয়েছে; একটা ডাকে বেরিয়ে গেলেন; সন্ধ্যের সময়ে ফিরবেন। আমি ধ'রে নিয়ে আসব এখন। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা এখন আছেন কেমন? মেয়েটি মুখ চুন করিয়া কহিল, তেমনই। খাবার সময়ে বড় ছেলেকে দেখিলাম না। গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিতেই কহিলেন, পাড়ার ছেলেদের ফিস্টি হচ্ছে; নেমন্তন্ন করেছে ওকে। কহিলাম, সে আবার কি? বাড়িতে এত খাবার আয়োজন করেছ; বাড়িতে না খেয়ে সেখানে গেল কেন? দলে প'ড়ে যা-তা খেয়ে অসুখ ধরিয়ে বসবে। গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া কহিলেন, বললাম তো তাই। শুনলে কই! বললাম এত ক'রে, কত বেলা হবে, দু মুঠো খেয়ে পিত্তি রক্ষা ক'রে যা; তা কে কার কথা শোনে! মুচকি হাসিয়া কহিলেন, কেমন লোকের ছেলে! গম্ভীর মুখে কহিলাম, লোকটার আবার কি দোষ হ'ল?

না দোষ আর কি! কোথাও নেমন্তন্নর কথা শুনলে বেসামাল হয়ে ছুটতে থাকে এই যা। কথাটা চাপা দিয়া কহিলাম, এর জন্যে আবার চাঁদা লাগবে তো?

তার কথা তো কিছু বলে নি। তা ছাড়া চাঁদা তো আদায় করেছে; আবার কিসের?

আহারের পরে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। গৃহিণীর ডাকে ঘুম ভাঙিল। চোখ মেলিতেই গৃহিণী কহিলেন, একবার ওঠ দেখি। মুচী-বউ কি বলছে।

কে মুচী-বউ?

গৃহিণী ধমকের সুরে কহিলেন, জান না নাকি? আমাদের ঘুঁটে দেয় যে, ঐ যে খোঁড়া মুচীর বউ।

মনে মনে বিরক্ত হইলাম। কে কোথাকার মুচীর বউয়ের জন্য কাঁচা ঘুমটা ভাঙিয়া দিল। বিরক্তি চাপিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কহিলাম, কি ব্যাপার?

গৃহিণী ফোঁস করিয়া উঠিয়া কহিলেন, জানি নে কি ব্যাপার। জিজ্ঞেস করগে ওকে। বিরক্তির সহিত কহিলেন, বারণ করলাম বার বার, যাস নে; মিথ্যে যত ছোট ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া—

চোখের ঘুম ছাড়িয়া গেল। বাহিরে আসিলাম। মুচী-বউ উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল। আমাকে দেখিয়া ঘোমটা টানিল।

আমার বাড়ির পিছনে, কতকটা গেলেই ধানের ক্ষেত—রেল-লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহারই একাংশে কতকটা উঁচু জমির উপর কয়েক ঘর মুচী বাস করে। সকলেই জাত ব্যবসা করে; আজকালকার দিনে রোজগার করে মন্দ নয়। শুধু মহেন্দ্র মুচীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। লোকটা বেতো রোগী। বৎসরে ছয় মাস শয্যাশায়ী থাকে। বাকি ছয় মাস উঠিয়া দাঁড়ায়; লাঠির উপর ভর দিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া হাঁটে। কাজকর্ম কিছুই করিতে পারে না। সংসার চালায় মুচীর বউ। বেঁটে কালো মেয়েটি। অত্যন্ত পরিশ্রমী। সারাদিন রাস্তায় মাঠে গোবর কুড়াইয়া আনে; ঘুঁটে তৈয়ারি করিয়া বিক্রয় করে। আজকাল বিড়ি বাঁধিতে শিখিয়াছে। তাহাতেও কিছু রোজগার হয়। তাহা ছাড়া চামড়া কষ করার কাজ জানে। তাহা করিয়াও কিছু আয় হয়। কয়েকটি পাঁঠা-পাঁঠী আছে। পাঁঠাগুলি বড় করিয়া বিক্রয় করে; পাঁঠীর দুধ বিক্রয় করে। মোট কথা, পাঁচ রকম করিয়া কোন মতে নিজের ও স্বামীর গ্রাসাচ্ছাদন চালায়।

কহিলাম, কি হয়েছে তোমার? মুচী-বউ ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদুকণ্ঠে কহিল, পাড়ার বাবু-ছেলেরা আমার একটি কচি পাঁঠা খেয়ে দিয়েছেন এজ্ঞে।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে কি! দাম দেয় নি তোমাকে?

ঘাড় নাড়িয়া মুচী-বউ 'না' জানাইল। কহিলাম, তোমাকে বলে নি?

মুচী-বউ কহিল, বললে দিতাম নাই, এজ্ঞে। কচি পাঁঠা আবার কেউ দেয়!

কহিলাম, ছেলেদের কাছে গিয়েছিলে?

উয়াকে পাঠিয়েছিলাম। গেল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অনেক কষ্টে। তো বাবু-ছেলেরা অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রশ্ন করিলাম, ওরা যে খেয়েছে তার প্রমাণ কি?

আর কে খাবেক এজ্ঞে? ওনাদেরই আজ ভোজ হইছে—

তোমরা পাঁঠার খোঁজ করেছ? কারও মাঠে হয়তো পড়েছে, খোঁয়াড়ে দিয়ে এসেছে।

বাবুদের ঘর গেছলম। ওনাদেরই জমি সব। ওনারা বললেক, পাঁঠা-টাঠা চাড়ে দেয় নাই ওনারা।

বাবু, অর্থাৎ অভয়বাবু। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। এ পাড়ার প্রাচীন বাসিন্দা। শহরের এই অংশটা যখন শহরের সঙ্গে যুক্ত হয় নাই, তখন এদিকটার জমিদার ছিলেন ওঁরা। এ পাড়ার অধিকাংশ বাড়ি ওঁদের জমিতেই নির্মিত।

তলাস করেছি এজ্ঞে, সারা পাড়ায়, উদিকে লাইন তক। কোথাও পাই নাই। ওনারাই কেটে খেয়েছেন, বাবু। এর একটা বিহিত করেন আপুনি।

কহিলাম, আমি কি করব? তোমাদের বাবুর কাছে যাও।

ওনার কাছে যেয়ে কি হবেক, বাবু, ওনার ছোট খোঁকাই তো পাণ্ডা। আপুনি একবার ডেকে ব'লে দ্যান। আমার অনেক ক্ষেতি হইছে। বড় হ'লে অনেক টাকা দাম হ'ত। তা বাবু-ছেলেরা যখন খেয়েইছেন তো কি বলব! আমার ন্যাযি দাম দিয়ে দ্যান ওনারা।

ছেলেদের কাছে গিয়ে বল না বুঝিয়ে।

আমার কথা কি কানে লিবেন ওনারা? উয়াকেই তো হাঁকিয়ে দিয়েছে। আবার গেলে হয়তো মারধোর করবেক। যা খোকাবাবুর মেজাজ!

আমার কথাই কি তোমাদের খোকাবাবু শুনবে? তার চেয়ে তুমি অভয়বাবুর কাছে যাও। উনিই ব্যবস্থা করবেন। মুচী-বউ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, উনি কিছুই করবেক নাই, বাবু। উল্টে গাল-মন্দ করবেক। এমনই তো ক বছর খাজনা বাকি আছে ব'লে কেবলই শাসাচ্ছে, উঠিয়ে দিব। খোকাবাবু

পাঁঠা কেটে খেয়েছেন শুনলে বলবেক—বেশ করেছে খেয়েছে; টাকার সুদ উসুল হয়ে গেল। মিনতি করিয়া কহিল, আপুনিই একবার ওনাদের কাউকে ডাকিয়ে ব'লে দ্যান। খোকাবাবুকে নাই বা হ'ল, আর কাউকে। কহিলাম, আচ্ছা যাও, আমি ডাকাচ্ছি এখনই। মুচী-বউ চলিয়া গেল।

বড় ছেলেকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তোদের আজ কি কি খাওয়া হ'ল রে?

সে কহিল, লুচি, পাঁঠার মাংস, আলুর দম—

মাংস পাওয়া গেল কোথায়? আজ তো বাজারে মাংসের দোকান বন্ধ।

তা তো জানি নে। খেলাম তো মাংস।

প্রশ্ন করিলাম, তোদের পাণ্ডা কে? ঘনশ্যাম?

সে ঘাড় নাড়িয়া 'হ্যাঁ' জানাইল।

ঘনশ্যাম অভয়বাবুর ছোট ছেলে। লম্বা, চওড়া, বলিষ্ঠ চেহারা। উদ্ধত প্রকৃতি। লেখাপড়া বিশেষ করে নাই। ছোটবেলায় স্কুলে যাওয়া-আসা করিয়াছিল কিছুদিন। যে কয়েকদিন স্কুলে ছিল, স্কুলের মাস্টাররা তাহার উপদ্রবে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন সে পাড়ায় রেশনের দোকান চালায়। পাড়ার কাহাকেও বিশেষ খাতির করে বলিয়া মনে হয় না। গত বৎসর কংগ্রেসের খাতায় নাম লিখাইয়া রীতিমত কংগ্রেসী হইয়া উঠিয়াছে।

খোকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অপরেশও তো তোদের দলের একজন কর্তা, নয়? তাকেই একবার ডেকে নিয়ে আয়।

অপরেশ আসিয়া হাজির হইল। কলেজের ছাত্র। পরনে পাৎলুন ও হাফহাতা শার্ট। ব্যাপারটা শুনিতেই যেন আকাশ হইতে পড়িল। কহিল, আমরা তো এসব ব্যাপার কিছু জানি নে, স্যর্। ঘনশ্যামের হাতেই সব টাকা, ওই সব ব্যবস্থা করছে। কেথেকে পাঁঠা নিয়ে এল ওবেলা। জিজ্ঞাসা করতে বললে, ওদের নিজেদের পাঁঠা। কহিলাম, তা তো নয়। নেহাৎ গরিব লোকের জিনিস। ওদের দাম দিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রে দাও।

অপরেশ কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তবে ঘনশ্যাম কি মিথ্যে কথা বলেছে?

সত্যি-মিথ্যে তো আমিও জানি না। তবে মেয়েটি আমার কাছে এসে ব'লে গেল ঐ কথা। সে-ও তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে বলতে সাহস করবে ব'লে মনে হয় না।

অপরেশ কহিল, ঘনশ্যামও ওরকম ছেলে নয়, সাবু। ওকে তো অনেক দিন থেকে জানি। অত্যন্ত চিন্তিতভাবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি যাচ্ছি এখনই ; ঘনশ্যামের কাছে সব জেনে আপনাকে খবর দেব।

অপরেশ আর আসিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মুচী-বউ আসিল। চোখে মুখে কান্নার চিহ্ন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, আপুনি কি খোকাবাবুকে ডাকিয়েছিলেন ?

কহিলাম, তোমাদের খোকাবাবুকে তো নয়, আর একটি ছেলেকে।

মুচী-বউ বহিল, খোকাবাবু এসে লাফাতে লাগল। উয়াঁকে মারলেক। আমাকে গালাগালি করলেক। আকালের বছর পাঁচটি টাকা দিয়েছিলেন। দিতে লেরেছি। বললেক, টাকা না দিলে পাঁঠাগুলোকে সব কেড়ে নিয়ে যাব, চাল কেটে বাস তুলে দিব। হাতে পায়ে ধ'রে ওনাকে ঠাণ্ডা করতে হ'ল। ওনাকে আর কিছু বলবেন নাই দয়া ক'রে।

বিরক্ত হইয়া কহিলাম, তুমি বলেছিলে ব'লেই তো বলতে গেলাম, না হ'লে আমার কি ?

এজ্ঞে তা তো বটেই। তবে জমিদারের ছেলে তো। কচি একটা পাঁঠা খেয়েছেন তো কি করা যাবেক বলুন ? ওনাদের খেয়েই তো বেঁচে আছি আমরা।

বেশ, আমি আর কিছু বলব না।

আপনাকে কষ্ট দিলম মিছামিছি। ক্ষেতি আমার হইছে বইকি ; কি করব বলুন ; চুপ ক'রে সওয়া ছাড়া গতি কি আমাদের ?

গৃহিণী আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন ; কহিলেন, ক্ষতি কি ক'রে হ'ল ? পাঁচটি টাকা তো নিয়েছিলে ; তা শোধ দিতে হবে তো ?

তা নিয়েছিলম বইকি, গিন্নীমা। মিছে কথা বলব কেনে ? তবে উ ভাল থাকলে ওনাদের বাড়ির সব্বাইকার পুরোনো জুতো সেরে-সুরে দেয়। একটি পয়সাও কখনও দেয় না ওনারা। ওনাদের বাড়ির কামিন না থাকলে কামিনের কাজও ক'রে দিয়েছি কতবার। একটা কড়িও কখনও নিই নাই। একটু থামিয়া কহিল, কি করব গিন্নীমা ; একলা মেয়েমানুষ, কি ক'রে যে পেট চালাই তা ভগবান জানেন। উ যদি ভাল থাকত, তা হ'লে কি আর ভাবতাম মা ?

মুচী-বউ চলিয়া গেল। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

গৃহিণী কহিলেন, স্বাধীনতা-দিবসের স্ফূর্তিটা ভালই হ'ল ছেলেদের। গরিবের সম্বল জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে নিজেদের পেট-পুজো হ'ল। স্বাধীন ভারতেও ঐ চলবে নাকি?

ক'হিলাম, যা এতদিন ধ'রে চ'লে এসেছে, তা কি একদিনে বন্ধ হবে? যতদিন না দেশের সব মানুষ সব দিক দিয়ে সমান হয়ে উঠবে, ততদিন মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার বন্ধ হবে না।

তা কি আর হবে কোন দিন?

হবে আশা ক'রেই তো সবাই আনন্দ করছে আজ। আমাদের মহাত্মা তো সেই কথাই বলেছেন বার বার। তাঁর মত দীন-দরিদ্র-দুর্বলের শুভানুধ্যায়ী আর কে আছে বল?

সত্যি। বেঁচে থাকুন তিনি। তিনি বেঁচে থাকলে লোকের আশা হয়তো একদিন মিটবে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, কতকগুলো লোক রাজার হালে আছে, আর বাকি লোকগুলোর হাড়ির হাল হচ্ছে, আর সহ্য করা যায় না, বাপু। হাসিয়া কহিলাম, সবাই সমান হ'লেই কি সহ্য করতে পারবে? মুচী-বউ তোমার হেঁসেল-ঘরে এসে দাঁড়াবে, এক পংক্তিতে ব'সে নেমন্তন্ন খাবে; ভজুয়া মেথর এসে তোমার ছেলের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করবে—

মুখ চুন হইয়া গেল গৃহিণীর। দম লইয়া কহিলেন, তা সহ্য করতে হবে বইকি। যখন যা রীত হবে, মানতে হবে—শুধু তো আমাকেই নয়, সব্বাইকে।

হরিসাধনবাবুর মেয়েটি আসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা কেমন? মেয়েটি ম্লান মুখে কহিল, বাবা ভারি ছটফট করছেন।

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মা কি করছেন?

মেয়েটি কহিল, মা বাবার বুকে মালিশ করছেন।

গৃহিণী রান্নাঘরের দিকে গেলেন। মেয়েটি তাহার পাছু পাছু গেল। আর একটু পরে মেয়েটি চলিয়া গেল। হাতে একটি বাটিতে কি লইয়া গেল। গৃহিণীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি নিয়ে গেল বাটিতে?

গৃহিণী কহিলেন, দুধ। ওর মা চেয়ে পাঠিয়েছে ওর বাবার জন্যে।

বিকাল পাঁচটায় বাহির হইলাম। শহরে বিরাট জনসভার ব্যবস্থা হইয়াছে। স্থানীয় কংগ্রেস-নেতারা বক্তৃতা করিবেন। সভা সারিয়া ডাক্তার-বাবুর বাড়ি যাইতে হইবে।

সভাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। লোকে লোকারণ্য। বিস্তৃত মাঠের এক পাশে সভামঞ্চের উপরে কংগ্রেস-নেতারা ও বিশিষ্ট কর্মীরা এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপবিষ্ট। বক্তৃতা শুরু হইয়া গিয়াছে।

বক্তৃতা করিতেছেন নকুড়বাবু। বহুদিনের পুরাতন কংগ্রেসকর্মী, জেলার অন্যতম কংগ্রেস-নেতা। লম্বা কাহিল দেহ, পরিধানে মহাত্মা গান্ধীর মত কটিবাস, গায়ে খদ্দরের ফতুয়া। খঞ্জন পাখির মত নাচিয়া নাচিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। স্বাধীনতা-লাভের জন্য কংগ্রেস-কর্মীরা তিনি নিজেও কি কি কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, তাহারই দীর্ঘ ফিরিস্তি দিতেছেন। অবশেষে কহিলেন, ইংরেজরা সহজে স্বাধীনতা দিয়া সরিয়া পড়ে নাই। সাম্রাজ্য রক্ষা করা আর সম্ভব নহে বলিয়াই সরিয়া পড়িয়াছে। এখন এই স্বাধীনতা রক্ষা করাই সমস্যা। ঘরে বাহিরে শত্রু। ঘর ও বাহির—দুই সামলাইতে হইবে। সমগ্র দেশবাসী কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হইয়া সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে শত্রুরা কিছুই করিতে পারিবে না। স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব রকম সুখ ও সুবিধার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলে চলিবে না। অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইবে এখনও। স্থির ও ধীর ভাবে মহাত্মা গান্ধী-প্রদর্শিত পথে চলিলে সব বিপদ কাটিয়া যাইবে একদিন।

প্রচণ্ড করতালির মধ্যে বক্তৃতা শেষ হইল। আর একজন দাঁড়াইলেন। বেঁটে মোটা, মেটে গায়ের রঙ, বয়স পঞ্চাশের উপর, মাথায় কাঁচা-পাকা ছোট ছোট চুল; মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। পরনে খদ্দরের খাটো কাপড়, খদ্দরের ফতুয়া, কাঁধে খদ্দরের চাদর। জলদগম্ভীর স্বরে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, স্বাধীনতা আমরা এখনও পাই নাই। স্বাধীনতার পথে পা দিয়াছি মাত্র। সত্যকার স্বাধীনতা পাইতে অনেক দেরি। সারা দেশের লোকের হৃদয় ও মনের পরিবর্তন দরকার, সমগ্র দেশবাসীর কর্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। দেশের জন্য বাঁচিবার ও মরিবার মত শক্তি আহরণ করা দরকার। চাই শৃঙ্খলা, সংযম, ধৈর্য ও নেতাদের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস, তাঁহাদের নির্দিষ্ট পথে চলিবার মত চাই নিয়মানুবর্তিতা। না হইলে সব পণ্ড

হইবে। দেশে নানা দলের সৃষ্টি হইয়াছে। দেশের জনশক্তিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া জাতিকে শক্তিহীন করিয়া তুলিতেছে। কোন দলে যোগ না দিয়া একমাত্র কংগ্রেসের পশ্চাতে দাঁড়াইতে হইবে সকলকে। আজ পঞ্চাশ-ষাট বৎসর অবিরত সংগ্রাম করিয়া কংগ্রেস দেশের শাসন-দণ্ড আয়ত্ত করিয়াছে। স্বাধীনতার সূচনা হইতে না হইতেই ক্ষমতালোভী লোকেরা শাসন-শক্তি হাত করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু এ কথা সকলের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, কংগ্রেস কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান নহে। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর মঙ্গল-সাধনই তাহার উদ্দেশ্য। ভারতের প্রাণ-শক্তিই তাহার শক্তির উৎস। দেশের সমগ্র জনগণের মধ্যে শান্তি ও সম্পদ আনিতে একমাত্র কংগ্রেসই সক্ষম।

আরও কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিয়া তিনি থামিলেন। যথারীতি করতালি-ধ্বনি হইল।

তারপর দাঁড়াইলেন আর একজন। ইনি বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্মী; পূর্বে বিপ্লবপন্থী ছিলেন, পরে কংগ্রেসে যোগদান করেন। লম্বা একহারা গঠন; ফরসা রঙ; পরনে দুধের মত সাদা খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি, চোখে সোনার চশমা। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কহিলেন, দীর্ঘ সংগ্রামের পর ভারতমাতা মুক্তি পেয়েছেন। দুর্গম গিরিশিখরে দুর্ভেদ্য কারাগারে ছিলেন বন্দী। দিনের পর দিন তাঁর উপরে চলেছে অকথ্য অত্যাচার, অপরিসীম লাঞ্ছনা ও অসহনীয় উৎপীড়ন। তাঁর আর্তনাদে সারা পৃথিবীর আকাশ আন্দোলিত হয়েছে। মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তানরা দিনের পর দিন করজোড়ে প্রভুদের কাছে মায়ের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন। সে প্রার্থনায় ক্ষমতা-মত্ত দাম্ভিক প্রভুরা কান দেয় নি।

শেষে একদল দুরন্ত ছেলে দুর্গম গিরিভূমি পার হয়ে সশস্ত্র প্রহরীদের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে কারাগারের লৌহদ্বারে করলে আঘাত। লৌহদ্বার ঝনঝন ক'রে উঠল। বিপুল বিস্ময়ে প্রভুরা সচকিত হয়ে উঠল। নেংটি ইঁদুরদের এত স্পর্ধা! প্রতিহিংসায় হয়ে উঠল নিষ্ঠুর। মারলে তাদের পশুর মত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে; বন্ধ ক'রে রাখলে অন্ধকার কারাগারে; পাঠাল দূর দুর্গম নির্বাসনে। যন্ত্রণার নানা যন্ত্র উদ্ভাবন ক'রে তাদের প্রাণশক্তিকে পিষে গুঁড়ো ক'রে দিলে। কিন্তু নিরস্ত হ'ল না মায়ের ছেলেরা। প্রাণের মায়া তুচ্ছ ক'রে দলে দলে তারা এগিয়ে গেল, করলে আঘাতের পর আঘাত কারাগৃহের দ্বারে,

কারাগৃহের ভিত্তিমূলে। মরলও তারা দলে দলে; তাদের দেহের কঙ্কাল জ'মে জ'মে পাহাড় হয়ে উঠল; তাদের বুকের রক্তে গিরির কঠিন বুক নরম হয়ে উঠল। শক্তিমানের বিপুল শক্তির কাছে ব্যর্থ হ'ল তারা। কিন্তু তাদের পায়ে পায়ে দুস্তর গিরিবক্ষের উপরে পরিস্ফুট হয়ে উঠল একটি পরিচ্ছন্ন পথ।

তারপর সেই পথে হ'ল এক অভিনব অভিযান। অভিযানের নেতা গান্ধীজী—ভারতমাতার সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। কৃশ খর্ব দেহ, কিন্তু লোহার চেয়ে কঠিন মন। অহিংসামন্ত্রে সিদ্ধ হয়ে এলেন সাগর-পার থেকে। তিনি ভারতমাতার কোটি কোটি সন্তানদের ডেকে বললেন, এস তোমরা আমার পিছনে সকলে। সমবেত কণ্ঠে মায়ের মুক্তি চাইব আমরা। অস্ত্র চাই না, আমাদের চাই মনের শক্তি, মরবার সাহস। ওরা মারবে আমাদের, মার মাথা পেতে নেব আমরা; মারের বদলে মারব না কাউকে। যদি মরতে হয়, হাসিমুখে মরব। কিন্তু মরতে মরতেও চাইব মায়ের মুক্তি—

চল্লিশ কোটি সন্তান জয়গান ক'রে উঠল তাদের নেতার; পুজো করলে তাঁকে ঘরে ঘরে, তাঁর নাম করতে করতে ভাবে গদগদ হয়ে যেতে লাগল, তাঁকে ডাকতে লাগল মহাত্মা ব'লে। কিন্তু এগিয়ে গেল না বেশি লোক। যাঁরা গেলেন তাঁরা সব দিক দিয়ে মায়ের সেরা সন্তান, আগুনে পোড়-খাওয়া সোনার চেয়েও খাঁটি। এঁদের নিয়ে গান্ধীজী দিনের পর দিন জানাতে লাগলেন দাবি—মায়ের মুক্তি চাই। মুখে প্রশান্ত হাসি, কিন্তু কণ্ঠে বজ্রের দৃঢ়তা। তাঁর ক্ষমা-সুন্দর মূর্তির সামনে আততায়ীর উদ্যত অস্ত্র স্তব্ধ হ'ল, প্রভুদের দম্ভ বিন্ধ্যগিরির মত মাথা নোয়ালে—

হঠাৎ ডান বাহুর উপর প্রবল চাপ অনুভব করিতেই পাশে চাহিয়া দেখিলাম, এক ব্যক্তি গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। লম্বা কাহিল চেহারা; ফরসা রঙ; মুখে আবক্ষলম্বিত দাড়ি; চোখে চশমা।

পরনে খাকী রঙের পাজামা ও হাফ-হাতা শার্ট। পায়ে বুটজুতা। মাথায় পাগড়ি। আপাদমস্তক তন্নতন্ন করিয়া দেখিলাম। পূর্বপরিচয়ের চিহ্ন মাত্র কোথাও দেখিতে পাইলাম না। লোকটাকে অবাঙালী বলিয়া মনে হইল। হিন্দু না মুসলমান তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। হিন্দী জানি না, তবুও কোন মতে প্রশ্ন করিলাম, ক্যা বোলতা?

লোকটি পরিষ্কার বাংলায় কহিল, আসুন আমার সঙ্গে। বিশেষ প্রয়োজন।

গলার স্বর চেনা মনে হইল; কিন্তু কাহার ঠাহর করিতে পারিলাম না। কহিলাম, কেন? কোথায়?

লোকটি কহিল, ভয় নাই। আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না।

মনে মনে কহিলাম, ক্ষতি তো করবে না বলছ, কিন্তু বিশ্বাস কি? তোমার চেহারা আর পোশাক! আজকাল ঐ পোশাকে কলিকাতায় কত লোক কত কাণ্ড করিয়া বেড়াইতেছে! আকাশের দিকে তাকাইলাম, সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়। কহিলাম, বক্তৃতা শুনব না? লোকটি কহিল, বক্তৃতা তো অনেক শুনেছেন। আরও শুনবেন। এর পর বক্তৃতার বন্যা বইবে দেশে। সামলানো দায় হবে। আসুন আমার সঙ্গে।—বলিয়া হাত ধরিয়া টান দিল। জোর করিয়া লইয়া যাইবে নাকি? ভয়ে ভয়ে কহিলাম, কোথায় যেতে হবে? যা বলবার এখানে বলুন না।

এখানে হবে না। গোপনীয় কথা।

হাজার হাজার লোকের মধ্যে বাছিয়া শুধু আমাকেই গোপন কথা শুনাইবার জন্য এই অপরিচিত লোকটার আগ্রহ কেন, বুঝিলাম না। সসঙ্কোচে কহিলাম, আপনার গোপনীয় কথা শোনবার আমার প্রয়োজন?

লোকটি কহিল, আপনার শোনবার প্রয়োজন না থাকতে পারে, আমার শোনাবার প্রয়োজন। সোৎসুক কণ্ঠে কহিলাম, আমাকে চেনেন নাকি? লোকটি 'হাঁ'-সূচক ঘাড় নাড়িল।

সঙ্গে যাইতে হইল। মনটা কিন্তু সন্দেহের দোলায় দুলিতে লাগিল। মতলব কি লোকটার? ধাপ্পা দিয়া লইয়া গিয়া, কোন গলি-ঘুঁজিতে ঢুকাইয়া পকেট মারিবে নাকি? সঙ্গে কয়েকটা টাকাও লইয়া বাহির হইয়াছি। হরিসাধনবাবুর জন্য এক শিশি হরলিক্স পাই তো কিনিয়া লইয়া যাইব। বুকে হাত দিয়া পাঁচ টাকার নোটটি যথাস্থানে নিরাপদে আছে কি না দেখিয়া লইলাম।

একটা অন্ধকার ছোট গলির মুখে আসিতেই সভয়ে কহিলাম, এদিকে কেন? বড় রাস্তা দিয়ে চলুন না। লোকটি কহিল, এ দিকেই যেতে হবে।

থমকিয়া দাঁড়াইয়া সকাতরে কহিলাম, না না, এ দিকে না। লোকটি হাসিয়া কহিল, কি মুশকিল! ওদিকে যাবার দরকার নাই, তবু যেতে হবে?

দরকার নাই কেন?

এই গলিতেই যে আমি থাকি। ভারি ভীতু হয়েছেন তো! বুড়ো হয়ে গেছেন দেখছি।

কণ্ঠস্বরে আবার পূর্ব-পরিচয়ের রেশ বাজিল। চেনা লোক নাকি? কে তাহা হইলে?

গলির মধ্যে কতকটা গিয়া একটা পুরাতন দোতলা বাড়ির সামনে আসিয়া কহিল, এই বাড়িটাতে থাকি, আসুন।

ভিতরে ঢুকিলাম। ছোট উঠান; তাহারই এক পাশে কুয়া। কুয়ার একটু দূরে রান্নাঘর। উনানে আঁচ দেওয়া হইয়াছে। সারা বাড়িটা ধোঁয়ায় ভরিয়া গিয়াছে। রান্নাঘরের বারান্দায় চাকর মসলা পিষিতেছে। মেসের ঠাকুর এক পাশে একটা টুলে বসিয়া হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে ঝিয়ের সহিত রসালাপ করিতেছে।

অত্যন্ত পুরাতন বাড়ি। দেওয়ালের চুন বালি খসা। সামনে বারান্দায় একটা তক্তাপোশ; তাহার উপরে একটা কম্বল পাতা। দেওয়াল ঘেঁষিয়া একটা তেলচিটা ময়লা বালিশ। দেওয়ালের উপরে কয়লা দিয়া আঁকাবাঁকা বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—আপিস। অর্থাৎ এইখানে বসিয়া হোটেলওয়ালা ব্যবসা পরিচালনা করে। ঐ তেলচিটা বালিশটায় ঠেস দিয়া বসিয়া খাদ্যের নামে অখাদ্য খাওয়াইয়া হোটেলের বাবুদের স্বল্প মাহিনার সবটাই কেমন করিয়া আত্মসাৎ করিবে, সেই সম্বন্ধে ফন্দি আঁটে। স্বাধীনতা-দিবসের সভায় সেও যোগ দিয়াছে সম্ভবত।

লোকটির পাছু পাছু দোতলায় উঠিলাম। সিঁড়ির মাথার কাছেই একটা ঘরের সামনে আসিয়া কহিল, এইটাই আমার আস্তানা। দরজা তালা-দেওয়া ছিল। খুলিয়া কহিল, আসুন, বসুন।

নেহাৎ ছোট কুঠরি। এক পাশে একটা ভাঙা চৌকি। তাহাতে লোকটির স্বল্প শয্যা বিছানো। মেঝেতে একটা মাঝারি-গোছের সুটকেস; এক কোণে একটা দড়িতে গেরুয়া রঙের একটি লুঙ্গীও একটি গামছা ঝুলিতেছে।

লোকটি কহিল, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। বিছানার উপরে বসিয়া পড়িলাম। নড়বড়ে চৌকিটা আর্তনাদ করিয়া উঠিল।

লোকটি মাথার পাগড়ি ও চোখের চশমা খুলিয়া ফেলিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া কহিল, চিনতে পারছেন এবার?

মাথায় বড় বড় চুল ; সামনের চুলগুলা একটু পাতলা ; চওড়া কপাল ; ডান চোখের ভ্রূর এক পাশে একটা কাটা দাগ ; উজ্জ্বল আয়ত চোখ . যেন প্রাণের দীপ্তি ঐ দুইটি চোখের মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে। খাড়া নাক। কানের পাতা দুইটির একটি বিশেষ ধরনের গঠন।

চিনিলাম, সুনির্মল। ১৯৪২ সালের আগস্ট-আন্দোলনের একজন ছাত্র-নেতা। কলিকাতায় এম. এ. পড়িত তখন। প্রতিভাবান ছাত্র ছিল। এম. এ. পাস করিলে যে কোন প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় পাস করিয়া সরকারী চাকুরি লাভ করিতে পারিত। আমাদের জেলায় এক গ্রামে বাড়ি। তাহার বাবা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। অতি কষ্টে ছেলেটির পড়ার খরচ চালাইতেন ও ছেলের মুখের দিকে তাকাইয়া ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন দেখিতেন।

এক রাত্রির কথা মনে পড়িল। ভাদ্র মাস সম্ভবত। অন্ধকার রাত্রি। দুর্যোগ নামিয়াছে। রাত্রি দুপুরে দরজায় ধাক্কা পড়িল। প্রথমটা ভয়ে দরজা খুলি নাই। তারপর নাম ধরিয়া ডাকিতেই দরজা খুলিয়া দেখি, এক ভদ্রলোক ; মুখে দাড়ি ; মাথায় পাগড়ি, চোখে চশমা। চিনিতে না পারিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলাম। ভদ্রলোক ভিতরে ঢুকিয়া, দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, দাড়ি পাগড়ি ও চশমা একে একে খুলিয়া ফেলিল। তখন চিনিলাম, আমাদের সুনির্মল। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার? হাসিয়া কহিল, ফেরার ; পুলিস পাছু নিয়েছে। বাড়ি যাচ্ছি। বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে আজই স'রে পড়তে হবে। ক্ষিদে পেয়েছে ভারি। খাবার আছে নাকি বাড়িতে?

ছিল না। স্ত্রী উঠিয়া তাড়াতাড়ি তৈয়ারি করিয়া দিলেন। যাইবার সময়ে কহিল, অনির্দেশ্য ভবিষ্যৎ। পায়ে-পায়ে শত্রু। আর ফিরতে পারব কি না কে জানে!—বলিয়া আমাকে ও আমার স্ত্রীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

কহিলাম, দাড়ি-গোঁফগুলোও খুলে ফেল। দাড়িটা হাত দিয়া টানিয়া সুনির্মল কহিল, এখন আর নকল নয়, আসল। গজাতে অনেক সময় লেগেছে।—বলিয়া হাসিল।

প্রশ্ন করিলাম, কখন এলে?

জবাব দিল, কাল রাত্রে। স্বাধীনতা এসেছে। আর লুকিয়ে থাকব কেন? বাবা কেমন আছেন? আর আর খবর কি?

সুনির্মলের বাবা আসেন মাঝে মাঝে শহরে। আমার বাড়িতেই উঠেন। কহিলাম, ভাল নাই বিশেষ। বুড়ো হয়ে গেছেন একেবারে। মাথার চুল সব পেকে গেছে। কুঁজো হয়ে গেছেন। দেখলে হয়তো চিনতেই পারবে না তাঁকে। বউমা তোমার বাবার কাছেই আছেন। নিজের মেয়ের মত সেবা-যত্ন করেন ওঁর। তোমার বাবা খুব প্রশংসা করছিলেন। গত বৎসর আমার বাড়িতে এসেছিলেন বউমা আই. এ. পরীক্ষা দেবার জন্যে। ভাল ক'রেই পরীক্ষা পাস করেছেন। সুনির্মল মৃদু হাসিয়া কহিল, তাই নাকি?

কহিলাম, বাড়ি যাচ্ছ কবে?

কালই যাব।

দাড়িগুলো কামিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে নাও। পোশাকটা বদলাও।

সুনির্মল মৃদু হাসিল। পাশে বসিয়া কহিল, এবার কি করা যাবে বলুন দেখি?

কহিলাম, পরীক্ষা দিয়ে দাও। পাস করবে নিশ্চয়। তারপর চাকরি-বাকরি করবে। দেশের নেতারা এখন দেশের শাসক। তোমাদের সম্বন্ধে সুবিবেচনা করবেন নিশ্চয়।

সুনির্মল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, দেশের কাজ করেছি ব'লে পুরস্কার?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কংগ্রেসের ছোট বড় নেতারা, ছোট বড় কর্মীরা, এমন কি কংগ্রেসের সঙ্গে যাদের নামমাত্র যোগ ছিল কোনও দিন তারাও, সবাই নূতন শাসন-ব্যবস্থায় কে কি সুবিধা আদায় করবে তারই হিসাবে ব্যস্ত। কিন্তু সমগ্র জনসাধারণের কেমন ক'রে দুঃখ-মোচন হবে, দু-চার জন ছাড়া এ কথা কেউ ভাবছে না। এ ক বছর ভারতের নানা প্রদেশে ঘুরে, নানা লোকের সঙ্গে মিশে, এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, দেশের অধিকাংশ লোকই স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণচিত্ত ও ঈর্ষাপরায়ণ। শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়, প্রদেশগতভাবেও স্বাধীনতা-লাভের পর এই মনোবৃত্তি যদি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তো মুশকিলের কথা। চিলের মুখ থেকে আমরা স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছি বটে, কিন্তু সে তো আর পালায় নি। কাছেই ডালে ব'সে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নাল ফেলছে। তা ছাড়া আরও অনেক চিল আশে পাশে উড়ছে—

কহিলাম, যার চেষ্টায় আমাদের মুক্তি-লাভ হয়েছে, তিনিই আমাদের

পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। যত বিপদই আসুক, যত বাধাই পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাক্, তাঁর নেতৃত্বে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁর প্রিয় মন্ত্রশিষ্য-গোষ্ঠী দেশকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। তারপর নূতন রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবেশে জন্মাবে নূতন মানুষ; পুরাতনের পচা সারে জন্মাবে নূতন প্রাণশক্তি; তখনই শুরু হবে ভারতের জয়যাত্রা।

নানা বিষয়ে গল্প হইতে লাগিল। ঘরের ভিতর অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিল। সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ। সকলে সভায় গিয়াছে। মাঝে মাঝে ঝিটার খনখনে গলার আওয়াজ শোনা যাইতেছে। চাকরটার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছে সম্ভবত।

এক সময়ে কহিলাম, আমার ওখানে যাচ্ছ কবে?

সুনির্মল কহিল, কাল যাব, বউদিদিকে বলবেন।

কিছুক্ষণ পরে চলিয়া আসিলাম। দোকানে দোকানে আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। রাস্তায় ভিড়। সভাভঙ্গের পর লোকে বাড়ি ফিরিতেছে। বাড়িতে বাড়িতে আলোকসজ্জা। রেডিওতে স্বদেশী গান বাজিতেছে।

সুনির্মলের স্ত্রীর কথা মনে পড়িল। লম্বা ছিপছিপে মেয়েটি। শ্যামবর্ণা। ভারি শান্ত-শিষ্ট। বুদ্ধিমতী। স্বামীকে বেশিদিনের জন্য পায় নাই। তবু স্বামীর গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করে। স্বামীর কথা বলিতে বলিতে তাহার চোখ-মুখ দীপ্ত হইয়া উঠে। স্বামী তাহার একদিন ফিরিয়া আসিবেন। আশাভঙ্গের শত আঘাতেও এ বিশ্বাস সে কোনদিন হারায় নাই। এই বিশ্বাসটিকে বুকের মধ্যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সে স্বামীর সহিত দীর্ঘ-বিচ্ছেদ-ভার নীরবে বহন করিয়াছে। আজ তাহার মুখে হাসি ফুটিবে।

বাংলা দেশে যাহারা আজ সুনির্মলের মত ফিরিয়া আসিল, তাহাদের বাড়িতে আজ আনন্দের আলো ফুটিবে। যাহারা ফিরিল না, ফিরিবে না, তাহাদের বাড়ির অন্ধকার আজ হইতে নিবিড়তর হইয়া উঠিবে।

এক শিশি হরলিক্স কিনিবার জন্য একটা ঔষধের দোকানে উঠিয়া চাহিতেই দোকানের মালিক ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, নাই। তারপর একবার মুখের দিকে তাকাইয়া কম্পাউণ্ডারকে কহিল, দেখ তো হে, হরলিক্স আছে কি না। কম্পাউণ্ডার একবার ভিতরে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, নাই। মালিক মোলায়েম হাসিয়া কহিল, বলেছিলাম তো, ও-জিনিস থাকতে পায় না, আসবা-মাত্র বিক্রি হয়ে যায়।

সব দোকানের মালিকেরই ঐ এক ভাব। কোন জিনিস চাহিলেই থাকে না, থাকিলেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; দোকানের কর্মচারীরা খুঁজিয়া খুঁজিয়া হয়রান হইয়া যায়, তবুও না। মহা মুশকিলে পড়িয়াছে বেচারারা! আর একটি মজা যে, এ বিষয়ে মালিকদের মধ্যে কোন তারতম্য নাই। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী, হালি-পুরাতন—সব এক ধরনের।

ডাক্তারবাবুর বাড়ির দিকে চলিলাম। রাস্তার দুই পাশে বাড়িগুলি দীপ-মালায় সজ্জিত। কাহারও বাড়িতে রেডিও, কাহারও বাড়িতে গ্রামোফোন বাজিতেছে। কোন বাড়িতে গানের আসর বসিয়াছে। ডাক্তারবাবুর বাড়িতেও অপরূপ আলোক-সজ্জা। ডাক্তারবাবু বাড়িতে ছিলেন। ড্রয়িং-রুমে রেডিও বাজিতেছিল। খবর পাইয়া বাহিরে আসিলেন। হরিসাধনবাবুর বাড়িতে যাওয়ার কথা বলিতেই কহিলেন, আজ আর হবে না মশাই। কয়েকজন ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন করেছি, তাঁরা এসে পড়লেন ব'লে।

কহিলাম, বেশি দেরি হবে না, কাছেই। দুই হাত জোড় করিয়া কহিলেন, মাপ করবেন; আজ আর হবে না। কাল সকালে বরং একবার খবর দেবেন। আচ্ছা, আসুন আপান, নমস্কার।—বলিয়া আর কিছু বলিবার আগেই চলিয়া গিয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

হরিসাধনবাবুর বাড়তে গিয়া দেখিলাম, অবস্থা সঙ্গিন। বিছানায় শুইয়া আছেন। অত্যন্ত অবসন্ন ভাব। চোখ দুইটি মুদ্রিত। মুখ দিয়া শ্বাস টানিতেছেন। উপরের ঠোঁটটা গুটাইয়া গিয়া সামনের কয়েকটা হলুদ রঙের দাঁত দেখা যাইতেছে। গলার ঘড়ঘড় শব্দ আরও বাড়িয়া গিয়াছে। হরিসাধনবাবুর স্ত্রী বুকে মালিশ করিতেছেন। ছেলেমেয়ে দুইটি এক পাশে ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

একটু দূরে একটা টুলে মাখনবাবু বসিয়া ছিলেন। আমাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ পরে আমার হাতে টিপ্‌নি দিয়া বাহিরে গিয়া চোখের ইঙ্গিতে ডাকিলেন। বাহিরে যাইবামাত্র ফিসফিস করিয়া কহিলেন, অবস্থা ভাল দেখছি নে; রাতটা কাটলে হয়। মাখনবাবু শুধু রোগীর জীবনেরই দায়িত্ব লইয়া নিশ্চিন্ত থাকেন না, মৃত্যুর পরের দায়িত্ব সম্বন্ধেও সমধিক সচেতন। কহিলেন, যে রকম ফুর্তির ফোয়ারা ছুটছে চারদিকে, লোকজন পাওয়া গেলে হয়! কি যে করা যাবে? তবে আমার কম্পাউণ্ডার চৌকস লোক। ওকে

আজ ছাড়া হবে না। বাড়িতে চারটি খাইয়ে দেব। আপনিও খেয়ে-দেয়ে আসুন।

মাখনবাবু একেবারে শেষের ব্যবস্থা করিতেছেন দেখিয়া ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিলাম, আজ রাত্রেই কিছু হবে না কি?

মাখনবাবু চোখ দুইটি বুজিয়া ঘাড় কাত করিয়া কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হ'লে?

তা হ'লে আর কি? খেয়ে-দেয়ে চ'লে আসুন। আমরাও আসছি।—বলিয়া চলিয়া গেলেন। মাখনবাবুর চিকিৎসাবিদ্যা স্বল্প; কিন্তু দরিদ্রের প্রতি দরদ সমধিক। আজকাল চিকিৎসকদের মধ্যে ইহার অত্যন্ত অভাব।

হরিসাধনবাবুর মেয়েকে ডাকিয়া কহিলাম, তোমাদের খাওয়ার কি ব্যবস্থা? রান্না হয়েছে? মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইল। হরিসাধনবাবুর স্ত্রীকে কহিলাম, আমি ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাচ্ছি। ওরা ওখানেই খাবে। আমিও আসছি একটু পরে।

ছেলেমেয়েদের লইয়া বাড়ি গেলাম। গৃহিণী তাহাদের খাওয়াইয়া বাড়ি পাঠাইয়া দিলেন। হরিসাধনবাবুর স্ত্রীর জন্যও খাবার দিলেন মেয়েটির হাতে।

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ছাদের উপরে গেলাম।

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। আকাশ তারায় সমাকীর্ণ। উত্তর-পূর্ব কোণে মেঘ জমিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। কোথায় যেন বৃষ্টি হইয়া গেল। হু-হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। বাড়িতে বাড়িতে দীপসজ্জা। রায়বাহাদুরের দ্বিতল বাড়িটি বিদ্যুতের লাল-নীল দীপমালা পরিয়া উৎসব-সভায় সালঙ্কারা ধনী-গৃহিণীর মত অহঙ্কারে যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। বাতাসে গানের মিষ্টি সুর ভাসিয়া আসিতেছে। হরিসাধনবাবুর বাড়ির দিকটা ঘন অন্ধকার। মৃত্যু যেন কালো জটা বিস্তার করিয়া ক্ষুধার্ত আগ্রহে ঘুপটি মারিয়া বসিয়া আছে। ওখানে পাড়ার ছেলেদের হল্লা শুনা যাইতেছে না। দুপুরের ভুরিভোজনটা পরিপাক করিবার জন্য সকাল সকাল শুইয়া পড়িয়াছে বোধ হয়।

দেহ ও মনে গভীর ক্লান্তি। সারাদিন নানা ধরনের আনন্দ ও বেদনায়, নানা চিন্তা ও ভাবের দোলায় দোল খাইয়াছে মনটা। দেহটাও ছুটাছুটি করিয়াছে বিস্তর। ইহার উপর রাত্রে যদি হরিসাধনবাবু মারা যান, তাঁহার

শেষকৃত্যের ব্যবস্থা ও শোকার্ত্ত পরিবারের ব্যবস্থা—এই দুই গুরুভারের অনেকটা আমার ঘাড়ে পড়িবে। একটু বিশ্রাম করিয়া লওয়া প্রয়োজন। ছাদের উপরে একটা মাদুর পাতিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন গৃহিণী। তাহাতেই গড়াইয়া পড়িলাম। ধীরে ধীরে নিদ্রার গাঢ় কুহেলিকা সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

ঘন অন্ধকার রাত্রি। বিপুল জনপ্রবাহের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছি। অত্যন্ত ক্লান্ত। তবু থামিবার উপায় নাই। জনতার চাপ ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে। তাহারই আলোকে সঞ্চরমাণ বৃহৎ জনপ্রবাহ মাঝে মাঝে দৃশ্যমান হইয়া উঠিতেছে।

হঠাৎ জনস্রোতের গতি রুদ্ধ হইল। সম্মুখে গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এই অন্ধকারের মধ্যে দূরে একটি আলোক-শিখা দৃষ্টিগোচর হইল, মিলিত কণ্ঠের ক্ষীণ ধ্বনিও কানে আসিতে লাগিল; যেন ঐ অন্ধকার প্রান্তরের মধ্য দিয়া কাহারা আসিতেছে। জনতা নিরুদ্ধ নিশ্বাসে তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ধীরে ধীরে অন্ধকার তরল হইয়া আসিতে লাগিল। রাত্রি অবসানপ্রায়। পূর্ব দিগন্তে উষার ঈষৎ আভাস দেখা দিল। আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, মেঘ কাটিয়া গিয়াছে।

আবার সম্মুখে চাহিলাম। উষার অস্পষ্ট আলোকে দেখিতে পাইলাম, অদূরে একটি শিবিকা ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে। পাশে পাশে আসিতেছেন নগ্নকায়, কটিবাসধারী, ভারতমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান—মহাত্মা গান্ধী। আরও কাছে আসিতে বাহকদেরও অনেককে চিনিতে পারিলাম। ভারতমাতার যেসব সন্তান মায়ের মুক্তিকল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা। ধীরে ধীরে শিবিকা সম্মুখে নবনির্মিত মর্ম্মর বেদীর উপরে স্থাপিত হইল। শিবিকার ভিতর হইতে বাহির হইলেন এক অপূর্ব মহিমাময়ী নারী; গান্ধীজীর কাঁধে ভর করিয়া ক্লান্ত শ্লথ চরণে জনতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সমগ্র জনতার মধ্যে অস্ফুট ধ্বনি উঠিল, মা মা—

এমন সময়ে পূর্বাকাশে সূর্যোদয় হইল। তরুণ অরুণালোক মায়ের মুখ ও দেহের উপর পড়িল। দেখিলাম, ঋজু সুঠাম দেহ; শুষ্ক পদ্মের পাপড়ির মত ম্লান শুভ্র রূপ, যেন গলিত রৌপ্যের উপর ভস্মের সূক্ষ্ম প্রলেপ পড়িয়াছে।

মুখখানি শীর্ণ; ফ্যাকাশে; যেন রক্তশোষী জোঁকের দল দেহের সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া লইয়াছে। দীর্ঘ রুক্ষ আলুলায়িত কেশ পিঠের উপর লুটাইতেছে। পরিধানে জীর্ণ বসন; সর্বদেহ রিক্তাভরণ। আয়ত চোখ দুইটিতে অপরিমেয় স্নেহ ও অপার করুণা টলটল করিতেছে; শুষ্ক ওষ্ঠ দুইটি থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

বিশাল জনসমুদ্র উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিল, বন্দে মাতরম্। সেই ধ্বনি সমুদ্র-গর্জনের মত দিক্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইল।

হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম, মা অঙ্গহীনা। ডান হাতটি সদ্য-ছিন্ন। ছেদস্থান হইতে অবিরত রক্তক্ষরণ হইতেছে। অপরিসীম যন্ত্রণা দুই ওষ্ঠ চাপিয়া মা নিঃশব্দে সহ্য করিতেছেন।

জনতা 'বন্দে মাতরম্' গান শুরু করিল। সমবেত কণ্ঠের স্তুতিধ্বনি তরঙ্গে তরঙ্গে মায়ের পদ-প্রান্তে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। মায়ের ওষ্ঠপ্রান্তে প্রসন্ন হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

মাতৃবন্দনা বিচিত্র সুরে-লয়ে আকাশে বাতাসে তরঙ্গিত হইতে লাগিল। কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল, সুর বেসুরা হইয়া উঠিতেছে। যেন দূর দিগন্তের ওপার হইতে কাহাদের রুদ্ধ ক্রন্দনোচ্ছ্বাস ক্ষীণ তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া মাতৃবন্দনার সুরমাধুর্যকে বিস্বাদ করিয়া দিতেছে।

মায়ের মুখের দিকে তাকাইলাম। মুখের সেই প্রশান্ত প্রসন্ন হাসি অম্লান; কিন্তু দুই চোখের কোণে দুইটি মুক্তার মত দুই ফোঁটা অশ্রু।

হঠাৎ কাহার ডাকে ঘুম ভাঙিয়া গেল। গৃহিণী বলিতেছেন, ওগো, শুনছ? ওঠ দেখি। ওদের বাড়ির দিক থেকে কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হরিসাধনবাবুর হয়ে গেল বোধ হয়।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। ছাদের ওপাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। রায়বাহাদুরের বাড়িতে লাউডস্পীকারে 'বন্দে মাতরম্' গান বাজিতেছে। কান পাতিয়া শুনিতেই শুনিতে পাইলাম, নারীকণ্ঠের ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি গাঢ় অন্ধকারের বুক চিরিয়া চিরিয়া ভাসিয়া আসিতেছে।

শ্রীঅমলা দেবী

চক্রবাকী

চক্কবাকবহুএ, আমন্তেহি সহঅরম্। উবট্ঠিদা রঅণী।—(অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)

দূর বালুচরে চক্রবাকের পিপাসায়
দহে প্রাণ—
—কাঁদিছে চক্রবাকী।
যামিনী নামিছে ;
হৃদয় ডাকিছে,
এস চিরাগত সাথী,
জীবনে জড়াও জীবনে তোমার ;
এখনো অনেক বাকি।
—কাঁদিছে চক্রবাকী।
রজনী, শিথিলচরণা রজনী বিরহ-
বেদনা-নত।
দিবসের কাজ শেষে
গৃহে ফিরে সবে দিবসের মত।
উজল গৃহের বাতি
ক্লান্ত দিনের শেষে।
কোথায় আমার সাথী ?
আমারি ব্যথায় অন্ধ তামসী মেশে ;
চির বেদনার দেশে
প্রেম আসে মম বিরহের বেশে।
একাকী শয়ন মম
কাঁদে, 'কই প্রিয়তম!?'
প্রেম আসে মম ঝঞ্ঝার বেশে।
যামিনী বক্ষ চিরে
ওঠে হাহাকার-ধ্বনি,
লও তুমি লও ফিরে,
ফিরে লও অভিশাপ।
ক্রুদ্ধ তাপস, ঘৃণ্য তোমার আক্রোশ-
অভিশাপ
লও, লও তুমি ফিরে।
আমারি বিলাপধ্বনি
রজনীর তীরে তীরে কান পেতে
আমি শুনি
যুগান্ত পার হয়ে প্রাচীন কালের ক্ষণে
সেই পুরা তপোবনে,
চক্রবাকীর অসহায় বেদনায়
কেবলি মিশাতে চায়।
আমার রজনী নামে—
চাহি দক্ষিণ-বামে
তুমি নাই, তুমি নাই !
যখনি বুকেতে চাই
তখনি বিরহ আসে
চক্রবাকের চক্রবাকীর সেতুবন্ধন নাই।
সকলে গৃহেতে আসে
আমারি গৃহেতে বিদায়-বিলাপ
ধ্বনি ওঠে চিররাতি,
'বিদায় এবার, সাথী।'
অজানা তাপস, শোন—
ফিরে লও অভিশাপ।

শ্রীমতী বাণী রায়

চিরজয়।

তুমি যদি শোনাও সঙ্গীত ;
দিশেহারা হয়ে যাই—
ধূলিলীন অন্তরের গোপনীয় সুরে
আজো জাগে উর্ধ্বমুখী চাতকের
চির আশা,
জাগে ভালবাসা।

যৌবনের মদিরতা, বাসনা মলিন
নিস্তব্ধ লজ্জায় মরে।
প্রগল্‌ভ চিতে
নেমে আসে তারালোক চিরশান্তি
দিতে।
তুচ্ছ-দীন এই প্রাণ
ধরণী-ধূলায় থাকে তার তুচ্ছতর
বিলাসিতা নিয়ে।
কাটিছে প্রহর
লঘু চপলতা দিয়ে;
কেটে যায় দিন;
তুমি রাখো কি সন্ধান?
তোমার সুরের বাণী হয়তো, প্রেমিক,
রেখেছে লুকায়ে বক্ষে দেহের কামনা,
হয়তো তোমারও গান
সহস্র সমান
নিরুপায় ভিক্ষাভাণ্ডে শরীর বন্দনা।
তবু থাকি অন্ধ হয়ে—
ভাবি মনে মনে,
আমারে বেসেছে ভাল কেহ এতদিনে;
যে প্রেম আলোক স্বপ্নে,
তারই রূপ ল'য়ে
অমর-সঙ্গীতে কেহ নিতে চায় চিনে।
আমার প্রমাদ প্রিয়, ট্রাজেডি আমার,
জেনেছি অনেক কিছু।
ভীরু আঁখি নীচু
অভিসারী পদে আসে সলাজ কিশোরী
প্রিয়ের সান্নিধ্যে তার,—
নহে মোর গতি।
জেনেছি অনেক আমি;
প্লেটনিক প্রেমে কতখানি থাকে খাদ
সোনা কয় রতি!
যদি বলো, ক্ষুদ্রমনা;
কভু মানিব না।
জেনেছি সকল তথ্য নিজেরেও দিয়ে
প্রেমের মুকুর 'পরে
আপন অন্তরে
চমকি উঠেছি দেখি বাসনার ছায়া।
স্পন্দহীন বিশ্ব শোনে যে কাব্যের মা
সে কবিতা আনে নাই চিত্তদ্বারে মম
দেহাতীত রূপে বাণী আকাশের নি
কিছু আছে সত্য তার, কিছু বর্ণারো
অর্ধেক কল্পনা আর অর্ধেক বাস্তব।
যে মনের একপাশ সুধার প্লাবনে
ভুলে যায় নিখিলের শত অসঙ্গতি।
প্রতিভা-পূজারী সে যে কোন শুভক্ষ
বিলায় নিজেরে কোন চারণ-চরণে।
সে মনেরি অন্য পাশ সিনিক অধরে
সবজান্তা মৃদু হাস্যে চুপিচুপি বলে,
এখনও প্রেমের গান!
জানি পংক্তি তলে
গুমরিয়া কেঁদে যায় মৌন আবেদন।
তবু থাকি অন্ধ হয়ে; কেন প্রিয়, জা
পিপীলিকা পক্ষভরে মরে কেন জান
কেন জান সূর্যমুখী সূর্যে দেয় মন?
কেন জান চাতকের আশা যে গগন
ধূলো ওঠে সোনা হয়ে—
অতৃপ্ত এ প্রাণ
পেতে চায় মাঝে মাঝে অমৃত-সন্ধা

শ্রীমতী বাণী

সমাজ ও সংস্কৃতি

জীবন-মথিত যে অমৃত আজ ভারতবর্ষে উৎসারিত হইতে চাহে, তাহা বহুজনসুখায়, বহুজনহিতায়।

বিংশ শতাব্দীর, এই হিংসায় ও বঞ্চনায় সৃষ্ট মানুষের সুসভ্যতার পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত হইবার সন্ধিক্ষণে জীবন ও সংস্কৃতিকে সুসংবদ্ধ করিবার যে মন্ত্র একদা ভারতবর্ষ উচ্চারণ করিয়াছিল, মনপ্রাণ দিয়া একবার তাহাকে উপলব্ধি করি, তাহাকে বরণ করিয়া লই। ভাঙিতে ভাঙিতে গড়িতে গড়িতে সমাজকে সচ্ছল করিতে করিতে জীবনের যে কোন দিক দিয়া যাহা কিছু ফুটিয়া উঠিবে তাহার প্রসাদ ও সৌরভ আজ বহুজনসুখায়, বহুজনহিতায়।

কিন্তু আত্মসংস্কৃতির যে-স্তরে উন্নীত হইলে মানুষ অপর সাধারণের সুখ ও হিতকে এমন আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, আমরা সেই লাভ- ও লোভ-হীন শিক্ষার উপযুক্ত হইয়াছি কি? সর্বসাধারণের জন্য যে আকুলতা, ইহা নিজেকে বিলাইবার আকুলতা। প্রেম দ্বারা সকল মানুষকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে ও ত্যাগের দ্বারা নিজেকে সকলের মধ্যে উৎসর্গ করিতে না পারিলে এতবড় আদর্শকে কেবল মাত্র রাষ্ট্রবিধির শাসনে সফল করিয়া তোলা সম্ভব নহে। বহুজনসুখায়, বহুজনহিতায়—ইহা প্রেমের ও ত্যাগের বাণী; ইহাই ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতির বাণী।

স্বীকার করিতেই হইবে, কালক্রমে এ আদর্শ হইতে আমরা ভ্রষ্ট হইয়াছি। আজ নিজের সুখকে নিরাপদ ও বৃদ্ধি করিবার জন্য বলিতেছি, Survival of the fittest; স্বার্থসংঘাত যেখানে ব্যক্তিগত, সমাজ বা সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের সার্থকতা সেখানে নিষ্পেষিত। এই কারণে সমাজের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা আজ যতই শিথিল হইতেছে, স্বার্থোদ্ধত নানা ইজ্‌ম্‌-এর স্বর্ণশৃঙ্খল ততই ইহার চারিদিকে আঁটিয়া বসিয়া জনসাধারণকে বিচকিত করিতেছে। রাষ্ট্রপরিচালনায় ভোটের প্রয়োজনে তুচ্ছতম মানুষকে আজ গায়ে পড়িয়া ভাই-ভাই রবে বিমুগ্ধ করিতেছি; গণশক্তি করায়ত্ত করিবার এ কৌশলকে মানবতার ব্যাখ্যা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া বিনিময়ে দুই মুষ্টি অন্নের প্রতিশ্রুতি দিয়া মনে ভাবিতেছি, প্রতিদান করিলাম, নিরন্নের হাহাকার ঘুচাইয়া তাহাদের কৃতজ্ঞচিত্তের আশীর্বাদ পাইলাম। এ দাক্ষিণ্যে মানুষ পেটে-খাইয়া বাঁচিতে পারে, কিন্তু এত সামান্য লইয়া সমাজ বাঁচিবে না। অন্নদানের সহিত প্রত্যেককে সম্মানদান করিতে

হইবে। অন্নের ভাগ, সেই সঙ্গে সুখ ও দুঃখের ভাগ, আশা ও আনন্দের ভাগ যখন আমরা পরস্পর পরস্পরের হাতে তুলিয়া দিতে পারিব, তখনই সমাজ রক্ষা পাইবে। আজ শুধু লোক ডাকিয়া দল বাঁধিয়া রাজ্যরক্ষা করিতেছি, সমাজ-রক্ষা নহে।

স্বরাজ্য গড়িয়া তুলিবার বীজ নিহিত রহিয়াছে আমাদেরই সমাজের অভ্যন্তরে। কিন্তু সমাজ-জীবন আজ বিচ্ছিন্ন, কেহ কাহারও আপন নহে। মানুষের শ্রম অর্থমূল্যে ক্রয় করিয়া তাহার উপকার পরিশোধ করিতেছি। আমরা কাজ লইতেছি, মানুষটিকে লইতেছি না। কেবল স্বার্থ লইয়া যে-সংস্রব গড়িয়া উঠে, কাজ ফুরাইলে তাহা টিকিয়া থাকে না। কাজের দাম দিয়া দেনা-পাওনাই চলিতেছে, কাজের মান দিয়া সম্বন্ধ পাতাইবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না।

ধোপা-নাপিত, কামার কুমার, মজুর-চাষী প্রভৃতি সকল প্রকার শ্রমিকদের সাহায্য লইয়া তবে মানুষের সুখ-সুবিধা ও সমাজ গড়িয়া উঠে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের সামাজিক মর্যাদা সম্বন্ধে আমরা আর সতর্ক নহি, অবজ্ঞা ও অবহেলায় তাহাদের দূরে রাখিয়াছি। অথচ, এই সকল অপাঙ্‌ক্তেয়দের লইয়াই রাজনীতির একটা স্বতন্ত্র মতবাদ গড়িয়া তুলিয়া হৃদয়ের ঔদার্য দেখাইতেছি। ইহা ছলনা মাত্র। শিক্ষিত ও উন্নতদের তাড়নায় সমাজেই আজ যাহাদের আসন দিই না, তাহাদের জন্য রাজসিংহাসন ছাড়িয়া দিলেই কি তাহারা সুখে ও সম্মানে থাকিবে? ইহা সত্য, মানুষ সমান সামর্থ্য ও সমান বুদ্ধিবৃত্তি লইয়া জন্মায় না, সুতরাং সমান অধিকারের দাবি অবাস্তব। একটা উচ্চ-নীচ বৈষম্য, একটা জাতিবিভাগ থাকিয়াই যায়। যাহারা শ্রেষ্ঠ, তাহাদেরই সামর্থ্যের উপর পরিচালনা ও আধিপত্যের ক্ষমতা আসিয়া বর্তায়। এই নিয়মে মনুষ্যসমাজ আজও চলিতেছে, চিরদিনই চলিবে। সাধারণ চিরদিনই সাধারণ থাকিয়া অনন্যসাধারণের নির্দেশ পালন করিতে থাকিবে। তবে কি যাহারা নীচে রহিল আজীবন তাহারা নীচু হইয়াই কাল কাটাইবে, তবে কি এই অভিশাপ প্রতিপালন করিতেই এত মানুষ জন্মিতেছে ও মরিতেছে? তাহা নহে, মানুষের ইন্‌স্টিন্‌ক্ট (Instinct) যেমন এক দিকে আত্মরক্ষার্থে স্বার্থবোধে সজাগ, আর এক দিকে তাহার কালচার আত্মত্যাগে ও পরার্থে উদার। এক দিকে সে নিজে বাঁচিতে চাহে, আর এক

দিকে সে সকলকে লইয়া বাঁচিতে চাহে; অহর্নিশি এই দ্বন্দ্বে মানুষ কখনও পশু, কখনও দেবতা।

আজ আমাদের শিক্ষাচারের সহিত, আমাদের উন্নতির সহিত সংস্কৃতির আর যোগ নাই। নিজের সহিত সকলকে ও সকলের সহিত নিজেকে যুক্ত করিয়া দেখিবার নীতিশিক্ষা এবং সংস্কৃতি না পাইলে রাজনীতির যে-কোন ইস্মই প্রহসনে পরিণত হইবে। একদা রাজারও নীতি ছিল প্রজানুরঞ্জন। প্রজাসকল সুখে থাকিবে—এ আদর্শও যথেষ্ট মহান ছিল। কিন্তু প্রকৃত নীতিবোধের অভাবে এ রাজনীতি দেশে দেশে ভাঙিয়া পড়িতেছে, এবং আজও ডেমোক্রেসির সংখ্যাগুরুত্বের একান্নজনের চাপে উনপঞ্চাশ জনের আশা-আকাঙ্ক্ষা অবহেলিত হইতেছে।

আমরাও আজ নিজের দেশে যে রাজনীতি গড়িয়া তুলিতে চাহি, যদি তাহাকে সর্বসাধারণের সুখে ও সেবায় ধন্য করিতে হয়, পরস্পরের জন্য যাহাতে মমতা জাগিতে পারে তাহারই জন্য আগে-ভাগে সমাজনীতিকে শোধন করিয়া তাহা সর্বশ্রেণীর মানুষের আশ্রয়স্থল করিতে হইবে। এ কারণ, কাজের সংস্পর্শের সহিত মানুষে মানুষে অবসরের সম্পর্ক সৃজন করিতে হইবে। প্রাত্যহিক জীবনে নিজের নিজের প্রয়োজন সামলাইতে প্রত্যেককেই ব্যস্ত ও ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়, অপরের জন্য চিন্তা করিবার অবসর নাই। প্রতিদিনকার বৈচিত্র্যহীন প্রয়োজন হইতে অবসর লইবার জন্য মাঝে মাঝে উৎসব সৃজন করিয়া পরস্পর মিলিবার মিশিবার উপায় করিয়া লইয়াছি। উৎসবের দিনে নিত্যকর্মের বন্ধন হইতে মুক্তি লইয়া যে সম্প্রীতি গড়িয়া উঠে, তাহাতে দায় নাই, ভার নাই। স্বার্থহীন সম্বন্ধ বলিয়া উৎসবের আনন্দ-কোলাহল গৃহধর্মের অপরিহার্য ক্ষুদ্রতাকে অনায়াসে অবহেলা করিয়া মনুষ্য-জীবনে নূতন করিয়া প্রাণসঞ্চার ও গতিসঞ্চালনে সক্ষম হয়। উৎসব সমাজ-জীবনের মিলন-ক্ষেত্র। তবু, মানুষের মিল সচরাচর সমানে সমানে, সমশিক্ষা- ও সমসংস্কৃতি-সম্পন্নের মধ্যেই আবদ্ধ। এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি মানুষের পেশাকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠে। তাই, সম বা অনুরূপ পেশার মানুষেরা,—যাহারা চাষী-মজুর, যাহারা কারিগর, যাহারা ব্যবসায়ী ও যাহারা বুদ্ধিজীবী, তাহারা সকলেই যে যাহার আপন আপন জাতি বা গণ্ডি করিয়া মেলামেশা করিতেছে; সকলের সহিত সকলে মিলিতে

পারিতেছে না। আমাদের সমাজ এই বিভেদ নির্মাণ করে নাই, মনুষ্য-প্রকৃতির এই বিভিন্নতাকে পর্যালোচনা করিয়া প্রভেদকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে মাত্র। তবু এককালে যাহা সমাজের নিয়ম ছিল, আজ তাহাকেই অনিয়ম বলিয়া মনে হইতেছে; মানুষে মানুষে স্বাভাবিক বিভেদ আজ বিচ্ছেদে পরিণত।

প্রয়োজনবোধে জাতিভেদকে আমরা ঘৃণা করিতেছি এবং এ বিভাগ আজ ভাঙিয়া দিবারও সময় আসিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ-শূদ্রের জাত না হয় জোর করিয়া ঘুচাইলাম, তবু ধনী ও দরিদ্রের, শিক্ষিত ও অজ্ঞের এবং ইতর-ভদ্রের যে পার্থক্য, পরস্পরের মধ্যে সঙ্কীর্ণ বিভেদ রক্ষা করিয়া জাতি বা শ্রেণীবিভাগের নব নব সমস্যা সৃজন করিতেছে, তাহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে সমাজের কোন্ ব্যবস্থা? পুরাতন সমাজ যেমন বিভাগ মানিয়া লইয়াছিল, পরস্পরকে গ্রহণ করিবার শিক্ষা ও ঔদার্যও তাহার আয়ত্তে ছিল। সকলকে স্বীকার করিবার ও সহ্য করিবার যে শিক্ষা, তাহা সমাজ-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষা।

শিক্ষায় ও উপার্জনে যাহারা উন্নত নহে, সঙ্কোচে ও ত্রাসে যাহারা শ্রেষ্ঠদের সহিত যাচিয়া মিলিতে পারে না, সামাজিক ক্রিয়াকলাপে সমাজ তাহাদের ডাকিয়া মিলাইবার বিধান দিয়াছে। বিভিন্ন উৎসবে আনুষ্ঠানিক আচার-বিচারের মধ্যে পুরাতন সমাজের এই প্রথা ও আদর্শের ধ্বংসাবশেষ আজও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বিবাহের আনন্দোৎসবে ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণ ও সেই সঙ্গে ক্ষৌরকারের অমার্জিত গ্রাম্য-ছড়া একত্রে সম্পৃক্ত রহিয়াছে। অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ হইতে কাহাকেও বিচ্ছিন্ন করিবার বিধি নাই। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিবে, বর-বধূর চারিচক্ষুর মিলন ঘটাইবে, কিন্তু সেই শুভক্ষণে নাপিত আসিয়া বসন-আচ্ছাদনে দৃষ্টি-বিনিময়টিকে গোপন করিয়া না দিলে অনুষ্ঠানটি মধুর ও সম্পূর্ণ হইবে না। আজিকার বিচারবিবেচনায় এই প্রথা অর্থহীন ও সংস্কার মাত্র। বিবাহের সত্যগ্রন্থিবন্ধনে দান ও গ্রহণের মন্ত্র বা শপথ,—ইহাই যথেষ্ট; আত্মীয় কুটুম্বের আসরে ক্ষৌরকারের উপস্থিতি নিষ্প্রয়োজন ও অযৌক্তিক। কিন্তু সমাজ যখন চলমান ছিল, সকল মানুষকে সে একসঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইয়াছে, কাহাকেও উপেক্ষা ও বর্জন করিয়া চলে নাই। তাই সামাজিক অনুষ্ঠানে নাপিতের হাতে বসনের প্রান্তটুকুমাত্র ধরাইয়া তাহাকে ব্রাহ্মণের পার্শ্বে দাঁড়া করাইয়াছে। সমাজের সর্বোচ্চের সহিত সর্বনিম্নকে এইরূপে প্রয়োজনে

নিষ্প্রয়োজনে একত্রে গাঁথিয়া একখানি মালা বিরচন করিয়াছিল। বিবাহের উৎসবে ক্ষৌরকারের উপস্থিতি অহেতুক হইলেও এত প্রয়োজনীয়। এই যে প্রত্যেককে লইয়া প্রত্যেকের জন্য সমাজ, ইহাই ছিল আমাদের ভারতবর্ষ। মানুষের যোগাযোগকে কেবলমাত্র কাজ ও দেনা-পাওনার দায়ে ক্ষুণ্ণ না হইতে দিয়া আমাদের সমাজব্যবস্থা বিবিধ প্রকার উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রবর্তন দ্বারা বিবিধ পেশার মানুষকে মর্যাদার দিক দিয়া বাধ্যবাধকতার সূত্রে আহ্বান করিয়া একটা সামাজিক সম্পর্ক নিবিড় করিতে চাহিয়াছে।

আজ আমরা এই আদর্শের দিক দিয়া নিজেদের সমাজকে চিনিয়া লইতে ও সেইমত তাহার সংস্কার করিতে চাহিতেছি না। শ্রেণীভেদ প্রকট হওয়ায় পরস্পর পরস্পরকে দূরে রাখিতেছি, সমাজের বন্ধন ইহাতে দৃঢ় হইতে পারিতেছে না। তাই, শিক্ষায় ও মানবতায় যাহারা উন্নতমনা, তাহাদের চেষ্টা আজ এই জাতিভেদ তুলিয়া দিয়া সকলকে সমশ্রেণীভুক্ত করিয়া মানুষের মন হইতে ঘৃণা ও হিংসা দূর করা। করিতেই হইবে, কিন্তু পথ ইহা নহে। জাতিভেদ তুলিতে হইলে জাতিবৈষম্যকে মানিয়া লইতে হইবে সর্বাগ্রে। সংস্কৃতি, পেশা ও উপার্জনের বৈষম্যেই জাতিভেদের সূত্রপাত। সচেষ্ট সমাজ সকলকে সমান হইবার সুযোগ দিতে পারে, কিন্তু সমান সামর্থ্য দিতে পারে না। সামর্থ্য মানুষের ব্যক্তিগত; ইহা তাহার শরীর ও বুদ্ধির শক্তি অনুযায়ী তুলনায় কম-বেশি হইয়া থাকে। এই কম-বেশির তারতম্য মানুষকে কখনই সমান হইতে দিবে না। সুতরাং এক নিয়মে ও এক শাসনে সকল মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হইবে। মানুষে মানুষে ষোল-আনা মিল সম্ভব নহে, এবং জোর করিয়া এ মিল কাম্যও নহে। প্রত্যেকটি মানুষকে তাহার নিজের সীমায় ও স্বাধীনতায় বিচরণ করিতে দিতে হইবে। সকল শ্রেণীকে তাহার নিজের দিক দিয়া উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হইবার পথ মুক্ত রাখিতে হইবে। প্রত্যেকের আশা-আদর্শ যদি তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী ফুটিতে পারে তাহা হইলে কেহ কাহাকেও ঈর্ষা করিবে না; শ্রেণীভেদ আজিকার ন্যায় রূঢ় আকারে মানুষের সম্পর্ককে কুটিল করিবে না। সমাজে যেমন জাতি রহিয়াছে, জাতি ভুলিয়া সকলের সহিত উৎসবে এক হইবার ব্যবস্থাও রহিয়াছে সত্য, তবু আমরা অপরের ছায়া মাড়াইলে অশুচি মনে করিতেছি কেন? দেশের অভাব-অনটনে সামাজিক সংস্কৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ছিল

সংস্কৃতির ধারক। আজ সংস্কৃতি নাই, সুতরাং ব্রাহ্মণকেও সম্মানিত করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। এক কালে সমাজে যাহারা আপনা হইতে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পাইয়াছে, আজ তাহারই নেশায় তাহারা সম্মান আদায় করিয়া লইতে চাহে। সম্মানের দৈন্যে সম্মানের জন্য এই উঞ্ছবৃত্তি। তাই ছলে-বলে ধর্মের আশ্রয়ে সকলকে নীচ ও অনধিকারী বুঝাইয়া জীবনধারাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া নিজেদের উচ্চ-সম্মান বজায় রাখিতেছে। এ সম্মান রাজ্যহীন রাজার সম্মানের ন্যায় হাস্যাস্পদ। সমাজ প্রাণ ফিরিয়া পাইলে, তাহার রসে সংস্কৃতির শাখা-পল্লব যখন নূতন করিয়া মঞ্জরিত হইবে, সেদিন শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ সে-যুগের ব্রাহ্মণেরা পুনরায় সমাজের সকলের নিকট হইতে ন্যায্য সম্মান ফিরিয়া পাইবে। আজ প্রতিষ্ঠার মায়ায় লুব্ধ হইয়া যাহারা অন্ত্যজদের ছায়া বাঁচাইয়া চলিতেছে, সেদিন তাহারাই নিজেদের আলোকে যাহারা হীন তাহাদের ছায়া মুছিয়া লইবে। সংস্কৃতিগত অবনতি জাতিভেদকে তীক্ষ্ণ ও মারাত্মক করিয়াছে। সংস্কৃতি মানুষকে নিজের এবং অপরের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আপনার অভ্যন্তর হইতে সচেতন ও সশ্রদ্ধ হইবার শিক্ষা দেয়। সে শিক্ষায় কেবল জাতিবিচার নহে, বহুবিধ গ্লানি নির্বিচারে উপেক্ষিত হইবে। এ কারণ, সমাজকে বাঁচাইতে হইলে প্রত্যেকের চিত্ত ও চিন্তার উৎকর্ষ সাধন করিবার নিমিত্ত সমাজব্যবস্থাকে সংস্কৃতিগত করিতে হইবে। আজ তর্ক-বিতর্ক ও আদেশ-উপদেশ দ্বারা যে সকল জটিলতার সমাধান হইতেছে না, তাহা আপনা-আপনি সরল হইয়া যাইবে।

সংস্কৃতির অভাবে সর্বদিক হইতে কুসংস্কারের জালে আচ্ছন্ন হইয়া আমাদের সভ্যতা আর্তনাদ করিতেছে। শিক্ষাহীনতার জন্য জীবন সম্বন্ধে সম্যক বোধ অস্পষ্ট হওয়ায় সংস্কারের অন্ধ প্রশ্রয়ে আমাদের দীনতা ও হীনতা সমাজকে পঙ্গু করিতেছে। সমাজে শিক্ষাদান করিতে পারিলে এ অন্ধকার ঘুচিয়া যাইবে,—এই সিদ্ধান্তে তৎপর হইয়া আমরা আজ বিদ্যা প্রচারের জন্য সর্বাগ্রে উৎকণ্ঠিত। কিন্তু জীবনের একটি কোন বিশেষ কোণ হইতে ইহার সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব নহে। জীবন-ধারণের সকল দিক ও সকল বিষয় হইতে একযোগে সমাজের উপর আলোকসম্পাত করিতে হইবে। দরিদ্র ও অশিক্ষিতের গৃহে সন্তানের দেহে ক্ষত হইলে জননী তেল-পড়া লেপন করিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। ব্যাধি ক্রমশ দুরারোগ্য হইয়া উঠিলে অনন্যোপায় মাতা পুত্রের পায়ে

কড়ি বাঁধিয়া দেবতার শরণ লইয়া নিরুপায়-বিশ্বাসে দিন গুনিতে থাকে। যদি আরোগ্য হয় তাহা দেবতার দয়া, নতুবা জননীর দুর্ভাগ্য। ইহাকেই আমরা সংস্কার বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেছি, এবং অচিরাৎ এ অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য শিক্ষা দিতেছি, বলিতেছি,—দেবতার দয়া মিথ্যা, ধর্মবিশ্বাস ভ্রান্ত। আমাদেরই শিক্ষাদান, আমাদেরই উপদেশ মিথ্যা ও ভ্রান্ত হইবে, যদি না এ ক্ষেত্রে ইহার সহিত আমরা চিকিৎসার বিধান করিতে পারি। রাষ্ট্রের ব্যয়ে গ্রামে যদি সাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং সুযোগ করিতে পারিতাম, জননীকে বিধাতার দয়ায় বিশ্বাস করিতে হইত না, চিকিৎসকের ঔষধে নির্ভর করিয়া নিজের বিচারেই সংস্কারের হাত হইতে রক্ষা পাইত; সন্তানকেও বাঁচাইত, সমাজকেও বাঁচাইত।

দেখা যাইতেছে, সমাজের প্রতিটি মীমাংসা আর একটি সমস্যার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। তাই সকল কাজের কর্মীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও উৎসাহ না পাইলে সংস্কৃতি সমগ্রতা লাভ করিতে পারে না। চারিদিকে যে বারিবর্ষণ হয়, ঢাল বুঝিয়া চারিদিক হইতে তাহা এক স্থানে আসিয়া সঞ্চিত হয়। জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, শিল্পী-শিক্ষক, উকিল-ডাক্তার, শ্রমিক-চাষী প্রভৃতি সকলের সহযোগিতায় যে সমৃদ্ধি পুঞ্জীভূত হইয়া মানুষের সুখৈশ্বর্য বর্ধিত করে, সংস্কৃতি তাহারই আশ্রয়ে ফুটিয়া উঠিয়া সকল প্রকার শ্রমকে শ্রীমণ্ডিত করে।

সংস্কৃতি মানুষের সত্যবোধ, সৌন্দর্যবোধ, ও মঙ্গল করিবার ঐকান্তিকতা হইতে উদ্ভূত হইয়া জীবনকে প্রসারিত করিতেছে। যাহারা শিক্ষিত, বিচার-বিবেচনায় যাহারা পরিপুষ্ট, তাহাদের যে সংস্কৃতি তাহা শিক্ষা-সংস্কৃতি; এবং সর্বসাধারণ লোকাচারের মধ্য দিয়া যাহা নির্বিচারে পালন করিতেছে, তাহা ধর্ম-সংস্কৃতি। শিক্ষাচার শিক্ষিতের ধর্ম, লোকাচার সর্বসাধারণের ধর্ম। ধর্মই মানুষের ও মনুষ্যত্বের আশ্রয়।

ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিরোধ বৃদ্ধির আশঙ্কায় আজ রাজনীতি ধর্ম সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত ও ভীত, এবং মূক না হইলেও মৌন রহিয়া এত বৃহৎ একটি সমস্যা এড়াইয়া চলিতেছে। বিরোধ এড়াইবার এই নিষ্ক্রিয় চেষ্টা মানুষের বিভিন্ন ধর্ম-বোধকে উৎসাহের অভাবে পরিস্ফুট না হইতে দিয়া ধর্ম-জীবনকে পশ্চাতে রাখিতেছে এবং জনসংস্কৃতির মূল উৎস রুদ্ধ হওয়ায় তাহার স্বতঃস্ফূর্ত ধারা ব্যাহত হইতেছে। ধর্ম বিষয়ে রাষ্ট্র যে আগ্রহশীল হইতে শঙ্কিত, তাহা অহেতুক নহে।

ইতিহাসে পৃথিবীব্যাপী যত রাজনীতির উত্থান ও পতন ঘটিয়াছে, তাহাদের প্রতিটির আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে তৎতৎকালে এক-একটি মাত্র ধর্মমত পরিপুষ্ট হইতে পারিত, এবং অন্য ধর্ম ও অপরের বিশ্বাস রূঢ় অত্যাচারে নিরুদ্ধ রহিত। কিন্তু আজিকার রাজনীতি সর্বসাধারণের আধিপত্যে পরিচালিত, কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহে ; বরং ধর্ম হইতে ইহা সতর্কতার সহিত সযত্নে বিশ্লিষ্ট। ধর্ম সম্বন্ধে ইহা উদারতা নহে, ইহা উদাসীনতা। বিরোধ মিটাইতে হইলে প্রতিটি ধর্মমত যাহাতে আপনা-আপনি মার্জিত আকারে ফুটিয়া উঠিতে পারে, তাহার জন্য রাষ্ট্রগত ভাবে প্রতিটি ধর্মের প্রতি সমান সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন। প্রতি ধর্মেরই আদর্শ—উৎকর্ষ। আপন আপন পরিপূর্ণতায় ধর্ম পরিণত হইলে, আপন বিশ্বাস ও মতবাদে মানুষ পরিতৃপ্ত রহিলে, অপরের ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করিবে না। আপন-আপন ধর্মের প্রেরণায় নিজের নিজের আদর্শমত আত্মসংস্কৃতির স্পষ্ট পথ খুঁজিয়া পাইবে। ধর্ম বিষয়ে রাষ্ট্র যতই নিরপেক্ষ থাকিতে চাহিবে, ধর্মচর্চা ও ধর্মজ্ঞানের অভাবে মূঢ়-অন্ধতা এবং সঙ্কীর্ণতা ধর্মবিরোধকে ততই গোপনে লালন করিতে থাকিবে। রাষ্ট্র সকল ধর্মকে সুস্থভাবে গড়িয়া তুলিবার উৎসাহ ও অবকাশ দান করিলে ধর্মই মানুষকে শাসন ও শোধন করিয়া রাজনীতির আভ্যন্তরীণ জটিলতা লাঘব করিবে। জনসাধারণ রাজনীতি বুঝে না, আপন আপন ধর্মকেই সশ্রদ্ধায় প্রতিপালন করে। ধর্মকে পৃথক রাখিয়া যে রাজনীতি তাহা শিক্ষিত সমাজে গ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু সর্বসাধারণের রাষ্ট্রে সর্বসাধারণের বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায় তুল্য-মর্যাদা না পাইলে রাজনীতি রাজ্যের কাহাকেও আকৃষ্ট করিবে না। এ মর্যাদা ধর্মের ভিত্তিতে শাসনভার বণ্টন করিয়া সম্ভব নহে ; সম্ভব হইবে—শিল্প ও বিজ্ঞানের আলোকে শিক্ষা এবং লোকশিক্ষা দ্বারা সকলের স্ব-স্ব ধর্ম-বৈশিষ্ট্যকে নির্মল ও উজ্জ্বলতর করিতে সহায়তা করিয়া, সকলের বিশ্বাস ও আদর্শকে পরিপূরণ করিয়া।

বিজ্ঞান-আলোকে উদ্ভাসিত এই মধ্যাহ্ন-বেলায় ধর্ম তাহার কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রত্যূষের মহিমা লইয়া আর কি মানুষের কাজে লাগিবে? ধর্মের অপব্যবহার এ যুগে, বিজ্ঞানেরও অতিপ্রয়োগ ও অপপ্রয়োগের ন্যায় নিরন্তর মানুষের চিত্তকে সন্দেহে ব্যাকুল করিতেছে।

মানুষের ধর্ম মানুষের অনন্ত-জিজ্ঞাসা। কোন উদাহরণ বা কোন নির্দিষ্ট

সংজ্ঞা দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা উচিত নহে, সম্ভবও নহে। বিচিত্র জীবনে বিচিত্র ইহার অনুভব, বিচিত্র ইহার ব্যাখ্যা ও ব্যঞ্জনা। সত্য বলিয়া যাহা বুঝিয়া পাই, শিক্ষিতের জ্ঞান সেইখানে নির্দিষ্ট ও নিঃসংশয়। যুক্তিতর্কের বাহিরে যে অপরিজ্ঞাত অন্ধকার রহিয়া যায় তাহার ছায়া তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। জ্ঞান মানুষের ধর্ম।

কিন্তু শুধু জ্ঞান নহে, অজ্ঞানতাও মানুষের ধর্ম। যেখানে অন্ধকার, বিচার-বিবেচনায় মানুষ যাহার নাগাল পাইতেছে না, সেই সংশয়াকুল রহস্য লইয়া জীবনের আরও একটা দিক মানুষ আলোড়িত করিতেছে। জন্ম-মৃত্যু-জন্মান্তর, পরলোক-পরকাল প্রভৃতির যথাযথ উত্তর যতদিন না মানুষ খুঁজিয়া পাইবে, ততদিন আপন আপন বিশ্বাসমত আচার পালন করিতে থাকিবে এবং ততদিন একের বিশ্বাসকে অপরে কুসংস্কার বলিয়া নিন্দাও করিতে থাকিবে। ইহ-জীবন এবং ইহ-জগৎকেই যদি মানুষ আদি-অন্ত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিত, বায়োলজি যদি মানুষের জন্ম-মৃত্যুর শেষ মীমাংসা হইত, মানুষের ধর্ম এবং ধর্মাচার এত জটিল হইত না। এই জটিলতা মানুষ ইচ্ছা করিয়া সৃজন করে নাই, তাই চেষ্টা করিলেই সরল সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে না। মানুষ অর্ধেক তাহার মস্তিষ্ক, অর্ধেক তাহার হৃদয়; অর্ধেক তাহার Reason, অর্ধেক তাহার Emotion। যুক্তি ও উপযুক্ত নজির লইয়াই মানুষ ক্ষান্ত রহিতে পারে না, তাহার চেতনায় শেষকথা বলিয়া কিছু নাই। তাই সত্যের সহিত কল্পনা, বস্তুর সহিত ভাব, ভাবের সহিত আবেগ মিলিয়া মিশিয়া মানুষ তাহার চিন্তাকে সুদূর ও সরস করিয়া লয়, তাহার বক্তব্যকে অনির্বচনীয় করিয়া বর্ণনা করে।

স্থির-নির্দিষ্ট জ্ঞানের বাহিরে মানুষের যে অনির্দেশ অনুসন্ধান চলিতেছে সেখানে অনুমান আছে, হয়তো সত্যও আছে, হয়তো মিথ্যাও রহিয়াছে। এবং এই সত্য-মিথ্যা-অনুমান ও অনুভব লইয়াই মানুষের শান্তি ও প্রশান্তি গড়িয়া উঠিতেছে। কথা হইতে পারে, যে সকল অনিশ্চিত বিশ্বাস প্রমাণের অপেক্ষায় সত্য বলিয়া নির্ধারিত হইতে পারে না, তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে ধর্মাচার, যে লোকাচার গড়িয়া উঠে, মানুষের পক্ষে তাহা মঙ্গলের হইবে কি? হয়তো মঙ্গলের হইবে না, হয়তো ভ্রান্ত বিশ্বাসের শতমুখী শিকড়গুলি মানুষের চিন্তাকে আবিষ্ট করিয়া রাখিবে। যে ধর্মস্পৃহা মানুষকে সত্য ও সততার

পথে চালনা করিবে, তাহাই হয়তো তাহাকে পিছনের দিকে টানিতে থাকিবে। তখন Reason-এর সহিত Emotion-এর বিরোধ মানুষকে এক স্থানে গতিহীন করিয়া রাখিবে।

আজ এই জটিলতা সমাধানের জন্য আধুনিক সভ্যতা Emotionকে বর্জন করিয়া চলিতে চাহে। যাহারা জ্ঞানী, তাহাদের দ্বারা ইহা সম্ভব সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহারা সাধারণ, ইহা তাহাদের অন্তর ও বিশ্বাসের প্রতি অসম্মান। জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা মানুষ যে সত্যে উপনীত হয়, তাহাতে তাহার যে বিস্ময় তাহাই তাহার জীবনের মন্ত্র ও মাধুর্য। কিন্তু সাধারণ মানুষ জীবনকে ও জগৎকে বুদ্ধি দিয়া দেখিবার ক্ষমতা পায় না, হৃদয় দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করে মাত্র। অজানাকে জানায় তাহার কৌতূহল নাই, তাহার আনন্দ অজানাকে ভয় করায়, তাহার নিকট নিজেকে সমর্পণ করায়। একজন জীবনকে জ্ঞান দিয়া উপলব্ধি করিতে চায়, আর জন ইহাকে প্রাণ দিয়া অনুভব করিতে চাহে। সুতরাং যাহা জ্ঞানীর ধর্ম, সাধারণ তাহা ঘাড় পাতিয়া লইতে চাহিবে না, —একের ধর্ম অপরে কখনই বহন করিবে না। তাই Emotionকে আঘাত করিলে সাধারণ মানুষের উন্নতি ও উপকার করিবার সিদ্ধান্ত ব্যর্থ হইবে।

মাত্রাজ্ঞানের অভাবে ভাবপ্রবণতা আমাদের বিভ্রান্ত করিতেছে। Emotion হৃদয়ের বিশেষ গুণ, ইহা গ্লানি নহে, সর্ববস্তুর ন্যায় ইহারও আধিক্য গর্হিত। Reason ও Emotionকে মনুষ্যজীবনে সমগ্ররূপে না দেখিয়া আজ পৃথক ও খণ্ড করিয়া দেখিতেছি কেন? ইহার কারণ রহিয়াছে। ধর্মযাজকদের নিপীড়নে মানুষ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। দেবতার উদ্দেশে ভক্তি তাহারা চুরি করিয়া লইতেছে। দেবতাকে মাঝখানে রাখিয়া এই প্রতারণা ধর্মের ঐকান্তিকতাকে পরিহাস করিতেছে। ধর্মের নিঃসারতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তাই এক দল মানুষ আজ ইহার প্রয়োজন অস্বীকার করিতে চাহে। আর এক দল অন্য আর এক দিক দিয়া ধর্মের আবশ্যকতাকে অর্থহীন প্রতিপন্ন করিতেছে। তাহাদের যে যুক্তি, তাহা এ জগতেরই মৃত্তিকাকে কেন্দ্র করিয়া ধূলি উড়াইতেছে। মানুষের নিত্য প্রয়োজন দিয়া মানুষের সীমা নির্দিষ্ট করিতে চাহে। যাহা দেখিতেছি বুঝিতেছি, যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার ঊর্ধ্বে এ দৃষ্টি আর কিছু অন্বেষণ করিতে প্রস্তুত নহে। যাহা নগদ বুঝিয়া পাই, কেবল তাহা লইয়াই জীবনের সুখ-সম্পদ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা।

যাহা হিসাবের বাহিরে তাহা উহ্য, তাহা লইয়া সমস্যার উদ্ভব কথা চিন্তার অপব্যবহার মাত্র। কিন্তু এই বাস্তবতা মনুষ্যত্বের উন্মেষমাত্র, ইহা তাহার বহুবিস্তৃত বিকাশ নহে। ফুল ফুটিবার ও ফল ধরিবার জন্য বিস্তারিত শাখা-পল্লবের প্রয়োজন, কেবলমাত্র মূল—বৃক্ষের পরিচয় নহে। চিন্তাশক্তি সংক্ষেপ করিলে মানুষের সভ্যতা অন্নবস্ত্রেই সীমাবদ্ধ রাহবে।

তথাপি এই মতবাদের ছায়া বর্তমান রাজনীতিতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সে কারণ মানুষের উন্নতিকল্পে হোর যে প্রচেষ্টা তাহা পার্থিব দেনা-পাওনাতেই নিবদ্ধ। যে দেশই আজ উন্নতি করিতেছে, তাহা কেবল সুখ-সুবিধা ও খাওয়া-পরার উন্নতি মাত্র, তাহা মনুষ্যজীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নহে। অন্নবস্ত্রের বিধান সর্বপ্রযত্নে করিতেহ হইবে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অধিক আর কি কিছুই আজ দিবে না? প্রাচুর্যই মানুষের জীবন,—এ প্রচুরতাকে কোন্ দিক দিয়া সফল করিয়া তুলিব? উদরপূর্তির পর মানুষের জীবন রোমন্থনে কাটিয়া যায় না, সৃজনে ভরিয়া উঠে। ধরিত্রী হইতে যাহা পাইতেছি এবং যাহা পাইতেছি না, তাহারই সন্ধানে মানুষ ঘুরিয়া মরে। অবিশ্রাম খুঁজিয়া ফিরিয়া যাহা আবিষ্কার করে, যাহা উপলব্ধি করে, তাহাই তাহার কলা-বিজ্ঞান এবং ইহাকেও অতিক্রম করিয়া চেতনার সূক্ষ্মতম যে স্তর তাহাই উদ্ঘাটন করিতে চাহে। এই সূক্ষ্মতম বৃত্তি লইয়া মানুষ তাহার ধর্ম ও অধ্যাত্মবোধ মুকুলিত করিতেছে। ইহা তাহার বুদ্ধির একটি অতিরিক্ত চাহিদা, নতুবা পেট ভরিলেও মানুষের মন ভরিবে না। মনের ভরণ-পোষণের জন্য বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আত্মোৎকর্ষ ও আত্মসংস্কৃতির পথে মানুষ অগ্রসর হইতে চাহে। এই চলাই তাহার সভ্যতা।

আমাদের স্বদেশ—এই বৃহৎ ভারতবর্ষ আজ মন-মরা। বিবাদ-বিচ্ছেদ ও কুসংস্কারের বিষ সমাজের সর্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এ বিসম্বাদ কেবল অন্নবস্ত্রের জন্য হইলে এত ভয়ঙ্কর হইত না, অন্নবস্ত্রের সূত্র ধরিয়া ইহার সর্বনাশ মনুষ্যত্বের সমস্ত দিকগুলি আক্রমণ করিতেছে। যুগে যুগে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক হিংসায় ও স্বার্থে কুটিল আকার যে ধারণ করে নাই এমন নহে, কিন্তু সে বিরোধ কোন কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন-না-কোন একটি বিষয় লইয়া। তাহা আজিকার ন্যায় জীবনের প্রতিটি বিষয় লইয়া প্রত্যেকটি মানুষের আত্মকলহের নিগ্রহে সংক্রামিত ছিল না।

এ বিরোধ আজ প্রমত্ত Instinct-এর সহিত শিথিল culture-এর অন্তর্দ্বন্দ্ব। সৌন্দর্যচর্চার অভাবে বৃত্তি ও সংস্কৃতির মধ্যে সামঞ্জস্য যোজনা করা সম্ভবপর হইতেছে না। তাই একা Instinct তাহার খণ্ড ও অসম্পূর্ণ রূপ লইয়া মানুষকে পরিপূর্ণ না হইতে দিয়া সভ্যতাকে খণ্ড খণ্ড করিতেছে। প্লাবনের জলধারার ন্যায় সংস্কৃতির শাসন-ভাঙা প্রবৃত্তিরাশি আবর্ত রচনা করিতে করিতে আপনার প্রবল আবেগে ফুলিয়া-ফাঁপিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া সমাজে যাহা খুশি করিতেছে। কিন্তু বৃত্তির সহিত সংস্কৃতির সম্পর্ক বিপরীতমুখী হইবার কথা নহে। যাবতীয় বৃত্তিই মানুষের বিভিন্ন কর্মপ্রেরণার মূল উৎস ও প্ররোচক ; তাই বৃত্তিকে দমন বা নিস্তেজ করিবার ব্যর্থ চেষ্টার সিদ্ধান্ত না করিয়া সৌন্দর্যশিক্ষার প্রয়োগে ইহার শাসন ও শোধন দ্বারা মনুষ্যসমাজকে সুসংস্কৃত এবং সুরক্ষিত করিতে হইবে। কাম-প্রবৃত্তিকে প্রেমের ব্যবহার দিয়া সৌন্দর্যে ও গভীরতায় ব্যাপ্ত করিয়া লইবার ন্যায়—মানুষের সংস্কৃতি অস্ফুট কোরক হইতে প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় তাহার জন্মগত আদি বৃত্তিরই চর্চা-অর্জিত ক্রমবিকাশ মাত্র। বৃত্তির প্রকোপকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে, সমাজে এক-চক্ষু স্বার্থ ও লোভ প্রশমিত করিতে হইলে, মানুষের সকল ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে সৌন্দর্যের বীজ নিহিত রাখিতে হইবে। বৃত্তিগুলি সৌন্দর্যের আকারে ফুটিয়া উঠাই সংস্কৃতি,—বৃত্তি ও সংস্কৃতি একই অঙ্গে নিবিড় হইবে।

সৌন্দর্যচর্চার বিলুপ্তি ঘটায় শুভ-অশুভ-মিলিত আমাদের সংসার হইতে মানুষের মঙ্গল-অংশটুকু চিনিয়া লইতে না পারায় অকল্যাণের মুষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইতেছি না। জীবনধারণের প্রণালীকে চর্চা দ্বারা অর্জন করিতে হয়। আজ যে আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন-ধারায় পর্যুদস্ত, তাহা আমাদেরই উদাসীনতার অভিশাপ। নিজেদের চেষ্টায় ও সতর্কতায় গৃহের অঙ্গন ও বাহির উদ্যানে রূপান্তর না করিয়া যদি চারিপার্শ্বে আবর্জনা স্তূপীকৃত রাখিয়া আঁস্তাকুড় রচনা করি, স্বহস্তে বেষ্টিত সে দুর্ভোগ নিজেদেরই যন্ত্রণার কারণ হইবে। দার্শনিক-তত্ত্ববাক্য উচ্চারণ করিলেই ভবযন্ত্রণার নিরসন হইবে না।

কেবলমাত্র সদুপদেশ দ্বারা সমাজকে পরিচালিত করা সম্ভব নহে, সর্বসাধারণের অগ্রসর হইবার পথ বাঁধিয়া দিতে হইবে। সরল পথ খুঁজিয়া পাইলে মানুষ বক্রপন্থায় পা বাড়াইবে কেন? জীবনকে সুসংস্কৃত ও সুন্দর

করিতে হইলে সুন্দর আবহাওয়া ও সুন্দর পরিবেশের প্রয়োজন। মানুষের বৃত্তিগুলি সুকুমার ও শোভন করিবার একটা পদ্ধতি রহিয়াছে, কিন্তু আজ সমাজে শিল্প নাই, কলাবোধ মৃত, সে কারণ সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতেছে না। এই কারণেই আজ কলাবোধ জাগ্রত করিবার জন্য শিল্পবস্তুকে দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গীভূত করিতে হইবে। ইংরেজ শাসনে আমরা শিল্পের প্রয়োজন বিস্মৃত হইয়াছি। ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় যেটুকু বা অবশিষ্ট আছে তাহা ধনীর ঐশ্বর্য, সর্বসাধারণের ভোগ করিবার সম্পদ নহে। শিল্পকলা বলিতে আজ আমরা কেবল চিত্র বা ভাস্কর্য বা শৌখিন সামগ্রীই বুঝিয়া থাকি, তাই অন্য বস্তু হইতে পৃথক করিয়া একটা উচ্চ সম্মানের প্রাসাদে বন্দী করিয়াছি।

শিল্প অকারণে গড়িয়া উঠে না, মানুষের স্থূল সূক্ষ্ম বিভিন্ন প্রয়োজনেই ইহার সৃষ্টি। কেবলমাত্র সৌন্দর্যবৃত্তি তৃপ্ত করিবার জন্য, মানুষের রসবোধকে সূক্ষ্মতরলোকে সমুন্নত করিবার জন্য যে শিল্পকলা শ্রেষ্ঠ প্রতিভার স্পর্শে সৃজিত হয়, তাহা শিক্ষায় দীক্ষায় উদ্ভাসিত উন্নততর মানুষের চেতনাকে আনন্দিত করিতেছে। এই জাতীয় কলাসৃজনীকে বাক্যের সীমায় বিধিবদ্ধ করা সমীচীন নহে। যুগে যুগে কচিৎ কোন মহাশিল্পীর আবির্ভাবে কলাবোধের নূতন তাৎপর্য মানুষের শিল্প-সভ্যতাকে নূতন যাত্রাপথে সঞ্চালিত করে।

কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য মোটা ভাত-কাপড়ের ন্যায় শিল্পকলারও একটা মোটামুটি বিধি-বিধান করিয়া সাধারণ সংস্কৃতিকে উদ্বুদ্ধ রাখিবার একটা চলতি পথ নির্ধারণ করিতে হইবে। কলা-অন্তর্গত সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য প্রভৃতি বিবিধ শিল্প মানুষের বিভিন্ন সংস্কৃতিকে বহন ও পালন করিতেছে। আমাদের দেশে সাহিত্যই শুধু আজ পরিচয়োপযোগী কিঞ্চিৎ উন্নত, এবং যেটুক সংস্কৃতি ভদ্রসমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা সাহিত্য-রসসিঞ্চিত। শিক্ষার ব্যাপকতর অভাবে ইহা সর্বসাধারণের পক্ষে সহজগ্রাহ্য না হওয়ায় সকলের উৎকর্ষবিধানে নিয়োজিত করা সম্ভবপর হইতেছে না। যাহারা অশিক্ষিত নিজেদের ভাল-মন্দ বিচারে তাহারা অক্ষম, যাহারা অর্ধশিক্ষিত তাহারা নিজেদের ভালটুকুই শুধু বিবেচনা করে, কেবল সুশিক্ষিত যাহারা তাহারাই মাত্র নিজের ও পরের সকলের মঙ্গল-চিন্তা করিতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার জন্য যথেষ্ট বিদ্যাভ্যাস সর্বসাধারণের পক্ষে সহজ নহে। ইহাই উপলব্ধি করিয়া এককালে ধর্ম ও উৎসবের অবলম্বনে কথকতা, যাত্রা ইত্যাদির

সাহায্যে অভিনয়, নৃত্য, গীত, সাহিত্য প্রভৃতি শিল্পগুলিকে একত্রে সম্বন্ধ করিয়া এক আধারেই সর্বসাধারণের শিক্ষা, নীতি, রুচি ও রসগ্রাহিতার সার্থক পন্থা নির্দিষ্ট হইয়াছিল। আজ ধর্মচর্চার অভাবে ধর্মাচারের আনুষঙ্গিক এই সকল শিল্পকলা বিস্মৃত ও বিলুপ্ত। পুনরায় ইহাদিগকে ফিরিয়া পাইবার সময় আসন্ন হইয়াছে, কিন্তু কিরূপে এবং কোন্ আকারে, অনুমানে তাহার নিশ্চিত নিরূপণ যুক্তিযুক্ত নহে। ধর্ম সর্বদা গতিশীল। মানুষের জাগতিক পরিবর্তনের সহিত ইহারও বাহ্যিক রূপ বদল অনিবার্য। এক এক যুগে মানুষ এক এক বিশ্বাস ও আদর্শকে বরণ করিয়া লয়। বিজ্ঞানের প্রতি আস্থা আজ ধীরে ধীরে ধর্মের মহিমায় গড়িয়া উঠিতেছে। সর্বসাধারণের মধ্যে ইহার প্রচুর প্রভাব যদি কালক্রমে সরলভাবে বিস্তারলাভ করে, বিজ্ঞানধর্মের ভাবধারা সেদিন সমাজকে পরিচালিত করিবে এবং স্বাভাবিক কারণে শিল্পকলাও এক আদর্শেরই অনুগামী ও বাণীবহ থাকিবে। কিন্তু বর্তমান জনসমাজ আজই ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া নাই। তাই, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে সহসা বাতিল না করিয়া বরং তাহাকেই অবলম্বনের উপায় হিসাবে লইয়া সাধারণের মধ্যে পুনরায় শিল্পচেতনার গতিসঞ্চারে যত্নবান হইতে হইবে। গতিপ্রবাহ প্রাণবন্ত থাকিলে নদী যেমন তাহার দুই তট আপনার অনুকূল ও প্রতিকূল বুঝিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী কোথাও ভাঙিয়া কোথাও বা গড়িয়া অগ্রসরের পথ করিয়া লয়,—সেইমত, মানব-মনের সৌন্দর্যলিপ্সা সদাজাগ্রত রাখিলে শিল্পসংস্কৃতি তাহার যুগধর্ম অনুযায়ী আপনার সার্থক পথ চিনিয়া লইতে অনায়াসে সক্ষম হইবে। আজ সাহিত্য সচল, এবং সমাজ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। তাই ধর্মের অনুগামী না হইয়াও সামাজিক বিষয়বস্তুকেই অবলম্বন করিয়া কথাশিল্প আপনার নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণীরূপ সফল করিবার জন্য আর দূর-অতিক্রান্ত পশ্চাতের পানে ফিরিয়া তাকাইতেছে না।

আমাদের যাবতীয় লুপ্ত শিল্পের সকলগুলির পুনরায় প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত আলোচনা এই প্রসঙ্গের বক্তব্য নহে। পট, প্রতিমা এবং যে শিল্প ও কারুকলা হাতের কাজ বলিয়া বিদিত, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

বস্তুরাজির মধ্যে বসবাস করিয়া ব্যবহারের বাস্তব বস্তুগুলিকে সুন্দর ও মনোরম করিয়া সৃজন করিতে না পারিলে কিসের ঐশ্বর্যে আমাদের পরিবেশ সুন্দর হইবে? যাহা সুন্দর নহে, তাহা মনকে আকৃষ্ট করে না, তাহা শুধু

কাজসারা। আমাদের জীবন-পালন আজ এই দায়-সারা, ইহার কোন আকর্ষণ নাই। অথচ শিল্পকে এককালে আমরা ফেলা-ছড়া করিয়া ভোগ করিয়াছিলাম। ঘর-দ্বার পোশাক-পরিচ্ছদ তৈজস-পত্র—ব্যবহারের যাবতীয় বস্তুকেই শিল্পমণ্ডিত করিয়া সুন্দর করিয়া লইতাম। ভাঁড়-খুরি প্রভৃতি তুচ্ছ বস্তুতেও সৌন্দর্য আরোপ করিয়া আমাদের সংসারখানি শিল্পসৌরভে উদ্ভাসিত ছিল। প্রাণের নিশ্বাসবায়ুর ন্যায় ইহা অগোচরে জীবন, ধর্ম ও সেই সঙ্গে সমাজকে উজ্জীবিত রাখিয়াছিল। ব্যবহারের সামান্য বস্তুকেও অবজ্ঞা না করিয়া মূল্যহীনকে সোনা করিয়া লইবার যে শিক্ষা, তাহা শ্রম ও সময়ের অপচয় নহে, ইহা মানুষের সৌন্দর্যবোধ ও সংস্কৃতির পরিচয়। কিন্তু শিল্প আজ সমস্যা। এমনই ঘটিয়া থাকে, বাতাসে অম্লজানের অসঙ্কুলান ঘটিলে তখনই জীব শ্বাস প্রশ্বাস সম্বন্ধে সচকিত হয়।

কিন্তু আমাদের সৌন্দর্যস্পৃহা আজ জাতিগতভাবে নিস্তেজ হইয়া পড়িল কেন? গৃহদ্বারের দুই পার্শ্ব শিল্পশোভায় ভূষিত না করিয়া নির্বিকার চিত্তে গোময়-পিষ্টক লেপন করিতেছি। জ্বালানি প্রস্তুতের স্থানের কি এমনই অভাব ঘটিয়াছে? সামান্যতর রূপজ্ঞানের প্রতি এ মর্মান্তিক নিস্পৃহা, রুচিবোধের এ অপঘাত মৃত্যু সম্ভব হইল কোন্ কারণে? আজ ইহা অনুসন্ধান না করিলে নবপ্রেরণায় শিল্প প্রবর্তনের চেষ্টা কার্যকরী হইবে না।

বিদেশী শাসন তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের স্বার্থে আমাদের গৃহজাত শ্রমশিল্পগুলি দমন করিয়াছে। তাহাদের পণ্য সরবরাহে আমাদের প্রয়োজন ঘুচিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে বাহিরের এই বানের জল আমাদের ঘরের জল—দেশীয় শিল্পকে নিঃশেষে মুছিয়া লইয়াছে। কালাপাহাড়ের নির্দয় হাতুড়ি আমাদের শিল্পকলায় আঘাত হানিয়াছিল, কিন্তু ইংরেজের সদয় ব্যবসা-চাতুর্যের ন্যায় এমন করিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া শিল্পকে, তৎসহ সমাজ-সংস্কৃতিকে, বিধ্বস্ত করিতে পারে নাই। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যগুলি লইয়াই গ্রাম্যশিল্প গড়িয়া উঠে, কিন্তু সে প্রয়োজনের সমস্তটুকুই যদি একা কলকারখানা মিটাইতে ব্যগ্র হয়, তাহা হইলে জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ হাতের কাজের অভাবে অলস ও উপার্জনে অক্ষম হইয়া পড়িবে।

শিল্পের পট-প্রতিমা গ্রাম্যজীবনে ধর্মের অঙ্গ। কিন্তু এই হাতের কাজের কারুশিল্প, যাহার দ্বারা ঘর-দ্বার, আসবাবপত্র-বাসন, বসন-ভূষণ জীবনের

নিত্য-ব্যবহার্য সামগ্রীর সমস্তগুলিই সৌন্দর্যশোভায় বিকাশ লাভ করিয়া থাকে, সে সমুদায় বস্তুই আজ বিদেশ হইতে আনীত। নির্মাণকৌশলে ইহারা সায়েন্‌টিফিক্‌, কিন্তু দেশের রুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞানসম্মত আর্টিস্ট নহে। ইহার কেবল প্রয়োজনই সাধিতেছে, শিল্পসাধন করা তাহাদের উদ্দেশ্যের বাহিরে। এক দিকে পণ্যবিনিময়ে বিদেশীকে অর্থ যোগাইয়া আমরা যেমন নিঃস্ব হইয়াছি, অপর দিকে শিল্প ব্যতিরেকে সৌন্দর্য ও সংস্কৃতির চর্চা বিনা আমাদের রুচির এই হীনতা দেখা দিয়াছে।

এই হীন রুচি মানুষের ব্যবহারকে বিকৃত করিতেছে, বসবাসের ঘর-দ্বার শ্রীহীন করিতেছে, ধর্মবোধকে আচারে বিচারে ছিন্ন রাখিতেছে; এবং এই সকল গ্লানি লইয়া সমাজ আজ শতধা। এই গ্লানি মানুষ শুধু নিয়মানুবর্তিতার কঠোর আইন-শৃঙ্খল দিয়া দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না। তাহার কার্যকলাপকে পরিমিত সীমায় সুসংযত করিতে হইলে বাহিরের আরোপ-করা বিধিনিষেধের উপর একমাত্র নির্ভর না করিয়া অন্তরের দীপ্ত সৌন্দর্যজ্ঞানে জীবনকে মাধুর্যে বিকশিত হইতে দিবার পূর্ণ অবকাশ দিতে হইবে। শৃঙ্খলায় বাঁধিয়া রাখিবার সঙ্গে সঙ্গেই রূপ রস রুচির মুক্তলোকে মানুষকে মুক্তি দিতে হইবে।

শিল্পকলা তাহার অজস্র রূপে রসে নিজের মধ্যেই আবদ্ধ নহে, বিলাস-ব্যসনে ও উৎসবের মাদকতায় সমাপ্ত নহে, তাহার বিচ্ছুরিত সৌন্দর্যরশ্মি সঙ্গীত-অন্তে সুরের স্মৃতির ন্যায় অগোচরে মানব-মনের কন্দরে কন্দরে প্রবেশ করিয়া প্রতিমুহূর্তেই সেথাকার পুষ্পপর্ণ গোপনে জাগাইয়া তুলিতেছে, মানুষের সর্বকর্মে তাহারই গন্ধ বর্ণ আভাসে ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিজ্ঞানী না হইলেও, বিজ্ঞানবস্তুর নিত্য সংসর্গে থাকিতে থাকিতে ধীরে ধীরে মানুষের বুদ্ধি যেমন বিচারশীলতায় গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে, সেইরূপ নিত্যকর্মে কারু-শিল্পের সংস্পর্শে রহিলে মানব-মনে তাহার সূক্ষ্ম প্রভাব কালে কালে মানুষের আচরণকে আপনার অন্তর হইতে মধুর ও আর্টিষ্টিক করিয়া তুলিতে সহায়তা করিবে।

এই কলাবোধ ফিরাইয়া আনিবার মানসে শিক্ষিত সমাজে শিল্পের স্তিমিত আবেগসঞ্চার অনুভূত হইতেছে। নগরীর শিক্ষিত শিল্পীরা চিত্র ও ভাস্কর্যের বহুলপ্রচারের জন্য আজ উদগ্রীব। এ উৎসাহ ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে,

আজ কেবলমাত্র ছবি আঁকিয়া মূর্তি গড়িয়া সাধারণ মানুষের সমাজে শিল্প-চেতনা ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইবে না। নিত্যব্যবহার্য বস্তুর সহিত জীবনের যোগ অঙ্গাঙ্গী, গ্রাম্যশিল্পে হাতের কাজ বা কারুকলা যোজনা করিয়া একত্রে মানুষের প্রয়োজন সাধিতে ও রুচিজ্ঞান জাগাইতে হইবে। শ্রমশিল্পের এই খণ্ড খণ্ড শিল্পসম্ভার বর্ধিত আকারে আপন গতিতেই এককালে গ্রামে চিত্র- ও ভাস্কর্য-কলায় পরিণত শোভায় প্রস্ফুটিত হইবে। গ্রামের প্রয়োজনীয় দ্রব্য যখন পুনরায় গ্রামের কারিগরেরাই প্রস্তুত করিয়া আত্মনির্ভরশীল হইতে শিখিবে, প্রতিদিনকার প্রয়োজন মিটাইবার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকলার প্রয়োজন কেবল তখনই মাত্র দিনযাপনে উদ্বেগমুক্ত মানুষের মনকে অনায়াসে অনুপ্রাণিত করিবে। গ্রামের ভার যখন গ্রামই বহন করিবে, শিল্পকলার চর্চা তখন স্বাভাবিক হইবে। নতুবা বলদের স্কন্ধে লাঙলের ন্যায় গ্রামে শিল্পভার চাপাইলেই সংস্কৃতির ফসল ফলিবে না।

আমাদের এই শিল্প-সংস্কৃতিকে রক্ষা করিয়া চলিবার কর্তব্য ইংরেজের ছিল না। তাহারা রাজা নহে, তাহারা ব্যবসায়ী। ধীরে ধীরে গৃহজাত শিল্পীর উচ্ছেদ সাধিয়া গ্রামে কাজের অভাবে মানুষকে অলসতায় বিবাদ-বিসম্বাদে অবসর-বিনোদনের প্রচুর অবকাশ দিয়া সমাজকে আবর্জনার পঙ্কে নিমজ্জিত রাখিয়াছিল। একটা জাতিকে নিষ্ক্রিয় ও অবশ করিয়া অবলীলাক্রমে আপনার বশে রাখিতে কৃতকার্য হইয়াছে। দুই শত বৎসরের মৃত্যু-গহ্বর হইতে ফিরিবার জন্য জীবনে নবীন শিখায় শিল্পের দীপ প্রজ্জ্বলিত রাখিবার প্রয়োজন আজ সর্বাধিক। ধর্মানুষ্ঠানের সুস্থ পুনঃপ্রবর্তন দ্বারা নিত্য নিত্য ব্রত ও পূজাপার্বণে নিয়োজিত করিয়া অথবা নবতর উৎসব সৃজন দ্বারা গৃহললনাদিগকে গার্হস্থ্য-শিল্পকর্মে নিবিষ্ট রাখিতে হইবে। গৃহে গৃহে সৌন্দর্যচর্চায় সংসারখানি যেমন পরিচ্ছন্ন ও প্রফুল্ল রহিবে, আর এক দিকে দ্বিপ্রহরে অবকাশের অভাবে নিদ্রালস নেত্রে পরচর্চার বিষোদ্গার হইতে সমাজকে জ্ঞাতিবিচ্ছেদে উৎসাহিত করিতে পারিবে না। গ্রামের পুরুষেরাও চাষ-আবাদ সারিয়া হাতের কাজের কাজ হাতে পাইলে, অভাব-অনটনের হাত হইতে মুক্ত রহিলে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ আজিকার ন্যায় দুর্বলের সর্বনাশের মন্ত্রণায় বীভৎস হইবে না।

এইরূপে নিয়ত সর্বকর্মের মধ্যে সৌন্দর্যের চর্চা ও তাহার স্পর্শলাভ করিতে করিতে মানুষের চিন্তায় কোন কিছু অসুন্দর, কোন কিছু কদর্যতা একদা তাহার

ধাতে সহিবে না। তাবৎ শিল্পকলার মধ্য দিয়া রসস্রোতে আত্মোৎকর্ষের দিকে মানুষ যখন আপনা-আপনি অগ্রসর হইবে ;—আশা করা যাইতে পারে, সেদিন মানব-সভ্যতা সৌন্দর্যের তাল-ভঙ্গের আশঙ্কায় তাহার অন্তকার শ্রীহীন মনের সকল কদাচার, সকল পাপাচার, শুধু সুন্দর নহে—ইহা বিবেচনা করিয়া সযত্নে পরিহার করিবে। মানুষের সম্পর্ক কেবল রাজশাসনে নির্ধারিত না হইয়া পরস্পরের আচরণ-বিনিময় সেদিন সৌন্দর্যে গভীর ও উদার হইবে; আজিকার ন্যায় সেদিন রাজনীতির প্রদীপশিখা আলোর জ্যোতি অপেক্ষা তাহার ধূমান্বিত কালি ঘনাইয়া তুলিবে না। মানুষের সৌন্দর্য-বোধই সেদিন রাজনীতি সমাজনীতি ও তাহার ধর্মচেতনাকে পরিচালনা করিয়া কুসংস্কারের অবোধ অন্ধকার দূর করিবে, জ্ঞানকে উজ্জ্বলতায় এবং প্রেমকে মাধুর্যে সুন্দর করিবে। বিভিন্ন শিল্পবৃত্তির সুন্দর প্রকাশে সমাজ যেদিন আত্মসচেতন ও আত্মসংস্কৃত হইবে, নিজের এবং অপরের সীমানা ও সীমা সম্বন্ধে অন্তর হইতে উদ্বুদ্ধ হইবে, তখনই মাত্র বর্তমান রাজনীতির বহু বিভাগে সমন্বিত এই সম্মিলিত কর্ম-প্রচেষ্টার মূল-মন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার দূর স্বপ্নখানি নিকটবর্তী হইবে। সেদিন জয় হইবে, সৌন্দর্যের আজ্ঞাবহ মানুষের জয় হইবে। সেই সঙ্গে আমাদের এই ভারতবর্ষেরও জয় হইবে।

* * *

কিন্তু মানুষের আত্মোৎকর্ষ ও সংস্কৃতির যাত্রাপথ অন্নবস্ত্রের সমস্যায় আজ পঙ্কিল। গ্রাসাচ্ছাদনের মান এমনই নিম্নস্তরে অবনত হইয়াছে যে, অন্নবস্ত্রের সঙ্কট মানুষকেই গ্রাস করিতেছে। অন্নবস্ত্রের ভিত্তিতে জীবনকে সুদৃঢ় করিতে না পারিলে সংস্কৃতির ললিত সুষমাকে ধারণ করিতে পারা সম্ভব নহে। কুসুম কোমল, কিন্তু তাহার বৃন্তটি কোমল নহে।

খাওয়া-পরার চাহিদা মিটাইতে রাষ্ট্রকে সজাগ হইতে হইবে। এই কার্যে এবং দেশের অন্যবিধ উন্নতিবিধানে, ভারতবর্ষেও আজ বৈজ্ঞানিকগণের সহযোগিতা, ও যন্ত্রপাতির সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু কেবল মাত্র যন্ত্রের উন্নতিচর্চায় ইউরোপ-আমেরিকায় যে-তৎপরতার সাড়া জাগিয়াছে, তাহাতে মনুষ্যত্বের সম্মান নাই। এই দৃষ্টান্তে সতর্ক রহিয়া আজ ইহার ব্যবহারকে সংযত করিতে না পারিলে যন্ত্রের সহিত জীবনের সামঞ্জস্য রক্ষা করা অসম্ভব হইবে। যন্ত্র-শিল্পের সহিত শিল্পকলার প্রসার যদি সমভাবে অগ্রসর না হয়,

সৌন্দর্যবোধের অভাবে মানুষ যন্ত্রে পরিণত হইবে, যান্ত্রিক উন্নতির মদমত্ততায় ভারতবর্ষেও দানবের তাণ্ডব চলিবে। যন্ত্র আমাদের যে সাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি বহন করিয়া আনিবে, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য সীমাজ্ঞান,—সে কারণ কলাবোধের প্রয়োজন। কেবলমাত্র উন্নতি আমাদের সভ্যতার কাম্য নহে, বাহিরের প্রাচুর্যের সহিত অন্তরের যে প্রসারতা তাহাই মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি। কলা-বিজ্ঞানে সম্মিলিত যে পরিপূর্ণ জীবন তাহাই আমাদের কামনা। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের দাবিতে বিজ্ঞান নির্দিষ্ট আকারে গড়িয়া উঠিবে, কিন্তু অন্নচিন্তার ন্যায় শিল্প-কলার দাবি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নহে। তাই কল-কারখানায় হাত লাগাইবার পূর্বে শিল্প-কলার জন্য, বিশেষ করিয়া কুটির-শিল্প বা হাতের-কাজগুলি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতার সহিত অবহিত থাকিতে হইবে, নতুবা যন্ত্রের শব্দে জীবনের সঙ্গীত নিঃশব্দে বিলীন হইয়া যাইবে।

যন্ত্রের সহায়তায় অন্নবস্ত্রের সহজ সমাধান করিয়া প্রাণ-ধারণকে সুখের এবং একই সঙ্গে শিল্প-কলার সাহায্যে জীবন পালনকে সুন্দর করিয়া লইতে হইবে। ইহার জন্য একটা নীতিগত জ্ঞান ও শিক্ষার প্রয়োজন। খাওয়া-পরায় ভারতবর্ষ নিজেকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে নাই, খাওয়া-পরা যেখানে শেষ সেখান হইতেই তাহার আরম্ভ; এ আরম্ভের শেষ নাই। আজ নিরাপত্তার অভাবে ভবিষ্যতের দুর্ভাবনায় কল্যকার জন্য আমরা সঞ্চয়ে আত্মনিয়োগ করিতেছি। সঞ্চয়ের নেশায় মানুষে মানুষে স্বভাবতই ধনী ও দরিদ্রের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়া বঞ্চনায় ও বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভে সমাজকে পঙ্কিল করিয়া তুলিতেছে। সঞ্চয়লিপ্সার কৃত্রিম কৌশল সমাজের অন্য সকলকে অতিরিক্ত বাস্তবতার অযথা আঘাতে পীড়ন করিতেছে। কিন্তু পুরাতন ভারতবর্ষ আজিকার সভ্যতার ন্যায় মানুষকে লোভে ও সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে নাই। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তার আবর্তেই মানুষ যাহাতে নিজেকে সঙ্কীর্ণ করিয়া না রাখে, তাহারই জন্য ধর্মাচরণ, উৎসব, শিল্পকলা প্রভৃতি মহৎ আদর্শে সকলকে ব্যাপৃত করিয়া প্রয়োজনকে কখনই প্রয়োজন অপেক্ষা বড় করিয়া দেখিবার অবকাশ দেয় নাই। সঞ্চয় তাহার ধর্মের নিষেধ।

সে নিষেধ, সে আদর্শ আজ জোর করিয়া চাপাইয়া দিলেই কার্যকরী হইবে না। মোটা ভাত-কাপড় যোগাইবার অবস্থা যখন দেশের ছিল, তখন অন্নবস্ত্রের প্রয়োজনকে আমরা তুচ্ছ বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত ছিলাম না। অন্নবস্ত্রই

আজ আমাদের সর্বস্ব। রাষ্ট্রের চেষ্টায় ও সহযোগিতায় উৎপাদন পর্যাপ্ত হইলে, সকল মানুষ মোটা ভাত-কাপড়ের নির্ভরতা পাইলে সাধারণের মুখের গ্রাস হরণ করিয়া কাহারও ধনী হইবার বাসনা ও উপায় থাকিবে না। সাধারণও আর ধনিকের কিঞ্চিৎ অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী থাকিবে না। আত্মনির্ভরতায় সকলে পুষ্ট হইলে অন্ন লইয়া ধনী-দরিদ্রের এই বিরোধ, এই প্রাথমিক প্রয়োজনটুকু মাত্র লইয়াই মানুষের সর্ববিধ কর্মশক্তির নিঃশেষ অপচয় সহজেই নিবারিত হইবে। অন্নবস্ত্রের পরিমিত প্রয়োজন মিটাইয়া জীবনের স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হইতে না পারিলে মানুষের সহিত মানুষের সহজ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে না। সম্পর্কহীন সমাজ লইয়া শিল্প ও সংস্কৃতির সম্ভাবনা স্বপ্ন মাত্র।

শ্রীসুনীল পাল (ভাস্কর)

ব্যবস্থাপত্র

বেদান্তের বালাপোষে ঢেকে রাখো পীড়িত আত্মাকে,
কখন ঝাপটা দেবে ভবসমুদ্রের জলো হাওয়া,
ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। যদি বা সত্যের সূর্য ঢাকে
জীবনের কুয়াশায়, শঙ্করাচার্যের কাছে পাওয়া
মোক্ষম দাওয়াই আছে ; মাঝে মাঝে করিও সেবন।
ধর্মসাক্ষী ক'রে যদি ব্যর্থ ব'লে জানাও নালিশ,
চতুর্গুণ খেসারত—চারিখণ্ডে বেদান্তদর্শন,
উপরন্তু বিনামূল্যে কবিরাজ প্লেটোর মালিশ।

আত্মাকে বাঁচানো চাই, কেন না আত্মার মৃত্যু নাই—
মৃত্যু যার নাই তাকে কোনক্রমে বাঁচাতেই হবে ;
অমৃতের পুত্রকন্যা, স্থির যদি করেছ নাচাই,
আজানু ঘোমটা দিও—শ্যাম-কুল সব ঠিক রবে।

অনেক অমর আত্মা হেলায় মরেছে যুগে যুগে,
সাবধানে থেকো তুমি, বোকারা মরুক ভুগে ভুগে।

শ্রীশান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

নিজের কথা

নতুন জীবন

রক্তপাত ক'রে বিদ্যার্জন ধাতে সইল না। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে প্রকাশ্যেই ছবি আঁকা শুরু ক'রে দিলাম। বাবুজী বেগতিক দেখে হাল ছেড়ে দিলেন। গারদখানা থেকে অব্যাহতি পেয়েও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। স্কুল ছাড়ার পর ঘরোয়া আবেষ্টনী অধিকতর অপ্রীতিকর হয়ে উঠল, ভাল ছেলেদের ব্যূহে আটক পড়লাম। ভাইজী—আমার পিসতুতো ভাই ফণীন্দ্রনাথ বর্মণ—সময় বুঝে সসম্মানে বি. এ. পাস ক'রে ফেললেন। তিনি আমাদের এখানে থেকেই লেখাপড়া করতেন। পাশের বাড়ির ভবানী—ভবানীপ্রসূন চাটুজ্জে—তাসের আড্ডার কাণ্ডারী বললে অত্যুক্তি হয় না। বলা নেই কওয়া নেই, কলেজী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে স্বর্ণপদকের ব্যবস্থা ক'রে নিলে। আমার অবস্থা কাহিল, জলে কুমীর ডাঙায় বাঘের মত। উঠতে বসতে তুলনার পীড়নে কান ঝালাপালা হয়ে উঠল। এমন অবস্থায় ভাল ছেলেকে সুনজরে দেখার কথা নয়, তথাপি ভাইজী ও ভবানীর প্রতি কখনও আমার বিদ্বেষ-ভাব আসে নি। ভাল ছেলের কর্তব্যে বহু প্রত্যাশা জড়িয়ে থাকলেও ভবানী পাস করার বেশি ঝক্কি ঘাড়ে নেয় নি। ভাইজীর একটু বাড়াবাড়ি ছিল, নম্রতা সুভাষণ ইত্যাদি অনেক দম্ভভরা গুণ আয়ত্ত ক'রে ফেলেছিলেন। প্রশংসার শাসনে এমনই কাবু হয়ে পড়েছিলেন যে, ঠাকুরদার কাছে তিনি বৈদান্তিক সংস্কৃত শ্লোক অবলীলাক্রমে আবৃত্তি ক'রে যেতেন। মুখস্থের কর্তব্য দিনের পর দিন বাড়িয়েই চলেছিলেন, বোঝার প্রয়োজন ছিল না ব'লে। চেহারাটাও ছিল আদর্শ-ঘেঁষা, একেবারে ভদ্রজনোচিত গোলগাল, তার ওপর গৌরবর্ণ—সুদর্শন ব্যক্তি। এতগুলি অস্বস্তিকর গুণ থাকা সত্ত্বেও ভাইজীর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা ছিল। আমার নিজের ভাইবোন কেউ না থাকায় ভাইজীকেই জ্যেষ্ঠের পাওনা দিয়েছিলাম। ভবানীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম ও আমার আঁকা ছবি দেখতে ভালবাসত ব'লে। গোড়ার দিকে ভবানীর উৎসাহ শোনবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকতাম। ছেলেটা নিশ্চিন্ত মনে সকলের সামনেই ছবি দেখত এবং ভালই বলত। তখনকার দিনে ওইটুকুতেই ভাল ছেলের ইজ্জৎ খোয়া যেত, ভবানী এ বিষয়ে ছিল একেবারে বেপরোয়া।

নিজের কথায় নামি। কথায় বলে, লেংটার নেই বাটপাড়ের ভয়। স্কুল

ছাড়ার পর তুলনার মন্ত্রশক্তি আমাকে নির্ভীক ক'রে তুললে। যার কোন গুণই নেই, তাকে কত আর খারাপ করা যায়! ছবিতে যুবতীদের আসা-যাওয়া চালাতে লাগলাম। পিসীমা কি ভাবে আমার অবৈধ কীর্তি দেখে ফেলেছিলেন। একেই গোল্লায় গিয়েছি, তার উপর আসল চরিত্রহানির সম্ভাবনা থাকায় বাবুজীকে ধ'রে বসলেন, এখুনি ছেলের বিয়ে দাও, তা নইলে একটা কেলেঙ্কারি হ'ল ব'লে, যাচ্ছেতাই কাণ্ড, ছেলেটা সোমত্ত মেয়েদের ছবি আঁকে।

বিবাহের প্রস্তাব রাষ্ট্র হতে সময় লাগল না। আমার অবস্থা দাঁড়াল ভাগাড়ে গরু পড়ার মত, কন্যাপক্ষীয়েরা আমাকে ছিঁড়ে খাবার যোগাড় করলেন। অনূঢ়া কন্যাদের গুণকীর্তনে বাড় তোলপাড় হয়ে উঠল। প্রত্যেকেরই ধারণা, তাঁর মেয়ে বিবাহ না করলে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। গৃহস্থালী স্থাপনের উপদেশ যে বীমা-কোম্পানির লাভজনক প্রতিশ্রুতি অপেক্ষা জবরদস্ত হতে পারে, আমার জানা ছিল না। বাড়িতে নতুন কেউ এলেই মনে হ'ত, ওই বুঝি আর একজন এল। বিয়ের কথায় ভয় শুরু হয়ে গেল।

কনে বাছার ভার তখনকার দিনে বরের ওপর ছাড়া হ'ত না, আমার ক্ষেত্রে অধম তো দূরের কথা, বাবুজীও কোন কথা বলার অধিকার পান নি। ঠাকুরদা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গোপনে এদিকটা নজর রাখছিলেন। বংশগৌরবের ফর্দে দেখা গেল, আগন্তুকরা অনেক ধাপ তলায়, অর্থাৎ বাঞ্ছনীয় যৌতুকের দিকটা কেউ সামলে উঠতে পারেন নি। সকলের আরজি বরখাস্ত হয়ে গেল।

একদিন সুপ্রভাতে শুনলাম, আমার টিকার (পাকা-দেখা) দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে। ধনী জমিদার রমানাথ বর্মণের কন্যা, একমাত্র সন্তান, সব দিক দিয়ে উপযুক্ত। ঠাকুরদা যে উকিল মারফৎ কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন, তা বাড়ির কেউ জানত না। খুলনার কোন বড় মহাল নিয়ে ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধ'রে মকদ্দমা চলছিল, সেই প্রাচীন মামলা তুলে নেবার শর্ত দাঁড়াল আমার বিবাহের যৌতুক হিসাবে।

মামলাকে মধ্যস্থ ক'রে আমার বিবাহ হয়ে গেল।

বিবাহের রাত্রে প্রথম যৌবনানুভূতির অভিজ্ঞতা পেলাম। কৌতূহল ও অজ্ঞাত ভয় এমন একটি পুলক সৃষ্টি করতে পারে, অজ্ঞাত ছিল। নারীর সংস্পর্শে মন মাতাল হয়ে উঠল। আধ্যাত্মিক আদর্শজড়িত ঊর্ধ্বগামী

ভালবাসার খবর আমার কাছে পৌঁছয় নি, এইটুকু বুঝেছিলাম, নারীদেহের সান্নিধ্য আমার একান্ত প্রয়োজন।

ঠিক এই সময় নবজাত প্রেমের সহজ গতি বাধা পেল। শ্বশুর মহাশয় পূজার তত্ত্বে ঘরোয়ানা চাল বজায় রাখতে পারেন নি। সামাজিকতার জটিল মন্ত্রণায় যা ধার্য হ'ল, তা ভিন্ন প্রকারে আমার উপর শাসন। শুনলাম, কুটুম্ব নীচ স্তরের লোক, ওখানে ছেলে পাঠানো শোভনীয় নয়। বিয়ের পর তখন বৎসর ফেরে নি, বউ ঘরে আসাও বাধা ছিল, এটাও সামাজিক অনুষ্ঠানের বিধান, আমি যেতাম নিজের স্ত্রীর কাছে লুকিয়ে। এ খবর কেমন ক'রে বার হয়ে গিয়েছিল, কোন শুভার্থী জানিয়ে দিলেন। এর পর ওদিক মাড়ানো চলে না।

অসুবিধা নানা দিক থেকে বেড়ে ওঠায়, দিনকতক অশোভনীয় কাজ থেকে নিজেকে আগলে রেখেছিলাম, কিন্তু শেষ রক্ষা হ'ল না। মিলনাকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠায় সামাজিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে দিলাম। সকলের সামনে দিয়েই নিজের স্ত্রীর কাছে যাব ঠিক ক'রে ফেললাম।

অন্তরের দারুণ আলোড়নের কথা বাবুজীকে জানালাম। তিনি খুশি হয়েই উত্তর দিলেন, এর মধ্যে কিন্তু বোধ করার কিছু তো নেই। আমার আচার-ভ্রষ্ট প্রস্তাব মা শুনেছিলেন। ছেলে পর হয়ে যাবার ভয় আমার বিবাহের পূর্ব থেকেই ছিল। পিতা-পুত্রের কথোপকথনে তিনি যোগ না দিয়ে পারলেন না। মন্তব্য প্রকাশ করলেন, এমন অনাসৃষ্টি কাণ্ড কোথাও শুনি নি! বিনা নিমন্ত্রণে নতুন জামাই শ্বশুরবাড়ি যায়? মায়ের মনের কথা জেনেও নিজেকে সংযত করতে পারলাম না। দুর্দান্ত যৌবনচেতনা আমাকে সকল বাধা ভাঙবার জন্যে প্রস্তুত ক'রে তুলল।

শ্বশুর মহাশয় সহজলব্ধ জামাই পেয়ে খুশিই হলেন। দিনকতক পরমানন্দে যাতায়াত চলল। সুখ যে আমার কপালে সয় না, তা জানতে পারলাম শ্বশুর মহাশয়ের স্নেহপূর্ণ ডাকে। পাশে বসিয়ে পারিবারিক কুশল-প্রশ্ন শুরু ক'রে দিলেন। কখনও তাঁর কাছে স্নেহের ভাষণ শুনি নি, অশুভ ঘটনার আশঙ্কায় সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলাম। অবিলম্বে বিপদের আবির্ভাব ঘটল।

কুশল-প্রশ্নের মাঝে অকস্মাৎ জমিদারি দেখার প্রস্তাব ক'রে ফেললেন।

আমি তাঁর বক্তব্য বোঝার আগেই তিনি মাস্টার মশায়ের স্থান দখল ক'রে ফেলেছিলেন। ভয়াল স্মৃতি আমাকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল। গুরুর কর্তব্যজ্ঞান তখন মারমুখি হয়ে উঠেছে। শিক্ষাদানের এমন শৃঙ্খলাবদ্ধ আয়োজন কুত্রাপি দেখি নি। গোড়াপত্তন করলেন, সবই তো তোমার হবে, এখন থেকে দেখে শুনে নেওয়া ভাল। তার পরেই কার্যকলাপের বিশদ বিবরণ শুরু হ'ল। প্রথমেই এল দাঙ্গার কথা। জমিদারি চালাতে হ'লে প্রয়োজন অনুসারে মানুষের মাথা ফাটানো যে মহৎ কর্ম, তা নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝাবার চেষ্টা চলতে লাগল। সবই সুচিন্তিত উপদেশ, আমার অন্যমনস্ক হবার উপায় নেই; অপর দিকে শিক্ষাদানের পদ্ধতি ভাবময় হয়ে উঠেছে, আমার অজ্ঞতার দাবি পেশ করার সুযোগও পাচ্ছি না। স্নেহের অপূর্ব পরিবেশনে ভিতরটা ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ছে। পরিত্রাণের সুযোগ পেলাম কোন মহলের নায়েব এসে পড়ায়। খবর খারাপ, দাঙ্গায় নাকি সত্যই দারোগার মাথা ফেটেছে। সরকার জটিল ধারায় কেস খাড়া করেছেন, তার সঙ্গে বডি-ওয়ারেণ্টের ব্যবস্থা চলেছে।

দীক্ষাদানের পূর্বেই শিষ্যের সামনে যাবতীয় উপদেশ ফেঁসে যাওয়ায় নায়েবের সঙ্গে গোপন মন্ত্রণার দরকার হয়ে পড়ল। আমি তখনকার মত ছুটি পেলাম।

শ্বশুর মহাশয়ের নিয়মিত উপদেশ-বর্ষণ সত্ত্বেও তাঁর বাড়ি যাওয়া থামাতে পারলাম না, স্ত্রীকে ভাল লেগে গিয়েছিল। উপদেশ গা-সওয়া হয়ে আসছিল, মাথা নত ক'রে সবই শুনতাম। আমার জ্ঞান সম্বন্ধে যখন তিনি প্রশ্নমালা গাঁথতেন, তখনই তাঁর হৃদয়হীনতায় অস্থির হয়ে উঠতাম, পালাবার অজুহাত খুঁজতাম।

সেদিন প্রশ্ন আরম্ভ হবার পূর্বেই পালাবার সদিচ্ছা প্রকাশ ক'রে ফেলেছিলাম। শ্বশুর মহাশয় ধৈর্য হারালেন। কিছুমাত্র গৌরচন্দ্রিকা না ক'রেই জানিয়ে দিলেন, আমার দ্বারা কোন ভাল কাজই হবার নয়। সিদ্ধান্তের পিছনে নতুন কিছু ছিল না, কিন্তু আমলাদের সামনে অপদার্থ প্রমাণিত হওয়ায় আত্মমর্যাদায় ঘা লাগল। বোকা হ'লেও ইজ্জৎ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার ছিলাম। এই ঘটনার পর আমার স্ত্রী সুশীলাকে আমাদের এখানে নিয়ে এলাম।

আমাদের বাড়িতে কত রকমের আত্মীয় আসতেন ও থাকতেন তার গোনাগুনতি ছিল না। তাঁদের সকলকে আমি চিনতামও না। কালীদর্শন,

চিড়িয়াখানা দেখা বা মামলা উপলক্ষ্যে সদরে দিন কতক নিখরচায় থেকে যেতে হ'লে সেজোর তরফের বাড়ি ছিল অবারিতদ্বার।

এক প্রকারের মানুষ আছে যারা সাময়িক স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোন সুবিধা হাতের নাগালে পেলেই কাজে লাগিয়ে নেয়। অপরিচিত আত্মীয়দের ভিতর অনেকেই ছিলেন এই দলভুক্ত ঠাকুরদার কাছে আমাদের ম্লেচ্ছাচারিতার বিশদ বিবরণ বড় দুঃখের সঙ্গে বলতে শুনেছি, যথা—বড় বংশে এ কি কাণ্ড! বাবা, মা, ছেলে একসঙ্গে কি ব'লে সাহেবী খানা খায়! একে মুরগীর মাংস, তায় আবার বাবুর্চীর রান্না। এ ছাড়াও আছে, বড়বাবু অর্থাৎ বাবুজী একটু আধটু কড়া পানি চালান। কোনটিই মিথ্যা নয়;—বাস্তবিকই, আমাদের রাত্রের আহার সরবরাহ করত পেলিটি, বাবুজীও পানাসক্ত ছিলেন। এর মধ্যে একটু আধটুও লুকো-ছাপার বালাই ছিল না। এইখানে সাফাই গাওয়া ভাল, যাঁরা ডবল জাতিচ্যুতির খবর দাদার কাছে জানাতেন, তাঁরাই আমাদের বাসী প্রসাদ লাভের আশায় উদ্গ্রীব হয়ে থাকতেন। ম্লেচ্ছাহারীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে তাঁহাদের নিষ্কলঙ্ক পাকস্থলীর সৎক্রিয়া কখন পিছপাও হতে দেখি নি।

গুণকীর্তনকারীদের ভিতর অনেকে সুশীলার প্রতি সাংঘাতিকভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন। কারণ ছিল, সুশীলাই কারও না কারও কন্যার স্থান দখল ক'রে বসেছিলেন। বউকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার ভার তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা এইটুকু খবর রাখতেন, একান্নবর্তী পরিবারে নতুন বউ সম্বন্ধে পুরাতন ভৃত্যেরও এ অধিকার থাকে, সুতরাং তাঁদের হিতোপদেশ-দান নিরচ্ছিন্ন দাবির কথা।

উপদেশের পিছনে শাসনের আগ্রহ দেখা যেতে লাগল। সুশীলা গুপ্ত উদ্দেশ্য বুঝে নিজেকে মেলামেশা থেকে সরিয়ে রাখতে লাগলেন। তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি স্বচ্ছন্দে অবহেলার পাত্রকে কৃপার চক্ষে দেখতে পারতেন। কৃপার মাত্রা বেড়ে ওঠায় নিজেকে নিরালায় বন্দী ক'রে ফেললেন।

অস্বস্তিকর অবস্থায় এসে পড়লাম। নিজে উপায়ক্ষম নই যে, প্যাঁচালো পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যাব। আমাদের বংশে উপায়ক্ষম হওয়া চলন ছিল না। স্বাবলম্বী হতে হ'লে জমিদারির পেশাই শোভনীয় মনে করা হ'ত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে আমাদের নিষ্কর্মা সম্ভ্রান্ত বংশ মাথা খাড়া ক'রে

চলেছে। আমিই প্রথম বংশমর্যাদা খর্ব করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠলাম। কার্যত তখনও অগ্রসর হ'তে পারি নি, কেবল বাসনার প্রকাশেই পিতৃকুল ও মাতৃকুল আসন্ন কলঙ্কের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

ইতিপূর্বে খরচের যথেচ্ছাচারিতা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ অনটন, সংযমের আদেশ পাঠাল। মামার ওখান থেকে মায়ের নামে যে মাসোহারা আসত, তা ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম ক'রে যেতে লাগল। ঠাকুরদাও আমাদের কিছু দিতেন না, একান্নভুক্ত পরিবারে থেকেও আমরা পৃথক ছিলাম ব'লে। আয় নেই, অথচ ব্যয়ের দিক কিছুমাত্র না কমায়, ঋণ জমা হতে লাগল।

ব্যয়শীলতার আভিজাত্যে মামা দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছিলেন। তাগিদ, অনুমান করি, ঊর্ধ্বগামী খেতাবের মোহ। খরচের প্রতিযোগিতায় লাট-বেলাটের পার্টি তো বেড়ে চলেছিলই, অধিকন্তু স্পোর্টসম্যানের খ্যাতি কায়েমী করার জন্যে অনেক কিছু উপরি-ব্যয়ের ভার গ্রহণ করেছিলেন। কুকুর পোষার সাহেবী শৌখিনতা তার মধ্যে একটি।

মামা বংশগৌরব দেখে কুকুর বাছাই করতেন, মানুষের জাত উবে গেলেও কুকুরের পেডিগ্রির সম্মান এখনও কাটে নি। গ্রীষ্মের সময় হাওয়া যেত দার্জিলিঙে। কুকুরের দৌলতে অনেকে স্বাস্থ্য শুধরে নিত। বড় খরচের সিদ্ধ-হস্ততায় ছোটখাট কর্তব্য সম্বন্ধে সব সময় খেয়াল রাখতে পারতেন না।

পরিবর্তন

এর জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ নেই, কারণ সকলেরই ব্যক্তিগত রুচি সার্থক করার অধিকার আছে। রাজ্যহীন মহারাজার স্থান ঊর্ধ্বলোকে, কল্পনার দেশে। ভেজালহীন আত্মস্তুতির এমন একটি সুবিধা দাম দিয়ে কেনার চেষ্টা থাকলে যা ঘটে, তা মামার বেলাতেও ঘটল। তাঁর অত্যধিক সচ্ছলতার আড়ালে অভাবের উঁকি সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ক্রমে আমাদের মাসোহারা প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

যে সময় অনটন আমার অস্তিত্বকে উপহাস করতে আরম্ভ করেছে, সেই সময় আমি কন্যার পিতা হলাম, বয়স সবে উনিশ পার হয়েছে। খুকী মাস ছয়েকের না হয়ে উঠতেই, আমার স্ত্রী আবার গর্ভবতী হলেন। প্রথম কন্যা জন্মাবার পরেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভেঙেছিল, দ্বিতীয় বার সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর সূতিকাগৃহেই মারা গেলেন। নবজাত শিশু কয়েক দিনের ভিতর মায়ের

পথানুসরণ করলে। খুকীকে মা-হারা অবস্থায় বেশি দিন ধ'রে রাখা গেল না। মুখাগ্নি আমি করতে পারি নি, বাবুজীর উপর ভার দিয়েছিলাম। বৎসর খানেকের ভিতর এল আমার মায়ের পালা। মায়ের মৃত্যুর পর রইলেন বাবুজী—আমার পরম বন্ধু, আমার শেষ বন্ধন।

কালের স্রোতে শোক স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল। এই সুযোগে আদিম প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু ক'রে দিলে। চরিত্রকে আদর্শবদ্ধ করতে হ'লে বিবাহ ছাড়া গতি নেই। কিন্তু অভাবকে পাশে নিয়ে ও কথা ভাবতেও আতঙ্ক আসে। অপর দিকে ভিতরে জ্বলন্ত আগুনের জ্বালা অসহনীয় হয়ে উঠল। কোন দিকে পরিত্রাণের পথ নেই, সর্বত্রই সংস্কারের বেড়াজাল, সর্বত্রই নীতির পাহারা সঙিন খাড়া ক'রে আছে। আমার অবস্থা দাঁড়াল পিঞ্জরাবদ্ধ বুভুক্ষু শার্দুলের মত। খাঁচার বাইরে আহার দেখা। রক্ষকের করুণায় আত্মরক্ষা।

কত সময় আত্মপ্রশ্নে যুক্তির আশ্রয় খুঁজেছি, মাংসাশীকে নিরামিষভোজী করায় কোন্ বৃহৎ আদর্শ সার্থক হয়ে থাকে? উত্তর পাই, প্রয়োজন অনুসারে সমাজের শৃঙ্খলা। ভাবতে থাকি, শাসন দ্বারা বাঘকে ভেড়া বানানোর যত বড়ই কৃতিত্ব থাকুক, তা প্রকৃতিদত্ত ধর্মকে অস্বীকার, ব্যক্তিগত শক্তিক্ষয়ের কৌশল। কেউ বলে, সমষ্টির শক্তির জন্য ব্যক্তিগত ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা আছে। শক্তিশালী ভোগীর সমর্থন পাই, ত্যাগের উদ্দেশ্য বৃহত্তর স্বার্থকে সিদ্ধির পথে নিয়ে চলা; কিন্তু চলার পিছনে শক্তি না থাকলে পথ অফুরন্ত হয়ে ওঠে এবং দুর্বল কোন প্রকারে গম্যস্থলে পৌঁছলেও যেটুকু লাভ হয় তা মুমূর্ষুর অবসাদের কথা। যা দেবার জন্য পথ চলা, তার ভার বহনের অক্ষমতায় দানের দ্রব্য মাঝপথে প'ড়ে থাকাও বিচিত্র নয়। এমত অবস্থায় যা পাওয়া গেল, তাকে সুস্থ অস্তিত্বের অবলম্বন করা চলে না। সুতরাং সমাজের হিতার্থে শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যেই ব্যক্তিবিশেষের শক্তিকে না মেনে উপায় নেই। এক শক্তির বিকাশে যে আর এক শক্তির জন্ম হতে পারে—এ কথা নির্বিচারে অস্বীকার করায় জটিল উদ্দেশ্য গ'ড়ে ওঠে, বৃহৎ আদর্শ খর্ব হয়।

ইঞ্জিনের বাষ্পাধারে যে শক্তি সংগৃহীত হয়, তার সার্থকতা গতিতে। গতিকে থামিয়ে বাষ্পাধার পূর্ণ করা শুধু অর্থহীন নয়, বিপজ্জনকও বটে। কারণ সীমাবদ্ধ আধারে শক্তির মাত্রাধিক্যে বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী এবং বিস্ফোরণ

যদি ঘটে তো শক্তির বিকাশ অবাঞ্ছনীয় পথও খুঁজে নিতে পারে। তখন আধার-ছাড়া ভয়াল গতিকে বাধা দেবে কে?

এইরূপ অনুকূল প্রতিকূল মতের সংঘর্ষণে যে আগুন জ্বলে উঠল, তার তাত সহ্য করা গেল না। তিলে তিলে দগ্ধে মরা অপেক্ষা আগুনে ঝাঁপ দিলাম সব কুণ্ঠাকে ভস্মসাৎ ক'রে ফেলার জন্য।

আত্ম-সংযমের অপারগতায় কত সময় অনুশোচনা এসেছে, পুনরায় আদিম তাড়নায় প্রকৃতির ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছি, অন্তরের ক্ষিপ্ত দানবদের শান্ত না ক'রে পারি নি।

নূতন জীবন

এই ভাবে আমার বাঁচার ধারা দিনের পর দিন পরিবর্তিত হয়ে যেতে লাগল। প্রবাহের টানে গা ঢেলে দিলাম। ভেসে চলেছি, কূলের ঠিকানা নেই, বাঁচারও উদ্দেশ্য নেই। সমাজেরও আমাকে প্রয়োজন ছিল না, আমার চারিত্রিক দৃষ্টান্ত তখন মানুষের কাছে ঘৃণ্য হয়ে উঠেছে।

এই সময় যে দরদীকে কাছে পেলাম, তা ছবির ঝাপসা রূপ। খোঁজার বস্তুকে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতাম। কখনও-সখনও নাগালের কাছে পেয়ে গেলে ছবিকে সাজিয়ে দেখার ইচ্ছা আসত, ফ্রেমে চড়াতাম।

এই কারণে সেদিন হগ মার্কেটে যাবার দরকার হয়েছিল। ট্রামে তেমন ভিড় ছিল না, সামনেই দেখলাম জপমালা হাতে প্রাচীন কালের মানুষ, চটা-ফাটা পুরানো পাথরের মত মুখ। কড়া ও মিহি রেখা চার ধার থেকে মুখাবয়ব বেড় দিয়েছে। মুখের উপর এক ঝলকা আলো নানা রঙের ঢেউ তুলেছে। ছবি আঁকার লোভ চেপে গেল। খসড়া করার সরঞ্জাম কাছেই ছিল, কাজে লেগে গেলাম। চলতি গাড়িতে পুরোপুরি সাদৃশ্য আনতে না পারলেও কাজটা সঙ্কোচহীন হয়ে উঠল।

ছবি আঁকার সময়, পাশের সাহেব যাত্রী কুতূহলী হয়ে উঠেছিলেন। কাজ শেষ হবার আগেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনতে লাগলাম। ভাবলাম, যাঁর প্রতিলিপি কাগজে ধরলাম, তিনি নিশ্চয় ছবিটা দেখতে চাইবেন। ঘটল বিপরীত। নিশ্চয় আমার শৌখিনতার অত্যাচারে তাঁর ভক্তির হিসাব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক দুই হাতে ভগবানের নাম চেপে ধ'রে গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। আমারও গন্তব্য স্থান নিকটে এলে

গিয়েছিল। পান্তাড়ি গুটিয়ে নামবার জন্ম প্রস্তুত হয়েছি, পাশের সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছবিটা বেচবে? উপস্থিত পঁচিশ টাকার বেশি দিতে পারছি না, বাড়িতে এলে বাকিটা পুষিয়ে দেব।

সম্পূর্ণ অপরিচিতের কাছ থেকে এইরূপ প্রস্তাব উপহাস ব'লে মনে হ'ল। সামান্ত একটা পেনসিলের খসড়া, কয়েক মিনিটে আঁকা, তারই দাম পঁচিশ টাকার অধিক হতে পারে কল্পনাও করতে পারি নি। ভাবলাম, সাহেবের দয়া। বিপদজনক কেন্দ্রে পৌছবার আগে নেমে পড়াই সুবুদ্ধির কাজ হবে। নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল না, হঠাৎ সাহেবের কৃপা সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চেয়ে বসা আমার পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র নয়; এবং প্রশ্ন শুরু হ'লে তার পরিণাম কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তারও স্থিরতা নেই, কারণ ছদ্মবেশী করুণা আমার কাছে বীভৎস।

চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা না থাকলেও সন্ত আঁকা ছবির উপর শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষ শিল্পীর কাছে মর্মান্তিক। মাতা যতই দীন হোক, সন্তান যতই কুৎসিত হোক, সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ প্রকৃতিদত্ত। দোষগুণ বিচারে স্নেহের প্রকাশ কম-বেশি হয় না। সাহেবের আচরণ জঘন্ত লাগছিল, উঠে দাঁড়ালাম নেমে পড়ার জন্তে। সাহেবও দেখি আমার সঙ্গে উঠলেন, সমীহ ক'রে জানালেন, ছবিটা আমার বড় ভাল লেগেছে, এখন এই নাও, বাড়িতে এলেই উপযুক্ত দাম দিয়ে দেব। তাঁর আন্তরিকতায় বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম, এরই ভিতর নোটগুলো আমার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছে। বিহ্বল অবস্থায় নিজের অজ্ঞাতেই হাত পেতে দিয়েছিলাম। নোটের সঙ্গে একটি কঠিন কাগজের স্পর্শানুভূতি পাচ্ছিলাম। চিত্তচাঞ্চল্যে তখন অন্তর ওলটপালট হয়ে গিয়েছে, সাহেবের দান গ্রহণ ক'রে চলতি গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম।

গাড়ি বেগে ছুটছিল, মুহূর্তে আমাদের মাঝে দূরত্বের সৃষ্টি হয়ে গেল। একটু ধাতস্থ হতেই দেখি, ছবিটা আমার বগলদাবায় র'য়ে গিয়েছে। হাতের তালুতে নোটগুলো কণ্টকপূর্ণ হয়ে উঠল, অবশেষে ভিক্ষাজীবী হয়ে গেলাম। নোটের সঙ্গে একটি ভিজিটিং কার্ড এসে গিয়েছিল; নাম পড়লাম—আরজেন-টাইন, র‍্যালি ব্রাদার্সের বড় সাহেব। বাড়ির ঠিকানা অ্যালেকজান্ড্রা কোর্ট, চৌরঙ্গী।

অন্তঃশুদ্ধির একমাত্র উপায়, টাকাটা এখুনি ফেরত দেওয়া। পথ চলতে চলতে ছবি-বাঁধানো দোকানের কাছে এসে পড়েছিলাম। দোকানে ঢুকেই

বললাম, বড্ড তাড়া, কি ক'রে বাঁধাতে হবে কাল এসে বুঝিয়ে দেব। ছবিটা রইল।

দোকানের স্বত্বাধিকারী পথ আগলে জানালেন, কথা আছে, কাজের কথা। আর এক ঘ্যাসাদ, আমার সঙ্গে আবার কি কথা থাকতে পারে? ভদ্রলোক দেখলাম, গোঁয়াজের দিকে গড়াচ্ছেন, মজা লাগছিল। সপ্রশ্ন দৃষ্টি তাঁর উপর নিক্ষেপ করতে তিনি বললেন, তোমরা শিল্পী লোক, হাওয়ায় ঘোরা অভ্যাস। একটু ব্যবসাবুদ্ধি মাথায় থাকলে মাটিকে চেনারও সুবিধা পেতে। ছবি সম্বন্ধে আকাশ মাটি ভাবুকতা ইত্যাদি কিছুই বুঝতাম না, এইটুকু জানতাম, ছবি আঁকতে ভাল লাগে, রঙের প্রতি ঘোরতর আকর্ষণ ছিল, যেখানে যা মানানসই মনে হ'ত, লাগিয়ে দিতাম।

কাজের কথার যেরূপ গাম্ভীর্যসহ শুরু হ'ল, তাতে ভয়ের কারণ ছিল, পাছে ভদ্রলোক কোন প্রফেসর অব আর্টের অনুকরণ ক'রে বসেন। ভীতির কারণ অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। আর্ট সম্বন্ধে পণ্ডিত লোক বেশি কেতাব পড়লেই, ছবির উদ্দেশ্য, শিল্পীর কর্তব্য, রসচর্চায় ধর্মের স্থান, তদুপরি আধ্যাত্মিক সোপান ইত্যাদি অনেক কিছু মন্ত্রপাঠের মত ব'লে যান, যার অর্থকরণ আমার মত মানুষের পক্ষে অসম্ভব। পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে মাথা নত না করলেও ত্রাণ নেই, স্পষ্ট ভাষায় শুনতে হয়—ঐখানেই তো গলদ, তোমরা এখনও রসিকের ধাপে ওঠ নি। আসলে তোমরা কারিগর, শিল্পী, মহৎ জীব, তাদের চিনিয়ে দেওয়াই আমাদের কাজ। সোজা কথায় যদি বলেন, তোমাকে চিনি না, তা হ'লে জ্ঞানীর বক্তব্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাথার টনক ন'ড়ে যায় না। কপালগুণে এ যাত্রা বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম। ভদ্রলোক কাজের কথায় নামলেন ; বিলাতী একরঙা ছাপা ছবি বহু রঙ দিয়ে খ'ড়া করতে হবে, বাজারে এর চাহিদা আছে। ছবি পিছু তিন টাকা পর্যন্ত দিতে তাঁর আপত্তি নেই।

ছেলেবেলায় পাঠ্য-পুস্তকের ষ্টিল প্রিণ্ট একরঙা ছবি শুকিয়ে রঙ করতাম। কাজটা মনে হ'ল আমার ক্ষমতার বাইরে নয়। সাহস সংগ্রহ ক'রে তখনই রাজি হয়ে গেলাম।

ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় বেশ কিছুদিনের। তথাপি আমাকে বিশ্বাস করার সাহস তাঁর ছিল না। দোকানের পুরাতন লোকের হাতে মাত্র

একটি ছবি দিয়ে বললেন, ছবিওলা বাবুর বাড়ি দেখে আসিস। এমন অকপট কাজের কথায় প্রথমটা বিগড়ে যাবার অবস্থা এসে গিয়েছিল। পরে ভেবে দেখলাম, ভদ্রলোক আসল কাজের মানুষ। বহু অভিজ্ঞতা লাভের পর সাবধানতা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ওইটুকু আয়ত্ত করতে পারলে অনেক লোকসান থেকে বেঁচে যেতাম চেষ্টার ত্রুটি ছিল না; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমার যথেষ্ট অমার্জিত অভ্যাস বাধ সেধে বসত। অবিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ থাকলেও মানুষকে নিজের দুর্বলতা জানাতে পারতাম না। আমিও অনেক ক্ষেত্রে ভদ্রাচারের আভিজাত্য দেখিয়ে ফেলতাম। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য কি না ভাববার বিষয় হ'লেও লিখলাম, কারণ সত্যই এরূপ ঘটনা আমার জীবনে অনেকবার ঘটেছে।

সেদিন আর সাহেবের বাড়ি যাওয়া হ'ল না।

পরের দিন সকালেই সাহেবের ঠিকানায় উপস্থিত হলাম। দ্বারসংলগ্ন বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতাম টিপতেই সুসজ্জিত বেয়ারা বেরিয়ে এল। ঘরে ঢুকলাম। অপূর্ব সরঞ্জাম, আবেষ্টনীতে মনোরম নতুনের সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে ছবি—একটিও ছাপা নয়, সব হাতে আঁকা, আসবাবপত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, সবই সুন্দরকে আঁকড়ে ধরেছে। বাহুল্যবর্জিত এমন ছিমছাম আবেষ্টনীর সংস্পর্শে ইতিপূর্বে কখনও আসি নি। মন আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল।

সাহেব স্নান করছিলেন। ইতিমধ্যে ছবিগুলো দেখে নেবার লোভ সম্বরণ করিতে পারলাম না। দু পা দেয়ালের কাছে এগুতেই দেখি, অনেক স্বদেশী চালের ছবি, আর পাশে বিলাতী ছবিও আছে। ভদ্রলোকের প্রতি শ্রদ্ধা এসে গেল। সস্তার মাল তিনি ঘরে রাখেন না।

কিছুক্ষণ বাদে সাহেব এলেন। ভদ্রাচারের পালা শেষ ক'রে জানালাম, টাকা ফেরত দিতে এসেছি। সাহেব অবাক্, জিজ্ঞাসা করলেন, ছবিটা বেচবে না? উত্তর দিলাম, ছবির দাম কি ভাবে দাঁড়ায় আমার জানা নেই, তবে ছবিটি তোমার ভাল লেগে থাকলে নিতে পার। তোমার ভাল লাগাকেই বড় দাম মনে ক'রে নেব। সাহেব আমার কথা শুনে এমনই খুশি হলেন যে, আগের দেওয়া মূল্য তো ফেরত নিলেনই, অধিকন্তু তিন গুন নোটের তাড়া গুনে আমার হাতে তুলে দিলেন। ভ্যাবাচাকার ঘটনা ঘ'টে গেল। খসড়া সাহেবের

হাতে তুলে দিলাম। ভদ্রলোক যেন হারানো রত্ন উদ্ধার করলেন। সযত্নে ছবিটি টেবিলের উপর রেখে, ফিরে এলেন আমার কাছে। আমি তখন কিং-কর্তব্যবিমূঢ়ের মত হয়ে গিয়েছি। সাহেবের দরদে আনন্দাশ্রু এসে গিয়েছিল। বেশি কথা বলার শক্তি ছিল না। সাহেবের কাছে বিদায় নিতে চাইলাম। সাহেব আমার নাম ও ঠিকানা লিখে নিয়ে বললেন, It is a privilege to possess one Chowdhury। জীবনে উপায়ক্ষম প্রথম সোপান তৈরি করলেন গ্রীস দেশের মানুষ আরজেনটাইন সাহেব।

বাড়ি ফিরে প্রথমেই স্বোপার্জিত নোটগুলি গুনতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। সাহেবের হিসাবে সন্দেহভঞ্জনের প্রয়াস ছিল না। সোনার আনন্দে মশগুল হবার ব্যবস্থা করছিলাম। জাগ্রত স্বপ্নের মৌজে ভুলে যাচ্ছিলাম। কতবার যে গোনার পুনরাবর্তন হ'ল বলতে পারি না।

টিন প্রিণ্টের রঙিন কারবার পরের দিন থেকে চালালাম। মাটির দেশের কাজ অল্প দিনের ভিতরেই শিখে ফেললাম। ব্যবসার মাথা খুলে যেতে এক দোকানের কাজ দেখিয়ে ভিন্ন দোকানের কাজ সংগ্রহ করতে লাগলাম।

অল্প দিনেই কারবার ফ্যাশানের স্তরে উঠে গেল। এখন আর ছবি কাঁধে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ফিরি করার প্রয়োজন হয় না। দোকানদাররা ঘরে এসে কাজ দিতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে মাটির কারবার এমন ফেঁপে উঠল যে, নিজের ছবি আঁকার আর সময় পাই না; বাধ্যতামূলক কোন কাজই আমার ধাতে সইত না। দোকানদাররা যখন জলদি কাজ আমার বাড়িতেই পাহারা বসিয়ে করিয়ে নিতে আরম্ভ করলে, তখন অর্থোপার্জনের উপর বীতরাগ এসে গেল। নিজের পরিকল্পনাকে রঙ ও রেখার রূপ দেবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম। নিজের কথা বলার জন্যে সময় খুঁজে নিলাম। কড়া সিদ্ধান্ত সাহস নিয়ে পিছনে দাঁড়াল, ঠিক ক'রে ফেললাম, এই ভাবে পয়সা উপায় চলবে না।

কল্পনার রূপকে ছবিতে ধরবার জন্যে যে উন্মাদনা অর্থের লোভ পরিত্যাগ করাল, তার প্রকাশ দেখলাম সাধনাসাপেক্ষ। সাধনারও নির্দিষ্ট পথ আছে, যার হদিশ পথ-প্রদর্শক ব্যতীত পাবার উপায় নেই। গুরুর সন্ধানে মন ধাবিত হ'ল। কেবল একমাত্র চিন্তা আমার পিছু নিয়ে রইল, কে আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে?

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

ভগবান যদি এখানে আসেন

ভগবান যদি এখানে আসেন—এখানে তাঁর
শঙ্খে চক্রে গদা ও পদ্মে চমৎকার
পীত-অম্বর জলদবরণ মোহনকায়
প্রকাশ পায়,
ভেবে দেখ তবে সে কি অদ্ভুত বেখাপ্পা,
সে কি বেমানান্ বিশ্রী যে হবে অবস্থা—
আজগবি কথা বলছি না আমি বলছি না।
ভেবে দেখ শুধু তারপরে ক'রো হেনস্থা।
এই রাস্তাতে এইখানে এই রাস্তাতেই—
গোবরে কাদায় ছড়ানো রয়েছে একাকার,
তার ওপর দিয়ে ধুয়ে ব'য়ে চলে বৃষ্টিধার।
চলতে গেলেই পায়ে ঝামা বেঁধে ঢিল ফোটে,
ন্যাংটো ছেলেরা তারই ওপরেতে খুব লোটে।
কাঠি দিয়ে দিয়ে নোংরা খোঁচায় নর্দমায়
পিঠের ওপর চটাস চটাস চাপড় খায়
মা রেগে গেলেই—কারণ থাক্ আর নাই বা থাক্
চোখ বুজে ভাবে, যাক, সময়টা কেটেই যাক
মুখ ব'সে গেছে, সর্দি ঝরছে নাক দিয়ে,
চামড়া উঠেছে পাঁজরে পাঁজরে পাক দিয়ে,
সকলেই জানে, তারও জানা আছে সে জঞ্জাল।
এইখানে যদি হঠাৎ আসেন বালগোপাল,
বলব না কিছু, ভেবে দেখ শুধু একটিবার
উদ্ভব হবে সে কি অদ্ভুত অবস্থার।

ভগবান যদি এখানে আসেন—এইখানে
নোনা-ধরা ইট ফাঁক ফাঁক খোলা পলকা কাঠ
আব্রু বাঁচানো বাঁখারির বেড়া ঘেরা খোপর,
হাড় নিয়ে কাক ঝগড়া করছে তারই ওপর,

ঝুল ভরা শিকে ভুষোমাখা কোন্ কুলুঙ্গির
ঝুলে গেছে দড়ি ভার ব'য়ে ধুতি ও লুঙ্গির
দেয়ালের গায়ে সে কোন্ খেয়ালী চিত্রকর
ধুয়ে ধুয়ে চুন খসিয়ে বালির পলেস্তর,
এঁকে গেছে ছবি—ভিখারী শিশুর কল্পনার··
অসহ্য স্বরে এবং নোংরা ভঙ্গিমায়
তরুণী মেয়েরা ঝগড়া ক'রেই দিন কাটায়,
অল্পবয়সী ছেলেরা কাশছে খকর-খক্,
বুড়োরা কেবল ধমকের পর দেয় ধমক,
ভিজে মাটিতেই গড়াগড়ি লোক দেয় যবে,
গুরু-অগুরুর মৃদু সুমধুর সৌরভে।

ভগবান যদি এখানে হঠাৎ প্রকাশ পান,
মনে হবে না কি, এ কি অদ্ভুত কি বেমানান!
এই রাস্তাতে এইখানে ফুটপাথের 'পর
পাগলা বুড়িটা বলছে রেসের জোর খবর,
ভূত-ভবিষ্যৎ বলে আধকানা গণৎকার,
জুতোর দোকানে রেডিয়ো চালায় কি চীৎকার,
মোড়েতে ভিক্ষে ক'রে বিধবার দিন কাটে,
বিকারবিহীন ব'সে ব'সে লোক ঘাড় ছাঁটে,
ছোকরা পানওলা নারকেল-দড়ি জ্বালাতে যায়;
কিছুতে জ্বলে না, শেষে জ্বলে গিয়ে যন্ত্রণায়
ঘন বর্ষার কালো মেঘ তাকে গাল পাড়ে,
ফেরিওলাগুলো থেকে থেকে ঝাঁকা নেয় ঘাড়ে।
ওই রে পাহারা ওই এল বুঝি ওই তাড়ে
এতটুকু ঘুঁটি খুঁজে মরে, খোঁজে অন্ধকার···
ভগবান যদি এখানে আসেন—হঠাৎ তাঁর
কি যে হতে পারে আমি শুধু তাই তাই ভাবি
নিঃসংশয়ে ভেঙে যাবে তাঁর অহংকার

ভ'রে যায় মন শিল্পীসুলভ যন্ত্রণায়।
লজ্জা লজ্জা—স্বীয় সৃষ্টির ব্যর্থতায়
জ্যোতিষ্কহারা তমিস্র লোকে অতঃপর
মগ্ন হবেন নবপ্রকাশের তপস্যায়।

অসিতকুমার

ডানা

(৪৯৩ পৃষ্ঠার পর)

গুলো ঝাড়তে লাগলেন। প্রচুর ধুলো জমেছিল। কবি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। কৃতজ্ঞতায় সমস্ত মন ভ'রে উঠল সহসা। বারো বছর বয়সের যে কিশোরীটিকে বিয়ে ক'রে এনেছিলেন তিনি বহুকাল পূর্বে, তাঁকে যেন তিনি দেখতে পেলেন হঠাৎ। সেই থেকে ক্রমাগত সেবা ক'রে চলেছেন। কিছুতেই থামবেন না। মন্দাকিনীর মত স্ত্রী না পেলে কি তাঁর মত মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে লেখাপড়া করা সম্ভব হ'ত? সংসারের কোন আঁচটি তাঁর গায়ে লাগতে দেন নি। তখনই কিন্তু মনে হ'ল, তা দেন নি বটে, কিন্তু মন্দাকিনী তাঁর জীবনে ঠিক সেই প্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছেন কি, যার জন্যে তাঁর কবি-চিত্ত সতত উন্মুখ হয়ে আছে? এমন একটি মহিমময় মুহূর্ত মন্দাকিনী তাঁর জীবনে মূর্ত ক'রে তুলতে পেরেছেন কি, যার জন্যে সমস্ত সুখ-সুবিধা তুচ্ছ ক'রে অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়তেও লোকে ইতস্তত করে না? তিনি কবি, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ তিনি, তাঁর সমিধ-সম্ভারে একটি স্ফুলিঙ্গও দিতে পেরেছেন মন্দাকিনী কোনও দিন? সে আগুনের জন্যে বারে বারে তাঁকে অপরের শরণ হতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। ডানার মুখখানা মনে পড়ল। এমন অদ্ভুত একটা বহ্নি আছে মেয়েটির মধ্যে, যার সান্নিধ্যে এলেই সমস্ত মন প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। না, ঠিক যৌন-লালসা নয় এটা—বৈজ্ঞানিকেরা যা-ই বলুন, আকর্ষণ মাত্রেই যৌন-আকর্ষণ নয়। লোহার সঙ্গে চুম্বকের সম্পর্কটা কি যৌন? এক-একটা বিশেষ লোককে দেখলেই মনে হয়, এই তো সে, যাকে খুঁজছিলাম এতদিন, তা সে নারী পুরুষ যে-ই হোক। তার কাছে গেলেই মনে ছবি জাগতে থাকে উদার আকাশের, দিগন্তবিস্তৃত মাঠের, দুরারোহ পর্বতের, সীমাহীন সমুদ্রের। অপূর্ব পুলকে সমস্ত চিত্ত ভ'রে ওঠে, অদ্ভুত উৎসাহ

সঞ্চারিত হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, কোনও কিছু অসম্ভব ব'লে মনে হয় না, মনে হয়, সব পারব, মন ডানা মেলে উড়তে চায়। মন্দাকিনী ঠিক এ জাতের নন। মন্দাকিনী বিচক্ষণ সচিব, অভিজ্ঞ গৃহিণী। কিন্তু প্রিয়সখী নন, ললিতকলা-বিধির কোনও ধার ধারেন না তিনি।

আশ্চর্য, ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মন্দাকিনীও ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন। নিজের চরিত্রে বা আচরণে যদিও কোন দোষ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না, কবির কবি-প্রতিভা সম্বন্ধেও হঠাৎ তিনি যে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, তাও নয়, তবু কেমন যেন আবছাভাবে তাঁর মনে হচ্ছিল, এ লোকটির ঠিক সঙ্গিনী তিনি হতে পারেন নি। মনে হওয়ামাত্রই রাগ হ'ল তাঁর, নিজের উপর নয়—কবির উপর। বুড়ো বয়সে ওই সব ছেলেমানুষি মানায় নাকি! সঙ্গে ক'রে তীর্থে নিয়ে যেতে চাও রাজি আছি, পাখি দেখে বেড়াবার বয়স আছে কি আর এখন? ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন একবার। কবি জানলায় দাঁড়িয়ে আছেন চোখে দূরবীন লাগিয়ে। আশ্চর্য মানুষ! হেঁট হয়ে শেল্‌ফের তলার ধুলোগুলো পরিষ্কার ক'রে নিলেন। একটা কাগজে সেগুলো নিপুণভাবে তুলে বাইরে ফেলে দিলেন। আবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন। তখনও দাঁড়িয়ে আছেন কবি নিস্পন্দ হয়ে, চোখে দূরবীন।

কি দেখছ অত তুমি?

কবি চমকিত হলেন। তারপর হেসে বললেন, একটা ফিঙে। ফিঙে দেখেছ ভাল ক'রে কখনও? ওয়াণ্ডারফুল!

টেলিগ্রাফ পোস্টের ওপর কি চমৎকার ব'সে আছে তখন থেকে! কুচকুচে কালো, গা থেকে রোদ পিছলে পড়ছে যেন! সূর্য যেন শত ধারায় সোনা ঢালছে ওর গায়ে আর ও যেন ঘাড় বেঁকিয়ে বলছে, চাই না তোমার সোনা, নিয়ে যাও, নিছক কালোই ভাল আমার, অলঙ্কার দরকার নেই, থ্যাঙ্ক্‌স!

হেসে ফেললেন মন্দাকিনী, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত অন্তরও স্নেহে বিগলিত হয়ে পড়ল যেন। চুলে পাক ধরলে কি হবে, লোক নিতান্ত ছেলেমানুষ এখনও। ছি ছি, এ রকম লোককে নিয়ে কি সংসার করা চলে?

দেখবে?

ওসব ছেলেমানুষি করবার সময় নেই আমার এখন।

মুখে যদিও এ কথা বললেন, কিন্তু মনে মনে দেখবার লোভ যে একটু ছিল না তা নয়।

একটুখানি দেখ না।

খুব অনিচ্ছাসহকারে যেন কবিকে বাধিত করবার জন্যেই এগিয়ে এলেন মন্দাকিনী। দূরবীনে চোখ লাগিয়ে দেখলেন ফিঙেটাকে। বাঃ, বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে তো! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দূরবীনটা চোখ থেকে নামিয়ে ছুটলেন বারের দিকে—ওই যাঃ, ডালটা পুড়ল বোধ হয়, গন্ধ ছাড়ছে, কি যে ছেলেমানুষি কর তুমি! পর-মুহূর্তেই বেরিয়ে গেলেন। কবি দেখতে লাগলেন ফিঙেটাকে আবার। একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। কাল ভোরে অদ্ভুত রকম মিষ্টি সুরে একটা পাখি ডাকাছল। উঠে টর্চ ফেলে দেখেছিলেন, অভিনব কোন পাখি নয়, ফিঙে। পাশে সঙ্গিনীটিও ব'সে আছে ব'লে মনে হ'ল। কি রে মেকি কি মেকি কি মেকি কি—ক্রমাগত ডেকে চলছে। শুকতারা জ্বলজ্বল করছে পূর্বাকাশে। কি রে মেকি কি মেকি কি মেকি কি। কবির হঠাৎ মনে হ'ল, যা কিছু মেকি তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছে ও যেন। সূর্যের সোনা ও চায় না, ফরসা হবার কোনও লোভ নেই ওর। আফ্রিকার জুলুর মত, ভারতবর্ষের কালা-আদমির মত কৃষ্ণবর্ণের গৌরবেই ও গৌরবান্বিত, আর সেটাকে প্রচারও করতে চায় স্পষ্টভাবে। শ্বেতাঙ্গদের বহু শতাব্দীর অত্যাচারের আগুন ওর বুকের ভিতর জ্বলছে। ভোরবেলায় প্রিয়াকে সম্বোধন করবার বেলাতেও তাই বোধ হয় ওর মনে হয়, এও মেকি নয় তো? সুরে সুরে বার বার প্রশ্ন করছে তাই—কি রে, মেকি কি, মেকি কি, মেকি কি?

ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—
চেনে নি তোমায় আজও যাহারা
কোন দেশে বাস করে তাহারা
উদ্ধত ওগো কালো পতাকা
সদা-জাগ্রত কড়া পাহারা
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—।

কখনও বসিয়া আছ সু-উচ্চ টেলিগ্রাফ পোস্টে
গরু ছাগলের পিঠে কখনও বা ভ্রমিতেছ গোষ্ঠে

ফিং দিয়ে ছুটে যাও কখনও বা পতঙ্গ লক্ষ্যি
ওগো ফিঙে পক্ষী,
খাইয়া তোমার তাড়া
কাক চিল পাড়াছাড়া
নিমেষে
ঠোকর খাইয়া মরে যদি হয় এতটুকু টিমে সে।
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

বুকে যে আগুন জ্বলে সারা গায়ে তারই কালো ঝুল কি ?
জলজ্বলে লাল চোখে দেখা যায় বুঝি তারই ফুলকি,
তাই বুঝি চোখে মুখে ফুটে আছে 'আয় দেখি' ভঙ্গী
ওগো ফিঙে জঙ্গী,
পুচ্ছেতে এক জোড়া
বাঁকা বাঁকা কালো ছোরা
শাণিত
জবাব তখুনি দেবে যদি কেউ করে অপমানিত।
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

আঁধার রজনী-শেষে আলোর আভাস যবে ঝলকে
প্রেয়সীর দিকে চেয়ে ব্যঙ্গের সুর তোলে বল কে
মেকি কি মেকি কি তুমি বল বল জীবনের সঙ্গী—
ওগো ফিঙে রঙ্গী
তখন যে গাও গান
ওঠে রসিকের প্রাণ
মাতিয়া
রাগে আর অনুরাগে প্রেয়সীও ওঠে বুঝি তাতিয়া
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

কবিতাটা লিখে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। জানলা দিয়ে চেয়ে রইলেন দূরে। হঠাৎ মনে হ'ল, বসন্তের আগমনে সমস্ত প্রকৃতি উৎসবে মেতেছে, কর্ণিকার ফুলে কি অদ্ভুত স্বর্ণকান্তি, অশোক-গুচ্ছের কি রূপ !

কু-কুক্‌-কুক্ কুক্—

কলকণ্ঠে সাড়া দিয়ে উড়ে গেল একটা স্ত্রী-কোকিল। সূর্যের সোনালী আলোয় ঝলমল ক'রে উঠল তার জংলা শাড়িখানা।

মন্দাকিনী এক কাপ দুধ হাতে ক'রে প্রবেশ করলেন।

বুঝলে, সুন্দরীর দুধ আজকাল এত ঘন হয়েছে যে, চড়িয়ে উনুন-গোড়া থেকে নড়বার জো নেই, সঙ্গে সঙ্গে তলা ধ'রে যাবে।

ডালটা পুড়ে গেল?

না। খুব বেঁচে গেছে।

মন্দাকিনীর মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল।

কবি দুধের পেয়ালায় চুমুক দিয়া বললেন, বামুনটা রাখ, কত আর খাটবে?

তুমি বোঝ না, রাখব কি ক'রে, মাইনে দিতে হবে তো একটি কাঁড়ি?

কিছু টাকার যোগাড় হয়েছে।

কোথা থেকে?

আমি রঘুবংশ আর কুমারসম্ভবের যে নোট লিখেছিলাম গেল বছর, সে দুটো একজন ছাপাতে চায়, মাসে আমাকে আশি টাকা ক'রে দেবে বলছে।

খুব খুশি হলেন মন্দাকিনী এ সংবাদে।

তবে রাখ। মাইনে ঠিক করেছ কিছু?

না। তুমিই যা হয় কর না গিয়ে।

সানন্দে মন্দাকিনী নীচে নেমে গেলেন।

কবিও বাইনাকুলার নিয়ে বেরুতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে অমরবাবুর চাকর মুন্সি এসে গোটা দুই বই দিলে তাঁর হাতে। অমরবাবু একটা ছোট চিঠিও লিখেছেন,—এই বই দুটো উলটে পালটে দেখবেন। সাধারণ পাখিদের অনেক খবর আছে এতে। আমাদের বাড়ির সামনে 'চোখ গেল' খুব ডাকছে। পাখিটাকে দেখতে পাই নি এখনও। একটু খুঁজলেই দেখতে পাওয়া যাবে। দেখতে চান তো আসুন।

কবি বই দুটো টেবিলে রেখে বেরিয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে।

ক্রমশ

"বনফুল"

ভূত-বালক-কথা

অস্তি বরিশালভুক্তৌ মুগঘট্টেতি জনপদঃ। তত্র চ মহাপ্রান্তরে বৃহদ্বটগাছাশ্রয়ঃ মামদো নাম ভূতঃ।

অস্য বটস্যাধস্তাৎ কাঁটাবুহরীঝোপা বর্তন্তে।* বালকা বুহরীলুব্ধাঃ ভৃশমত্রাগচ্ছন্তি, ইটলগুড়াদিভিস্তরুং তাড়য়ন্তি, ভূতস্য চ বিশ্রামবাধামুৎপাদয়ন্তি। অতোঽসৌ ভূতঃ মহাক্রুদ্ধঃ বালকঘাড়বিভাঙনেচ্ছুরেব কালং নয়তি।

তত্রৈকদা কাঁটাবুহরীকামঃ কশ্চিদ্বালকঃ গ্রীষ্মমধ্যাহ্নসময়ে তদ্বনং গতঃ। একাকিনমেনমায়ান্তমবলোক্য ভূতাশ্চিন্তয়ামাস, অহো মহাবসরো মেঽদ্য সমুপস্থিতঃ। এতৈর্বানরবৎসকৈরুত্যক্ত এব কালং হরামি। তদদ্যাস্য ভগ্নঘাড়শোণিতেন ক্রোধঃ মে উপশাম্যতু।

ইতি বিচিন্ত্য স ভূতঃ বিকটং ভেংচিতাস্যঃ প্রসারিতবাহুর্বালকমন্বধাবৎ। অচিরাচ্চৈনং দৃঢ়মুষ্ট্যা পপাকড়।

অথ তদ্বিধং ধৃতঃ স বালকঃ অত্যর্থং ভীতঃ উচ্চৈঃ ক্রন্দিতুমারেভে। ভূত আহ, চুপী ভব। ন চীৎকারৈস্তিলমপি ফলং লপ্স্যসে। ঘাড়ং তেঽদ্য ভাঙিষ্যামি।

তদ্ভমকাদ্বিস্তৃতলোচনঃ বালকঃ ফুঁপয়ন্নাহ, কস্মাত্তাঙিষ্যসি। কথং মে ঘাড়ভাঙ্‌তা ইতি।

ভূতেনোক্তম্, ভূতোঽহম্। অত্রৈব বটবৃক্ষে নিবসামি। ত্বদ্বিধানামুপদ্রবাৎ কদাপি স্বস্তিং প্রাপ্নোমি।

বালক আহ, অপি মমোপদ্রবাদেব। ভূত আহ, অরে রে চ্যাঙড়—

প্রত্যহং ঘুঘো দুর্বৃত্ত ভক্ষয়সি ধানানি মে।
ধৃতোঽসি ঘুঘো দুর্বৃত্ত নয়াম্যদ্য প্রাণান্ হি তে॥

বালক উবাচ, নৈবৈতৎ যুক্তম্। অস্তি ত তে চক্ষুর্দ্বয়ম্। পশ্যসি এব নাহং ঘুঘুঃ। ন চ ময়া ভক্ষিতানি তে ধানানি। তৎ কথমজ্ঞাতঠিকানস্য ঘুঘোরপরাধান্নিরপরাধস্য মে প্রাণা নীয়ন্তে। নূনং ন ময়াপরাদ্ধম্ ভবতি।

ভূতেন সঘাড়নাড়মুক্তম্, চালাকির্ন চলিষ্যতি। জানাসি সম্যক্ ঘুঘুরত্রোক্তমুপময়া, ধানানি চোপময়ৈব। অপি চ, ঘুঘব এব যূয়ম্, যদনুক্ষণমত্রাগত্য মমাধিকারাদ্বুহরাণি ভক্ষয়িত্বা পলায়েধ্বে।

বালক আহ, কিং ময়ৈব ভক্ষিতানি। অহং চেৎ ব্রূয়াম্, অদ্যৈব প্রথমমহমত্রাগতঃ, ন চ একমপি বুহরং মুখে পূর্তুং শক্তস্ত্বয়া বলাদ্ধৃতঃ।

* 'বুহরীবুহরমুহৈঃরৈচীতি বঙ্গপাশ্চমে'।

ভূত আহ, তথাপি হন্তব্যোঽসি, যতো বহূনামেকঃ বহোয়াচরণস্য ফলং ভুঙ্‌ক্তে। উক্তঞ্চ—

সর্পবিষং প্রাণঘাতী মানবাঃ সর্পঘাতিনঃ।
নির্বিষং গলিতদংষ্ট্রম্ কিং তে ছাড়ন্তি মারিতুম্॥

তীক্ষ্ণা চ মে শোণিততৃষ্ণা। তদ্‌বৃথা তে তর্কবিস্তারঃ।
ইত্যুক্ত্বা স ভূতস্তং বালকং ঘাড়ং ভাঙ্‌ক্ত্বা নিজঘাণ।
হন্যমানশ্চ বালকঃ সখেদমাহ, ওরে বাপ্‌ রে—

বৃক্ষাণি ন ভক্ষ্যাণি বুভুক্ষুঃ সাবধানো ভবেৎ।
বরং হি বাজারে ক্রয়ঃ, ন গচ্ছেত্তু তজ্জঙ্গলম্॥

অপি চ,

মূঢ়োঽহং নাস্মরং যস্মাৎ ন খলস্যাছিলাভাবঃ।
নেকড়েবাঘঃ অহংশ্ছাগং জলাঘুলনছুতয়া॥

তথা চ,

মাংসলোভী ছাগং হন্তি কিং তস্য ছাগক্রন্দনাৎ।
ক্ষুধামৃতে প্রজালক্ষে কিং বা রেশনমন্ত্রিণঃ॥

"সম্বুদ্ধ"

ওয়েসিস

মোর ক্যারাভান চলিয়াছে মরুপথে,
অর্ধ শতক চলেছে অহর্নিশ,
ভাঙিয়া পড়েছে তবুও তা কোনো মতে
ক্লান্ত চরণে খুঁজে চলে ওয়েসিস।
আসিয়াছে আঁধি উড়িয়াছে বালুঝড়,
তৃষ্ণাকাতর দেহ না চলিতে চায়;
মরীচিকা-টানে টেনেছে দিগন্তর,
উদর-ব্যথায় করিয়াছে, হায় হায়!
সন্ধ্যা ঘনায় সহসা নয়নে জাগে
ধূধূ মরুবুকে সজল শ্যামল শোভা,
প্রখর নয়ন মুদে আসে অনুরাগে—
মরুভূমি হয় অরণ্য মনোলোভা।
হায় রে ভ্রান্ত, এও ক্ষণ-মরীচিকা,
যাত্রীর ভালে শুধু দু-দিনের লিখা।

ক্ল্যাপ-স্টিক-কাব্য

আমার মনের স্টুডিওতে ভাই
শুটিং চলিছে রাত্রিদিন।
ডাইরেকশন একে একে দেয়
বিবেক হৃদয় মগজ মিলে।
শত শত ফিট জমেছে ফিলিম
কল্পনা আর স্মৃতির রীলে,
কাব্য-হাউসে প্রজেক্ট করিব
বিনা এডিটেই সে সব 'সিন'। ফেড ইন
এক এরোপ্লেন, শত ঘুড়ি উড্ডীন,
ক্লাউড মেয়ের ভিড়ে যেন হিরোয়িন। কাট্

ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপছি এবং উঠছি কভু ঘেমে,
ম্যালেরিয়া হয় নি আমার পড়েছি ভাই প্রেমে। কাট্

বিবাহেতে সুখী হবে সেই দম্পতি
বউ যদি কানা হয়, কালা হয় পতি। কাট্

বিবাহ যদি কর প্রেমেতে নাহি প'ড়ে,
প্রেমেতে তবে পড় বিবাহ নাহি ক'রে। কাট্

অলসরা প্রেমে পড়ে, খুব খাটি কথা,
প্রেমে যবে পড়ে সে
ছুটোছুটি করে সে,
থাকে নাকো আর তার কোন অলসতা। কাট্

তোমার প্রেমে পড়েছিলাম শনিবার
কিই বা তাতে ক্ষতি,
তোমায় আবার ভুলে গেলাম রবিবার
সত্যি কথা অতি। ফেড-আউট।

শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সংবাদ-সাহিত্য

ভোরবেলায় উদাত্ত ভদ্র-কণ্ঠে মাতৃস্তুতি শুনিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। শুনিলাম, দেবতাকুলের ঘোর বিপদের মধ্যে মহিষমর্দিনী মা কেমন করিয়া আবির্ভূতা হইলেন, কেমন করিয়া চরাচরে আনন্দরোল উত্থিত হইল, ধনধান্যে প্রাচুর্যে উৎসব-কোলাহলে বিশ্বভুবন ভরিয়া গেল। কিছুকাল ধরিয়া ঘরে বাহিরে সর্বত্র অভদ্রকণ্ঠে সর্ববিধ অভাব-অনটনের অনুযোগ শুনিতে শুনিতে বিবিধ আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া পড়িতেছিলাম। হঠাৎ-ভাঙা ঘুমের মধ্যে আনন্দপ্রাচুর্যের কথা মন্দ ঠেকিল না। মহিষমর্দিনী মাকে প্রণাম করিলাম।

* * *

পরক্ষণেই নানা দার্শনিক চিন্তা মনে উদিত হইল। যে মা মহিষাসুরের পিছনে ধাওয়া করিয়া খড়্গ বল্লম হাতে একবার ঘরের বাহির হইয়াছেন, তিনি কি আবার নাড়ু-মোয়া হাতে ঘরে ঢুকিয়া সন্তানপালিনী হইতে পারিয়াছেন? পুরাণের ধারা ধরিয়াই ইতিহাস; পুরাণ যাই বলুক, ইতিহাস অন্য কথা বলে। মা মহিষাসুরের রক্তমাখা মুণ্ডটা মাথায় তুলিয়া পথে পথে এখনও তাণ্ডব নৃত্য করিয়া ফিরিতেছেন, ঘরে ফিরিলে বাংলার জনসংভরণ-মন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের এত বিপদ হইত না, মায়ের কৃপায় তিনি সহজেই মায়ের সন্তানদের জন্য দুমুঠা অন্ন ও এক ফালি বস্ত্রের সংস্থান করিয়া দিতে পারিতেন, মন্ত্রীত্বের সৌকুমার্য রক্ষা করিতে অতুল্য-লাঞ্ছনা ভোগ করিতেন না; বাঙালী জাতির সর্বরোগহর কণ্ঠুদাবানল বিধানচন্দ্রকেও জ্ঞানাঞ্জনশলাকাহত হইয়া "মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়" গান করিতে করিতে শিলং পাহাড়ের জন্য অশ্রুবিসর্জন করিতে হইত না; অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন ময়মনসিংহী গর্জনেই কাজ হাঁসিল করিতে পারিতেন, হিন্দুস্থানের জীবনবীমায় ইস্পাহানের সাহায্য তিনি কদাচ লইতেন না; বাংলার শ্যামাপ্রসাদ রামপ্রসাদ হইয়া দিল্লীর পথে পথে রামধুন গাহিয়া ফিরিতেন না। মোটের উপর, আমাদের মা সেই যে বাহির হইয়া গিয়াছেন, আর ফেরেন নাই।

* * *

ইহাই বাস্তব ইতিহাস, পুরাণের কথা আমরা মানি না। চৌষট্টি বৎসর পূর্বে ১২৯১ বঙ্গাব্দে ঠিক এই পূজার সময় রবীন্দ্রনাথও কবিদৃষ্টিতে এই মহাসত্য অনুভব করিয়া "কাঙালিনী" কবিতায় লিখিয়াছিলেন,—

"মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব!
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গলকলস।...
আনন্দময়ীর আগমনে,
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।"

কিন্তু এও আজ প্রাচীন ইতিহাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাঙালিনীর জন্য মায়ের দোহাই পাড়িয়া যে ধনীদের কাছে কবি আবেদন জানাইয়াছিলেন—আবেদনই বা বলি কেন, দাবি জানাইয়াছিলেন—তাঁহারা আজ ম্যামথ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিলুপ্ত। দেশে আর ধনী নাই। ধনিক আছে, শ্রমিক আছে, আর সরকার আছে। ধনিকদের আজ চিনিবার জো নাই, চোরাবাজারের কৃপায় শ্রমিক ধনিক হইয়া শ্রমিকের সহিত বিবাদে মাতিতেছে। ইহারা দুই বিবদমান দল হইলেও ইহাদের শ্রেণী বা জাতের কোনও ঠিক নাই। পরান্নপুষ্ট বহু জমিদারকেও শ্রমিকের দালালি করিতে দেখা যাইতেছে—রাশিয়া হইতে এক বিচিত্র মুখোশের আমদানি হইয়াছে। সুতরাং কাঙালিনীরা আজও বাহিরেই দাঁড়াইয়া আছে। আমদানি-করা বহু বুলি ও স্লোগানের মাহাত্ম্য সত্ত্বেও দেশের আনন্দোৎসবে তাহারা প্রবেশাধিকার পায় নাই। চৌষট্টি বৎসরে তাহাদের সংখ্যা এক হইতে কয়েক কোটিতে দাঁড়াইয়াছে। ধনিক-শ্রমিকের বাজারে ধনীদের অভাব আজ অত্যন্ত বেশি অনুভূত হইতেছে।

* * *

এখন ভরসা এক সরকার। ধনীর উচ্ছেদে সরকারই এখন ধনী হইয়াছেন। সুতরাং কাঙালিনীদের সমস্ত দায়িত্ব সরকারে বর্তাইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা এখনও চরকা-খদ্দরের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া আছেন, স্বরূপে আবির্ভূত হইতেছেন না। ধনীর দরবারী চেহারা যতক্ষণ প্রকট

না হইতেছে, ততক্ষণ কাঙালিনীদের বিপদ। তাহারা কোথায় দাঁড়াইবে, কাহার নিকট কুনিশ করিয়া অভাব-দুঃখের কথা নিবেদন করিবে? তাই তাহারা অসহায়ভাবে কণ্ট্রোলে দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, কিউয়ে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। তাহাদের দেখিবার কেহ নাই। কণ্ট্রোলের চালের কাঁকর মন্ত্রীদের পাতানো কাঙালিনী মাতাদের অভিযোগ সত্ত্বেও দূর হইতেছে না—চাউল পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ আজ যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে সক্ষম ভাষায় সরকারের কাছে কাঙালিনীদের কথা নিবেদন করিতে পারিতেন, আমাদের ভাষার সে জোর নাই। আমরা শুধু কাতর প্রার্থনা জানাইতেছি—হুজুরেরা আর খদ্দরের মুখোশ পরিয়া গরিবদুঃখীদের ছলনা করিবেন না, আসাসোটা হাতে মুকুট মাথায় কিংখাবের চোগা দুলাইয়া এবার আত্মপ্রকাশ করুন, দোহাই আপনাদের, গরিবের সঙ্গে আর অশোভন ইয়ার্কি দিবেন না। পাঁজা মাইতি বর্মণ নস্করদের ছদ্মবেশ আমরা ধরিয়া ফেলিয়াছি প্রভু। আপনারা সকলেই বিধান-নলিনী হইয়া দরবারে অবতীর্ণ হউন, আমরা আপনাদের শরণ লইয়া বাঁচি। মহাত্মা গান্ধীর ঠেঁটিপরা ছবি দেখাইয়া রাজদরবারে রামধুন গাহিয়া আর আমাদের প্রতারিত করিবেন না—করিবেন না—করিবেন না।

* * *

দার্শনিকতা কখন নিদারুণ ভাবোচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়াছিল, সহসা বেতারযোগে রামধুন শুনিয়া মনে হইল—আজ ২রা অক্টোবর, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন। আজ মহালয়াও বটে। মহালয়ায় আমরা বিধিমতে পিতৃপুরুষকে স্মরণ করি। আজ জাতির পিতা গান্ধীজীকে শুদ্ধচিত্তে স্মরণ করিবার দিন। যিনি অসহায় অস্পৃশ্য সকল-অধিকারচ্যুত দরিদ্রদের জন্য ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, দরিদ্রদেরই আজ তাঁহাকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা করিবার কথা। কিন্তু আড়াইলাখী রাজাগোপালাচারী ও দেড়লাখী কাটজুরা দরিদ্রের প্রতিভূ হইয়া সমারোহের সহিত সেই কাজ সারিয়াছেন, দরিদ্রেরা আজ নিশ্চিন্ত হইবার অবকাশ পাইয়াছে। যে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার জন্য জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন, তিনিই আজ ভারতবর্ষের প্রধান রাজদরবারে এবং প্রাদেশিক দরবারসমূহে চিত্র ও মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন, তাঁহার পবিত্র দেহভস্ম

প্রধান প্রধান নদীজলযোগে ভারতবর্ষের মাটিকে সর্বত্র স্পর্শ করিয়াছে। তুক যত রকমে করিবার সকলগুলিই আমরা রাজকীয় সমারোহে করিয়া ফেলিয়াছি। আর আমাদের ভয় নাই। তাঁহার জীবনের সাধনা ছিল অকপটতা, সরলতা ও অনাড়ম্বরতা। মৃত্যুর পরে তিনি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ঐশ্বর্যের মধ্যে। এবার তাঁহার পূজা চলিবে, তাঁহার আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজন আমাদের ফুরাইয়াছে।

*　　　*　　　*

এখানে একটি সম্পূর্ণ নূতন গল্প মুদ্রিত করিতেছি। গল্পটির নাম "বাণী ও ভস্ম"; লেখক শ্রীভুবনমোহন সরকার।

"মহামানব প্রেমানন্দ মহাপ্রয়াণ করিবেন। প্রধান শিষ্যদের ডাকিয়া ঘরোয়া বৈঠকে সেই সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন।

বলিলেন, জগতের কাছে আমার যা বলার ছিল, আমি বলেছি। মানুষের মুক্তির পথ, আনন্দের পথ আমি নির্দেশ করেছি। সে পথে চলার দায়িত্ব তোমাদের—জগতের মানুষের। আমার কাজ শেষ হয়েছে। আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি।

বলিলেন, কিন্তু ভুলো না আমি দেহত্যাগ করলেও বেঁচে থাকব। বেঁচে থাকব আমার বাণীর ভেতরে—তোমাদের অন্তরে, তোমাদের কর্মে। যেখানে প্রেম থাকবে, ভালবাসা থাকবে, সহজ সরল অনাড়ম্বর নিষ্কাম জীবনাদর্শ থাকবে, সেইখানেই আমি বেঁচে থাকব।

শিষ্যগণ কোঁচার কাপড়ে চোখ ঢাকিয়া অধোবদন হইলেন।

শিষ্য মাধবানন্দ কহিলেন, আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক প্রভু। আপনার যাবার সময় হয়েছে, আমরা বাধা দেব না।

শিষ্য যোগানন্দ চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিলেন, না, বাধা দেওয়া আমাদের সঙ্গত হবে না।

শিষ্যা আনন্দময়ী নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

মহামানব শিষ্য ভাবানন্দের দিকে এক ঝলক অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটু হাস্য করিলেন। সরলকণ্ঠে বলিলেন, এই আমি আশা করেছিলাম। জানতাম, তোমরা বাধা দেবে না। তেমন শিষ্য তোমরা নও। তবে তাই হোক। আর একটা কথা। আমার মৃতদেহ সম্বন্ধে আমার কতকগুলি

নির্দেশ আছে। অক্ষরে অক্ষরে সেগুলি পালন করতে হবে। আমি নিজে হাতে নির্দেশপত্র লিখে রাখব।

সভা ভঙ্গ হইল। শিষ্যগণ উঠিয়া গেলেন। শুধু ভাবানন্দ উঠিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় আসিয়া মহামানব প্রেমানন্দের কাছে বসিলেন।

সব চ'লে গেছে?—মহামানব প্রশ্ন করিলেন।

হ্যাঁ।—ভাবানন্দ জবাব দিলেন।

ব্যবস্থা সব ঠিক আছে?

আছে।

মহামানব কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, জীবনে একবার মাত্র—এই প্রথম আমি মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছি। এ মিথ্যায় পাপ নেই ভাবানন্দ। কারণ এ মিথ্যার প্রয়োজন আছে। সত্যান্বেষী আমি, সত্য আমাকে জানতে হবে। আমার ধর্ম, আমার জীবনাদর্শের সঙ্গে এ মিথ্যার কোন বিরোধ নেই।

ভাবানন্দ বলিলেন, আমি বুঝেছি গুরুদেব।

মহামানব প্রেমানন্দের মহাপ্রয়াণের পর এক বৎসর পার হইয়াছে। এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর মহামানব প্রেমানন্দ ভাবানন্দকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। নিঃসংশয় হইয়া আসিয়াছেন যে, তাঁহার তিরোভাব সম্বন্ধে কোনদিকে কাহারও মনে কোন সংশয় ঘটে নাই। প্রথম বাৎসরিক শ্রাদ্ধ পর্যন্ত মহাসমারোহসহকারে সর্বত্র সম্পন্ন হইয়াছে, কোন প্রশ্ন ওঠে নাই। কোন শ্রাদ্ধবাসরে তিনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন।

ধীরপদক্ষেপে স্বীয় আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন। আশ্রমের শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি শুনা গেল।

কিসের শব্দ?—মহামানব জিজ্ঞাসা করিলেন।

পূজা হইতেছে।—ভাবানন্দ জবাব দিলেন।

কিসের পূজা? কোন বিশেষ দেবতার প্রতিষ্ঠা তো আমি করি নি।

ভাবানন্দ বলিলেন, এঁরা বোধ হয় করেছেন। জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে।

আশ্রমযাত্রী একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বিস্মিত এবং আহত হইলেন। বলিলেন, আপনারা এখানে নতুন এসেছেন?

হাঁ।

কিন্তু এও আশ্চর্য। তীর্থে এসেছেন, কোন্ তীর্থ জানেন না।—ভদ্রলোক অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, মহামানব প্রেমানন্দ যেখানে তিরোভাব করেছিলেন, সেখানে দিবারাত্রি আরতি হয়। জেনে রাখুন।

ভদ্রলোক দ্রুত অগ্রসর হইয়া গেলেন।

মহামানব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভাবানন্দের পানে তাকাইলেন। উভয়ে নীরবে চলিতে লাগিলেন।

একদল লোক আশ্রম হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। প্রেমানন্দ বলিলেন, ভুখ মিছিল ব'লে মনে হচ্ছে। দেখ তো। ভিখারীর দলও হতে পারে।

ভাবানন্দ একটি লোককে থামাইয়া ব্যাপারটি জানিতে চাহিলেন। বলিলেন, আশ্রমে কি আজ ভিখারী-বিদায় হচ্ছে?

লোকটি চটিয়া উঠিল, কি বলছেন মশাই? ভিখারী-বিদায় মানে? আমরাই ভিক্ষে দিয়ে এলুম। বুঝেছেন?

পাশের লোকটি নরমসুরে কহিল, ভিক্ষে নয়, চাঁদা। দুদিনের খাওয়ার খরচ বাঁচিয়ে চাঁদা দেবার হুকুম হয়েছিল। এখানে আমরা সবাই গরিব মানুষ তো! খাওয়া বন্ধ না করলে চাঁদার টাকা কোত্থেকে হবে? আর চাঁদা না হ'লে এই সব বড় বড় কাজ হবেই বা কি ক'রে?

কি কাজ?—মহামানব প্রশ্ন করিলেন।

অনেক কাজ।—লোকটি বলিল, দেশে দেশে আমাদের আশ্রমের শাখা-আপিস আছে। সেখানে টাকা পাঠাতে হয়। মাতা আনন্দময়ী যেখানে আছেন সেখানে খাঁটি গাওয়া ঘি বা দুধ কোনটাই নেই। একখানা উড়ো-জাহাজে রোজ দুধ আর ঘি পাঠাতে হয় তাঁর কাছে। স্বামী যোগানন্দ—

একটু ধীরে বল ভাই।—ভাবানন্দ বাধা দিয়া বলিলেন, একখানা উড়োজাহাজে তা হ'লে ঘি আর দুধ পাঠাতে হয়?

না পাঠালে চলবে কি ক'রে? মাতা আনন্দময়ীর আবার সাত্ত্বিক আহার তো? তা ছাড়া শুধু দুধ ঘিটাই—একমাত্র কথা নয়। এতে ক'রে বিদেশে আশ্রমের মর্যাদা অনেকখানি বেড়ে যায়।

মহামানব হঠাৎ চলিতে শুরু করিলেন। ভাবানন্দ সঙ্গ লইলেন।

আশ্রমে প্রবেশ করিতেই একজন আশ্রমবাসী অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, এই যে, এদিক দিয়ে আসুন।

কোথায়?—ভাবানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন।

আশ্রমবাসী একটু বিস্মিত হইল।—আগে দেখে নেবেন না?

কি দেখব?

আগন্তুকদের অজ্ঞতা আশ্রমবাসী ক্ষমা করিল। বলিল, মহামানব কোথায় বসতেন, কিসে বসতেন, কোথায় শুতেন, কি পরতেন, কি দিয়ে লিখতেন—এই সবই লোকে এসে আগে দেখে কিনা! অবশ্য আপনাদের অভিরুচি।

মহামানব প্রেমানন্দ এবার কথা বলিলেন, আমরা যত শীঘ্র সম্ভব, স্বামী মাধবানন্দের দেখা পেতে চাই।

তবে ওই দিকে যান।

আশ্রমবাসী সরিয়া গেল।

সুসজ্জিত কক্ষে স্বামী মাধবানন্দ দেখা দিলেন।

মহামানব নীরবে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

আপনারা বিলম্বে এসেছেন।—মাধবানন্দ কহিলেন, কিছু পাবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু বেশি নয়।

কি জিনিস?—ভাবানন্দ প্রশ্ন করিলেন।

জবাবে বাধা পড়িয়া গেল। একজন আশ্রম-কর্মী প্রবেশ করিয়া স্বামী মাধবানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিল, বাগদাদ থেকে চিঠি এসেছে। এক হাঁড়ি পাঠাতে অনুরোধ করেছে।

এক হাঁড়ি পারব না।—মাধবানন্দ হুকুম দিলেন, এক প্যাকেট রেজিস্ট্রি ক'রে পাঠিয়ে দাও।

আচ্ছা।—আশ্রম-কর্মী চলিয়া গেল।

কি জিনিস?—ভাবানন্দ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

স্বামী মাধবানন্দের দৃষ্টি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কিন্তু অসীম মনোবল তাঁহার। মুহূর্তে ক্রোধ দমন করিয়া প্রশান্ত বদনে বলিলেন, আপনারা কি ভস্ম নিতে আসেন নি?

কিসের ভস্ম?—মহামানবের রুদ্ধকণ্ঠ যেন ভাঙিয়া পড়িল।

মহামানব প্রেমানন্দের চিতাভস্ম, যা নিতে সকলে আসে। আপনারা কেন এসেছেন ?

ভাবানন্দ বলিলেন, ভস্ম নিতে হয় আমরা জানতুম না। আমরা এসেছি আপনার শ্রীমুখে মহামানবের বাণী শুনতে। তাঁর ধর্ম, তাঁর জীবন, তাঁর নির্দেশ আপনার জীবনে প্রতিফলিত দেখব, দেখে প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভ করব—এই আশা ক'রেই আমরা এসেছি।

তার অর্থ—মহামানবের ভস্মে আপনার বিশ্বাস নাই। কিন্তু আমরা বিশ্বাসী। অত সব বাণী, ধর্ম, জীবন, নির্দেশ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয় না, সময়ও কম। আচ্ছা, আসুন তবে।—মাধবানন্দ উঠিলেন।

দাঁড়াও। বজ্রকণ্ঠে মহামানব গতিরোধ করিলেন। ছদ্মবেশ খুলিয়া ফেলিলেন।

চিনতে পার ?

বিবর্ণ মৃতপ্রায় পতনোন্মুখ মাধবানন্দকে ভাবানন্দ ধরিয়া ফেলিলেন।

মুহূর্তমাত্র। মহামানব পুনরায় ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। অসীম ঘৃণাভরে কহিলেন, শোন্ মূঢ়, ভেবেছিলাম এই মিথ্যার তাসের ঘর ভেঙে দিয়ে আবার নূতন ক'রে সত্যের প্রতিষ্ঠা করব। সে ভুল আমার ভেঙেছে। সত্যের মৃত্যু হয়েছে। আমার মৃত্যুই তবে সত্য হোক।

ভাবানন্দের হাত ধরিয়া মহামানব দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।"

—

এবার পূজার "সার্বজনীন" ডামাডোল কিঞ্চিৎ কম। মনে হইতেছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্রের ভিত্তিতে আশাতিরিক্ত চাঁদার প্রলেপে যে "সার্বজনীনতা" গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে এবার ভাঙন ধরিয়াছে বোধ হয়। মনে হইতেছে, ইহা আসন্ন দুর্ভিক্ষের পূর্বলক্ষণ। চাচারা আপন বাঁচাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। রাষ্ট্রীয় শাসনদণ্ড যাঁহারা পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহারা এই ইঙ্গিত পাইয়া অবহিত হইতে পারেন।

—

এক বৎসর স্বাধীন হইয়া আমরা কি পাইয়াছি—এই প্রশ্ন করিলে তাহার বাস্তব জবাব হইবে—সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থা। ব্যবস্থা ভালবাসেন এরূপ লোকেরা বিদায়ীকৃত ইংরেজদের জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন,

এরূপ দৃশ্যও বিরল নয়। ইংরেজের ঘুষি আমরা যতটা রপ্ত না করিয়াছি, তাহাদের ঘুষপ্রথা আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজভক্তেরা বলিতেছেন, তাঁহাদের আমলে ঘুষে কাজ হইত, আজ ঘুষের মাত্রা চরমে উঠিয়াছে, কিন্তু কাজ হইতেছে না। নূতন কর্তারা শাঁখের করাত হইয়া জনসাধারণকে কাটিতেছেন।

* * *

অন্ন ও বস্ত্র বণ্টন ব্যবস্থার নিন্দা করিব না, কারণ এখনও অনশন ও উলঙ্গতা বরণ করিতে হয় নাই; কিন্তু শিক্ষাবিভাগে ও রেলওয়েগুলিতে যে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছে তাহার তুলনা হয় না। আবগারি-খাতে ট্যাক্স না উঠিলে যে দেশে শিক্ষাখাত শুষ্ক হইয়া যায়, সে দেশের গবর্মেণ্টকে ধিক্, শিক্ষিত মানুষ মাত্রকেই ধিক্। ভবিষ্যৎ জাতির গঠনকার্যে যাহাদের সহায়তা সর্বাধিক আবশ্যক, তাহাদিগকে আধপেটা খাইতে দিবার ব্যবস্থাও সরকার করেন নাই—অথচ সরকার বাহাদুরের কমিটি ও স্কীমের অন্ত নাই। টেক্স্টবুক কমিটির হাঁ দেখিলেই শিক্ষাব্যবসায় কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে অনুমান করা যায়। সরকার বৎসরের পর বৎসর শুধু স্কীমের পিছনেই টাকা ঢালিয়া আশ্রিতবাৎসল্য অভ্যাস করিতেছেন, যাঁহারা শিক্ষা দিবেন তাঁহাদিগকে বাঁচাইবার সামান্য প্রয়াসও তাঁহারা করিতেছেন না। স্বাধীন হইয়াও অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই।

রেলযোগে শিয়ালদহ হইয়া যাঁহারা যাতায়াত করিয়া থাকেন, পাকিস্তানের অব্যবস্থার অজুহাতে অলস ও আরামপ্রিয় হিন্দুস্থানী কর্মচারীরা সাধারণের কতখানি অসুবিধা ঘটাইতে পারেন, তাহা তাঁহারা বিশেষভাবেই অবগত আছেন। প্রভুরা দয়া করিয়া একটা ট্রেনের আগমন-নির্গমনের সময় জ্ঞাপন করেন না, বলিয়া বসেন—পাকিস্তান-আগত ট্রেন ও মালের কোনও সংবাদ তাঁহারা জানেন না, অথচ ট্রেন যথাসময়েই আসিয়া পৌঁছে—খবর করিয়া সাধারণের ক্লেশ লাঘব করাটাকে তাঁহারা কর্তব্যের মধ্যে ধরেন না।

সর্বত্রই এই নিদারুণ অব্যবস্থার স্পর্শ লাগিয়াছে—ইহাই আমাদের স্বাধীনতার লাভ। আমরা যেন সকল বিষয়ে কেমন শিথিল দায়িত্বজ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়াছি। যাঁহারা বর্তমানে গবর্মেণ্ট পরিচালনা করিতেছেন, পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহারা স্ব স্ব পদের স্থায়িত্ব রক্ষায় ব্যস্ত। দলাদলি-ভোট তাঁহাদের চিত্তের সবখানি অধিকার করিয়া আছে, তাঁহাদের সময় কোথায়?

শুনিতে পাই, আমরা অর্থাৎ জনসাধারণ আজ জাগ্রত, নিজেদের দাবি তাহারা আদায় করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু কাজের বেলায় দেখিতেছি, দুষ্কৃতিকারীকে পুলিসের কবল হইতে ছিনাইয়া লইবার এবং চলচ্চিত্র-প্রদর্শনীগৃহ-গুলিতে হাঙ্গামা বাধাইবার কাজেই তাহাদের চৈতন্য উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে সত্যকার প্রতিরোধ প্রয়োজন, সেখানে আমরা নিষ্ক্রিয়। সামান্য ব্যক্তিগত অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে বলিয়া মূল্য দিয়াও আমরা চোরা-কারবারীদের সমর্থন করিয়া চলিতেছি, সমবেতভাবে তাহাদের দমন করিবার কোনও চেষ্টার কথা শুনি নাই। আমরা সকলেই যেন প্রলয়ের মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। কিছুতেই কাহারও কিছু যায় আসে না। অব্যবস্থা ও অলসতায় কখনও স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না।

* * *

দেখিতে-পাইতেছি অতিরিক্ত লোভে আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ চেতনাহীন হইয়া পড়িয়াছি। বাংলা দেশে হিন্দুস্থান-পাকিস্তান বিভেদ অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিক অবস্থা আমরা নির্লোভ হইলে বেশিদিন টিকিত না। নিজের রাষ্ট্রের সর্বনাশ করিয়া হিন্দুস্থানীরা আণ্ডাবাচ্চানারীশিশুনির্বিশেষে পাকিস্তানের সহিত চোরা-কারবার করিতেছে—নদীয়া জিলার প্রত্যন্ত সীমানায় উপস্থিত হইলেই তাহা চোখে পড়িবে। আত্মহত্যার অসংখ্য দৃষ্টান্ত মালদহ-মুর্শিদাবাদের নদীপথে পাওয়া যাইতেছে। সাধারণ মানুষেরা এত লোভী হইলে গবর্মেণ্টের সাধ্য কি এই সর্বনাশ প্রতিরোধ করে। অথচ রাষ্ট্রানুগত্যের বিস্ময়কর আদর্শ সীমানার ওপারেই বর্তমান। সেখানকার মানুষেরা নিদারুণ আর্থিক কষ্ট সহ্য করিয়াও রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতেছে। আমরা যে ডালে বসিয়া আছি, প্রতিদিন তাহা সমবেতভাবে কর্তন করিয়া চলিয়াছি। কাটা ডাল লইয়া অপর পক্ষ ঘর বাঁধিতেছে—ইহাই হইল বর্তমান ইতিহাস।

নিজের রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ভুলিয়া যাহারা নিজের স্বার্থের বশবর্তী হইতেছে, সরকার তাহাদের শাস্তিবিধান অবশ্যই করিবেন; কিন্তু দেশসুদ্ধ গ্রামসুদ্ধ জিলাসুদ্ধ লোকে যদি তাহাদিগের সহিত সহযোগিতা করে, তাহা হইলে কাহারও কিছুই করিবার থাকে না। লোভ এখন সর্বগ্রাসী হইয়াছে, স্কুলের কচি-কচি ছেলেরাও ডবল কাপড় পরিয়া এপার ওপার করিতেছে।

লোভী ব্যবসায়ীরা আবহাওয়া এমনই বিষাক্ত করিয়া দিয়াছে যে, মানুষের আত্মকল্যাণবোধ নষ্ট হইয়াছে। ইহাই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান ট্র্যাজেডি!

হায়দ্রাবাদ সমস্যা মোটামুটি মিটিবার পর যদি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইত, তাহা হইলে ভারত-সমবায়-রাষ্ট্রের সত্যই কল্যাণ হইত। বাঙালী মুখে বদ্‌জোবান্‌ বলিলেও অন্তরে কখনই প্রাদেশিকতা সমর্থন করে নাই। করিলে, বাংলা দেশের প্রধান নগর কলিকাতায় বড়বাজারের পত্তন হইত না। নদীমাতৃক বাংলা দেশের খাল-পথে বাহির হইতে যে সকল কুমীরের আমদানি হইয়াছে, তাহারা বাংলা দেশের মৎস্য ভক্ষণ করিয়া বাংলা দেশেরই বালুতটে আরামে রোদ পোহাইয়াছে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুশাসনসত্ত্বেও বাঙালী কখনও তাহাদের তাড়না করে নাই।

আজ কয়েকটি ব্যাঙ্কের ব্যাপারে হঠাৎ ধরা পড়িয়া গিয়াছে—ইহারা নিরীহ কুমীর মাত্র নয়, আস্ত তিমিঙ্গিল। বাংলা দেশে বাঙালীরা ব্যবসা করিয়া খাইবে, ইহাও তাহারা বরদাস্ত করিবে না। ছলে-বলে-কৌশলে যে সকল প্রতিষ্ঠান বাঙালী ব্যবসায়ীদিগকে সাহায্য করে, সেগুলির সর্বনাশ সাধন করিয়া নিজেদের বাধার মূলোচ্ছেদ করিতে চাহিতেছে। বিধানচন্দ্র শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু আমরা দেখিতেছি, বিদ্বেষ ইহাতে কমে নাই। বাংলা দেশের বুকে বসিয়া যাহারা দাড়ি উপড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে প্রকাশ্য বিচারে তাহাদের যথোপযুক্ত শাস্তি হইলে দুষ্কৃতিকারীরা সাবধান হইতে পারিত। আমরা প্রাদেশিকতার সমর্থন মোটেই করিতেছি না, বাংলা দেশের মাটির রসে পুষ্ট হইয়া যাঁহারা বাংলা দেশের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে সজ্ঞান ও সচেতন করার কথাই বলিতেছি।

সত্যকার প্রাদেশিকতা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে বিহার, আসাম, উড়িষ্যায় বাংলা দেশ সম্পর্কে। একদা-উন্নাসিক বাঙালীর উদ্দেশ্য যে হীন ছিল না, তাহার প্রমাণ বিহার উড়িষ্যা ও আসামের সর্বত্র এখনও মিলিবে। এখনও এই সকল স্থানের শিক্ষাবিভাগ ও চিকিৎসাবিভাগ ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। বাঙালীর সামান্য অপরাধের যে শাস্তি স্থানীয় সরকারেরা বিধান করিতেছেন,

তাহা হীন প্রতিহিংসার স্তরে পৌঁছিয়াছে। এই মানসিকতা কোনও প্রাদেশিক রাষ্ট্রের পক্ষেই কল্যাণকর হইবে না।

* * *

একটি কথা মনে পড়িয়া গেল। ময়ূরাক্ষী নদীতে বাঁধ দেওয়া হইবে, বাঁধ দিয়া খাল কাটিয়া জলসেচের ব্যবস্থা করা হইবে, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করিয়া নানাবিধ শিল্পের প্রসার হইবে—ইহার জন্য পশ্চিম-বাংলায় তোড়জোড় শুরু হইয়া গিয়াছে। বীরভূমে ভাদুর গান গাহিবার সময়ে এবার গ্রামের কবিরা গাহিয়াছে, "ভাদু -টেরাকে (Truck-এ) পাথর বহাইতেছে মোরাক্ষিকে বাঁধিবে" ; কিন্তু ময়ূরাক্ষীর বিপদের অন্ত নাই। তাহার অনেকখানি বিহারের এলাকায় সাঁওতাল পরগনার ভিতর দিয়া বহিয়া আসিয়াছে। যেখানে ময়ূরাক্ষী বেলপাতা পরগনার দক্ষিণে পর্বতমালা ভেদ করিয়া সমতল ভূমিতে প্রবেশ করিতেছে, সেখানে একটি বড় বাঁধ দিলে তবেই সমগ্র ময়ূরাক্ষীর উন্নতির পরিকল্পনা সার্থক হইতে পারে। বীরভূমের মাটি ভাল নয়, জলসেচের ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে ; প্রাচীন পুকুরগুলি অযত্নে অর্থাভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ১৯৪০ হইতে ১৯৪৮-এর মধ্যে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য গবর্মেণ্টকে উনিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। এ অবস্থায় যত দ্রুত বাঁধ হয়, খাল হইতে জলসেচের ব্যবস্থা হয়, ততই ভাল।

কিন্তু শোনা যাইতেছে, মালিকানা স্বত্ব লইয়া গোল বাধিয়াছে। বিহার গবর্মেণ্টের অধিকারীবৃন্দের নাকি ভয় হইয়াছে যে, এরূপ ব্যবস্থা কাজে পরিণত হইলে অন্নাভাব ঘুচিবে সন্দেহ নাই ; কিন্তু ময়ূরাক্ষীর তীরবর্তী যে অংশ লাভবান হইবে, তাহার আনুগত্য বিহারের প্রতি বৃদ্ধি না পাইয়া বাংলার প্রতি বেশি বৃদ্ধি পাইবে। এই সম্ভাবনাকে নাকি তাঁহারা আদৌ ভাল চোখে দেখিতেছেন না, বরং নানাবিধ প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বাধার সৃষ্টি করিতেছেন।

উল্লিখিত সংবাদ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, দারিদ্র্য দূর করার চেয়ে জমিদারি রক্ষায় মন্ত্রীমণ্ডলের উৎসাহ বেশি। জমিদারি বজায় রাখিতে গিয়া যদি দরিদ্র চাষীকে দরিদ্রই রাখিতে হয়, তাহাতেও আপত্তি নাই। আমার গোয়ালের গরু যদি না খাইয়া মরিয়াও যায়, তবু দড়ি খুলিয়া পরের জমিতে তাহাকে ঘাস খাইতে দিব না, পাছে আমার গোবরের সারে

পরের মাঠ পুষ্ট হয়। এদিকে গরুকে খড় বা খইল খাওয়াইবার সামর্থ্যও আমার নাই।

আজ বৃদ্ধিশীল প্রাদেশিকতার পিছনে রাজনৈতিক জমিদারি-মনোবৃত্তির গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে মুক্তির উপায় এ নয় যে, রোগের মূল কি, তাহাই শুধু দেখাইয়া মানুষকে ক্রুদ্ধ করিয়া তোলা এবং একটা গোলমেলে বিপ্লব বাধানো। ইহা হইতে মুক্তির উপায় হইল, প্রাদেশিকতার বিরুদ্ধভাবকে জাগাইয়া তোলা এবং স্থির দৃঢ় কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে তাহাকে রূপায়িত করা।* যদি জাতির জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থ-ব্যাধির সংক্রামকতার পরিবর্তে দরিদ্রতম মানুষের স্বার্থপোষণকেই ধ্রুবতারার মত গ্রহণ করি, তাহারই প্রতি অবিচল দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কর্মের তরী পরিচালনা করি, তবে সাময়িকভাবে যে ক্ষুদ্রতার ঝড় বহিতেছে, তাহা তরণীকে উল্টাইলেও পথভ্রষ্ট করিতে পারিবে না।

ময়ূরাক্ষীর উপত্যকার যে অঞ্চল বিহারের এলাকাভুক্ত, তাহা বাংলার অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা না ভাবিয়াও আমরা উভয় প্রদেশের আর্থিক উন্নতি-কল্পে আশু ময়ূরাক্ষীর বাঁধ বাঁধার দাবি করিতে পারি। বাংলার গভর্মেণ্ট যদি এই সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হন, বাংলার কংগ্রেস যদি দারিদ্র্য-মোচনের সমস্যাকে মূল সমস্যা ভাবিয়া তাহার অনুকূল জনমত সৃজনে তৎপর হন, বাংলা প্রদেশের সীমা-বিস্তারের চেয়ে ইহাকে অধিক মূল্য দেন, তবে বিহারের গভর্মেণ্টও স্বেচ্ছায় বা পরেচ্ছায় অর্থাৎ কেন্দ্রের তাড়নায় হয়তো সেই শুভপথে চলিতে বাধ্য হইবেন।

দরিদ্রতমের কল্যাণকে ধ্রুব লক্ষ্য করিলে আমরা নিশ্চয়ই নানাবিধ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার মরুভূমি অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
২১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৫

গান্ধী-চরিত

দিনচর্যা

দুপুরে বিশ্রাম এবং সূতাকাটার পর গান্ধীজীর সাক্ষাৎকার এবং কথাবার্তার সময় হইত।

গান্ধীজী হিন্দুস্তানী ভাষায় কথাবার্তা বলিলেও লক্ষ্য করিতাম, গুজরাতী ভাষাতেই আলাপ করিতে বেশি ভাল বাসিতেন। শ্রীযুক্ত পিয়ারেলাল নায়ার ও তাঁহার ভগ্নী ডাক্তার সুশীলা নায়ার পঞ্জাবের গুজরাট জেলার অধিবাসী। আভা গান্ধীর নিবাস বাংলা দেশে বরিশাল জিলায়। ইঁহারা সকলে গুজরাতী মাতৃভাষার মতই বলিতে পারেন। অপরেও যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারা কোন রকমে গুজরাতী বলিতে পারিলে ওই ভাষাতেই কথা বলিতেন, গান্ধীজীও খুশি হইতেন। তাহা ভিন্ন অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে হিন্দুস্তানী বা রাষ্ট্রভাষাতেই গান্ধীজীর কথাবার্তা চলিত।

ইংরেজীতে সহজে গান্ধীজী কথাবার্তা চালাইতে চাহিতেন না। ১৯৪৫ সালের শেষভাগে সোদপুরে একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটে। জনৈক মহিলা গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলার সময়ে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করিতে থাকেন। তিনি গঠনমূলক কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, অতএব রাষ্ট্রভাষা শিক্ষা তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ছিল। গান্ধীজী হিন্দুস্তানীতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, ইংরেজী ভাষায় কেন, চীনা ভাষাতেও তো বলিতে পারিতে? মহিলাটি তখন বলিলেন যে, তিনি পূর্বে, অর্থাৎ কয়েক বৎসর আগে, গান্ধীজীর সঙ্গে ইংরেজীর মারফৎই কথা বলিয়াছিলেন। গান্ধীজী তাঁহাকে বলিলেন, হিন্দুস্তানী না বলিতে পার, বাংলায় বল, এবং আমি হিন্দুস্তানীতে উত্তর দিব। গান্ধীজী যে-সকল ভাষা বুঝিতেন অথচ বলিতে পারিতেন না, সেরূপ ক্ষেত্রে কথাবার্তা এইভাবেই চলিত।

কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে ইহার ব্যতিক্রম সর্বদাই ঘটিত। যাঁহাদের পক্ষে হিন্দুস্তানীতে বলা বা বোঝা কঠিন ছিল, তাঁহাদের সঙ্গে ইংরেজীতেই গান্ধীজী কথাবার্তা বলিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ঘরোয়া কথাবার্তা হিন্দুস্তানীতে চালাইতাম। কিন্তু রাজনৈতিক অথবা কোনও জটিল প্রশ্নের বিষয়ে আলোচনা

করিতে হইলে, আমার বর্তমান হিন্দুস্তানীতে কুলাইত না। একদিন মৌন-দিবসে গান্ধীজী আমাকে কোনও নির্দেশ হিন্দীভাষায় লিখিয়া দেন। তাহা পড়িয়া বুঝিতে এবং কাজ করিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া সেই অবধি গান্ধীজী আমাকে সব কিছু ইংরেজীতেই লিখিয়া দিতেন। এবং সেদিন বলিয়াছিলেন, এভাবে সময়ের অপচয় আমি পছন্দ করি না।

গান্ধীজীর হিন্দী খুব ভাল ছিল না। অর্থাৎ কাশী-এলাহাবাদ অথবা লখনৌ-দিল্লীতে যে হিন্দী বা উর্দু শিক্ষিত-মহলে শোনা যায়, তাহার মত লালিত্যপূর্ণ ছিল না। উহা শুদ্ধ অবশ্যই হইত, কিন্তু গুজরাতী বাগ্‌ধারায় আচ্ছন্ন থাকিত। কিন্তু তিনি যখন ইংরেজীতে কথা বলিতেন, তখন মনে হইত যেন প্রত্যেক বাক্যটি কোঁদাই করিয়া পরিপাটীভাবে বাহির হইতেছে।

অত্যন্ত গুরুতর বিষয়ে আলোচনার সময়ে লক্ষ্য করিতাম যে, তিনি আর শ্রোতার চোখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন না; অন্য দিকে, সচরাচর ঈষৎ নিম্নমুখে, দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উত্তর দিয়া যাইতেন। তাঁহার এইরূপ আত্মস্থ অবস্থাতেই ইংরেজী বাক্যগুলি শব্দচয়নের গুণে ও সুসম বিন্যাসের ফলে যেন ঝলমল করিয়া উঠিত।

যাঁহারা গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তাঁহারা নানা কারণে আসিতেন। কেহ হয়তো জটিল রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করিতে আসিতেন, কেহ বা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে উপদেশ লইয়া যাইতেন। আবার কেহ কেহ ধর্মসংক্রান্ত আধ্যাত্মিক বিষয়েও আলাপ-আলোচনা করিতে আসিতেন। কখনও কখনও আমাদের এমনও মনে হইত যে, প্রশ্নকর্তা শুধু একবার গান্ধীজীকে দর্শন এবং তাঁহার সহিত কথা বলিবার লোভেই উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু এমন মানুষও দেখিয়াছি, যাঁহারা কোনও বিশেষ সমস্যা মীমাংসার জন্য উপস্থিত হইয়া আপিসে বসিয়া গান্ধীজীর লেখা কোনও চিঠির নকল হইতে স্বীয় সমাধান পাইয়া গেলেন এবং গান্ধীজীকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া কেবল দর্শন ও প্রণামান্তে বিদায় লইলেন।

আপিসের বিষয় উল্লেখ করিলাম বটে, কিন্তু আপিস বলিতে দুই-একখানি স্টীল-ট্রাঙ্ক এবং সঙ্গের দুই-একজন সঙ্গীকে বুঝাইত। যিনিই দেখা করিতে আসুন না কেন, তিনি প্রথমে আমাদের নিকট সংবাদ লইতেন। পরিচিত ব্যক্তি হইলে আমরা সেদিনকার কার্যতালিকা দেখিয়া একটি সময় তাঁহার জন্য

নির্দেশ করিয়া দিতাম। অথবা ব্যস্ততা থাকিলে গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতাম, তিনি কখন সময় দিবেন। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে গান্ধীজী কলিকাতা থাকার সময়ে বলিয়া দিলেন, তিনি ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যা ভিন্ন অপর কোনও বিষয়ে পারতপক্ষে আলোচনা করিতে চান না। জনৈক অধ্যাপক সে সময়ে বয়স্ক-শিক্ষা সম্পর্কে আলাপের জন্য সময় প্রার্থনা করেন। গান্ধীজীর নির্দেশমত আমরা বলিতে বাধ্য হই যে, তিনি এখন অত্যধিক ব্যস্ত আছেন, দিল্লী হইতে ফিরিয়া নোয়াখালি যাইবার পথে অধ্যাপক মহোদয়ের সঙ্গে ভবিষ্যতে সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে সাক্ষাৎকার আর সম্ভব হয় নাই।

গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের নিয়ন্ত্রণভার আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহার জন্য কখনও কখনও অপ্রীতিকর কার্য করিতেও হইত। বেলেঘাটায় অবস্থানকালে একদিন এক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার পরনে সাধারণ কাপড়চোপড়, মুখে বসন্তের দাগ, ময়লা রঙ ও মাথায় বাবরি-কাটা চুল। তিনি গান্ধীজীর সহিত দেখা করিতে চাহিলেন। আমি প্রশ্ন করিলাম, আপনি কোন্ বিষয়ে আলোচনা করিতে চান, অর্থাৎ আপনার প্রয়োজন কি? ভদ্রলোক ইহার উত্তর দিতে অস্বীকার করিলেন। উপরন্তু বলিলেন, প্রয়োজন তাঁহার নহে, প্রয়োজন গান্ধীজীর। বারম্বার প্রশ্ন করায় যখন তাঁহার পরিচয় পাওয়া গেল না, তখন সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করিতে আমিও অস্বীকার করিলাম। ভদ্রলোক তখন আমার নিকট এক খণ্ড কাগজ চাহিয়া লইলেন এবং স্বীয় পরিচয় লিখিয়া আমার হাতে ফিরাইয়া দিলেন। পড়িয়া দেখিলাম তাহাতে লেখা রহিয়াছে, আমিই সেই নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। এ রকম এক-আধজন রসিক ব্যক্তি আসিতেন বলিয়াই আমাদের নিরবচ্ছিন্ন কর্মস্রোতের মধ্যে মাঝে মাঝে ছেদ পড়িত, আমরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতাম।

সাক্ষাৎকারের জন্য সময় বাঁধিয়া দেওয়া হইত। কাহাকেও পনেরো মিনিট, কাহাকেও আধ ঘণ্টা, কাহাকেও বা মাত্র পাঁচ মিনিট। যেদিন যাঁহার যাঁহার সহিত কথাবার্তা হইবে, তাহার একখানি তালিকা করিয়া পূর্বাহ্ণে গান্ধীজীর কাছে দিয়া আসিতাম; তিনি সেই অনুসারে কথাবার্তা বলিতেন। একদিন অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে অতিবাহিত হইতেছে; জনৈক আমেরিকান মহিলা নোয়াখালির পাশে ত্রিপুরায় দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সেবাকার্যে লিপ্ত থাকার সময়ে

গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শের জন্য আসিলেন। কথাবার্তা শেষই হইয়া গিয়াছিল, তবু তিনি হয়তো লোভের বশবর্তী হইয়া কথাবার্তা আরও একটু বিলম্বিত করিবার চেষ্টায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, How can I help in your mission? গান্ধীজী উত্তর দিলেন, By saving me every minute of my time। মহিলাটি ইশারা স্বীকার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পূর্বে গান্ধীজী কথাবার্তায় যতটা নিয়মবদ্ধ হইয়া চলিতেন, ইদানীং, অর্থাৎ শেষ বয়সে, যেন তাহাতে একটু ঢিলা পড়িয়াছিল। নোয়াখালি ও ত্রিপুরা পরিক্রমার সময়ে আমরা তখন বোধ হয় চর-শোলাদি গ্রামে উপস্থিত হইয়াছি। আমার ডেরা একটি তাঁবুর মধ্যে স্থিরীকৃত হইয়াছিল। দুপুরে এক নেপালী বৈরাগী আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিলেন যে, তিনি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান। প্রয়োজন কি, তাহা ব্যক্ত করিবেন না, অথচ আধ ঘণ্টার কম সময়েও চলিবে না। ব্যক্তিটির মাথায় কিছু ছিট ছিল; অবশ্য আমাদের অনেকের মাথাতেই আছে। আমি অনেক দর-কষাকষি করিয়া এক মিনিট সময়ে তাঁহাকে রাজি করাইলাম। সঙ্গে করিয়া গান্ধীজীর কুটীরে তাঁহাকে লইয়াও গেলাম। গান্ধীজী তখন রোদের দিকে পিঠ করিয়া ঘরের দরজার সামনে চরকায় সূতা কাটিতেছিলেন। বৈরাগীকে লইয়া গিয়া বলিলাম, দেখ ভাই, এক মিনিট মাত্র কথা বলিবে, নয়তো তোমায় আছাড় দিব (নতো তুম্‌কো পটক দুংগা)। গান্ধীজী শুনিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? আমি বলিলাম, ও কিছু নয়, আপনার শোনার দরকার নাই। ইনি কেবল আপনার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলিবেন, আমি ঘড়ি লইয়া দাঁড়াইয়া আছি। নেপালী বৈরাগীটি তখন গান্ধীজীকে প্রণাম করিয়া গভীর বেদনাভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্তরে তাঁহার শান্তি নাই, কেমন করিয়া শান্তিলাভ হইবে? হয়তো সত্যই বেচারীর হৃদয় দুঃখের ভারে পীড়িত হইয়া ছিল, তাঁহার চোখ অশ্রুসজল হইয়া পড়িল। আমিও অবনত হৃদয়ে নিজের শিবিরে ফিরিয়া গেলাম। গান্ধীজী তাঁহার সহিত এক মিনিট নয়, অনেক মিনিট কথা বলিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

এ রকম ব্যতিক্রম যে ঘটিত না, তাহা নহে। কিন্তু পূর্বে ইহা বিরল ছিল, ইদানীং হয়তো ইহার মাত্রা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ফলে সময়ে সময়ে আমাদিগকে রূঢ় হইতে হইত। বেলেঘাটা হইতে গান্ধীজী শেষবার যখন

বিদায় লন, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের ঘটনা হইবে—কোনও কোনও ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, সরাসরি আমাদের মত দ্বারপালকে অতিক্রম করিয়া গান্ধীজীর কাছে চলিয়া যাইতেন এবং সময়বিশেষে অসুবিধাও ঘটাইতেন। কোন বিশিষ্ট মারওয়াড়ী-ব্যবসায়ী-পরিবারের কয়েকজন সভ্য সেদিন ওইভাবে গান্ধীজীর নিকটে গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার নিকট কি সব প্রশ্ন করিলেন। গান্ধীজী তখন প্রয়োজনীয় লেখায় ব্যস্ত ছিলেন, সেই দিনই তাহা সমাপ্ত করিয়া ডাকে পাঠাইবার কথা। আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্য করিলাম, তাঁহার লেখা বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং আগন্তুক ভদ্রমহোদয়গণ যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা অত্যন্ত মামুলী। অর্থাৎ ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মিলন কি করিয়া হইবে, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি কেমন ভাবে সম্ভব, ইত্যাদি। তাঁহারা যে বিশেষ কোনও প্রয়োজনে আসেন নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। উপরন্তু তাঁহারা দ্বারপালকে লঙ্ঘন করিয়া আসার অপরাধে তো অপরাধী ছিলেনই। অতএব আমি গান্ধীজীকে বলিলাম, আপনার লেখা শেষ হইতে আর কত দেরি হইবে? তিনি বলিলেন, একটু দেরি হইতে পারে; ইঁহারা কথা বলিতেছেন। আমি তখন বলিলাম, কিন্তু আপনার লেখা তো শেষ করিতেই হইবে। ইঁহারা না হয় পাঁচ মিনিট কথা বলিয়া লউন, আমি ঘড়ি ধরিয়া আছি। তাহার পর আপনি লেখায় বসুন। পাঁচ মিনিটের অন্তে তিনি ভদ্রলোকগণকে বলিলেন, হাঁ, এইবার ভাই উঠিয়া যাও; এ তো আর বসিতে দিবে না। অর্থাৎ আমার দ্বারপালত্বের অধিকারে তিনি নিজেও হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেন না। শ্রীযুক্ত ঠক্কর বাপা বা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রমুখ ব্যক্তিগণের কথা স্বতন্ত্র; অপর কেহ সরাসরি তাঁহার নিকট কথাবার্তার সময়ের জন্য প্রার্থনা করিলে তিনি দ্বারপালের নিকটেই তাঁহাকে প্রেরণ করিতেন।

গান্ধীজীর কথোপকথনের সময়ে সম্ভব হইলে আমরা কেহ না কেহ থাকিতাম এবং কথাবার্তার মর্ম লিখিয়া লইতাম। পরে তাহা প্রবন্ধ বা রিপোর্টের আকারে লিখিয়া গান্ধীজীর কাছে হাজির করিতে হইত। তিনি সংশোধন করিয়া দিলে উহা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত হইত।

গান্ধীজীর কথোপকথনের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহার মধ্যে আমাদের সকলেরই শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তিনি প্রশ্নকর্তার কথা একমনে

শুনিয়া যাইতেন, মাঝখানে কোন কথা বলিতেন না। প্রশ্নকর্তা থামিলে হয়তো বা সময়ে সময়ে কোনও বিষয়ে অর্থ পরিষ্কার করার জন্য দুই-একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু প্রতিবাদ বা সংশোধনাত্মক কিছুই বলিতেন না। বক্তার কথা শেষ হইলে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাঁহার বক্তব্য শেষ হইয়াছে কি না? বক্তা 'হাঁ' বলিলে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেন, এবার কি আমি আরম্ভ করিতে পারি? Have you finished? Then, may I begin? ইহা তাঁহাকে কয়েক ক্ষেত্রে বলিতে শুনিয়াছি। দুই-এক ক্ষেত্রে, যেখানে হয়তো বক্তার দোষে তাঁহার প্রশ্নই স্পষ্ট হয় নাই, অথবা প্রশ্নের পরিবর্তে তিনি নিজে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সেই বিষয়ে গান্ধীজীর মতামত শুনিতে চান, সেরূপ অস্পষ্ট অবস্থায় গান্ধীজীকে এমনও বলিতে শুনিয়াছি, Let me repeat what you have said and see if I have understood you rightly। কখনও কোনও ইঙ্গিত বা আভাসেও তিনি জিজ্ঞাসুকে অসুবিধায় ফেলিতেন না; বরং তিনি যাহাতে স্বীয় প্রশ্ন স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে পারেন, সেই বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্যই করিতেন। এবং আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নিজের প্রতিকূল কোন সত্যের আভাস পাইলে তাহা স্বীকার করিতে শুধু পশ্চাৎপদ হইতেন না এমন নয়, বরং আগ্রহভরে তাহাকে স্বীকার করিবার জন্যই যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। একদিন মনে আছে, অত্যন্ত গুরুতর রাজনৈতিক কোনও প্রশ্নের আলোচনাকালে জনৈক বিশিষ্ট দেশনেতা গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, Do you think there has been a change of heart? গান্ধীজী বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, Through bitter experience I feel there has been no change of heart, but I think there has been a change of policy। এ জাতীয় সত্য স্বীকার করিতে কখনও তাঁহার বিলম্ব ঘটিতে দেখি নাই।

কিন্তু ইহার ফলে কেহ যেন মনে না করেন যে, গান্ধীজীকে স্বীয় আসন হইতে সহজে বিচ্যুত করা যাইত। বস্তুত তাঁহার একটি বিশেষত্ব ছিল যে, নানা ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও তিনি স্বীয় লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হইতেন না। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে মুসলিম লীগ কর্তৃক বাংলা দেশে 'ডিরেক্ট অ্যাকশন' আরম্ভ হইবার পরে বাংলার লীগ গভর্মেণ্টের উপরে আর কাহারও

আস্থা রহিল না। তাহার পর নোয়াখালির বিপর্যয় ঘটিল এবং তাহার পর বিহারে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুসলমান-সম্প্রদায়ও গভীর আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। গান্ধীজী অক্টোবর মাসে কলিকাতায় আসিলে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী সুহরাবর্দি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহারই মারফৎ প্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মত ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা সাক্ষাৎ আইন-অমান্য-আন্দোলনের দ্বারা গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ না হইতেছি, ততক্ষণ গভর্মেণ্টকে স্বীকার করিয়া চলিতেছি। এবং নির্বাচন-পদ্ধতিকে (১৯৩৭ সালের) যখন স্বীকার করিয়া লইয়াছি, তখন বাংলায় লীগ গভর্মেণ্টকেও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, সেই গভর্মেণ্টের নিকট ন্যায্য দাবি আদায় করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সে সময়ে গান্ধীজীর সহিত যাঁহারা সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন তাঁহারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন যে, বর্তমান গভর্মেণ্টের কাছে কোনও প্রতিকারের চেষ্টা নিষ্ফল। তাঁহারা সেরূপ চেষ্টার বিফলতার দৃষ্টান্ত দিতেন, গান্ধীজীকে বারংবার নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। গান্ধীজী তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা স্বীকারও করিতেন। কিন্তু বলিতেন, আচ্ছা, যে অসহযোগ নীতি আপনারা বাংলায় হিন্দু-সম্প্রদায়কে অনুসরণ করিতে বলিতেছেন, বিহারের মুসলমান-সম্প্রদায়কেও কি তাহা তেমনইভাবে স্থানীয় কংগ্রেস গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ধারণ করিতে বলিবেন? তাঁহারা কংগ্রেস গভর্মেণ্ট ও লীগ গভর্মেণ্টের মধ্যে পার্থক্য কোথায় তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন এবং গান্ধীজীকে পরামর্শ দিতেন। তিনি যেন সরকারী প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়া কংগ্রেসের মারফৎ বাংলায় দুরবস্থা নিরাকরণের চেষ্টা করেন। গান্ধীজীকে একদিন বলিতে শুনিলাম, But where is the Congress? It seems to be going to pieces। তাহার পর বলিলেন, জনসাধারণকে স্বীয় গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে, এবং সেই উদ্দেশ্যে আজও প্রতিকারের চেষ্টা নির্বাচিত মন্ত্রীসভার মারফৎই করিতে হইবে। বন্ধুগণ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, ফল তো হইবেই না, উপরন্তু সময়ের অপব্যয় হইবে। গান্ধীজী উত্তর দিলেন, I understand your point of view; but you see, I am made in a different way। এবং ইহার পর নিজে যে পথ নির্বাচন করিয়া লইয়াছেন, তদনুসারে চলিতে লাগিলেন। ব্যক্তিগতভাবে আমার সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য

লাগিয়াছিল এই ভাবিয়া যে, সমগ্র তর্কের মধ্যে তিনি অপর পক্ষের মতকে একবারও খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন নাই। অপর পক্ষের যুক্তির মধ্যে দুর্বলতা থাকিলে তাহার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন নাই; বরং স্বীয় মতের সপক্ষে যুক্তিই কেবল প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। ফলে উভয়ের স্ব স্ব মতানুযায়ী অগ্রসর হইবার স্বাধীনতা বজায় থাকিত, মতভিন্নতার জন্য কোনও তিক্ততার সঞ্চারও হইত না।

নোয়াখালি জেলায় আর একটি সাক্ষাৎকার বা পরামর্শের কথা আমার মনে আছে। গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে প্রস্তাব হইল যে, প্রতি গ্রামে হিন্দু এবং মুসলমান প্রতিনিধিদের লইয়া শান্তি-সমিতি রচিত হইবে এবং সেই সমিতির পরামর্শ অনুযায়ী পুলিস অপরাধীকে গ্রেপ্তার করিবেন; উপরন্তু উক্ত সমিতি জনসাধারণের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য বিস্তৃতভাবে প্রচারকার্যও চালাইবেন। হিন্দু নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীকে জানাইলেন যে, অধিকাংশ গ্রামের শিক্ষিত বা নেতৃস্থানীয় হিন্দু পলাতক, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যাহারা চক্রী বা দুর্ধর্ষ তাহাদেরই নাম শান্তি-সমিতিগুলির প্রস্তাবিত তালিকায় স্থান পাইয়াছে। দুর্বল অশিক্ষিত হিন্দু ধোপা, নাপিত, মালী যদি ওই সকল ব্যক্তির সহিত এক সমিতিতে স্থান পায়, তবে সেরূপ সমিতি প্রকৃত অপরাধীর দণ্ডবিধান বা ধর্ষিত হিন্দুর মনোভয় দূর করিতে অসমর্থ হইবে। গান্ধীজী সমগ্র যুক্তি শুনিয়া বলিলেন, ইহা শান্তি-সমিতি স্থাপনের বিরুদ্ধে যুক্তি নয়; বর্তমান অবস্থায় শান্তি-সমিতিগুলি গড়ার বিরুদ্ধে যুক্তি। কিন্তু আমরা তো গণতন্ত্রকেই দৃঢ় করিতে চাই। অতএব আজ ওই অশিক্ষিত ধোপা-নাপিতদের পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নেতা না বলিয়া অশিক্ষিত জনসমূহের মধ্যেই উপযুক্ত মানুষ গড়িয়া তুলিতে হইবে। শান্তি-সমিতি গঠিত হউক, তৎসহ আমাদিগকে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে, কি করিয়া দুর্ধর্ষ বলবান ও শিক্ষিত মুসলমানের সহিত একাসনে বসিয়া অশিক্ষিত হিন্দু ধোপা-নাপিতও গ্রামের শান্তিরক্ষার জন্য সম্যক্‌ভাবে কার্যপরিচালনা করিতে পারে। ইংলণ্ডের ইতিহাসের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সেখানেও এইভাবে গণতন্ত্রের শিক্ষা বিস্তারের জন্য শত-শতবৎসরব্যাপী চেষ্টা করিতে হইয়াছে; আমাদিগকেও হইবে। কিন্তু দ্রুত কার্যসিদ্ধির জন্য যদি আমরা অন্য কোনও পথ খুঁজি, তাহার দ্বারা গণতন্ত্রের ভিত্তিনির্মাণের কার্য দুর্বলই থাকিয়া যাইবে। আপাতত

কার্যসিদ্ধি হইতেও পারে, কিন্তু স্থায়ী কল্যাণের বুনিয়াদ গঠনের জন্য অন্য দিকে মন দেওয়া দরকার।

এই জাতীয় যুক্তি তাঁহার মুখে প্রায়ই শুনিতাম। তিনি স্বীয় পথের সপক্ষে এই কথাই বলিতেন, I am made differently। অপর পক্ষকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং নিজের পথেই কি ভাবে আরও ভাল করিয়া চলিতে পারেন, তাহারই অনুসন্ধান করিতেন।

গান্ধীজীর রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমার অনেক সময় নারদীয় ভক্তিসূত্রের অন্তর্গত একটি সূত্রের বিষয়ে স্মরণ হইত: তস্মিন্নন্যতা তদ্বিরোধী যূদাসীনতা চ।২।৯। অর্থাৎ যে আশ্রয়কে অবলম্বন করিয়া মানুষ চলিয়াছে, তাহা ত্যাগ না করিয়া, বিরোধী আশ্রয়সমূহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব পোষণ করিলে তবেই সাধনে দৃঢ়তা জন্মে, এবং সাধনে দৃঢ়তা জন্মিলে ভাবেরও গভীরতা বৃদ্ধি পায়।

গান্ধীজীর মধ্যে এই আচরণ ফলিতভাবে প্রকাশলাভ করিত।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

ধর্মমঙ্গল উপাখ্যানের উৎপত্তিকাল

ধর্মমঙ্গলের প্রধান নায়ক লাউসেন। যদি ধর্মমঙ্গল উপাখ্যানের ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকে, তবে লাউসেন ঐতিহাসিক ব্যক্তি এবং লোকপরম্পরায় তাঁহার নাম ও অবদান কবিগণের মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য হইয়াছে। কিন্তু বাংলার কোন প্রামাণিক ইতিহাসে লাউসেনের কোন পরিচয় নাই। শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বৈশাখ-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে লাউসেনের প্রসঙ্গে যে ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত দিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে টিকিতে পারে না। তাঁহার অবলম্বন ধর্মমঙ্গলের উপাখ্যান। তিনি ইহার সহিত রাজেন্দ্র চোড়ের তিরুমলৈ লিপির উল্লিখিত দণ্ডভুক্তির রাজা ধর্মপাল ও উত্তররাঢ়ের মহীপালকে জড়াইয়া কল্পনার সোনার কাঠির সাহায্যে এক ইতিকথা রচনা করিয়া বিজ্ঞ ঐতিহাসিকের মত লিখিয়াছেন, "কর্ণসেনের পুত্র লাউসেন মহীপালের সহায়তায় যুদ্ধে ইছাই ঘোষকে বধ করিয়া পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন।" কিন্তু আমি বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোনও ধর্মমঙ্গলে মহীপালের নাম পাইয়াছেন কি, কিংবা কোনও শিলালিপি বা প্রাচীন

পুস্তকে মহীপালের সহিত লাউসেনের কোন উল্লেখ দেখিয়াছেন কি? কাজেই তিনি যে লিখিয়াছেন, "পালসম্রাট প্রথম মহীপালের সময়েই ধর্মপূজা প্রবর্তিত হয়, এ কথা জোর করিয়া বলা চলে", তাহার কোন ঐতিহাসিক জোর নাই।

সমস্ত ধর্মমঙ্গলের মতে গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা-পুত্র লাউসেন। কিন্তু এই গৌড়েশ্বর কে? কোনও ধর্মমঙ্গলে তাঁহার নামটি নাই। ঘনরাম তাঁহার ধর্মমঙ্গলে বলেন যে, রাজা ধর্মপালের ক্ষেত্রজ পুত্র এই গৌড়েশ্বর (ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৫০)। এই মতে লাউসেন রাজা দেবপালের সমকালীন হন, মহীপালের নয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঘনরাম কল্পনা হইতে কিংবা ভুল কিম্বদন্তী অনুসারে ধর্মপালের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তবে কি লাউসেনও কোন কবির স্বকপোলকল্পিত?

তিব্বতী পুস্তকে এক লবসেনের নাম পাওয়া যায়। তিনি রাজা যক্ষপালের মন্ত্রী ছিলেন। পরে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং গৌড়ের রাজা হন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশিত History of Bengal, পৃ. ৩৩৬)। বাংলার পঞ্জিকাকারগণ লাউসেনকে কালকালের রাজচক্রবর্তীদিগের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করেন। তিব্বতীর লবসেনকেই আমরা লাউসেন বলিয়া নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করিতে পারি। শিলালিপিতে লবসেনের নাম পাওয়া যায় নাই; কিন্তু যক্ষপালের নাম পাওয়া গিয়াছে (ঐ History of Bengal, পৃ. ১৪৯; Indian Antiquary, XVI, 64)। এই যক্ষপাল রামপালের সমসাময়িক হইতে পারেন। তিব্বতী লেখক তারানাথের মতে তিনি রামপালের মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে রাজা হন (ঐ পাদটীকা)। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র আচার্য তিব্বতী গ্রন্থের সাহায্যে গৌড়ের যে রাজতালিকা দিয়াছেন, তাহাতে রামপালের পর যক্ষপালের নাম লিখিত আছে। তিনি তাঁহার রাজ্যকাল ১১৩৮-১১৩৯ খ্রীঃ অব্দ দিয়াছেন (History of the Mediaeval School of Indian Logic, Appendix B)। রামপালের রাজ্যকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের History of Bengal (পৃ. ১৭৭) মতে ১০৭৭—১১২০ খ্রীঃ অব্দ।

৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে (J. B. O. R. S., XIV, 538) ১০৫৭—১১০২ খ্রীঃ অব্দ।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে (I. H. Q., VI, pp. 167, 168) ১০৭৮—১১২০ খ্রীঃ অব্দ।

৺সতীশচন্দ্র আচার্যের মতে ১০৯২—১১৩৮ খ্রীঃ অব্দ।

শ্রীপ্রমোদলাল পালের মতে (Early History of Bengal, p. 75) ১০৮০—১১২৩ খ্রীঃ অব্দ।

রামপালের পর যক্ষপাল, তৎপরে লবসেন। কাজেই তিনি পাল-রাজাদের শেষ সময়ে এবং সেন-রাজাদের আদি সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। রামাই পণ্ডিত তাঁহারই সমকালীন। সুতরাং সেন-রাজাদের সময়ে ধর্মপূজার প্রবর্তন বলিয়া আমি যাহা লিখিয়াছি, সেটা ঠিকই। রাঢ়ে ধর্মপূজার প্রাদুর্ভাব হয়; সেখানে তখন সেনবংশের রাজত্ব ছিল, পালেদের ছিল না। রামাই পণ্ডিত বিজয়-সেন বা বল্লালসেন বা উভয়ের সমকালবর্তী ছিলেন। ধর্মমঙ্গলের উপাখ্যানের উৎপত্তি এই সময়েই।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

আগামী পথের যাত্রী

দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের গতি তখন মিত্রশক্তির অনুকূলে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের ফলে বঙ্গজননীর অঙ্ক থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে পঞ্চাশ লক্ষ সন্তান। উত্তর-ভারতীয় বণিককুলের শোষণে এবং প্রতিক্রিয়াশীল লীগমন্ত্রীসভার শাসনে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক জীবনে নেমে এসেছে হতাশার ছায়া। এমনই সময় স্বজন-পরিত্যক্ত এবং ভাগ্য-আহত একজন বাঙালী যুবক সৈন্যসংগ্রাহক দপ্তরে গিয়ে ব্রিটিশ-ভারতীয় সৈন্যবিভাগে পেশাদার সৈনিক হিসেবে কাজ করবার জন্য দাসখত দিয়ে এলেন। অন্তরে তিনি জানতেন, জাতীয় প্রয়োজনের দিক থেকে এ সংগ্রাম তাঁর নয়, কারণ তা হ'লে যাঁদের নির্দেশ এবং সহযোগিতায় ভারতবর্ষ এ সংগ্রামে সর্বাধিক সাহায্য করতে পারত, সেই দেশবরেণ্য মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু প্রভৃতি জননেতৃকুল কারাগারে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হতেন না। পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য জার্মানি ও জাপান এ যুদ্ধের সূচনা করেছে, এবং বহুকালের প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য ইংরেজ অবতীর্ণ হয়েছে এ সংগ্রামে; সঙ্গে দোসর জুটেছে ডলার-সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা। বৃহৎ শক্তিগুলির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মতবাদগত

আগামী প্রতিষ্ঠার স্পৃহাই এ সংগ্রামের কারণ। পরাধীন ভারতের পক্ষে নীতিগত বা প্রয়োজনগত কোন দিক থেকেই এ সংগ্রাম তার নিজস্ব নয়, তবু পারিপার্শ্বিকতার প্রতিকূলতায় যুবক অনন্যোপায় হয়ে প্রতিজ্ঞাপত্রে সই ক'রে সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এলেন মেসে।

পরের দিন সকালবেলায় স্নানাদি সেরে, বিছানাপত্র গুছিয়ে এবং মেসের লেনদেন চুকিয়ে যুবক যাত্রা করলেন কর্তৃপক্ষের পূর্বনির্দেশমত আধাসামরিক শিক্ষার্থী-কেন্দ্রে। পরিচয়পত্র প্রদান করবার পরে একজন পাঞ্জাবী মুসলমান সুবেদার সাহেব যুবককে নিয়ে উপস্থিত হলেন এক ইহুদী ক্যাপটেন সাহেবের সামনে। মোটামুটি দু-একটি কথা জিজ্ঞাসা ক'রে ক্যাপটেন সাহেব যুবককে পাঠিয়ে দিলেন শিক্ষার্থীদের আস্তানায়। আস্তানায় এসে যুবক ভাবতে বসলেন, সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ জীবনের সঙ্গে কি ক'রে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, তিনি প্রকৃত সৈনিক হতে পারবেন কি না, তিনি কি শুধু চাকুরি রক্ষার খাতিরে ব্রিটিশ শাসকের দাসানুদাস হয়ে জীবন কাটিয়ে দেবেন, না, সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতাকে আগামী দিনে সফল ক'রে তুলবেন দেশের এবং দশের কল্যাণে?

আশ্চর্য, ভাগ্য-বিড়ম্বিত বাঙালী যুবক একান্ত পেটের দায়ে যোগ দিয়েছেন ব্রিটিশ-ভারতীয় পেশাদার সৈন্যবিভাগে, কিন্তু অন্তর তবু তাঁর স্বীকার করছে না এ অবাঞ্ছনীয় জীবনকে; কারণ হয়তো স্বাভাবিক। তিনি অস্বীকার করতে পারছেন না তাঁর রক্ত, তাঁর সংস্কৃতি এবং তাঁর প্রাকৃতিক পরিবেশ। তিনি বাঙালী, তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন্দ্রনাথ এবং মহাবিপ্লবী সূর্য সেনের স্বজাতি। হয়তো তাই এ যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সামরিক বিভাগের দ্বার বাঙালী জাতির কাছে রুদ্ধ ছিল, কারণ, শ্বেতধুরন্ধরদের সাম্রাজ্যরক্ষাবিধান-পুস্তকে সামরিক কৃতিত্বে বাঙালী অক্ষম ছিল না, ছিল অবাঞ্ছনীয়—কারণ বাঙালী ছাড়া বোধ হয় আর কোন ভারতীয় জাতি জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য ক'রে চরম পাঞ্জা লড়ে নি শাসক ইংরেজের বিরুদ্ধে। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী বাঙালীকে প্রমাণ করা হয়েছিল অসামরিক জাতি হিসেবে। কিন্তু ইংরেজ পলাশীর মাঠে সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে লড়েছে বাঙালী পদাতিকের সাহায্যে, উড়িষ্যা জয় করেছে বাঙালী গোলন্দাজদের সহায়তায়, আসামে বেনিয়া কোম্পানির ফৌজ প্রেরিত হয়েছিল বাঙালী সৈনিকের সহযোগিতায়। ইংরেজ জাত স্বার্থ এবং

সুযোগ সম্বন্ধে খুবই সচেতন, তাই প্রয়োজনমত সত্যকে অসত্য ব'লে প্রমাণ করতে এবং অসত্যকে সত্য ব'লে প্রমাণ করতে ইংরেজ-চরিত্র কোনদিন অক্ষম হয়ে পড়ে নি।

পাঞ্জাবী, গুর্খা প্রভৃতি জাতির জন্ম ইংরেজ-আমলে সামরিক বিভাগের দ্বার ছিল উন্মুক্ত, কারণ আঠারো টাকা এবং ডাল-রুটির জন্ম চরম আনুগত্য আর কে জানিয়েছে বর্তানিয়া সরকারের কাছে? ভিক্টোরিয়া-ক্রস-প্রাপ্ত সিপাই খোদাদাদ খানের চাইতে শহীদ বাঘা যতীন সৈনিক হিসেবে হেয় নন, তবু শাসক ইংরেজের বিচারে—একজন সাম্রাজ্যবাদের কাঁটাস্বরূপ, আর একজন শাসকের পদলেহী দাসানুদাস। অবশ্য সামরিক বিভাগে চাকুরে বাঙালীও, প্রয়োজনমত কম যোগ্যতার পরিচয় দেন নি। উদাহরণস্বরূপ বিমান-বিভাগে উইংকমাণ্ডার শ্রীযুত মজুমদার এবং স্থল-বিভাগে ব্রিগেডিয়ার শ্রীযুত রুদ্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে বুটের লেফ্ট্-রাইট্-খটাখট্ ছন্দে, টাইপ-রাইটার মেশিনের টকাটক আওয়াজে, এবং টেলিগ্রাফের টরে-টক্কা-টরে-টক্কা-টক্কা নিনাদে। সকালবেলায় প্যারেড-গ্রাউণ্ডে পাঞ্জাবী মুসলমান সুবেদার হাঁকেন—"ইয়ে বঙ্গালীও কমজোরও ছাতি খুলকে আগে চলো," দুপুরবেলায় আধাসামরিক কমার্শিয়াল কলেজের বেসামরিক বাঙালী প্রিন্সিপাল মিঃ সেন হাঁকেন—"You boys, pack of wolves"। কিছু আবেদন-নিবেদন করতে গেলে আর একটু বেশি কড়া মেজাজে বলেন—Shut up, keep quiet, I am terribly annoyed with you। তাঁর ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের মনে হ'ত, মানুষকে অযথা আঘাত ক'রে যে দলের লোকেরা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, তিনি তাঁদের দলের সভাপতি। অপরাহ্ণে অর্ডালি-রুমে ন্যায়ের আসনে সমাসীন হয়ে ইহুদী ক্যাপটেন সাহেব অপরাধীদের বিচার করতেন। অপরাধগুলি মোটামুটি এই ধরনের ছিল, বিকেলবেলায় বেড়াতে বেরিয়ে ফিরে আসতে কার নির্দিষ্ট সময় থেকে তিন সেকেণ্ড দেরি হয়েছিল, রাত্রে ঘুমোবার সংকেতিক ধ্বনি হওয়ার পরে কে সিগারেট খেয়েছিল ইত্যাদি। আমাদের সৈনিককেও একদিন দুপুর রোদে আধ ঘণ্টা এক্স্ট্রা ড্রিল করতে হয়েছিল, কারণ তাঁর উদ্যোগে বাঙালী শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্র-স্মৃতি-ভাণ্ডারে চাঁদা পাঠিয়েছিলেন। ইহুদী ক্যাপটেন সাহেবের বিচারে অসঙ্গত সাব্যস্ত হওয়ায় তিনি সৈনিকের

উপর শাস্তির হুকুম দিয়েছিলেন। এমনই ধারার জীবনের দৈনন্দিন সংঘাতে বহু বাঙালী যুবকের সঙ্গে আমাদের সৈনিকও কাটিয়ে দিলেন দেড় বছর। যাঁরা তাঁর আগে এসেছিলেন তাঁরা কেউ কেউ এখনও র'য়ে গেছেন শিক্ষার্থী-কেন্দ্রে, এবং যাঁরা তাঁর পরে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে চ'লে গেছেন দেশ-দেশান্তরে—বোম্বাই, বন্দর আব্বাস অথবা সুদূর কায়রোয়।

পথে বহু নবীনতম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ক'রে ক্লান্ত শরীরে সৈনিক এসে পৌঁছলেন মধ্যভারতে জব্বলপুরে, এখানে একটি সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রে তাঁকে নিতে হবে উচ্চ সামরিক শিক্ষা। পুরানো বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনই এখনও তাঁর সঙ্গে আছেন। নতুন ক'রে বিভিন্ন প্রদেশবাসী বহু জনের সঙ্গে তিনি হলেন পরিচিত। পাঞ্জাবীরা এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ —অফিসার, সর্দার ও উদেদারদের মধ্যে, এবং মাদ্রাজীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীদের মধ্যে। নবাগতদের নির্দিষ্ট জায়গায় সৈনিক এবং অন্যান্য নবাগতেরা কোন রকমে মাথা গুঁজবার জায়গা ক'রে নিলেন। অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিন তো কাটাতে হবে।

সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রের জীবন বাঙালীদের পক্ষে কতটা অসহনীয়, তা ভুক্তভোগী বাঙালী ছাড়া কেউ বুঝবে না। প্রথমত, সামরিক জীবনের কঠোরতা আয়েসী এবং ভাবপ্রবণ বাঙালী জাতির পক্ষে হয়ে উঠত শিরঃপীড়ার নামান্তর, এবং দ্বিতীয়ত, ইংরেজের বিভেদ-মন্ত্রে দীক্ষিত পাঞ্জাবী ওস্তাদদের অমূলক বাঙালী-বিদ্বেষের ফলে হয়ে উঠত অসহনীয়। ওস্তাদদের অশিক্ষিত এবং বর্বর মনোবৃত্তির সঙ্গে বাঙালীদের শিক্ষিত এবং আদর্শবাদী মন খাপ খাইয়ে নিতে পারত না। ফলে শত অবিচার এবং অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হ'ত মুখ বুজে।

যাই হোক, অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম, তাই শত অসুবিধার মধ্যেও সৈনিকের দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু অসহ্য হয়ে উঠত যখন খাবার-ঘরে অথবা রাত্রে বিছানায় শুয়ে পাঞ্জাবী, যুক্তপ্রদেশবাসী, এমন কি বিহারীরা পর্যন্ত মূর্খের মত অভদ্র ভাষায় বাঙালীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করত। তাদের বক্তব্য ছিল, বাঙালীরা ম্লেচ্ছের জাত, মাছ-মাংস খায়, টিকি রাখে না, পুরুষগুলি পৌরুষহীন এবং মহিলারা আব্রুহীনা। বেশির ভাগ বাঙালীই প্রতিবাদ করত না, কারণ 'ঔজি গোয়িং' জাতের প্রতিনিধি কি না! কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় কিছু গোঁয়ার-গোবিন্দও ছিলেন, যাঁদের একজনই

একশো নিন্দাবাদীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হতেন, শুধু মৌখিক প্রতিবাদের জন্ম নয়, প্রয়োজনমত করতেন শক্তির ব্যবহার। এঁরা বোধ হয় সেই বাঙালী নন, যাঁরা কনৌজরক্ত শরীরে প্রবাহিত ব'লে গর্ব অনুভব করেন; এঁরা বোধ হয় সেই বাঙালী, যাঁরা মহারাজ শশাঙ্কের নেতৃত্বে আর্যাবর্তের দাঁত ভেঙে দিয়েছিলেন।

দিন কেটে যাচ্ছে, সকাল চারটে থেকে রাত দশটার আগে শিক্ষার্থীরা বুট-পট্টি খুলবার সময় পেতেন না। স্নান করা প্রভৃতি সময়ের অভাবে অনেক দিন অসম্ভবই থেকে যেত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত খোলা ময়দানে রাইফেল হাতে প্রখর সূর্যের তাপ শিরে বহন ক'রে। তবু বেশির ভাগ বঙ্গসন্তানই আনন্দের সঙ্গে অবস্থাকে মেনে নিয়েছিলেন, শুধু মাসিক বেতনের বিনিময়ে নয়, কারণ ছিল প্রভু ইংরেজের রাজত্বে এত বিস্তৃত সামরিক শিক্ষার সুযোগ বাঙালী জাতি আর কোনদিন পায় নি।

কেটে যাচ্ছে দিন। সৈনিকের প্লাটুনের সামরিক শিক্ষার মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। সেদিন ছিল চাঁদমারীর দিন। খুব সকালেই সৈনিক এবং তাঁর সতীর্থগণ পূর্বব্যবস্থামত এসে উপস্থিত হলেন চাঁদমারীর ময়দানে। চাঁদমারী-পর্ব সমাপনান্তে প্রকাশিত হ'ল শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের ফলাফল। ইংরেজের দেওয়া অপবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন ক'রে অসামরিক জাতির প্রতিনিধি বাঙালী শিক্ষার্থীবৃন্দই স্থান সংগ্রহ করলেন অন্যান্য প্রদেশবাসীর পুরোভাগে, এবং পাঞ্জাবীদের নাম রইল বিভিন্ন প্রদেশবাসীর সকলের নিম্নে। অবশ্য চাঁদমারীতে শারীরিক যোগ্যতার ততটা বিশেষ প্রয়োজন নয়, যতটা প্রয়োজন সাধারণ বুদ্ধির। চাঁদমারী-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার সর্দার শরণ সিং খুব রসিক লোক ছিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়ে লাইনে ফিরে আসবার সময়ে বললেন, তোমরা সকলে মন দিয়ে শোন, আমি তোমাদের একটা মজার গল্প বলছি। অনেক কাল আগে সৃষ্টির আদিতে, স্বর্গে এক কলেজে প্রফেসার বিধাতাপুরুষ লেকচার দিচ্ছিলেন, বিষয় ছিল বুদ্ধিমত্তা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমার স্বজাতি পাঞ্জাবীরা সকলেই অনুপস্থিত ছিলেন সে ক্লাসে। ফলে যা হয়েছে, তার প্রমাণ চাঁদমারীর ময়দানে আজ তোমরা অনুভব করবার সুযোগ পেয়েছ। আমি কিন্তু আর সহজ সরল ক'রে বলব না, কারণ আমিও তো পাঞ্জাবী। সর্দার সাহেবের কথা শুনে বিভিন্ন প্রদেশবাসী শিক্ষার্থীরা হো-হো ক'রে উঠলেন হেসে, আর পাঞ্জাবী শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত মাত্রায় গাম্ভীর্য অবলম্বন ক'রে ইচ্ছে ক'রে বঞ্চিত রইলেন রসগ্রহণে করতে।

শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

ভুল

ছোট শহর। নূতন আসিয়াছি।

সকালবেলা পথে বাহির হই। পথে নরনারীর স্রোত, আমার দুই পাশ দিয়া বহিয়া যায়। সম্ভ্রমে সংকোচে শীর্ণকায় হইয়া হাঁটি।

নরজাতি গাড়ি লইয়া যায়। নারীজাতি বালতি লইয়া যায়। গাড়ি ও বালতিতে ভাল ভাল গন্ধদ্রব্য।

অন্যত্র এই বস্তু আবৃত করিয়া লইয়া যাইবার প্রথা আছে। এখানে লোকেরা কপটতা ভালবাসে না। গাড়ি ও বালতি অনাবৃতই থাকে।

প্রথম প্রথম জব্দ হইতাম। এখন বুদ্ধিমান হইয়াছি। গাড়ি বা বালতি দেখিলেই শ্বাস বন্ধ করি, চক্ষু অন্য দিকে ফিরাই, প্রাণপণ দ্রুতপদে সেটাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাই।

সেদিনও বাহির হইয়াছিলাম।

একটি গাড়িকে অতিক্রম করিলাম, তারপর একটি বালতি, তাহার পরই আবার একটি বালতি। বারংবার শ্বাস রুদ্ধ করিয়া আর দ্রুতপদে চলিয়া বুক টন্‌টন্ করিতে লাগিল।

বালতি চলিয়া গেল। নিশ্চিন্ত হইয়া একটা বৃহৎ শ্বাস টানিতে যাইব, পাশের গলি হইতে একটি নারী অতি অকস্মাৎ বাহির হইয়া আসিল, দুই হাতে দুইটি বালতি। শ্বাস টানা হইল না, শ্বাসনালী বন্ধ করিয়া চক্ষু ঊর্ধ্বে তুলিয়া পায়ের বেগ বাড়াইলাম।

কষ্ট হইতেছিল। পাশ কাটাইয়া যাইতে যাইতে নিজের অজ্ঞাতসারেই চক্ষুর কোণ দিয়া দেখিয়া লইতে গেলাম, আর কতদূর! চাহিয়াই, থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। বালতিতে দুধ ভরা। হাসি পাইল, ভুলের কথা ভাবিয়া।

তারপরই সে হাসি বন্ধ হইয়া গেল, ভুলের কথা ভাবিয়া।

এখনও ভাবিতেছি। অনেক বালতি চোখে পড়িয়াছে, অনেক বার শ্বাস বন্ধ করিয়াছি, চক্ষু ফিরাইয়া লইয়াছি। তাহার অনেক বালতিতে কি দুধও ছিল?

"সবুজ"

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

৪

স্বদেশপ্রেম :

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের প্রতিটি কার্য্যে জন্মভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইত। প্রথম জীবনে কলেজে চোগা-চাপকান পরিলেও পরে ধুতি-চাদর ছাড়া অন্য বেশে কেহ তাঁহাকে দেখে নাই। 'নানান্ দেশে নানান্ ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা, পূরে কি আশা'ই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তিনি মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষায় চিঠিপত্র লিখিতেন না; মাতৃভাষাতেই তিনি তাঁহার অমূল্য গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া গিয়াছেন, এমন কি, বিশ্ববিদ্যালয়ে "যজ্ঞ" সম্বন্ধে বক্তৃতাগুলি বাংলায় দিয়া মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এক কথায় রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। তিনি তাঁহার একটি রচনায় স্বদেশপ্রেমের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা উদ্ধারযোগ্য; তিনি লেখেন :—

"মূলে স্বদেশানুরাগের ভিত্তি না থাকিলে স্বদেশের উন্নতিচেষ্টা কেবল পণ্ডশ্রম; এবং যে জাতির আপনার পুরাতন কাহিনী জানিবার প্রবৃত্তি নাই, তাহার স্বদেশানুরাগের আস্ফালন সর্ব্বতোভাবে উপহাস্য। স্বদেশের উন্নতির জন্য এ দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন, শিল্প-শিক্ষার প্রচার, বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচার, শিল্পসমিতি স্থাপন প্রভৃতি নানাবিধ উদ্যম দেখা যাইতেছে; কিন্তু সকল উদ্যমই ব্যর্থ ও বন্ধ্যা হয়। তাহার মূল কারণ এক। আপনার জাতির অতীত ইতিহাসে যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে যেন স্বদেশপ্রিয়তার স্পর্দ্ধা না করে; আপনার জাতিকে যে চেনে না, সে যেন কৃত্রিম স্বদেশানুরাগের আস্ফালন না করে।" ('চরিত-কথা,' পৃ. ১৫)

১৯০৫ সনের ১৬ই অক্টোবর (৩০ আশ্বিন ১৩১২) 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ-কার্য্য সমাধা হইবে—এই সরকারী ঘোষণা যখন প্রচারিত হইল, তখন ভাঙা বাংলাকে জোড়া দিবার জন্য দেশে বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই জাতীয়-আন্দোলনে রামেন্দ্রসুন্দর নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন নাই। বঙ্গবিভাগের দিনটিকে দেশবাসীর মনে চিরজাগরূক রাখিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের মাথায় যেমন উভয় বঙ্গের মিলনসূচক রাখীবন্ধনের, তেমনি রামেন্দ্রসুন্দরের মাথায় ক্ষোভসূচক অরন্ধনের পরিকল্পনা জাগিয়াছিল। "তিনি অরন্ধনের পরিকল্পনা করিয়া তাহা সামাজিক ব্রত অনুষ্ঠানের অঙ্গীভূত করিয়া দিয়াছিলেন।

সমাজের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী স্ত্রীজাতিকে সেই আন্দোলনের পশ্চাতে দণ্ডায়মান রাখিয়া পুরুষজাতির শক্তি ও উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি শক্তিরূপিণী স্ত্রীজাতির জন্য অপূর্ব্ব ভাষায় 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রচনা করিয়াছিলেন।" পুস্তিকার ভূমিকায় প্রকাশ :—"বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের দিন অপরাহ্নে জেমো-কান্দি গ্রামের অর্দ্ধসহস্রাধিক পুরনারী আমার মাতৃদেবীর আহ্বানে আমাদের বাড়ীর বিষ্ণু-মন্দিরের উঠানে সমবেত হইয়াছিলেন; গ্রন্থোক্ত অনুষ্ঠানের পর আমার কন্যা শ্রীমতী গিরিজা কর্ত্তৃক এই ব্রতকথা পঠিত হয়।" গ্রন্থোক্ত "অনুষ্ঠান" এইরূপ :—

"প্রতি বৎসর আশ্বিনে বঙ্গবিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহিণীগণ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সে দিন অরন্ধন। দেবসেবা ও রোগীর ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য উপলক্ষে গৃহে উনুন জ্বলিবে না। ফলমূল চিড়ামুড়ি অথবা পূর্ব্বদিনের রাঁধা-ভাত ভোজন চলিবে।

পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘটস্থাপন করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিন্দুর লইবেন। হরীতকী বা সুপারি হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথাশেষে বালকেরা শঙ্খধ্বনি করিলে পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বাম হস্তের (বালকেরা দক্ষিণ হস্তের) প্রকোষ্ঠে স্বদেশী কার্পাসের বা রেশমের হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখী বাঁধিয়া দিবেন। রাখীবন্ধনের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে। তৎপরে প্লাটালি প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। সংবৎসরকাল যথাসাধ্য বিদেশী, বিশেষতঃ বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিবেন। সাধ্যপক্ষে প্রতিদিন গৃহকর্ম্ম আরম্ভের পূর্ব্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টিভিক্ষা রাখিবেন এবং মাসান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে বিনিয়োগ করিবেন।"

রামেন্দ্রসুন্দরের এই অনবদ্য রচনাটির সহিত বর্ত্তমান কালের পাঠকের পরিচয় সাধনের জন্য আমরা উহার সমগ্র অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা

বন্দে মাতরম্। বাঙলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্ত্যে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ-কাশী পার হ'য়ে মা পূর্ব্ববাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ ক'রে মা সেখানে শতমুখী হ'লেন। শতমুখী হ'য়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী

এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলাদেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি হ'ল। লোকে পরমসুখে বাস করতে লাগল।

এমন সময় মর্ত্ত্যে কলির উদয় হ'ল। লোকে ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়তে লাগল। ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অনাচারী হ'ল। সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হ'ল। সকলে বেদবিধি অমান্য করতে লাগল। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি চঞ্চল হ'লেন। লক্ষ্মী ভাবলেন—হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়তে হ'ল। তখন বাঙলাতে রাজা ছিলেন, তাঁর নাম আদিশূর। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; বাঙলায় অনাচার ঘটেছে; আমি বাঙলা ছেড়ে চললেম। রাজা কেঁদে বললেন,—না মা, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না; যাতে বাঙলায় সদাচার ফিরে আসে, তা আমি করছি। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বসলেন। দরবারে ব'সে পশ্চিমদেশে কনোজে লোক পাঠালেন; কনোজ থেকে পাঁচ জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনালেন। তাঁদের সঙ্গে পাঁচ জন সজ্জন কায়েত এলেন। রাজা তাঁদের রাজ্যের মধ্যে বাস করালেন। তাঁরা বাঙলাদেশে বেদবিধি নিয়ে এলেন, সদাচার নিয়ে এলেন। তাঁদের ছেলেমেয়ে বাঙলার গাঁয়ে গাঁয়ে বাস করতে লাগল। তাঁদের দেখাদেখি দেশে বেদবিধি সদাচার ফিরে এল। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বসলেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি আবার চঞ্চল হ'লেন। বাঙলার ধন দেখে ধান দেখে মোছলমান বাঙলায় এলেন। তখন বাঙলার রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল লক্ষ্মণ সেন। তাঁর রাজ্য গেল। মোছলমান বাঙলার রাজা হ'লেন। হিঁদুর জাতিধর্ম্ম নষ্ট হ'তে লাগল। হিঁদুর ঠাকুরঘর ভেঙে মোছলমান মস্‌জিদ্ তুলতে লাগলেন। অর্দ্ধেক হিঁদু মোছলমান হ'ল। হিঁদু-মোছলমানে এক গাঁয়ে এক ঠাঁয়ে বাস ক'রে মারামারি-কাটাকাটি করতে লাগল। লক্ষ্মী ভাবলেন, হায়, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, আমাকে বুঝি বাঙলা ছাড়তে হ'ল। তখন বাঙলাতে গৌড়ের পাঠানবাদশা রাজা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হোসেনশা। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, আমার হিঁদুও যেমন, মোছলমানও তেমনি; হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই যখন মারামারি-

কাটাকাটি করতে লাগল, আমি বাঙলা ছেড়ে চল্লেম। পাঠান রাজা কেঁদে বল্লেন—মা, তুমি যেতে পাবে না; আমি হিঁদু-মোছলমান সমান দেখ্ব; তাদের ভাই-ভাই একঠাই কর্ব, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না। লক্ষ্মী বল্লেন—আচ্ছা, তাই হবে; আমি এখন থাক্ব; দিল্লীতে মোগল বাদশা হবেন; দিল্লীর বাদশা বাঙলার রাজা হবেন; সেই রাজা হিঁদু-মোছলমান সমান দেখ্বেন; তখন হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই হবে, ঝগড়া-বিবাদ মিটে যাবে। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বস্লেন। দরবারে ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে মহাভারত শোনালে। মোছলমান রাজা ব্রাহ্মণকে মান্য ক'রে রাজমন্ত্রী কর্লেন। হিঁদু গিয়ে মোছলমানের পীরতলায় শিন্নি দিতে লাগ্ল। এমন সময় মহাপ্রভু নদীয়ায় অবতার হ'লেন। তিনি যবনব্রাহ্মণ সবাইকে ডেকে কোল দিলেন। পাঠানের পর দিল্লীর মোগলবাদশা বাঙলার রাজা হ'লেন। তিনি হিঁদু মোছলমানকে সমান চোখে দেখ্তে লাগ্লেন। হিঁদু-মোছলমান ভাই-ভাই হ'ল, ঝগড়াবিবাদ মিটে গেল। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা জুড়ে বস্লেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

এইরূপে বহুদিন গেল। চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি আবার চঞ্চল হ'লেন। দিল্লীর তখনকার বাদশা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল আলমগির। তিনি হিঁদু-মোছলমানে তফাত করতে গেলেন। বর্গী এসে বাদশার রাজ্য লুঠ করতে লাগল। সাতসমুদ্র পার হ'য়ে খৃষ্টান ইংরেজ সদাগর বাঙলায় বাণিজ্য করতে এসেছিল। দিল্লীর বাদশা তাদের আদর ক'রে নিজের রাজ্যমধ্যে জায়গা দিয়েছিলেন। বাঙলার ধন দেখে, ধান দেখে তাদের লোভ হ'ল। লক্ষ্মী তখন আলমগিরের বংশের দিল্লীর বাদশাকে ছেড়েছেন। বাদশা ইংরেজকে বাঙলার দেওয়ান ক'রে দিলেন। বাদশার দশা তারাই হ'ল বাঙলার রাজা। তারা এসেছিল সদাগর, হয়েছিল বাদশার দেওয়ান, হ'য়ে গেল দেশের রাজা। রাজা হ'ল; কিন্তু রাজ্যে বাস করল না। বাঙলাদেশের ধন নিয়ে ধান নিয়ে সাতসমুদ্রপারে আপন দেশে চলল। সাগরের জাত কিনা, মেজাজ ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অতিশয় ধূর্ত্ত। তারা চোরডাকাত দমন করল, মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতে লাগ্ল, আবার নিজের দেশ হ'তে খেলেনা এনে, পুঁতুল এনে প্রজার মন ভুলাতে লাগ্ল। লক্ষ্মী যখন চঞ্চল হন, তখন মানুষের বুদ্ধিলোপ হয়। বাঙলার লোকের বুদ্ধিলোপ হ'ল। বুড়ামানুষে শিশু সাজ্ল; ইংরেজের

দেওয়া খেলনা-পুতুল নিয়ে ছেলেখেলা করতে লাগল। সদাগর রাজা কাঁচ এনে দিলেন। বাঙলার প্রজা কাঞ্চনবদলে সেই কাঁচ নিতে লাগল। দেশের জিনিষে লোকের মন উঠে না। ঝুঁটোমণির রঙ দেখে দেশের সাচ্চামাণিকে অনাদর করতে লাগল। রাজা যত আদর দেন, সোহাগ করেন, দেশের লোক ততই খোকা সাজতে লাগল। রাজা হাততালি দিতে লাগলেন; দেশের যত বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে আধ-আধ কথা বলতে লাগল। লক্ষ্মী বললেন—আর না, আমি বাঙলার লক্ষ্মী, বাঙলার লোকের এই দশা, আমার আর বাঙলায় থাকা চললো না।

লক্ষ্মী চঞ্চলা। চঞ্চল হয়ে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে চললেন। আঁধার রাতে কালপেঁচা ডেকে উঠল। তখন সাতকোটি বাঙালি কেঁদে উঠল। রাজার দোষে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চললেন ব'লে রাজার দোষ দিয়ে সকলে কেঁদে উঠল। ইংরেজ রাজা সেই কাঁদন শুনে বিরক্ত হ'লেন। ইংরেজ রাজার তখন একটা ছোকরা নায়েব ছিল; সে আপন দেশে ছিল কেরাণী, হয়ে এসেছিল নায়েব। নায়েবী পেয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করত। আলমগির-বাদশার তক্তে ব'সে সে আপনাকে আলমগিরের নাতি ঠাওরা'ত। সে বললে, এরা বড় ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করছে; থাক্, এদের দু'দল ক'রে দিচ্ছি; এক দিকে থাক্ মোছলমান, এক দিকে থাক্ হিন্দু। এরা ভাই-ভাই একঠাঁই থেকে বড় বিরক্ত করছে; এদের ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই ক'রে দাও, এদের জোট ভেঙে দাও। এই ব'লে তিনি বাঙালীকে দুদল ক'রে দিলেন,—এক দিকে গেল হিঁদু, এক দিকে গেল মোছলমান। পূবে-উত্তরে গেল মোছলমান, পশ্চিমে-দক্ষিণে থাকল হিঁদু।

লক্ষ্মী দেখলেন, আমি বাঙলার লক্ষ্মী; আর আমার নিতান্তই বাঙলায় থাকা চলল না। আমার হিঁদু যেমন, মোছলমান তেমনি। হিঁদু-মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হ'ল, তখন আর আমার বাঙলায় থাকা চলল না।

১৩১২ সাল, আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সে দিন বড় দুর্দ্দিন, সেইদিন রাজার হুকুমে বাঙলা দুভাগ হবে; দুভাগ দেখে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচকোটি বাঙালী আছাড় খেয়ে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে ডাকতে লাগল—মা তুমি বাঙলার লক্ষ্মী, তুমি বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর; বিদেশী রাজা আমাদের সুখ দুখ বোঝেন না;

তাই ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই করতে চাইলে; আমরা ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হব না; মা, তুমি কৃপা কর; আমরা এখন থেকে মানুষের মত হব; আর পুঁতুলখেলা করব না, কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ কিনব না; পরের দুয়ারে ভিক্ষা করব না; মা, তুমি আমাদের ঘরে থাক। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙালীকে দয়া করলেন। কালীঘাটের মা-কালীতে তিনি আবির্ভাব করলেন। মা-কালী নববেশে মন্দিরে দেখা দিলেন। সে দিন আশ্বিনের অমাবস্যা, ঘোর দুর্যোগ। ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি, হুহু ক'রে হাওয়া। পঞ্চাশ হাজার বাঙালী মা-কালীর কাছে ধন্না দিয়ে পড়ল। বললে, মা, আমাদের রক্ষা কর। বাঙলার লক্ষ্মী যেন বাঙলা ছেড়ে না যান। আমরা আর অবোধের মত ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলব না। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। ঘরের জিনিষ থাকতে পরের জিনিষ নেবো না। মায়ের মন্দির হ'তে মা ব'লে উঠলেন—জয় হউক, জয় হউক; ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবেন; বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকবেন; তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলো না; ঘরের থাকতে পরের নিয়ো না; পরের দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ো না; ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ো না; তোমাদের "এক দেশ এক ভগবান্, এক জাতি এক মনপ্রাণ" হোক্; লক্ষ্মী তোমাদের অচলা হবেন।

তিরিশে আশ্বিন, কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা নিয়ে বাঙলার লক্ষ্মী ঐ দিন বাঙলা ছাড়ছিলেন। ঐদিন বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় অচলা হ'লেন। বাঙলার হাট-মাঠ-ঘাট জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি হ'ল।

বাঙলার মেয়েরা ঐ দিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। ঘরে ঘরে সে দিন উনুন জ্বলল না। হিঁদু মোছলমান ভাই ভাই কোলাকুলি করলে। হাতে হাতে হলদেসূতোর রাখী বাঁধলে। ঘট পেতে বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনলে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।

বচ্ছর-বচ্ছর ঐদিনে বাঙালীর মেয়েরা এই ব্রত নেবে। বাঙালীর ঘরে ঐ দিন উনুন জ্বলবে না। হাতে হাতে হলদেসূতোর রাখী বাঁধবে। বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনে শাঁখ বাজিয়ে ঘটে প্রণাম ক'রে বাতাসা-পাটালি প্রসাদ পাবে। ঘরে ঘরে

লক্ষ্মী অচলা হবেন। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবেন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকবেন।

সবাই বল—

আমরা ভাই ভাই একঠাঁই।
ভেদ নাই ভেদ নাই ॥
ভাই ভাই একঠাঁই।
ভেদ নাই ভেদ নাই ॥
ভাই ভাই একঠাঁই।
ভেদ নাই ভেদ নাই ॥

মা লক্ষ্মি, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। ঘরের থাক্‌তে পরের নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। ভিক্ষার ধন হাতে তুলবো না। মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। ভাইকে খাইয়ে পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্‌। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক্‌। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলায় থাকুন।

বাঙলার মাটি বাঙলার জল
বাঙলার হাওয়া বাঙলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান্‌।

বাঙলার ঘর, বাঙলার মাঠ,
বাঙলার বন, বাঙলার হাট,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান্‌।

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান্‌।

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান্।
বন্দে মাতরম্

একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়। রামেন্দ্রসুন্দর বড়-একটা নেতাদের সহিত মিশিতেন না; কলেজ, ঘর আর সাহিত্য-পরিষৎই তাঁহার স্থান ছিল, অথচ এই স্বদেশহিতৈষিতার বীজ কে তাঁহার মনে উপ্ত করিল? এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়া গিয়াছেন:

"স্বদেশের কথা কহিবার সময় তাঁহার [পিতার] কণ্ঠস্বরের বিকৃতি ও লোমহর্ষ ঘটিত। স্বভাবপ্রদত্ত মেঘমন্দ্রস্বরে উদ্দীপনার ভাষায় তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রটির মনে স্বদেশভক্তি সঞ্চারিত করিবার জন্য কতই না প্রয়াস পাইতেন।" ('পুণ্ডরীককুলকীর্তিপঞ্জিকা,' পৃ. ৭৮)

"শৈশবেই আমি জননী জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' বলিয়া জানিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলাম। সে মন্ত্রে দীক্ষা সে বয়সে সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যিনি দীক্ষা দিয়াছিলেন, তিনি কোথা হইতে আজিও আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার দিব্য দৃষ্টি অতিক্রম করা আমার সাধ্য নহে। আমার শক্তি ছিল না, কিন্তু সেই দিব্য নেত্রের প্রেরণা ছিল; আমার জীবনে যদি কিছু সার্থকতা থাকে, তাহা সেই প্রেরণার ফল।" ('পরিষৎ-পত্রিকা,' ১৩২২)

মৃত্যু:

রামেন্দ্রসুন্দরের শেষ-জীবন নিরতিশয় শান্তিতে কাটিতে পারে নাই। মুহুর্মুহু শোকের আঘাত তাঁহাকে নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহার শরীরও ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে আবার তাঁহার বৃদ্ধা জননীও ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন (১৩২৫, মহাবিষুব-সংক্রান্তি)। রামেন্দ্রসুন্দর রোগজীর্ণ দেহে দেশে কোনরূপে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া, কলিকাতায় ফিরিয়া সেই যে শয্যাগ্রহণ করিলেন, তাহাই তাঁহার শেষ-শয্যায় পরিণত হইল। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ (৬ জুন ১৯১৯) রাত্রি ১০টার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৫ বৎসর হইয়াছিল। অন্তিমকালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রোগীর শয্যাপার্শ্বে ছিলেন, তিনি বড় আক্ষেপেই বলিয়াছিলেন,—"আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যার একটা বড় জাহাজ ডুবিয়া গেল।"

উপসংহার :

রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যুতে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তৎসম্পাদিত 'সাহিত্যে' যে অপূর্ব্ব রচনাটি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা দেশের কর্ম্মক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থান বাছিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক, তিনি দার্শনিক, তিনি সাহিত্যিক। কর্ম্মী রামেন্দ্রসুন্দর নীরবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আপনার জীবন সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্ম্মজীবনে অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু তাঁহার সমগ্র জীবনে যে বিশেষত্ব ছিল, সেই বিশেষত্বের প্রভাবেই তিনি বাঙ্গালীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। সে বিশেষত্ব—তাঁহার দেশাত্মবোধ। তিনি খাঁটী বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিগত ভাবের সুবর্ণে কোনও খাদ ছিল না।

রামেন্দ্রসুন্দর শৈশবে, কৈশোরে স্বীয় জনকের নিকট এই স্বাদেশিকতার দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষা ছিল বিদেশী, কিন্তু দীক্ষা ছিল স্বদেশী। বিদেশের জ্ঞানে বিজ্ঞানে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়াও রামেন্দ্রসুন্দর কখনও স্বাদেশিকতায় বঞ্চিত হন নাই। ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিশেষত্ব।

আমার মনে হয়, রামেন্দ্রসুন্দর ডিরোজিও-যুগের প্রতিক্রিয়ার অবতার। প্রতীচ্য শিক্ষা তাঁহাকে প্রাচ্য ভাবে, প্রাচ্য সংযমে বঞ্চিত করিতে পারে নাই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন রামেন্দ্রসুন্দর, প্রতীচ্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সিদ্ধ সাধক রামেন্দ্রসুন্দর 'আহেলে বিলাতী' হইবার প্রলোভন সংবরণ করিয়া সে কালের বাঙ্গালার সাবেক চণ্ডীমণ্ডপের খাঁটী বাঙ্গালী থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। যে শিক্ষায় বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী রূপান্তরিত হইয়া অদ্ভুত ও উদ্ভটের উদাহরণ হইতেছে, তিনি সেই শিক্ষা আকণ্ঠ পান করিয়াও অভিভূত হন নাই। তিনি নীলকণ্ঠের মত বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মন্থন-সম্ভূত হলাহল স্বয়ং জীর্ণ করিয়া, তাহার অমৃতটুকু দেশবাসীকে দান করিয়া গিয়াছেন। বাল্য-জীবনের পারিবারিক দীক্ষা তাঁহাকে রক্ষাকবচের মত রক্ষা করিয়াছিল। ডিরোজিও-যুগের দেশহিতৈষণা, 'গণে'র কল্যাণকামনা, দেশহিত-ব্রতে অদম্য

উৎসাহ রামেন্দ্রসুন্দরে পূর্ণভাবে বিকশিত হইলেও, সে যুগের কোনও অসংযম, কোনও উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁহার জীবন ও চরিত্র দূরে থাক, তাঁহার চিন্তা বা তাঁহার কোনও সঙ্কল্পকেও স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে তিনি ভাবী শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদর্শ। ভবিষ্যতের বাঙ্গালী মধুকরের মত বিশ্ব-নন্দনের নানা ফুল হইতে মধু সঞ্চয় করিয়া মধুচক্র রচনা করিবে, কিন্তু সে চক্রে, সে মধুতে তাহার নিজত্ব থাকিবে। রামেন্দ্রসুন্দর স্বীয় জীবনে, চরিত্রে ও জীবনের কর্ম্ম-সমবায়ে সেই অনন্যসাধারণ নিজত্বের পরিচয় ও প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি ভাবী বাঙ্গালীর অগ্রদূত। নিজত্বে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন হইলে যাহা হয়, তাহাই রামেন্দ্রসুন্দর। জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে ও সাহিত্যে 'গোঁড়ামী'র স্থান নাই, কিন্তু নিজত্বের যথেষ্ট অবকাশ আছে, রামেন্দ্রসুন্দর নিজের জীবনে বাঙ্গালীর উত্তর-পুরুষের জন্য এই ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্র বাঙ্গালার সাহিত্যেই আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি পঁচিশ বৎসর রিপণ কলেজে অধ্যাপকতা ও অধ্যক্ষতা করিয়া শিক্ষাবিভাগে যশস্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরিচয়, প্রতিষ্ঠা বাঙ্গালা সাহিত্যে। সংক্ষেপে রামেন্দ্রসুন্দরের সাহিত্য-জীবনের পূর্ণ পরিচয়দান সম্ভব নহে। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা,—মানব-চিন্তার এই ত্রিধারা রামেন্দ্র-সঙ্গমে যুক্তবেণীতে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার সারস্বত-সাধনার ত্রিবেণীসঙ্গম বহু দিন বাঙ্গালীর তীর্থ হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালীর সাহিত্য তাঁহার সাধনার বস্তু ছিল। তিনি সে সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষা অতুলনীয়। তাঁহার সহজ, প্রাঞ্জল, সরস ভাষা, তাঁহার নিপুণ রচনা-রীতি বহুকাল বাঙ্গালী লেখকের লোভনীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহাকে শুধু লেখক বা সাহিত্যিক ভাবিলে আমরা ভুল করিব। তিনি শক্তিশালী, ভাবগ্রাহী ব্যাখ্যাতা ছিলেন। দুরূহ বিষয়ের বিশদ আলোচনায় ও বিশ্লেষণে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানেও বিস্ময়ের সঞ্চার করে; ভবিষ্যতেও তাহা বিস্ময়ের সৃষ্টি করিবে। বিজ্ঞান ও দর্শনের জটিল তত্ত্ব তিনি জলের মত বুঝাইয়া দিতেন; নিজে আত্মসাৎ করিয়া, তদ্‌ভাবে ভাবিত হইয়া, সমগ্রের স্বরূপ দর্শন করিতেন;

তাহার পর সমাহারে স্বীয় চিন্তার অভিব্যক্তির ফল দেশবাসীকে দান করিতেন। আলোচ্য বিষয়ের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সকল পর্য্যায়ে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত। পল্লবগ্রাহিতা তাঁহার চরিত্রে ছিল না, তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যেও নাই।

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের সকল কর্ম্মের মূল—দেশাত্মবোধ। তিনি দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া আপনার ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার পূজা করিয়া গিয়াছেন। 'নানান্ দেশে নানান্ ভাষা, বিনে স্বদেশী ভাষা, পূরে কি আশা'ই তাঁহার সাহিত্য-জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

বাঙ্গালার সাহিত্য-পরিষদ্ রামেন্দ্রসুন্দরের কীর্ত্তিস্তম্ভ। রামেন্দ্রসুন্দরের বুকের রক্তে পরিষদ্-মন্দিরের ইটের পর ইট গাঁথা হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই যে পরিষদে আত্মদান, ইহার মূলও তাঁহার দেশাত্মবোধ। দেশাত্মবোধের সাধনার জন্যই রামেন্দ্রসুন্দর এই দেশমাতৃকার মন্দির গড়িয়াছিলেন। কলেজে, পরিষদে, সাহিত্যে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে মাতৃপূজাই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনিও বলিতে পারিতেন,—'তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।' তিনি তাঁহার দেবতার জন্য মন্দির গড়িতেন, এবং মন্দিরে মন্দিরে তাঁহার দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেন। এমন আন্তরিক চেষ্টা কি বাঙ্গালীর ভাগ্যেও নিষ্ফল হইতে পারে?

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য, বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ব, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার পুরাবস্তু, বাঙ্গালার অবদান,—এক কথায় বাঙ্গালীর প্রাণ তাঁহার ধ্যানের বস্তু ছিল। জাতীয়তার এমন একনিষ্ঠ, আত্মমগ্ন, প্রচ্ছন্ন উপাসক আমি জীবনে অতি অল্প দেখিয়াছি। 'যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গাজলে', রামেন্দ্রসুন্দরও তেমনই বাঙ্গালার উপকরণে বাঙ্গালার পূজা করিতেন, বাঙ্গালার ভাবে বাঙ্গালার সাধনা করিতেন। অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় ক্লাসে অধ্যাপনা করিতেন। প্রিন্সিপাল রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালীর পরিচ্ছদ ধুতী চাদর পরিয়া রিপণ কলেজে অধ্যক্ষতা করিতেন। তিনি দুইবার বিশ্ববিদ্যালয়ে উপদেশক-রূপে প্রবন্ধ পাঠ করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কেন জানেন? রামেন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি নহে, এই জন্য বাঙ্গালা দেশের বাঙ্গালীর বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাঙ্গালী শ্রোতার মজলিসে, রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধ পড়িবার অনুমতি পান নাই। তিনি তৃতীয় বার অনুরুদ্ধ হইয়া

লেখেন,—'ইংরাজী রচনায় আমি অভ্যস্ত নহি। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিবার অনুমতি দিলে আমি "বেদ" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িতে পারি।' তখনকার ভাইস্‌চ্যান্সেলার সার ডাক্তার দেবপ্রসাদ রামেন্দ্রসুন্দরকে সে অধিকার দান করিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালা কেতাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু আমরা বলিব, বাঙ্গালার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এই শুভ মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার কোনও স্থান ছিল না। রামেন্দ্রসুন্দরই তাহার সূচনা করিয়া বাঙ্গালা দেশে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় অদূর-ভবিষ্যতে যাহা হইতে বাধ্য, রামেন্দ্রসুন্দর প্রতিভার, মনস্বিতার, স্বাদেশিকতার ও মাতৃভাষা-ভক্তির নিক্রয়ে বাঙ্গালীকে তাহার অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'যজ্ঞ' শুধু সাহিত্যের হিসাবেই চিরস্মরণীয় নয়, এই হিসাবেও তাহা রামেন্দ্রসুন্দরের আন্তরিক দেশভক্তি ও স্বাদেশিকতারও জয়স্তম্ভ বটে। রামেন্দ্র সম্বন্ধেও আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি,—'নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ।'

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের মাধুর্য্য, হৃদয়ের ঔদার্য্য, চরিত্রের শুচিতা, তাঁহার বন্ধুবৎসলতা, অমায়িকতা ও সদাশয়তার পরিচয় দিবার স্থান নাই, সময়ও নাই। তাঁহার শ্রদ্ধাবুদ্ধির তুলনা হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার আকর্ষণ করিবার শক্তি ছিল। তিনি স্বয়ং কর্ম্মী ছিলেন; এবং চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তিনি তেমনই কর্ম্মীদিগকে আকর্ষণ করিতেন। তিনি ভাবুক ও ভাবের প্রস্রবণ ছিলেন। যে ভাবে বিভোর হইয়া তিনি বাঙ্গালার পূজায় মজিয়াছিলেন, সেই ভাবে বিভোর করিয়া তিনি অনেক শক্তিশালী লেখককে বাঙ্গালা ভাষার সেবায় দীক্ষিত করিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর অদ্ভুত শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি কলেজে কয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন, জানি না। কিন্তু উত্তর-জীবনে দর্শন, উপনিষদ্, বেদে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। আমার সহিত ত্রিশ বৎসরের পরিচয়ে আমি তাঁহাকে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য কখনও গুরুকরণ করিতে দেখি নাই। কালিদাসের উমার শিক্ষার সেই বর্ণনা মনে পড়ে—

'প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ॥'

লর্ড হার্ডিঞ্জ যাঁহাকে 'এসিয়ার রাজকবি' বলিয়া সম্মানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আমরা যাঁহাকে 'এসিয়ার গণতন্ত্রের কবি' বলিয়া জানি,

রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত ভাব-যজ্ঞে তাঁহার সাহচর্য্য ছিল। স্বদেশী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত রামেন্দ্রসুন্দরের সহিত রবীন্দ্রনাথের ভাবের বিনিময় হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ১৩২১ সালে পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দরের সংবর্দ্ধনায় অভিনন্দনে লিখিয়াছিলেন,—'সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি, মাধুর্য্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিনন্দন করিতেছি।' কে অস্বীকার করিবে, এই সুন্দর অভিনন্দনের প্রত্যেক অক্ষর সত্য। আর তখন কে জানিত, যাঁহার জীবন এমন সুন্দর, তাঁহার মৃত্যুও এমন সুন্দর হইবে,—কোনও মৃত্যু এমন সুন্দর হইতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের লোকান্তরের কয়েক দিন পূর্ব্বে "নাইট" উপাধি বর্জ্জন করিয়া নব-ভারতে ত্যাগের, দেশাত্মবোধের ও জাতীয় বেদনাবোধের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করেন। শনিবার তাঁহার পদত্যাগপত্রের অনুবাদ 'বসুমতী'র অতিরিক্ত পত্রে প্রকাশিত হয়। রবিবার রামেন্দ্রবাবু এই সংবাদ অবগত হন, এবং রবীন্দ্রবাবুর পত্রের অনুবাদ পাঠ করেন। রামেন্দ্রবাবু তাঁহার কনিষ্ঠকে দিয়া রবিবাবুকে বলিয়া পাঠান, 'আমি উত্থানশক্তিরহিত। আপনার পায়ের ধূলা চাই।' সোমবার প্রভাতে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রবাবুর শয্যাপার্শ্বে উপনীত হন। রামেন্দ্র বাবুর অনুরোধে রবিবাবু তাঁহাকে মূল পত্রখানি পড়িয়া শুনান। এ পৃথিবীতে রামেন্দ্রের এই শেষ শ্রবণ। রামেন্দ্রসুন্দর রবীন্দ্রনাথের পদধূলি গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল আলাপের পর রবীন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন; রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রায় মগ্ন হইলেন। সেই তন্দ্রাই মহানিদ্রায় পরিণত হইল। রামেন্দ্রসুন্দর আর এ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই। দুনিয়ার সহিত তাঁহার শেষ কারবার—দেশাত্মবোধের উদ্বোধন। দেশভক্তিই যাহার জীবনের একমাত্র প্রেরণা ছিল, দেশভক্তির উচ্ছ্বাসেই তাঁহার ঐহিক জীবনের শেষ তরঙ্গ মিশিয়া গেল। কবি সত্যই বলিয়াছেন, রামেন্দ্রসুন্দর! তোমার সকলই সুন্দর, তোমার জীবন সুন্দর, তোমার মরণ সুন্দর, তোমার জীবনের আদর্শ আরও সুন্দর। যদি নিষ্কাম ধর্ম্মে ও নিষ্কাম কর্ম্মে স্বর্গ থাকে, তবে সে স্বর্গ তোমার। সেই স্বর্গ হইতে আশীর্ব্বাদ কর—তোমার দেশ সুন্দর হউক, বাঙ্গালীর উত্তর পুরুষ সুন্দর হউক, হে সুন্দর! তোমার চিরসুন্দর আদর্শ সফল হউক, সার্থক হউক।" ('সাহিত্য', আশ্বিন ১৩২৬) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তিরিশে জানুয়ারি

রাজায় রাজায় যুদ্ধ ছাড়া যে উলুখড়ের প্রাণ যায় না—এটা যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা সংসার সম্বন্ধে নিরতিশয় অনভিজ্ঞ এ কথা নিঃসংশয়েই বলা যায়। গান্ধীজীর মৃত্যু হয়েছে। দেশে বিদেশে বড় বড় নেতা, চিন্তানায়কেরা ভারতের তথা বিশ্বের কত বড় ক্ষতি যে হয়ে গেল, তারই পরিমাপ ক'রে বাণী ও বিবৃতির বৃষ্টি করলেন—কিন্তু আমি সামান্য লোক, উলুখড়, আমার ক্ষতিটুকুর খবর রাখে কে? আমার অপরাধ যে সে সময়ে দিল্লীতে উপস্থিত থেকেও আমি মহাত্মার শবযাত্রায় যোগ দিই নি, এমন কি শোকাকুল জনস্রোতে মিশে তাঁর মৃতদেহ দর্শন পর্যন্ত ক'রে আসি নি। কি জানি, তখন আমার মনে হয়েছিল, এর প্রয়োজন নেই। বুদ্ধিভ্রষ্ট এক যুবকের কাপুরুষতার কলঙ্ক শবযাত্রায় যোগ দিয়ে মৃত মহাত্মার জয়ধ্বনি ক'রে গলা ভেঙে ফেললেও অপনোদন করা যাবে না। একদিনেই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। তখনকার আচ্ছন্ন বুদ্ধিতে যে আচরণ সমীচীন ব'লে মনে হয়েছিল; সদ্য-স্বাধীন, নেতৃশোক-বিক্ষুব্ধ গণমনের বিচিত্র বিচারে সেইটাই হয়ে দাঁড়াল দেশদ্রোহিতার নামান্তর। প্রমাণ হয়ে গেল যে, আমি গান্ধীবাদে অবিশ্বাসী, অতএব সকলের ঘৃণার মাত্র। হায় উলুখড়!

কলকাতায় ফিরে এসে নিত্য অভ্যাসমত চায়ের দোকানে ঢুকতেই, সাধু ভাষায় যাকে বলে প্রশ্ন-বাণে জর্জরিত—আমার সেই অবস্থা হ'ল। নকুলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি তো দিল্লীতেই ছিলেন, কেমন দেখলেন সব? আমি বললুম, দেখবার আর কি আছে বলুন, সর্বনাশ যা হবার তা তো হয়েই গেল?

নকুলবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, আহা, তা তো বটেই। খবরটা যখন শুনলুম, মনটা যেন হুহু ক'রে উঠল, তক্ষুনি দোকান বন্ধ ক'রে বাড়ি চ'লে গেলুম।

নকুলবাবুর দোকান বন্ধ ক'রে বাড়ি চ'লে যাওয়াটার গুরুত্ব সকলেই যে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন সেটা তাঁদের ভাবে ও আচরণে বিলক্ষণ বোঝা গেল।

নকুলবাবুকে পাড়ার লোকে একজন কর্ম-বীর ব'লেই মনে ক'রে। একখানা সামান্য মুদির দোকান থেকে যে লোক এই ক বছরের মধ্যে তিনখানা বাড়ি,

দুটো আটার কল ও একটা তেলের কল করতে পারে, সে কর্মবীর ছাড়া আর কি? টাকার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খাতির ও প্রতিপত্তি দুইই বেড়েছে। নকুলবাবুর প্রশ্নের জের টেনেই হরিবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ মশাই, রমেনের জামাই বলছিল, কপালেও নাকি একটা গুলি লেগেছিল, কিন্তু কাগজে তো সে কথা কিছু লেখে নি! বিরলা-হাউসে তো গিয়েছিলেন, দেখলেন নাকি তেমন কিছু? আমি বিরলা-হাউসে যাই নি, এমন কি শবযাত্রায়ও যোগ দিই নি জেনে সকলে যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। নকুলবাবু যেন ক্ষেপে গেলেন, বললেন, প্রসেশনেও যান নি? তা হ'লে দিল্লীতে রইলেন কি করতে? দেশের দশের কোন কাজেই তো লাগলেন না, এমন কি দেশ যাঁর জন্যে স্বাধীন হ'ল তাঁর শেষ কাজটাতে যোগ দিয়ে উঠতে পারলেন না? আপনারা আবার খদ্দর পরেন, দেশপ্রেমের বড়াই করেন! তারপর রাম-বাবুকে এবং সেই সূত্রে উপাস্থিত সকলকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, জানেনই তো, আমার খাবার ফুরসৎ নেই, তবুও সেদিন হিসেবপত্তর সব ফেলে রেখে বাড়ি-সুদ্ধ সবাই মিলে গঙ্গার তীরে একটা তর্পণ মত ক'রে এলুম। না হয় লাগলই বারোটা টাকা ট্যাক্সি-ভাড়া,—টাকা বড়, না, দেশের কাজ বড়?

যদুবাবু কথাটা লুফে নিয়ে বললেন, সেই কথাই তো বলছি। সেদিন আমার ছাপাখানার লোকগুলো বেঁকে বসল, গান্ধীজী মারা গেছেন, কাজ বন্ধ ক'রে দিতে হবে। শেষে ডবল মজুরি কবুলে তাদের দিয়ে কাজ করাই। হতভাগাদের এতটুকু আক্কেল হ'ল না, যাঁর জন্যে কাজ বন্ধ করছিস তাঁর ছবি ছাপবার জন্যেই তো তোদের আটকালুম। আমারও মশায় ধনুক-ভাঙা পণ, যত টাকা লাগে কুছ্ পরোয়া নেই, মহাত্মাজীর ছবি আমি বাজারে বার করবই। কাগজ, মজুরি সব মিলিয়ে পড়তা একটু বেশিই প'ড়ে গেল, ছবি পিছু প্রায় পাঁচ সিকে। দেড় টাকা দাম ক'রে দশ হাজার ছবি বাজারে ছেড়ে দিলুম। বেঁচে থাকতে তো লোকটাকে কেউ চিনলে না, এখন ছবিখানা চোখের সামনে থাকলে যদি সুবুদ্ধির উদয় হয়।

অনুশোচনা আর আত্মগ্লানিতে মনটা যেন পুড়ে যেতে লাগল। বৃথাই এতদিন খদ্দর প'রে ঘাম আর ঘামাচিতে কষ্ট পেয়ে এসেছি, বিলিতী সিগারেট ছেড়ে দিশী বিড়ি টেনে টেনে গাল দুটো অকালেই তুবড়ে ফেললুম, অথচ ভিড় ক'রে গিয়ে মহাত্মার মৃতদেহ দর্শন ক'রে আসা বা সময়োচিত শুভ্র শোকবেশ

ধারণ ক'রে শবযাত্রায় যোগ দেওয়ার মত স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতির প্রথম কর্তব্যটুকুই করলুম না। নিজেকে শত ধিক্কার দিলুম। দোকানে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি নীরব তিরস্কারের মত গায়ে এসে বিঁধতে লাগল; ঘাড় হেঁট ক'রে আস্তে আস্তে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এলুম।

পাড়াটার এক প্রান্তে মেথরদের বস্তি। ঘুরতে ঘুরতে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি, ঝগড়ু জমাদার ঘরের সামনে খাটিয়ায় প'ড়ে আছে, আর দুজন লোক মহাবিক্রমে তার গা-হাত টিপছে। কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কি রে ঝগড়ু, জ্বর এল নাকি তোর? ঝগড়ুর বউ পাশেই ব'সে ছিল, সে-ই জবাব দিলে, জ্বর-টর কিছু নয় মেজবাবু, মদ না খেয়ে ওঁর এই দশা হয়েছে। বলে, গান্ধী মহারাজ মারা গেছেন, তাই মদ খাওয়া ছেড়ে দেবে। দেখুন তো বাবু, একে পুরোনো অভ্যেস, তার ওপর সারা দিন খাটে, একটু মদ না খেলে শরীর টানবে কেন? এ আবার আর এক সমস্যায় পড়া গেল। মদ খাওয়া গান্ধীজীর বারণ, কিন্তু মদ না খেয়েও তো লোকটার এই দশা! কি যে বলি ভেবে না পেয়ে চুপ ক'রে রইলুম। সমস্যার সমাধান ক'রে দিলে ঝগড়ুর বউই। কত ক'রে বলছি মেজবাবু, মদ খাওয়া যদি ছাড়বি তো আস্তে আস্তে কমিয়ে তার পর ছেড়ে দে, তা কিছুতেই শুনবে না গোঁয়ারটা। আদর্শ-বাদের সঙ্গে বাস্তবের চমৎকার রফা ক'রে নিলে মেয়েটা, আর আমাকেও বাঁচালে। মানে মানে স'রে প'ড়ে বাড়ির দিকে রওনা হলুম।

দূরে সমবেত কণ্ঠে ঘন ঘন মহাত্মাজীর জয়ধ্বনি শুনে বুঝলুম, পার্কে শোক-সভা চলছে। বোকা মেথরটার জন্যে দুঃখ হ'ল। ব্যাটা মদ ছেড়ে কষ্ট না পেয়ে মীটিংয়ে গেল না কেন? তাতেই তো চলত।

শ্রীদেবাংশু মুখোপাধ্যায়

বোবা সৃষ্টি

হে স্রষ্টা, তোমার সৃষ্টি বোবা, অর্থহীন;
ভাষা দিয়ে, অর্থ দিয়ে, তারে প্রতিদিন
মানুষ তুলিছে গড়ি নূতন করিয়া
আপনার কল্পনার মাধুর্যে ভরিয়া।

আকাশ সুনীল সত্য, সুনীল জলধি,
সুন্দর কি অসুন্দর কে জানিত, যদি
মানুষ না হ'ত মুগ্ধ হেরি নীল ছায়া ;
সুরে গানে না রচিত সুন্দরের মায়া !
প্রাণময় যন্ত্র এই তোমার রচনা ;
নাহি মন, নাহি প্রেম, করুণা, কল্পনা ;
বিপুল বিরাট সৃষ্টি অন্ধ শক্তিময়,
মানুষ দিয়েছে ভাষা, করেছে চিন্ময়
আপনার ভাব দিয়ে, আপনার মনে
করেছে অপূর্ব সৃষ্টি তোমার ভুবনে ;
কিন্তু তবু সে সকলি ভাবের বিলাস
তৃপ্তিহীন হৃদয়ের উদ্বেল উচ্ছ্বাস,
সৃষ্টি নয় সৎ কিংবা পরম অসৎ,
মানুষ রচেছে তার আপন জগৎ.
সত্যাসত্য, ভালমন্দ, অলীক কল্পনা
কালের সাগরতটে জলের আল্পনা।
কল্পনার জালে শুধু বাঁধে আপনারে,
অন্ধ সৃষ্টি ছুটে চলে আপনার ভারে
পিষ্ট করি, লুপ্ত করি নিজ গতিবেগে,
প্রলয়ের রুদ্রবীণা বাজে মেঘে মেঘে।

স্রষ্টা শুধু চেয়ে থাক মূক স্থাণুবৎ,
ভীত ত্রস্ত অসহায় করে দণ্ডবৎ।
ক্লিষ্ট আর্ত্ত ব্যথিতের আকুল প্রার্থনা
ভেসে যায় শূন্যমাঝে, শুনেও শোন না ;
রথচক্র ঘর্ঘরিয়া ছোটে অন্ধরথ
নিষ্পেষিত, নিঃশেষিত কল্পনা-জগৎ।

শ্রীগোপালদাস চট্টোপাধ্যায়

আমার বর্ষশেষ

ও-শে চৈত্র চ'লে গেল; লোকে বললে, বছর শেষ হয়ে গেল। বাড়িতে খাওয়ার কিছু বিশেষ আয়োজন; আমার মনে ছিল না, কারণ মাইনে পাই ইংরেজী মাসের পয়লা। বাংলা মাসের বা সালের সঙ্গে বাঙালীর বাধ্যতামূলক পরিচয় ঘটে জন্ম, বিয়ে আর শ্রাদ্ধের সময়; তার মধ্যে আবার জন্ম-তারিখটার বিলাতীকরণ ক'রে তবে জীবনবীমা বা কেরানীগিরি হয়। কেরানীগিরি করি; জীবনবীমার অগ্রিম দাদন (প্রিমিয়াম) দিই পয়লা তারিখে; তাই আজকে বর্ষশেষ হ'লেও আমি আপিসে গিয়েছি, ফিরে আসতে পথে কোন কোন দেশী দোকানে কলাগাছ আর আমপাতা দেখে ভেবেছি, বোধ হয় কোন দেশী পর্ব-টর্ব হবে, ওর সঙ্গে আমাদের জাতি-গোত্রহীন কেরানীদের কোন যোগাযোগ নেই। বিকেলে বাড়িতে খাওয়ার আয়োজনে সন্ত্রস্ত হয়ে স্ত্রীকে সভয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই তিনি দুটি টাকার প্রয়োজন জানিয়ে নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিলেন—যেন আমাকে উপেক্ষা ক'রে, আজকে ১লা বৈশাখ; বাংলা মাসটা মেয়েদের কিনা, তাই তোমরা খবর রাখ না।

পকেট থেকে একটি টাকা বের ক'রে দিয়ে বললাম, বছর তা হ'লে সত্যিই চ'লে গেল।

সুধা বললে, কেন যাবে না? তোমাদের মাইনের মত যুগের পর যুগ একই জায়গায় ব'সে থাকবে নাকি?

জামা ছাড়তে ঘরে এলাম। সুধা পেছন পেছন এসে আমার হাত থেকে জামাটা নিয়ে দড়ির ওপর ছড়িয়ে দিতে দিতে বললে, চাইলাম দুটো, দিলে একটা।

আমি। তোমাদের বছরের আরম্ভ আর আমাদের বছরের শেষ। দুটো টাকা দিয়ে কেনবার মত তোমাদের বছরের দাম নয়।

সুধা। বছরের দাম দেবে, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! বরং বল যে, সেলামি দিচ্ছ।

আমি মেঝেতে ব'সে একটা হাত-পাখা নিয়ে বাতাস খেতে খেতে বললাম, তোমাদের বছরকে ঘুষ দেবার আমার মত কেরানীর কোন দরকার নেই। একটু চা দেবে?

এচোড়ের চপ ভাজছি; একটু দাঁড়াও।—ব'লে সুধা চপল পায়ে চ'লে গেল।

এচোড়ের চপ—মানে, আনা আষ্টেকের একটা এচোড়, এক সের আলু, এক পোয়া রেশনের তেল, একুনে এক টাকা পাঁচ আনা। আলু অবশ্য ছ আনা সের; কিন্তু তেল পয়সা দিলেও পাওয়া যায় না।

ভাবছি, এতখানি দুঃসাহস সুধার হ'ল কি ক'রে? এ ছাড়া আরও আয়োজন নিশ্চয়ই আছে। যদি আবার কাউকে নিমন্ত্রণ ক'রে থাকে, তা হ'লে তো এই মাসের শেষে আপিসের দারোয়ানের কাছে হাত পাততে হবে। তা অবশ্য প্রায়ই হয়, তাতে লজ্জা কিছু নেই। অসুবিধা এই যে, মাইনে পেতে পেতেই দিয়ে দিতে হয়, একটু দেরি করবার উপায় নেই; কারণ ওরা জানে, দেরি হ'লে আর ফেরত পাবে না. আবার অপেক্ষা করতে হবে আসছে মাসের জন্যে। ইতিমধ্যে আমার বেপরোয়া ভাব।

চপের আশায় ব'সে আছি। চায়ের তৃষ্ণা পরিবর্ধমান। মাসের শেষ কিনা, দুপুরে চার পয়সার ছোলাভাজা-সমেত আধ পেয়ালা চা আজ কদিন থেকেই জুটছে না। আপিসে আসা-যাওয়ার খরচটা তো রাখতে হবে। গলাটা শুকিয়ে একেবারে যাকে বলে, উপোসী ছারপোকা। সুধার তো চপ-সমভিব্যাহারে আসবার কোন লক্ষণই দেখছি না। দেয়ালে যে একটু হেলান দিয়ে বসব তারও জো নেই, অসংখ্য গহ্বরে ছারপোকা ভরা। এর মধ্যেই পিঠটা ফুলিয়ে দিলে। উঠে গিয়ে ডাক দিলাম, সুধা, আর কত দেরি? সুধার উত্তর পাবার আগেই গলির পাশের খোলার বাড়ির বিমলি কাপড় মেলতে এল দড়িতে আপরাহ্নিক গাত্র-সম্মার্জনার পর। দেখতে বেশ সুডৌল মেয়েটা—সুধার এচোড়ের চপের চেয়ে লোভনীয়। বিমলি চ'লে গেলেও আমি না ভেবে পারলাম না যে, কোন বিশেষ নারীকে পুরুষ চায় না, চায় তার যৌবনের ব্যক্তিবিহীন নির্যাসটুকু, তরুণের কাছে তারুণ্যই কাম্য, সে তারুণ্য বাগদী মেয়েরই হোক আর মেথরানীরই হোক।

কথাটা ভেবে নিজের প্রতি কেমন বিতৃষ্ণা এল। সুধাকে চপের জন্যে আবার তাগিদ দেব ভেবে যেই মুখ খুলেছি, অমনই নীচে বড় মেয়ে তিন্নুর (ভাল নাম তনিমা কিনা) মুখ গেল খুলে; চীৎকারে একেবারে চপের আশা বিদীর্ণ হয়ে গেল। তার কান্নার ওপরেই এল সুধার উপর্যুপরি চড়ের শব্দ। মেয়েটা আর্তনাদ ক'রে উঠল। নীচে গিয়ে কোলে ক'রে তিন্নুকে নিয়ে ওপরে এসে ব'সে একটু আদর ক'রে বললাম, এক গেলাস জল নিয়ে এস তো মা।

কাজ করতে বসতেই তার ফোঁপানি থেমে গেল; দেখলে, তাকে আমি তার মায়ের সমান প্রাধান্য এবং মর্যাদা দিচ্ছি। মারের ব্যথা কত সহজে ভুলে গেল। রাগ হয়ে গেল সুধার ওপর। কেন এদের মারে? শব্দ এল নীচে থেকে, এই তেনি, শুধু জল নিয়ে যাস নে এখন।

তার মানে, সুধার চপের আশায় বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ ক'রে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হবে। মুখটি শুকিয়ে তিনু ওপরে এসে আমার পাশে চুপটি ক'রে বসল। রাগে বিষিয়ে উঠল মন আমার। ছোট মেয়েটাকে কেন এমন ক'রে শাস্তি দেয়? সারা দিনের পর বাড়ি এসে কোন স্বাচ্ছন্দ্যের আশা, স্নিগ্ধতার আশা বহু দিনই ছেড়ে দিয়েছি, তবু একেবারে এত অশান্তি কেমন ক'রে সহ্য করি? সুধা ডাকল তিনুকে। তিনু নীচে গেল।

সুধা। যা তো, চার পয়সার দুধ নিয়ে আয় ময়রার দোকান থেকে।

শচী তো ছিল নীচে; আবার তিনুকে পাঠানো কেন? আমার কাছে বসতে দিতে চায় না ওকে সুধা। মেরেছে, আবার আমি যে একটু মেয়েটাকে আদর করব, তাতেও হিংসে। মেয়েমানুষ কি জাত বাবা! চেঁচিয়ে বললাম রাগের মাথায়, এচোড়ের চপে আর দরকার নেই; এক পেয়ালা চা হ'লেই চলবে।

সুধা নীচে থেকে বললে, কার জন্যে চপ ভেজে মরছি তবে?

আমি। চপ ভেজে যদি মরতেই হয় তো না হয় নাই ভাজলে।

সুধা। কেবল কথাই বলতে পার, ছেলেটাকে একটু সামলালে কি ক্ষতিটা হয়? এই যে পা দিয়ে দুধটা ফেলে দিলে তার কি হবে? আবার তো আনতে হ'ল।

সুধার স্কুলের বন্ধু এল নিমন্ত্রণে, এখনও বিয়ে হয় নি তার, দারিদ্র্যের আর অবিরাম পরিশ্রমের ভারে এখনও তার মেজাজ সপ্তমে চড়ে নি। সে এখনও স্নিগ্ধ, ভাবালু, নতিয়ে-পড়া, বহুবার দেখেছি একে। মেয়েটার একটা গুণ হ'ল, হাসবার সময় হিসেব ক'রে হাসে না। যতখানি সম্ভব হেসে নেয়। সে এসেই বললে, আর এক জায়গায় যেতে হবে ভাই; তাই তোকে বলতে এলাম। রাতে আসব আবার। দেখিস, যেন সব সুধীরদাকে দিয়ে দ্রৌপদী সেজে ব'সে থাকিস না।

সুধা মেজাজ নামিয়ে, ভদ্রতা বাঁচিয়ে, ঠোঁটে হাসি এনে বললে, তুই যা আসবি সে আমি জানি।

আচ্ছা দেখিস !—ব'লে পূর্ণিমার অন্তর্ধান।

আমাদের আবার অমাবস্যা।

সুধা তিনুকে বলছে, হ্যাঁরে, টাকাটা কোথায় রাখলাম ?

তিনু : তা তো জানি না মা।

সুধা তিনুকে ভেঙিয়ে বললে, তা তো জানি না মা ! রেবাদের বাড়িতে ব'লে এসেছি, ওদের চাকরকে দিয়ে মাছ আনিয়ে নেব। এখন না আনতে দিলে ওরা হাসবে না ? ধাড়ি মেয়ে, কিছু যদি পারবে !···দেব আবার কসাটা নিংড়ে ?

সুধার ফোঁস্‌ফোঁসানি দেখি বেড়েই চলেছে। নিজে হারিয়েছে টাকা, অথচ নিরপরাধ মেয়েটাকে লাঞ্ছনা করতে একটু দ্বিধাও ওর হচ্ছে না। আমার কাছে সাধু সাজবার চেষ্টা। টাকাটা তা হ'লে হারাল—এই শেষ-মাসের, অনেক চেষ্টায়, অনেক লোভ সামলে বাঁচানো পথ-খরচের দুটো টাকার একটা এই ভাবে অবহেলায় সুধার মেজাজের মূল্য দিতে গেল। তার জন্যে একটু অনুশোচনাও নেই ওর। আবার বলছে, বাবা, এই এক আনা, আধ আনা, এক টাকার চুল-চেরা হিসাব করতে করতে প্রাণটা গেল ! একটা পয়সা এদিক ওদিক করবার জো নেই, এমনিই পোড়ার সংসার হয়েছে আমার।

তিনু উত্তর দিলে, তুমিই তো তাড়াতাড়ি গেলে পুষু মাসীকে বসাতে।

ফের মুখে মুখে উত্তর !—ব'লেই কি ধরনের শাস্তিটা তিনুকে দিলে জানি নে, মেয়েটা ডুকরে কেঁদে উঠল।

তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে জুতো পায়ে ঢুকোতে ঢুকোতে নীচে নেমে গিয়ে বললাম, নব-বর্ষের এচোড়ের চপ আর খেতে রুচি নেই।

তারপরে একেবারে সোজা রাস্তায় এসে উত্তরণ।

এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি যে, গৃহের ঝড়ের আড়ালে আকাশেও কালবৈশাখী ঘনিয়েছে। বাড়ির ঝাঁঝের বদলে এখন নাকে ঢুকবে রাস্তার ধুলো। আর জীবনের প্রতি ধিক্কারে যে জল চোখ দিয়ে বাড়িতে ফেলতে ঘেন্না হয়েছিল সেই জল বেরোবে ধুলোর আক্রমণে। গিয়ে বসলাম পার্কে—ছাউনি-দেওয়া এক বেঞ্চির ওপর—সামনে সিনেমা থেকে বেরিয়ে আসছে ছবিবিহ্বল জনতা, ওদের ঢুকতেও যেমন ঠেলাঠেলি, বেরোতেও তেমনই। কেন বাবা, একটু ব'য়ে ব'সে, সকলে বেরিয়ে গেলে, বেরুতে ক্ষতি কি ?

ঝড়ের ভয়ে পার্ক জনবিরল হয়ে উঠেছে। তা না হ'লে লোকের ভারে ফেঁপে-ওঠা কলিকাতার পার্কে এখন লোক উপছে পড়তই

এক ধারে গাছের তলায় কেবল চার জন লোক তাসে গভীর মগ্ন, তাদের ভ্রূক্ষেপও নেই, জগতে বা আকাশে কি ঘটছে! তাদের একজন—এই তো চাঁদ, রঙের চোদ্দ লুকিয়েছিলিস—বলতে বলতেই এল ঝড় বর্ষশেষের ঝাঁটা হাতে ক'রে, দিলে ওদের তাস উড়িয়ে সারা পার্কময়। ধর্ ধর্, এই যে ইস্কাবনের সাতা, এই সাহেব, উই উই যে টেক্কা যায়, সব মাটি ক'রে দিলে—ইত্যাদি আক্ষেপের সঙ্গে ধুলোয় অন্ধ হয়ে তাস কুড়োতে কুড়োতে একজন এসে পড়ল একেবারে আমার ঘাড়ের ওপর। চোখে দেখতে পান না মশাই?—ব'লে ঠেলে ফেলে দিতে গিয়ে দেখি, লোকটার মুখে বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে। সরিয়ে দিতেই দিলে গায়ে এক ঝলক বমি ক'রে, বললে, একেবারে শুকো যাবে বাবা, বছরকার দিনে। লোকটার গালে এক চড় মারতেই সেও রুখে এসে বেঞ্চিতে ধাক্কা খেয়ে প'ড়ে গেল। পার্ক ছেড়ে নেমে এলাম রাস্তায়। পুরোনো বছরের অজীর্ণ আজ নববর্ষ যেন উদ্গার ক'রে দিল আমার গায়ে। কে জানে, আজ নতুন বছর পড়ার আনন্দে লোকটা অন্য দিনের চেয়ে বেশি মদ খেয়েছে কি না! রাস্তার কলে ধুয়ে নিলাম আমার হাতাটা; তবু গন্ধ যায় না, যায় না কিছুতেই পুরো এক বছরের জমা গন্ধ, তাতে ডুবে যায় নতুনের সোঁদা গন্ধ। তা না হ'লে আমার এই আটাশ বছরের জীবনে কেন কেবল দেখি পুরোনোর পুনরাবর্তন, না, পুরোনো বললেও তো কিছু একটা হ'ল, আমার জীবনে শুধু দেখেছি ঘটনা-বিহীনতার বারে বারে ফিরে আসা। ওই মাতালটা কেন মদ খেয়েছিল? একঘেয়েমি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে?

কলিকাতার গ্লানিময় ধুলো আর সহ্য হচ্ছে না। মুখ, হাত, পা চিটচিট করছে। তবু যাই কোথায়? বাড়িতে তো নববর্ষ শেষ হয়ে আবার পুরোনো বছর তেমনই ক'রেই শুরু হয়েছে দেখে এসেছি। রাস্তায় তবু ঝড় আছে। বেশ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নিজেকে যেন চলতেই হচ্ছে না।

সামনের মনিহারী দোকানে লোকের ভিড়, উপহার কিনছে সব। ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল শিবানী মজুমদার। মেয়েটা আমাদের সঙ্গে পড়ত এম. এ.। আমি চিনি ওকে, আমাকে ও চেনে কি না, জানি না। শিবানীর হাতে একটা মোড়ক, ছেলেটার মুখে হাসি, বুঝলাম, ছেলেটার জীবনে আজ কিছু

একটা ঘটল। শিবানীর নধর শ্যামল মুখে লজ্জার আর সন্তোষের ছড়াছড়ি। মনে হ'ল, সুধার ভারি মিষ্টি বিরল হাসিটুকু। আহা, বেচারী কত উৎসাহে এই অভাবের মধ্যেও আজ নববর্ষ উদ্‌যাপন করতে গিয়েছিল।

ফিরে এলাম বাড়ি। দেখি, এক বড়লোক ছাত্র ব'সে আছে বাইরের ঘরে। একে আমি বি. এ. পড়াতাম মাস কয়েক আগে, মাইনেটা দিত ঠিক। পরনে কোটপ্যাণ্ট, হাতে এক ঝুড়ি ফল-মূল ইত্যাদির উপহার। শচী তিনু লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঝুড়ির দিকে। তিনুর মুখে একটু আগের প্রহারের কোন চিহ্নই নেই। আমি ঢুকতেই সমীর প্রণাম ক'রে বললে, বিকেলে আসাই আমার ভুল হয়েছে মাস্টারমশাই; এখন কখনও কেউ বাড়িতে থাকে? তবে ভাবলুম, আপিস থেকে ফিরে আপনি হয়তো বেরুবেন না। তারপরে বিনীত-ভাবে ঝুড়িটা দিলে এগিয়ে। আমি বললাম, এসব কি সমীর? যদিও জানি, এসব কি এবং কেন।

সমীর। নববর্ষটা ভাল ক'রে আরম্ভ করতে চাই, এই আর কি। ওগুলো দেওয়া যে প্রথা।—ব'লে তিনু আর শচীকে আদরে ক'রে 'তবে আসি মাস্টার-মশাই' ব'লে বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠল। গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে দেখি, অনেক উপহারের ভারে গাড়ি একেবারে বোঝাই।

বাইরের ঘরে ফিরে এসেই দেখি, সুধা ঝুড়িটা তুলে নিয়েছে, চোখে মুখে নাকে—যেখানে সেখানে আনন্দের উচ্ছ্বাস। আমাকে বললে, সমীর ছেলেটি তো বেশ।

আমি। আলাপ করেছ, না, ঝুড়ি দেখে বলছ?

সুধা। ফের ঝগড়া বাধাবার ফন্দি?

দেখলাম, এখন সুধার মেজাজ শরিফ, টাকার প্রলেপ লেগেছে, সে প্রলেপ এখন খানিকক্ষণ উঠবে না। মন আমারও খুশি, মাসের শেষে ভাল খাওয়া জোটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তা ছাড়া, দিন দুই আর বাজার করবার ভাবনা রইল না। সমীর ছেলেটি ভাল। ও-ই আমাদের পুরাতন বৎসরের জীর্ণতা দূর ক'রে নববর্ষের উদ্বোধন ক'রে দিয়ে গেল। তিনু বললে, মা, সমীরদার বিয়ে হবে? সুধা তৃপ্ত বিস্ময়ে তিনুর দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলে, তোর পছন্দ হয় নাকি সমীরকে? তিনু 'যাঃ' ব'লে আমার পেছনে লুকোল। এমন সময়ে সমীর আবার ফিরে এসে বললে, মাস্টারমশাই, মাছটা দিতে ভুল

হয়ে গিয়েছিল। চাকর মাছটা রাখতেই সে মুখ তুলে তাকিয়ে তিমুকে আরও আত্মগোপন করতে দেখে হেসে বললে, ও অত লুকোচ্ছে কেন? তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে না ব'সেই বললে, যাই, আবার দেরি হয়ে যাবে। সুধা ততক্ষণে ঝুড়িটা রেখে দিয়ে চ'লে যাবার ভান করতে করতেই সমীর চ'লে গেল; সুধার আপেক্ষিক ভাবে দীর্ঘ উপস্থিতিতে তার চোখে একটু বিস্ময় জাগল। ঝড়ের ধুলো থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টায় সে আমাদের বাড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যাবার পথে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সুধাকে যে দেখে নিল এক চুমুক, এ আমি লক্ষ্য করলাম। সুধার মুখে হাসি, বললে, চল, আজ নটার শো-তে সিনেমায়।

মা ও মেয়ে, দুজনাকেই চঞ্চল ক'রে দিয়ে গেল সমীর। একটা নিষ্ফল ক্ষোভে ইচ্ছে হ'ল, আবার বেরিয়ে পড়ি ঝড়ের মধ্যে, প্রকৃতির যা কিছু পুরাতন, সব তো উড়ে যাচ্ছে ঝড়ে; কিন্তু মানুষের সেই পুরাতন তো নতুন কিছু হয়ে উঠছে না। তাই রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতায় শুধুই প্রাকৃতিক হুল্লোড়। দূর ছাই! এখনও এক কাপ চা-ই খাওয়া হয় নি। বললাম, কই, চা-টা কর নি? দেখলাম, কিছুই গভীর ক'রে ভেবে লাভ নেই। ঝড়ে সব কিছুর ওপরটাই ওড়ে। তলায় থাকে সেই চির-পুরাতন।

সুধা মাছটা তুলে নিয়ে এদিক-ওদিক ফিরিয়ে দেখে বললে, এই জন্যেই টাকাটা হারাল।...আচ্ছা, সমীরদের মাসে কত আয়?

আমার চায়ের আবেদন সুধার কল্পনায় স্থানই পায় নি। উত্তর দিলাম, সত্যি মিথ্যে না ভেবেই—হাজার পাঁচেশেক হবে। একটু চা কর।

সুধা প্রচুর জিনিসের মধ্যে ডুবে গিয়ে সেগুলিকে নিয়ে রান্নাঘরে চ'লে যেতে যেতে বললে, ওপরে গিয়ে ব'স না, দিচ্ছি পাঠিয়ে। করতে তো গিয়ে-ছিলাম, নিজেই তো রেগে বেরিয়ে গেলে।

অভিমানের স্থান নেই পাঁচ বছরের প্রবীণ স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে। স্ত্রী তো আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে সঞ্চয় করে স্বামীর পৌরুষের প্রতি অবজ্ঞা। তারপর কল্পনায় লাগে সমীরের সমীরণ। এত সহজে তাই সমীর সুধার মনে দৃঢ় ক'রে দিয়ে গেল আমার প্রতি সুধার বিতৃষ্ণা আর অবজ্ঞা। আমার নববর্ষে এল অবহেলার উপহার।

সুধা চা এবং চপ নিয়ে এসে বসল, দেখি, তার দৃষ্টি নিজের কব্জিতে

নিবদ্ধ। আমি চপ শেষ ক'রে চায়ে মনোনিবেশ করছি. সুধা বললে, তা হ'লে তুমি টিকিট কেটে আনগে, যাব সিনেমায়।

আমি। সিনেমা দেখতে যাওয়ার টাকাটাও কি সমীর দিয়ে গেল নাকি?

সুধা। সমীরের কাছে আজকের জন্যে তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

এল ঝড়ের এক ঝাপটা ঘরে, ধুলোয় ভ'রে দিয়ে গেল। বললাম, কাঁচগুলো বন্ধ ক'রে দাও না।

সুধা। আজকের দিনে আসুক না ধুলো। ·আচ্ছা, ব্রোঞ্জের ওপর গড়লে তো সোনা কম লাগবে। তাই গড়তে দাও না কেন? লোকজনের সামনে বেরুতে লজ্জা করে যে।

আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে যে, সমীর আসার পর থেকে সুধা নিজের চাওয়া-পাওয়ার কল্পলোকেই নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে, আমার করুণ মুখের দিকে চেয়ে দেখবারও ওর অবকাশ নেই; দরকারও নেই আমার কথার মানে বোঝবার। ব'লে চলেছে নিজের কথা। সুধার কথায় মনে হয়, ও ভুলে গিয়েছে যে আমি সমীর নই, কেরানী—মাসিক আয় যুদ্ধের কল্যাণে ১২৫ টাকা। আসল আয় ৬০ টাকা বোধ হয় শীঘ্রই আবার পেতে আরম্ভ করব।

সিনেমা এবং চুড়ি, কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টা রাখি? যদি কোনটাই না রাখি তা হ'লে এই ক্ষণিক নব-বার্ষিক শান্তির মোহ একেবারে যাবে ভেঙে।

চায়ের কাপ রেখে দিয়ে সমস্ত ক্ষুব্ধ জড়তা কাটিয়ে বললাম, কিন্তু, শচীকে কোথায় রেখে যাবে যদি সিনেমায় যাও?

সুধা চোখ নাচিয়ে বললে, ও-বাড়ির রেবার কাছে রেখে যাব।

আমি। টিকিট করবার টাকাটা তুমি ধার দেবে তো?

আচ্ছা, দেখছি খুঁজে —ব'লে সে উঠে গেল। আমি নীরবে মাকড়সার জাল বুনে যেতে লাগলাম।

সুধা শুধু দেখেছে সমীরকে, আর তো কিছু নয়। না না, সমীর একটু মূল্যবান দৃষ্টিও চ'লে যাবার মুখে সুধাকে দিয়েছিল। সমীরের দৃষ্টির পেছনে আছে সামর্থ্য। এতেই আজ সুধার হৃদয়ের রুদ্ধ দুয়ার খুলে এতদিনের সুপ্ত বে-হিসেবিটা বেরিয়ে পড়েছে।

স্বীকার করি, আমার দারিদ্র্যে তার জীবন পদে পদে আত্মস্ফূর্তির পথে

পেয়েছে বাধা। কিন্তু আমার জীবনেরও তো সেই দশা। তবে সহানুভূতির বদলে আজ এ অবজ্ঞা কেন সুধার?

সমীর কিসের আভাস আনে তার কাছে? মনের অজস্র কামনার অফুরন্ত পরিতৃপ্তির? নির্বাধ, উচ্ছল, ঐশ্বর্যময় জীবনের বিলাসের?

কোথা থেকে তিনটে টাকা এনে সুধা আমার কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বললে, যাও, আর দেরি ক'রো না। শেষে হয়তো দেখবে, হাউস্ ফুল

বেরিয়ে যাচ্ছি, এমন সময়ে সে ডেকে বললে, বেশি দেরি ক'রে ফিরো না যেন। খেয়েদেয়ে তবে তো বেরুতে হবে।

বুক-পকেটে হাত দিয়ে দেখি, ফাউন্টেন পেন নেই। জিজ্ঞাসা করলাম। সুধা নিজের বুক থেকে সেটা বের ক'রে আমার হাতে দিলে, কলমটায় তখনও সুধার বুকের উত্তাপ। ওর মুখে আজ খুশির আভা। বছর দুই হ'ল আমার কলমে ও আর হাত দেয় নি। আজ বহুদিন পরে মন ওর ঐশ্বর্যের সুদূর আভাসে গ্লানিহীন। ইচ্ছে হ'ল, খোঁপাটা ধ'রে একটু নেড়ে দিই। ও বললে, কলমটা সারিয়ে নাও না কেন? দিয়েছে তো সমীর, আবার সারিয়েও কি সে ই দেবে?

আমি। সমীরকেই বলব মনে করছি।

সুধা। তা তো বলবেই; লজ্জা তো আর কিছুতেই নেই।

আমি। না, ওটা বহুদিনই গিয়েছে, যেদিন প্রথম ট্রামে পয়সা ফাঁকি দিই টিফিনে সেই পয়সায় চা খাব ব'লে।

সুধা হেসে ফেললে, সে হাসিতে সশ্রদ্ধ সমর্থন। আমার কিন্তু সেই প্রথম ফাঁকি-দেওয়া এখনও পীড়িত করে মনকে। মনে হয়, সেইদিন প্রথম জীবনে মরেছিলাম। সুধা বললে, তুমি আবার ফাঁকি দিতে পার নাকি? পয়লা তারিখে বাড়ি-ভাড়া দেবার জন্যে ছোটাছুটি কর। ওই তো রেবার বর তিন মাস ভাড়া না দিয়ে রয়েছে। আসছে মাসে যদি উঠে যায় তো চার মাসের ভাড়াটা তো ওর লাভ হ'ল। মাসে মাসে পঁচিশটা ক'রে টাকা সোজা কথা! গা যেন করকর করে।

এই সুধাই বিয়ের রাতে আমাকে বলেছিল, সকলে ঘুমিয়ে পড়লে, চাঁদের ম্লান আলো ভোরের ফিকে অন্ধকারে যখন সামনের আম-বাগানের মাথার ওপর সৃষ্টি করেছিল সুধার মরীচিকা—আমরা দুজনে কখনও পয়সার লোভে অন্যায়

করব না। অবশ্য জানি, সে কথার মূল্য রাখা আজকের জগতে অসম্ভব। তবু সেই কথা আর আজকের এই কথা! আবার তাকালাম ওর মুখের দিকে, সেই লোভনীয় খুশির লাবণ্য। কিন্তু বিয়ের রাতের সভোবিবাহিতা সুধার মুখের সেই সারল্য কোথায় গেল? আজকের এ লাবণ্য যেন গভীর সাংসারিকতায় চোবানো। সুধা আবার বললে আচ্ছা, তুমি যে বলেছিলে সমীরদের আপিসে কি একটা পার্ট-টাইম কাজ নেবে?

আমি। আত্মসম্মানে বাধল।

ওঃ, আত্মসম্মান!—সুধা ব'লে চ'লে গেল ঘর থেকে। নীচে থেকে বললে, যাও, আর দেরি ক'রো না।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পথে আবার ওর মুখের দিকে না তাকিয়ে পারলাম না। সে মুখে সেই লাবণ্য প্রলুব্ধ করছে আমাকে। কিন্তু যে অবজ্ঞা করে তার লাবণ্য যে আমার নাগালের বাইরে। উদ্ধত আবেগ নিষ্পিষ্ট ক'রে চ'লে গেলাম। সুধা যেন আমার স্ত্রী নয়, তাই এত সুন্দর! সমীরের দৃষ্টির মোহ ছড়িয়ে গিয়েছে ওর মুখে।

না সার্, থার্ড ক্লাস নেই। দেখছেন না, থার্ড ক্লাস ফুল।

ঢোকবার সময় দেখি নি যে, থার্ড ক্লাসে আর জায়গা নেই। শনি-রবিবার ছাড়াও থার্ড ক্লাস ফুল হয় তা হ'লে? একটি সিনেমাভিজ্ঞ ছোকরা অযাচিত উপদেশ দিলে, মাই সিস্টারের থার্ড ক্লাস আজ কেটে আজই দেখবেন!

দেড় টাকারও নেই?

না।

কাছে আছে মোটে তিনটি টাকা।

গুণ্ডার কাছে দশ আনার টিকিট এক টাকায় কিনলাম। আজকে শুধু-হাতে ফিরতে যেন কিছুতেই মন সায় দিলে না। কেন জানি না মনে হ'ল, আজ আমার যেমন ক'রেই হোক টিকিট কিনতেই হবে। আজ টিকিট না পাওয়ার সম্ভাবনা কার কাছে যেন পরাজয়ের মত বাজছে বুকে।

পৌনে নটায় চিত্রগৃহে পৌঁছে ঢুকতে যাব ভেতরে, এমন সময় পেছন থেকে বিনীত স্পষ্ট আহ্বান এল, মাস্টারমশাই! পেছন ফিরে দেখি সমীর এগিয়ে এসে বললে, একটা অনুরোধ যদি রাখেন মাস্টার মশাই। তাকিয়ে রইল সে আমার আর সুধার মুখের উপর। সুধা বললে, কি অনুরোধ, বল

না। কণ্ঠস্বরে সুধার খুঁজে পেলাম বহুদিন আগের উচ্ছলযৌবনা, স্পর্ধিতা মুগ্ধা নারীর প্রথম অভিজ্ঞতার বিচিত্র বিস্ময়, এই পাঁচ বছরের ক্লেদ কোথায় ধুয়ে চ'লে গেল এই আলোকোজ্জ্বল হর্ম্যতলে, এই জনতার তীর্থে! ছায়াচিত্রের প্রবেশপথে ছায়ার মত মিলিয়ে গেল পূর্বের সুধা। সুধার মুখের দিকে না তাকিয়ে সমীরের প্রতি একটু প্রশ্রয় দেওয়ার হাসি হাসলাম। সে হেসে বললে, দাদা, বউদি, আর আমি একটা বক্স নিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা আসতে পারলে না। আপনারা আসুন না আমাদের বক্সে। আমি বললাম, কিন্তু বক্সে—

সমীর। আচ্ছা মাস্টার মশাই, আমার কি একটুও জোর নেই আপনাদের ওপর? আপনি কিনা টাকার কথা ভাবছেন।

সমীরের মুখে সত্যিকারের বেদনা ফুটে উঠল।

সুধা। চলই না সমীরের বক্সে, বেশ সকলে একসঙ্গে দেখা যাবে। সকলের মাঝখানে বসার চেয়ে এ বেশ নিরিবিলি।

সমীর সুধাকে বললে, দেখুন, আপনি কত স্নেহ করেন আমাকে। আর মাস্টার মশাই এখনও ভাবছেন।

আমি। একেই বলে—চোরের ওপর বাটপাড়ি। তুমি আমার ছাত্র, আমার মাধ্যমে তোমার সঙ্গে ওঁর পরিচয়। আর উনি কিনা তোমায় বেশি স্নেহ করেন!—ব'লে মৃদু মৃদু হাসলাম। কিন্তু টিকিট দুখানার রিফাণ্ড নিতে হবে তো?

আমার এই হিসেবীপনায় পঁচিশ-টাকা-বাড়ি-ভাড়া-ব্যথিত সুধা বিরক্তিতে বললে, থাক্ না রিফাণ্ড নেওয়া। আজ কি সুধা সব বিলিয়ে দিতে বসেছে?

সমীর। আর রিফাণ্ড দেবেও না ওরা। বজ্জাতের ধাড়ি সব। ও আশা ছেড়ে দিন মাস্টার মশাই।

গিয়ে বসলাম বক্সে, আমাদের দুজনের মাঝে সমীর। কি ক'রে যে বসাটা এই ভাবে হয়ে গেল তা আমি ভেবেই পেলাম না। সমীর একবার বললে, মাস্টার মশাই, আপনি এই চেয়ারটায় আসুন। আমি বললাম, থাক্ না।

বিজ্ঞাপনের পেছনে গান হচ্ছে রেকর্ডে—

পথের শেষ কোথায় শেষ কোথায়, কি আছে শেষে !
এই কামনা এই সাধনা, কোথায় মেশে !
ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার, সম্মুখে ঘন আঁধার
পার আছে কোন্ দেশে !
আজ ভাবি মনে মনে
মরীচিকা অন্বেষণে
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই, মনে ভয় লাগে সেই—
হালভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা
চলেছে নিরুদ্দেশে ।

এই কথাটাই কেবল মনে হচ্ছিল, পথের শেষ কোথায় ? এই কয় বছরেই তো মনে হয় একই পথ ঘুরে ঘুরে অতিক্রম করেছি। আজ এসে পৌছেছি একটা নতুন বাঁকের মুখে।

সুধা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

সমীর বললে, গানটা যে কতবার শুনেছি !

সুধা। কি অদ্ভুত সুর! চণ্ডালিকার সেই দৃশ্য আমার স্পষ্ট মনে পড়ে গানটা শুনলে। ভিক্ষু আনন্দের অপার বেদনার রূপ ঐ গানে।

মুগ্ধ হয়ে গেলাম সুধার ভাষায়।

সমীর। ওটা চণ্ডালিকার গান নাকি ?

সুধা। হ্যাঁ, জান না বুঝি ?

সমীর। আপনার এত মনে থাকে !

সুধা ফিরে তাকালে সমীরের দিকে। আমি বললাম সমীরকে, তোমার গুরুপত্নী সুগায়িকা সমীর।

সমীর। যদি প্রশ্রয় দেন তো শুনতে আসি একদিন।

সুধা। ভুলে গিয়েছি সব গান আমি। আর তো গাই না।

সমীর। কেন গান না ?

এর উত্তর আমি জানি। সুধা আর উত্তর দিলে না, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল পর্দার ওপর। তারপরে বললে, ভাল লাগে না, সেই জন্যে।

নিষ্কারণে এত লজ্জিত আর অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। সুধা কি আমাকে দোষী করছে নিজের অপূর্ণ জীবনের জন্যে ?

ছবি আরম্ভ হয়ে গেল। ভাল ক'রে দেখতে পারলাম না। একটু পরে প্রেক্ষাগৃহের অন্ধকারে মনে হ'ল, আমার যেন এখানে কোন স্থান নেই। যদি একেবারে এই অন্ধকারে গ'লে যেতে পারতাম, তা হ'লে হয়তো সুধার জীবন পেত নতুন উন্মুক্তি। আমিও পুনর্জন্ম গ্রহণ করতাম। কিন্তু কেন? আমি তো অবহেলায় জীবনের সুযোগ নষ্ট করি নি। তবে কেন এ ক্ষোভ? ইচ্ছে হ'ল, বাইরে চ'লে যাই। যাওয়াটা কি উচিত হবে? কিন্তু এ ভাবে শূন্যতায় পর্যবসিত হয়ে ব'সে থাকা অসম্ভব। উঠে পড়লাম। ওরা দুজনে ছবিতে মগ্ন।

বললাম, দেখ, আসবার সময় বাইরের দরজায় শুধু শেকলই দিয়েছ, তালা তো দাও নি।

ব'লেই মনে হ'ল—এ কি করলাম?

সুধা শূন্য কণ্ঠে উত্তর দিলে, তা হ'লে কি ফিরে যাব এখনই?

আমি। না, চাবিটা আমাকে দাও, আমি—

সমীর। তা হ'লে আপনি না হয় চাবিটা নিয়ে এগিয়ে যান। যদি বলেন তো এঁকে আমি পৌঁছে দিতে পারি আমার গাড়িতে।

সুধার মুখের দিকে চাইল সমীর অনুমোদনের জন্যে।

না, আমি যাই।—ব'লে উঠে দাঁড়াতে যাবে, আমি বাধা দিয়ে বললাম, না না, তুমি দেখেই যেয়ো। সমীর পৌঁছে দেবে, তাতে দোষ কি?

বেরিয়ে এলাম পথে।

যথাসময়ে সুধাকে সমীর পৌঁছে দিয়ে গেল। ওর মুখের দিকে তাকাতে আমার ইচ্ছা হ'ল না, কিন্তু কৌতূহল হ'ল। বাড়ির মধ্যে তখনও সে ঢোকে নি—

গলির ওপরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে—সমীর চ'লে গিয়েছে—আমি দুয়োর ধ'রে দাঁড়িয়ে আছি—আমি সরলেই সুধা ঢুকবে। জনহীন গলি, মাথার ওপর গাছের ফাঁকে চাঁদ—অপরূপ সুধা। বললাম, এস। সুধার যেন চমকে ভাঙল, বললে, দাঁড়াই না একটু; ঢুকতে তো হবেই। বুঝলাম, কিছুতেই সেই পূর্বজীবনের সঙ্গে সুধা আর খাপ খাওয়াতে পারছে না, কিন্তু সমীরের গাড়ি তো চ'লে গিয়েছে। এ ঘর ভাল না লাগলে নতুন ঘরে যাবার বাহন তো চাই। বললাম, তা হ'লে তুমিই ঢোক, আমি একটু যাই।

নিরুদ্বেগ জিজ্ঞাসায় সে চোখ রাখলে আমার মুখের ওপর। উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলাম না। গলির ওপর দাঁড়িয়ে রইল সুধা; দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পথে নেমে এলাম আমি। আমার ঘরে লাগল ভাঙন নববর্ষে, কিন্তু নতুন ঘর কি গড়ল কোথাও ?

খানিক পরে ফিরে এসে দেখি, তেমনই ক'রেই চুপ ক'রে সুধা দাঁড়িয়ে আছে দুয়োর ধ'রে। গাছের আলো-ছায়া তার সর্বাঙ্গে, আঁচল লুটোচ্ছে মাটিতে, যেন কার প্রতীক্ষারত।

আমি আসতেই সে যেন চমকে উঠে ক্ষিপ্রপদে ঢুকল ভেতরে, পেছনে আমি। আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে কাঁধে মুখ রেখে সুধা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, ভগ্নোচ্চারণে বললে, কেন এমন হয় বলতে পার ?

শ্রীশীতাংশু মৈত্র

ডানা

৫

রূপচাঁদ মৌলিক আপিসে বেরিয়ে গেছেন। বকুলবালা নিজের ঘরে তন্ময় হয়ে ব'সে আছেন তাঁর নূতন খেলনাটি নিয়ে। কাল রূপচাঁদ হলদে পাখিটি এনে দিয়েছেন তাঁকে। আনন্দবাবু যে কবিতাটা লিখে দিয়েছেন সেটা বড় বড় ক'রে লিখে দিয়ে গেছেন রূপচাঁদ একটা কাগজে। কিন্তু কবিতাটা বড়—অত বড় কাগজ খাঁচায় ঠিক সাঁটা যাচ্ছে না। বকুলবালা শেষে ঠিক করলেন, কাগজটা দেওয়ালে ছবির মত ক'রে টাঙিয়ে দেবেন। টাঙিয়ে তার পাশে খাঁচাটা টাঙিয়ে দেবেন। অনেক খুঁজে খুঁজে পেরেক বার করলেন চারটে। তারপর রান্নাঘর থেকে নোড়া নিয়ে এলেন। নোড়া দিয়ে পেরেক ঠুকতে গিয়ে আঙুলে লাগল দু একবার। কিন্তু বকুলবালার তাতে গ্রাহ্য নেই। অনেক কষ্টে হেঁট হয়ে হয়ে চারটে পেরেকই ঠুকে ফেললেন তিনি। কিন্তু ঘরের দেওয়াল পাকা। ভাল ক'রে ঠোকা গেল না, ঠোকবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পেরেক প'ড়ে গেল, কবিতার কাগজটা বেঁকে গেল। রোখ চ'ড়ে উঠল বকুলবালার। খানিকটা ময়দা বার ক'রে গুললেন প্রকাণ্ড এক অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে, তারপর ঘুঁটে জ্বেলে উনুনটা ধরিয়ে ফেললেন। ধোঁয়ায় চোখ লাল হয়ে জল পড়তে লাগল। কিন্তু এসবে নিরস্ত হবার পাত্রী বকুলবালা নন। একবার যখন

ঝোঁক উঠেছে কাগজটাকে সাঁটতে হবে, তখন না সেঁটে কিছুতেই ছাড়বেন না তিনি। আঠা হয়ে গেল। কিন্তু ভয়ানক গরম। বাটিটাকে সাঁড়াশি দিয়ে এক চৌবাচ্চা জলের উপর ধ'রে রইলেন। সমস্ত চৌবাচ্চার জলটা যে কালো ভুসোতে ভ'রে গেল সেদিকে খেয়াল নেই। একটু ঠাণ্ডা হতেই তুলে নিয়ে এলেন সেটাকে, হাত দিয়ে দেখলেন, বাটিটা ঠাণ্ডা হয়েছে বটে, কিন্তু আঠা এখনও বেশ গরম। কতক্ষণ চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে রাখবে সে? উঠে গিয়ে মশারির চাল থেকে পাখাটা নিয়ে এলেন—পাখার বাঁট দিয়ে দিয়ে আঠা মাখাতে লাগলেন কাগজটায়। খুব বেশি ক'রে ক'রে লাগিয়ে দেওয়ালে সেঁটে দিলেন কাগজটা। তারপর একটু দূরে স'রে গিয়ে দেখলেন। বাঃ, চমৎকার হয়েছে, আনন্দে হাততালি দিয়ে আপনার মনেই নেচে উঠলেন একবার। কিন্তু ওখানে খাঁচাটাকে টাঙাবেন কি ক'রে? ওখানে তো খাঁচা টাঙানো যাবে না। কি করা যায়? ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর এক ছুটে ঘরের মধ্যে চ'লে গেলেন। ঘরের ভিতর রূপচাঁদের রিভল্ভিং বুক-শেল্ফ্ ছিল একটা। বেশ উঁচু। সমস্ত বইগুলো বার ক'রে স্তূপীকৃত করলেন মেঝের উপর। তারপর হিড়হিড় ক'রে বুক-শেল্ফ্‌টাকে টেনে নিয়ে গেলেন বাইরে দেওয়ালে যেখানটায় কবিতা লেখা কাগজটা সাঁটা ছিল সেইখানে। উঃ, ভারী কি কম! জগদ্দল পাথর যেন একটা। হাঁপাতে লাগলেন বেচারী। বিরক্তি ফুটে উঠল সারা মুখে। কিন্তু খাঁচাটা তার উপর রাখতেই আনন্দে হেসে উঠল আবার চোখ দুটি। কি চমৎকারই না দেখাচ্ছে! বাঃ, রিভল্ভিং শেল্ফ্‌টা ঘুরিয়ে দিলে আরও চমৎকার দেখায়। রিভল্ভিং শেল্ফ্‌টা ঘোরালে কিন্তু ভয় পাচ্ছে পাখিটা।

ভয় লাগছে বুঝি? আচ্ছা, আর ঘোরাব না।

খাঁচার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মুচকি হেসে সান্ত্বনা দিলেন তাকে বকুলবালা।

কই, কথা বল একটা, শুনি!

পাখির কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

কথা বলবে না?

তবু কোন উচ্চবাচ্য করে না বেনে-বউ।

ও বাবা, রাঙা মূলো নাকি তুমি?

পাখি নীরব।

ভাব করবে না আমার সঙ্গে ?

বেনে-বউ ভাব করবার কোনও লক্ষণই প্রকাশ করলে না।

এমনই গোমড়া মুখ ক'রে ব'সে থাকবে নাকি রাতদিন ? তবেই তো হয়েছে ! আমার মদনলাল খুব লক্ষ্মী—মদনলাল, তোমার কথা শুনিয়ে দাও তো ওকে।

বারান্দার কোণে লোহার খাঁচায় মদনলাল ব'সে ছিল লোম ফুলিয়ে চোখ বুজে। প্রবীণ একটি চন্দনা। ডাক শুনে চোখ খুললে।

কথা শুনিয়ে দাও ওকে। বল—

মদনলাল চোখ মিটমিট করতে লাগল, তারপর ব'লে উঠল হঠাৎ, শিউজি, গোটি পী যাও, গোটি পী যাও, শিউজি, গোটি পী যাও—

পশ্চিমের একজন কন্‌স্টেব্‌ল চন্দনাটিকে এই বুলি শিখিয়েছিল।

শুনলে তো ? তুমিও কথা বল একটি, শুনি।

বেনে-বউ গম্ভীর হয়ে রইল, একটি কথা বললে না।

খিদে পেয়েছে নাকি ? খাবে ? দিচ্ছি, দাঁড়াও, ভাল পেঁপে আছে। পেঁপে খেয়ে কথা বলতে হবে কিন্তু।

একটা পেঁপে বার ক'রে কাটতে ব'সে গেলেন বকুলবালা।

পেঁপে কাটতে দেখে তাঁর সব পাখিগুলোই চঞ্চল হয়ে উঠল। দাঁড়ের উপর দুলতে লাগল টিয়াটা। ময়নাটা ব'লে উঠল, ওগো, শুনছ ! বুলবুলির কণ্ঠে ফুটে উঠল কুটুর কুটুর আওয়াজ। শ্যামা শিস দিয়ে উঠল। শিউজি, গোটি পী যাও—মদনলাল নিজের কৃতিত্বের জাহির করলে আবার। তাদের দিকে একটা রোষদৃষ্টি হেনে বকুলবালা বললেন, এখুনি তো খেয়েছ সব, আগে ওকে দিই, তারপর তোমাদের দিচ্ছি।

পেঁপে খেয়ে বেনে-বউ কিন্তু উল্লসিত হ'ল না তেমন। একবার ঠুকরে দেখলে, তারপর ব'সে রইল চুপ ক'রে। বকুলবালা তাঁর প্রত্যেক পাখিকে এক টুকরো ক'রে দিয়ে আবার এসে দাঁড়ালেন বেনে-বউয়ের খাঁচার সামনে।

কই, খাচ্ছ না যে তুমি ? পেঁপে ভাল লাগে না বুঝি ? আমার মতন অবস্থা বুঝি তোমার ? আমারও ভাল লাগে না পেঁপে। লজেঞ্চ খাবে ? চকোলেট ? ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে লজেঞ্চ আর চকোলেট নিয়ে এলেন।

এই নাও।

একটা লজেঞ্জ আর একটা চকোলেট খাঁচার মধ্যে ফেলে দিলেন। বেনে-বউ নির্বিকার।

এও খাবে না? ও বাবা! বুঝেছি, আসলে তোমার দুষ্টুমি। কিছু শুনছি না আর। কথা বল এবার। বল না একটা কথা। বল, লক্ষ্মীটি—

বহুবার অনুরোধ ক'রেও বেনে-বউয়ের কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পেলেন না বকুলবালা। হঠাৎ রাগ হ'ল।

তবে রে মুখপোড়া, আমাকে চিনিস না?

পাখাটা তুলে ঘা কতক বসিয়ে দিলেন খাঁচারই উপর। পাখিটা ত্রস্ত হয়ে উঠল, কিন্তু একটি শব্দ করলে না। পাখাটা ফেলে দিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পাখিটার দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ বকুলবালা। তারপর চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এল হঠাৎ আবার।

অমন সুন্দর পাখিটাকে কি বেশি নির্যাতন করা যায়? কিন্তু কি মুশকিল, কথা যদি না বলে, তা হ'লে ও পাখি নিয়ে কি হবে? পাখিটা বোবা নয় তো? মানুষের মধ্যে যেমন বোবা থাকে, পাখিদের মধ্যেও হয়তো থাকে। হয়তো পাখিওলা ঠকিয়ে একটা বোবা পাখি বিক্রি ক'রে গেছে। আর একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন পাখিটার দিকে। কি চমৎকার গায়ের রঙ! হঠাৎ হিংসে হ'ল। ব'লে উঠলেন, আমারও হলদে রঙের শাড়ি আছে, দামী রেশমী শাড়ি, তোর মত আমিও সাজতে পারি, দেখবি? তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন বকুলবালা এবং হলদে শাড়িখানা বার ক'রে সত্যি সত্যি সাজতে ব'সে গেলেন। শাড়ি প'রে মাথার চুল আঁচড়ে এমনভাবে ফিতে দিয়ে বাঁধলেন যে, খানিকটা চুল গলায় এবং পিঠের উপর পড়ল গিয়ে। বেনে-বউয়ের মাথা আর গলার কাছটা যেমন কালো, অনেকটা তেমনই দেখাতে লাগল। তারপর ঠোঁটে রঙ দিলেন বেশ ভাল ক'রে। টুকটুকে হ'ল ঠোঁট দুটি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে দেখলেন খানিকক্ষণ। তারপর রূপচাঁদের কালো মাফলারটা বার ক'রে সেটা কোমরে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন দু পাশ দিয়ে, তারপর বেরিয়ে গিয়ে বাইরে চৌকিটার উপর উপুড় হয়ে পাখির মত ব'সে বেনে-বউকে সম্বোধন ক'রে বললেন, এই দেখ, তোমার চেয়ে কিছু

কি খারাপ দেখাচ্ছে আমাকে? এস, এইবার ভাব কর আমার সঙ্গে। কথা বল একটি।

বেনে-বউ তবু কথা বলে না।

এইবার কবিতাটার দিকে নজর পড়ল বকুলবালার। তাঁর মনে হ'ল, ওর সম্বন্ধে যে কবিতাটা লেখা হয়েছে, সেটা তো শোনানো হয় নি ওকে? তাই অভিমান ক'রে ব'সে আছে নাকি? কিন্তু কবিতা কি ক'রে প'ড়ে শোনাবেন এখন? তিনি তো পড়তে জানেন না। হঠাৎ একটা গভীর বেদনায় টনটন ক'রে উঠল সমস্ত মনটা। কবিতাটা রূপচাঁদ প'ড়ে শুনিয়েছিলেন তাঁকে—মনে করবার চেষ্টা করলেন লাইনগুলো। 'কও না কথা হলদে পাখি'—এই লাইনটা মনে পড়ল শুধু। আর কিছু মনে পড়ল না। কেমন একটা অস্বস্তি লাগল, উঠে পড়লেন তিনি। মনের ভিতর কি যে হচ্ছে তা প্রকাশ করবার ভাষা নেই। উঠোনে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। নির্মল নীল আকাশ। রাস্তার ওধারে বটগাছটার পাতা ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে, শিশুগাছটা ভ'রে উঠেছে কচি কচি শ্যাম কিশলয়ে, উঠোনের আমগাছটায় অজস্র মুকুল ধরেছে যেন পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে কারা—মুখ দেখা যাচ্ছে না, সোনালি চুলগুলা দেখা যাচ্ছে শুধু। মৌমাছির ঝাঁক উড়ছে, বোলতা উড়ছে, চিল উড়ছে, উঁচুতে,...সবাই উড়ছে। বসন্তের হাওয়া বইছে। বকুলবালার সমস্ত অন্তঃকরণ ছটফট করতে লাগল একটা কারাগারের মধ্যে। কবিতাটা পড়তে না-পারার বেদনায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি, হয়তো ছুটে বেরিয়ে পড়তেন বাইরে। গাড়ি ডাকিয়ে চ'লে যেতেন রূপচাঁদের আপিসে তাঁকে ডেকে আনবার জন্যে। কিন্তু তার আর দরকার হ'ল না—চণ্ডী এসে পড়ল। স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছে চণ্ডী। পাখিওলার কাছ থেকে,পরশু সে শুনেছে যে, হলদে পাখিটা রূপচাঁদবাবু কিনেছেন। পাখিওলা যখন রাস্তা দিয়ে যেত, প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে অনেকদিন দেখেছে সে এই হলদে পাখিটাকে।

মাসীমা, আপনারা আর একটা পাখি কিনেছেন নাকি?

কে, চণ্ডী এসেছিস? ভালই হয়েছে।

বকুলবালার বেশ দেখে চণ্ডী বললে, আপনি কোথাও বেরুচ্ছেন নাকি?

না। এমনই পরেছি। পোড়ারমুখো পাখিকে দেখাচ্ছিলাম যে, হলদে শাড়ি আমারও আছে।

সুন্দর পাখিটা, নয়?—চণ্ডী সাগ্রহে খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

একটি কথা কইছে না কিন্তু। কবিতাটা পড় তো।

কোন্ কবিতা?

ওই যে দেওয়ালে সাঁটা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস না? ওর বিষয়েই কবিতা, আনন্দবাবু লিখে দিয়েছেন।

ও।

চণ্ডী সোৎসাহে এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল কবিতাটা।

চেঁচিয়ে পড় না।

চণ্ডী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল। তার সঙ্গে আবৃত্তি ক'রে যেতে লাগলেন বকুলবালা।

কও না কথা কও না কথা
কও না কথা হলদে পাখি
সোনার বরণ সুরের সাকী
চলবে না তো আর চালাকি
ধরা যখন প'ড়েই গেছ
নামটি তোমার বলবে না কি
কও না কথা হলদে পাখি।

যে কথাটি ঢাকছ কেবল
নানান ছলে নানান সুরে
সেই কথাটি শুনতে যে চাই
আজকে তোমায় খাঁচায় পুরে

রঙটি গায়ে কলকে ফুলের
কুচকুচে রঙ মাথার চুলের
মনের কথাও রূপকথা কি?
চুপটি ক'রে ছলবে নাকি
কও না কথা হলদে পাখি।

শর্ষে ফুলের স্বপ্ন ওগো
পদ্মফুলের বুকের রতন

সোনার কাঠির পরশ পেয়ে
রঙ হ'ল কি সোনার মতন

তোমার তরেই চাঁদ সদাগর
পার হ'ল কি সাতটা সাগর
বিশ্ব উজল যে দীপ-শিখায়
তুমিই কি তার সলতে নাকি
কও না কথা হলদে পাখি।

দুজনে মিলে বার বার আবৃত্তি করতে লাগলেন কবিতাটা। আম্রমুকুল-গন্ধমদির বসন্ত-দ্বিপ্রহর ছন্দভরে কাঁপতে লাগল যেন।

ট্যিউ—

হঠাৎ মিষ্টি সুরে ডেকে উঠল বেনে-বউ।

হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন বকুলবালা।

ঘর্মাক্ত কলেবরে রূপচাঁদ যখন আপিস থেকে ফিরছিলেন, তখনও বেশ বেলা রয়েছে। তাঁর বাঁ হাতে একটি পুঁটলি। পুলিস সাবইন্‌স্‌পেক্টার রহমান মিঞা একটি দুর্লভ জিনিস উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে। কেপন—খাসি মুরগি। আপিসেরই চাপরাসীকে দিয়ে মুরগিটি জবাই করিয়ে কুটিয়ে মাংসের টুকরোগুলি নিপুণভাবে কাগজে মুড়ে রুমালে বেঁধে নিয়ে আসছিলেন তিনি। ইচ্ছে ছিল, নিজেই রাঁধবেন। বাজার থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় মসলাও কিনে এনেছিলেন। বাড়িতে ঢুকতেই বকুলবালা ছুটে এলেন। তখনও তাঁর পরনে সেই হলদে কাপড়। ঠোঁটের লাল রঙ ঠোঁটেই নিবদ্ধ নেই, গালে এবং চিবুকেও লেগেছে। পরিবারের অসাধারণ প্রসাধন দেখে বিস্মিত হলেন রূপচাঁদ, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না। বরং চোখমুখে এমন একটা ভাব প্রকাশ করলেন, যার অর্থ—কি অদ্ভুত রূপসী তুমি, কি চমৎকার মানিয়েছে তোমায়! বকুলবালা কিন্তু এসব সূক্ষ্ম ভাবের ধার দিয়েও গেলেন না। অন্য জগতেই ছিলেন যেন তখন। রূপচাঁদকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

কি শয়তান তোমার ওই বেনে-বউ! উঃ, কম জ্বালানটা জ্বালিয়েছে আমায় সমস্তদিন!

কেন, কি হ'ল

প্রথমে তো মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে রইল। একটি কথা কইবে না, কত সাধ্যসাধনা—কিছুতে না।

রূপচাঁদ ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমস্ত বই মেঝের উপর স্তূপীকৃত।—এ কি করেছ?

খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন বকুলবালা, তারপর রূপচাঁদের হাত ধ'রে হিড়-হিড় ক'রে টানতে টানতে বললেন, বাইরে দেখবে চল না, কি করেছি। কম খোশামোদ করেছি তোমার পাখির?

রূপচাঁদের সর্বাঙ্গ জ্ব'লে উঠেছিল, কিন্তু হেসে বললেন, এইটে রাখি দাঁড়াও আগে।

কি ওতে?

মাংস।

পুঁটুলিটা কোণে রেখে দিয়ে বকুলবালার সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে এসে রূপচাঁদ দেখলেন, তাঁর বুকশেল্‌ফের উপর পাখির খাঁচা রাখা হয়েছে। দেওয়ালে কবিতা সাঁটা রয়েছে, তাও দেখলেন। সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে সোচ্ছ্বাসে ব'লে উঠলেন, বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা করেছ তো! আমার মাথায় এত আসত না। সুন্দর হয়েছে!

তবু কি মন পেয়েছি তোমার পাখির! ওর মন ভোলাবার জন্যেই শেষে এই শাড়িটা পরলাম, তবু না। শেষকালে চণ্ডী এল, দুজনে মিলে ওই কবিতাটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়লাম, তবে বাবুর মুখে কথা ফুটল, তাও একটি বার।

চণ্ডীর আগমনবার্ত্তায় মনে মনে ঈষৎ অপ্রসন্ন হলেন পুলিস-কর্মচারী রূপচাঁদ। বাইরের কোনও লোক বাড়িতে আসে, এ তিনি পছন্দ করেন না।

চণ্ডী এসেছিল নাকি? বেশি আমল দিও না ওকে।

কেন?

ছোঁড়াটা চোর শুনেছি।—অসঙ্কোচে মিথ্যা কথাটা বললেন রূপচাঁদ।

তাই নাকি?

বকুলবালা চোখ বড় বড় ক'রে চেয়ে রইলেন।

প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হবার জন্যে রূপচাঁদ বললেন, তোলা উনুনটাতে আঁচ দাও। আমিই মাংস রাঁধব আজ।

তোলা-উনুনে কেন ?

মুরগির মাংস যে।

ও!

বকুলবালা মুরগির মাংস খান, কিন্তু হেঁসেলে ঢুকতে দেন না।

বকুলবালা তোলা-উনুনটা বার করলেন কোণ থেকে।

উঃ, এর মধ্যেই কি রকম গরম প'ড়ে গেছে দেখেছ ? পাখাটা এখানে প'ড়ে কেন ?

পাখাটা তুলে হাওয়া করতে যেতে ময়দার আঠা লেগে গেল হাতময়।

এ কি, এতে লেগে আছে কি ?

ও! আঠা লাগিয়েছিলাম ওটা দিয়ে। কবিতাটা দেওয়ালে লাগাবার জন্যে আঠা করেছিলাম যে। তোমার পাখির জন্যে কম ভোগান ভুগতে হয়েছে আজ!

ক্রোধে কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠল রূপচাঁদের। মুখে কিন্তু সুমিষ্ট হাসি ফুটিয়ে বললেন, করতেও পার এত!

উত্তরে বকুলবালাও হাসলেন। রূপচাঁদ ঘরে ঢুকে জামা জুতো ছেড়ে বেরিয়ে এলেন আবার। বকুলবালা তোলা-উনুনে ঘুঁটে ভেঙে ভেঙে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ আর একটা কথা মনে প'ড়ে গেল তাঁর।

কম দুষ্টু তোমার বেনে-বউ। কবিতা শোনবার পর 'টিউ' ক'রে ছোট্ট একটি শব্দ করেছিল খালি। তারপর অনেক সাধ্যসাধনা করলাম, না রাম না গঙ্গা, কিছু বললে না। এই একটু আগে, পরোটা বেলছি, হঠাৎ ব'লে উঠল, 'ওকি ওকি ও'! কি দুষ্টু বল তো—তার মানে, পেঁপে খেয়েছি, ছাতু খেয়েছি, পরোটাও চাই একটু। পরোটা দিলাম, খেলে না, ওর মন পাওয়া ভার।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে হেসে উঠলেন বকুলবালা।

একটু মুচকি হেসে সংযতবাণী রূপচাঁদ বললেন, আস্তে আস্তে ভাব হবে। তোমার মন পেতে আমাকেও কম বেগ পেতে হয় নি।

আহা!

কোপকটাক্ষে স্বামীর দিকে একবার চেয়ে ঘুঁটেয় কেরোসিন ঢালতে লাগলেন বকুলবালা। মাথায় জবাকুসুম মেখে চৌবাচ্চার দিকে অগ্রসর হলেন রূপচাঁদ। স্নান ক'রে চা জলখাবার খেয়ে মাংস রাঁধতে বসবেন।

এ কি, চৌবাচ্চার জলে কালো কালো এসব ভাসছে কি ?

কই ? ও, অ্যালুমিনিয়ামের গরম বাটিটা ঠাণ্ডা করবার জন্যে চৌবাচ্চায় বসিয়েছিলাম। দাঁড়াও, ঠিক ক'রে দিই।

তাড়াতাড়ি এসে বকুলবালা হাত দিয়ে ভাসমান ভুসোগুলোকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সমস্ত জলটাই ঘুলিয়ে উঠল তাতে। রূপচাঁদের মনের ক্রোধাগ্নি দাউদাউ ক'রে জ্বলছিল। কিন্তু খুব শান্তকণ্ঠে তিনি বললেন, থাক্, আমি জল তুলেই স্নান করছি। কেবল ব্রহ্মচারীর নয়, চার্বাকপন্থীরও সংযম দরকার সিদ্ধিলাভের জন্য।

স্বহস্তে ইঁদারা থেকে জল তুলে স্নান সেরে যখন ফিরে এলেন, তখন ঘুঁটের ধোঁয়ায় চারিদিক ভ'রে গেছে, তার মধ্যে দগদগে হলদে কাপড়-পরা বকুলবালা ব'সে চা ছাঁকছেন। রূপচাঁদের মনে হঠাৎ একটা গানের একটা লাইন ভেসে এল, 'ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে'। যে স্বর্গলোকে সে ডানা মেলে উড়তে চায়, সেখানে পৌঁছতে হ'লে অনেক নালা নর্দমা আঁস্তাকুড় পার হতে হবে, দ'মে গেলে চলবে না।

দেখ, মাংসটা আজ ভাল ক'রে রাঁধব। অমরেশকে দিয়ে আসব একটু। সে আমার হাতের রান্না খেতে চেয়েছে। ঘি আছে তো ?

আছে। মসলা কি কি চাই ?

বলছি।

টিফিন-কেরিয়ারটি হাতে ক'রে খাওয়া-দাওয়া সেরে রূপচাঁদ যখন বেরুলেন, তখন রাত্রি নটা বেজে গেছে। পূর্ববন্দোবস্তমত কন্‌স্টেব্‌ল রামখেলাওন মিশির এসে বারান্দায় শুয়েছে বকুলবালার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। রূপচাঁদ বকুলবালাকে বলেছেন যে, অমরেশবাবুর বাড়ি থেকে আড্ডা দিয়ে ফিরে আসতে রাত হবে তাঁর।

অন্ধকার গলি জনবিরল হয়ে এসেছে। রূপচাঁদবাবুর পায়ে কেড্‌স। নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছেন তিনি। মনের মধ্যে অদ্ভুত ভাব জাগছে একটা। দুঃসাহসী হিমালয়-আরোহীর মনে যে ধরনের ভাব জাগে, অনেকটা সেই রকম। হিমালয়-আরোহী জানে যে, হয়তো তার অভিযান ব্যর্থ হবে, হয়তো সে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে উঠতে পারবে না, কিন্তু যদি পেরে যায়! ওই

'যদি'টা আলেয়ার মত প্রলুব্ধ ক'রে নিয়ে যায় তাকে দুর্গম পথে। তা ছাড়া, সাফল্য যদি না-ও হয়, অভিযান করার মধ্যেই কি আনন্দ নেই? ভয় জিনিসটার অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে একটা। অনিশ্চয়তার মধ্যে অপ্রত্যাশিতের চমকপ্রদ যে সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে, তার আহ্বানে ছুটে যেতে চায় মন। কোন কষ্টকেই কষ্ট ব'লে মনে হয় না তার, বরং বাধা যত দুরতিক্রম্য হয়, সে তত যেন আকুল হয়ে ওঠে, শক্তি তত যেন সংহত হয়, জেদ তত যেন চ'ড়ে ওঠে। অজানার আহ্বান নূতনের প্রলোভন সুরার মত সঞ্চরণ ক'রে বেড়ায় তার দেহে মনে স্বপ্নে কল্পনায়। বাইরের নানা বাধা অতিক্রম ক'রে কাম্যলোকে পৌঁছবার ঢের আগেই তার সমস্ত সত্তা কল্পনায় পৌঁছে যায় সেখানে, এবং পৌঁছে গিয়ে যে আনন্দ পায়, তারই আবেগে সে হাসিমুখে অতিক্রম করে সমস্ত বাধা। তার কৃচ্ছ্রসাধন ব্রহ্মলোলুপ তপস্বীর কৃচ্ছ্রসাধনের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। তার লক্ষ্য আলাদা, পথও তাই আলাদা। নিজের স্বর্গলোকে সেও মুক্তি পেতে চায়। তার মনও ডানা মেলেছে—বহুবর্ণবিচিত্র রূপ-রস-রঙের লীলাতীর্থে, মৃন্ময়ী ধরণীর মহিমালোকে—সূক্ষ্ম অবাস্তবে নয়, স্থূল বাস্তবে; পরোক্ষে নয়, প্রত্যক্ষে। পথ পিচ্ছিল, পর্বত দুরারোহ, সমুদ্র দুস্তর, কণ্টক কঙ্কর কর্দম—বাধার অন্ত নেই। কামনারও অন্ত নেই।

অন্ধকারে হঠাৎ খুব জোরে একটা হোঁচট খেলেন রূপচাঁদ। পায়ের বুড়ো-আঙুলটায় খুব জোরে লাগল জুতো থাকা সত্ত্বেও। সামলে নিয়ে আবার চলতে লাগলেন। বলা বাহুল্য অমরেশের কাছে যাচ্ছিলেন না তিনি, যাচ্ছিলেন ডানার কাছে।

ক্রমশ

"বনফুল"

নিজের কথা

দীক্ষা

বাবুজীকে বলতে হ'ল মানসিক অশান্তির কথা। সংসার চালানোর ভার আমার উপর এসে পড়েছিল, তথাপি আমার প্রস্তাবে বাবুজী বিচলিত হলেন না। জানালেন, শিক্ষকের সন্ধানে থাকবেন।

কিছুদিন বাদে আমার অভিবাঞ্ছিত মানুষের সন্ধান পেলাম। বিংশ শতাব্দীর মহাশিল্পী, ভারতের আধুনিক শিল্পগুরু শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর আঁকা ছবি একটিও দেখি নি, কেবল নাম শুনেই ভক্ত হয়ে উঠেছিলাম।

গুরুদর্শনের ব্যবস্থা ক'রে বাবুজী একদিন বৈকালে আমাকে নিয়ে গেলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে। প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম, নিজের অনেক ছবি সঙ্গে ছিল—বেশির ভাগই পেন্‌সিলের খসড়ায় মানুষের প্রতিলিপি ও প্রাকৃতিক দৃশ্য।

অবনীন্দ্রনাথ আমার ছবি দেখে ভাল-মন্দ কিছুই বললেন না, তৎপরিবর্তে বাবুজীর সঙ্গে অবান্তর আলাপ শুরু ক'রে দিলেন। কথোপকথনে আমার সঙ্গে কোনও যোগ ছিল না, দূরে স'রে গেলাম বারান্দার এক কোণে। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেখান থেকে গুরুদেবের বিখ্যাত চিত্রশালা দেখতে পাওয়া যায়। দেওয়ালের উপর দিকে বড় বড় ছবি, অদ্ভুত ধরনের আঁকা। মানুষগুলি কেমন-তর, লম্বা লম্বা আঙুল, অস্বাভাবিক ও অস্থিহীন। মনে হ'ল, ও দিয়ে কিছু ধরবার উপায় নেই, শুধু দেখবার জন্যেই ওদের অস্তিত্ব। তা ছাড়া অধিকাংশ ছবিই নতুন প্রথায় কাপড়-পরা। কাপড়ের ভাঁজগুলি আঙুলের মতই অস্বাভাবিক, বাস্তবতার সঙ্গে কোনও মিল নেই। কাছে গিয়ে ছবিগুলি দেখবার ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু প্রথম পরিচয়েই যেভাবে কাবু হয়েছিলাম, তাতে কৌতূহলকে প্রশ্রয় দিতে সাহস পেলাম না।

যে সময়ে সংযমের আশ্রয় নিচ্ছিলাম, সেই সময় বারান্দায় একজন সুদর্শন কিশোর এসে উপস্থিত হলেন। আমার নিকট এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কাকে চান? প্রশ্ন শুনে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল। কেমন ক'রে বলি, যাঁকে চাই, তাঁর কাছ থেকেই আমি বিতাড়িত।

অনেকক্ষণ কোনও উত্তর দিতে পারি নি, রুদ্ধ ক্রন্দনের স্রোত অন্তরে ব'য়ে চলেছে। চিত্তবহার কিছুটা নিশ্চয় বাহ্যদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক দয়ার্দ্র হয়ে উঠলেন। আমাকে মূক ভেবে ক্ষুদ্রাকার নোট-বইতে লিখলেন, কাকে চান?

দুঃখের উপর হাসি এসে গেল। চিত্রাঙ্কণে দক্ষতা না থাকলেই বোবা হতে হয়, এমন যোগাযোগের খবর আমার কাছে নতুন। হেসেই উত্তর দিলাম, গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে ছবি-আঁকা শিখতে এসেছি। ছবি-আঁকা শিখতে এসে শিক্ষকের কাছ থেকে স'রে থাকা স্বাভাবিক নয়। নিশ্চয় কৌতূহল তাঁকে প্রশ্ন তোলার তাগিদ দিচ্ছিল, কিন্তু বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি ছাড়া গোপনীয় কথাকে বেআব্রু করার কোনও চেষ্টা দেখলাম না।

ইতিমধ্যে আমার শরীরের উপর তিনি অনেকবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি কোনও ব্যায়ামচর্চা করেন? শরীরের তারিফ শোনায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম, প্রশ্নের ভিতর নতুন কিছু ছিল না, সংক্ষেপে তাঁর প্রশ্নোত্তর সেরে নিলাম। ভদ্রলোক আমার প্রতি বেশ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। ব্যায়ামচর্চার আলোচনায় দেখলাম তাঁর বেশ আন্তরিকতা আছে। আমাদের আলাপ অল্প সময়ের ভিতর কাজের কথায় এসে পৌছাল। ঐখানেই কুস্তি শেখার ব্যবস্থা ভদ্রলোক ক'রে নিলেন। কিশোরের নাম সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবির নিকট-আত্মীয়। দীক্ষা নিতে এসে আমার শিষ্য জুটে গেল আগে।

বিকেলের দিকে ওস্তাদের কর্তব্য সারতে আসতাম। সৌম্যের সঙ্গে আরও অনেকে যোগ দিলেন। নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া বাইরের অনেকে ছিলেন। দু-চার দিন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা চলল, তারপর হঠাৎ শৈথিল্যের সাড়া প'ড়ে গেল। আখড়া দু দিনেই খালি। এইরূপ ঘটনার জন্ম আমি প্রস্তুত ছিলাম না—এমন কথা বলি না, তবে আরম্ভের চেয়ে শেষের তাড়া বেশি হয়ে উঠবে ভাবতে পারি নি। আখড়া উঠে যাক, কুস্তির অছিলায় দুটি বন্ধু পেলাম, সৌম্য আর নবু, ওদের কাছ থেকে বহুদিন দূরে আছি, কিন্তু মনের কাছ থেকে ওরা স'রে যায় নি।

সৌম্য দলছাড়া হয়ে থাকতেই ভালবাসত, সঙ্গীতচর্চার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। কবির গান তার মুখে সব সময় শুনতে পেতাম। আমাদের সাংঘাতিক গরমিল ছিল এইখানে। সুরকে আমি কথার পোশাকে ভারাক্রান্ত হতে দেখলে ব্যথা পেতাম। সৌম্য কথাকেই বড় ক'রে দেখত। এ বিষয়ে আমাদের তর্কের কামাই ছিল না। অধুনা সঙ্গীতচর্চার ব্যাপক প্রচার সম্বন্ধে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ভুক্তরাও সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে থাকেন, তথাপি সুরের আসল রূপ লোকে জানতে চায় না কেন? কেন আজ ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরীর চাল উঠে গেল? কারা এই বিতাড়নের জন্ম দায়ী? প্রশ্ন গূঢ়রহস্যজড়িত নয়, কিন্তু কে খোঁজ নেবে, কোথায় গলদ?

আমার বক্তব্য, ছবির ব্যাখ্যার জন্ম যেমন পুঁথি ঘাঁটা টীকা নিষ্প্রয়োজন, সেই রকম কথার বলপ্রয়োগে ধ্বনিকে অধিকতর গুণসম্পন্ন করতে যাওয়া বিড়ম্বনা, কারণ উভয়ের বিকাশ বিভিন্ন কেন্দ্রে। উভয়ের বৈশিষ্ট্য আপন সত্তায়

আত্মপ্রতিষ্ঠা। আপন শক্তির অভাবে যেখানে আত্মপ্রকাশ অচল, সেখানে বুঝতে হবে, কোথাও ঘুণ ধরেছে, রোগ সহানুভূতি ও স্বার্থের ষড়যন্ত্রে বেগশীল হয়ে উঠেছে, আমরা জমকালো ঔষধের বিজ্ঞপ্তিতে ক্ষয়রোগকেই রসের উৎস ক'রে তুলেছি। সহানুভূতির প্রচার হয় সবজান্তা রসিকের দ্বারা, সুস্থকে মেরে যারা সেন্টিমেণ্ট মন্থন করে। দৃষ্টান্তের অভাব নেই, সাহিত্যের কেন্দ্রেই কিছুদিন আগে নবতম প্রেমের 'ফিকৃশন' খোঁজা হ'ত হাসপাতালের ঘরে; আদর্শ ছিল ত্যাগে, যার অপূর্ব নমুনা প্রচার হ'ত যক্ষ্মাকে অবলম্বন ক'রে, মৃত্যুর কোলে। সঙ্গীত সম্বন্ধেও ক্ষয়রোগ চিন্তা ক'রেই লিখলাম, কারণ স্বার্থ ও সহানুভূতির ষড়যন্ত্রই আজ বাংলা থেকে সুর-রসিককে অন্তর্ধান করিয়েছে, উচ্চাঙ্গের রাগ-রাগিণী স্থান পেয়েছে সমাধির ভিতর, নির্যাতন অসহনীয় হওয়ায় ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরী আজ আত্মঘাতী।

স্বার্থান্বেষীর সম্মতিতেই এইরূপটি ঘটেছে, তাঁরা জানতেন, ধ্বনির নিজস্ব একটি ভাবব্যঞ্জক রূপ আছে, যা ধ্বনির ভাষাতেই প্রকাশ হতে পারে, যেমন যন্ত্রের সাহায্যে আলাপ। এ রকম ক্ষেত্রে সুরের রসবিকাশ উপযুক্ত রসগ্রাহীর কাছে ধ্বনির দ্বারাই সহজবোধ্য, কারণ সুরের ভাষা ও প্রকাশের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার অন্তরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। সেই রকম চিত্রশিল্পীর কৌশলে যেরূপ নক্‌শাই তৈয়ার হোক না কেন, তার প্রকাশ নিজের কেন্দ্রে, কারণ রঙ ও রেখার দ্বারা ধ্বনির সৃষ্টি অসম্ভব। সুতরাং সুরের কেন্দ্রে চিত্রশিল্পী প্রবেশ করার চেষ্টা চালালে বলতে হবে—অনধিকার-চর্চা। চিত্রশিল্পী সম্বন্ধে যে কথা বলা চলে, সে কথা কবি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

জনসাধারণকে সঙ্গীত মারফৎ উত্তেজিত ক'রে তুলতে হ'লে কথার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি না, কারণ কথার পিছনে অনেক কৌশল লুকানো থাকে, যা সেন্টিমেণ্টকে নাড়া দেবার জন্য বিশেষ সহায়ক। কিন্তু এই সূত্র অবলম্বনে আর্টের ব্যাপক প্রচার শুরু হ'লে বলতে হয়, উদ্দেশ্য আদর্শভ্রষ্ট, কারণ আদর্শ অধোগামী নয়, এগিয়ে চলার পথে দৃষ্টি থাকে আগে ও ঊর্ধ্বে। আমাদের দেশে আর্ট সম্বন্ধে জনসাধারণের বিচারশক্তি এতই পিছিয়ে-পড়া যে তাদের চলার সঙ্গে সমতাল রাখতে হ'লে পথপ্রদর্শককেও পিছু হটতে হয়। এগুবার পথে পিছিয়ে থাকা দুর্বলতার লক্ষণ, শক্তির পরিচায়ক নয়। রসের রাজ্যে সেন্টিমেণ্টের প্রয়োজন থাকলেও ভাবের উদ্দেশ্য বোধগম্য হয়

প্রকাশশক্তির দ্বারা। কি ভাবে এবং কতটা প্রকাশ হ'ল, তাই রসগ্রাহীর কাছে বিচারের বস্তু। কারণ যা প্রকাশ হয় তা উপলক্ষ্য মাত্র. সুতরাং কবিতা যে ভাবেই ধারালো সেন্টিমেন্ট নিয়ে সুর ও রূপের উপর জুলুম চালাক, সাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা পাক, রসিকের কাছে তা ব্যর্থপ্রয়াস ও হাস্যকর। সে স্থানে, ওই রকম চেষ্টার পেছনে স্বার্থ কোথাও আত্মগোপন ক'রে আছে। উপমা এসে পড়ে ছবির ফ্রেমকে মধ্যস্থ ক'রে। ফ্রেমের উদ্দেশ্য সীমার নির্দেশ, যা বক্তব্যকে বাঁধনের মধ্যে রাখতে হ'লে অবর্জনীয়। কিন্তু সীমান্তের বেড়ার খাতিরে ছবি যদি অদৃশ্য হয়ে যায়, তা হ'লে আসল দ্রষ্টব্যকেই অস্বীকার করা হয়, ফ্রেম পেয়ে বসে প্রাধান্য।

স্বার্থের কথা বলি। ফ্রেমের কারবারী ছবি বুঝুক বা না বুঝুক, যে কোন ছবিতেই দামী মজবুত ফ্রেম জড়াতে পারলে তার লাভের মাত্রা বেড়ে থাকে। নিজের স্বার্থসিদ্ধিই কারবারীর পক্ষে বড় কাজ, ফ্রেমের চাপে ছবি জখম হ'ল কি না সেদিক দেখা তার কর্তব্য নয়, ক্ষেত্রহিসাবে কৃপার বস্তু হতে পারে। কৃপাপরবশ হয়ে আপন ব্যবসায়ে লোকসান টেনে আনা সহজসাধ্য বস্তু নয়, সুতরাং স্বার্থ ছাপিয়ে ওঠে সব উদ্দেশ্যের উপর।

ছবির বেড়া ছোট কারবারের কথা, কিন্তু কবিতা যেখানে মহাশক্তিশালী, সেখানে ছোট কারবারের উপকরণ এসে পড়লে দ'মে যাই, ভাবতে থাকি, মানুষ মহামানব হয়েও দুর্বলতাকে দাবিয়ে রাখতে পারে না কেন? এই 'কেন'র উত্তর পাবার জন্যে ইতিহাসের অনেক পাতা খুঁজেছি, কেবল জেনেছি, মহত্তেরও দুর্বলতা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু 'কেন'র উত্তর আজও পাই নি।

সঙ্গীত-প্রসঙ্গে দিলীপবাবুর (শ্রীদিলীপকুমার রায়) কথা এসে পড়ছে। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় যতটা বুঝেছি, তাতে মনে হয়, তিনিও (অধুনা) কথাকে আঁকড়ে থাকতে চান, কারণ অনুমান করি—ভক্তির সেন্টিমেন্ট। ভক্তির সঙ্গে আমার লড়াই নেই, কারণ ওখানে যুক্তির পাত্তা পাওয়া যায় না। মতের গরমিল থাক্, এইটুকু সান্ত্বনা আছে, তিনি সুরকে নতুন ভাবে গ্রহণ করছেন; নূতন রূপে সাজিয়ে তুলছেন। নব রসচেতনার তাগিদ সেন্টিমেন্ট পাঠালেও সুর নিজের রূপে আপন সত্তা প্রতিষ্ঠা করেছে, কথার চাপে ধ্বনি কাবু হয়ে যায় নি। গোঁড়ামির অপদৃষ্টি এড়াতে পারলে আমার বিশ্বাস তাঁর দান সুর-রসিক অস্বীকার করতে পারবেন না।

দীক্ষার কথা বলছিলাম। গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়েও ছবি আঁকার স্পৃহা কিছুমাত্র কমল না। বাড়িতে কদিনের ভিতর দুটি খসড়া করেছিলাম, নিজের ভাল লেগেছিল, রূপের গাঁথুনি বেশ জবরদস্ত রেখার দ্বারা খাড়া করেছিলাম। গুরুকে দেখাবার জন্যে আকাঙ্ক্ষা বেড়ে উঠতে লাগল, দুটি উৎসাহের কথা শোনবার জন্যে অধীর হয়ে উঠলাম। উচ্ছ্বাসকে রোধ করার শক্তি আমার কোনও বিষয়েই ছিল না, ভাবতে লাগলাম, ভয় কিসের, দেবতার মন্দিরে অর্ঘ্য দেবার আগে কোন পাতকী তো তাঁর আদেশের অপেক্ষায় থাকে না, তবে আমারই বা ইতস্ততের কারণ কোথায়? যুক্তির সহায়তায় মন সবল হয়ে উঠল, সত্যই সেদিন নতুন আঁকা ছবি নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম।

বারান্দার কাছে আসতেই দেখি, তিনি সদ্য-আঁকা ছবি ছিঁড়ছেন। রূপ-সৃষ্টির প্রকরণে ধ্বংসের এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকতে পারে, আমার জানা ছিল না। অঙ্কনপদ্ধতির নতুন প্রথা দেখে আতঙ্ক উপস্থিত হ'ল। যে লোক নিজের আঁকা ছবির উপর জহ্লাদের কোপ চালাতে পারেন, তাঁর পক্ষে অপরের ছবির উপর কোরবানির কেরামতি দেখানো কিছুই বিচিত্র নয়। ছবি দেখানোর বিষয়ে দ্বিমনা হয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় গুরুদেব পিছন দিকে ঘাড় ফেরালেন, বাজে কাগজের ঝুড়ি খুঁজছিলেন বোধ হয়, আমি পিছনেই ছিলাম, দেখে সামনে ডাকলেন।

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে জানালাম, ছবি নিয়ে এসেছি। গুরুদেব উৎসুক হয়েই বললেন, কই দেখি? ছবি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ কোনও নোংরা জিনিস ছুঁয়ে ফেললে শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষের মুখশ্রী যেরূপ ভাবব্যঞ্জক হয়ে ওঠে, ঠিক সেইরূপ নির্দেশ পেলাম গুরুদেবের চাহনিতে। তারপরেই এল অপূর্ব উৎসাহবাণী। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কুস্তি-টুস্তি কেমন চলছে? শরীরটা বেশ গড়েছ দেখছি, ওই দিকে নজর দাও বেশি, কিছু হবে। আমি নাম-করা বোকা হ'লেও কখন-সখন বুদ্ধির আশ্রয় পেয়ে যেতাম। বিবেচনা ক'রে দেখলাম, এর পর ছবির পোঁটলা গুটিয়ে ফেলাই ভাল। গুরুর পদধূলি নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

রোখ চেপে গেল গুরুকে খুশি করতেই হবে। খোঁজ নিতে লাগলাম, তিনি কোন্ ধরনের ছবি ভালবাসেন! এই সময় ওরিয়েন্টাল (Oriental)

আর্ট বোঝার ধুম প'ড়ে গিয়েছে। যেখানে সেখানে মার্জিত গোষ্ঠী গ'ড়ে উঠেছে, পাশ্চাত্যপন্থীরা রসচর্চাকে একচেটে ক'রে ফেলেছেন। সংস্কৃতির আলোচনায় সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তিরা এমনই মার্জিত হয়ে গিয়েছেন যে, তাঁদের সামনে সঠিক ড্রইং দ্বারা সুস্থ গোটা মানুষের চেহারা ধরলে আঁতকে ওঠেন ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে,—ব'লে বসেন, এটা করেছ কি, এ যে মডেল নিয়ে আঁকা, আর্টস্কুলের কসরৎ, ফিরিঙ্গী আখড়ার প্যাঁচ—সরাও সরাও, চোখের সামনে থেকে সরাও। আমার বিদ্যার দৌড় ঐ পর্যন্ত। মার্জিত দৃষ্টির সামনে আর ছবি বার করা যায় না। কি করলে আমার পাপক্ষয় হতে পারে, তাও তাঁরা বলেন না, মুশকিলে প'ড়ে গেলাম।

বহু চিন্তার ফলে সিদ্ধান্ত দাঁড়াল, ড্রইং ভুল করতে পারলেই ওরিয়েন্টাল আর্ট হয়। বিচার মনঃপূত হ'লেও হিসাবে গলদ র'য়ে গেল। কতটা ভুল হ'লে আর্টস্কুলের কসরৎ থেকে ছবি নবাবিষ্কৃত কলায় গিয়ে পৌঁছায়, জানবার উপায় নেই। ভুলের সৃষ্টি উপলব্ধি থেকে, যা অদৃশ্য, যে বিষয়ে কোনও জ্ঞান নেই, তাকে উপলব্ধির ভিতরই বা আনি কেমন ক'রে?

সার্কাসে ক্লাউনের খেলায় অনেক কায়দা জানতাম, আনাড়ীর মত স্বেচ্ছায় আছাড় খেতাম, পতনশীল সাইকেলকে আবার ওস্তাদী কায়দায় খাড়া করিয়ে দিতাম, বাহবা পেতাম। ছবিতে ক্লাউনের খেলা কি ভাবে চালাব, হদিশ পাচ্ছিলাম না। পরামর্শ দরকার হয়ে পড়ল।

তখন শিল্পীমহলে একটু-আধটু আসা-যাওয়া চলেছে। গোকুল নাগের কাছে গেলাম। আমাদের সমসাময়িকদের ভিতর গোকুল লেখাপড়া-করা মানুষ, ছবি আঁকার সঙ্গে সাহিত্যিকের আসরে তার দাবি খাড়া করেছে। ছাপার অক্ষরে তার লেখা বই দেখেছি।

কোন ভদ্রলোকের একটি তৈলচিত্র আঁকছিল, ফরমাসী কাজ। বাগড়া দিয়ে জানালাম, বিশেষ বিপদে প'ড়েই বিরক্ত করতে এসেছি। আলাপের সূত্রপাতেই ওরিয়েন্টাল আর্ট সম্বন্ধে আমার বিশ্লেষণ জানালাম। গোকুল চিন্তাশীল ব্যক্তি, অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, তুমি ধরেছ ঠিক। তবে সজ্ঞানে ভুল আর সাদাসিদে ভুল এক জিনিস নয়। ওর মার-প্যাঁচ অনেক আছে, চোখটা মাছের মত হবে, হাঁটুর কোণে বরবটির বিচি থাকা দরকার, কলাগাছের মত জানু হওয়া চাই—সে অনেক ঝামেলা, আমি সব জানি না।

তুমি ওরিয়েন্টাল সোসাইটিতে যাও, খাঁটি খবর পাবে। যতদূর জানি, ওরা ইতিহাস খাড়া ক'রে ট্র্যাডিশনাল মালমসলা তৈরি করে। সাধে কি বললাম, ও ভুল যে-সে ভুল নয়, ও ভুলের জাত আছে, বয়স আছে, ভুল শিখতে হ'লে পুরোহিতের কাছে দীক্ষা নিতে হয়। একটু সাবধানে চ'লো বাপু। ওখানে প্রায় সকলেই পুরোহিত, একবার ধরতে পারলেই শিখিয়ে ছাড়বে। তোমাকে আবার না প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, নির্ভুল ড্রইং কর, আমার ভয় ওইখানে। শুদ্ধির জন্য প্রস্তুত হয়ে যেও। শুদ্ধির প্রকরণে প্রধান কাজ অতীতের কবর খোঁড়া। প্রাচীন স্বদেশী গোরস্থানে ওরা শব-সাধন করে।

গোকুলের সদুপদেশ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। গোদের উপর বিষফোড়া এসে জুটল। আমার বিশ্লেষণের সমর্থনেই কাবু হয়ে ছিলাম, তার উপর গোরস্থানে কবর খোঁড়ার প্রস্তাবে মাথায় চক্র লেগে গেল। ফেরবার পথ নেই, মনকে তখন দৃঢ় ক'রে ফেলেছিলাম, অগ্নি-পরীক্ষায় ঝাঁপ দিতে হ'লেও পিছ-পাও হব না। গুরুর পছন্দসই ছবি আঁকতে হ'লে যত বড় ভুল শেখার কসরত থাক্, ঠিক আয়ত্ত ক'রে ফেলব।

সোসাইটিতে হাজির হলাম, হুলুস্থুল ব্যাপার, চার ধারে হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড লেগে গিয়েছে আগতপ্রায় প্রদর্শনীর জন্য। দুর্গোৎসবের মতই সমারোহ। দিল্লী, লাহোর, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি নামকরা জায়গা থেকে জাঁদ্রেল শিল্পীরা ছবি পাঠিয়েছেন, বড় বড় প্যাকিং-কেস খোলা হচ্ছে, সকলেই সেজেগুজে ব্যস্ত।

প্রদর্শনী-ঘরে ঢুকতেই দেখলাম, গুরু অবনীন্দ্রনাথ ব'সে আছেন, পাশে গগনবাবু (অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)। আমি ওখানে গিয়েছিলাম কবরের খবর নিতে। সামনে প'ড়ে গেল তাজা জ্যান্ত মানুষ। ফিরব কি না ভাবছিলাম, এমন সময় একটি নিরেট ব্রোঞ্জ-মূর্তির স্থান পরিবর্তনের দরকার হ'ল। দুজন মানুষেও সেটাকে তুলতে পারে না। আমি একজন কেউ-কেটা নই প্রমাণ করার সুবিধা পেয়ে গেলাম। গগনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় রাখতে হবে বলুন, মূর্তিটা বসিয়ে দিচ্ছি। গুরুদেব বললেন, ঠিক মানুষ এসেছে, এই ছোকরাই পারবে। সকলের সামনে 'ছোকরা' কথাটা কশাঘাতের মত কানে এসে পড়ল। গগনবাবু কোথায় রাখতে হবে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। মূর্তি যথাস্থানে রেখে এসে গুরুদেবকে বললাম, সার্, আমার নাম ছোকরা নয়,—দেবীপ্রসাদ। অশুভ মুহূর্তে আত্মমর্যাদা

প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েছিলাম, গুরুদেব আজও আমাকে দেবীবাবু ব'লে সম্বোধন ক'রে থাকেন।

আমার সঠিক নাম শুনে গুরুদেবের কান লাল হয়ে উঠল, বক্রহাস এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার ছবি এক্সিবিশনে দেবে না? প্রশ্নের পিছনে যে রূঢ়তা ছিল, তা বুঝতে সময় লাগল না। কবর দেখার কোনও ব্যবস্থা না ক'রেই বাঁচা ও ভাজার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

ক্রমশ

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

সুকান্ত আর কুকান্ত

সুকান্ত আর কুকান্ত দুটি ভাই।
সুকান্ত করে সুকর্ম,
(আর) কুকান্ত করে কুকর্ম ;
কালো-বাজারেতে লাল হয়ে উঠে
কুকান্ত দিল দালান ;
(আর) সওদাগরের চালানী আফিসে
সুকান্ত লেখে চালান,
সুকান্ত হ'ল সমাজে তুচ্ছ
কুকান্ত হ'ল চাই।
সুকান্ত ছিল সুরূপ,
(আর) কুকান্ত অতি কুরূপ,
তবু কুকান্ত-কেন্দ্র ঘিরিয়া
ঘোরে সুন্দরী-বৃত্ত
সুকান্ত পানে তাকায় না তারা,
জানে তার নেই বিত্ত।
পাড়ায় যখনি চাঁদা তোলা হয়
সুকান্ত দেয় চাঁদা।
কুকান্ত হয় কমিটির চাই
এটি আছে তার বাঁধা।

চাঁদা তোলা হয়ে জমে তার কাছে,
সে জমার থেকে যাহা কিছু বাঁচে
গোপনে পাঠায় আপন ব্যাঙ্কে—
টাকা আনা আর পাই।

কুকান্ত জানে ঠকানো বিদ্যে
সুকান্ত জানে ঠকা,
(তাই) কুকান্ত মহাবুদ্ধিমান, আর
সুকান্ত মহা বোকা,
মহাধার্মিক দাদা সুকান্ত,
মহানাস্তিক পাপী কুকান্ত
কেহ কেহ কয় নরকেও নাকি
মিলিবে না তার ঠাঁই।
সুকান্ত হ'ল সংসারী, মানে
হ'ল বিয়ে-করা স্বামী
(জনৈক বাপের অনুরোধে প'ড়ে,
যতদূর জানি আমি)।
কুকান্ত হাসে টাকা আছে যার
কিসের তাহার দুঃখু?
ফুলে ফুলে আমি মধু খাব শুধু,
বিয়ে করে কোন্ মুখ্খু?

জুটে গেল বহু নৈশ ইয়ার
এল শ্যাম্পেন, ব্র্যাণ্ডি, বিয়ার
কত সুন্দরী এল আর গেল
লেখাজোখা তার নাই।

সচ্চরিত্র সুকান্ত, আর
কুকান্ত লম্পট ;
সুকান্ত যত সৎ, কুকান্ত
ঠিক ততখানি শঠ।

সুকান্ত তবু বহুদিন কেসে
প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড শেষ ক'রে শেষে
গেল একদিন টস্ ক'রে টেঁসে
শুধু ব'লে গেল 'যাই'।
রেখে গেল নাহি একটি আধলা,
বিধবার চোখে ঝরিল বাদলা,
কহিল সে, ল'য়ে কাচ্চা-বাচ্চা
এখন আমি কি খাই ?
কুকান্ত আজো মোটর-বিহারী
কালো-বাজারেতে ভাল কারবারী
লাখো লাখো টাকা এসে যায় ফাঁকা
তবুও মেটে না খাঁই।
মহাসুখে খায় পোলাও কালিয়া,
সুন্দরী আর মোসাহেব নিয়া
রাতে টেনে মাল হয় বেসামাল
মাথা ঘোরে বাঁই বাঁই
সারারাত আর নাহি পায় টের
ভোর হয়ে গেলে জেগে উঠে ফের
কারবারে যায় কুকান্ত রয়ে
সযতনে বেঁধে টাই।

অ. কৃ. ব.

দুরাশা

যৌবনেরই প্রথম নেশায় আলোর-ভরা দূর আকাশের সীমায়
উড়িয়ে দিয়েছিলাম আমার সোনার-ডানা কোন্ দুরাশার পাখি।
আজকে তারে দেখছি চেয়ে দ্বারের পাশে ব'সে ব'সে ঝিমায়,
আলোক গেছে দু চোখ হতে, ডানায় তাহার পালক নাহি বাকি।

শ্রীগিরিজা গঙ্গোপাধ্যায়

'দৈনিক বসুমতী'

'শনিবারের চিঠি'তে (চৈত্র, ১৩৫৪) সাপ্তাহিক 'বসুমতী'র জন্ম-তারিখ লইয়া যখন আলোচনা করি, তখন 'দৈনিক বসুমতী' সম্বন্ধেও যে অনুরূপ গোল থাকিতে পারে, ইহা ভাবিয়া দেখি নাই। এ-সম্বন্ধে দুই প্রতিষ্ঠাবান্ সাংবাদিকের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :

(১) শ্রীঅমল হোমের মতে :— 1914 : *Basumati*, Bengali Daily, started with Hemendra Prasad Ghosh as Editor."

(২) শ্রীযুত হোমের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎসম্পাদিত 'দৈনিক বসুমতী'তে (৫ চৈত্র ১৩৫৪) এইরূপ লেখেন :— "সাপ্তাহিক বসুমতী পরে ১৩২০ সালে যখন দৈনিকে রূপান্তরিত হয়, তখন ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।" অর্থাৎ উপেন্দ্রবাবুর মতে সাপ্তাহিক 'বসুমতী' 'দৈনিক বসুমতী'তে পরিণত হয়, এবং ইহার প্রথম সম্পাদক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ নহেন,—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

'দৈনিক বসুমতী'র পুরাতন ফাইল বিদ্যমান থাকিলে এই পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তির নিষ্পত্তি সহজ হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু তবুও ইহার জন্মকাল নির্ণয় করা একেবারে দুঃসাধ্য নহে। 'বসুমতী'র কর্ণধার সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে তাঁহার সম্বন্ধে শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে 'দৈনিক বসুমতী'র জন্মকাল-নির্ণয়ের সূত্র মিলিতেছে। তিনি লেখেন :—

> "প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় এবং যত্নে 'দৈনিক বসুমতী' জন্মগ্রহণ করে। এ বিষয়ে স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অপেক্ষা সতীশচন্দ্রের উৎসাহ অনেক অধিক ছিল। বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ বাধিবার পরদিনই উপেন্দ্রবাবু আমার নিকট 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একখানা দৈনিক সংস্করণ বাহির করিবার প্রস্তাব করেন। কতকগুলি বিশিষ্ট কারণে আমি ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি নাই। কিন্তু সতীশবাবু নাছোড়বান্দা। তিনি বলিলেন যে, তিনি ঐ সকল অসুবিধা দূর করিয়া দিবেন। শেষে যুদ্ধ বাধিবার দুই দিন পরেই আমি এবং শ্রীযুত দুর্গানাথ ঘোষাল কাব্যতীর্থ উভয়ে বর্ত্তমান 'দৈনিক বসুমতী' প্রথম বাহির করি।" ('মাসিক বসুমতী,' বৈশাখ ১৩৫১, পৃ. ৭)

স্পষ্ট জানা যাইতেছে, "যুদ্ধ বাধিবার দুই দিন পরেই" অর্থাৎ ৬ই আগস্ট ১৯১৪ (২১ শ্রাবণ ১৩২১) 'বসুমতী'র একটি দৈনিক সংস্করণ—সাপ্তাহিক সংস্করণ ছাড়া—প্রকাশিত হয়। 'দৈনিক বসুমতী'র জন্মকাল সম্বন্ধে শশিভূষণের উক্তি একটি স্মরণীয় ঘটনার সহিত জড়িত, এই কারণে সাল-তারিখের ভুল না হইবারই কথা। প্রকৃতপক্ষে 'দৈনিক বসুমতী' ১৯১৪ সনের আগস্ট (শ্রাবণ ১৩২১) মাসেই যে প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার আর একটি প্রমাণ দিতেছি।

বঙ্গীয় রাজসরকার দেশীয় সংবাদ-পত্রের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। সংবাদপত্রে জনমত কিরূপ প্রতিফলিত হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য সরকারী মহলে প্রতি সপ্তাহে একটি করিয়া রিপোর্ট প্রস্তুত হইত। এই রিপোর্টে থাকিত সংবাদ-পত্রের প্রয়োজনীয় অংশের সঙ্কলন এবং বাংলা দেশের সমুদায় সংবাদ-পত্রের (মাসিকপত্রাদিও বাদ পড়িত না) নামধাম, সম্পাদকের নাম ও বয়স। ১৯১৪ সনের ১৫ই আগস্টের রিপোর্টে সাপ্তাহিক বসুমতীর উল্লেখ আছে, 'দৈনিক বসুমতী'র নামগন্ধ নাই। কিন্তু পরবর্তী ২২এ আগস্টের রিপোর্টে সংবাদপত্রের নাম-তালিকায় পাইতেছি :—

Additions to, and alterations in, the list of Vernacular Newspapers as it stood on 1st March 1914 :

... ...

Basumati...Daily.

শেষ পর্য্যন্ত জানা গেল, ১৯১৪ সনের আগস্ট মাসে (১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসে—১৩২০ সালে নহে) 'দৈনিক বসুমতী' জন্মলাভ করে, ইহার সম্পাদক ছিলেন শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এবং ইহার সহিত সাপ্তাহিক বসুমতীর কোন সম্বন্ধ ছিল না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীন ভারতের শিক্ষা-সংস্কার

ভাদ্রের 'শনিবারের চিঠি'তে শ্রীনারায়ণচন্দ্র চন্দ্র "স্বাধীন ভারতে শিক্ষা-সংস্কার" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন—কোন্ পথে আজ দেশ এগিয়ে যাবে, কোন্ আদর্শকে সামনে রেখে আজ জাতিকে গ'ড়ে তোলা হবে, এক কথায় কোন্ পথে কি ভাবে চলার শিক্ষা আজ দেশকে দেওয়া হবে তা ঠিক করার দায়িত্ব আমাদেরই। শিক্ষা যে জীবন-দর্শন,

সমাজ-দর্শন বা রাষ্ট্র-দর্শনকে জাতির মধ্যে সঞ্চারিত করার বাহন—এ কথা আজ কারও অজানা নয়, শিক্ষার মধ্য দিয়েই ফ্যাসিস্ট, বা কমিউনিষ্টিক বা গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী আজ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সঞ্চারিত করা হচ্ছে। আমাদেরও যদি দাসজাতিকে নূতন আদর্শে, নূতন প্রেরণায় সঞ্জীবিত ক'রে তুলতে হয়, নূতন পথে প্রগতিশীল জগতের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলবার মত শক্তি জাতির মধ্যে সঞ্চারিত করতে হয়, তবে নূতন ক'রে উপযুক্ত শিক্ষার কথা ভাবতে হবে। এতদিন চিন্তা ও কাজের মধ্যে বিরাট প্রাচীর ছিল পরাধীনতার। নিজেদের কোন পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করা সুকঠিন ছিল, যদি তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের পরিপন্থী হ'ত। আজ একমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বহু শতাব্দীর স্তূপীকৃত নিজেদের পাপ দিয়ে গড়া বাধা ছাড়া আর কোন বাধা নেই। অর্থাৎ আজ বাধাটা আর বাইরের নয়, ভেতরের। ভেতরের বাধা ব'লে বাধাটা যে কোনও অংশে কম শক্তিশালী তা নয়। বরং এতদিন চেনা শত্রু ছিল, তাই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করা ছিল সহজ; অন্তত শত্রুকে চিনে নেবার জন্য বেগ পেতে হ'ত না। আজ বাধা আমাদের ভেতরে, আজ বাধা আমাদের অবচেতন মনে, আজ বাধা আমাদের যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত সংস্কারের, আজ বাধা আমাদের নিজেদের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গীর। তাই এই অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করা আরও কঠিন। কিন্তু বাধা যতই কঠিন হোক না কেন, আজ কাজের দায়িত্ব আমাদেরই, ফলাফলের জন্য এবার আর নন্দ ঘোষের ঘাড়ে দোষ চাপানো চলবে না। তাই আজ পথ বেছে নেবার আগে ভাববার প্রয়োজন খুবই বেশি, আর পথ ঠিক ক'রে নিয়ে দৃঢ় পদে এগিয়ে চলার প্রয়োজনও সর্বাধিক।

জাতীয় ভবিষ্যতের ওপর শিক্ষার বিরাট প্রভাবের কথা স্মরণ ক'রে আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ইংরেজ-আমলে ইংরেজের প্রয়োজনে যে শিক্ষার প্রচলন হয়েছিল, পরাধীন দেশে বশ্য দাস সৃষ্টি করার জন্য যে ব্যবস্থা আমাদের ঘাড়ের ওপর চাপানো হয়েছিল, স্বাধীন দেশের স্বাধীন মানুষ গড়ার জন্য সে ব্যবস্থা যথাযোগ্য ব্যবস্থা হতে পারে না। আজকের শিক্ষা আমাদের দৃষ্টিকে পাঠ্য পুঁথির মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে দিয়েছে—বিরাট বিশ্বের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে, নিজের আত্মশক্তির ওপর নির্ভর ক'রে সমস্যার সমাধানের শিক্ষা দেয় নি। দাসসৃষ্টির জন্য এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল।

পরের কথা নির্বিচারে বিশ্বাস করা এবং তাকে স্থানে অস্থানে উদ্‌গীরণ করাকে লজ্জার কারণ ব'লে মনে না করার মধ্যেই দাসত্বের বীজ নিহিত রয়েছে। আজ জাতীয় জীবনের নূতন অবস্থায় এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন অস্বীকার্য।

এজন্য শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তার প্রয়োজন আজ খুবই বেশি। নারায়ণবাবুর প্রবন্ধকে এজন্য আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাংলা ভাষায় ভবিষ্যৎ শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কমই হয়েছে, আর যাও হয়েছে তা বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার ছায়ায় আবছা। আমরা এখনও বর্তমানকে পেছনে ফেলে সম্পূর্ণভাবে বিপ্লবী কিছু ভাবতে পারছি না। নারায়ণবাবুর প্রবন্ধ প'ড়েও আমার মনে হয়েছে যে, তিনি কেবল সংস্কারের কথাই কয়েছেন, বিপ্লবের কথা ভাবেন নি। বর্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামোতে বর্তমানে সংস্কারের বেশি কিছু সম্ভব কি না—এ প্রশ্ন উঠতে পারে। সে প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব না। কাপড়টা যখন পরার যোগ্য থাকে, তখন তাতে দু-চারটা জোড়াতালি দিয়ে তাকে ব্যবহারযোগ্য ক'রে তোলা চলে, কিন্তু জোড়াতালি দিতে দিতে পুরানো কাপড়কে আবার একটা নূতন কাপড়ে পরিণত করার কথা আমরাও চিন্তা করি কি? আমার ধারণা, শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা সেই রকম একটা অসম্ভব কিছু ভাবছি। বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা দাসসৃষ্টির ব্যবস্থা। একে জোড়াতালি দিয়ে আরও ভাল দাসসৃষ্টির ব্যবস্থায় পরিণত করা চলে, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। স্বাধীন মানুষ গড়ার জন্য সম্পূর্ণ নূতন ব্যবস্থারই দরকার। কাপড় যখন ছিঁড়ে পরার অযোগ্য হয়ে ওঠে, তখন সেটা ফেলে দিয়ে নূতন কাপড় পরাই বিধি। দাস গড়ার শিক্ষা আমরা ফেলে দিতেই চাই, আর তার পরিবর্তে সম্পূর্ণ অন্য প্রয়োজনে নূতন ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলতে হবে।

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক পরিকল্পিত বুনিয়াদী-শিক্ষা-ব্যবস্থা এমনিতর একটি নূতন ব্যবস্থা। আজকাল আমরা যাকে গান্ধীবাদ বলি, তা একটা সম্পূর্ণ বিপ্লবী চিন্তাধারা। পাশ্চাত্য সভ্যতা এগিয়ে চলতে চলতে আজ একটা অপরিহার্য পরিণতির সামনে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এই সভ্যতার ভিত্তি সম্পত্তিবোধের ওপর, এ বোধকে যে ইন্ধন যোগায় সে হচ্ছে লোভ। কোন তৃপ্তি নেই এই বোধের; নিত্য নূতন অভাব সৃষ্টি করা আর যে কোন উপায়ে তাকে তৃপ্ত করার মধ্য দিয়েই এর বিকাশ। এ সভ্যতায় ব্যক্তি ও সমাজের

মান হচ্ছে বস্তু-সম্পদের প্রাচুর্য, আর এর পথ হচ্ছে হিংসাসিক্ত দ্বন্দ্বের পথ, তাই এর পরিণতি আত্মধ্বংসে। গান্ধীজী বিশ্বব্যাপী এই সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন নূতন পথের সন্ধান দিয়ে। সম্পূর্ণ নূতন ব'লে কোন জিনিসই জগতে নেই, সুতরাং সে অর্থে নূতন বলছি না। যা আমাদের মধ্যে নেই, কখনও ছিল না—এমন একটা কিছুর কথা যদি গান্ধীজী বলতেন, তবে তা অবাস্তব হ'ত। শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর মত গান্ধীজী সেই সত্যকেই আবিষ্কার করেছেন, যার অঙ্কুরস্ত দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে, অথচ আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে। অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাতেই আমরা শান্তি, সত্য, ভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠা দেখতে চাই। অশান্তির পথ বেয়েও আমরা পৌঁছাতে চাই শান্তির দেউলে, হিংসার সংঘাতের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই প্রেমেরই। পশুত্বই শুধু মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি নয়, মনুষ্যত্বও মানুষের সহজাত ; আর পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে উত্তরণই তার বিবর্তনের নিদর্শন। গান্ধীজী এই সনাতন সত্যেরই সন্ধান নূতন ক'রে দিয়েছেন মাত্র। তবু এ পরিকল্পনা নূতন এই জন্যই যে, আদর্শ হিসাবে সত্য, অহিংসা ইত্যাদিকে স্বীকার করলেও বর্তমানের জটিল জীবনযাত্রায় সমাজে, রাষ্ট্রে, শিক্ষায় এর প্রয়োগ আমরা অবাস্তব ব'লে ধ'রে নিয়েছি। এ ধারণার কারণ আমাদের শিক্ষা। আমরা সত্যকে সর্বাবস্থায় আঁকড়ে ধরার শিক্ষা পাই নি, এর ওপর কল্পিত দুর্বলতা আরোপ ক'রে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেবার শিক্ষা গ্রহণ করেছি। চরিত্রগঠন আমাদের শিক্ষার আদর্শ ছিল না। গান্ধীজীর মতে চরিত্রগঠনই শিক্ষার লক্ষ্য, আর বুনিয়াদী শিক্ষা গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী চরিত্র ও সমাজ গঠনেরই মাধ্যম।

আমি এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই বুনিয়াদী শিক্ষাকে দেখে থাকি। এই দৃষ্টি নিয়ে দেখতে গিয়ে নারায়ণবাবুর উক্ত প্রবন্ধে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর কতকগুলি উক্তির সঙ্গে একমত হতে পারি নি। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য জানাবার জন্যই এই প্রবন্ধ লিখতে বসেছি।

প্রথমত নারায়ণবাবু বলেছেন, "তিনি (গান্ধীজী) বলিয়াছিলেন, বনিয়াদী শিক্ষা প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা, গ্রামবাসীর শিক্ষা।"

বুনিয়াদী শিক্ষা নিশ্চয়ই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা। অবশ্য প্রাথমিক স্তর বলতে কেউ যেন না আজকালকার উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্তর বোঝেন। এখানে জীবনে প্রবেশের এবং নাগরিক দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যতটুকু শিক্ষা

অপরিহার্য, তাকেই গান্ধীজী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বলেছেন। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষাকে কেবল গ্রামবাসীর জন্য উদ্দিষ্ট শিক্ষা ব'লে আখ্যা দেওয়া চলে না। নারায়ণবাবুর এই সিদ্ধান্তের কারণ কয়েকটি বাক্য পরেই পাচ্ছি। তিনি লিখেছেন, "কাজেই গ্রামবাসীকে গ্রামে রাখিয়াই স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপনে শিক্ষিত করা এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও কুটিরশিল্পে আত্মনিয়োগ করিতে শিক্ষা দেওয়াই বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য।" সত্যিই যদি এই বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ত, তবে এ শিক্ষা শুধু গ্রামবাসীর শিক্ষাই হ'ত সন্দেহ নেই। কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য গান্ধীজী স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, "To draw out the best in the child—physical, intellectual and spiritual"—অর্থাৎ এ শিক্ষা হচ্ছে প্রত্যেকটি শিশুকে দেহে মনে আত্মিক-সম্পদে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ক'রে তোলার শিক্ষা। তাই শহর-গ্রামের সীমা-রেখা দিয়ে এর গণ্ডি টানা চলে না। গান্ধীজী বিকেন্দ্রীত শাসন ও শিল্প-ব্যবস্থা চেয়েছেন গ্রামকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য নয়, মনুষ্যত্বকে তার চরম বিপর্যয় ও আত্মধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য। যদি মানুষের বিকাশের জন্য গ্রামকে লুপ্ত ক'রে দেওয়া আর শহর গ'ড়ে তোলা শ্রেয় হ'ত, তা হ'লে গান্ধীজী নিশ্চয়ই তা করার চেষ্টা করতে দ্বিধা করতেন না। এখানে গ্রাম বা শহর প্রধান বিবেচ্য নয়, মূল লক্ষ্য হচ্ছে মনুষ্যত্ব। কেন্দ্রীভূত শিল্প শক্তিকে কেন্দ্রীভূত ক'রে ব্যক্তিকে অসহায়ভাবে পরনির্ভরশীল ক'রে তোলে, উৎপাদনকে যান্ত্রিক ক'রে উৎপাদনকারীর ব্যক্তিত্বকে শিল্পপ্রতিভাকে বিকশিত হবার সুযোগ দেয় না। এই ব্যবস্থায় সমাজ ও ব্যক্তির বিকাশ পরস্পরবিরোধী হয়। তাই গান্ধীজী বলেছেন, "কিন্তু আমার মতে যন্ত্রশিল্পের মধ্যেই দুর্নীতি নিহিত আছে, সমাজ-তান্ত্রিকতা তার মূলোৎপাটন করতে পারবে না।"

বুনিয়াদী শিক্ষা সুতাকাটা, কৃষি, সাফাই, কুটিরশিল্প প্রভৃতির মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে। এ থেকেই হয়তো শিক্ষিত লোকেরা সিদ্ধান্ত ক'রে থাকেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা চাষাভুষোর জন্য পরিকল্পিত শিক্ষা, ভদ্রলোকের জন্য নয়; গ্রামের লোকের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষা, শহরের লোকের জন্য নয়; পশ্চাৎপদ জাতি ও সমাজের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষা, প্রগতিশীল জাতি বা সমাজের জন্য নয়। বস্তুত আমরা, যারা বিনা বিচারে এমনিতর সিদ্ধান্ত ক'রে বসি তারা, আমাদের অজ্ঞতাপ্রসূত ক্ষীণ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে গিয়ে গান্ধীজীর বিরাট

প্রতিভাকে অসম্মান করি। গান্ধীজী যে শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের সামনে রেখেছেন, তা তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারাকে মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করারই যোগ্য মাধ্যম। তাঁর জীবনদর্শন যেমন কেবলমাত্র অসহায় পশ্চাৎপদ জাতির জন্য নয়, তা যেমন আত্মধ্বংসী সভ্যতার গর্বান্ধ মূঢ় পদক্ষেপের সামনে মঙ্গলের এক নূতন পথরেখা, তেমনই তাঁর পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থাও সর্বদেশের সর্বজাতির জন্য। কিন্তু বাস্তব অবস্থাকে গান্ধীজী ভাল ক'রেই চিনতেন, কারা তাঁর উপদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবে তা তিনি জানতেন; তাই তিনি এই শিক্ষার পরীক্ষাকে গ্রামের সীমারেখার মধ্যে প্রয়োগ করার উপদেশ দিয়েছিলেন।

বুনিয়াদী শিক্ষায় সুতাকাটা, কৃষি ইত্যাদি কাজের শিক্ষা বৃত্তিশিক্ষা নয়। বুনিয়াদী শিক্ষালাভের পর সবাই তাঁতী বা চাষী হবে, এ কল্পনা নিশ্চয়ই গান্ধীজীর মনে ছিল না। বুনিয়াদী শিক্ষার এই মাধ্যম গ্রহণ করার কারণ ত্রিবিধ। কাজের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ যে সব চাইতে কার্যকরী এ সম্বন্ধে আজ আমাদের কোন সন্দেহ নেই, কারণ মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান এ সম্বন্ধে আমাদের সামনে অকাট্য যুক্তি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থাপিত করেছে। কিন্তু সব কাজই কি শিক্ষাদানের পক্ষে সমান উপযোগী? গান্ধীজী শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে তেমন কাজই বেছে নিতে চেয়েছেন,

(১) যা আমাদের জীবনধারণের অপরিহার্য বিষয়ে স্বাবলম্বন এনে দেবে, যার ফলে উত্তর-জীবনে আমরা যখন সমাজের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে চলব, তখন তা ছদ্ম দাসত্ব হবে না, আত্মরক্ষার শক্তিসম্পন্ন শক্তিমানদের মধ্যে স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা হবে;

(২) যে কাজ কেবল মাত্র শিশুর ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশিকেই পরিতৃপ্ত করবে না, পরন্তু সামাজিক মঙ্গলকে এগিয়ে দেবে, যার ফলে শিশুর মধ্যে সমাজ-বোধ জাগ্রত হবে, সামাজিক মঙ্গল ও আত্মবিকাশের চিন্তার মধ্যে সেতু রচিত হবে;

(৩) যে কাজের ব্যাপকতা এত বেশি, যে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সেই কাজগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ হবে।

সকল কাজের এই গুণ নেই। তাই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গান্ধীজী অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সম্পর্কিত কাজগুলি বেছে নিয়েছেন। এই কাজগুলিতে যদি আমরা অসহায়ভাবে পরনির্ভরশীল হই, তবে আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা একান্তভাবে

ব্যাহত হতে বাধ্য। আমাদের সহযোগিতা তখনই স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা হতে পারে, যখন আমরা এই সব একান্ত অপরিহার্য কাজ সম্বন্ধে অসহায়ভাবে পরনির্ভরশীল থাকি না। কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে পারে না। আত্মনির্ভরশীলতা যতই বাড়বে, আমাদের স্বাধীনতাও ততই ব্যাপক হবে, ততই তার ভিত্তি দৃঢ় হবে। সুতরাং এই কাজগুলির শিক্ষা আমাদের স্বাধীনতার উপযুক্ত ক'রে তুলবে ব'লেই এই কাজগুলির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়।

অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান সম্পর্কিত কাজগুলি প্রায়শ কারুশিল্প। এদের একটা মূল্যের দিকও আছে। তাই কাজগুলি নেহাতই ভাঙা-গড়ার খেলা নয়। এ কাজগুলি যত ভাল হবে, শিক্ষা ও নিপুণতা যতই পূর্ণ হবে, ততই উৎপাদিত দ্রব্যগুলির মূল্য বাড়বে। সুতরাং এই কাজগুলির শিক্ষা কেবলমাত্র শিশুকেই সৃষ্টির আনন্দ দেবে না, সমাজের ঐশ্বর্য বাড়াতেও সাহায্য করবে। এ ভাবে এই কাজগুলির মধ্যে ব্যক্তিগত আনন্দ, ব্যষ্টির বিকাশের সঙ্গে সমাজের মঙ্গল, সমষ্টির বিকাশও একীভূত হয়ে আছে।

শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাজগুলিকে নির্বাচন করার প্রধান কারণ হচ্ছে পূর্বোল্লিখিত তৃতীয় কারণটি। জীবনের পক্ষে অপরিহার্য এই কাজগুলির ব্যাপকতা অসীম। আমাদের জীবনের প্রতি ক্ষণকে, আমাদের ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠাকে প্রভাবিত করেছে এই কাজগুলি, এজন্য শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে এই কাজগুলির কোন তুলনা নেই।

বুনিয়াদী শিক্ষা যে কেবলমাত্র গ্রামবাসীর শিক্ষার পরিকল্পনা নয়, তার একটি প্রমাণ হচ্ছে এজন্য নির্বাচিত নামটি। এই শিক্ষা-ব্যবস্থা 'বুনিয়াদী-জাতীয় শিক্ষা' (Basic National Education) ব'লে পরিচিত। এখানে 'জাতীয় শিক্ষা' কথাটার অর্থ ভাল ক'রে বোঝা উচিত। প্রত্যেক জাতির জাতীয় ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি ক'রে সেই জাতির প্রতিভা রূপ নেয়। বিশ্বের ভাণ্ডারে এই হয় জাতির সব চাইতে বড় অবদান। ভারতের প্রতিভা রূপ নিয়েছে সত্য ও অহিংসার বাণীতে। সত্যকেই ভারত ভগবান ব'লে জেনেছে, ধর্ম ব'লে গ্রহণ করেছে। তাই ভারতের ধর্ম কথার আড়ালে বাঁধা পড়ে নি। যা-কিছু সত্য, যা-কিছু মঙ্গলকর, ভারত তাকেই গ্রহণ করেছে, আপন ক'রে নিয়েছে। দ্বন্দ্বের পথ থেকে সামঞ্জস্যের

পথে চলতে ডাক দিয়েছে ভারতবর্ষ। বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতের এই বাণীকে, এই প্রতিভাকে, এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে রূপ দেবার মাধ্যম হবে, এজন্যই একে জাতীয় শিক্ষা বলা হয়েছে। সুতরাং 'জাতীয় শিক্ষা' কথাটা একটা ভৌগোলিক সীমা নির্দেশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় নি, একটা জাতীয় প্রতিভার দ্যোতক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

জগতে চিরকালই গ্রাম আর শহর থাকবে, ছোট বড় শিল্প থাকবে। সমস্ত গ্রামকে আমরা শহর ক'রে ফেলব অথবা সমস্ত শহরকে অবলুপ্ত ক'রে আমরা খাঁটি গ্রামসভ্যতার পত্তন করব—এ কোন কালেই সম্ভবপর হবে না। কিন্তু গ্রামে শহরে সর্বত্রই সত্যনিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা, আত্মনির্ভরতার মনোভাবকে সঞ্চারিত করা সম্ভব। বুনিয়াদী শিক্ষা এই সম্ভাবনার ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। বস্তুটা তো কেবলমাত্র বস্তু হিসাবে দোষণীয় নয়; তার সৃষ্টির পেছনে যে মনন-শক্তি আছে, তার ব্যবহারের পেছনে যে ব্যক্তিত্ব কাজ করছে, তারই প্রভাবে বস্তুর মূল্য প্রভাবিত হয়। এই মনন-শক্তি, এই ব্যক্তিত্বকেই নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয়ত, নারায়ণবাবু লিখেছেন: "বনিয়াদী শিক্ষার প্রধান সমালোচ্য বিষয় এই যে, নিম্ন হইতে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত একটি সুসম্বদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীর অঙ্গহিসাবে ইহা প্রথম হইতেই পরিকল্পিত হয় নাই।"

শ্রীযুক্ত চন্দ্রের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ বুনিয়াদী-শিক্ষা-পরিকল্পনার দোষ, না, গুণ, নূতন পরিকল্পনার দুর্বলতা, না, শক্তি? আমরা যখন সুসম্বদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীর কথা ভাবি, তখন আমাদের বর্তমান জ্ঞান দিয়েই তার সীমারেখা টানি না কি? যা অজানা, যা সম্পূর্ণ নূতন, তার সবটা আমরা দেখব কি ক'রে? তার সম্পূর্ণ চিত্র আঁকা কি ক'রে সম্ভব হতে পারে? আমরা নূতনের আকাঙ্ক্ষা করি বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নূতন কিছু গ্রহণ করা আমাদের শক্তিতে কুলিয়ে ওঠে না। আমাদের ভীরু পদক্ষেপ, ঝাপসা দৃষ্টির ফলে নূতনের সঙ্গে অনেকখানি পুরাতনের খাদ মিশিয়ে ফেলি। এইখানেই আমরা পেতে পারি গান্ধীজীর বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয়। ফলাফল দেখার জন্য ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করার মত বৈজ্ঞানিক মনোভাব তাঁর ছিল, তাই তিনি আগে-ভাগেই একটা সুসম্বদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীর কাঠামো গড়েন নি। প্রাথমিক স্তরের কাজ আরম্ভ করার জন্য তার একটা রূপ দেবার প্রয়োজন ছিল, বুনিয়াদী

শিক্ষার পরিকল্পনায় ততটুকু মাত্র রূপ দেওয়া হয়েছিল ; আর ততটুকু সম্বন্ধেও বার বার সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছিল যে, এর কোন কিছুই শেষ কথা নয়। যে সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না, তা হচ্ছে আদর্শ ও পথ সম্পর্কে। উৎপাদক কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী শিক্ষার কথাটা তাই গান্ধীজী এত জোর দিয়ে বলেছেন। তিনি বলেছেন: "Self sufficiency is the acid test of its reality"—এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হ'লে শিক্ষার বিষয়বস্তু কি হবে, কত বৎসর ব্যাপী শিক্ষা দেবার প্রয়োজন হবে, সে সম্বন্ধে শেষ কথা গান্ধীজী কিছুমাত্র বলেন নি। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপ্তি বা বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন, এ শিক্ষা সর্বজনীন হওয়া চাই, অবৈতনিক হওয়া চাই, আর মাতৃভাষার মাধ্যমে হওয়া চাই। এই নীতির মধ্যে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। শিক্ষা তৈরি করবে নূতন যুগের নূতন মানুষ, আর প্রত্যেকের অধিকার থাকবে মানুষের মত মানুষ হয়ে গ'ড়ে ওঠার। মহাত্মাজী নূতন বোতলে পুরানো মদ ঢালার চেষ্টা করেন নি, একটা জোড়া-তালি দেবার ব্যবস্থা করেন নি। আজ বুনিয়াদী শিক্ষার ফলাফল আমাদের হাতে রয়েছে, তারই ভিত্তির ওপর মাধ্যমিক এবং ওই পরীক্ষার শেষে তার ফলাফলের ভিত্তিতে উচ্চতর শিক্ষার কথা আমাদের ভাবতে হবে। গান্ধীজী যে প্রাথমিক স্তরের পরীক্ষা শেষ হবার আগে উচ্চতর স্তরের শিক্ষা-পরিকল্পনা ইচ্ছা ক'রেই রচনা করতে চান নি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সেবাগ্রামে হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘের Post-Basic Sub-Committeeর অধিবেশন হয়। উক্ত উপ-সমিতি মাধ্যমিক শিক্ষার এক বিশদ পরিকল্পনা রচনা করেন। এই পরিকল্পনা গান্ধীজীর কাছে উপস্থাপিত করা হ'লে তিনি বলেন যে, 'হাওয়াই বাত' তিনি চান না। তাঁর সামনে প্রাথমিক শিক্ষার যে ফলাফল রয়েছে, তার ভিত্তিতে উক্ত প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা যারা সম্পূর্ণ করল, তাদের শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য কি শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত, সে সম্বন্ধে ভাবতে তিনি এই উপ-সমিতিকে উপদেশ দেন। এই শিক্ষার নাম মাধ্যমিক শিক্ষা হবে, না, কলেজী শিক্ষা হবে—এ নিয়ে বিতর্ক করা নিরর্থক ব'লে তিনি মনে করেন। এ শিক্ষা নূতন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, পুরাতন নামের সঙ্গে যুক্ত করার অত্যধিক আগ্রহে কেবল ভ্রান্তিরই সৃষ্টি হবে। সুতরাং আমার মনে হয়, বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা যে প্রথম থেকেই একটা সুসম্বদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীর অঙ্গ হিসাবে তৈরি হয় নি, এখানেই তার বৈশিষ্ট্য।

সার্জেণ্ট-পরিকল্পনা আমাদের সামনে একটা সুসম্বদ্ধ শিক্ষাপ্রণালীর পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছে। আমাদের সপ্রশংস দৃষ্টিও সহজেই আকৃষ্ট করেছে এই পরিকল্পনা, কারণ এই পরিকল্পনাতে নূতনত্ব থাকলেও পরিকল্পনাটি মূলত আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষার কাঠামোর সঙ্গে বেমানান নয়। এজন্য আমরা সহজেই একে গ্রহণ করতে পারি, বিচার করতে পারি। আমার মনে হয়, সংস্কার আর বিপ্লবের মধ্যে এখানেই তফাত। সার্জেণ্ট-পরিকল্পনার চেষ্টা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাকে সংস্কারের চেষ্টা, গান্ধীজীর চেষ্টা বিপ্লবের।

তৃতীয়ত, নারায়ণবাবু লিখেছেন, "পল্লীর বালকবালিকাকে যদি আবশ্যিক ভাবে বনিয়াদী বিদ্যালয়ে সাত বৎসরকাল শিক্ষা লাভ করিতে হয়, তবে তাহার ফলে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হইতে সক্ষম ভাবী প্রতিভাকে আমরা পাকা কারিগরে পরিণত করিয়া তাহার বৃহত্তর প্রতিভার বিকাশে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারি।" এই আশঙ্কাকে দূর করার জন্য নারায়ণবাবু একটি উপায়েরও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন: "...শুধু সকল ছাত্রকেই বনিয়াদী বিদ্যালয়ে শেষ শ্রেণী পর্যন্ত ধরিয়া না রাখিয়া প্রতিভাবান কতককে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দিতে হইবে।" অর্থাৎ তাঁর মতে ১১ বৎসর বয়সের পর প্রতিভাবান ছেলেমেয়েকে উচ্চশিক্ষার দিকে যেতে দেওয়া উচিত।

তাঁর এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারি নি। সাত বছর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাটালে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হওয়ার বিঘ্ন ঘটেছে, এমন কোন প্রমাণ আছে কি? বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজ শেখার মানে বৃত্তিশিক্ষা নয়—এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এখানে কাজকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয় এই কাজের মধ্য দিয়ে শিশুর দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক বিকাশ ঘটবে ব'লে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিষয়জ্ঞান কম দেওয়া হয়—এ বোধ হয় আজকালকার সুধীসমাজের ধারণা। এ ধারণা কোন প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব'লে মনে হয় না। বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রম দেখলেই বোঝা যাবে যে, বুনিয়াদী শিক্ষায় সাধারণ বিদ্যালয়ের চাইতে অনেক বেশি বিষয়জ্ঞান হওয়ার কথা। এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা একটি ছোট প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়, অন্যত্র আমরা এ সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।*

---

* অনিলমোহন গুপ্ত: বুনিয়াদী-শিক্ষা-পদ্ধতি, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

শারীরবিদ্যা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি শেখার পূর্ব-প্রস্তুতি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পুরাদমেই চলতে থাকে। ঠিক যেমন মাতৃভাষা আয়ত্ত করার আগে অন্য ভাষা শিক্ষা কোন শিশুর ঘাড়ে চাপালে তার মাতৃভাষাও ভাল ক'রে শেখা হয় না, আর অন্য ভাষার জ্ঞানও থেকে যায় আব্ছা; তেমনি প্রাথমিক শিক্ষাটা সুসম্পূর্ণ হবার আগেই বিশেষজ্ঞ হবার শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টা করলে গোড়াটা অত্যন্ত কাঁচা থেকে যায়। বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাকারীদের মতে শিশুর বিশেষ প্রতিভাটিকে আবিষ্কার করার সময় আসে না। এর পেছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি হচ্ছে এই যে, মনোবিজ্ঞানের সাক্ষ্য অনুসারে কৈশোরের এই সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করার আগে শিশুর চিন্তাধারার স্রোতের গতি নিশ্চিতরূপে বোঝা যায় না; দেহবিজ্ঞানীরা বলেন, ১৩।১৪ বছরের আগে কারিগরের কাজ শেখার মত দৈহিক পূর্ণতা শিশুর জন্মায় না। বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনাকারীদের তরফ থেকে এ সম্পর্কে মূল যুক্তি এই যে, বুনিয়াদী-শিক্ষার ভেতর দিয়ে যে আদর্শ বিদ্যার্থীর মনে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়, যে উঁচু গ্রামে চরিত্রকে বাঁধবার চেষ্টা করা হয়, যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব তাঁরা বিদ্যার্থীর মনে গ'ড়ে তুলতে চান, যে নাগরিকবোধ ও কর্তব্যবোধ বিদ্যার্থীর মনে জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়, তাকে স্থায়ীভাবে বিদ্যার্থীর আসনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অন্তত ওই সময়টুকু প্রয়োজন, এবং ন্যূনপক্ষে চৌদ্দ বছর বয়সের আগে বিদ্যার্থী বুদ্ধিযুক্তভাবে এই আদর্শকে আত্মস্থ করতে পারে না। যে শিক্ষার, কেবল বুদ্ধির বিকাশ নয়, চরিত্রগঠনও মূল উদ্দেশ্য, সেখানে এই মূল উদ্দেশ্যটিকেই বাদ দিলে আর কি থাকে! সুতরাং সময় সংক্ষেপ করতে গিয়ে মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হ'লে বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অল্পই অবশিষ্ট থাকবে।

১২ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস ক'রে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সুপ্রচুর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, চরিত্রবলে বিশ্বের সম্মান অর্জন করেছেন,—এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত হয়তো এই যুক্তির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করা হবে। কিন্তু ১৮ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাস ক'রে বিশ্বের দরবারে স্থান অর্জন ক'রে নেবার দৃষ্টান্তেরও তো অসদ্ভাব দেখি না। জগতের মধ্যে প্রতিভাবান ও জড়বুদ্ধি শিশু থাকবেই,—তারা কিন্তু সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। আমাদের গড় আয়ু ২৭ বছর। তাই বোধ হয় বয়স নিয়ে আমরা এত হৈ-চৈ করছি। দু বছর আগে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার তাড়ায় তার অপরিণত ঘাড়ে সাধ্যাতিরিক্ত বোঝা

চাপাবার চেষ্টা না ক'রে আমরা যদি গড় আয়ুকে ২৭ থেকে ৬০ বছরে তোলবার চেষ্টা করি, তবে বোধ হয় অনেক উপকারও হবে, আর বিশ্বসভায় স্থান ক'রে নেবার প্রস্তুতির সময়ও অনেক বেড়ে যাবে। শিক্ষাকে দু বছর কমানোর চাইতে আয়ুকে ত্রিশ বছর বাড়ানোর চেষ্টা করলে আমরা নিশ্চয়ই অধিকতর লাভবান হব। বস্তুত গান্ধীজীর কাছে বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যাপ্তি ও শিক্ষাশেষের বয়স প্রধান বিবেচ্য ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষালাভে শিশুকে স্বাবলম্বী হতে হবে, নাগরিক হিসাবে কতগুলি দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হতে হবে—এই সকল অর্জন করাই হবে বিদ্যার্থীর লক্ষ্য, তাতে যতখানি সময় লাগে ততটা সময় দিতে হবে তাকে। তাই এক জায়গায় গান্ধীজী বলেছেন, "মেরা তো সাত বরসকে সাথ সাদী নেহী হুয়ী, সাদী হুয়ী তো স্বাবলম্বনকে সাথ।"

সর্বশেষে নারায়ণবাবুর একটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আমার মন্তব্য জানিয়ে এই বক্তব্য শেষ করব। তিনি লিখেছেন, "শুধু কুটিরশিল্পের প্রসার হইলে এবং পল্লীবাসীর অভাব মিটিলেই দেশের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সংঘটিত হইবে না। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগ চলিতেছে।...কুটিরশিল্পকে যন্ত্রশিল্পের পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করিয়া সমাজ-জীবনে পল্লী ও শহরের মধ্যে সহযোগিতার সেতু স্থাপন করিতে হইবে।"

প্রথম বাক্যটিতে নারায়ণবাবু যা বলেছেন, তার সঙ্গে কারও দ্বিমত থাকতে পারে না। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনাকারীরা কুটিরশিল্পের পক্ষ থেকে এমন কোন দাবি করেন নি। আসল কথা এই যে, কুটিরশিল্পের প্রসার না হ'লেও পল্লীবাসীর অভাব না মিটলে দেশের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক কোন উন্নতি সংঘটিত হতে পারে না। কুটিরশিল্পের প্রসার ও পল্লীবাসীর দুর্গতিমোচন শেষ কথা নয়, গোড়ার কথা। সমগ্র দেশকে জাগ্রত ক'রে তুলতে হ'লে ওইটুকু একান্তই প্রয়োজন। যে দেশের শতকরা ৮০ জন লোকের দু বেলা পেট ভ'রে অন্ন জোটে না, সে দেশের প্রতিভা যদি এই সমস্যাকে উপেক্ষা ক'রে অন্য দিকে দৃষ্টি দেয়, যদি এই সমস্যার সমাধানে অপারগ হয়ে সাহিত্য দর্শন কপচায়, তবে সে প্রতিভা শ্মশানের প্রতিভা, সে প্রতিভার গর্ব না করাই ভাল।

অবান্তর হ'লেও হঠাৎ পণ্ডিত জওহরলালের কথা মনে প'ড়ে গেল। তিনি জাতীয় পরিষদে সেদিন মাত্র জানিয়েছেন যে, ভারতের আন্তর্জাতিক

মর্যাদা রক্ষার জন্য নাকি আমাদের বড়লাটকে মাসিক লক্ষাধিক টাকা বৃত্তি দেবার প্রয়োজন আছে। যে দেশের অর্ধেক লোক আধপেটা খায়, অর্ধনগ্ন থাকে, যে দেশের শতকরা ৯০ জন লোক অশিক্ষিত, চিকিৎসার সামান্যতম সুবিধা থেকেও বঞ্চিত—সেসব কাহিনী জগতের দেশে দেশে প্রচারিত হ'লেও আমাদের অমর্যাদা হবে না, সব অমর্যাদা ঢেকে যাবে বড়লাটকে লম্বা মাইনে দিলে! পণ্ডিতজীর মুখে আমরা এমন কথা শুনব আশা করি নি, কিন্তু আমাদের প্রতিভার গতি এমনিই হয়েছে।

দ্বিতীয় বাক্যে শ্রীযুক্ত চন্দ্র বোধ হয় বোঝাতে চেয়েছেন যে, এটা বিজ্ঞানের যুগ চলছে, আর বুনিয়াদী শিক্ষা কুটিরশিল্প কৃষি ইত্যাদির দিকে ঝোঁক দিয়ে পেছনের দিকে চলেছে। বিজ্ঞানকে এখানে যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে ব'লে আমার আশঙ্কা হয়। বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে—প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তার আচরণের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করা। যন্ত্রে তার প্রয়োগ মাত্র। এ প্রয়োগের সার্থকতা সেখানেই, যেখানে প্রয়োগ মঙ্গলের বাহক। কিন্তু মঙ্গলামঙ্গল বিচার না ক'রে যন্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবহারেই আমরা বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ ব'লে ধ'রে নিয়েছি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শ্রী জে. সি. কুমারাপ্পা তাঁর 'Why the Village Movement' ও 'Economy of Permanence'-এ করেছেন। আমার এখানে বক্তব্য শুধু এই যে, বিজ্ঞানকে বুনিয়াদী শিক্ষা বিন্দুমাত্র অবহেলা করে নি, এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করাকে বুনিয়াদী শিক্ষায় একটি শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়েছে। বুনিয়াদী শিক্ষায় কেবলমাত্র বিজ্ঞানের কতকগুলি সিদ্ধান্ত মুখস্থ না করিয়ে আরও গোড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে বিদ্যার্থীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও বৈজ্ঞানিক অভ্যাস গঠন করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। আমার মনে হয়, প্রাথমিক শিক্ষায় অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত গলাধঃকরণ করার চাইতে এই মনোভাব সৃষ্টির প্রয়োজন অনেক বেশি।

যন্ত্রশিল্প সম্বন্ধে গান্ধীজীর মতামত তাঁরই জবানিতে উদ্ধৃত করছি: "আমি যন্ত্রকে ধ্বংস করতে চাই না, তার কর্মক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করতে চাই। কুটিরবাসী কোটি কোটি মানুষের কর্মভার লাঘব করবে যে যন্ত্র, তাকে আমি স্বাগত জানাই।...যদি গাঁয়ের ঘরে ঘরে আমরা বিদ্যুৎশক্তি পৌঁছে দিতে পারি, সেই বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে গ্রামবাসীরা যন্ত্র চালালে আমি ক্ষুণ্ণ হব না।...কিন্তু যন্ত্র-

সংখ্যক লোকের হাতে বিত্ত ও ক্ষমতা সঞ্চয় করার জন্য যদি যন্ত্রের ব্যবহার হয়, আমি তা অন্যায় ও পাপ ব'লে মনে করি। অধুনা যন্ত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়।...ভারতের সাত লাখ গাঁয়ে যে সজীব যন্ত্র ছড়িয়ে আছে, তার বিরুদ্ধে প্রাণহীন যন্ত্র বসাতে চাই না।...আমাদের দেশের যা কিছু প্রয়োজন, তা যদি তিন কোটি লোকের বদলে ত্রিশ হাজার লোকের দ্বারা প্রস্তুত হয়, আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ওই তিন কোটিকে অলস ক'রে বেকার বসিয়ে রাখা চলবে না।"*

সুতরাং গান্ধীজীর বিদ্রোহ যন্ত্রসভ্যতার বিরুদ্ধে নয়, যন্ত্র-অসভ্যতার বিরুদ্ধে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে শিল্পশিক্ষা দেওয়া হয়, তা বৃত্তি হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয় না—এ কথা পূর্বেই বলেছি। এই শিক্ষার দ্বারা শিশুর দেহমনের বিকাশ হয়। টাকু চরখা এগুলিও যন্ত্রই এগুলি ব্যবহারের দ্বারা শিশু ভবিষ্যতে জটিলতর যন্ত্র ব্যবহারেরই পূর্বপ্রস্তুতি লাভ করে। এজন্য ডাঃ জাকির হোসেন বলেছেন যে, যদি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করার পর বিদ্যার্থী বৃহৎ যন্ত্রশিল্পে যোগদান করতে চায়, তবে তাতে কোন অসুবিধাই হবে না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে নানা যন্ত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার ফলে তার যে নিপুণতা জন্মাবে, তাতে তার পক্ষে এই পথ নেওয়া সহজতর হবে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণের ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে সহযোগের সেতুটি ভেঙে যাবে ব'লে শ্রীযুক্ত চন্দ্র যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তা একান্তই ভিত্তিহীন। বৃহৎ যন্ত্রশিল্প একেবারে অবলুপ্ত হয়ে যাবে, বা মানবজাতির কোন কল্যাণেই লাগবে না—এমন কল্পনা গান্ধীজী নিশ্চয়ই করেন নি; কিন্তু বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে এর স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্তি পাবার একটা বাস্তব পথ তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। গ্রাম ও শহরের মধ্যে সেতুর প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিন্তু শোষণ-ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার জন্য সেতুটির ব্যবহার মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত

ধূমকেতু

কাঁকর বেড়েছে চালে—কিবা মিল, কিবা ঢেঁকি-ছাঁটা।
ধূমকেতু নয় দাদা, দয়াময় বিধাতার ঝাঁটা।

---

* ধীরেন্দ্রলাল ধর: 'আমাদের গান্ধীজী', পৃ. ৩৮৫

পুণার রাস্তায়

এইখানে ছিল নৈমিষারণ্য কিংবা পঞ্চবটী।

বিবর্ণ বন-মৃত্তিকাতলে জনকতনয়ার স্নানপুণ্যোদকের শ্যামল ঐতিহ্য-চন্দনবর্ণা ঋষিকন্যারা নেমে এসেছিল এই গিরিপথ দিয়ে এক রৌদ্রহীন প্রভাতে;

তাদের কমণ্ডলুর স্নেহসিঞ্চনে মহারাষ্ট্রের ইতিহাস আজও জীবন্ত।

মেহের বান্, ও মেহের বান্, খয়রাৎ কর মেহেরবান্

—অন্ধ ভিক্ষুক হাঁকে মহাকাল-মন্দিরের নীচে—

[খীবা-বুখারার শক্তসমর্থ ভিক্ষুক চেঁচিয়ে আসছে এই সুরে]

দূর দেশের রাজকুমার এসেছে খাকী পোশাক প'রে

রক্তরসিক মহাকবি—

এই মরণযজ্ঞের অবসরে, জীপের অঙ্কে, রক্তমাংসের মহাকাব্য রচনা করে।

অতি-আধুনিক প্রথায় পথচলতি সংস্করণ।

সেদিন অনেক রাতে পার্শী অরফ্যানেজের ভিত্তিমূল উঠেছিল চঞ্চল হয়ে আর 'বন' গার্ডেনের অধস্তন সপ্ততললোক বিরাট ভূমিকম্পের সম্ভাবনায় উদ্বেল।

সেই অনাগত প্রলয়ের সমস্ত স্পন্দনটুকু গ্রহণ করলাম শিরায় শিরায়।

পশ্চিম-তীর থেকে যারা আসে, উদ্ভট নাম নিয়ে বিভ্রান্ত দ্রবিড়—ওদের আমি বাঁচাতে পারব।

আর

উত্তর-পশ্চিমের সেমেটিক ওরাও ফিরে আসবে।

আর

একদিন,

গৈরিক রঙের অনন্ত গোধূলিতে,

গৈরিক ধূসর সহস্র যোজনের বানপ্রস্থ পথে,

অনন্ত যাত্রা করব (গৈরিকে নয়) রক্তবসনের পরিব্রাজক

…অনাদিকালের চলমান বহে যেন…

…সহস্র বর্ষের সতপ্ত রক্ততিলক আমার ললাটে…

'বন' গার্ডেনের এই মহীরুহের তলে রচনা করব শেষ আসন, আমার প্রলয়-প্রাপ্ত রক্তচন্দনে তিলক পরাব মহারাষ্ট্রের অগ্নিগর্ভ বিভূতিস্তূপে,

নৈমিষারণ্যের আকাশে উঠবে শাশ্বত-কালের সামগান!

আর্যপুত্র সুপ্রিয়

ওগো মিস্

অত সেজে-গুজে তুমি কোথা যাও
ওগো ইঙ্গ-ভারত-ললনা?
তুমি আপিসের পানে কেন ধাও
এ কি চাকরির শুধু ছলনা?

বাস্! ভাষা ঠ্যাং ভেঙে ব'সে পড়েছে, আর কিছুতেই সে আমার ভারী ভাবকে বইবে না। কবিতার জন্ম হবে কি ক'রে? ছন্দ ঠিক রাখতে গিয়ে মিল হয়ে যায় গরমিল, আবার মিল ঠিক রাখতে গিয়ে ছন্দ হয় অপ ছন্দ; এই ছুমুখো দৈন্য নিয়ে স-মিল ও স-ছন্দ কবিতা লিখি কি ক'রে? এদিকে প্রাণে আমার জেগেছে ভাব-টাইফুন্, তাকে বন্দী ক'রে রাখাও অসম্ভব। পদ্যের সুদৃশ্য পোশাক না হয় জোটাতে পারলুম না, গদ্যের সাদা-মাটা পোশাকেই আমি আমার ভাবকে প্রকাশ করি; পোশাকবিলাসীদের ভাল না লাগলেও ভাববিলাসীদের কি ভাল লাগবে না?

ওগো ইঙ্গ-ভারতীয়া, তোমায় দেখছি আমি আজ নয়; তোমাকে দেখেছে এরা ওরা এবং আরও অনেকে। যে প্রোলেটারিয়েট-কবিরা চীনে-গণিকা বঙ্গ-বারাঙ্গণা অবঙ্গ-ঝাড়ুদারনী ইত্যাদি দেখে বেড়ায়, তারাও তোমায় দেখেছে; আবার যে বুর্জোয়া-কবিরা আসরে-বাসরে বুর্জোয়া সুন্দরী দেখে, তারাও তোমায় দেখেছে। তবুও তুমি আজ পর্যন্ত বাংলা-কাব্যের উপেক্ষিতা রইলে কেন? কত নগণ্য তুচ্ছ জিনিসও কবির প্রাণে কত বড় ভাব আনতে পারে; কিন্তু তুমি যে কেন আজ পর্যন্ত কোনও বাঙালী-কবির ভাবের lock-gate খুলে দাও নি, তা জানি না। হায়, আমি আজ নাগর, ভাব-সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি; তোমার উদ্দেশে কিছু না লিখলে আমার উদ্ধার নাই।

পথে ট্রামে বাসে যখনই নেহারি
মনে হয় তুমি স্বর্গ-fairy!

ওগো স্বর্গের পথ-ভোলা-পরী, জানি না, কোন্ উদ্দেশ্যে তোমার এই শহরে আগমন। এই বিশ্রী মর্ত্যে তুমি কি স্বর্গের শ্রীসুষমা ফোটাতে চাও? চাও কি এখানে স্বর্গ-পরিবেশ রচনা করতে? চাও কি তুমি পার্থিব জীবনের কদর্যতা দূর করতে? হে পরী, তোমার ডানাজোড়াটি কোথায়? সেটি কি ওই ভ্যানিটি-ব্যাগের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছ?

ওগো বিচিত্রা সারা দেহে তব
বহিছে রঙের বন্যা,
নিশ্চয়ই তুমি হবে কোন এক
রূপশিল্পীর কন্যা।

তোমার সারাদেহে রঙহীন ঠাঁই নেই; হাত-পায়ের কুড়িটি নখে ফুটিয়েছ কুড়িটি রক্তজবা; শ্রীচরণেষু রঙদার-বাটা শোভা পাচ্ছে; আ-হাঁটু লম্বিত কটিবাস থেকে রঙ ঝরছে; দেহখানি চাপা আছে বহু-বর্ণের মরসুমী ফুলের রাশিতে। তোমার ঠোঁট দুটি আর গাল দুটি দেখে কবিতা না লিখে পারি নি—

ওগো মিস্ তব অধর-ওষ্ঠে
লেপেছ কিস্ মি নট্,
আমার নয়নে ফুটিছে কেবলি
আয়রন্-রেড্ হট্!
তোমার নিটোল দুই গণ্ডের লালিমা,
আমেরিকা-জাত আপেলের মুখে
লেপেছে লজ্জা-কালিমা।

লাল-বর্ডারের মাঝখানে ঝক্‌ঝক্ করছে দু পাটি মাদার-অফ্-পার্লের দাঁত। নির্লোম ভুরুটিতে মেরেছ সূক্ষ্ম তুলির টান; বব্-ছাঁটা আঙুর-দোলানো-অলকে বেঁধেছ রঙিন স্কার্ফ; কানে ঝুলছে রঙিন কাঁচ, গলায় রঙিন কাঁচের মালা; হাতে ছাতি ও ব্যাগ—দুই-ই রঙিন।

সারা দেহে তব এত রঙ কেন
কিছুই নাহিক জানি,
আমার চক্ষে পড়িছে কেবলি
ইঙ্গিত হাতছানি।

কালো-চামড়ার দেশে তোমার ফিকে-গোলাপী চামড়াখানা নিশ্চয়ই বেশি

মর্যাদা দেয়; তার ওপর এই নিখুঁত-রূপচর্চা। এর পরেও যদি তোমায় সুন্দরী ব'লে সম্বোধন না করি, তা হ'লে সকলে আমায় অন্ধ বলবে। হে সুন্দরী—

বল দেখি কোন্ দেবতা-চরণে
সঁপিবে রূপের ডালি ?
কোন্ দেবতার আরতি করিবে
নিজদেহ-দীপ জ্বালি ?

এত বর্ণ সমাবেশ কি শুধু পেটেরই জন্যে ? যে পেটের জ্বালায় অসংখ্য লোক ট্রামে-বাসে ঝুলে জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফাউণ্টেন্-পেন মনিব্যাগ হারিয়ে রোজ আপিসে যায়, তোমার পেটেও কি সেই জ্বালা ? একই জ্বালা নিয়ে যদি একই জায়গায় যাও, তবে তোমার এত সাজ কেন ? নিশ্চয়ই কোন বড়-দেবতার air conditioned মন্দিরে তুমি প্রবেশ করবে আর সারাদিন দেবসেবাতেই কাটাবে। তোমার এত সাজ কি বড়-দেবতারই চিত্তরঞ্জনের জন্যে নয় ? নয়ন-ভোলানোর জন্যেই নয় কি এত রূপচর্চা ?

দেবতা তোমার নহে তো পাষাণ
রুধিরে পূর্ণ ধমনী,
পূর্ণ তোমার হবে মন কাম
হে রূপসেবিকা রমণী।

তোমার এই রূপারতি আর সেবাপরায়ণতা নিশ্চয়ই এনে দেবে দেবতার প্রসন্নতা; তোমার ওপর করুণা-বর্ষণ হবে অজস্রধারায়। সান্ধ্য-ভোগারতির সময়ও দেবতা তোমায় ভুলতে পারবেন না, ভুলতে পারবেন না তোমার সেবা।

ওগো সৌভাগ্যবতী, যে সৌভাগ্যের জোরে তুমি পেয়েছ জীবন্ত দেবতার প্রসন্নতা, পেয়েছ প্রসাদ, আমি কি সে সৌভাগ্যের হিংসে করব ? তোমার সুখ দেখে আমি কি আমার চোখকে টাটাতে দেব ? না, কখনই নয়। তোমার শক্তি আছে, সাধনা আছে, তাই তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ; আমার শক্তি-সাধনা নেই, আমি তাই কিছুই পাই নি। ট্রামে চলেছ তুমি নির্দিষ্ট আসনে ব'সে "Night Life of a Girl" পড়তে পড়তে, আর আমি চলেছি পকেট চেপে ধ'রে জুতোর পালিশ বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা ক'রে লোকের ভিড়ে চিঁড়ে-চেপ্টা হতে হতে। আপিসে তোমার জন্যে আছে 'সেলাম' আর সহাস্য

আবাহন, আর আমার জন্যে 'রাম-রাম' আর লাল-চোখ। তবুও আমি তোমায় হিংসে করি না, কেন না, তুমি বাঙালী নও যে, তোমার সুখ দেখে আমার বুক চড়চড় করবে।

ওগো রূপসী, তোমার চুম্বকময় দেহ সকল চোখকে টানছে; কড়া-চোখগুলো একনজর দেখেই ফিরে আসছে, নরম-চোখগুলো ফিরছে না। চোখ দেখছে প্রাণরসে পরিপূর্ণ তোমার দেহ, ভাবনা-চিন্তাহীন হাস্যোজ্জ্বল মুখ, তোমার রূপ, তোমার রূপচর্চা, দেখছে আর কত কি! আমিও তোমায় দেখছি, তোমারই পাশে দেখতে পাচ্ছি আর একটি দেহ, যার মধ্যে ইঙ্গিত-হাতছানি কিছুই অবশিষ্ট নেই, মুখে হাসি নেই, দেহে রস নেই, রূপ নেই, রূপচর্চা নেই; আছে কোটরে-ঢোকা চোখ, ঠেলে-ওঠা-গালের-কণ্ঠার হাড়, অতিলম্বা গলা, শির-বেরোনো হাত। দুটো ছবি পাশাপাশি দেখছি আর আকাশ-পাতাল কত কি ভাবছি—সাদা-কালো, Capitalism-Communism, Debauchary-Luxury—সব ভাবনা তালগোল পাকিয়ে কিম্ভূত-কিমাকার হয়ে যাচ্ছে।

ওগো শ্বেতবর্ণা, ইংরেজের আওতায় তোমার জন্ম আর বৃদ্ধি; ভারতের রোদ-জল-মাটির ছোঁয়াচ তোমায় কোনদিন লাগে নি, তাই এতদিন তোমার বর্ণ-বদল হয় নি। আজ আওতা সাফ হয়েছে, রোদ এসে পড়ছে তোমার ওপর, জলও গায়ে লাগবে, মাটিও মাড়াতে হবে; ক্রমে তোমার চামড়ায় ভারতীয়তা ফুটে উঠবে। বর্ণবদলের সঙ্গে সঙ্গে হয়তো তোমার বর্ণানুরাগ ক'মে আসবে, ক'মে আসবে রূপচর্চা। একদিন তুমি হয়তো মনে-প্রাণে-বর্ণে ভারতীয়া হয়ে উঠবে।

তাই বলি—

ইন্দ্র তোমার খ'সে গেছে আজ
মিস্ তুমি ভারতীয়া,
ইঙ্গিতগুলি আবৃত কর
দীর্ঘ বসন দিয়া।

শ্রীপ্রবোধকুমার চট্টখণ্ডী

আশ্বাস

মাঝখানে বহে পদ্মা, এপার ওপারে ডেকে বলে,
দুপারেরই আধ দিদি, মাঢ়াই হতেছে একই কলে।

সংবাদ-সাহিত্য

'শনিবারের চিঠি' তাহার মাসিক জীবনের বিংশ বৎসর সম্পূর্ণ করিয়া দ্বাবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। ইহার মধ্যে প্রায় বৎসরাধিক কাল তাহাকে অজ্ঞাতবাসে কাটাইতে হইয়াছে। সুতরাং প্রকাশিত বা লিখিত মতে সে কুড়ি বৎসর পূর্ণ করিয়া একুশে পড়িল। কিন্তু আমরা অজ্ঞাতবাস-পর্বকেও হিসাবের মধ্যে গণনা করিয়া তাহাকে অদ্য হইতে সাবালকত্বে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। ব্যাঙ এতদিনে কোলাব্যাঙ হইল। এবার মাণ্ডুক্যোপনিষৎ রচিত হইবার পালা।

একটা ব্যাঙাচি-জীবনও আছে বলিয়া ব্যাঙের উপমা মনে জাগিল। সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র জীবনারম্ভ হয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ১০ শ্রাবণ; ওই বৎসরের ৯ ফাল্গুন পর্যন্ত একাদিক্রমে ২৭ সংখ্যা সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া সাপ্তাহিকের এন্তেকাল ঘটে। আরম্ভ করেন অশোক চট্টোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস, হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়, সুধীরকুমার চৌধুরী; পরে আমরা এবং রবীন্দ্রনাথ মৈত্র আসিয়া জুটি। এই কয় জনই ছিলেন প্রধান। কিন্তু লেখক-দলভুক্ত ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শান্তা দেবী, পুলিন-বিহারী দাস প্রভৃতি। সম্পূর্ণ ১৩৩২ সাল 'শনিবারের চিঠি'র পক্ষে নিষ্ফল যায়। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় ও কার্তিকে যথাক্রমে "জুবিলী", "বিরহ" ও "ভোট" সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া 'চিঠি'র অসাময়িক জীবনও শুরু হইয়া যায়। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে মাসিক 'শনিবারের চিঠি'র জন্ম হয়—ব্যাঙাচির লেজ খসিয়া ব্যাঙ হয়।

ব্যাঙাচি-যুগে প্রধান লক্ষ্য (target অর্থে) ছিল চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনীতি; সমাজ, সাহিত্য, পৌরশাসন প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইত গৌণত, ফক্কুড়িমূলকভাবে। মাসিকপত্রে রূপান্তরিত হইয়াই 'চিঠি'র লক্ষ্য ও পথ দুইই বদল হইয়া গেল। তখন মূল লক্ষ্য হইল, তথাকথিত অতি-আধুনিক বাংলা-সাহিত্য; আমাদের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন মোহিতলাল মজুমদার। রবীন্দ্রনাথ পৃষ্ঠপোষকতা করিলেন, বাংলা সাহিত্যের পুরাতন ও নূতন খ্যাতিমান ও খ্যাতিলুব্ধ অনেকে আসিয়া দল ভারি করিলেন—আদি-পর্বেই লঙ্কাকাণ্ড শুরু হইয়া গেল। ১৩৩৬ সালের কার্তিক সংখ্যা পর্যন্ত

সাময়িক জীবন যাপন করিয়া 'শনিবারের চিঠি' অকস্মাৎ গা-ঢাকা দিল। পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিল ১৩৩৮-এর আশ্বিনে নিজস্ব ছাপাখানা হইতে। সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত ইহা নিয়মিত বা অনিয়মিত ভাবে মাসে মাসে বাহির হইতেছে।

লঙ্কাকাণ্ডের পর উত্তরাকাণ্ড; বঙ্গ-ভারতীর বাল্মীকি-তপোবন-আগত লব-কুশের দল একে একে চিঠির আসরে নামিয়া সাধারণের দরবারে বীণা-সহযোগে গান ধরিয়াছেন; স্ব স্ব কীর্তির বলে প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আজ তাঁহারা বাংলা সাহিত্যের 'বনফুল', তারাশঙ্কর, অমলা দেবী, 'সমুদ্র', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হইয়াছেন। ইঁহাদের গৌরবে 'শনিবারের চিঠি' গৌরবান্বিত হইয়াছে।

এই যুগে 'শনিবারের চিঠি'কে বিদ্বজ্জনসমাজে বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছে মোহিতলাল মজুমদারের সাহিত্য-বিচার এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্ভরযোগ্য গবেষণা। দুই জন দুই দিকে,—একজন রস, ও অন্যজন ইতিহাস বিষয়ে যে একনিষ্ঠ সাধনার কাহিনী 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে বাংলা-সাহিত্যে নূতন আলোকপাত হইয়া যুগান্তর সম্ভব করিয়াছে। আজ আমাদের কাছে পথ এবং পাথেয় নির্দিষ্ট ও সুলভ হইয়াছে। সাধকেরা সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবেন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস—১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস 'চিঠি'র ইতিহাসে স্মরণীয়। সাহিত্যের মূল ভূমিকা ত্যাগ করিয়া 'চিঠি' সেই দিন ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবাবর্তে ঝাঁপাইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল। সমগ্র দেশ তখন সাম্রাজ্যবাদীর শোষণে শুষ্ক তৃণবৎ, বিপ্লবের আগুন সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতে বিলম্ব হয় নাই। শাসকের অত্যাচার প্রবল, দেশের জনসাধারণ ভীত সন্ত্রস্ত মূক, বাণী কারাগারের অন্তরালে নীরব, দেশের উন্মত্ত বৈপ্লবিক শক্তি পাতালপ্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 'শনিবারের চিঠি' সেই ঘোর দুর্দিনে নিশ্চিন্তে সাহিত্যের বাঁশি বাজাইতে পারে নাই, ভয়াবহ পরধর্ম আশ্রয় করিয়াছিল।

দুর্দিনের সম্পূর্ণ অবসান না ঘটিলেও অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, পরমুখাপেক্ষী আজ আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সাধনা করিতেছে; উত্তাপের দাহ

থাকিলেও অগ্নি আজ নির্বাপিত, অসাধার হস্তে সকলেরই লাপালাপি করিবার আবশ্যক নাই। কবি ও সাহিত্যিকেরা স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার অবকাশ লাভ করিতেছেন। ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইতেছি, রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সুযোগ লইয়া বহু অবাঞ্ছিত বেনোজল আমাদের সাহিত্যপ্রাঙ্গণে ঢুকিয়া বিবিধ আবর্জনার সঙ্গে অনেকগুলি কুমীরও ছাড়িয়া গিয়াছে। এবার সবসুদ্ধ ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবার পালা। প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর পরে সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে বিপদ দেখা গিয়াছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই ততোধিক বিপদ দেখা দিয়াছে। গোপালেরা হাল ধরিয়া নিরীহ নির্বিচারী সাধারণ মানুষকে কৌশলে হনন-ঘরের দিকে লইয়া যাইতেছে। সাবালকত্বে এবং স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত 'শনিবারের চিঠি'র এখন কাজ অনেক।

তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপাল ও রাষ্ট্রপতিরা সগৌরবে স্বদেশে শুধু প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই, স্বদেশে এবং বিদেশে স্ব-স্ব আত্মীয়বান্ধবদেরও প্রতিষ্ঠা দান করিতেছেন। তাঁহাদের কাজ তাঁহারা বুঝিয়া লইতেছেন, নব শাসন-ব্যবস্থা প্রস্তুত হইতেছে; আমাদের খাদ্য, আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের শিক্ষা, আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ, আমাদের সীমান্ত, আমাদের ভাষা, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত সকল বিষয়েই তাঁহারা মাথা ঘামাইতেছেন। আমাদের এখন নিশ্চিন্তে বসিয়া গান গাহিবার পালা। বিশ্বমহাযুদ্ধের দাপটে ভারতীয় পূজা-মণ্ডপ একটু নোংরা হইয়াছে; সাফসুফ করিয়া লইয়া যত শীঘ্র আমরা পালা শুরু করিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। বাঙালী বিহারী হইবে কি না, বাঙালীর মাতৃভাষা উড়িয়া কি না এবং আসামে বাঙালীরা বাঙালী হইয়া থাকিতে চাহিলে আসামী হইয়া থাকিবে না কেন, এই সকল কঠিন কঠিন প্রশ্নের সহজ সহজ উত্তর দিবার জন্য যখন জওহরলাল প্যাটেল রাজেন্দ্রপ্রসাদ আছেন এবং বিধানচন্দ্র নলিনীরঞ্জন কিরণশঙ্কর প্রফুল্লচন্দ্র নাই, তখন পূর্ববঙ্গ বাংলা কি না এবং হিন্দুস্থানী হিন্দী কি না—এই সকল অনাবশ্যক প্রশ্ন লইয়া আমাদের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইবার কারণ নাই; রোম দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিলেও নীরো বাঁশী বাজাইবে—সাহিত্যের এই পরম নীতি আমরা মানিয়া চলিব। একুশ বৎসরে ইহাই সংকল্প, ভগবান আমাদিগকে সংকল্পে স্থির রাখুন।

সংবাদ-পত্রে দেখিলাম, গত ১০ নবেম্বর মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী
গণপরিষদের সদস্য পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল এক বিবৃতিতে ভারতবর্ষের ম
নিম্নলিখিত নূতন জাতীয় সঙ্গীতটি চালু করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন—

"জনগণ অধিবাসিনী জয় হে মহীমণি ভারতমাতা
হিমকিরিটিনী বিন্ধ্য মেখলে উদধি ধৌত পদকমলে
গঙ্গা যমুনা রেবা কৃষ্ণা গোদাবরী জল বিমলে।
বিবিধা তদাপি অবিভক্তে শান্তা,
শক্তি-সংযুক্তে যুগযুগ অভিনব মাতা,
জনগণ ক্লেশ-বিনাশিনী জয় হে মহীমণি ভারতমাতা।
জয় হে জয় হে জয় হে, জয় জয় জয় জয় জয় হে ॥

পণ্ডিত ডি. পি. মিশ্র নামধেয় কোনও কবি শুক্ল মহোদয়ের অনুরো
রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন' অবলম্বন করিয়া এই অপূর্ব সঙ্গীতটি রচনা করিয়াছে
শুক্ল মিশ্র মতে ইহাতে 'জনগণমনে'র সার ও 'বন্দে মাতরমে'র ক্ষীর য়ি
হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়াছিলেন মায়ের দেবীরূপ, রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছি
জনগণের মনে যিনি ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে; শুক্ল-f
ভারতমাতাকে স্বরূপে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহারাও ভুল করিয়াছে
মানুষকে পাশ কাটাইয়া ইহারা ভারতবর্ষের বাহ্য-প্রাকৃতিক রূপই
দেখাইতে চাহিয়াছেন। আমরা মনে করি, মায়ের আসল গৌরব সন্ত
গৌরবে। নূতন জাতীয় সঙ্গীতটি এই ধরনের হওয়া উচিত—আদর্শ রবী
নাথের 'জনগণমন'ই থাকুক—

जनगण-भोट-अधिनायक जय हो केन्द्रीय भाग्य-विधाता
पाञ्जाबी माराठी बङ्गाली ओड़िया बेहारी गुजराटी मद्र
नेहरू प्याटेल राजेन्द्र पन्थ पट्टभी यज्ञ भद्र
विजयलक्ष्मी छुँया जागे
सरोजिनी नाइडुका आगे
एकु सुरे सब्कोइ गाँया ।
व्याक्स-रेमन-विधायक जय हो भारत-भाग्य-विधाता ॥

জনগণ-ভোট-অধিনায়ক জয় হো কেন্দ্রীয় ভাগ্যবিধাতা
পাঞ্জাবী মারাঠী বঙ্গালী ওড়িয়া বেহারী গুজরাটী মদ্র
নেহরু প্যাটেল রাজেন্দ্র পন্থ পট্টভী শুক্ল ভদ্র
বিজয়লক্ষ্মী হুঁয়া জাগে
সরোজিনী নাইডুকা আগে
এক্ সুরে সব্ কোই গাঁথা।
ট্যাক্স-রেশন-বিধায়ক জয় হো ভারত ভাগ্যবিধাতা।

এক স্তবকেই যখন সব কথা বলা হইয়াছে, তখন জাতীয় সঙ্গীতকে দীর্ঘতর রিয়া লাভ নাই। তবে যতদূর বুঝিতেছি, আমাদের এই সকল বিকৃত টায় আখেরে কোনই ফলোদয় হইবে না, কারণ পণ্ডিত জওহরলাল হিন্দুস্থান হামারা"কে ভাঙাইয়া "হিন্দুস্থানী হামারা" নামক একটি গান প্রস্তুত রাইতেছেন, সেইটিই চালু হইবে।

* * *

এই প্রসঙ্গে কবি জীবনময় রায় আমাদিগকে একটি পত্র সহযোগে যে চন ইঙ্গিত দিয়াছেন তাহা প্রকাশযোগ্য বিবেচনা করি। তিনি লিখিয়াছেন,

"'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানটার মধ্যে আত্মধিক্কারের যে গ্লানি এবং আত্মশোধনের যে আকুতি কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল আজ সেই গ্লানি আমাদের বহুল পরিমাণে দূর হয়েছে। এখন নিজেকে, নিজের অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড শক্তিকে জানবার, উপলব্ধি করবার, আত্মবিশ্বাসে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার দিন সমাগত। কবির অতুলনীয় ভাষা ছন্দ ও সুরে রচিত গানটি অপরিত্যাজ্য অথচ এখনকার অবস্থার বিপরীত তার ভাষা এবং ব্যঞ্জনা। তাই আমি প্রলুব্ধ হয়েছি যথাসাধ্য কবির ভাষা ও ছন্দ রক্ষা ক'রে গানটিকে বর্তমান অবস্থার উপযোগী ক'রে নিতে। হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণে কবির লেখা শব্দগুলির মধ্যে কোন পরিবর্তন করি নি।" পরিবর্তিত আকারে গানটি এইরূপ দাঁড়াইয়াছে—

দেশ দেশ কম্পিত করি মন্দ্রিত ঘন তূর্য
পূর্ব গগন উজলি উদিল নব-ভারত সূর্য
বল, হে নির্ভয় বীর,
"জয় ভারত জননীর";
বল হে নির্ভয় বীর

ক্ষমা-মন্ত্রে হিংসাসুরে জিনিল প্রীতিদানে
বিশ্বশান্তি নায়ক জয় অহিংস অভিযানে।
ধ্বনিল বিশ্বে প্রমুক্ত নব-জীবন-জয়গান হে;
বল জয় জাগ্রত নব-ভারত জয়তু শক্তিমান হে।

বিঘ্ন বিপদ দুঃখ দহন চূর্ণিল পদ-ঘাতে
মৃত্যু-গহন পার হইল ঝঞ্ঝা ঘন রাতে।
বল হে জয় ··
প্রচণ্ড তব কীর্তিতূর্য ঘোষিল জয়যাত্রা,
বিশ্বনিখিল বিস্মিত শুনি বিঘ্ন-বিজয়বার্তা।
নমঃ প্রাণ, মহাপ্রাণ, জ্যোতির্ময় প্রাণ হে;
জয় জাগ্রত···

নূতন যুগ সূর্য উঠিল টুটিল তিমির রাত্রি;
জয়যাত্রার দুর্গমপথে মিলিল সকল যাত্রী।
বল হে নির্ভয় বীর
জয়···
বন্ধুর যত দুস্তরপথ লঙ্ঘি চলিল তূর্ণ;
দীপ্তরুধির উন্নতশির চিত্ত অ-ভয়পূর্ণ।
শঙ্কটভয় করিল বিজয় অমর কীর্তিমান হে;
জয় জাগ্রত···

জনগণপথ সেই জয়রথচক্রমুখর আজি,
স্তম্ভিত করি পূর্ব-অপর উঠিল শঙ্খ বাজি।
বল হে বীর
জয়···
শৌর্যপুরিত বক্ষ তার বীর্যদীপ্ত আশা,
প্রেমপূর্ণ অভয় চিত্ত, সত্যসন্ধ ভাষা।
নিখিল কণ্ঠ আজি অকুণ্ঠ গাহে জয় গান হে;
জয় জাগ্রত···

ভারত তব শক্তি লভিল নিজ অন্তর মাঝে,
বর্জিল ভয় অর্জিল জয় সার্থক হ'ল কাজে।
বল হে···
আপন পরে বিশ্বাস তার বিশ্বে জিনিল শ্রদ্ধা,
সখ্য লভিল সুচিরশত্রু আনত করি স্পর্ধা।
বিশ্ব জগত করি শিরনত দানিল সম্মান হে;
জয় জাগ্রত···

জাতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য পূর্বে জানাইয়াছি। জীবনময়ের প্রস্তাব সুধীজন বিবেচনা করিবেন।

—

'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডঃ সুকুমার সেন "বটতলার বেসাতি" সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পড়িয়া শরৎচন্দ্রের কথা মনে হইল: "বাপ্ রে বাপ্! মানুষে এত পড়েই বা কখন্, এবং মনে রাখেই বা কি করিয়া!" শুধু কি ছাই পড়া? জনশ্রুতিও বাদ পড়ে নাই। তিনি লিখিতেছেন, জনশ্রুতি আছে যে ভবানীচরণ শ্রীমদ্‌ভাগবত ছাপিয়াছিলেন (১৮৩০) বিশুদ্ধ মতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কম্পোজিটর টাইপ সেট করিয়াছিল এবং গঙ্গাজল যোগে কালি প্রস্তুত হইয়াছিল।···অগ্রিম মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল তেত্রিশ টাকা।" দুঃখ এই, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা-সাহিত্যের একমাত্র আকর-গ্রন্থ সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থখানির পৃষ্ঠা উল্টাইবার ক্লেশটুকু তিনি স্বীকার করেন নাই! উহার ১ম খণ্ডের ৮৮ পৃষ্ঠায় এই সংবাদটি মুদ্রিত হইয়াছে:—টীক শ্রীমদ্ভাগবত ৩২ টাকা। চন্দ্রিকাযন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়স্য আপনশিদং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের অপ্রাপ্তি দূর করণার্থে ছাপা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি তুলাত কাগজে প্রাচীন ধারামত পুস্তকের পাত করিয়া বড় অক্ষরে ও ক্ষুদ্রাক্ষরে শ্রীধর স্বামির টীকা এই প্রণালীতে সংশোধিত করিয়া চন্দ্রিকাযন্ত্রে ব্রাহ্মণদ্বারা মুদ্রাঙ্কিত করাইব···।"

সু-কুমার গবেষণায় প্রকাশ:—"বটতলায় প্রথম ছাপাখানা করেন বিশ্বনাথ দেব। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে—হয়ত দুই এক বৎসর পূর্বেই এই ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছিল।" অথচ আমাদের জানা আছে ১৮১৮ সনেও এই ছাপাখানা বিদ্যমান ছিল। এই বৎসর এপ্রিল মাসে রাধাকান্ত দেবের 'নীতিকথা' পুস্তকখানি বিশ্বনাথ দেবের ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়াছিল।

কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় নিরীহ বাঙালী পাঠকদের উপর দুইটি ময়ূরহীন কার্তিক লেলাইয়া দিয়া সম্ভবত মজা দেখিতেছেন। একা শ্রী-কুমারে রক্ষা নাই, আবার সু কুমার!

—

'সাগরতলী'র মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'বসুমতী'তে "নগরবাসী" হইবার প্রয়াস করিতেছেন। নগরবাসী সাবধান! মাণিকবাবু কৌশলী এবং চৌকস লোক, তিনি গাছের খাইয়া থাকেন, তলে তলে তলার কুড়াইতেও অভ্যস্ত। ইংরেজীতে একটি প্রবচন আছে—গোল গর্তে চতুষ্কোণের সমাবেশ কঠিন কাজ, যিনি তাহা পারেন তিনি ওস্তাদ ব্যক্তি। মাণিকবাবু কঠিনতর কাজ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন. 'চতুষ্কোণে'র মধ্যে বেমালুম ত্রিকোণ ঢুকাইয়া মিলাইয়া দিয়াছেন। মহা ওস্তাদ তিনি। তাই বলিতেছিলাম, নগরবাসী, সাবধান!

—

রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা-সাহিত্য বিভাগের প্রধান ছিলেন তাই বিপদে পড়িয়াছি। ভাদ্রের 'বসুমতী'তে "স্মৃতিরেখা" নিবন্ধের গোড়াতেই তিনি লিখিয়াছেন "উন্নত বাহু, দেহ গৌরবর্ণ গম্ভীর অথচ সুরসিক সুরেশচন্দ্র"। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কি ঊর্ধ্ববাহু ছিলেন, না, রায়বাহাদুরের চোখে নাসিকা বাহুরূপে প্রতিভাত হইয়াছে? গৌরবর্ণ? ভূতপূর্ব এবং আধুনিক রামতনুরা তথ্যের ধার ধারেন না— ধারিলে তাঁহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইত না, কিন্তু ভাষার ধারও কি ধারেন না তাঁহারা? তথ্যের নমুনা এই নিবন্ধেও আছে। যথা, "'সাহিত্য' পত্রিকায় ছবি থাকত না, কাগজও উৎকৃষ্ট ছিল না।" আমরা পুরাতন 'সাহিত্য' লইয়া ঘাটাঘাটি করিয়াছি, তাহাতে ছবিও দেখিয়াছি, উৎকৃষ্ট কাগজও দেখিয়াছি। খগেন্দ্র শূন্য হইতে মর্ত্যের সংবাদ দিয়াছেন, তাঁহাকে দোষ দিই না।

—

জীবিত বা চলতি ভাষায় অনুবাদ-ক্ষেত্রে আকস্মিক প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দগঠনে শব্দের অপপ্রয়োগ অনিবার্য। বাংলা দৈনিক পত্রের কৃপায় এরূপ অনেক শব্দ অপপ্রযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ততর শব্দের অভাবে ব্যবহারে ব্যবহারে চলিয়া গিয়াছে। ইহাদের অনেকগুলিকে আমাদের মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এমন অনেক শব্দ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি, সংস্কৃত অভিধানে

অর্থ অশুদ্ধ, ব্যাকরণমতে যাহার ব্যবহার শুদ্ধ নয়। সেই সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও অর্থ জানিয়া লইয়া শব্দপ্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য এরূপ কতকগুলি শব্দের তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন। পূর্বে শনিবারের চিঠি'তে কিছু প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার তালিকা হইতে একটি শব্দের প্রয়োগ বিচার এখানে নমুনা-স্বরূপ তুলিয়া দিতেছি—

অবদান পদটি contribution অর্থে সর্বত্র চলিতেছে—যেমন শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ অবদান পল্লীসমাজ, অমুক থিয়েটারের নবতম অবদান অমুক চিত্র, অমুকের অপূর্ব অবদান রাতাবি সন্দেশ ইত্যাদি। অবদান পদ অতি প্রাচীন। ইহার অর্থ পুণ্যক্রিয়া, বিশুদ্ধ কীর্তি, গৌরবময় চরিতকথা, বীরত্বসূচক কার্য, পরাক্রম, খণ্ডিত বস্তু। কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ এই সকল অর্থে পদটির প্রয়োগ করিয়াছেন। মহাপুরুষদিগের কীর্তিকাহিনী লইয়া রচিত দিব্যাবদান, অশোকাবদান, অবদানশতক, অবদানকল্পলতা প্রভৃতি গ্রন্থের নামের মধ্যে উক্তরূপ অর্থেই অবদান শব্দের প্রয়োগ আছে।

অব-পূর্বক শোধনার্থক দৈ(প) ধাতু কিংবা খণ্ডনার্থক দো ধাতু হইতে অনট্ প্রত্যয়ে অবদান পদ নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং যৌগিক বিশ্লেষণেও বিশুদ্ধ কর্ম বা বীরত্বসূচক কর্মই হয় উহার অর্থ।

শ্রীষেণ নামে এক রাজা অপরের জীবনরক্ষার্থে নিজের দেহার্ধ ছেদন করিয়াছিলেন। এই পুণ্য কর্ম একটি অবদান (অবদানকল্পলতা, 'শ্রীষেণাবদান')। দুষ্মন্ত একাকী দুর্জয় দানবগণের উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। এই বীরকর্ম আর একটি অবদান (অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৭ম অঙ্ক—গণয়ত্যবদানবিস্মিতো ভবতঃ সোঽপি ন সৎক্রিয়ামিমাম্)।

—

ভ্রম-সংশোধন—গত আশ্বিন-সংখ্যায় "সংবাদ-সাহিত্যে" (পৃ. ৬২৯-৩৩) "রাণী ও ভস্ম" নামক যে গল্পটি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার লেখক শ্রীভূপেন্দ্রমোহন রায়। ভ্রমক্রমে অন্য নাম মুদ্রিত হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
৪১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৭৫

গান্ধীচরিত

ব্রহ্মচর্য

রাত্রে গান্ধীজীর কাছে মাঝে মাঝে মেয়েরা কেহ কেহ শুইতেন, ইহা উল্লেখ করিয়াছি। তিনি অনাবৃতদেহে তেল মাখিবার সময়ে প্যারেলালজী বা অপর কেহ আসিয়া প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রের বিষয়ে পরামর্শ করিয়া যাইতেন, এবং কানু গান্ধী বা অপর পুরুষ সেবকের পরিবর্তে মনু বেন বা ডাক্তার সুশীলা নায়ারই হয়তো তেল মাখাইতেন—এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। কানু গান্ধী একটি গ্রামে প্রেরিত হইবার পর যখন আমার উপরে প্রথমে সেই ভার পড়িল, তখন আমি নিজে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত বোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু গান্ধীজী স্বয়ং যখন সে ভাব দূর করিয়া দিলেন তখন বুঝিতে পারিলাম যে, শরীর সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ বোধ গান্ধীজীর বোধ তাহা হইতে স্বতন্ত্র। একদিন স্নান সারা হইয়াছে, তিনি শুকনা খদ্দরের তোয়ালে জড়াইয়া উঠান পার হইয়া ঘরে যাইবেন, এমন সময়ে দেখা গেল, ভুল করিয়া বড় তোয়ালের বদলে ছোট্ট একখানি তোয়ালে আনা হইয়াছে। আমি দৌড়াইয়া সেটি আনিতে যাইব এমন সময়ে দেখিলাম, গান্ধীজী সেই ছোট্ট তোয়ালেখানিই কোন রকমে, জড়াইয়া ঘরের দিকে চলিয়াছেন। ঘরে ঢুকিয়া তাহা ফেলিয়া দিলেন এবং কাপড় দিবার পর তবে কাপড় পরিতে আরম্ভ করিলেন। উঠানে এবং ঘরের পাশে কয়েকজন বন্ধু গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাতের অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন, তথাপি তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার সঙ্কোচের ভাব লক্ষ্য করিলাম না।

কিন্তু আশ্রমের নারী-কর্মীদের সহিত তাঁহার ব্যবহার লইয়া অনেকদিন হইতেই বিরুদ্ধ সমালোচনা চলিতেছিল। তিনি বেড়াইতে যাইবার সময়ে মেয়েদের কাঁধে ভর দিয়া চলিতেন বলিয়া সংবাদপত্রে লেখালেখিও হইয়াছিল। ২১-৯-১৯৩৫ তারিখের ইংরেজী 'হরিজনে' গান্ধীজী 'A Renunciation" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন (পৃ. ২৫২)। তাহাতে তিনি বলেন যে, আশ্রমে তাঁহার দেখাদেখি কোনও একজন কর্মী জনৈক মহিলা-কর্মীর সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ আচরণ করিতেছেন, তাহা বিচারের ফলে তিনি যুবকটির মনে মলিনতার সন্ধান পাইয়াছেন, অথচ সে ব্যক্তির যুক্তি হইল, সে গান্ধীজীকেই অনুসরণ করিতেছে। আত্মপ্রবঞ্চনার সম্ভাবনা হইতে অপরকে রক্ষা করিবার জন্য

গান্ধীজী সেই সময় হইতে মেয়েদের কাঁধে ভর দিয়া বেড়ানো বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং প্রয়োজন হইলে দীর্ঘ যষ্টি ব্যবহার করিতে থাকেন। ইদানীং তাঁহার পক্ষে একেবারে খাড়াভাবে চলিতে অসুবিধা হইত, কারণ বয়সের জন্ত তিনি একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন।

১৯৩৫ হইতে এই নিয়ম কতদিন অনুসৃত হইয়াছিল জানি না; কারণ ১৯৪৫ সালে যখন জেলখানা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুর পরিদর্শনের জন্য আসেন, তখন সোদপুরে খাদি-প্রতিষ্ঠানের আশ্রমে লাঠির পরিবর্তে কাহারও কাঁধে ভর দিয়াই আবার আমরা তাঁহাকে চলিতে দেখি। কোনদিন সতীশবাবুর নাতনী, আবার কোনদিন বা দিদিকে সরাইয়া দিয়া তাহার ছোট ভাইটি ওই স্থান দখল করিত। গান্ধীজীকে সেদিন বালখিল্য-ঋষিকে অবলম্বন করিয়া অন্তত কিছুক্ষণ বেড়াইতে হইত; কেন না, তাহাকে স্বস্থানচ্যুত করা অপরের সাধ্যের বহির্ভূত ছিল।

যাহাই হউক, মেয়েদের সহিত ব্যবহারের যে-সমালোচনার সূচনা আমরা ১৯৩৫ সালে দেখিতে পাই, ১৯৩৯ সালে তাহা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। ডাক্তার সুশীলা নায়ার বা মীরা বেন তাঁহার পরিচর্যা করেন, এজন্য দেশী এবং বিদেশী সংবাদপত্রে মন্তব্য প্রকাশিত হইতে থাকে। ফলে ৪-১১-৩৯ তারিখের 'হরিজনে' গান্ধীজী এইরূপ সমালোচনা উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় মতামত "My Life" নামক একটি প্রবন্ধে প্রকাশ করেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি ইহাও বলেন যে, অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনের পর হইতেই যেন তাঁহার নৈতিক চরিত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ বেশি করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বোধ হয় কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়াই তিনি উল্লিখিত প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

If I were sexually attracted towards women, I have courage enough, even at this time of life to become a polygamist. I do not believe in free love—secret or open. Free open love I have looked upon as dog's love. Secret love is besides cowardly. (*Harijan*, 4-11-39, p. 326).

এসব লেখা আমি পূর্বেই পড়িয়াছিলাম। কিন্তু লেখাপড়ার কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়; গান্ধীজীর প্রতিদিনের আচরণের মধ্যে যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহাই পাঠকগণের সম্মুখে নিবেদন করিতে চাই।

কানু গান্ধী এবং তাঁহার পত্নী আভা গান্ধীর নিকটে শুনিয়াছিলাম যে, নোয়াখালি যাত্রার কিছুকাল পূর্বে সেবাগ্রাম আশ্রমের মধ্যেও গান্ধীজীর নিকটে মেয়েদের শোওয়ার ব্যাপার লইয়া কঠিন সমালোচনা হয়। তিনি নিজে শুদ্ধমনে যে কাজ করিতে পারেন, অথবা তন্ত্রসিদ্ধ কাপালিক সাধকদের মত শবাসনে বসিয়া যদি বা কোনও কঠিন আত্মপরীক্ষাও করেন, তবু যাঁহার আদর্শ অপরে অনুকরণ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেরূপ সম্প্রদায়পতির পক্ষে কোনও কোনও বিষয়ে হয়তো আরও সাবধান হইবার প্রয়োজন আছে। আশ্রমবাসী সহচারী সাধকদের এই নিবেদন শুনিয়া গান্ধীজী উল্লিখিত ব্যবহার পরিত্যাগ করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলেন যে, ব্রহ্মচর্যের দৃষ্টিতে তিনি সমালোচকগণের যুক্তিকে সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করেন না।

ইহা গেল পূর্বের কথা। এইবার আমি নোয়াখালি বা বিহারে যাহা অনুভব করিয়াছি তাহাই বলিব। গান্ধীজীর পার্শ্বচারী পুরুষ এবং নারী কর্মীদের মধ্যে অনেকের সহিত তখনই অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার এবং জানিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম, এবং তাঁহাদের চরিত্র গান্ধীজীর প্রভাবে কি অপূর্ব পরিণতি লাভ করিয়াছে তাহা দেখিয়া মুগ্ধ এবং বিস্মিত হইতাম। গান্ধীজীর প্রতি কি গভীর প্রেম ও ভক্তি ডাক্তার সুশীলা নায়ার অথবা অমতুস সলাম, কিংবা কানু বা আভা গান্ধী এবং পিয়ারেলালজীর মধ্যে প্রকাশ পাইত তাহা বলিতে পারি না। সেই প্রেমের বশে ইঁহাদের চরিত্র যে উচ্চ শিখরে উন্নীত হইত, তাহা চিন্তা করিয়া চমৎকৃত হইতাম। গান্ধীজী অমতুস সলামকে এক গ্রামে বসাইয়া রাখিয়াছেন, সেখানে দেখা দিতেছেন না, এমন অবস্থার মধ্যে অমতুস সলাম সেই গ্রামের স্বধর্মাবলম্বী মুসলমানগণের হৃদয় পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্যে হেলায় আমরণ অনশনব্রত গ্রহণ করিলেন। বিশ দিন উপবাস চলিতে না চলিতে মুসলমান সমাজ ব্যস্ত হইয়া তাঁহার দাবি মিটাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং গান্ধীজী পরিক্রমার মধ্যে সেই গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সহিত অমতুস সলামের মিলন দেখিয়া আমার মনে হইল যেন ক্ষণেকের মধ্যে গান্ধীজীর মঙ্গলস্পর্শে অমতুস সলামের সকল তাপ জুড়াইয়া গেল; অহল্যা রামচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের দ্বারা ধন্য হইলেন। রাওলপিণ্ডির সন্নিকটে ভারতের মুক্তিলাভের পর যখন নরমেধযজ্ঞ চলিতেছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষ ঝঞ্ঝাবিতাড়িত শুষ্কপত্রের ন্যায় ভারতবর্ষের অভিমুখে ছুটিয়া

আসিতেছিল, তখন গান্ধীজী সুশীলা নায়ারকে সেখানে মরণ-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়া, সম্ভব হইলে আঘাতজীর্ণ শরণার্থীদিগকে সেবা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কি প্রচণ্ড বীর্য লইয়াই যে এই রমণী ওয়া নামক স্থানে শরণার্থী-শিবিরে সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও জানি। এবং এইরূপ পরিণতি শুধু গান্ধীজীর পার্শ্বচরদের মধ্যেই নয়, একলব্যের মত দূরে থাকিয়াও যাঁহারা গান্ধীজীর নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও দেখিয়াছি বলিয়া গান্ধীজীর প্রতি প্রেম কোন্ উচ্চ শিখরে মানুষকে উন্নীত করিতে পারে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি।

কিন্তু ইহাও আমার ক্ষেত্রবিশেষে মনে হইয়াছে যে, আমরা মানুষ, বহু সংস্কারের অরণ্য ভেদ করিয়া ঊর্ধ্বগামী হইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। এবং গান্ধীজীর প্রতি প্রেম অথবা তাঁহার প্রদর্শিত নীতির প্রতি আনুগত্য সকল সময়ে আমাদের প্রাক্তন হইতে উদ্ভূত সংস্কারকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করিতে পারে না; অধিকারীভেদে উহার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। আশ্রমবাসী কর্মীদের মধ্যে সময়ে সময়ে গান্ধীজীর প্রীতিলাভের চেষ্টায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব আমার ভাল লাগে নাই। তেমনই কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে চরিত্রের একটি বিশেষ পরিণতিও আমার নিকট উচিত বলিয়া মনে হয় নাই। আমি ক্ষেত্রবিশেষে লক্ষ্য করিয়াছি যে, ইহাদের জীবনের স্বাভাবিক গতি যেন গান্ধীজীর মত মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া মোচড় খাইয়া গিয়াছে। যাঁহার বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে, তিনি হয়তো বলিয়া বসিলেন, বিবাহ আমি করিব, কিন্তু সংসারধর্ম পালন করিব না; বৎসরের অধিকাংশ সময় গান্ধীজীর অধীনে দেশ-সেবায় অতিবাহিত করিতে চাই। এরূপ সংকল্পে গান্ধীজী কর্মীদের বাধা দিতেন না, বরং ক্ষেত্রবিশেষে সমর্থনও করিতেন, ইহা আমার অবিদিত ছিল না। দেশধর্মকে এইরূপ সর্বগ্রাসী আকার দান করা আমি খুব ভালভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই; কেন না, ক্ষেত্রবিশেষে আমার মনে হইয়াছে যে, পাতলা মানবপ্রেমের ভাব লইয়া যাঁহারা সেবাধর্ম পালন করিতে চেষ্টা করে, তাঁহাদের পক্ষে বরং বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম পালন করিলে ভাল হইত। মনের তৃপ্তি ঘটিলে তাহার পর হয়তো সাধারণ সংসারী মানুষের মত পরের জন্য ইহারা যথাসাধ্য কাজ আরও ভালভাবে করিতে পারিতেন।

মহৎসঙ্গ দুর্লভ; কিন্তু সেই মহৎসঙ্গ লাভের জন্য প্রাকৃতজনকে অনেক মূল্য

দিতে হইতেছে, ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই মূল্যদানের ফলে এক দিক দিয়া যেমন সাধারণ চরিত্রের মানুষও সোনার কাঠির স্পর্শে মহত্ত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতেছে দেখিয়াছি, তেমনই তাঁহাদের মনের মধ্যে টানাটানির বিরাম ঘটে নাই—ইহা অনুভব করিয়া মনে হইয়াছে যে, হয়তো এতটা ঠিক হইতেছে না। মনের মধ্যে টানাটানির ভাব থাকিয়া যাইবে কেন? ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলিতেন, সিদ্ধ হইলে বেগুনপোড়ার মত নরম হইয়া যায়। কিন্তু দরকচা-পড়া অবস্থা দেখিলে মনে হয়, সাধক বোধ হয় শক্তির অতিরিক্ত চেষ্টা করিতে গিয়া নিজের প্রতি অত্যাচার করিতেছেন।

এই গেল গান্ধীজীর সহকারীদের কথা। তাঁহার নিজের দিক দিয়াও একটি বিষয় বলিবার থাকিয়া গিয়াছে। তাঁহার নিজের মধ্যেও যেন পার্শ্বচারী ব্যক্তিগণের একান্ত ব্যক্তিগত সমস্যা লইয়া কালক্ষেপ করিবার একটি বাসনা ছিল। তাহারা সকলে কাছে আসুক, নিজের পারিবারিক অথবা জীবনের অন্তবিধ সমস্যা লইয়া তাঁহাকে ডাক দিক, ইহা যেন গান্ধীজীর ভাল লাগিত। গহন অরণ্যের মধ্যে মহা শালবৃক্ষ গগনচুম্বী শিখর তুলিয়া আকাশের আলোক-সাগরে পত্রের মেলা বিস্তার করিয়াই যেন তৃপ্তিলাভ করিতেছে না, সে যেন আরও চায় যে, শ্যামল ছায়াচ্ছন্ন ধরণী হইতে সমুদ্ভূত বনলতা, হয়তো বা ধরণীরই দুর্বলতার সংবাদ বহন করিয়া, তাহার কাণ্ডের সাহায্যে ঊর্ধ্বে প্রসারিত হউক। গান্ধীজী মহাপুরুষ হইলেও পুরুষ ছিলেন, তাই মানুষের সঙ্গ তাঁহার আবশ্যক হইত। তিনি সেই প্রয়োজনকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। হয়তো বা অতিক্রম করিবার আবশ্যকতাও তাঁহার ক্ষেত্রে ছিল না।

এই সকল নানা কথাই আমার মনে আসিত। কিন্তু এরূপ কথা গান্ধীজীর নিকটে প্রকাশ করিবার কোন সুযোগও হইত না, প্রয়োজনও ছিল না। একবার কিন্তু আবশ্যক হইল, এবং তখন অকপটে গান্ধীজীর নিকট সব কথাই নিবেদন করিলাম।

১৯৪৬ সালে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি জনৈক কর্মীর আতিশয্যের ফলে গান্ধীজী একদিন অত্যন্ত বিচলিত এবং ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ইহার পর কয়েক দিবস গত হইলে ৩১-১২-১৯৪৬ তারিখে বন্ধুবর পরশুরাম গান্ধীজীর নিকটে মৌখিক এক নিবেদন করেন। সেবাগ্রামে যে যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছিল, পরশুরাম সেই যুক্তির পুনরাবৃত্তি করেন এবং প্রসঙ্গত আমার

নাম উল্লেখ করিয়া বলেন যে, আমিও তাঁহার মতকে সমর্থন করিয়া থাকি। গান্ধীজী আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিলাম, সন্ধ্যার পর অবসর-সময়ে আপনাকে বিস্তারিতভাবে জানাইব। সন্ধ্যায় প্রার্থনা সারিয়া বেড়াইয়া আসিবার পর আমি গান্ধীজীকে দেড় ঘণ্টাকাল স্বীয় বক্তব্য জ্ঞাপন করিলাম। প্রথমে হিন্দী ভাষাতেই আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ভাষার দিকে বেশি মন দিতে হইতেছে অনুভব করিয়া গান্ধীজীর অনুমতি লইয়া ইংরেজী ভাষাতেই কথা বলিতে থাকি। তিনিও স্বীয় বক্তব্য ইংরেজীতেই বলিতে থাকেন। আমার সেই রাত্রে লেখা ডায়েরির অংশবিশেষ সংশোধনের পর পাঠকের নিকট নিবেদন করিতেছি।

"গান্ধীজীকে বললাম, আমি আপনাকে অন্য দিক থেকে ভক্তি করি। মানুষে মানুষে সংঘাতের বেলায় যখন হিংসার পথ আশ্রয় করে তখন ফল ব্যর্থ হয়ে যায়, যা চায় তা পায় না। আপনি social change-এর ব্যাপারে অহিংসার পথ নির্মাণ ক'রে নূতন পথ সৃষ্টি করছেন; আপনাকে পথিকৃৎ ব'লে মনে করি। সেই পথের মহত্ত্ব বোঝবার চেষ্টা করেছি, আপনার লেখা যত্ন ক'রে পড়েছি; তার ফলে আপনার aspiration-এর পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু aspiration এবং achievement স্বতন্ত্র জিনিস।

"যারা আপনাকে অনুসরণ করে তাদের আচরণে দেখতে পাই, তারা সামাজিক পরিবর্তনের এই নূতন নীতিটিকে অনুসরণ করার চেয়ে ব্যক্তিগত-ভাবে আপনাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে; আনুষ্ঠানিক ভাবে চরকা কেটে, নিজের জীবনে 'কঠিনাই'-এর অভ্যাস ক'রে (যথাশক্তিকে অতিক্রম ক'রে অল্প খেয়ে, শীতে কষ্ট পেয়ে, ব্রহ্মচর্যের চেষ্টায়) আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কাজের প্রয়োজনে এ রকম করলে দোষ হয় না; কিন্তু আত্মপ্রসাদের সন্ধানে আত্মনিগ্রহের প্রবৃত্তি জাগলে সমাজ-জীবনের ক্ষেত্রে তারা অকর্মণ্য হয়ে যায়। এ জিনিস আমি বহুদিন হতে লক্ষ্য করেছি, কিন্তু কারণ বুঝতে পারি নি। আপনার সঙ্গে গত দেড় মাস একান্তে থাকার ফলে বুঝতে পারছি, আপনি এই সব মানুষের 'কঠিনাই' দেখলে খুশি হ'ন। কঠিনাই-এর প্রতি আপনার মধ্যে আসক্তির ভাব আছে, এটা আমার নিকট নূতন অভিজ্ঞতা। তাই কোন কোন কংগ্রেস-কর্মীর আচরণের মূল কারণ এখন বুঝতে পারছি।

"যারা এইরূপ আত্মনিগ্রহ করে, তারা আপনার সামনে বিনয়ে নম্র হয়ে

থাকে, কিন্তু অন্যত্র তাদের মধ্যে এক-আধজনকে অপরের সঙ্গে স্বার্থপর বা অহংকারীর মত আচরণ করতে দেখেছি। তাদের কঠিনাই-এর অভ্যাস কোনও কার্যসাধনার প্রয়োজনে আসে নি, খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভের এবং খানিক সূক্ষ্মভাবে আপনার নিকট আদরণীয় হবার জন্য উৎপন্ন হয়েছে। অতএব এগুলি অসত্য বস্তু। তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাদের মনে, 'আমি কত ত্যাগ করেছি'—এমনই একটা অভিমানের ভাব জন্মায়। এক দিককার লোকসান অন্য দিক দিয়ে তারা পুষিয়ে নেয়। এবং সাধারণ সংসারী মানুষও যেখানে ভদ্র ব্যবহারকে লঙ্ঘন করতে পারে না, তারা পারে।

"কিন্তু এসকল ঘটনা আপনার গোচরে ঘটেও না, প্রকাশও পায় না। যদি বা আপনি জানতে পারেন, সেখানে এমন মানুষের প্রতি আপনি নির্মম হতে পারেন না; একটা অপ্রিয়বাৎসল্যের ভাব আপনার মধ্যে লক্ষ্য করেছি। আবার ক্ষেত্রবিশেষে আপনাকে একান্ত মমতাশূন্য ভাবেও ব্যবহার করতে দেখেছি। কঠিন মুহূর্তে, জাতির বড় বড় সমস্যার সময়ে এ রকম ভাব প্রকাশ পায়, এ কথা আমি জানি। কিন্তু অনবচ্ছিন্নভাবে পায় না, এই আমার দুঃখ।

"দ্বিতীয়ত, আপনাকে রাগ করতে, বিরক্ত হতে দেখেছি। ফলে আপনাকে আরও কাছের মানুষ ব'লে মনে হয়েছে। সম্পূর্ণ ক্রোধশূন্য মানুষ ব'লে জানলে আপনাকে হয়তো দূর হতে ভক্তিই শুধু করতাম। কিন্তু আপনার সম্পর্কে সমস্ত লেখা প'ড়ে যে ধারণা হয়েছিল, তার ব্যতিক্রম ঘটছে দেখে বিচলিত হই নি। পাহাড়ের তুলনা দিয়ে বলছি, পাহাড়ের চূড়ায় যেখানে বরফ থাকে, সেখানে সবই উজ্জ্বল, সবই স্পষ্ট। কিন্তু সেখানে বাস করা যায় না। কিন্তু নীচে ধরণীর সঙ্গে তার যোগ, সেখানে মাটি আছে, গাছপালায় আচ্ছন্ন থাকে, মানুষ বাস করতে পারে; আবার হয়তো আমাদের পথও হারিয়ে যায়। সেদিক দিয়ে কোনও অভিযোগ আমার নাই। আপনি নিজেকে যখন মাটির পুতুল (মিটিসে বনী হৈ পুতলি) ব'লে বর্ণনা করেন, তখন বিনয়ের বশে বলেন না, বরং সত্য প্রকাশ করেন—এ কথা বুঝতে পেরে আমার ভাল লাগছে। মানুষ হিসাবে আপনাকে যেন আরও কাছে পেয়েছি।

"আপনি মেয়ে বা পুরুষদের সঙ্গে যেভাবে ব্যবহার করেন, মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের ভিতরেও যেভাবে হস্তক্ষেপ করেন, পরশুরামের দ্বারা বর্ণিত সে সব ঘটনার বিবরণ সত্য। অপরের মনের জগতে আপনার অজ্ঞাতসারে

যে সব অঘটন ঘটে, সে বিষয়ে পরশুরাম আপনাকে ঠিক ঠিক জানিয়েছেন। কিন্তু আমি তাঁর মত ওগুলিকে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগের পর্যায়ে ফেলি নি। তার কারণ, আপনার নিজের পক্ষে এমন আচরণকে খেলার পর্যায়ে আমি ফেলেছি। এমন মানুষ দেখেছি যারা পরিপূর্ণ অক্রোধ, পরিপূর্ণ কামদমনের চেষ্টা করতে গিয়ে এমনভাবেই নিগ্রহের অভ্যাস করেছেন যে, তাঁরা মানুষের সব কাজের বার হয়ে গেছেন। আপনি যদি মানবের কল্যাণমার্গে একান্তভাবে চলার সময়ে সংস্কারজনিত বাধা পথে পেলে রাশকে ঈষৎ ঢিলে দেন, আমি ভুল বুঝব না। বরং এই জানব যে, আপনার পরম উগ্র বীর্যমণ্ডিত জীবন এমনইভাবে মাটির নীচে, নরলোক থেকে নিজের পুষ্টির রস আকর্ষণ করছে।

"কিন্তু যারা আপনার চারিদিকে থাকে, তাদেরও একটা দিক আছে। আপনার সঙ্গলাভের দাম দিতে গিয়ে তাদের মনে দরকচা প'ড়ে যায়। এটা আমার ভাল লাগে নি; কারণ এর জন্য পরোক্ষভাবে আপনি দায়ী।

"আজ আপনি সকলকে পরিত্যাগ ক'রে, নোয়াখালির পথে পথে পদব্রজে একা পরিক্রমার সংকল্প করেছেন, এটি আমার খুব ভাল লাগছে। আপনি অপর সকলকে ঠিকই বলেছেন যে, এবার তাদের প্রকৃত পরীক্ষার সময় উপস্থিত। খবরের কাগজে সংবাদ বার হবে না, আপনি অন্যত্র চ'লে যাবেন, হয়তো বাঙলা দেশ ছেড়েও চ'লে যেতে হতে পারে, তা সত্ত্বেও যে কর্মী নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ ক'রে নোয়াখালিতে অত্যাচারিত দুর্বল মানুষের মনে পরিপূর্ণ সাহস ফিরিয়ে আনবে, তারাই সেবাধর্মে সিদ্ধিলাভ করবে।"

এই লইয়া পরেও গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু সহকর্মীদের মনের গতি সম্বন্ধে আমি যে বিশ্লেষণ করিতাম, তাহা তিনি কোনদিনই স্বীকার করেন নাই।

কোনও এক বিশেষ উপলক্ষ্যে তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি —এর বিষয়ে অবিচার করিতেছ; বরং তাহার অভিপ্রায় সম্বন্ধে তাহার সহিত আর একবার আলোচনা কর। আমি উত্তর দিয়াছিলাম, আলোচনা করা নিষ্ফল। কারণ তিনি নিজেই নিজের মনের গহনের সংবাদ রাখেন না। আমি তাঁহার আচরণের বহু বিক্ষিপ্ত টুকরা একত্র করিয়া সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি। ফ্রয়েডের নামোল্লেখ করিয়া বলিলাম, আমি নিজের মনের বিশ্লেষণে ফ্রয়েড-প্রদর্শিত পন্থায় অসীম

সহায়তা পাইয়াছি। নিজের আচরণের বিভিন্ন রূপ এবং তাহার মূলস্বরূপ বহুমুখী বিভিন্ন তৃষ্ণার সন্ধান জানি বলিয়া তুলনার দ্বারা অপরের সম্বন্ধেও মনের গহনের কথা কিছু কিছু অনুমান করিয়া থাকি, আপনি তাহা পারেন না। কারণ, সেবাধর্মের প্রয়োজনে যখন আপনি নিগ্রহের অভ্যাস করিয়াছেন, তখন সেবাধর্মের সত্য আপনাকে রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু অনেকের বেলায় নিগ্রহ সত্য নয়, বরং মিথ্যা, তাহার সংবাদ আপনি জানিবেন কেমন করিয়া?

আশ্চর্যের বিষয়, গান্ধীজী বিহার হইতে ১৯ ৩ ১৯৪৭ তারিখের একখানি পত্রে লিখিলেন : What is Freudian philosophy? I have not read any writing of his. One friend himself a Professor and follower of Freud discussed his writings for a brief moment. You are the second. অতঃপর আমার উপরে ভার দিলেন যেন আমি লিখিয়া লিখিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহাকে পাঠ দিই। কারণ, If you hold on to the view you have expressed in your letter to K., you do owe it to me to explain your standpoint and enable me to understand myself more fully than I do.

দুই মাস পরে, মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে (১৯৪৭) যখন তিনি নোয়াখালির ব্যাপার লইয়া প্রধান মন্ত্রী সুহরাবর্দি সাহেব এবং শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাদানুবাদের উপলক্ষ্যে দিল্লী হইতে সোদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন একদিন ভোরে বেড়াইবার সময়ে অকস্মাৎ অপর বন্ধুদের সংগইয়া একা আমার কাঁধে ভর দিয়া একটু আগাইয়া গেলেন। এবং বলিলেন, কই, তুমি তো ফ্রয়েডের পদ্ধতি সম্পর্কে আমাকে কিছু জানাইলে না। আমি বলিলাম, আপনি সমগ্র ভারতবর্ষের যে সকল দুরন্ত প্রশ্ন লইয়া ব্যস্ত আছেন, তাহার মধ্যে আর ওই লইয়া আপনাকে লিখিতে মন হয় নাই। তিনি তবু বলিলেন, উহা তো ছোট জিনিস নয়, অতএব আমি যেন ও সম্বন্ধে লিখিতে অবহেলা না করি।

গান্ধীজী যেমন পরশুরাম অথবা আমার মত পার্শ্বচরগণের সমালোচনা সম্পূর্ণ শুনিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিতেন, তেমনই তাঁহার নিজের এমন কতকগুলি অন্তরঙ্গ মিত্র ছিলেন, যাঁহাদের কাছে এইরূপ অবস্থায় চিঠি লিখিয়া মতামত প্রার্থনা করিতেন। নোয়াখালিতে অবস্থানকালে মেয়েরা তাঁহার

নিকটে শোয় বলিয়া যখন পুনরায় সমালোচনার উদয় হয়, তখন এইরূপে কয়েকখানি পত্র প্রেরিত হইয়াছিল। আমিষাপাড়ার প্রার্থনান্তিক বক্তৃতায় তিনি জনসমূহের নিকটে এ বিষয়ে বিচার দাবি করিলেন। তেমনই তাঁহার অন্তরঙ্গদের মধ্যে অন্যতম, ডন-সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে ১-২-৪৭ তারিখে পত্র লিখিলেন। অপর যাঁহাদের নিকটেও চিঠি গিয়াছিল, তাঁহাদের নাম দিতেছি, রাজকুমারী অমৃত কাউর, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি আচার্য কৃপালানি। অধ্যাপক হরেস আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে মৌখিক দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন।

গান্ধীজীর আর একটি বিচিত্র অভ্যাস ছিল। তাঁহার ব্রহ্মচর্য বিষয়ে ধারণা সমাজে প্রচলিত ধারণা হইতে বিভিন্ন হইলে পত্রিকায় সে বিষয়ে আলোচনা করিতেন। এবং যদি সত্যই কোনও দিন তাঁহার মনে কামভাবের উদয় হইত, তখন তিনি ক্যাথলিক মতাবলম্বী সাধকগণের মত বিশ্বাসভাজন বন্ধুদের নিকট অপরাধ স্বীকার বা কনফেশনের দ্বারা পুনরায় শান্তিলাভ করিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার আচরণ হিন্দুধর্মাবলম্বী সাধকদের মত না হইয়া বরং খ্রীষ্টীয় সাধকবৃন্দের অনুরূপ ছিল।

রোগের বশে শরীর যখন জীর্ণ হইয়া যায়, তখন আমাদের দেহ স্বীয় জৈব ধর্ম অনুসারে বাঁচিবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠে। এবং জীবনস্রোতকে আঁকড়াইয়া ধরিবার এই চেষ্টায় মনের গভীরে মানুষের যে সকল আদিপ্রবৃত্তি বর্তমান রহিয়াছে, সেগুলি স্বভাবতই উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। তাহারাই মানুষ-পশুর দীর্ঘ দিনের সহচর।

১৯৩৯ সালে ২৯এ ফেব্রুয়ারি তারিখে গান্ধীজী ইংরেজী 'হরিজনে' "Nothing without Grace" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন (পৃ. ২০)। তিনি তখন সবে কঠিন রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পুনরায় 'হরিজনে' লেখার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধের অন্তে তিনি প্রকাশ করেন—

I have been trying to follow *Brahmacharya* consciously and deliberately since 1899. My definition of it is purity not merely of body but of both speech and thought also. With the exception of what must be regarded as one lapse, I can recall no instance

during more than thirty-six years' constant and conscious effort, of mental disturbance such as I experienced during this illness. I was disgusted with myself. The moment the feeling came I acquainted my attendants and the medical friends about my condition. They could give me no help. I expected none. I broke loose after the experience from the rigid rest that was imposed upon me. The confession of the wretched experience brought much relief to me. I felt as if a great load had been raised from over me. It enabled me to pull myself together before any harm could be done. But what of the Gita? Its teaching is clear and precise. A mind that is once hooked to the Star of Stars becomes incorruptible. How far I must be from Him, He alone knows. Thank God my much vaunted Mahatmaship has never fooled me. But this enforced rest has humbled me as never before. It has brought to the surface my limitations and imperfections. But I am not so much ashamed of them, as I should be of hiding them from the public. My faith in the message of the Gita is as bright as ever. Unwearied ceaseless effort is the price that must be paid for turning that faith into rich infallible experience. But the same Gita says without an equivocation that the experience is not to be had without divine grace. We should develop swelled heads if Divinity had not made that ample reservation. (পৃ ১০-১)

ব্রহ্মচর্যের প্রসঙ্গ লইয়া নোয়াখালি বা বিহারের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গদের মধ্যে বিরুদ্ধ সমালোচনা উঠিয়াছে, এবং এই সম্পর্কে মারাঠা বা গুজরাত প্রদেশের সহকর্মীরা যখন তাঁহার সহিত পত্রব্যবহার করিতেছেন, এমন কি এই আলোচনার জন্যই বিহার পর্যন্ত উপস্থিত হইতেছেন ও প্রশ্ন করিতেছেন, 'সবই বুঝিলাম। কিন্তু তোমার আত্মপরীক্ষার প্রয়োজন কি?' তখন তিনি 'হরিজনে' নূতন করিয়া ব্রহ্মচর্য বিষয়ে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই লেখার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান দীর্ঘ আলোচনা সমাপন করিব।

What is *Brahmacharya*? It is the way of life which leads us to Brahma (God). Patanjali has described five disciplines. It is not possible to isolate any one of these and practise it. For this age the five have been expanded into eleven. They are non-violence, truth, non-stealing, *brahmacharya*, non-possession, bread labour, control of the palate, fearlessness, equal regard for all religions, *swadeshi* and removal of untouchability.

It is well to bear in mind that all the disciplines are of equal importance. If one is broken all are. There seems to be a popular belief amongst us that breach of truth or non-violence is pardonable. Non-stealing and non-possession are rarely mentioned. We hardly recognize the necessity of observing them. But a fancied breach of *brahmacharya* excites wrath and worse. There must be something seriously wrong with a society in which values are exaggerated and underestimated. Moreover to use the word *brahmacharya* in a narrow sense is to detract from its value. Such detraction increases the difficulty of proper observance. When it is isolated even the elementary observance becomes difficult, if not impossible. Therefore, it is essential that all the disciplines should be taken as one. This enables one to realize the full meaning and significance of *brahmacharya*. (*Harijan*, 8-6-47, p. 180)

There are certain rules laid down in India for the would-be *brahmachari*. Thus he may not live among women, animals and eunuchs, he may not teach a woman only or even a group, he may not sit on the same mat as a woman, he may not look at any part of a woman's body, he may not take milk, curds, *ghee* or any fatty substance nor indulge in baths and oily massage. I read about these when I was in South Africa. There I came in touch with some men and women who, while they observed *brahmacharya*, never knew that any of the above-named restraints were necessary. Nor did I observe them and I was none the

worse for the non-observance. I did give up milk, ghee and and other animal substances but for different reasons.

A perfect *brahmachari* never loses his vital fluid. On the contrary, he is able to increase it day by day and, what is more he conserves it ; he will, therefore, never become old in the accepted sense and his intellect will never be dimmed.

It appears to me that even the true aspirant does not need the above-mentioned restraints. *Brahmacharya* is not a virtue that can be cultivated by outward restraints. He who runs away from a necessary contact with a woman does not understand the full meaning of *brahmacharya*.

Let not the reader imagine for one moment that what I have written is to serve as the slightest encouragement to life without the law of real restraint. Nor is there room in any honest attempt for hypocrisy.

Self-indulgence and hypocrisy are sins to be avoided.

The true *Brahmachari* will shun false restraints. He must create his own fences according to his limitations, breaking them down when he feels that they are unnecessary. The first thing is to know what true *brahmacharya* is, then to realize its value and lastly to try to cultivate this priceless virtue. I hold that true service of the country demand this observance. (*Harijan*, 15-6-47, p. 192)

শ্রীনির্মলকুমার বসু

অধিকার কোথা বন্ধু

জীবনের দুর্নিবার টানে
চলেছি ভাসিয়া আমি দিনরাত্রি নব অভিযানে ;
আমার জীবন-স্রোতে কত বার ডেকে গেছে বান,
অজানিত তটভূমি দুরন্ত আহ্বান।
রক্তের আলাপ শুনে পলে পলে চলা,
হোক ক্ষতি হোক সে নিস্ফলা।

অক্লান্ত চঞ্চল মন এখানে ওখানে গিয়ে লাগে,
সুখেতে সন্তোষে আর ব্যথায় বিরাগে ;
মুঞ্জরিত বসন্ত মুকুল—
ঝ'রে যাক—হয় হোক ক্ষমাহীন ভুল !

আমার এ গতিবেগ শৃঙ্খলের আলোড়নে কাঁদে—
অসংখ্য বিবাদে ;

আসে দিন আসে রাত্রি—
হেসে যায় চন্দ্র সূর্য তারা,
অধিকার কোথা বন্ধু—জীবনের মিলেছে ইজারা !

প্রশ্ন কর—সে মুক্তির কোথা পাব তীর—
অধিকার অভগ্নসুস্থির ?

সম্মুখে—
সম্মুখে মুক্তি—প্রচণ্ড উল্কার মত চলা !
অরণ্যের জটিলতা পাহাড়ের ক্ষুরধার ফলা—
সব মিথ্যা ;
—চলেছি যে পথ

প্রভাত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা দীর্ঘরাত্রি নিয়েছি শপথ !
এদিনের ঝড়বৃষ্টি, ওদিনেতে প্রখর উত্তাপ,
এদিনের মুখে গর্ব, ওদিনেতে ক্রন্দন বিলাপ—
সব সহে—দুঃখ চাপ—
নেই কোন দীর্ঘশ্বাস বুকে ;
নিজেকে দিই না ফাঁকি
চলেছি সম্মুখে !

অনেক বৈশাখী দিনে আম্রবনে শান্ত স্নিগ্ধ ছায়া,
অনেক আষাঢ় আনে ধান্যক্ষেত্রে সবুজের মায়া,
শরতের শেফালিকা হেমন্তের সোনার কিরণ,
পৌষের নবান্নতে ফাল্গুনের ভ্রমরগুঞ্জন,—
আমার বুভুক্ষু মন ছুটে গেছে

নিয়েছে অনেক ;
সঞ্চয় হয় নি সত্য
অধিকার কোথা ব'লে আজো কাঁদে অতৃপ্ত বিবেক।
কক্ষপথ ভাঙা গড়া জন্ম থেকে জন্মান্তরে চলা
নিরবধি কাল—আছে পৃথিবী বিপুলা।

শ্রীসমর সোম

নিজের কথা

সংগ্রাম

গোড়ার দিকে গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাজে যে ভাবে প্রভাবান্বিত হ'য়ে পড়েছিলাম, ঠিক সেই ভাবে গুরু বয়েসের (Boiyess) সম্মোহন-শক্তির আকর্ষণে জড়িয়ে পড়তে লাগলাম। ছবির সামঞ্জস্যের পরিকল্পনায় (Composition) দেশী প্রথা বিদেশী টেকনিকের সঙ্গে অবাধে মিশতে শুরু ক'রে দিলে। জাতিচ্যুতির ফলাফল নিশ্চিত জেনেও গতিরোধ করতে পারলাম না। এই সূত্র অবলম্বনে অনেকে লাঞ্ছনা দিতে ছাড়েন নি। গুরু অবনীন্দ্রনাথ সবই জানতেন, কিন্তু সঙ্কীর্ণ গণ্ডির নির্দেশ তাঁর উপর প্রতিপত্তি করতে পারে নি।

ঘটনাচক্রের ফলে সোসাইটিতে শিক্ষকের কাজ পেয়ে গেলাম। গুরু অবনীন্দ্রনাথই নতুন ক্লাসের প্রতিষ্ঠা করলেন। আমি সেখানে বিলাতী চালে ড্রইং শেখাতে আরম্ভ ক'রে দিলাম। নির্দিষ্ট আয়ের কতকটা সংস্থান হ'লেও প্রয়োজনের অনেক কম। সোসাইটিতে মাত্র দু ঘণ্টার কাজ ছিল। উপরি বাঁধা মাইনের কাজ খুঁজতে লাগলাম। কার পরামর্শে মনে নেই, একদিন স্যর্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হলাম। উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিছু ছিল না, ড্রিল-মাস্টার জাতীয় একটা যা-হোক কিছু পেলেই চলত। ড্রিল আমি জানতাম না, ভাবলাম, কুস্তি শেখাবার প্রস্তাব করলে কেমন হয়? শরীরগঠন ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা একই সঙ্গে হয়ে গেলে আমার আরজি মঞ্জুর হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশি।

স্যর্ আশুতোষ আমার নাম শুনেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন, তার পরেই জিজ্ঞাসা করলেন, হরিপ্রসাদ রায়চৌধুরী বা বরদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী আমার

আত্মীয় কি না? একজন ঠাকুরদাদা, আর একজন খুড়ো, আত্মীয় নয় বলি কেমন ক'রে? আমার স্বীকারোক্তিতে তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। হুঙ্কারের জের থামতে জেরা শুরু ক'রে দিলেন, প্রশ্নের সারাংশ—পরিবারে কোন ঝগড়া-ঝাঁটি ক'রে এসেছ কি না? উত্তর দেবার সাহস ছিল না, সঠিক খবর বললে, কতটা বিশ্বাস করবেন, কতটা করবেন না—কিছুই জানি না। নমস্কারান্তে বিদায় নিলাম।

কয়েক দিন পরে উমাপ্রসাদবাবুর (সার্ আশুতোষের সেজো ছেলে) সঙ্গে দেখা করলাম, পরিচয়কে তিনি স্বল্পসময়ের ভিতর সঙ্কোচহীন ক'রে দিলেন। নির্ভয়ে জানালাম আমার দুঃখের কথা। কপালগুণে উমাপ্রসাদবাবু ছবি ভালবাসতেন, একটু-আধটু আঁকতেনও বোধ হয়। তাঁর সহানুভূতি সহজলব্ধ হয়ে গেল; আশা দিলেন, চেষ্টায় থাকবেন। স্বল্পদিনের ভিতরই চাকরি জুটে গেল, দুপুর-রোদ্দুরে কুস্তি শেখাতে হ'ল না, ড্রইং-মাস্টারের পদ তৈরি হ'ল মিত্র ইন্স্টিটিউশনে, মাসে ৪০৲ টাকা মাইনে। নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। এর সঙ্গে গড়পড়তায় অনির্দিষ্ট আয়ের যোগ থাকায় অনটনের দিক অনেকটা সামলে নেবার ব্যবস্থা হ'ল।

সব-কিছুর যোগাযোগে রোমান্স্ চক্রান্ত শুরু ক'রে দিলে। মনের মানুষ খোঁজার তাগিদ প'ড়ে গেল, প্রেমের অভিযান শুরু হ'ল।

ভোরের আলো আঁধারিতে কুস্তির আখড়ায় যাবার পথে বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে যেতাম। ললিত, যৌনপুরি, ভৈরো, তোড়ি, আসাবরী, ভৈরবী ইত্যাদি—বিশেষ বিশেষ রাস্তার জন্য বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর ব্যবস্থা ছিল, কারণ গোপন থাকাই ভাল। এইটুকু বলতে পারি, বিশেষ সুরের উচ্ছ্বাস আসত ঢাকতে চেনা শাড়ির পাড় দেখে।

সুর আমি বাল্যকাল থেকেই ভালবাসতাম। সঙ্গীতচর্চায় কোন গুরুর কাছে দীক্ষা না নিলেও আবেষ্টনীর প্রভাবে রাগ-রাগিণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। জটিল তানের আড়াল পড়লেও বেশির ভাগ রাগ বা রাগিণীর রূপ আমার কাছে আত্মগোপন করতে পারত না।

বাঁশির ঘুমভাঙানো সুরকে সকলেই নিরীহ রসের আবেদন মনে করতেন, এমন কথা বলি না। কুস্তির পর আখড়া থেকে ফেরবার মুখে, অনেকে সাদরে ঘরে ডেকে নিতেন আলাপের পুরোটা শোনবার জন্যে। দক্ষিণা পেতাম

গরম ঘরোয়া চা, তার সঙ্গে দরজার আড়ালে চুড়ির রিনিঝিনি-ধ্বনি। কখনও বা পেয়ে যেতাম কৌতূহলী চাহনি, ডাগর চোখের দৃষ্টি, ক্ষণেকের দেখা। ঐটুকুই ছিল আমার বৃহৎ লাভ।

ভিন্ন প্রকারের আমন্ত্রণ আসত বেনামী চিঠিতে চাঁদার মারের খবর নিয়ে। অভিনন্দনকে বিচিত্র বলবার উপায় নেই, কারণ বাঁশে বাঁশিও থাকে, আবার লাঠিও চলে। ব্যবহার নির্ভর করে বিভিন্ন রুচির প্রয়োজনীয়তা অনুসারে। যাঁরা আমাকে মার দেবার প্রস্তাব পাঠাতেন, তাঁদের কাছেই আমি অধিকতর ঋণী, কারণ রসের কারবারে চূড়ান্ত লাভ তাঁদের কৃপাতেই ঘটেছে। তাঁদের ঈর্ষার উদ্যোগে বিভিন্ন ক্ষণে যৌবন-কে জাগিয়ে দিয়ে দূর থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখবার সুযোগ পেয়েছি। গায়ে আঁচ না লাগিয়ে আগুনের খেলায় যে কুটিল আনন্দ পেতাম, তার বিশদ বিবরণ দিতে চাই না, সুপ্ত বিপদ জাগরিত হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকায়।

আগুন নিয়ে খেলায় বেশিদিন তাপ এড়িয়ে থাকতে পারলাম না। বিবরণ এই রকম, বাঁশি বাজিয়ে পথ চলার কোন নির্দিষ্ট দিক ছিল না। সেদিন ঘুরতে ঘুরতে পালিত স্ট্রীটে এসে পড়েছিলাম বালীগঞ্জের কাছে। ধারণা ছিল না, এইখানেই আমার রোমান্সের উপর কড়া বাঁধন পড়বে, চলার পথ একই জায়গায় থমকে দাঁড়াবে। এ বিষয়ে বলবার অনেক ছিল, কিন্তু লিখে লাভ নেই। রস কেলেঙ্কারির ধাপে ওঠবার আগেই ধরা প'ড়ে গেলাম আইনের ফাঁদে। ঘটনাটি বিবাহের ব্যাপার, নেহাত মামুলী জিনিস। বাঁশির সূত্রেই পাত্রীর সঙ্গে পরিচয়, নাম চপলা চৌধুরী, জমিদার রবীন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরীর (লক্ষ্মীপুর) জ্যেষ্ঠা কন্যা, আসামে ধুবড়ীতে বাস। এইটা জেনবার পর রোমান্সের কথা উত্থাপন শাস্তিভঙ্গের কাজ, সুতরাং বিরত হলাম। দ্বিতীয় বারেও আমার স্ত্রী বেশি দিন আমার সঙ্গে থাকতে চাইলেন না, ডাক পড়ল ওপারের, চপলা মারা গেলেন। একটি পুত্রসন্তান জন্মেছিল, সেও কিছু দিন বাদে পিছু নিল মায়ের। আবার সব ফুরাল।

চাকরি রোমান্স ইত্যাদির বিবরণে অনেক কথা চাপা প'ড়ে গিয়েছিল। প্রথম যে প্রেরণা আমাকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট করেছিল, তা অহংকার সম্মোহিনী-শক্তি। ইংরেজীতে সার অর্থ দাঁড়ায়—ego। ইগো যখন আত্ম-জাহিরের জন্যে আমাকে সম্পূর্ণ বশ্যতা মানিয়ে ছেড়েছে, তখন সুহৃদ (শ্রীযুক্ত অশোক

চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে পরিচয় হ'ল, তারপর জানলাম সুরেশদাকে (সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

কুহুর সঙ্গে আলাপ সাইকেলের খেলা উপলক্ষ্য ক'রে। 'প্রবাসী'-আপিস থেকে ছবি ফেরত আ-তে গিয়েছিলাম। সাধারণ-ব্রাহ্ম সমাজের পাশেই আপিস, সামনে অতি সঙ্কীর্ণ গলি, ওই স্বল্পপরিধির ভিতর দেখি, ভদ্রলোক সাইকেলের উপর সার্কাসের প্যাঁচে নানাভাবে ওঠা-নামার কসরৎ চালিয়েছেন। নিজের অহমিকা গোপন ক'রে দর্শক হয়ে গেলাম। দর্শক সামনে পেয়ে ভদ্রলোক দ্বিগুণ উৎসাহে আছাড় খেতে লাগলেন, যা দেখানোর বিষয় তা কিছুতেই সামলাতে পারেন না। গলদ কোথায় জানতাম। নিজের কেরামতি আর লুকিয়ে রাখা গেল না, দেখিয়ে দিলাম প্যাঁচের নমুনা।

কুহু অত সহজে নত হবার পাত্র নয়, মরিয়া হয়ে লেগে গেল ব্যর্থতাকে পাশ কাটিয়ে ওঠার জন্যে। আছাড়ের পর আছাড় চলেছে সফলতার চেষ্টায়। শেষ পর্যন্ত প্যাঁচ সাফাই ক'রে ছাড়লে। মহৎ সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর জানালে, কাজটা কিছুই নয়, কেবল অভ্যাসসাপেক্ষ। বিরাট সত্যের আবিষ্কৃতি অস্বীকার করার উপায় ছিল না মেনে নিলাম, কাজটা কিছু না। এই একগুঁয়েমি, পরে লক্ষ্য করেছিলাম, ওর জীবনধারার সব-কিছুর মধ্যে জড়িয়ে আছে।

কুহুকে নিকটে পাবার জন্যে ভট্টাচার্যকে মধ্যস্থ করতে হয় নি। আমাদের মিল ছিল ভিন্ন আস্তানায়। বাঁদরামির পরিপক্কতায় আমরা উভয়ে উভয়ের কাছে নত হতে লজ্জাবোধ করতাম না। গরমিল যা ছিল তা শিক্ষার দিক দিয়ে, দৈন্য ও সম্পদের প্রাচুর্যে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা সংগ্রহে ও সাংঘাতিকভাবে পারদর্শী জানতাম না। ছেলেটা কেম্‌ব্রিজের এম. এ.। অ্যাকাডেমিক ধাপের চূড়ায় ব'সে গভীর খাদবাসীর প্রতি কেন আকৃষ্ট হ'ল জানবার ফুরসৎ এখনও পাই নি, চেষ্টাও করি নি। মিল যখন হয়ে গিয়েছে, তখন গরমিলের কারণ খুঁজে কোন লাভ নেই।

কুহুকে রসিকচূড়ামণি বললে অত্যুক্তি হয় না। সুন্দরকে চেনা ওর ধর্ম হয়ে গিয়েছিল। ছবির আলোচনায় যে জ্ঞানের প্রকাশ দেখেছি, তাতে বোঝানো অপেক্ষা বোঝার প্রয়াসই বেশি। পাণ্ডিত্যের খাঁড়া খাড়া ক'রে রূপস্রষ্টাকে কুপিয়ে মারার জন্যে কখনও তাকে এগিয়ে চলতে দেখি নি। সর্বোপরি

সে ছিল শিল্পীর দরদী। আমরা বাঁচার চেষ্টায় ওর কাছে কত রকমের সাহায্য পেয়েছি, তার বর্ণনা দিতে হ'লে ক্ষুদুকে নিয়েই একটি বই লিখতে হয়। ক্ষুদুর মারফৎ পেলাম কেদারদাকে। দিল-দরিয়া মানুষ, বর্তমান 'প্রবাসী'র সম্পাদক, ক্ষুদুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। উভয়েই আমার জীবনে ভালমন্দ সামলে চলবার ভার নিয়েছিলেন। কেদারদা এবং ক্ষুদু আমাকে বহু বিষয়ে আগলে না থাকলে আজ আমার অবস্থা কি হ'ত বলতে পারি না।

সুরেশদাকে চিনলাম আমাদের সোসাইটির প্রদর্শনী-গৃহে। ভদ্রলোক তখন আমারই আঁকা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে। শ্রদ্ধেয় চারু বন্দ্যোর সঙ্গে আলোচনা চলছিল। সুরেশদার সহাস্য মুখ দেখে অনুমান করলাম ছবি কিছু প্রশংসা সংগ্রহ করেছে। এগিয়ে গেলাম নিজের কথা শোনার জন্যে। আত্মপ্রশংসা শুনতে পেলে আমার নেশা লেগে যেত, নিজেকে ভালবাসার এমন দৃষ্টান্ত খুব কম লোকেই দিতে পারে। নির্লজ্জের মত জানালাম, ছবিগুলো আমারই আঁকা। ভদ্রলোক আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন, কেমন একটা সন্দিগ্ধ ভাব তাঁকে পেয়ে বসেছিল। গুণ্ডামার্কা আকৃতি নিয়ে রূপ-স্রষ্টার দাবি নিশ্চয় তাঁর কাছে অদ্ভুত লেগেছিল। এ রকম ঘটনা পূর্বেও অনেক ক্ষেত্রে ঘটেছে, সুতরাং তাঁর আচরণে বিস্মিত হবার কিছু ছিল না, সন্দেহভঞ্জনের জন্যে বেশ জোর দিয়েই বললাম, আমার নামের সঙ্গে ছবির স্বাক্ষরে মিল আছে। ভদ্রলোক আমার তেজস্বী দাবি মেনে নেওয়ায় বিমনা দেখে, প্রমাণ পাকা করার জন্যে নিজেদের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ করলাম।

চায়ের নিমন্ত্রন ক'রে যখন তাঁকে মডেলের কাঠগড়ায় চড়ালাম, তখন তাঁর মুখশ্রীতে ভীতির হাঁক-ডাক প'ড়ে গিয়েছে। রাম গড়ার ইচ্ছা থাকলেও উপযুক্ত কারিগরির অভাবে রাম ছাগল হয়ে যাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। ঘটনাটির ভবিষ্যৎ-কল্পনায় দাদা যদি ঘাবড়ে থাকেন তো দূষণীয় বলা চলে না।

শিল্পী-নামের যোগ্যতা যে আমারও থাকতে পারে, তা প্রমাণ করার জন্যে সংকল্প দৃঢ় ক'রে ফেলেছিলাম। দাদাকে বললাম, ভয় পাবার কিছু নেই, ছবি শেষ হ'লে আপনার চেহারাই দাঁড়াবে। দাদা হাঁ-না কিছুই বললেন না, ভদ্রাচারের শাসনে কাঠগড়াতেই ব'সে রইলেন।

দ্রুত কাজ সারবার ইচ্ছা ছিল না, মুখাবয়বের খুঁটিনাটি যেখানে যা ছিল সব

ফাঁস ক'রে দিলাম। বয়েস সাহেবের দান মাথা খাড়া ক'রে উঠল। আত্ম-নির্ভরশীলতার জয়পতাকা তাঁর সামনে ধরলাম, দাদা আয়নায় মুখ দেখলেন, বেজায় খুশি। আলাপ ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের দিকে এগিয়ে চলল, ধীরে ধীরে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে দাদা এসে যোগ দিলেন।

সুরেশদার সঙ্গে আলাপের পূর্বেই একটু-আধটু লেখার চেষ্টা করতাম, নিরিবিলিতে একান্ত গোপনে। খাঁটি খেয়াল-চরিতার্থতা। যে কথা ছবিতে বলার উপায় নেই, যে রূপ মাটিতে ধরা যায় না, যে বক্তব্যের বাহন কেবল কথ্য ভাষা, তাকেই নিকটে টানার চেষ্টায় ছিলাম, নিজের কথা ভিন্ন ভাবে প্রকাশের জন্য। এমন প্রবৃত্তি পণ্ডিতের অগোচরেই রাখতে হ'ত টিটকারির ভয়ে।

ক্ষমাহীন ব্যক্তির আত্মাঙ্কার নিমিত্ত যুক্তির আশ্রয়ও নিরাপদ নয় যে বলব, রসসৃষ্টির কারবারে আন্তরিক উচ্ছ্বাসের প্রকাশই আনন্দের উৎস, কতটা প্রকাশ হ'ল তা বিচারের বস্তু। সাহিত্যের রসে নিরবচ্ছিন্ন ব্যাকরণের বেড়াজাল, বা শব্দ সমষ্টির পুষ্টিকরণ যদি চরম সার্থকতা হ'ত, তা হ'লে শব্দ-কল্পদ্রুম ও পাণিনি ই রসিক-রঞ্জনের উপাদান হয়ে উঠত।

ব্যাকরণ আসলে পাহারাওয়ালা, ভাষাকে আগলানো তার কাজ। শব্দের স্তর ভাষার গাঁথনির উপাদান। সুতরাং ক্ষমতা অনুসারে আনন্দের আশ্রয়-লাভ যে ভাবেই তৈয়ার হোক, গঠনকারীর শক্তির তুলনায় নিকৃষ্টেও সহানুভূতির দাবি অগ্রাহ্য হওয়া উচিত নয়।

গ্রন্থস্থ জ্ঞান যে ভাবেই পণ্ডিত প্রকাশ করুক, জ্ঞানের সঙ্গে রসিকের ভাবুকতার অভাব ঘটলে, প্রকাশ্য রূপ সম্বন্ধে অন্তঃদৃষ্টির যোগ না থাকলে, রস-সৃষ্টি অপেক্ষা তার সপিণ্ডকরণের ব্যবস্থা আগে হয়ে থাকে, কারণ নতুনকে আমদানির কাজে চর্বিতচর্বণের স্থান নেই।

যেখানে রূপের ভাণ্ডার অফুরন্ত, সেখানে চাওয়ার দাবি গ্রহণ-শক্তির স্বল্পতা হেতু অগ্রাহ্য হওয়া ঔদার্যের পরিচয় নয়। দেবতার মন্দিরে, ধনী বা দীনের নির্বিচার যাচ্ঞার যদি বাধা না থাকে, তা হ'লে রত্নাকর থেকে বাঁচার পাথেয় সংগ্রহের চেষ্টায় আমার মত নগণ্যকে বাধা দেওয়া গুণীর দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক।

উপরের যুক্তি আশ্রয় দেবার পূর্বেই ওস্ত-পাতা জ্ঞানী ব'লে বসে, রত্নকে চেনার আগে মানিকের সন্ধান বিড়ম্বনা। মানলাম, হীরক সংগ্রহ করলেও তার

যাচাই হয়তো আমার দ্বারা হবে না, কিংবা অজ্ঞতা হেতু ঝুটোই কুড়িয়ে নেব। পাওয়া জিনিস ফাঁকি হ'লেও খোঁজার আন্তরিকতাকে তো অস্বীকার করার উপায় নেই। যা চাই তা ভুল ক'রে চাই, যা পাই তা চাই না—কবির এই বাণী মহা পণ্ডিতকেও খোঁজার ব্যাপারে নব নব অভিজ্ঞতা দিয়ে থাকে, যা এক-একটি ব্যর্থতার স্তর এগিয়ে চলার সোপান।

আত্মরক্ষার ব্যাপারে তর্কজাল বুনে ফেললাম। নানা উৎপাত বর্ত্তমান থাকায়, লেখা লুকিয়েই সারতাম। কথা প্রসঙ্গে অসতর্কতায় আমার গোপন কারবার সুরেশদার কাছে ধরা প'ড়ে গিয়েছিল। তিনি উৎসুক হয়েই আমার চেষ্টার পুঁজি দেখতে চাইলেন। পড়া শেষ ক'রে বললেন, এটা তো ছাপতে হয়। গল্পটি সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন। কিছুকাল পরে 'ভারতী'তে আমার প্রথম লেখা ছাপা হ'ল। সে আজ ২৫ বৎসর আগের কথা। সুরেশদাই প্রথম এ বিষয়ে আমাকে পর্দার বাইরে টেনে আনলেন। উৎসাহ আমাকে সাহসী ক'রে তুলছিল, দীর্ঘকাল লুকিয়ে থাকায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। স্পষ্টবাদী নির্দয় ও দুর্মুখ সমালোচক সজনীকে (সজনীকান্ত দাস, 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক) একদিন আমার লেখা শুনিয়ে দিলাম বাঘের শিকারে যে ভাবে শুকনো পাতা মুচড়ে যাবার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়, ঠিক সেই ভাবে সজনীর পঠনকালীন আমার হৃদ্‌স্পন্দনে অনুভব করছিলাম, খাঁড়া কাঁধের উপর উঠে গিয়েছে, যে কোন মুহূর্ত্তে কোপ পড়ার অপেক্ষা মাত্র। কোপ পড়ল ভিন্নভাবে, 'শনিবারের চিঠি'তে আমার লেখা পত্রস্থ হতে লাগল। সাহিত্যচর্চায় সজনী নেশা লাগিয়ে দিলে। টাল সামলাবার ভার নিজের উপরে থাকলেও আমার খানায় পড়ার জন্যে গুরুকে দায়ী করি না। দুর্বল পা নিয়ে দূরপথের যাত্রী হ'লে চলায় বেসামাল হওয়া অস্বাভাবিক নয়, তথাপি চলার যৎসামান্য শক্তি পাওয়ার জন্য বন্ধু ও গুরুর নিকট কতকটা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি কেমন ক'রে!

ইতিমধ্যে সময় দ্রুত ছুটে চলেছিল, তার সঙ্গে জীবনধারার অনেক কিছুই ওলটপালট হয়ে যেতে লাগল। কাজের ভিড়ে অন্তরের মাংসলোলুপকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম, লেখাই ছিল প্রধান সহায়; কিন্তু 'সাবলিমেশন' এর যাবতীয় ঘুষ ও তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব বেশিদিন টিকিয়ে রাখা গেল না। অকস্মাৎ জাগরণের ভীতি আমাকে সতর্ক ক'রে তুলল। দীর্ঘকাল অনশনের পর বুভুক্ষুর

হিংস্র হয়ে ওঠা কিছুই বিচিত্র নয়। সব বিষয়ে নিজেকে চেনার দাবি না থাকলেও এ দিকটায় আত্মজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলাম। ঠিক জানতাম, প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করলে আমার দ্বারাই সমাজের অকল্যাণ আগে সাধিত হবে, প্রবঞ্চনার দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজে নেব। রক্ষা, এই দিকটায় তেমন অগ্রসর হতে পারি নি। পাতানো আত্মীয়তার আড়াল দিয়ে সুবিধা খুঁজে নেওয়া সাধনা-সাপেক্ষ বস্তু, আমার ধৈর্য এ বিষয়ে শায়েস্তা ছিল না। পাঁকের দিকে ফেরবার পথও নেই, ভড়ি ঘড়ি সাজানো প্রেমের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। পুনরায় আমাকে বিবাহের জন্য প্রস্তুত হতে হ'ল।

দারপরিগ্রহে এইরূপ পক্ষপাতিত্ব লোকের নিকট হাস্যকর হয়ে উঠল, অনেকে কেলেঙ্কারির পর্যায়ে ফেললেন, কেউ বা লাভজনক ব্যবসা সাব্যস্ত করলেন। প্রতিবাদের ফাঁক ছিল না, কারণ সিদ্ধান্তের প্রধান সহায় আমার আদর্শভ্রষ্ট ভালবাসা।

আমার মতে নরনারীর ঘনিষ্ঠ মিলন যে অনুষ্ঠান বা আদর্শের সমর্থনেই হোক মিলনের চরম সার্থকতা দেহ-মনের স্বতঃপ্রবৃত্ত বোঝাপড়ায়। উভয়ে উভয়কে চাওয়াই ভালবাসার শেষ কথা। চাওয়া সব সময় অল্পবিস্তর স্বার্থজড়িত, গরমিল ঘটলে উভয়ে উভয়ের দাবিকে সাধ্যানুসারে মানা—সহজ ও স্বাভাবিক বাসনার এর চেয়ে বেশি দাবি থাকলে আত্মপ্রবঞ্চনার কৌশল বেড়ে ওঠে, সুতরাং আমাকে আমার মত ক'রে বাঁচতে হ'লে আমার ব্যক্তিত্বকে বাদ দেবার উপায় নেই। নিজেকে ঠকাতে পারলাম না, তৃতীয় বার বিবাহ করলাম। আমার বর্তমান স্ত্রীর নাম চারুবালা, স্বর্গীয় মণীন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা, প্রফেসার জে. এল. ব্যানার্জীর ভ্রাতুষ্পুত্রী। চারুবালার ডাকনাম ডলী। এর পর প্রয়োজনে সংক্ষেপে ডলী ব'লেই উল্লেখ করব।

বিবাহের পরেই দেশত্যাগী হতে হ'ল মাদ্রাজে পেনশনযুক্ত কাজের ডাকে। সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদ পেয়ে গেলাম। কর্মপ্রাপ্তির কিছুদিন পরেই অফিসিয়াল চক্রান্তের সহিত পরিচিত হতে লাগলাম। অভিজ্ঞতা ছিল না, কুটিলতাও আর্টের পর্যায়ে উঠতে পারে।

কলকাতা থেকে আসবার সময় স্বর্গীয় স্যর্ আশুতোষের মূর্তি গঠনের ভার পাই। কাজটি মাদ্রাজেই করতে হয়েছিল। অতিকায় মূর্তি, কলকাতায় চৌরঙ্গীর শেষে, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউর গোড়াতে রাখা আছে। কাজটি

সন্তোষের মহারাজা আই. এফ এ.-এর তরফ থেকে দিয়েছিলেন। মূর্তির অতিকায় রূপ, তার সঙ্গে পাঁচ অংকের মজুরি এখানে অনেকের গাত্রদাহের কারণ হয়ে উঠল। চক্রান্ত ঘুরতে ঘুরতে কর্তা-ব্যক্তিদের কাছে এসে হাজির। কানাঘুষোয় শুনতে পেলাম, আমার প্রাইভেট কাজ নেওয়া বন্ধ ক'রে দেওয়া হবে।

খবর শুনে প্রথমটা এমনই অস্থিরতা এসেছিল যে, গোলামির শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলার জন্য প্রায় প্রস্তুত হয়ে উঠেছিলাম। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, নিজে না শিখলে শেখাবার শক্তি আসে কেমন ক'রে? এত বড় মূর্তি কেবল খেয়ালচরিতার্থতার জন্যই বা কেউ কি ভাবে? অসুবিধার আক্রমণ চার ধার থেকে শুরু হ'ল, তবু কাজ ক'রে চললাম, কোন প্রকারে মূর্তি শেষ করতে পারলে বাঁচি, কি জানি কখন হুকুম আসে—কাজ থামাও।

এক দিকে মূর্তিগঠন পরিকল্পনা, অপর দিকে আসন্নপ্রায় আত্মঘাতী হবার আদেশ। বাঁচার জন্য মনকে সতেজ ক'রে তুললাম, নিজেকেই আদেশ দিলাম, মূর্তি শেষ হবার আগে কিছুই ঘটতে দেওয়া হবে না। ভাগ্যক্রমে সাংঘাতিক প্রতিকূল কিছু ঘটার আগেই মূর্তিটি শেষ হয়ে গেল।

কাজের ব্যাপক বিজ্ঞাপ্তির সঙ্গে সামাজিক সমাজে মাণ্যবর ব্যক্তি হয়ে গেলাম, স্বাধীন মহারাজারা থেকে লাট বেলাট আমার স্টুডিওতে এসে সিটিং দিতে লাগলেন। বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভিতর লর্ড আর্সাকিন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা, স্যার সি. ভি. রমন, স্যার সি. পি. আইয়ার, স্যার সি. আর. রেড্ডি, আরও অনেকে ছিলেন। এই সময় আমার আঁকা ছবি ইউরোপ ও মার্কিন দেশে নামজাদা প্রদর্শনীতে ঘোরাঘুরি করছে, বিদেশী পত্রিকায় প্রশংসার প্রচার চলেছে। খবর ভাল, প্রশংসা ফাঁকা আওয়াজেই ভরাট ছিল না, বিক্রয় দিক থেকেও লাভবান হচ্ছিলাম। মোটা দামেই ছবি বিকুচ্ছিল।

বিলাতী প্রশংসায় দেশী মানুষেরা ঠাউরে নিলেন, আমি একজন জাঁদরেল ব্যক্তি। সম্মানপ্রাপ্তির প্রতিক্রিয়ায় শিল্পীর উপর দিয়ে ঝড় ব'য়ে যেতে লাগল। সামাজিকতা অবশ্যকর্তব্য বোঝার মত স্কন্ধে ভর করল। নিত্য একটা না একটা হুজুগ লেগেই থাকত, চা বা ডিনার পার্টি জড়িয়ে।

পেটুকের খ্যাতি যথেষ্ট থাকলেও আহারে সন্তোষলাভ কচিৎ ঘটেছে। সুস্বাদের সঙ্গে বাঞ্ছিত পরিমাণের যোগাযোগ করাতে গেলেই দেখেছি, ভদ্রাচার

আমাকে সন্ত্রস্ত ক'রে দিয়েছে। ভদ্রতার এক-একটি নীতি শানানো বল্লমের মত ধারালো, খোঁচাবার জন্য সদাই প্রস্তুত। ভক্ষণীয় অপেক্ষা আহারের প্রণালীই আকর্ষণের বস্তু। বামে ডাইনে সামনে বিভিন্ন আকৃতির রাশিকৃত ছুরি, কাঁটা ও চামচের প্রদর্শনী—ডাক্তারখানায় ফোড়া-কাটার ধারালো অস্ত্রের মত সাজানো। গরমিল জায়গায় হাত প'ড়ে গেলেই আশে-পাশে চাপা আতঙ্কের সাড়া প'ড়ে যায় প্রায় সেপটিক ঘোষণার মত।

'হোস্ট'রা বেশির ভাগ সবাই আমারই মত কালা আদমি, নিমন্ত্রিতরাও স্বদেশী চেহারার মানুষ, তবে বিলাত ফেরতা তাঁরা, সাহেবী আর কিছু বুঝুন বা না বুঝুন, ছুরি-কাঁটায় দোরস্ত হয়ে দেশে ফিরেছেন। টেব্‌ল ম্যানার্স্‌ মরিয়া হয়ে আত্মসাৎ করেছেন।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির চরম লাভের ওইখানেই সমাপ্তি। সার্কাসে বাঁদরের খেলায় কাঁটা চামচের ব্যবহার দেখেছি বাঁদর শিক্ষার তাড়নায় অবলীলাক্রমে সঠিক কাঁটা চামচ শাস্ত্রসম্মত ভাবে ব্যবহার করেছে। যে কাজ মর্কটের পক্ষেও অসাধ্যসাধন নয় তা মনুষ্যের পক্ষে আয়ত্ত ক'রে নেওয়া একটি অপূর্ব কীর্তি নয়। সুতরাং শিক্ষার অভাবে যদি সঠিক ব্যবহার নাই হয়, তা হ'লে মনুষ্যকে বাঁদর অপেক্ষা নিকৃষ্ট ভাবাও মস্তিষ্কের গোলযোগের কথা। এ কথা শোনে কে! মেলামেশায় কথোপকথনেও অ্যাবমডেটিং কন্‌ভার্সেশনালিস্ট না হ'লেই রূঢ় ব'লে খ্যাত হতে হয়।

আমার অবস্থা দাঁড়াল জলের মাছ ডাঙায় এসে পড়ার মত। অনভ্যস্ত আবেষ্টনীতে ভিতরটা খালি হোতে থাকত, তথাপি হাসি টেনে বলি, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিশেষ আনন্দ পেলাম স্বল্প হারে প্রায় অভুক্ত থেকেও জানাতে হয় এমন পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার ইতিপূর্বে কখনও জোটে নি।

শিক্ষাপীঠের যাবতীয় কার্যকলাপ সময়নির্দিষ্ট। রস-চর্চারও লগ্ন শুরু এবং শেষ হয় ঘড়ির কাঁটা ধ'রে। ক্লাস থেকে ফিরলেই ফাইলের গাদা রাক্ষসের মত অপেক্ষায় থাকে আমাকে গ্রাস করার জন্যে। প্রত্যেকটি ফাইল যেন সমাধি স্তূপের এক-একটি স্তর। অগাত গহ্বরে ঢুকে যেতে লাগলাম, কবর কলেবর বৃদ্ধি ক'রে চলল শিল্পীকে দম বন্ধ ক'রে মারার জন্যে।

প্রিন্সিপ্যাল সাহেব আসলে শিল্পী, অন্তত উক্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই সরকার আমাকে বাহাল করেছিলেন। এখানে এসে দেখলাম, আমার আসল

কাজ কেবল হিসাব ঠিক রাখা, তার সঙ্গে আছে নানা জাতের রিটার্নস—কোনটা মাসিক রিপোর্ট, কোনটা ত্রৈমাসিক, কোনটা বাৎসরিক, একটা না একটা কিছু লেগেই থাকে। কাজ সেরেছি ভেবে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। বাজেটের টাকা খরচ না করতে পারলেও কৈফিয়তের তলব এবং বেশি খরচ করলে নিজের ট্যাকের ওজন খালি হওয়ার সম্ভাবনাও কম নয়। সংক্ষেপে কর্তব্যের ভিতর প্রধান কাজগুলি মার্চেণ্ট আপিসের বড়বাবুর করণীয়। সময়ের গতির সঙ্গে আমিও বড়বাবু হয়ে যেতে লাগলাম। পরিবর্তন নিজের কাছেই বিস্ময়কর হয়ে উঠল।

আজকাল মূর্তি গড়ি নিরবচ্ছিন্ন অর্থসমাগমের জন্য, বাহবা পাই ফ্যাশানের দাপটে। এরও উপর উপদ্রব এসে জুটল, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আর্ট সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া, তার সঙ্গে দৈনিক বা মাসিক পত্রিকার প্রতিনিধির প্রশ্নোত্তর। চাহিদা আমাকে হুমড়োটের জীবনধারাতেও অভ্যস্ত করিয়ে ছাড়লে। শিল্পীকে লোকে চাইল পণ্ডিত হিসাবে।

ছাড়পত্র পেলাম বেভারলি নিকলসের *Verdict on India* কেতাবে। ভদ্রলোক আমার একটিও ছবি না দেখে আমার কাজ সম্বন্ধে অনেক লিখলেন, বক্তব্যের সমাপ্তিতে জানালেন, আমি একজন good conversationalist*। নিশ্চয় তাঁর রসবোধের অজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু ব'লে থাকব। সাহেবরা সব বিষয়েই স্পোর্টসম্যানশিপের উপমা খাড়া ক'রে থাকে; আমার ধারণা ভদ্রলোক ভাষার মারে জখম হয়েই শ্লেষোক্তি ঘুরিয়ে লিখেছিলেন।

সাহেবের কলমে, বিলাতী কেতাবে, দু-চার ছত্র আমার সম্বন্ধে বার হওয়ায় লোকে আমাকে তাজ্জব জীব ক'রে তুলল, ভারতে জিন্না সাহেবের নামের পরেই আমার কথা উল্লেখ! দর্শকের ভিড় বেড়ে যেতে লাগল, কতকটা চিড়িয়াখানায় বাঁদর দেখার কৌতূহল চরিতার্থতার মত।

এক প্রকারের দর্শক আছেন তাঁদের নিরীহ বলা চলে বাঁদরকে তার নিজস্ব রূপে দেখতে পেলেই জানোয়ার দর্শনের তৃপ্তি শেষ হয়। আর এক প্রকারের মানুষ কেবল দর্শন লাভেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, নিরাপদ ব্যবধান পেলেই একটু খুঁচিয়ে দেখা তাঁদের অভ্যাস।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষই আমার কাছে বেশি আসতেন।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনা সম্পর্কে কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"তপের প্রভাবে বাঙালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া।"

মানুষ একদিন জড়ে ও চেতনে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের কথা কল্পনা করিয়াছিল, প্রাণী-জগতের সঙ্গে উদ্ভিদ্-জগতের যোগসূত্রও সে আবিষ্কার করিতে পারে নাই। জগদীশচন্দ্রই প্রথম প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, নিখিল বিশ্বের সর্বত্র চলিয়াছে এক অখণ্ড চৈতন্যের লীলা। ভারতীয় ঋষি একদিন উদাত্ত কণ্ঠে যে ঐক্যের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, সে বাণী যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, জগদীশচন্দ্রই তাহা বিস্ময়বিমুগ্ধ বিশ্ববাসীর নিকট প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র শুধু পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক নহেন, তাঁহার মধ্যে বিজ্ঞানীর সত্যানুসন্ধিৎসা, কবির কল্পনা ও ঋষির ধ্যানদৃষ্টি এক অপূর্ব সমন্বয় লাভ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, জগদীশচন্দ্রের রচনাবলীর মধ্য দিয়া যে মানুষটির মূর্তি আমাদের মানস-নয়নে ভাসিয়া উঠে, তিনি স্বদেশ-প্রেমিক, স্বজাত্য-বোধে উদ্দীপ্ত, মাতৃভূমির গৌরবময় অতীতে এবং অধিকতর গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতে আস্থাবান। তাঁহার রচনাবলী যে স্থানে স্থানে হাস্যরসের স্নিগ্ধ দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর মনে হয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের যে মধুর প্রীতির সম্পর্ক ছিল, সে কথা সকলেই জানেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কথা ও কাহিনী' নামক কাব্যগ্রন্থ এইভাবে জগদীশচন্দ্রের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন—

"সত্য রত্ন দিলে তুমি, পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।"

কবিগুরুর সঙ্গে বিজ্ঞানাচার্যের যে সমস্ত পত্রালাপ হইয়াছে, সেগুলি যে চিরকাল বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশ্বের বরেণ্য এই মনীষিদ্বয় ভারতীয় সাধনার অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছেন—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যানুভূতিই এই সাধনার বিশেষত্ব। সুতরাং তাঁহারা উভয়েই সত্যদ্রষ্টা—একজন সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন অনুভূতির দ্বারা, আর একজন সত্যের সন্ধানে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার বন্ধুর পথ দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র স্বয়ং বলিয়াছেন—"বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি, অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই,

কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে তো প্রমাণ বাহির হইতে পারে না; এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়।

"বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসংবরণ করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে, এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্তনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে, তখন মুহূর্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসংবরণ বিস্মৃত হন, এবং বলিয়া উঠেন 'যেন নহে—এই সেই'।" (অব্যক্ত)

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনা ও জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার মধ্যে আর একটি জায়গায় আশ্চর্য মিল আছে। যে অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে কবি সমগ্র জীবন অনলসভাবে কাব্য-সাধনা করিয়া চলিয়াছেন, কবি তাহার নাম দিয়াছেন—জীবন-দেবতা। অবশ্য এই জীবন-দেবতা কবির নিকট বিচিত্ররূপিণী হইয়া দেখা দিয়াছে। জগদীশচন্দ্রও এইরূপ একটি অদৃশ্য শক্তির নির্দেশ শুনিতে পাইয়াছেন এবং উহা শিরোধার্য করিয়াছেন। সক্রেটিসের অন্তর-পুরুষ (genius of Socrates) তাঁহাকে বলিয়া দিতেন, কোন্ পথ বর্জন করিতে হইবে; আর জগদীশচন্দ্রের অন্তর-পুরুষ তাঁহাকে বলিয়াছেন, কোন্ পথে চলিতে হইবে। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের সাধক হইয়াও অলোকপন্থী (mystic) তাপসগণের ন্যায় দৈববাণী শুনিতে পাইয়াছেন, এ কথা ভাবিতেও বিস্ময় জন্মে। তাঁহার "হাজির" নামক প্রবন্ধের একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

"এক বৎসর পূর্বে হঠাৎ যেন নির্দেশ শুনিতে পাইলাম—'বিদেশ যাও'। বিদেশ যাত্রা! সেখানে কে আমার কথা শুনিবে? এবার কঠিন স্বর শুনিলাম—'আমার নাম হুকুম, তোমার নাম তামিল। লাভালাভ বলিবার তুমি কে?' আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া লইলাম।" (অব্যক্ত)

জগদীশচন্দ্র প্রধানত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করিলেও তাঁহার রচনার সাহিত্যিক মূল্য অল্প নহে। শিশুদিগের উপযোগী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায়ও যে জগদীশচন্দ্র সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে বৈজ্ঞানিক রচনাকে হাস্যরসে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে জগদীশচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় কৃতকার্যতা বাংলা দেশে আর কেহ লাভ করিতে পারেন নাই। (বঙ্কিমচন্দ্রের দু একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও হাস্যরসের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়াছে, যেমন—"চন্দ্রলোক"।) জগদীশচন্দ্রের রচনার আর একটি প্রধান গুণ—সরলতা ও স্পষ্টতা। তাঁহার কোন কোন রচনায় কবিদৃষ্টি ও রসানুভূতিরও পরিচয় পাওয়া যায়। ফলত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার্ জেম্স্ জীন্সের ন্যায় জগদীশচন্দ্রও বিজ্ঞানকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নত করিয়াছেন তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিয়াছেন—"বন্ধু। যদিও বিজ্ঞান-রাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করেছ, তবুও সাহিত্য-সরস্বতী সে পদ দাবি করতে পারত।"

এবার আচার্য জগদীশচন্দ্রের পরিহাস-রসিকতার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

বৃক্ষ সাধারণত কতখানি করিয়া বাড়ে তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য জগদীশচন্দ্র ক্রেস্কোগ্রাফ নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি এই যন্ত্রের নামকরণ করিতে চাহিয়াছিলেন বৃদ্ধিমাণ। তিনি প্রথম প্রথম তাঁহার নূতন যন্ত্রগুলির সংস্কৃত নাম দিয়াছিলেন, যথা—কুঞ্চন-মান এবং শোষণ মাণ। তারপর আমেরিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক যখন জগদীশচন্দ্রকে 'কাঞ্চনম্যান' সম্পর্কে ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন জগদীশ-চন্দ্র 'কুঞ্চন-মাণের' এই অদ্ভুত পরিণতি দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রসমূহের নামকরণের জন্য আর কখনও সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় লইবেন না। জগদীশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"বুঝিতে পারিলাম, হিরণ্যকশিপুকে দিয়া বরং হরিনাম উচ্চারণ করানো যাইতে পারে, কিন্তু ইংরেজকে বাঙ্গালা কিংবা সংস্কৃত বলানো একেবারেই অসম্ভব। এজন্যই আমাদের হরিকে হ্যারী হইতে হয়। এই সকল দেখিয়া কলের বুদ্ধিমান নামকরণের ইচ্ছা একেবারে চলিয়া গিয়াছে। বুদ্ধিমান, তাহা হইতে বার্‌ডায়ান্ হইত। তার চেয়ে না হয় ক্রেস্কোগ্রাফই ভাল।" (অব্যক্ত)

বিজ্ঞান যে মানুষের জীবনে আশীর্বাদ না হইয়া চরম অভিশাপ হইতে পারে

এবং সভ্যতার মৃত্যু ঘটাইতে পারে, সে সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র বহু পূর্বেই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন। জগদীশচন্দ্রের মতে বিজ্ঞান-সাধনার লক্ষ্য—ঐক্যবুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানবতার সেবা। এই দিক দিয়া জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই ভারতীয় সাধনার যোগ্য অধিকারী। জগদীশচন্দ্র বলিয়াছেন—

"বিশ্বের নিয়তপরিবর্তনশীল সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে যাহারা সেই এককে দেখিতে পায়, সত্যকে শুধু তাহারাই পায়।"

জগদীশচন্দ্রের জীবনে তাঁহার পিতৃদেবের প্রভাব বিপুল। জগদীশচন্দ্র তাঁহার পিতৃদেব সম্পর্কে লিখিয়াছেন—"তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনি শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ববিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর। জনহিতকর নানা কার্যে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সুখসম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন কোন বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম।" (অব্যক্ত)

জগদীশচন্দ্র তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতেই স্বদেশপ্রেমের প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে যুগে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগপ্রদর্শন দুঃসাহসের লক্ষণ ছিল। জগদীশচন্দ্রকে সর্বপ্রথম বাংলা বিদ্যালয়ে পড়িতে দিয়া তাঁহার পিতা দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম কত গভীর ছিল, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বিক্রমপুর-সম্মিলনীতে প্রদত্ত অভিভাষণ হইতে দুই-একটি অংশ উদ্ধৃত করিব।

বাংলার পতিত অস্পৃশ্য জাতিদের সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন—

"পঙ্ক অর্ধনিমজ্জিত, অনশনক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ, অস্থিচর্মসার এই পতিত শ্রেণীরাই ধনধান্য দ্বারা সমগ্র জাতিকে পোষণ করিতেছে। অস্থিচূর্ণ দ্বারা নাকি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অস্থিচূর্ণের বোধশক্তি নাই। কিন্তু যে জীবন্ত অস্থির কথা বলিলাম, তাহার মজ্জায় চিরবেদনা নিহিত আছে।"

এই অভিভাষণে স্বদেশবাসীগণকে লক্ষ্য করিয়া জগদীশচন্দ্র বলিতেছেন—

"যদি ভারতকে সঞ্জীবিত রাখিতে চাও, তবে তাহার মানসিক ক্ষমতাকে

অপ্রতিহত রাখিতে হইবে। ভারতের সমকক্ষ প্রতিযোগী বহু প্রাচীন জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেহের মৃত্যুই আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নহে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকায় মিশিয়া গেলেও জাতীয় আশা ও চিন্তা ধ্বংস হয় না। মানসিক শক্তির ধ্বংসই প্রকৃত মৃত্যু, তাহা একেবারে আশাহীন এবং চিরন্তন।

"তখনই আমরা জীবিত ছিলাম যখন আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানশক্তি ভারতের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশ-বিদেশ ব্যাপ্ত হইত। বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেও তখন আমাদিগকে হীনতা স্বীকার করিতে হইত না। এখন সেদিন চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল আমরা পরমুখাপেক্ষী। জগতে ভিক্ষুকের স্থান নাই। কতকাল এই অপমান সহ্য করিবে? তুমি কি চিরকাল ঋণীই থাকিবে? তোমার কি কখনও দিবার শক্তি হইবে না? ভাবিয়া দেখ, এক সময়ে দেশ-দেশান্তর হইতে জগতের বহু জাতি তোমার নিকট শিষ্যভাবে আসিত। তক্ষশিলা, কাঞ্চী ও নালন্দার স্মৃতি কি ভুলিয়া গিয়াছ? ভারতের দান ব্যতিরেকে জগতের জ্ঞান যে অসম্পূর্ণ থাকিবে, সম্প্রতি তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা দেবতার করুণা বলিয়া মানিতে হইবে; এই সৌভাগ্য যে চিরস্থায়ী হয়, ইহা কি তোমাদের অভিপ্রেত নহে? তবে কোথায় সেই পরীক্ষাগার, কোথায় সেই শিষ্যবৃন্দ?" (অব্যক্ত)

জগদীশচন্দ্রের রচনা হইতে আর অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার নানা প্রবন্ধে এইরূপ জলন্ত স্বদেশ-প্রেমের নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে যাহা কিছু মহিমময়, তাহার প্রতি জগদীশচন্দ্রের অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। সেই শ্রদ্ধাবুদ্ধি ছিল বলিয়া তিনি ভারতের অন্তরাত্মার সন্ধান পাইয়াছিলেন। প্রবচনের দ্বারা, মেধার দ্বারা বা বহুশ্রুতত্বের দ্বারা যাহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, ধ্যানদৃষ্টির দ্বারা জগদীশচন্দ্র তাহা অবগত হইয়াছিলেন।

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

শরীরপাতন

মন্ত্রে শুধু হয় বিয়ে—জীবযাত্রা হয় না নির্বাহ।
সে মন্ত্রসাধনে চাই ব্রাহ্মণের দেহ আর বাহ।

আগামী পথের যাত্রা

তিন

সৈনিকের জীবনে পরিচিতা এলেন নবপরিচয় নিয়ে, ছন্দে গানে পরিচিতা সৈনিককে এনে দিলেন কল্পলোকের আমেজ। সৈনিক আজ ফিরে তাকালেন পিছে-ফেলে-আসা পঁচিশ-বছরের পানে, মনের আবেগে আবৃত্তি ক'রে উঠলেন :—

নবরূপে হ'ল নবপরিচয় নব জীবনের সাথে,
ভুবন-সভায় দাঁড়ানু আজিকে একতারা ল'য়ে হাতে।

পরিচিতাকে সঙ্গে নিয়ে সৈনিক যাত্রা করলেন মধুমতীর তীরের পানে ; শিয়ালদা থেকে যাত্রা হ'ল শুরু। সৈনিক এবং সৈনিকের পরিচিতাকে নিয়ে ছুটে চলল যন্ত্রদানব সম্ভবপর গতিতে। প্রত্যেক দেশসেবকের দেশসেবা এবং কর্মবাদীর কর্মময় জীবনের বাইরে একটা একান্ত ব্যক্তিগত জীবন থাকে, যে জীবনে লক্ষজনের সেবায় আত্মনিবেদিত দেশসেবক কামনা করেন একক মরমীর প্রেরণা, বহুজন-পূজ্য কর্মবাদী আকাঙ্ক্ষা করেন একক হৃদয়ের প্রীতি এবং শুভেচ্ছা, সম্ভবত সেই একান্ত ব্যক্তিগত মন আজ সচেতন হয়ে উঠেছে সৈনিকের অন্তরে। বিগত দিনের লাভ ক্ষতির হিসাব অস্বীকার ক'রে বর্তমানকে শাশ্বত এবং সত্য ব'লে মেনে নিয়ে সৈনিক আপন মনে কল্পনার জাল বুনতে চেষ্টা করছিলেন। সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়ে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে আবৃত্তি ক'রে উঠলেন—"আমরা দুজনে স্বর্গ খেলনা গড়িব না ধরণীতে।"

কত প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় ভাবের আদান-প্রদান ক'রে যাত্রীযুগল এসে পৌছলেন খুলনা স্টেশনে, উঠলেন স্টীমারে, শস্যশ্যামল পূর্ব-বাংলার আরও অন্তস্থলে প্রবেশ করতে। স্টীমার ত্যাগ করল জেটি। পূর্ণিমার চাঁদ হাসছে আকাশের কোলে, কিন্তু ভৈরবের স্রোতোধারা মনবেদনায় সহযোগিতা করতে পারছে না আকাশের চাঁদের সঙ্গে। ভৈরব যেন বলছে, চাঁদ, তুমি যুগে যুগে কলঙ্কী, সুদূরের তুমি লজ্জা-ঘৃণার অতীত, তাই তুমি আজও হাসছ, কিন্তু আমি আজ তোমার হাসি-খেলার রাজ্যে যোগ দিতে অক্ষম, কারণ কালের পরিহাসে আজ আমি ব্যর্থ হয়েছি, এতবড় দুর্দিন আমার কোনদিন আসে নি। আমার বুকের উপর দিয়ে চ'লে গেছে বীর প্রতাপাদিত্যের অর্ণবযান, নিরুপায় হয়ে প্রবেশ করেছে আমার অঙ্কে মোগলের পশ্চাদাক্রমণে রাজা সীতারাম রায়ের পদাতিক বাহিনী। আমি গোপনে তাঁদের সাহায্য করেছি আত্মরক্ষা করতে,

তবু কেন আজ আমি বঞ্চিত আমার সত্যিকারের পরিচয় থেকে, কেন আমি বিচ্ছিন্ন আমার দেশজননীর অঙ্ক থেকে? কবে রাজপুত্র এসে সোনার কাঠির স্পর্শে আমার আজিকার তমস্রা-রজনী দূরীভূত করবে প্রভাত-সূর্যের আলোক-সীমায়। কবে কতকাল পরে সে প্রভাত আসবে ভৈরবের?—তাই আজ একমাত্র জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন আগামী কালের উদ্দেশ্যে।

ভৈরবের এ মনোবেদনা বিদেশী কোম্পানির যাত্রী-জাহাজ অনুভব করতে পারে নি, যদিও বা ভৈরবের সঙ্গে পরিচয় তার দৈনন্দিন, যেমন অনুভব করতে পারেন নি বিদেশী বিচারক স্যর্ সিরিল র‍্যাডক্লিফ। তাই কশাইয়ের মত চাকু চালিয়ে তিনি বাংলাকে খণ্ডিত করেছেন ন্যায় এবং নীতিবিগর্হিত হয়ে।

বাষ্প-জাহাজ ভৈরবের সলিলধারা ভেদ ক'রে ছুটে চলেছে আগামী গন্তব্যের পানে। চাঁদের আলোয়, নদীর কলস্রোতে সাজ পূর্ববঙ্গের সে কি মনোহারিণী রূপ, নীচের তলায় তৃতীয় শ্রেণীতে একজন যুবক মুগ্ধ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে গেয়ে চলেছেন—"সোনার বাংলা মা গো তোমায় ভালবাসি"। প্রতিবাদে দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিন থেকে সৈনিক ব'লে উঠলেন, না বন্ধু, ভাবপ্রবণ এবং আত্মভোলা হওয়ার মত সময় আজ নয়। আজ বড় বড় যুক্তিবাদের মাঝে এবং বিস্ময়মথিত কল্পনার মাঝে বাঙালী জাতির কর্ম-শক্তিকে বিপথগামী হতে দেওয়া সঙ্গত নয়। আজ প্রয়োজন, ইংরেজের দেশ-প্রেম, মুসলমানের স্বধর্মপ্রীতি এবং জার্মানির প্রতিহিংসাপরায়ণতা—বাঙালীর চিন্তাধারায় বাঙালীর কর্মপন্থায় প্রতিফলিত করা। আজ প্রত্যেকটি বাঙালীকে বুঝতে হবে, কেন পঞ্চাশের মন্বন্তরে আমরা হারিয়েছি লক্ষ লক্ষ ভাই-বোনদের, কেন কলকাতা এবং নোয়াখালির দাঙ্গার ফলে বঙ্গবিভাগ ক'রে স্বীকার করেছি ঋষি বঙ্কিমের জাতীয় মন্ত্র, কেন মহাভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে বিভিন্ন পন্থায় সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েও দিকে দিকে আজ হচ্ছি অস্বীকৃত? তাই বিশেষভাবে আজ আবার প্রত্যেকটি বাঙালীকে অন্তরে উপলব্ধি করতে হবে দেশজননীর সঙ্গে সম্বন্ধ তার কি?

চিনি আমি চিনি জননী তোমারে শত শত যুগ ধরি,
যুগে যুগে আমি ধন্য হয়েছি তোমায় প্রণাম করি;
আমিই গণেশ করি মহাপণ
পাঠানের সাথে করিয়াছি রণ

আমিই কেদার, আমিই প্রতাপ, আমি রাজা সীতারাম
কৃপাণফলকে লিখে গেছি আমি ইতিহাসে মোর নাম;
ফাঁসির মঞ্চে নন্দকুমার,
আমিই তো মা গো দুলাল তোমার,
আমি ক্ষুদিরাম, যতীন, কানাই, আমি প্রফুল্ল চাকী,
আমার রক্তে তোমার ললাটে তিলক দিয়াছি আঁকি।
আমিই তোমার দুরন্ত শিশু
মৃণ্ময়ী বীর সুভাষ বসু
অস্থিরে আমি বজ্র করিয়া যুগ যুগ তোমা রক্ষা করি
চিনি আমি চিনি জননী তোমারে শত শত যুগ ধরি।

কেটে যায় খানিকক্ষণ, ভাববিহ্বল নয়নে পরিচিতা তাকিয়ে থাকে সৈনিকের দিকে। যে পুরুষের কল্পনা তিনি জীবনে করেছিলেন, এ তো সে নয়। নারীর রূপ, জননীর মমতা এবং পিতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই সব পুরুষদের জীবনে বাধার প্রাচীর তুলতে পারে না। এই ধরনের পুরুষদের শ্রদ্ধা করা যায়, কিন্তু ভালবাসা যায় না। এরা আগ্নেয়গিরি বিসুবিয়াস অথবা বাত্যাক্ষুব্ধ আটলান্টিক, সাধারণ মানুষের অনুভূতি এবং মতামতের বাইরের লোক এরা। সমষ্টিগত মানুষের এরা করে মহা উপকার, আর সর্বনাশ করে এক-একটি একক হৃদয়ের। পরিচিতার মনোভাব সৈনিক তখন অনুধাবন করতে চেষ্টা করেন নি, অনুসন্ধান করছিলেন মধুমতীর তীরের দিকে তাকিয়ে কোন অনাগত নেতৃত্বের। হৃদয়ের আবেগে আপন মনে ব'লে উঠেন—The outburst of the future will shake your banks, Madhumati, get ready to welcome it.

আমি জয়গৌরবে যুগে যুগে আসি দম্ভী দমন হেতু
বিপ্লবী আমি কালের খেয়াল মহাকাল ধূমকেতু
আঘাতে আমার টলমল করে দুঃশাসনের রাজ্য
নূতন করিয়া পৃথিবী রচনা যুগে যুগে মোর কার্য।

স্টীমার মাঝে মাঝে রাত্রির গাম্ভীর্য ম্লান ক'রে গুরুগম্ভীর ভেঁপু হেঁকে এগিয়ে চলেছে, নেশাক্রান্ত সৈনিক ডেকে আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে পণ্ডিত নেহেরুর *Discovery of India* পাঠে মগ্ন। লেবুর শরবৎ তৈয়ারি ক'রে

পরিচিতা দিলেন সৈনিকের হাতে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সৈনিক এক চুমুকে করলেন উদরসাৎ। উভয়ে নির্বাক, কেটে গেল খানিকক্ষণ, মৌনতা ভঙ্গ ক'রে পরিচিতা বললেন, সৈনিক, এত মদ তুমি কেন খাও?

কেন পরিচিতা, তুমি কি অপরাধ মনে কর?

নিশ্চয়ই, জাতীয়তাবাদের বলিষ্ঠ সত্তা রয়েছে তোমার মধ্যে। এ অবাঞ্ছনীয় বিজাতীয় অভ্যাস তুমি কেন করলে?

আত্মপ্রতারণার সহজ উপায় ব'লে।

লাভ কি? পেরেছ কি নিজেকে ফাঁকি দিতে?

নিজেকে পেরেছি, পারি নি অপরকে, অবিশ্যি চেষ্টাও করি নি।

ঠিক বুঝলাম না তোমার কথার অর্থ।

কোন মানুষ কি নিজের মনের সব কথা বোঝাতে পেরেছে, যাকে চেয়েছে বোঝাতে?

তোমার কথাবার্তা চাল চলন সবই হেঁয়ালিপূর্ণ।

শুধু আমার সব কিছুই হেঁয়ালিপূর্ণ নয়, গোটা জগৎই হেঁয়ালিতে ভরপুর। হেঁয়ালির উত্তর ভিত্তি ক'রেই গ'ড়ে উঠেছে মানুষের একক এবং সমষ্টিগত জীবন। কত অবিজ্ঞাপিত হেঁয়ালির উপর ভিত্তি ক'রেই প্রতি যুগের কবি-সাহিত্যিকেরা রচনা ক'রে গেছেন মানব-মনের খোরাক, প্রতি যুগের বিভিন্ন দেশের সৈনিকেরা রেখে গেছেন কৃপাণের জয়দণ্ড—সমাজ হয়তো তাঁদের স্বীকার করেছে, কিন্তু সম্মান করে নি। গোটা পৃথিবীই হেঁয়ালিতে পরিপূর্ণ, সুতরাং আমার কথায় এমন কি নতুন হেঁয়ালির তুমি সন্ধান পেলে পরিচিতা? থাক্, রাত অনেক হয়েছে, এবার তুমি ঘুমোতে যাও।

তুমি ঘুমোবে না?—জিজ্ঞাসা করলেন পরিচিতা।

না, এখনও নয়, খুব ভাল লাগছে পণ্ডিতজীর বইখানা, তাই আরও কিছুক্ষণ পড়ব ভাবছি, তুমি আমার জন্যে মোটেই ব্যস্ত হ'য়ো না, কোন অসুখ-বিসুখ আমার হবে না—আমি everything-proof।

কেটে যায় কয়েক ঘণ্টা। বিদেশী কোম্পানির যাত্রী-জাহাজ ছুটে চলেছে মধুমতীর বক্ষ ভেদ ক'রে, সৈনিক পণ্ডিতজীর বইখানা হঠাৎ বন্ধ ক'রে এসে দাঁড়ালেন কেবিনের বাইরে, উজ্জ্বল চাঁদ, উচ্ছল মধুমতীর স্রোতোধারা সৈনিকের রক্তে যেন কিসের সাড়া তুলল। সবুজ বাংলার আঁচলখানির দিকে তাকিয়ে

সৈনিক ব'লে উঠলেন, আমার মায়ের আঁচল আবার আমারে বিধাতা ফিরায়ে দে। পরিচিতা ঘুমোতে পারেন নি। সৈনিকের কণ্ঠস্বর শুনে এলেন কেবিনের বাইরে। দাঁড়ালেন এসে সৈনিকের পাশে, বললেন, মাকে ভালবাসতে পারলে না সহযাত্রী, দেশকে ভালবাসতে শিখলে কি ক'রে?

কারণ অনুধাবন করা দুর্জ্ঞেয় নয়, একক মায়ের শান্তি-ছায়ায় যদি জীবন কাটাবার সৌভাগ্য হ'ত, তবে হয়তো লক্ষ মায়ের কথা ভাববার সুযোগ জীবনে পেতাম না।

তোমার সব-কিছুই হেঁয়ালিপূর্ণ এবং আমার বিচারে আত্মপ্রতারণারই নামান্তর। তুমি ধূমকেতু, তুমি অমঙ্গল, তোমার সঙ্গে আমায় আজিকার যাত্রা সম্ভবত আগামী দিনে আমার মনোবেদনার কারণ হয়ে উঠবে।

হঠাৎ কোথেকে একটা টিকটিকি টিকটিক ক'রে আগামীর সংকেত দিয়ে গেল। দুজনের সে মিলিত যাত্রা শেষ পর্যন্ত ধাবিত হ'ল সম্পূর্ণ ভিন্ন মুখে।

কেটে যায় দিন। সৈনিকের অন্তরে পরিচিতার স্মৃতি আজ বিস্মৃতিতে লীন। পরিচিতা বেছে নিয়েছেন জীবনে স্বাধীন এবং স্বকীয় মতের পথ, আর সৈনিক এগিয়ে চলেছেন বল্গাবিহীন ঘোড়ার মত আগামী দিনের পানে, তাঁর আদর্শকে বাস্তবে রূপ দান করতে।

বেপরোয়া মনের প্রভাবে সৈনিক স্বেচ্ছাসেবক হয়ে যাত্রা করলেন কাশ্মীর-রণাঙ্গনে। পালামপুর ত্যাগ করবার সময় বন্ধু বান্ধবেরা শুভেচ্ছা জানিয়ে বললেন, এখানকার শান্তিময় জীবন ছেড়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিপৎসঙ্কুল কাশ্মীরে ধাওয়া করবার কি প্রয়োজন ছিল?

উত্তরে সৈনিক বললেন, চির অশান্ত সৈনিকের পক্ষে পালমপুরের শান্তিময় পরিবেশ মোটেই লোভনীয় নয়, তার চাইতে নিজেকে নিজে বেশি অনুভব করবার সুযোগ পাব রাইফেল কাঁধে ঢুকিয়ে বরফ-ঘেরা কাশ্মীরের শত্রু-আক্রান্ত গিরিকন্দরে। সৈনিক-জীবনের সেই সতেজ জীবনানন্দ থেকে বঞ্চিত হতে আপনারা আমাকে প্রলুব্ধ করবেন না। আসুন, আমরা সকলে সকলের কাছ থেকে হাসিমুখে বিদায় নিই। বন্দে মাতরম্।

পাঠানকোটের উদ্দেশে গাড়ি দিল ছেড়ে।

শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

মাস্টারমশাই

সাব-ইন্সপেক্টার কালীবাবু একটা তদন্ত ক'রে ফিরছিলেন। একে পাড়াটা খারাপ, তার ওপর অনেক রাত অবধি খেটেও আশানুরূপ ফল পান নি, তাই মেজাজটা বেজায় বিগড়ে ছিল। সঙ্গী রামভরোসা সিং ছোটবাবুর মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছিল, তাই ইচ্ছে ক'রে একটু পেছিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কালীবাবুকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যেতে দেখে সে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। কালীবাবুর আর যে দোষই থাক্ এ বিষয়ে তিনি একেবারে ভীষ্মদেব। কৌতূহল তার খুব বেশি হ'লেও সে দূরত্বটা বজায় রেখেই দাঁড়িয়ে গেল। খদ্দেরের আশায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হতাশ হয়েও যারা নিজেদের মধ্যে স্থান-কাল-পাত্রের উপযুক্ত রসিকতা ক'রে অভাব ভোলবার চেষ্টা করছিল, তারা যে যেখানে পারলে দৌড় দিলে। কালীবাবুর কিন্তু এসব দিকে লক্ষ্য ছিল না; সামনের একজন লোককে তিনি নিরীক্ষণ করছিলেন। লোকটিকে সনাক্ত করতে ভুল হয় নি মনে হতেই তিনি তাড়াতাড়ি তার সামনে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। পুলিস ইন্সপেক্টার পথ আটকে দাঁড়ালে পায়ের তলাকার মাটি কাঁপে না, এমন লোক এ দেশে কমই আছে, কিন্তু সেটা হয় ভয়ে। কালীবাবু যার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তার মুখ দেখলে কারও সন্দেহ থাকত না—লোকটার মনের মধ্যে ভয়ের চেয়ে লজ্জাটাই বোধ হয় বেশি ছিল; কালীবাবুর সে অবকাশ বা মানসিক স্থিরতা ছিল না। তিনি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, আপনার লজ্জা করে না মাস্টারমশাই? ঘরে যার এক বেলার ভাত নেই, যার বউ মেয়ের লজ্জা-নিবারণের একখানা কাপড় নেই, ভিক্ষে না ক'রে যার হাঁড়ি চড়ে না··· ইচ্ছে করে, চাবকে পিঠের—

কালীবাবু কথাটা শেষ করলেন না, সেটা মাস্টারমশাইয়ের বয়েসের কথা মনে ক'রে, কি পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা স্মরণ ক'রে তা বলা যায় না। কালীবাবু অত্যন্ত চটেছিলেন, তা না হ'লে মাস্টারমশাইয়ের মুখ দেখে হয়তো চমকে উঠতেন। একটু থেমে বললেন, এর পর যদি আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় যান, তা হ'লে—। কথাগুলো অসমাপ্ত রেখেই কালীবাবু হনহন ক'রে চ'লে গেলেন।

সেদিন রাত্রে খেতে ব'সে কালীবাবু তাঁর স্ত্রী অনিমাকে ঘটনাটা বললেন। ভদ্রমহিলা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না; মাস্টারমশাইকে তিনি

বহুদিন দেখছেন, তাঁর হাসিমুখে দারিদ্র্য সহ্য করবার ক্ষমতাকে বরাবর শ্রদ্ধা করেছেন; সে লোক কখনও এ কাজ করতে পারে? স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ গো, তুমি দেখতে ভুল কর নি তো? বিরক্ত হয়ে কালীবাবু বললেন, কি যে বল! মাস্টারমশাইকে আমি চিনতে পারব না? আর যদি ভুলই হবে, তা হ'লে চাবুক মারবার কথায় লোকটা চ'টে উঠবে না?...না, ভুল হওয়া অসম্ভব। না মেনে উপায় নেই, অথচ অনিমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না।

রামভরোসা সিং মাস্টারমশাইকে আগে অনেকবার দেখেছে; প্রত্যেক মাসের গোড়ায় তিনি কালীবাবুর কাছে সাহায্য নিতে আসতেন। যারা রোজগার ক'রে খায়, তারা কাউকে অন্যের রোজগারে খেতে দেখলে তার ওপর চটে, তা সে নিজেকে এক পয়সা খরচ না করতে হ'লেও। রামভরোসা সিংও মাস্টারমশায়ের ওপর খুশি ছিল না; লোকটা অপদস্থ হয়েছে দেখে সে বেশ সন্তুষ্ট হয়েছিল। ছোটবাবু যে বেজায় চটেছেন তা বুঝতে তার মোটেই সময় লাগে নি, সেই রাগটা যাতে প'ড়ে না যায় তাই দুদিন পরে বললে, হুজুর, হামি সন্ধান করিয়েসি, মাস্টার তো হামেশা উখানে যায়; মেয়েছেলেগুলা সোবাই উকে চিনে। ছোটবাবু কোন রকম ঔৎসুক্য না দেখিয়ে বললেন, ওর নাম আমি আর শুনতে চাই না। হেসে ব'সে স্ত্রীকে বললেন, তোমার সন্দেহ হচ্ছিল না, অন্য লোককে মাস্টারমশাই ব'লে ভুল করেছি? রামভরোসা সিং খবর নিয়ে এসেছে—উনি প্রায়ই ওখানে গিয়ে থাকেন, ওপাড়ার লোকেরা সবাই ওঁকে চেনে। খুব বেঁচে গিয়েছি, কদিন ধ'রে তুমি বলছিলে আমাদের মিনুকে একটু একটু পড়াবার জন্যে বলতে। কালীবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী এত সব প্রমাণ সত্ত্বেও যেন ঠিক বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছিলেন না, কোথায় একটা খটকা থেকে যাচ্ছিল।

কালীবাবু মাস্টারমশাইকে দেখছেন এই তো ক বছর; তা ছাড়া চোর, জোচ্চোর, বদমায়েশ নিয়ে সমস্তক্ষণ কাটাতে কাটাতে লোকের সম্বন্ধে প্রথমেই খারাপ ধারণা ক'রে নেওয়া তাঁর অভ্যেস হয়ে গিয়েছে; কিন্তু অনিমা অত সহজে তাঁর এতদিনের বিশ্বাস বদলান কি ক'রে? তিনি যখন তাঁর মেয়ে মিনুর মত, তখন তাঁকে পড়াবার জন্যে মাস্টারমশাই তাঁদের বাড়ি আসেন, কত আদর যত্ন করেছেন, কত জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গিয়েছেন, লেখাপড়া ছাড়া কত ভাল কথা শিখিয়েছেন। তারপর যখন অনিমা উঁচু ক্লাসে উঠলেন, তখন অন্য

মাস্টার এলেন। কিন্তু মাস্টারমশাই প্রায়ই এসে তাঁর খবর নিতেন। ভদ্রলোকের অবস্থা কোনদিনই ভাল ছিল না; একটা প্রাইভেট স্কুলের সব চেয়ে নীচু ক্লাসে পড়াতেন, মাইনে যা পেতেন তা সামান্যই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বাড়িতে পড়িয়ে যা দু-পাঁচ টাকা পেতেন, তাতেই তাঁর চ'লে যেত। অনিমা অনেক সময় ভেবেছেন, ভদ্রলোকের কি ক'রে চলে এত সামান্য আয়ে? কিন্তু মাস্টারমশাইকে তিনি কোনদিন নিজের দুর্ভাগ্য নিয়ে দুঃখ করতে শোনেন নি।

তাঁর বিয়ের ক বছর পরে হঠাৎ একদিন বাপের বাড়ি গিয়ে অনিমা মাস্টারমশাইয়ের কথা জিজ্ঞেস ক'রে শুনলেন, ভদ্রলোকের চাকরিটি নেই, অনেক বয়েস হয়েছে ব'লে স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাড়িয়ে দিয়েছে, পড়ানোর কাজও আজকাল বেশি জোটে না। সেই দিনই তিনি ফিরে এসে স্বামীকে বলেন মাস্টারমশাইয়ের জন্যে একটা মাসোহারা বন্দোবস্ত ক'রে দিতে; কালীবাবুও মাত্র কয়েকটা টাকার জন্যে স্ত্রীকে ক্ষুণ্ণ করতে চান নি। প্রথমবার অনিমা নিজে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি গিয়ে টাকা দিয়ে আসেন; ভদ্রলোক সহজে নিতে রাজি হন নি; অনিমা বলেন, আপনার মেয়ে দিতে এলে কি আপনি ফেরত দিতে পারতেন? ভদ্রলোক কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, তাঁর চোখে জল এসে যায়, তারপর অনিমার হাত থেকে টাকা নেন।

অনিমার মনে প'ড়ে যায়, একবার মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে তিনি চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলেন। ফেরবার সময় রাস্তায় মাস্টারমশাই পাঁচখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পান; তাঁকে সঙ্গে ক'রেই তিনি থানায় গিয়ে টাকাটা জমা দেন। সাব-ইন্সপেক্টার বলেন, আচ্ছা লোক তো মশাই! নগদ টাকা, এ আবার জমা দিতে এসেছেন! আপনার এ যুগে জন্মানোই উচিত হয় নি। অনিমা কি ক'রে বিশ্বাস করেন, সেই লোক এই বয়েসে এমন হীন কাজ করেছেন? অথচ তাঁর স্বামীর পক্ষে ভুল করাও সম্ভব ব'লে মনে হয় না।

সব সন্দেহের অবসান হয়ে গেল পরের মাসে, মাস্টারমশাই টাকা নিতে এলেন না। নিয়ম ক'রে প্রত্যেক মাসের পাঁচ তারিখে তিনি আসতেন, শুধু পাঁচ তারিখে বৃহস্পতিবার পড়লে তার পরদিন আসতেন। অনিমা সারাদিন আশা করেছিলেন, মাস্টারমশাই আসবেন, আর তা হ'লেই প্রমাণ হয়ে যাবে কালীবাবুর ভুল হয়েছিল। তাঁর স্বামী যদি মাস্টারমশাইকেই দেখে থাকেন,

তা হ'লে নিশ্চয় তিনি আর টাকা নিতে আসবেন না। দিনটা যতই কেটে যেতে লাগল, ততই অনিমা হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন; তবে কি তাঁর স্বামীর ভুল হয় নি? পরের দিন সকালে তাঁর মনে হ'ল, হয়তো ভদ্রলোকের অসুখ করেছে, পরে আসবেন। কিন্তু একদিন দু'দিন ক'রে মাস শেষ হয়ে এল, মাস্টারমশাই এলেন না। অনিমার ইচ্ছে হয়েছিল, একবার খবর নেন; কিন্তু কাকে দিয়ে নেবেন? তা ছাড়া স্বামী জানতে পারলে বিরক্ত হবেন, সে বিষয়ও সন্দেহ ছিল না।

এর পর ক মাস কেটে গেছে; মাস্টারমশাইয়ের কথা আর কারও মনেও পড়ে না, শুধু প্রত্যেক মাসের পাঁচ তারিখে হিসেব লেখবার সময় অনিমার মনে প'ড়ে যায় ভদ্রলোকের কটি টাকা হাত পেতে নিয়ে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করার কথা।

সেদিন রাত প্রায় দশটা; কালীবাবু খেতে বসতে যাচ্ছেন এমন সময় খবর এল, তাঁর এলাকার মধ্যে একটা খুন হয়েছে। খাওয়ার কথা মাথায় উঠে গেল, কালীবাবু তখনই বেরিয়ে পড়লেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই যারা ভিড় ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল, তারা স'রে গেল। সিঁড়ির তলায় যে মৃতদেহটা উপুড় হয়ে প'ড়ে ছিল, সেটাকে একজন কন্‌স্টেবল চিৎ ক'রে শুইয়ে দিতে কালীবাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আরে, এ যে মাস্টারমশাই! তারপরই বললেন, ঠিকই হয়েছে, এসব লোকের এই রকম পরিণামই হওয়া উচিত।

তারপর চলল তদন্ত। অনেক জেরা, অনেক জুলুম, অনেক ধমকধামকের পর যা জানা গেল, তা হচ্ছে এই—

প্রতিদিনের মত সেদিনও মাস্টারমশাই দরজায় দরজায় উঁকি মেরে মেয়েদের দেখছিলেন আর মেয়েরা তাঁকে নিয়ে তাদের উপযুক্ত রসিকতা করছিল. সেই সময় কেতকী নামে একটি মেয়ে বাইরে থেকে বেড়িয়ে ফিরছিল; সে এ পাড়ায় নতুন এসেছে তাকে দেখে মাস্টারমশাই তার দিকে এগিয়ে যান, মেয়েটিও ছুটে বাড়ির ভেতর চ'লে যাবার চেষ্টা করে ও সামনের সিঁড়ি দিয়ে খানিকটা উঠে যায়। মেয়েটি যার সঙ্গে বেড়িয়ে ফেরে, সে লোকটি তখনও গাড়িতে ব'সে ছিল, ব্যাপার দেখে নেমে আসে ও মাস্টারমশাইকে আটকায়। মাস্টারমশাই জোর ক'রে তার হাত ছাড়িয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করেন। ধস্তাধস্তি হতে হতে লোকটা তাঁকে ধাক্কা দেয়, মাস্টার-

মশাই সিঁড়ি থেকে প'ড়ে যান। প্রথম সবাই ভেবেছিল অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন, তাই জল ছিটিয়ে দেয়। কিন্তু একটু পরেই তাদের ভুল ভাঙে তারা বুঝতে পারে লোকটি মারা গিয়েছে। যে লোকটি ধাক্কা দিয়েছিল, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি।

এর পরই ডাক পড়ল কেতকীর, কিন্তু সে কিছুতেই এল না। খুব বিরক্ত হয়েই কালীবাবু তার ঘরে গেলেন; গিয়ে দেখলেন, মাটিতে শুয়ে মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কালীবাবু ভয়ানক চটে ছিলেন, তাই ধমক দিয়ে বললেন, আর ন্যাকামি করতে হবে না, উঠে ব'সে আমার কথার জবাব দাও। মেয়েটি উঠে বসল, কিন্তু তার কান্না থামে না। কালীবাবুর মিষ্টি ভাষা বেশ কিছুটা ব্যয় হবার পর মেয়েটি চুপ করলে। কালীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ওই লোকটিকে চিনতে? মেয়েটি জবাব দিলে না। কালীবাবু প্রায় চীৎকার ক'রে উঠে বললেন, কথার জবাব দাও বল মেয়েটি ঘাড় নেড়ে জানালে, সে চিনত। কালীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কতদিন থেকে চিনতে?

অনেক দিন থেকে,—কান্নায় মেয়েটির প্রায় গলা বন্ধ হয়ে আসছিল। কালীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, লোকটা তোমার কাছে কতদিন থেকে আসছে?

মেয়েটি কান্নায় ভেঙে প'ড়ে বললে, আপনার পায়ে পড়ি, চুপ করুন।

কালীবাবু রাগে প্রায় ক্ষেপে উঠে বললেন, থাম। লোকটা তো খেতে পেত না, তোমার পয়সা যোগাড় করত কি ক'রে?

মেয়েটি আর নিজেকে সামলাতে পারলে না, বললে, চুপ করুন, চুপ করুন ইন্সপেক্টারবাবু। উনি—উনি আমার বাবা।

কালীবাবুর নিজের শ্রবণশক্তির ওপর বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাঁর ইন্সপেক্টারী জীবনের বহু বহু বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে এ রকম অভিজ্ঞতা আর হয় নি।

শ্রীমনোজ গুপ্ত

উলুখড়

কমিতেছে আয়, বাড়িতেছে ব্যয়—দুই সীমান্তে মেলানো ভার।
মধ্যে আমরা যারা র'হয়া'ছি—মধ্যবিত্ত সংজ্ঞা যার,
তারা লোপ পাবে এ রামরাজ্যে—সেই ব্যবস্থা করেন রাম
খালি ক'রে ট্যাঁক, সেই অনুপাতে বৃদ্ধি ক'রয়া দ্রব্যদাম।
উপরে এবং নীচে যারা থাকে—ধনিক মজুর বিবদমান।
রাজারা যুঝছে এ রামরাজ্যে, মাঝে উলুখড় হারায় প্রাণ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

(১৮৫৩ ১৯৩১)

১

জন্ম ঃ বংশ পরিচয়

১৮৫৩ সনের ৬ই ডিসেম্বর (২২ অগ্রহায়ণ, ১২৬০) তারিখে নৈহাটীর প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য-বংশে হরপ্রসাদের জন্ম হয়। তাঁহার প্রপিতামহ মাণিক্য তর্কভূষণ পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই স্বগ্রাম—যশোহর (অধুনা খুলনা) জেলার কুমিরা ত্যাগ করিয়া নৈহাটীতে আসিয়া বসতি করেন। তিনি অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক ছিলেন; ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। "পূর্ব্ব দেশ হইতে আসিয়া নৈহাটী গ্রামে চৌপাড়ী করিয়া অধ্যাপনা" করার কথা কর্ণগোচর হইলে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ১১৬৭ সালে (ইং ১৭৬০-৬১) মাণিক্যকে "পরগণে হাবেলী সহর" নৈহাটীতে অনেকখানি ব্রহ্মোত্তর জমি দান করিয়াছিলেন। মাণিক্যের পুত্র শ্রীনাথ তর্কালঙ্কারও নব্য ন্যায়ে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই শ্রীনাথের পুত্র রামকমল ন্যায়রত্নই হরপ্রসাদের পিতা। তিনিও সুপণ্ডিত ছিলেন। নৈহাটীতে ভট্টাচার্য্য-পরিবারের টোল সে সময়ে শীর্ষস্থানীয় ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হরপ্রসাদ নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন:—"আমার পূর্ব্বপুরুষেরা নৈহাটীতে আসিয়া ন্যায়শাস্ত্রের টোল খুলেন। এক শত বৎসর ধরিয়া এই অঞ্চলের নৈয়ায়িকেরা আমাদের বাড়ী পাঠ স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। অনেকেই নৈহাটীতে পাঠ স্বীকার করিয়া তথা হইতে উপাধি লইয়া গিয়াছেন।"

বিদ্যাশিক্ষা

রামকমলের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু ও পঞ্চম পুত্র হরপ্রসাদ প্রকৃত পণ্ডিতপদবাচ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। নন্দকুমার অল্প বয়সেই ন্যায়শাস্ত্রে পারঙ্গম হইয়াছিলেন। তিনি চার বৎসর (নবেম্বর ১৮৫৬—ডিসেম্বর ১৮৬০) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপনা করিবার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুপারিশে পাইকপাড়া রাজাদের কান্দী-স্কুলে হেড-পণ্ডিতের পদলাভ করেন। ১৮৬১ সনের ৪ঠা অক্টোবর পিতা রামকমলের মৃত্যু হইলে নন্দকুমারকে নৈহাটী আসিতে হইয়াছিল; পিতৃশ্রাদ্ধের পর তিনি ভ্রাতাদের সঙ্গে লইয়া কান্দী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। হরপ্রসাদের এ-বি-সি শিক্ষা এই কান্দী-স্কুলেই হয়। তখন তাঁহার নাম ছিল—শরৎনাথ। তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন:—

"বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে আমার দাদা ৺নন্দকুমার ন্যায়চুঞ্চু কান্দীর হেডপণ্ডিত ছিলেন। তখন কান্দীর ইস্কুল এ্যাংলো সংস্কৃত ইস্কুল ছিল। হেডমাষ্টার ও হেডপণ্ডিত প্রায় সমান বেতন পাইতেন। আমার এ বি সি শিক্ষা কান্দীর ইস্কুলেই হয়। আমরা প্রায় এক বৎসর কান্দীতে ছিলাম। তখন আমার বয়স ৯ বৎসর,......ইস্কুলে আসিয়া এ্যাডমিশন রেজিষ্টার দেখিলাম। তখন আমার নাম ছিল শরৎনাথ ভট্টাচার্য্য, সেই নামেই আমায় ভরতি হইতে হইয়াছিল। আমার ভাএরাও সেই দিনে ভরতি হইয়াছিলেন।...২রা জুলাই ১৯২৩। ("পুরাণ বাঙ্গালার একটা খণ্ড" : 'বঙ্গশ্রী,' মাঘ ১৩৪০)

নন্দকুমার কান্দীতে রাজযক্ষ্মায় আক্রান্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে কলিকাতায় আনাইয়া ডাঃ গুডীবের চিকিৎসাধীন রাখেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই,—১৮৬২ সনের নবেম্বর মাসে তাঁহার মৃত্যু হয় *

নন্দকুমারের কান্দী-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে হরপ্রসাদও নৈহাটী ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। অল্প দিনের ব্যবধানে রামকমল ও নন্দকুমারের মৃত্যুতে অভিভাবকহীন ভট্টাচার্য্য-পরিবারে অর্থকষ্ট উপস্থিত হয়। হরপ্রসাদ কিছু দিন কাঁটালপাড়ার টোলে (বয়স তখন ১১), কিছু দিন স্থানীয় স্কুলে পড়াশুনা করিবার পর ১৮৬৬ সনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীর ছাত্রাবাসে আশ্রয়লাভ করিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। এই সময় তিনি "হরপ্রসাদ" নামেই পরিচিত ছিলেন; একবার কঠিন পীড়ায় হরের প্রসাদে মুক্তিলাভ করায় 'শরৎনাথ' নামের পরিবর্ত্তে তাঁহার নামকরণ হয়—হরপ্রসাদ। কয়েক মাস পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্রাবাসটি উঠিয়া যাওয়ায় হরপ্রসাদ বৌবাজার নেবুতলা-নিবাসী গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় নামে এক সুবর্ণবণিকের ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। এখানে তিনি বাড়ীর ছেলেদের পড়াইতেন

* সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনাকালে নন্দকুমার (তখন 'তর্করত্ন'), জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের সহিত, এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে খণ্ডশঃ প্রকাশিত 'বৈশেষিকদর্শন' সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইহার প্রথম খণ্ডটি (Fas. I) উভয়ের সম্পাদনায় ১৮৬১, ৯ই জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। পরে জয়নারায়ণ একাকী সম্পাদক ছিলেন; নন্দকুমারের কান্দী-গমনই ইহার কারণ। আমি 'সংস্কৃত কলেজের ইতিহাসে' (পৃ. ১৪) লিখিয়াছি যে, স্বাস্থ্যহানিবশতঃ নন্দকুমার সম্পাদন-কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহা ঠিক নহে।

ও নিজে রাঁধিয়া খাইয়া বিদ্যালয়ে যাইতেন। এক কথায় দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের সহিত রীতিমত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইয়াছিল।

"তিনি সংস্কৃত কলেজে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিলেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে তাঁহার সমগ্র 'রঘুবংশ' মুখস্থ হইয়া যায়। এই শ্রেণীতে রামনারায়ণ তর্করত্ন 'রঘুবংশ' পড়াইতেন। এই রামনারায়ণই সুপ্রসিদ্ধ নাটুকে রামনারাণ। তাঁহার নিকটেই হরপ্রসাদ কাব্যের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিবার জ্ঞানলাভ করেন। এই শ্রেণী হইতেই এক শ্রেণী টপকাইয়া (ডবল প্রোমোশন লইয়া) ৪র্থ শ্রেণীতে উঠেন। এখানে 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ পড়েন।...এই শ্রেণীতে পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া ৮৲ টাকা বৃত্তি পান। আবার এখান হইতে ডিঙ্গাইয়া (পুনর্ব্বার ডবল প্রোমোশন লইয়া) ২য় শ্রেণীতে উঠেন।...শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেন—My school career is more brilliant than my college career." (শ্রীগণপতি সরকার: 'হরপ্রসাদ-জীবনী,' পৃ. ৯-১০)

হরপ্রসাদ অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি তিনি কিরূপ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, ইউনিভার্সিটি ক্যালেণ্ডার হইতে তাহার আভাস দিতেছি:—

ইং ১৮৭১ ... এনট্রান্স ... সংস্কৃত কলেজ।
১৮৭৩ ... এফ.এ. ... সংস্কৃত কলেজ ... ১৯শ স্থান।
১৮৭৬ ... বি.এ. ... প্রেসিডেন্সী কলেজ* ৮ম স্থান।
১৮৭৭ ... এম.এ. ... সংস্কৃত কলেজ ... একাই সংস্কৃতে ১ম বিভাগে।

হরপ্রসাদ এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে "শাস্ত্রী" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

* ১৮৭৫-৭৬ সনের শিক্ষা-বিষয়ক সরকারী রিপোর্টে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য আছে:—"The single student [from the Sanskrit College] who passed the B.A. examination is credited to the Presidency College where he was for the most part taught. He, however, won the highest "Sanskrit College graduate" scholarship of Rs 50 a month, the Laha scholarship of Rs. 25 a month, and the Radhakanta Deb Medal for standing first in Sanskrit at the B.A. examination."

বিবাহ

বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া হরপ্রসাদ সবেমাত্র সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিয়াছেন, এই সময়—১৮৭৮ সনের মার্চ মাসে কাটোয়ার সন্নিকট দেয়াসিন গ্রামের রায় কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা হেমন্তকুমারী দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। হরপ্রসাদের বিবাহিত জীবনের ফল—পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা। তাঁহার ৪র্থ পুত্র শ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-সংসারে নিতান্ত অপরিচিত নহেন। ১৯০৮ সনের জানুয়ারি মাসে তিনি বিপত্নীক হন। পত্নীর অন্তিমকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন না—এ দুঃখ তাঁহার চিরদিন ছিল।

চাকুরী—সরকারী ও বে-সরকারী

হরপ্রসাদ কলেজ হইতে বহির্গত হইবার অল্পদিন পরেই সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করেন।

হেয়ার স্কুল: ১৮৭৮ সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারি* তিনি হেয়ার স্কুলের ট্রানস্লেশন-মাষ্টার নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৮৮৩ সনের ২৪এ জানুয়ারি পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন।

লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজ: হেয়ার স্কুলে ছয় মাস কাজ করিবার পর হরপ্রসাদ বিনা-বেতনে ১৩ মাসের (১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৮—৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯* ছুটি লইয়া লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে একটিনি করিতে গিয়াছিলেন। বায়ু পরিবর্ত্তনই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল; তিনি কলিকাতায় প্রায়ই ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেন। তিনি পথিমধ্যে কর্ম্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলায় এক রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন:—

"১৮৭৮ সালে [কর্ম্মাটাঁড়] ষ্টেশনের পাশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক বাংলা ছিল;...আমি ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লক্ষ্ণৌ যাই। এখানে আমার সর্ব্বদা ম্যালেরিয়া জ্বর হইত; সেই জন্য লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের সংস্কৃত প্রফেসারের [রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর] একটিনি করিতে গিয়াছিলাম।...আমরা কর্ম্মাটাঁড়ে পৌঁছিয়া আমাদের মালপত্র ষ্টেশন মাষ্টারের জিম্মা করিয়া দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাংলায় গেলাম।...তিনটার পর

* *History of Services of Gazetted Officers*...Corrected July 1907 হইতে।

গাড়ী পৌঁছিয়াছিল ;—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গল্পগুজবে কাটিয়া গেল। তিনি আমার বাড়ীর প্রত্যেকের খবর নিলেন, আমিও তাঁহার অনেক খবর লইলাম। আমি লক্ষ্ণৌয়ে সংস্কৃত পড়াইতে যাইতেছি—এম. এ. ক্লাসেও পড়াইতে হইবে—বিশেষ হর্ষচরিতখানা পুরা পড়াইতে হইবে—শুনিয়া তিনি একটু ভাবিত হইলেন, বলিলেন—বইটা বড় কঠিন। তিনি নিজে আট ফর্ম্মা মাত্র ছাপাইয়াছিলেন এবং তাহা পূর্ব্বেই কলিকাতায় আমায় দিয়াছিলেন। বলিলেন—বাকীটা বড় গোল। আমি বলিলাম—রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলেন—ইহার সংস্কৃত বড় কাঁচা। তিনি বলিলেন—তাই ত, রাজকুমার এত বড় পণ্ডিত হইয়াছে, যে কাঁচাপাকা সংস্কৃত চিনিতে পারে? —যাহা হউক তিনি আমাকে হর্ষচরিত এবং অন্যান্য বই পড়াইবার কিছু কিছু কৌশল বলিয়া দিলেন, তাহাতে আমার বেশ উপকার হইয়াছিল।... [পরদিন] আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাহির হইলাম,...।"*

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ : ১৮৮৩ সনের জানুয়ারি মাসে রামনারায়ণ তর্করত্ন সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহার শূন্য পদে "হেয়ার স্কুলের ট্রান্সলেশন-মাষ্টার" হরপ্রসাদকে নিযুক্ত করিবার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন শিক্ষা বিভাগকে সুপারিশ করিয়াছিলেন। হরপ্রসাদের নিয়োগ সম্বন্ধে আমরা সংস্কৃত কলেজের নথিপত্রে পাই :—

> Asst. Professor of Rhetoric and Grammar (Class VI) at Rs. 100 per month. Transferred from the Hare School and joined in the forenoon of the 25th January 1883.

এই পদে হরপ্রসাদ পরবর্ত্তী ২৪এ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন।

অ্যাসিষ্টাণ্ট ট্রান্সলেটর : তিনি ১৮৮৩ সনের ২৫এ সেপ্টেম্বর হইতে সরকারী অনুবাদকের সহকারীর পদে যোগদান করেন।†

বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান : ১৮৮৬ সনের জানুয়ারি মাসে হরপ্রসাদ বেঙ্গল

---

* 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

† সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ২৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ তারিখে শিক্ষা-বিভাগকে লিখিয়াছিলেন :—"I have the honour to inform you that Pandit Hara Prasad Sastri M A. Asst. Professor of Sanskrit Rhetoric and Grammer. in this college, has left the college to join his new post as Assistant to the Bengali Translator to Government."

লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছলেন। জনশিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর সার্ আ্যালফ্রেড ক্রফ্ট তাঁহার উপরিওয়ালা ছিলেন; তিনি হরপ্রসাদের লিখিত বার্ষিক বিবরণগুলির বিশেষ প্রশংসা করিতেন। এই পদে হরপ্রসাদ নয় বৎসর—১৮৯৪ সন পর্য্যন্ত যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরির ১৮৯৩, অক্টোবর-ডিসেম্বরের ত্রৈমাসিক রিপোর্টেও বেঙ্গল লাইব্রেরিয়ান-হিসাবে তাঁহার নাম মুদ্রিত আছে; পরবর্ত্তী ত্রৈমাসিক রিপোর্টে তাঁহার নাম নাই, থাকিবার কথাও নহে।

প্রেসিডেন্সী কলেজ: ১৮৯৫ সনের ২৮এ ফেব্রুয়ারি* হরপ্রসাদ প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে তাঁহারই যত্ন-চেষ্টায় ১৮৯৬ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতে এম. এ. ক্লাস প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংস্কৃত কলেজ: জনশিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর আলেকজাণ্ডার পেড্‌লারের (Pedler) সুপারিশে গবর্মেণ্ট ১৯০০ সনের ৮ই ডিসেম্বর হইতে হরপ্রসাদকে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। এই পদের বেতন ছিল তিন শত টাকা। ১৯০৮ সনের অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত আট বৎসর সুনামের সহিত অধ্যক্ষের কাজ করিয়া হরপ্রসাদ সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতাকালে তিনি সংস্কৃতে এম. এ.-পাস-করা এক দল গবেষককে সংস্কৃতে গবেষণাকার্য্যে রীতিমত শিক্ষা দান করেন। ইঁহারা সকলেই পরে কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন।

১৯২৪ সনে সংস্কৃত কলেজের শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তাঁহার গুণমুগ্ধ জনেরা কলেজ গৃহে তাঁহার তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বঙ্গের গবর্নর লর্ড লিটন এই তৈল-চিত্র উন্মোচিত করেন।

বুরো অব ইনফর্মেশন: হরপ্রসাদ সরকারী কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও সরকার তাঁহাকে একেবারে ছাড়িলেন না; তাঁহারা হরপ্রসাদকে Bureau of Information for the benefit of Civil Officers in Bengal in history religion customs and folklore of Bengal

---

* *List of Services of Gazetted Officers* দ্রষ্টব্য। পুরুষনামা লেখকেরা ভুলক্রমে প্রেসিডেন্সী কলেজে হরপ্রসাদের নিয়োগকাল "ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার করিলেন। এই পদাধিকারে তিনি ১৯০৯ সন জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে মাসিক ১০০ বৃত্তি পাইতেন।

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে হরপ্রসাদ ইহার সংস্কৃত ও বাং বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিয়োগ-ব ১৮ জুন ১৯২১। এই পদে তিনি ১৯২৪ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত অধিষ্ঠি ছিলেন। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট্ (Honoris causa) উপা দানে সম্মানিত করিয়া "গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না" এই প্রবাদবাক্যের সার্থক প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহচর্য্যে

হরপ্রসাদের বাংলা রচনার সূত্রপাত সংস্কৃত কলেজে পাঠদশায়। তিনি যখন বি. এ. ক্লাসের ছাত্র, সেই সময়ে 'ভারতমহিলা' নামে প্রবন্ধ রচনা করিয়া হোলকার-পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। রচনাটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদ (১২৮২ মাঘ-চৈত্র; ইং ১৮৭৬) প্রকাশিত হয়। এই উপলক্ষেই সাহিত্য-সম্রাটের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় ঘটে। তাঁহার পৈতৃক বাসভবনের নিকটেই কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র তখন অবস্থান করিতেন। পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল। হরপ্রসাদের ভাষায়—"আমি শনিবারে বাড়ি আসিলেই, এইখানে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম। আমরা রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত ইতিহাস, সাহিত্য, পদ্য, গদ্য, নাটক, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজি, এই সকল লইয়া আলোচনা করিতাম।" পরবর্ত্তী কালে 'নারায়ণে' বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আলোচনাকালে হরপ্রসাদ বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার কথা এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন :—

"আঠার শ চুয়াত্তর সালে আমি সংস্কৃত কলেজে থার্ডইয়ারে পড়ি। মহারাজ হোলকার সংস্কৃত কলেজ দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিলেন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন। মহারাজ হোলকার একটি পুরস্কার দিয়া গেলেন। কেশববাবু বলিয়া দিলেন, সংস্কৃত কলেজের যে ছাত্র "On the highest ideal of woman's character as set forth in ancient Sanskrit writers" একটি 'এসে' লিখিতে পারিবে তাহাকে ঐ পুরস্কার দেওয়া হইবে। শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহা

আমায় ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমিও চেষ্টা কর।' কলেজের অনেক ছাত্রই চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৮৭৫ সালের প্রথমেই 'এসে' দাখিল করা হইল। পরীক্ষক হইলেন মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল। লিখিতে এক বৎসর লাগিয়াছিল, পরীক্ষা করিতেও এক বৎসরের বেশী লাগিয়াছিল। ছিয়াত্তর সালের প্রথমে আমি বি. এ. পাস করিলাম, উমেশবাবুও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ পাইলেন। প্রিন্সিপাল প্রসন্নবাবু মনে করিলেন সংস্কৃত কলেজের বেশ ভাল ফল হইয়াছে, সুতরাং তখনকার বাঙ্গলার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্যর রিচার্ড টেম্পলকে আনিয়া প্রাইজ দিলেন। সেই দিন শুনিলাম রচনার পুরস্কার আমিই পাইব। স্যর রিচার্ড আমাকে একখানি চেক দিলেন ও কতকগুলি বেশ মিষ্ট কথা বলিলেন।

আমার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক মহাশয়েরা যে রচনা ভাল বলিয়াছেন এবং গবর্ণর সাহেব যাহার জন্য আমায় এতগুলি মিষ্ট কথা বলিয়া গেলেন, সেইখানি ছাপাইয়া দিয়া আমি কেন না একজন গ্রন্থকার হই? তার পর ভাবিলাম এম. এ. ক্লাস পর্য্যন্ত ত একরকম স্কলারশিপেই চলিয়া যাইবে। তাহার পর হঠাৎ কিছু আর চাকরি পাওয়া যাইবে না। তখন প্রাইজের ঐ কটি টাকাই আমার ভরসা। অতএব বই ছাপাইয়া ঐ কটি টাকা খরচ করা হইবে না। এখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্রীযুত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম. এ., মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি সংস্কৃত কলেজের এম. এ. আমার উপর তাঁহার স্নেহদৃষ্টি থাকা সম্ভব, সুতরাং তিনি তাঁহার মাসিকপত্র আর্য্যদর্শনে আমার লেখাটি স্থান দিলেও দিতে পারেন। তাঁহার কাছে গেলে, খুব গম্ভীরভাবে, বেশ মুরুব্বিআনা চালে বলিলেন, "তুমি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, রচনা লিখিয়া তুমি পুরস্কার পাইয়াছ, আমার কাগজে উহা ছাপান উচিত। কিন্তু তুমি বাপু যে সকল 'ভিউ' দিয়াছ, আমার সঙ্গে ত মেলে না। আমূল পরিবর্ত্তন না করিলে আমার কাগজে উহা স্থান দিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "আমার ত মহাশয় নিজের কোন 'ভিউ' নাই। পুরাণ পুঁথিতে যা পাইয়াছি, তাই সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছি।" যাহা হোক তিনি উহা

ছাপাইতে রাজী হইলেন না। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, আপাততঃ গ্রন্থকার হইবার আশা ত্যাগ করিলাম।

তাহার পর একদিন চাঁপাতলার ছোট গোলদীঘীর ধার দিয়া বেড়াইতে যাইতেছি, শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত রাস্তায় দেখা হইল। তিনি ও তাঁহার দাদা বাবু রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বেশ জানিতেন, আমাকে বেশ স্নেহ করিতেন, কিন্তু আমি তিন চারি বৎসর কাল তাঁহাদের বাড়ী যাই নাই বা তাঁহাদের কাহারও সহিত দেখা করি নাই। তিনি সে জন্য আমাকে বেশ মৃদু তিরস্কার করিলেন এবং আমাকে অতি সত্বর তাঁহাদের বাড়ী যাইতে বলিলেন। আমি তাঁহাদের বাড়ী গেলেই এই তিন চারি বৎসর কি করিয়াছি তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রমে রচনাটির কথা উঠিলে তিনি সেটি দেখিতে চাহিলেন। আমি একদিন গিয়া তাঁহাকে উহা দেখাইয়া আসিলাম। তাহার পর তিনি আমায় একদিন বলিলেন, "তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে পারি।" আমি বলিলাম, "আর্য্যদর্শনে যাহা লয় নাই, বঙ্গদর্শনে তাহা লইবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।" তিনি বলিলেন, "সে ভাবনা তোমার নয়। তুমি রবিবারের দিন নৈহাটি ষ্টেশনে অপেক্ষা করিও, আমি সেই সময়ে সেখানে পৌঁছিব।" যথাসময়ে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া রেলের ভিতর দিয়াই বঙ্কিমবাবুর বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিলেন। পথে শুনিলেন যে তাঁরা চারি ভাই শ্যামাচরণ বাবুর বাড়ীতে বসিয়া গল্প করিতেছেন। তাদের বেড়া ডিঙ্গাইলেই শ্যামাচরণ বাবুর বাড়ীর দরজা। রাজকৃষ্ণবাবু বাড়ী ঢুকিলেন, তাঁহার সঙ্গে আমারও এই প্রথম প্রবেশ। রাজকৃষ্ণবাবুকে তাঁহারা খুব আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, আমিও বসিলাম। নানারূপ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। চার ভাইয়েরই নাম শুনা ছিল, আমি তাঁহাদের গল্পের মধ্যেই কোন্‌টি কে, চিনিয়া লইলাম। ক্রমে বঙ্কিমবাবুর দৃষ্টি আমার উপর পড়িল। তিনি রাজকৃষ্ণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটি কে?" তিনি বলিলেন, "এটির বাড়ী নৈহাটি, সংস্কৃত কলেজে পড়ে, এবার বি-এ. পাশ করিয়াছে।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্রাহ্মণ?" রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "হাঁ"। তখন তিনি আমায়

জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৈহাটি বাড়ী, ব্রাহ্মণের ছেলে, সংস্কৃত কলেজে পড়, বি. এ. পাশ করিয়াছ, আমাদের এখানে আস না কেন ?" আমি মৃদুস্বরে, বলিলাম, "সঞ্জীববাবুর ভয়ে।" তাঁহারা সকলেই ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঞ্জীববাবু বলিলেন, "আমার ভয় ? কেন ?" "শুনিয়াছি কামিনীগাছের ফুল ছিঁড়িলে আপনি নাকি মারেন।" হাসির মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "নৈহাটি ? তোমার বাবার নাম কি ?" আমি বলিলাম, "৺রামকমল ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়।" তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তুমি রামকমল ন্যায়রত্নের পুত্র, নন্দর ভাই, রাজকৃষ্ণ তোমাকে আমার নিকট আনিয়া আলাপ করাইয়া দিল ! তোমার দাদার সঙ্গে আমার ভারি ভাব ছিল। সে আমার একবয়সী ছিল। তার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধির লোক আর দেখা যায় না"—বলিয়া তিনি দাদার সম্বন্ধে নানা গল্প বলিতে লাগিলেন। দেখিলাম, দাদার উপর তাঁহার বেশ শ্রদ্ধা ছিল। এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "হরপ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে, উহার একটু কাজ আছে।" অমনি বঙ্কিমবাবু বেশ গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন "কি কাজ ?" রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, "ও একটি রচনা লিখিয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে একটি প্রাইজ পাইয়াছে, আপনাকে উহা বঙ্গদর্শনে ছাপাইয়া দিতে হইবে।" বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা চালে বলিলেন, "বাঙ্গলা লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ যারা সংস্কৃতওয়ালা, তারা ত নিশ্চয়ই 'নদনদী পর্ব্বত কন্দর' লিখিয়া বসিবে।" আমি বলিলাম, "আমার রচনার প্রথম পাতেই 'নদনদী পর্ব্বত কন্দর' আছে," বলিয়া খুলিয়া দেখাইয়া দিলাম এবং বলিলাম, "প্রথম চারিটি পাত ও সকলের শেষে আমি ঐ ভাবেই লিখিয়াছি, পরীক্ষককে জানিয়াই আমার ঐরূপ ভাবে লেখা, কিন্তু ভিতরে দেখিবেন অন্যরূপ।" তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "নন্দের ভাই বাঙ্গলা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।" আমি তিনটি পরিচ্ছেদ মাত্র লইয়া গিয়াছিলাম, এই কথা শুনিয়া, তাঁহাকে উহা দিয়া দিলাম। তাহার পর অনেক মিষ্টালাপের পর আমি বাড়ী গেলাম, রাজকৃষ্ণবাবু সেখানে রহিয়া গেলেন।…… …আমি আর একদিন বঙ্কিমবাবুর কাছে গেলাম। তিনি বসিয়া কি লিখিতেছিলেন।

আমায় দেখিয়াই বলিলেন, "তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে। তুমি এমন বাঙ্গলা লিখিতে শিখিলে কি করিয়া?" আমি বলিলাম, "আমি শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের চেলা।"* তিনি বলিলেন "ও:! তাই বটে! নহিলে সংস্কৃত কলেজ হইতে এমন বাঙ্গলা বাহির হইবে না।" সেই মুহূর্ত্ত হইতে বুঝিলাম যে বঙ্কিমবাবু মুরুব্বিআনা ভাবটা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। সেদিনকার মত গম্ভীর ভাব আর নাই। তিনি আমাকে একেবারে আপন করিয়া লইতে চাহেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ উহার বাকী আছে, সেগুলি আপনি একবার দেখিবেন কি?" তিনি বলিলেন "নিশ্চয়ই।" আমি আর একদিন তাঁহার কাছে বাকী অধ্যায় কয়টি লইয়া গেলাম। প্রথম তিন অধ্যায়ই স্মৃতি অথবা তাহার টীকা হইতে লওয়া কিন্তু বাকীগুলি সমস্তই পুরাণ অথবা কাব্য হইতে লওয়া। এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে যতগুলি স্ত্রীচরিত্র ছিল, সবগুলিরই সমালোচনা আছে। তিনি বেশ মন দিয়া পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া সেগুলি পড়িতে লাগিলেন। শেষে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি চলিবে কি?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "যাহা ছাপাইয়াছি সে রূপা, এসব কাঁচা সোণা।" বলিতে কি, সেদিন আমি ভারি খুসী হইয়া বাড়ী ফিরিলাম। তাহার পর যখন নৈহাটি হইতে কলিকাতা যাতায়াত করিতাম, তখন প্রায় প্রত্যহই তাঁহার কাছে যাইতাম। যখন কলিকাতায় বাসা থাকিত, তখন শনি-রবিবার বৈকালে তাঁহার কাছে যাইতাম।......

বঙ্গদর্শন তিন বৎসর নয় মাস বাহির হইয়াছিল। আমার ভারত-মহিলা লইয়া বাকী তিন মাস পূর্ণ হয়। চারি বৎসরের পর তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা ছাড়িয়া দেন। বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় আবার বাহির হয়। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কার্য্যতঃ বঙ্গদর্শনের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, তিনি নিজে ত

* হরপ্রসাদ যে সংস্কৃত-বিরল খাঁটি বাংলা লিখিতেন, তাহার মূলে সংস্কৃত কলেজের "লেকচারার" শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির প্রভাব বড় কম ছিল না। শ্যামাচরণ ১৮৬৭ সনের ১২ই আগষ্ট ১৫০৲ বেতনে সংস্কৃত কলেজের ইংরেজী বিভাগের "লেকচারার" নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ সনের 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত তাঁহার "Bengali Written and Spoken" প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক 'বঙ্গদর্শনে' (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৪) উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

লিখিতেনই, অন্য লোকের লেখা পছন্দ করিয়া দিতেন, অনেককে বঙ্গদর্শনে লিখিবার জন্য লওয়াইতেন, অনেকের লেখা সংশোধন করিয়া দিতেন। পূর্ব্বেও তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে যেমন চলিত, বঙ্গদর্শন এখনও তেমনি চলিতে লাগিল। নূতন বঙ্গদর্শনে নূতনের মধ্যে আমি, আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কখনও নাম সই করি নাই। সেই জন্য এখন সেই সকল লেখা যে আমার, তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে।

নূতন বঙ্গদর্শন বাহির হইবার প্রায় বছরখানেক পরে আমি লক্ষ্ণৌ যাত্রা করি এবং সেখানে এক বৎসর থাকি।...লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আমি কাঁটালপাড়ায় গিয়া দেখি বঙ্কিমবাবু সেখানে নাই; শুনিলাম তিনি চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন।...সেই দিনই বৈকালে চুঁচুড়ায় গেলাম...হঠাৎ আমাকে দেখিয়া তিনি খুব খুসী হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি ত চুঁচুড়ায় বাসা করিয়াছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু 'কৃষ্ণকান্ত' আছে?" তিনি বলিলেন, "তুমি ঠিক বুঝিয়াছ, আমি বড় খুসী হইলাম, তোমার কাছে আমার বেশী কৈফিয়ৎ দিতে হইল না।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "লক্ষ্ণৌ হইতে আমি বঙ্গদর্শনের জন্য যে কয়টি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম, পড়িয়াছেন কি?" তিনি বলিলেন, "তুমি যেটির কথা মনে করিয়া বলিতেছ, সেটি কোন জার্মান পণ্ডিতের লেখা বলিয়া মনে হয়।" আমি আর কিছু বলিলাম না। সে প্রবন্ধটির নাম "বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি" —অর্থাৎ তিন জন কবির বহি কলেজের ছাত্রেরা খুব আগ্রহের সহিত পড়ে, এবং এই তিন জন কবির কথা লইয়াই তাহারা আপনাদের 'চরিত্র গঠন করে'—সেই তিন জন কবি বাইরন্, কালিদাস ও বঙ্কিমচন্দ্র।" ('নারায়ণ', বৈশাখ ১৩২২)

১২৮২ সাল (ইং ১৮৭৬) হইতে ১২৯০ সাল (ইং ১৮৮৩) পর্য্যন্ত—প্রায় আট বৎসরের মধ্যে হরপ্রসাদের বহুবিধ রচনা 'বঙ্গদর্শনে' স্থান লাভ করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন:—

"তিনি আমাকে লিখিতে সর্ব্বদা উৎসাহ দিতেন। বঙ্কিমবাবুর উপর তখন আমার এরূপ টান যে, প্রতি মাসেই তাঁহাকে এক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিতাম। প্রবন্ধ লিখিয়া নাম করিব, এ মতলব আমার একেবারেই ছিল না, সে জন্য কখনও প্রবন্ধে নাম সহি করিতাম না।

একটা ইচ্ছা ছিল—হাত পাকাইব, আর এক ইচ্ছা—বঙ্কিমবাবুকে খুশী করিব। তিনি যদি কখন কোন প্রবন্ধের প্রশংসা করিতেন, তাহাতে হাতে স্বর্গ পাইতাম।" ('নারায়ণ,' আষাঢ় ১৩২৫)

শুধু বঙ্কিমচন্দ্রকে খুশী করিবার ও হাত পাকাইবার জন্য 'বঙ্গদর্শনে' প্রবন্ধ লিখিতেন, এইরূপ উক্তি করিয়া হরপ্রসাদ অত্যধিক বিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সেই বয়সেই স্বদেশ, সমাজ ও মাতৃভাষার উন্নতির জন্য চিন্তা করিতেন। তাঁহার চিন্তার প্রকৃতি মোটেই গতানুগতিক ছিল না; বরং অনেকগুলি প্রবন্ধকে বিদ্রোহাত্মক বলা যাইতে পারে। আজ সেই প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আমরা বিস্মিত হইয়া দেখিতেছি, হরপ্রসাদের কি অসাধারণ দূরদর্শিতা ছিল। আমাদের শিক্ষার গলদ সম্বন্ধে তিনিই সর্ব্বাগ্রে সচেতন হইয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাঁহার রচনাগুলির মধ্যে 'বাঙ্গালা সাহিত্য—বর্ত্তমান শতাব্দীর' (ফাল্গুন ১২৮৭) ও 'বাঙ্গালা ভাষা' (শ্রাবণ ১২৮৮) এইরূপ উল্লেখযোগ্য রচনা। 'কালেজী শিক্ষা' (ভাদ্র ১২৮৭) নামক আর একটি প্রবন্ধে তিনি যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার সত্যতা চিন্তাশীল শিক্ষাবিদেরা আজ উপলব্ধি করিতেছেন। মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত, এই মত তিনি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু পূর্ব্বে জোরের সহিত প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সমগ্র প্রবন্ধটি সর্ব্বত্র পুনঃপ্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা সামান্যই উদ্ধৃত করিতেছি:—

"যদি নিজ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেকটা সহজে হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন অতি দূরবর্ত্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটি মোটামুটি শিখিতে রোজ চারি ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আট দশ বৎসর লাগে। ভাষা শিক্ষাটা অথচ কিছুই নহে, ভাষাশিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিস শিখিবার উপায়—উহাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র—সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময়ব্যয় ও এত পরিশ্রম। তবুও কি সে ভাষা বুঝা যায়? তাহার যো কি। বাঙ্গালা হইলে এই কেতাবী জিনিসই আমরা কত অধিক পরিমাণে শিখিতাম। ইংরেজীতে আমরা কখন কথা কহি না। এখন আমরা ইংরেজীতে চিঠিপত্রও বড় লিখি না, অথচ আমাদের জ্ঞান-উপার্জ্জনের একমাত্র দ্বার ইংরেজী। ইংরেজী আমাদের রাজভাষা। যাহারা ইংরেজের সংসর্গে

আসিবেন তাঁহাদের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন। তাই বলিয়া ছয় কোটী ছয়ট্টি লক্ষ লোক ইংরেজী পড়িয়া মরিবে কেন? বলিবে, ইংরেজ যখন রাজা, সকলেই কোন না কোন সময়ে ইংরেজের সংসর্গে আসিবেন। স্বীকার। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কর ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরেজীতে অঙ্ক কসিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়া ইংরেজী শিখ না কেন? ইংরেজী দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন? আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরেজীমুখে শিখিতে হয়।

যেরূপ চলিতেছে ইহাতে জ্ঞান অল্প হয়, ইংরেজী শিক্ষা অল্প হয় আর পরিশ্রম অনন্ত করিতে হয়। আর শিক্ষিতদিগের সহিত অশিক্ষিতের মনোমিল থাকে না; শিক্ষিতগণ যেন একটি নূতন জাতি হইয়া দাঁড়ান। অত্যন্ত অধিক পরিমাণে শ্রম করিয়া অতি অল্প জ্ঞানলাভ হয়।

যাও বা শিখি তাহাও শিখিবার জন্য শিখি না; জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য শিখি না। শিখি একজামিন পাশ করিবার জন্য। আচ্ছা করিয়া পড়ি; যেমন প্রশ্ন দিক ঠকাইতে পারিবে না এজন্য পড়ি না, কেমন প্রশ্ন দিবে বাছিয়া বাছিয়া তাহাই পড়ি, অনেক সময়ে মাষ্টার মহাশয়েরাও তাহাই পড়ান। ইহার এক ফল এই যে যখন একজামিন নাই তখন পড়ি না, একজামিনের সময় রাত দিন পড়ি। লাভ এই হয় কতকগুলো গুরুপাক জিনিস উদরস্থ হয়, সব হজম হয় না। রাত জেগে যাহা পাঠ করা গেল, তাহা মাসখানেকের মধ্যে ভুলিয়া যাই।

অতএব লেখাপড়ার যে উদ্দেশ্য—মনোবৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি—তাহা একেবারেই হয় না। যে চিন্তাশক্তিবলে শিক্ষিতদিগের দ্বারা সমাজের উপকার হইবে তাহা হয় না। চিন্তা করিবার শক্তি নাই অথচ জ্ঞান আমি বড় বুঝি, ইহার অনেক দোষ, কলেজী শিক্ষায় সে দোষগুলি সমুদয়ই ঘটে। যদিও চিন্তাশক্তি দুই চারি জনের জন্মে তাহাও শূন্যের উপরে। যদি এরূপ হইত, তবে এইরূপ ফল হইত; কিন্তু চিন্তা abstract-এর উপর। যাহা আছে তাহার উপর নহে। যাহাই হউক, তবুও চিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হইলেই সেটি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা ত হয় না।

অতএব কালেজী শিক্ষায় চিন্তাশক্তি উত্তেজিত হয় না, উহা শুদ্ধ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য, এজন্য উহাতে জ্ঞান-অর্জ্জন হয় না। জ্ঞান-অর্জ্জন একটু আধটু হইলেও ইংরেজীমুখে অর্জ্জন করিতে হয় বলিয়া সেই একটুকুতেই অনেক শ্রম লাগে, যাহা শিখি তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তিও দুই পাঁচটির মাত্র চালনা হয়, হৃদয়বৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তির কিছুই হয় না। কোন একটি বিষয়ও সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা হয় না; অতএব উহা দ্বারা পরিণামে যে করিয়া খাইবে তাহাও হয় না। কালেজে না একমুখী শিক্ষা হয়, না সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা হয়।......

অতএব কালেজীশিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা নহে। প্রথম, কালেজে যাহা শিক্ষা হওয়া উচিত, তাহাই আমাদের কালেজে অল্প শিক্ষা হয়। সকল শাস্ত্রের কিছু কিছু পড়ান একেবারেই হয় না। কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম হয়। একজন কর্ত্তার খেয়াল হইল, জ্যামিতিবিদ্যা পড়ান আরম্ভ হইল, কিন্তু ভূগোলবিদ্যা উঠিয়া গেল। ভূগোল পড়িলে দেশীয় কুসংস্কার যত শীঘ্র অপনীত হয় এত আর কিছুতেই হয় না। সেই ভূগোল উঠিয়া গেল। আর একজন বলিলেন, ছয় বিষয়ে পরীক্ষা ছেলেরা পারিবে কেন? পাঁচ কর। আর একজন বলিলেন, পাঁচেও বেশী হয় তিন কর। সুতরাং সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হয় না। শুদ্ধ কেতাব পড়িয়া শিখিতে হইলে ছয়টা বিষয় শিখা কঠিন হয় বটে, কিন্তু যদি এক এক বিষয়ে উৎকৃষ্ট অধ্যাপকের নিকট সেই সেই বিষয় শিক্ষা হয় ও কতক দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে পারে তবে অনেক জিনিস অল্পে শিক্ষা হইতে পারে।

কালেজী শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইলে, উহার সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্য শিক্ষা চাই, সামাজিক শিক্ষা চাই। প্রাকৃটিকল শিক্ষা চাই, হাতে হাতিয়ারে অনেক কাজ করা চাই। ঠেকিয়া শিখা চাই, প্রোফেশন শিক্ষা চাই।

আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে আমাদের দেশীয় ভদ্রসন্তানগণ যে শিক্ষা পাইত, সে শিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা। কালেজী শিক্ষার সহিত তুলনা করিলে কেতাবী জিনিস তাহারা কিছুই শিখিত না। তাহারা না ভূগোল শিখিত, না ইতিহাস জানিত, না বিজ্ঞান জানিত, না গণিত জানিত। কেতাবী বিষয়ে তাহাদের শিক্ষা অল্প থাকিলেও তাহারা অন্যান্য সকল বিষয়ে অল্প পরিশ্রমে আমাদের অপেক্ষা অনেক

অধিক শিখিত। কেমন করিয়া নম্র বিনীত হইতে হয়, গুরুজনের প্রতি ভক্তি করিতে হয়, কেমন করিয়া অল্প সময়, শ্রম ও অর্থব্যয়ে সুন্দররূপে সংসার চালাইতে হয়, গৃহস্থালী করিতে হয়, তাহা সুন্দররূপে শিখিত। পিতার সহিত সে সর্ব্বত্র ফিরিত, সকল জিনিস দেখিত, সকল সমাজে যাইত, সে যেন জন্মিয়া অবধি মানুষ হইবার জন্য এপ্রিণ্টিস্ বা শিক্ষানবীশ থাকিত। এখনকার মত সংসার হইতে, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অরণ্যবাস করিতে হইত না। যদিও কেতাবী শিক্ষা অল্প হইত, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষিত লোকের সংসর্গে আসিয়া সে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আপনা আপনি শিখিত। মোটামুটি সে অনেক বিষয় জানিত। সেকালে জ্ঞানের উন্নতি ছিল না। জ্ঞানসীমা এত বর্দ্ধিত হয় নাই, সুতরাং প্রাচীনকালে অর্থাৎ সমাজের প্রথম অবস্থায় যেমন মোটামুটি বিদ্যা ছিল তখনও ঠিক তেমনি ছিল; আর সেই মোটামুটি জিনিস অধিকাংশ ভদ্রসন্তান জানিত ও শিখিত। এখনকার ছেলে যদি লেখা পড়া করিতে গেল অমনি বাপ মা বলিয়া বসেন "রাম আমার সংসারের কোন কাজই করিবে না, এ কর্ম্ম আমার রামকে করিতে দিও না, রামের সময় নষ্ট হবে।" রাম শুদ্ধ লেখা পড়া করিয়াই সময় কাটাইলেন। যখন কালেজ হইতে বাহির হইলেন, একটী গাছবানর বাহির হইলেন। যদি ভাল চাকরী পাইলেন, কি মেলা টাকা রোজগার করিলেন এক রকম চলিয়া গেল, নহিলে দাঁড়িয়ে সর্ব্বনাশ. সমাজে গেলেন যদি, যেখানে দশজন লোক আছে সেখানে গেলেন যদি, একপাশে বসিয়া রহিলেন। জানেন না কেমন করিয়া লোকের সঙ্গে মিশিতে হয়, মিশিতে পারিলেন না। লোকে জানিল রামাটা লেখা পড়া শিখিলে কি হয়, বড় অহঙ্কারী নর-লোকের সঙ্গে কথাই কহেন না। আমরা রামকে বেশ জানি, রামের অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই, শুদ্ধ শিক্ষার দোষে বেচারার নিন্দা হইল।"

হরপ্রসাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও মতামত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাবান্ হইয়াও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সাহিত্য-যশঃপ্রার্থী হরপ্রসাদের তরুণ চিত্তে মনীষী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব বড় কম ছিল না; তাঁহার চিন্তা ও রচনা-ভঙ্গীর ছাপ হরপ্রসাদের কোন কোন প্রাথমিক রচনায় পরিস্ফুট। পরবর্ত্তী কালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকালে সভাপতি হিসাবে

হরপ্রসাদ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি নিজেকে বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য-রূপে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই ; তিনি বলিয়াছিলেন :—"তিনি জীবনে আমার Friend Philosopher and Guide ছিলেন। তিনি এখন উপর হইতে দেখুন যে, তাঁহার এই শিষ্যটি এখনও তাঁহার একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত।" ('মাসিক বসুমতী,' ভাদ্র ১৩২৯)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ছন্দের মুক্তি

একদা বাংলা-ছন্দের বন্ধন-দশা দেখিয়া মহাকবি মধুসূদন দত্তের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল।—

"বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে,
মিত্রাক্ষর রূপ বেড়ি।"

তাই তিনি মিত্রাক্ষরের বেড়ি ঘুচাইয়া, স্বচ্ছন্দ-গতি অমিত্রাক্ষর-ছন্দের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অনেক পূর্বে অতি-প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গ-কবিরা বাংলা-ছন্দকে বন্ধন-মুক্ত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় প্রতি-অক্ষরের মাত্রা-পরিমাণ সুনির্দিষ্ট আছে। সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে 'অ, ই, উ, ঋ, ৯'—হ্রস্ব-স্বরগুলি একমাত্রার, 'আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ'—দীর্ঘ স্বরগুলি দুই মাত্রার, এবং হলন্ত ও যৌগিক স্বরযুক্ত অক্ষর দুই মাত্রার বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু বাংলা কবিতায় সেই আদি-যুগ হইতেই এই মাত্রার বন্ধন শিথিল হইতে থাকে, এবং ক্রমে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয় প্রকার স্বরান্ত অক্ষরই এক মাত্রার বলিয়া গণ্য হইতে থাকে হলন্ত অক্ষর কোন শব্দের আদিতে বা মধ্যে থাকিলে, তাহাও এক মাত্রার বলিয়া পরিমিত হয়। মাত্রা-পরিমাপের এই শৈথিল্য বাংলার প্রাচীনতম গীতি-কবিতা চর্যাপদগুলি হইতেই শুরু হইয়াছে। অবশ্য কোন কোন স্থলে সংস্কৃত রীতিও অব্যাহত রহিয়াছে। যথা—

"জো মঁন গোঅর / আলা জালা। ... ৮+৮
আগম পোথী / ইষ্টামালা।" ... ৮+৮

এই উদাহরণে সংস্কৃত মাত্রা-পরিমাপ-পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইহা পয়ার-ছন্দের একটি নিখুঁত দৃষ্টান্ত। ইহার প্রতি চরণ দুইটি ৮-মাত্রা-পদে সম-বিখণ্ডিত হইয়াছে। 'পয়ার' শব্দটি সম্ভবত 'পদাকার' শব্দ হইতে আসিয়াছে। এই ছন্দে প্রতি চরণ দুইটি সমান পদের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হয়। এই পয়ারের আর একটি দৃষ্টান্ত চর্যাপদ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"টালত মোর ঘর / নাহি পড়বেষী। ··· ৮+৮
হাড়ীত ভাত নাহি / নিতি আবেশী॥" ৮+৮

এখানে 'নাহি' শব্দের 'না' অক্ষরটি সংস্কৃত রীতি অনুসারে দুই মাত্রার হইলেও এক মাত্রার বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। চর্যাপদ হইতে আরও একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

"ধামার্থে চাটিল / সাঙ্কম গঢ়ই। ··· ৮+৮
পারগামি লোঅ / নীভর— তরই॥" ··· ৮+৮

ইহাতে 'আ' কোথাও এক মাত্রার, আবার কোথাও দুই মাত্রার এবং 'অ' ও 'ই' এক মাত্রার হইলেও দুই মাত্রার হইয়াছে। নিম্নে একটি আধুনিক কবিতার দুইটি চরণ উদ্ধৃত হইল।—

"শিশির-বিন্দুর ছলে / ঊষা দেবী কুতূহলে ··· ৮+৮
ফুল্ল নলিনীর ভালে / পরাইছে সাবধানে ··· ৮+৮
মুকুতার মালা।" ৬

এখানে বাংলা অক্ষরগুলি সংস্কৃতের মাত্রাপদ্ধতি হইতে বিমুক্ত হইয়াছে; হ্রস্ব ও দীর্ঘ এবং স্বরান্ত ও হলন্ত সকল অক্ষরই এক মাত্রার বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এইরূপে বঙ্গকবিতা মাত্রার বন্ধন হইতে অনেকটা মুক্তিলাভ অনেক কাল আগেই করিয়াছে।

মাত্রার মত পদের (বা পর্বের) বন্ধনও বাংলা-কবিতায় ক্রমে ক্রমে শিথিল-বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। পয়ারের প্রতি চরণকে দুইটি সম-পদে বিভাগ করিবার রীতি প্রচলিত থাকিলেও এই বিভাগ-পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট শৈথিল্য দৃষ্ট হয়।

বঙ্গের আদি মহাকবি কৃত্তিবাসের রামায়ণেও এই শৈথিল্য অনেক স্থলেই লক্ষ্য করা যায়। পয়ারের চরণকে তিনি কোথাও ১০+৬, কোথাও ৮+৭, আবার কোথাও ৮+৬ এইরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—

"পাকল চক্ষে রামের পানে / চাহিলেক বালি। ১০+৬
দন্ত কড়মড়ায় বীর / রামেরে পাড়ে গালি ॥" ৮+৭
"রাবণ-সন্তান বলি / দয়া না করিবে। ৮+৬
দয়াময় রামনামে / কলঙ্ক রহিবে ॥" ৮+৬

প্রাচীন বাংলা-কাব্যে পয়ারের এইরূপ শৈথিল্য বহু স্থানে মিলিবে। প্রতি চরণকে দুইটি পদে ভাগ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু মাত্রা-সমকত্বের দিকে আদৌ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। যথা—

(১) "প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে / মাথায় ধরে নারী। ১০+৭
সবে বলে পাগল পাগল / কত সৈতে পারি ॥" ১০+৬
(বিজয় গুপ্ত)

(২) "ভাগিনাবধূ গীত গায় / মামাশ্বশুর নাচে। ৯+৭
জামাইয়ে পাখোয়াজ বাজায় / শাশুড়ীর কাছে ॥" ১১+৬
(দ্বিজ বংশীদাস)

(৩) "লক্ষ্মীরূপা বেহুলা / লক্ষণ আছে ভাল। ... ৭+৭
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন / মুখ কৈল আলো ॥" ... ৮+৬
(ক্ষেমানন্দ)

তবে, এই সমস্ত শৈথিল্যের ভিতর দিয়াও পয়ারের চরণ-রচনায় একটা নিয়ম কালক্রমে দৃঢ় হইয়া উঠে। উহার প্রতি চরণে দুইটি পদ: প্রথম পদটি ৮ মাত্রার ও দ্বিতীয়টি ৬ মাত্রার। এইরূপ নির্দিষ্ট পয়ারের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হইতেছে কাশীরাম দাসের ভণিতা—

"মহাভারতের কথা / অমৃত সমান। ... ৮+৬
কাশীরাম দাস কহে / শুনে পুণ্যবান ॥" ... ৮+৬

কিন্তু এইরূপ সুমার্জিত পয়ার-ছন্দে কতকগুলি কঠিন বন্ধন দেখা দিল। ইহার প্রথম বন্ধন এই যে, ইহার দুইটি চরণ লইয়া একটি শ্লোক গঠিত হইবে এবং উহাদের অন্ত্য-মিল থাকিবে। ইহার দ্বিতীয় বন্ধন এই যে, ইহার এক-একটি চরণে একটি ভাব বা অর্থ পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবে, এবং ইহার তৃতীয়

বন্ধন এই যে, প্রতি পদে (বা পর্বে) একটি ভাবাংশ বা অর্থাংশ (phrase বা clause) পূর্ণ হইবে, এই কারণে পয়ারে যতি ও ছেদ পরস্পর মিলিয়া যায় এবং প্রতি চরণের অন্তে পূর্ণ বিরাম ঘটে। যথা—

"খড়্গ চর্ম লয়ে তবে* / রণ করে বীর * * //
তাহাতে কাটিয়ে সৈন্য * / কেহ নহে স্থির * * //
বড় বড় রথী মারে * / পর্ব্বতের চূড়া * * //
খান খান করে রথ * / হয়ে যায় গুঁড়া * * //
শত শত হস্তী মারে * / পর্বতের কায় * * //
পদাতি পাইক মারি * / ধরণী লোটায়" * * //

(কাশীরাম দাস)

পয়ারের এই দ্বিবিধ বন্ধন হইতে বাংলা কবিতাকে মাইকেল মধুসূদন মুক্তি দেন। তিনি প্রতি জোড়া চরণের শেষে মিল উঠাইয়া দেন। প্রতি পর্বে বা চরণের মধ্যেই কোন ভাবকে তিনি শেষ হইতে দেন নাই; উহা সবেগে চরণ হইতে চরণান্তরে গিয়া উপনীত হয় এবং বহু চরণ ব্যাপিয়া পরিপূর্ণতা লাভ করে। কোন ভাব যেখানে গিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেইখানেই ছেদ পড়ে; —এই ছেদ যতির অনুগামী হয় না। এই নব ছন্দে কয় মাত্রার পরে ছেদ পড়িবে, তাহার কোন নির্দিষ্টতা নাই—ভাবাবেগের তীব্রতা অনুসারে তাহা শীঘ্র বা বিলম্বে পড়ে। তবে, পয়ারের মত, প্রতি চরণে ১৪ মাত্রা থাকে, প্রথম ৮ মাত্রার পরে অর্ধ-যতি ও চরণ-শেষে পূর্ণ-যতি পড়ে; কিন্তু পূর্ণ যতিতে অর্থের পূর্ণতা না ঘটায়, ছন্দের গতি পরবর্তী চরণে গিয়াও উপনীত হয়। কখনও কখনও কতিপয় চরণ পার হইয়া তবে পূর্ণ বিরাম ঘটে। মধুসূদনের এই নূতন ছন্দ 'অমিত্রাক্ষর' নামে অভিহিত হয়। অমিত্রাক্ষর-ছন্দ এইরূপে পয়ারের যাবতীয় নিগড় হইতে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু কোনই বন্ধন না থাকিলে, ছন্দ-সৌষম্য ফুটিয়া উঠিতে পারে না। এই নিমিত্ত প্রতি চরণের নির্দিষ্ট মাত্রা-সংখ্যা এবং অর্ধ যতি ও পূর্ণ-যতির নিয়মিত অবস্থান এই ছন্দে অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। যথা—

"একাকিনী শোকাকুলা / অশোক কাননে //
কাঁদেন রাঘববাঞ্ছা * / আঁধার কুটীরে //

নীরবে। * * দুরন্ত চেড়ী / সীতারে ছাড়িয়া //
ফেরে দূরে, * মত্ত সবে / উৎসব-কৌতুকে।" * * //

(মেঘনাদবধ)

যাহা হউক, পয়ার ও অমিত্রাক্ষর এই উভয় জাতীয় ছন্দেই চরণগুলি পরস্পর সমান হইয়া থাকে, এবং এই চরণ-সমতা এই ছন্দদ্বয়ের বন্ধন-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। মধুসূদনের পরবর্তী বঙ্গীয় কবিবৃন্দের অনেকে এই চরণ-সমতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। তিনি চরণের সমতা ও পর্বের মাত্রা-পরিমাপ একেবারে উঠাইয়া দেন। তাঁহার এই অপূর্ব ছন্দ 'গৈরিশ ছন্দ' নামে অভিহিত হয়। ইহাতে প্রতি চরণে দুইটি করিয়া পর্ব থাকে, এবং ভাবের গাম্ভীর্য অনুসারে কোন পর্ব হ্রস্ব বা দীর্ঘ হইতে পারে। প্রত্যেক চরণই একটি পূর্ণ অর্থ-বিভাগ। একটি অর্থাংশ প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন চরণের অন্ত ঘটে না। এই কারণে, কোন চরণ ক্ষুদ্র, আবার কোনটি বৃহৎ হইয়া পড়ে। কোন চরণ অতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িলে, উহার কতকগুলি শব্দকে অতিরিক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় এবং চরণটির মাত্রা-পরিমাপের সময় ওইগুলিকে বাদ দেওয়া হয়। যথা,—

"গান্ধারী, নহি, বান্ধব তব	…	৬+৬
চাহ বুঝাইতে / (তোমা হতে) আমি বলাধিক।	…	৬+৬
ক্ষত্রিয় সমাজে / (কথা বটে) সম্মানসূচক,	…	৬+৬
ছল নহি আমি / —অতি ছল তুমি	…	৬+৬
মুক্তকণ্ঠে / করি হে স্বীকার।	…	৪+৬
ছলে চাহ / ভুলাইতে,	…	৪+৪
ছলে কহ / আশ্রিতে ত্যজিতে,	…	৪+৬
চতুরের / চূড়ামণি তুমি।"	…	৪+৬

—(পাণ্ডব-গৌরব)

গৈরিশ ছন্দে রচিত কোন কবিতার প্রায় প্রতি চরণ দুইটি সমান পর্বে বিভাগ করা যায় এবং ওই পর্ব দুইটি দৈর্ঘ্যে প্রায় অনুরূপ হইয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে ছন্দের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া কোথাও ছন্দের প্রবাহকে ক্ষিপ্রতর করা হয়। যথা—

"[কোথা তুমি] কীচকের / একমাত্র প্রাণ ! ... ৪+৬
ছার সূতের / নন্দন !— ... ৫+৩
পদাঘাতে, / পদাঘাত [হবে কিবা শোধ] ! ... ৪+৪
মৃত্যু [দেখি,] দয়াশীল / যুধিষ্ঠির হ'তে । ... ৬+৬
ক্ষুদ্র বক্ষ / ধরে দুঃশাসন,— ... ৪+৬
[বিদারি',] শোণিত-তৃষা / মিটিবে কি মোর ? ... ৫+৬
দুর্যোধন,—[হুতাশন] হুতাশন জ্বলে— ... ৪+৬
[ছার মুখে] ধর্মরাজে / নিন্দিল পামর ; ... ৪+৬
পদাঘাতে কিবা / হবে প্রতিশোধ !" ... ৬+৬

(পাণ্ডব-গৌরব)

কিন্তু একই কবিতায় এইরূপ বিভিন্ন পরিমাণের চরণ ব্যবহার করিলে, ছন্দের বন্ধন একেবারে লোপ পাইবার আশঙ্কায় স্তবকের (বা পদবন্ধের) সৃষ্টি হইল ও তদ্দ্বারা কবিতার চরণগুলিকে বিধৃত করা হইল। এই নবজাত পদবন্ধের দ্বারাই ছন্দ-সঙ্গতি রক্ষিত হয়। পয়ারাদি কবিতায় যেমন পংক্তিগত ছন্দ-ভাগ থাকে, পদবন্ধও তেমনই পদসমষ্টিগত এক-একটি বৃহত্তর ছন্দ-ভাগ; ইহাও পদের মত কবিতায় পুনরাবর্তিত হইয়া থাকে। (এখানে 'পদ' শব্দটি 'চরণ' অর্থে ব্যবহৃত হইল। যেমন, 'চতুর্দশপদী কবিতা'।) এইরূপ পুনরাবর্তনের ফলে সমগ্র কবিতাটিতে একটা অখণ্ড ছন্দঃপ্রবাহ বিচিত্রগতিতে বহিয়া যায়। যথা—

রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষার দিনে' কবিতার প্রথম দুইটি পদবন্ধ :

(১)

"এমন দিনে তারে / বলা যায়, ... ৭+৪
এমন ঘনঘোর / বরিষায়। ... ৭+৪
এমন মেঘস্বরে / বাদল ঝরঝরে ... ৭+৭
তপনহীন ঘন / তমসায় ॥ ... ৭+৪

(২)

সে-কথা শুনিবে না / কেহ আর, ... ৭+৪
নিভৃত নির্জন / চারিধার ! ... ৭+৪
দুজনে মুখোমুখী / গভীর দুখে দুখী ... ৭+৭

আকাশে জল ঝরে / অনিবার, ... ৭+৪
জগতে কেহ যেন / নাহি আর।" ... ৭+৪

এই পদবন্ধ বা স্তবক (stanza) আমাদের কবিতায় সম্পূর্ণ নূতন, প্রাচীন কবিতায় ইহার অস্তিত্ব ছিল না। এইরূপ স্তবকগঠনে কতিপয় ক্ষুদ্র বৃহৎ চরণকে নানা কৌশলে যোজনা করিয়া একটা কেন্দ্রগত সৌষম্য দান করা হয়। কোন স্তবকের পংক্তির আয়তন ও মিলের সংস্থান যতই বিচিত্র হয়, এই সঙ্গতি-সুষমা ততই গভীরতর হইয়া উঠে। এইরূপে স্তবকের দ্বারা কবিতা চরণের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছে, কিন্তু একেবারে ছন্দোহীন হয় নাই।

বাংলায় বিবিধ আকারের স্তবক দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্তবকে চরণগুলি পরস্পর সমান, কিন্তু অধিকাংশ কবিতাতেই উহারা সমান নহে। "অন্ততঃ তিনটি চরণ না হইলে পদবন্ধ রচনা হয় না।"* প্রাচীন যুগের ত্রিপদী বা পয়ারের এক জোড়া চরণকে একটি স্তবক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে, কিন্তু stanza বলিতে যাহা বুঝায়, সেই অর্থে উহাকে পদবন্ধ না বলিয়া শ্লোক বলিলেই ঠিক হয়। কারণ, ঐরূপ জোড়া বাঁধিয়া কোন শ্লোক সমগ্র কবিতার সাধারণ ছন্দে একটা স্বাতন্ত্র্য রচনা করিতে সক্ষম হয় নাই। "উৎকৃষ্ট পদবন্ধের লক্ষণ এই যে, তাহাতে নানাবিধ পংক্তি ও মিলের সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ ছন্দমণ্ডল সৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং প্রত্যেক পদবন্ধ এক-একটি ভাবকে যেন সম্পূর্ণ করিয়া শেষ পংক্তিতে বিরাম লাভ করে—যদিও সেই ভাবগুলি মূল কবিতারই অঙ্গ।"* একটি কবিতার মধ্যে যে এইরূপ কতিপয় পৃথক পৃথক ছন্দমণ্ডল রচিত হয়, তাহাতে কিন্তু সমগ্র কবিতার সাধারণ ছন্দ-প্রবাহে কোথাও কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় না,—যেমন, নদীর স্রোতে বহু আবর্ত থাকিলেও, জল-প্রবাহের গতি তাহাতে ব্যাহত হয় না। বরং নদীর জল যতই বাড়িয়া যায়, স্রোতের বেগ ততই বেশি হয়, আর সেই সঙ্গে বড় বড় ঘূর্ণাবর্তের উৎপত্তি হয় সেই বিশাল স্রোতের বক্ষে। এবং এই ঘূর্ণাবর্তমালার সমাবেশে সেই বিশাল বারিধিবক্ষ আরও গম্ভীর হইয়া উঠে। এই প্রকারের পদবন্ধ প্রাচীন বাংলা পদ্যে ছিল না; একটি কবিতার সর্বত্র একই ছন্দের একটা নিরবচ্ছিন্ন স্রোত বহিয়া চলিয়াছে—তাহাতে তরঙ্গ নাই, আবর্ত নাই, উচ্ছলতা নাই,—তাই, তাহাতে কল্লোলও নাই।

---

* শ্রীমোহিতলাল মজুমদার—'বাংলা কবিতার ছন্দ'।

"এ যুগের আদিতে, বা পুরাতন যুগের শেষে, কবি ঈশ্বর গুপ্তই বোধ হয় প্রথম একটি পদবন্ধযুক্ত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।"* কিন্তু গুপ্তকবির পদবন্ধ কেবল আকারে পদবন্ধ, তাহাতে পদবন্ধোচিত স্বাতন্ত্র্য নাই। যথা—

"দেহ হয় ক্ষীণ ক্রমে দেহ হয় ক্ষীণ।
কালের অধীন তুমি কালের অধীন॥
ভবে আর রবে কত কাল যত হয় গত,
নিকট হতেছে তত মরণের দিন।
কালের অধীন তুমি কালের অধীন॥"

(ঈশ্বর গুপ্ত)

পুরাতন পয়ার ও ত্রিপদী মিলাইয়া এই পদবন্ধটি রচিত হইয়াছে,—ইহার দ্বারা ছন্দের সুরে কোন নূতনত্ব জাগিয়া উঠে নাই। ইহার পরবর্তী পদবন্ধেও ওই এক ভাব ও এক সুর একটানা বহিয়া চলিয়াছে।

মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র প্রত্যেকটি কবিতা—একাধিক স্তবকে গঠিত। কিন্তু সকলগুলিতেই একই ভাব, একই সুর; কোন স্তবকই একটি বিশিষ্ট মণ্ডল হইয়া উঠে নাই। কোন কবিতার মূলভাব ও সাধারণ ছন্দকে অবলম্বন করিয়া উহার পদবন্ধগুলি এক-একটি নূতন ভাব ও ছন্দ-তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া উঠিবে, অথচ এই নব ভাবগুলি মূল ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে, এবং এই নূতন ছন্দ-তরঙ্গরাশি সাধারণ-ছন্দ-স্রোতে মিশিয়া যাইবে। অথবা কবিতাটি যদি হয় একগাছি সোনার হার, উহার স্তবকগুলি তবে হইবে এক-একটা বিশেষ ছন্দ-গ্রন্থি,—যে গ্রন্থিগুলিকে ডোর দিয়া কবিতার মালাটি গাঁথা হইয়াছে। ইহাই হইতেছে পদবন্ধের প্রধান বৈশিষ্ট্য। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যে'র কবিতাগুলির সকল স্তবকেই এই প্রধান বৈশিষ্ট্যের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তবে, তাঁহার কোন কোন কবিতায় পদবন্ধের কতকটা লক্ষণ দৃষ্ট হয়। সেগুলির মধ্যে ভাবের কোন ছেদ না থাকিলেও, ছন্দের গ্রন্থি আছে;—বিবিধ মাপের চরণ ও মিলন-স্থাপনের বিচিত্র কৌশল আছে। এই গুণে উহারা স্তবকের স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। যথা—

"রে প্রমত্ত মন মম! কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?

---

* শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কতদিন রবে ?
নীরবিন্দু দূর্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলঝলে ?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?"

(আত্ম-বিলাপ)

এই পদবন্ধটি আকারে একটি ষট্‌ক বা ছয়-চরণের স্তবক। ইহাতে হ্রস্ব ও দীর্ঘ উভয়বিধ চরণের সংযোজনা আছে। প্রথম চারিটি পংক্তিতে একান্তর মিল ঘটিয়া একটি চতুষ্ক রচিত হইয়াছে। পঞ্চম পংক্তিতে পদ-মধ্য মিল থাকায়, একটা ছন্দ-হিল্লোল ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। ষষ্ঠ পংক্তির অন্তে প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির মিল ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং তাহার ফলে স্তবকটির সুন্দর সমাপ্তি ঘটিয়াছে।

মধুসূদনের পরে হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবিবৃন্দ পদবন্ধযুক্ত বহু কবিতা ও কাব্য রচনা করেন। কিন্তু মধুসূদনের অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্ব কেহই দেখাইতে পারেন নাই। পরে কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনীতে সর্বাঙ্গসুন্দর স্তবকের বিকাশ ঘটিতে থাকে ও বাংলা ভাষায় গীতি-কবিতার পথ উন্মুক্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার 'পূরবী'-কাব্য হইতে "লীলা-সঙ্গিনী" নামক কবিতার একটি স্তবক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"নদী-কূলে কূলে / কল্লোল তুলে	...	৬+৬
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে।	...	৮
বনপথে আসি / করিতে উদাসী	...	৬+৬
কেতকীর রেণু মেখে।	...	৮
বর্ষাশেষের / গগন কোণায় / কোণায়,	...	৬+৬+৩
সন্ধ্যামেঘের / পুঞ্জ সোনায় / সোনায়,	...	৬+৬+৩
নির্জন ক্ষণে / কখন অন্য / মনায়	...	৬+৬+৩
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।	...	৮
কখনও হাসিতে / কখনও বাঁশিতে	...	৬+৬
গিয়েছিলে ডেকে ডেকে॥"	...	৮

এই পদবন্ধের "পংক্তিগুলি আরম্ভ হইয়াছে—১২ ও ৮ মাত্রায়; গঠনে, আয়তনে ও পংক্তিসজ্জায়···ইহার ছন্দ-সঙ্গীত চরমে উঠিয়াছে—ঘন ঘন মধ্য-

মিল, এবং মাঝের তিন পংক্তির মাত্রা-বৃদ্ধি, যেন ভাবাবেশে কণ্ঠ আর বাধা মানিতেছে না !···পদশেষের মিলগুলি প্রায় স্তবক-মিলের মত, তাহাতে ভাবের উদ্দীপনা ও অধীরতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।"* শেষের পংক্তিটি দ্বিতীয় পংক্তির সহিত মিল রাখিয়া সমগ্র স্তবকটিকে সহজেই সম্বদ্ধ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করিয়া অক্ষয়কুমার বড়াল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কাজী নজরুল ইস্‌লাম প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর স্তবক-যুক্ত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে নজরুল ইস্‌লাম স্তবক গঠনে আশ্চর্য কৌশল দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'অগ্নি-বীণা' কাব্যের "বিদ্রোহী" নামক কবিতার স্তবকগুলি অতীব প্রশংসনীয়। ভাবের তীব্রতা-অনুসারে উহার প্রত্যেকটি স্তবক একটা বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে ; কোনটি বৃহৎ, কোনটি ক্ষুদ্র, কোনটিতে ভাবের প্রাবল্যে ও ছন্দ-প্রবাহের অতি-বেগে অতিশয় দীর্ঘ চরণ স্বতই গড়িয়া উঠিয়াছে। কোথাও খণ্ড-পর্ব-সমাবেশের দ্বারা ছন্দের গতিকে ক্ষিপ্রতর করা হইয়াছে। এই কবিতার কোন স্তবকই উহার অন্য কোন স্তবকের যথাযথ অনুকরণ নহে, অথচ সকলগুলির মধ্যে একটা সাদৃশ্যও রহিয়াছে। প্রথম স্তবকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"(বল)—বীর ···২
(বল)—উন্নত মম/শির ···৬+২
(শির)—নেহারি আমারি,/নত-শির ওই/শিখর হিমা/দ্রির ৬+৬+৬+২
(বল)—বীর ···২
(বল)—মহাবিশ্বের/মহাকাশ ফাড়ি' ···৬+৬
চন্দ্র সূর্য/গ্রহ তারা ছাড়ি' ···৬+৬
ভূলোক দ্যুলোক/গোলক ভেদিয়া, ··৬+৬
খোদার আসন/'আরশ' ছেদিয়া ··৬+৬
উঠিয়াছি চির/বিস্ময় আমি/বিশ্ব-বিধা/ত্রীর ! ···৬+৬+৬+২
(মম)—ললাটে রুদ্র/ভগবান জ্বলে/রাজ-রাজটীকা/দীপ্ত জয়/শ্রীর !" ···
৬+৬+৬+৬+২

এই স্তবকটির পূর্বে আর যে-সকল স্তবক আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি, সেগুলির প্রতি [illegible] লক্ষ্য করিলে, সহজেই দৃষ্ট হইবে যে, প্রত্যেকটি স্তবক একটা

* মোহিতলাল মজুমদার।

নির্দিষ্ট আদর্শে (pattern) গঠিত হইয়াছে, এবং যে স্তবকটি যে কবিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে, সেই কবিতার অন্য স্তবকগুলিও সেই আদর্শে গঠিত। কিন্তু "বিদ্রোহী" কবিতার স্তবকগুলি কোন একটি বিশেষ আদর্শে গঠিত হয় নাই, কোন স্তবকের সহিত কোন স্তবকের সর্বাংশে সাদৃশ্য নাই। ইহার স্তবকগুলি যেন স্বাধীনভাবে স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। কাজেই, স্তবক-রচনায় মধ্যে যে একটি আদর্শের বন্ধন থাকে, সেই বন্ধন হইতে এই স্তবকগুলি মুক্তিলাভ করিয়াছে। "বিদ্রোহী" কবিতার আর একটি স্তবক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"আমি মৃণ্ময়,/আমি চিন্ময়, ...৬+৬
(আমি)—অজর অমর/অক্ষয়, আমি/অব্যয় ...৬+৬+৪
(আমি)—মানব-দানব/দেবতার ভয়, ..৬+৬
বিশ্বের আমি/চির-দুর্জয়, ..৬+৬
জগদীশ্বর/ঈশ্বর আমি/পুরুষোত্তম/সত্য, ..৬+৬+৬+৩
(আমি)—তাথিয়া তাথিয়া/মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল/মর্ত্য। ৬+৬+৬
+৩
(আমি)—উন্মাদ আমি/উন্মাদ! ৬+৪
(আমি)—চিনেছি আমারে,/আজিকে আমার/খুলিয়া গিয়াছে/সব বাঁধ।"
৬+৬+৬+৪

প্রথম পদবন্ধটির পংক্তিগুলি যেভাবে সজ্জিত হইয়াছে, এই পদবন্ধের পংক্তিগুলি ঠিক সেইভাবে সজ্জিত হয় নাই। তবে, স্তবকদ্বয়ের মধ্যে একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়,—উহাদের হ্রস্ব বা দীর্ঘ সকল চরণগুলিই ৬ মাত্রা পর্বের সমবায়ে গঠিত হইয়াছে এবং কোন কোন চরণে খণ্ডপর্ব যুক্ত হইয়াছে। কাজেই, একমাত্র সমমাত্রিক পর্বের ব্যবহার ছাড়া, আর কোন বন্ধন "বিদ্রোহী" কবিতায় নাই।

সুপ্রচলিত অনেক কবিতার ছন্দেই পর্বের মাত্রা, চরণের দৈর্ঘ্য ও স্তবক-গঠনের সূত্র—এই তিন দিক দিয়া ঐক্যবন্ধন থাকে। কিন্তু সব দিক দিয়া ঐক্য না থাকিলেও চলে, এক দিকে ঐক্য থাকিলেই যথেষ্ট। আধুনিক যুগের অনেক কবিতাতেই লক্ষ্য করা যায় যে, স্তবকে একই মাত্রার পর্ব ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু প্রতি চরণের পর্বের সংখ্যা ও প্রতি স্তবকের গঠন-রীতি একরূপ নহে। নিম্নে একটি অতি-আধুনিক কবিতার একটা স্তবক উদ্ধৃত হইল।—

"উত্তর আকাশের/পারো ছিল	...	৮+৪
নীল পর্দার গায়ে/গাঢ় নীল।	...	৮+৪
নীলে নীলে দিগন্ত/ঢাকল—	...	৮+৩
আমার চোখের বিলে /	...	৮+০
স্বচ্ছ নীলের ছায়া/রাখল"	...	৮+৩

['নীল পাহাড়'—পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য]

ইহাতে প্রত্যেক চরণের প্রথমে একটি ৮ মাত্রার পর্ব আছে এবং শেষে একটি করিয়া ৩ বা ৪ মাত্রার খণ্ডপর্ব আছে, কোনটাতে খণ্ডপর্বটি ফাঁক রহিয়াছে। কাজেই, এই কবিতার ছন্দে শুধুমাত্র এক দিক দিয়া ঐক্য বজায় আছে। নিম্নে রবীন্দ্রনাথের "হঠাৎ দেখা" নামক কবিতার প্রথম পদবন্ধটি উদ্ধৃত হইল।—

"রেলগাড়ির কামরায় / হঠাৎ দেখা,	...	৯+৫
ভাবি নি সম্ভব হবে / কোন দিন।	...	৯+৪
(আগে)—ওকে বার বার দেখেছি	...	৯
লাল রঙের সাড়িতে	...	৮
দালিমফুলের মতো / রাঙা;	...	৮+২
(আজ পরেছে)—কালো রেশমের কাপড়,	...	৯
আঁচল তুলেছে মাথায়,	...	৯
দোলনচাঁপার মতো / চিকনগৌর মুখখানি / ঘিরে।"		৮+৯+২

এখানে ৮ মাত্রা ও ৯ মাত্রা—এই দ্বিবিধ পর্বের সংমিশ্রণে পদবন্ধটি গঠিত হইয়াছে, তবে ৯ মাত্রার পর্বই বেশি। ৫, ৪ অথবা ২ মাত্রার খণ্ডপর্ব কোন কোন চরণে যুক্ত হইয়াছে। এখানেও কেবল পর্বের মাত্রার দিক দিয়া ঐক্য আছে, কিন্তু তাহাও শিথিল। রবীন্দ্রনাথের রচিত আর একটি কবিতার প্রথম স্তবক নিম্নে লিখিত হইল। ইহাতে দেখা যাইবে, এই পর্বগত মাত্রা-বন্ধন আরও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।—

"আজ আমার প্রণতি / গ্রহণ করো, পৃথিবী,	...	৮+৮
শেষ নমস্কারে অবনত / দিনাবসানের বেদীতলে,	...	১০+১০
মহাবীর্যবতী, / তুমি বীরভোগ্যা,	...	৭+৬
বিপরীত তুমি / ললিতে কঠোরে,	...	৬+৬

মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি / পুরুষে নারীতে ... ৯+৬

মানুষের জীবন / দোলায়িত করো তুমি / দুঃসহ দ্বন্দ্বে।" ৭+৮+৬

এখানে কোন চরণই কোন চরণের সমান নহে, পর্বগুলিও বিভিন্ন আকারের; কিন্তু উহাদের মধ্যে বেশি পার্থক্য নাই,—পরস্পর অনেকটা অনুরূপ। ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ মাত্রার বিচিত্র পর্বমালা লইয়া পদবন্ধটি রচিত। প্রথম পাঁচটি চরণ দুই পর্বে বিভক্ত এবং ষষ্ঠ চরণটি ভাবের আতিশয্যে তিন পর্ব পর্যন্ত গড়াইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, প্রায় সকল চরণগুলিই দুই পর্বের সংযোগে গঠিত। এই দিক দিয়াও কিছুটা ঐক্য আছে। দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ চরণে অন্ত্যমিল দিয়া চরণগুলিকে যেন বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' হইতে কতিপয় পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"এখানে নামলো সন্ধ্যা— ... ৮

(সূর্যদেব), কোন্ দেশে / কোন্ সমুদ্র পারে / তোমার প্রভাত হলো ?

... ৪+৭+৮

অন্ধকারে (এখানে) / কেঁপে উঠছে / রজনীগন্ধা ৪+৫+৫

বাসরঘরের / দ্বারের কাছে / অবগুণ্ঠিত। / নববধূর মতো... ৬+৫+৫+৭

কোন্‌খানে (ফুটলো) / ভোরবেলাকার / কনক-চাঁপা ?... ৪+৬+৫

জাগ্‌লো কে ? ... ৫

নিবিয়ে দিলো / সন্ধ্যায় জ্বালানো দীপ ... ৫+৮

ফেলে দিলো / রাত্রে গাঁথা / সেঁউতি ফুলের মালা।" ... ৪+৪+৮

এখানে পর্ব, চরণ ও চরণসমূহের সমাবেশ—কোন কিছুতেই কোন রকম মিল নাই। ইহা পদ্য হইলেও, গদ্যের অনুরূপ। এই জন্য এইরূপ ছন্দকে অনেকে 'গদ্য-ছন্দ' বলিয়া থাকেন। ইহাতে এক-একটি ভাব বা অর্থের সম্পূর্ণতা লইয়া এক-একটি চরণ শেষ হইয়াছে, এবং অর্থানুসারে কোনটি দীর্ঘ বা হ্রস্ব হইয়া পড়িয়াছে। কোন চরণান্তর্গত অর্থের এক-একটি অর্থ বিভাগ লইয়া সেই চরণটি কতিপয় পর্বে বিভক্ত হইয়াছে। এই পর্বগুলি ধ্বনিপ্রবাহের উত্থান-পতন অনুসারে গঠিত হয় নাই। যেখানে কোন অর্থাংশ (phrase বা clause) শেষ হইয়াছে, সেইখানেই যতি বা ছেদ পড়িয়াছে। গদ্যের ন্যায় ইহাতে ছেদ ও যতি মিলিয়া গিয়াছে। গদ্যভাষায় একটি বাক্য শেষ হইয়া গেলে, দাঁড়ি দিয়া, আর একটি বাক্য সেই পংক্তিতে লেখা হয়; কিন্তু গদ্য-ছন্দে

এক-একটি বাক্য এক-একটি পংক্তিতে লেখা হয়। এতদ্ব্যতীত গদ্য রচনার সহিত এই জাতীয় পদ্যের বিশেষ পার্থক্য নাই। অতএব এই গদ্য-জাতীয় পদ্যের ছন্দকে মুক্ত-ছন্দ বলা যাইতে পারে। বর্তমান কালের অনেক কবিতা এইরূপ গদ্য-ছন্দে রচিত ;—ইহাদিগকে পদ্য না বলিয়া, গদ্য বলিলে, খুব দোষের হইবে না ;—কারণ পদ্যের মধ্যে যে ছন্দের বন্ধন থাকে, তাহা হইতে ইহারা মুক্তি লাভ করিয়াছে। নীচে, একজন বর্তমান কবির একটা কবিতা হইতে কিয়দংশ লিখিত হইল।—

"তোমাদের পৃথিবীর ব্যস্ত আঙিনায়
অনেক ভুল, অনেক মিথ্যা, অনেক অন্যায়
তোমাদেরে মন থেকে তাই করি ঘৃণা ভয়,
আর বার বার থেকে থেকে মনে হয় :
তোমাদের পৃথিবী থেকে দূরে কোথায়ও সরে পড়ি
সেখানে একটা নিজের জন্য মনের মতন পৃথিবী গড়ি।"

এখানে প্রতি জোড়া চরণের অন্ত্যে মিল আছে, তাই ইহাকে পদ্য বলিয়া মনে হয়, নতুবা ইহার ভাষা ও ধ্বনিপ্রবাহ একেবারে গদ্যের মত। গদ্য-পদ্যের জাতিগত ভেদ ক্রমশই উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার ঘোষ

রামমোহন রায় ও কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সদ্য উদ্‌যাপিত সপাদশতাব্দী "জয়ন্তী" উৎসব পঞ্চাহব্যাপী নানাবিধ সভাসমিতি দ্বারা মৃতপ্রায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-সমাজের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উক্ত কলেজের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) এতদুপলক্ষে প্রকাশিত করিয়া স্থানীয় সরকার এক দিকে উৎসবের একটি স্থায়ী ফল অর্পণ করিয়াছেন এবং অপর দিকে "নিরুপাধি" ঐতিহাসিক-প্রবরের সমুচিত মর্যাদা করিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। এই মূল্যবান গ্রন্থ সম্বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়া সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সদস্যগণের হস্তে অর্পিত হইলে অনেক উপকার হইত এবং হয়তো ঐ পরিষদের প্রস্তাবাবলী গঠনে কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিত। ব্রজেন্দ্রনাথের প্রভূত পরিশ্রমকৃত

সতর্ক রচনার মধ্যে কোনপ্রকার ত্রুটি ধরা অসাধ্য—আমরা প্রযত্ন করিয়াও কিছু পাইলাম না।* কেবল দুই-একটি পরিপূরক যোজনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছি। কলেজের অধ্যাপকবর্গ "সকলেই" (পৃ. ৮) খ্যাতনামা ছিলেন না। মুগ্ধবোধের দ্বিতীয় পণ্ডিত রামদাস সিদ্ধান্তপঞ্চানন ("সিদ্ধান্ততর্কপঞ্চানন" নিতান্ত অপ্রচলিত উপাধি—পৃ. ৬, ১০—বোধ হয় ছাপার ভুল) সম্বন্ধে Price সাহেব লিখিয়াছিলেন (১।৭।১৮২৪ তারিখের পত্রে)—"his acquirements qualify him for more elementary tuition." বস্তুত: কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানেই "সর্বত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধমমধ্যমা:" কথার ব্যতিক্রম দেখা যাইত না—বিদ্যালয়েও গুপ্তদ্বার দিয়া এমন অযোগ্য লোক প্রবেশ করিত (দুঃখের বিষয় এখনও করিতেছে) যাহাদের সম্বন্ধে সেকালের উচিত বক্তা কবিচন্দ্রের উক্তি ("বড়লোকসহায়ো যঃ স এব বড়পণ্ডিতঃ") চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মুগ্ধবোধের প্রধান পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণ পাশ্চাত্য বৈদিক বংশীয় ছিলেন এবং যশোহর, বারইখালীর পণ্ডিত রামশম্ভু তর্কচূড়ামণির শ্যালক ও ছাত্র ছিলেন (কবিরাজ গঙ্গাধর কৃত "বহুবিবাহরাহিত্যনির্ণয়", উত্তরখণ্ড, পৃ. ৩৮)। জয়নারায়ণের জন্ম "আনুমানিক ৮০৫ সনে" নহে (পৃ. ২৮), ঠিক ১৮০৬ সনের এপ্রিল মাসে, নতুবা পেন্‌সনসংক্রান্ত বিবরণে ১০ আগস্ট ১৮৬৯ তারিখে তাঁহার বয়স "৬৩ বৎসর, ৪ মাস" (পৃ. ৩১) হয় না। বলা বাহুল্য বাঙ্গালী তখনও "বয়স চুরি" করার ব্যবসায় অবলম্বন করে নাই। জয়নারায়ণের ন্যায়গুরু "অতিসুবিখ্যাত" জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত বর্ধমান-সাতগেছে নিবাসী নব্যন্যায়ের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পত্রিকাকার দুলাল তর্কবাগীশের (১১৩৮-১২২২ সন) ছাত্র ছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। জয়নারায়ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মধুসূদনও জগন্মোহনের ছাত্র ছিলেন। Capt. Marshall সরকারের নির্দেশে কাশী সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করিয়া ৩ মে ১৮৪১ তারিখে এক মূল্যবান বিবরণী প্রদান করেন (General Rep., 1840 42, App. xiii, pp. xcv cxi)—পরিদর্শনকালে জয়নারায়ণ সহযোগিতা করিয়া উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন

* গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যক্ষ মহোদয় স্থানে স্থানে যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে ইতিহাসটির মুখহানি ঘটিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। বিদ্যাসাগরের আসনে বসিয়া যাঁহার লেখনী হইতে 'ক'রে,' 'হয়েছেন', 'হ'তে' প্রভৃতি বাহির হয় তাঁহার মাত্রাজ্ঞান প্রশংসনীয় নহে।

("for whose learning, zeal and discretion I derived the greatest advantage", p. c)। জ্যোতিষের অধ্যাপক যোগধ্যান মিশ্র ৮ মার্চ ১৮৩৯ তারিখে Law Commission on Slavery-এর নিকট সাক্ষ্যদান করিয়াছিলেন—তাঁহার আত্মপরিচয় এই :—My family belongs to Lahore, but I am a native of Benares......I have been a resident in Calcutta 18 years." (Slavery Report, Jan. 1841, App. 1, p. 54)। কলেজের কতিপয় সেক্রেটরীর সম্বন্ধে প্রেমচন্দ্রের চমৎকার শ্লোকটি উদ্ধারযোগ্য :—

> চ্যুতদলে "কমলে" জড়তাকুলে ব্রজতি "মারশলে" চ মধুব্রতে।
> বিধি-বশাদধুনা "মধুনা-দৃতঃ" "রসময়ঃ" সময়ঃ সমুপাযযৌ॥

আমরা বাহুল্যবোধে এজাতীয় তথ্যকণা অধিক প্রকাশ করিলাম না। কলেজের তৎকালীন ছাত্রদের একটি বিবরণী-গ্রন্থ সাবধানে রচিত হইয়া প্রকাশিত হইলে এই ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ হয়।

কলিকাতার চতুষ্পাঠী

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্বাহ্নে রামমোহন রায় বড়লাটের নিকট দীর্ঘ পত্র লিখিয়া তীব্র ভাষায় যে প্রতিবাদ করেন তাহা এবং তদুপরি ইংরাজ রাজতন্ত্রের ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্য সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই পড়িয়া দেখা উচিত। তাহা আলোচনা করার পূর্বে আমরা ঐ সময়কার কলিকাতা-স্থিত চতুষ্পাঠী-সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথাযথ প্রদান করিতেছি। ১৮১১ সনে শ্রীরামপুরের বিখ্যাত পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হিন্দু সম্বন্ধীয় সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে পশ্চিম-বঙ্গের বহুসংখ্যক টোবাড়ির অস্তিত্ব উল্লেখ করিতে গিয়া যথাক্রমে সাতটি প্রধান স্থানের নাম প্রকাশ করেন—ত্রিবেণী, নদীয়া, কুমারহট্ট, মহলা, বালী, গুপ্তিপাড়া, শান্তিপুর প্রভৃতি (১ম খণ্ড, পৃ. ২০০)। এস্থলে কেবল কলিকাতা নহে, ভট্টপল্লীও প্রভৃতির অন্তর্গত হইয়াছে। ২য় সংস্করণে ১৮১৭ সনে কাশী, নদীয়া ও কলিকাতার অধ্যাপকদের বিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৪২৩-৪ দ্রষ্টব্য)। কলিকাতার তালিকাটি সাড়ম্বরে টুকিয়া (কোথা হইতে অবশ্য উল্লেখ নাই) জনৈক "সত্যদর্শী" লেখক অনুমান করিয়াছেন "উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে নদীয়া ছাড়াও কলিকাতায় সংগীত-(? সংস্কৃত)-চর্চার একটি বড় কেন্দ্র ছিল"

('মাসিক বসুমতী,' আষাঢ় ১৩৫৫, পৃ. ২৬২)। "ভারতীয় রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ" বলিয়া প্রত্যক্ষদর্শী ভারতচন্দ্র যে স্থানের গুণগান করিয়াছেন, সেই নদীয়ার ভারতব্যাপী কীর্তিকাহিনী উদ্ধার করা তো দূরের কথা জ্ঞানপূর্ব্বক অন্যায়ভাবে ক্ষুণ্ণ করাই সত্যদর্শীর ন্যায় শিক্ষিত লোকের গৌরবাত্মক কার্য্য বলিয়া মনে হয়। ওয়ার্ড প্রদত্ত নদীয়ার তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে, দিগ্দর্শন মাত্র; কারণ তিনি নিজেই অন্যত্র লিখিয়াছেন (1822 Ed., Vol. II, p. 226) যে, নদীয়ায় ন্যায়ের টোলের সংখ্যাই ছিল 'অন্যূন ৫০-৬০'। তালিকায় ৩১টি টোলে ভারতের দিগ্‌দিগন্ত হইতে আগত উপাধিলিপ্সু চরমপর্য্যায়ের ছাত্র-সংখ্যা ছিল ৭৪৭; আর কলিকাতার ২৮টি টোলের মোট ছাত্র-সংখ্যা হইল মাত্র ১৭৩, তন্মধ্যে একটিও চরমপর্য্যায়ের ছিল কিনা সন্দেহ। লক্ষ্য করিতে হইবে, নদীয়ার 'প্রধান' নৈয়ায়িক শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতির একটিমাত্র টোলেই ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২৫। ওয়ার্ড প্রদত্ত কলিকাতার তালিকাটিও সম্পূর্ণ নহে—অনবধানতাবশতঃ তন্মধ্যে কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধ্যাপক রঘুমণি বিদ্যাভূষণের চতুষ্পাঠীর নাম বাদ পড়িয়াছে। তাহার অবস্থানাদিবিষয়ক একটি মূল্যবান্ পত্র উদ্ধৃত হইল :—

শ্রীনবাব-হেসাব্-জঙ্ বাহাদুরমহাশয়েষু।

নিবেদনঞ্চ শ্রীকালীপ্রসাদস্যা গ্রজন্মনঃ।

শ্রীমন্নবাবসাহেবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া "নবাব দেলওয়ারজঙ্গ) বাহাদুরের" আমলে তাঁহার অনুমতিক্রমে চিতপুরমোকামে টোল চৌপাড়ি করিয়া আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺রঘুমণি বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেকদেশস্থ বিদ্যার্থিলোককে বিদ্যাদানপূর্ব্বক কাল যাপন করিয়াছেন (।) পরে তাঁহার ফৌত হওনের পর ছয় সাত বৎসর পর্য্যন্ত আমিও ঐ নবাবসাহেবের আমল অবধি ঐ টোল চৌপাড়িতে অধ্যাপনাপূর্ব্বক নবাবসাহেবের অনুগ্রহে নিরুদ্বেগে আছি (।) এইক্ষণে নবাবসাহেব কর্ত্তা হইয়া নানাপ্রকার খোসনাম করিতেছেন ইহাতে বড় অহ্লাদিত হইয়া বিশেষাশীর্ব্বাদ করিতেছি আপনকার অভিলাস পূর্ণ হবেক। চৌপাড়ির জায়গার কিঞ্চিৎ করসম্পর্ক আছে ইহাতে লজ্জিত আছি (।) জ্ঞান হয় পূর্ব্বাবধি ইহা নবাব সাহেবের জ্ঞাতসার না হইয়া থাকিবেক। যদ্যপি অন্নবিষয় দিতে অসমর্থ নহি তথাপি ধর্ম্মাবতারের অধিকারে দুরস্থ পণ্ডিতেরদিগের পাঠশালায় করসম্পর্ক হওনের বিষয় নহে এপ্রযুক্ত জ্ঞাতসার করিলাম যেমত হুকুম হয় তাহাতেই আমার ভাল হবেক।

পত্রটি ১২০১ সনে লিখিত বলিয়া প্রমাণ আছে। কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের পোষ্টা দেলওয়ার জঙ্গ সুপ্রসিদ্ধ রেজা খাঁ মুজফরজঙ্গের পুত্র "চিতপুরের নবাব" নামে খ্যাত ছিলেন। ২৮ বৎসর কলিকাতায় যাপন করিয়া তিনি অনুমতি লইয়া মুরসিদাবাদ গমন করেন ('সমাচারদর্পণ,' ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০) এবং সেখানে ১৯ নবেম্বর ১৮২০ তারিখে দেহত্যাগ করেন (ঐ, ১৩ ডিসেম্বর ১৮২০)। রঘুমণির টোলে স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যবহারকাণ্ড বিশেষভাবে পড়ানো হইত; রামজয় তর্কালঙ্কার, বিশ্বনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি অনেকে তাঁহার ছাত্র ছিলেন। ১৭৭৪ সনে সুপ্রীম্ কোর্টে প্রথম বেতনভুক্ পণ্ডিত নিযুক্ত হন এবং তদবধি কলিকাতার ন্যায় অপণ্ডিতের স্থানও ক্রমশঃ পণ্ডিত সমাগম দ্বারা অর্ধশতাব্দী মধ্যে ছোটখাট এক সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্রে পরিণত হয়। শাস্ত্রমতে রাজার জাতিবিচার নাই, ম্লেচ্ছ রাজতন্ত্রের আহ্বানে নবদ্বীপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত অশীতিপর বৃদ্ধ গোপাল ন্যায়ালঙ্কারও কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া হিন্দু আইনের গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ওয়ার্ডের তালিকাস্থিত অনেকেরই পরিচয় আমরা জানি—ম্লেচ্ছ রাজধানীতে প্রাচীন আদর্শে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যেও তাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার করিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত "সত্যদর্শী" মহাশয় চতুষ্পাঠী ও তাহার পৃষ্ঠপোষকদের সম্বন্ধে নূতন আবিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন (পৃ. ২৬৩)—"এইসব পণ্ডিত ও টোল-চতুষ্পাঠীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ইংরেজ আমলের প্রথম যুগের হঠাৎ-ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা, ইংরেজদের দেওয়ান, মুন্শী, বেনিয়ান ও দালালরা এবং তাঁদের বংশধরেরা।...সখের যাত্রা, বুলবুলি ও হাফ-আখড়াইয়ের দলের মতো ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে এ-দেশে এই সব সখের টোল-চতুষ্পাঠীও অনেক গজিয়ে উঠেছিল, কবিওয়ালাদের মতো পণ্ডিতেরাও হঠাৎ-বড়লোকদের তথাকথিত আভিজাত্যের খোরাক জোগাচ্ছিলেন।" স্বাধীন ভারতে বিলুপ্যমান খ্রীষ্টান পাদ্রী প্রভৃতি বিধর্ম্মীর উগ্র সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিষদাঁত আহরণ করিয়া "সত্যদর্শী" এস্থলে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকৃত পূজারী ও পরিরক্ষকগণের বিষয়ে যে ধিক্কারজনক বিদ্রূপোক্তি ও অসত্যভাষণ করিয়াছেন তাহাই বোধ হয় প্রগতির লক্ষণ। ইংরাজশাসনে ভারতের সর্ব্বত্র এবং বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার ঘোরতর অবনতি ঘটিয়াছে, ইহার ভূরিভূরি প্রমাণ সরকারী রিপোর্টে পর্য্যন্ত

পাওয়া যায় (লর্ড মিণ্টোর মিনিট প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। ইহার প্রতীকারকল্পেই সংস্কৃত কলেজের উৎপত্তি; অর্থাৎ "সত্যদর্শীর" ভাষায় একটা বড় রকমের "সপের" চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া ইংরাজ ভারতীয়দের দৃষ্টিতে আভিজাত্য লাভ করিল।

রামমোহন রায়ের যুক্তি

এই কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রামমোহন রায় যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেকটি প্রণিধানযোগ্য এবং তাঁহার অপূর্ব্ব দেশভক্তি ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করিতেছি।

(১) তাঁহার আশা ছিল, ইউরোপের জাতিসমূহ যে সকল জনহিতকর শাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ বিধান করিয়া জগতের অপরাপর দেশবাসিগণের উপরে উঠিয়াছে—গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা প্রভৃতি—শিক্ষিত প্রতিভাশালী ইউরোপীয় অধ্যাপক দ্বারা ভারতীয়দের সে সকল শাস্ত্রে শিক্ষা দেওয়া হইবে। (২-৪ অনুচ্ছেদ) ধূর্ত্ত ইংরাজ বণিক তাহার নবলব্ধ প্রভুত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া মহাত্মা রামমোহনের বিনয়মণ্ডিত সুদৃঢ় উক্তি গ্রাহ্য করেন নাই—উচিতবক্তাকে উদ্ধত ভাষায় অপমান করিয়া নিরস্ত করেন। ১৮৩৫ সনে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানতঃ সামরিক বিভাগের অঙ্গরূপে এবং এ যাবৎ যত সাহেব ডাক্তার বিলাত হইতে আমদানী হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে প্রতিভাশালী প্রথম শ্রেণীর কেহ ছিলেন না বলিলেই চলে। দেশবাসীর বিজ্ঞানস্পৃহা "ক্ষেত্রতত্ত্বদীপিকা", এনাটোমীর সংস্কৃত অনুবাদ প্রভৃতি গ্রন্থ দ্বারা মিটাইতে চেষ্টা হইয়াছিল। লক্ষ্য করিতে হইবে ইহঃপূর্ব্বে যে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাতে গণিত ভিন্ন কোন বিজ্ঞানশাস্ত্রের শিক্ষা হইত না। হিন্দুকলেজ স্থাপনকালে ইউরোপীয় শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তনে ("substitution of European tution" ইতিহাস, পৃ. ৭১) কোন বাধা মানা হয় নাই। কারণ, তদ্দ্বারা হিন্দু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচরণই বোধ হয় গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ৭১৭ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মূলকষ্টকারী বিজ্ঞানচর্চা কিছুতেই প্রবর্ত্তিত করা চলে না, ইহাই কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব ছিল বলিয়া মনে হয়।

(২) দেশের তৎকালীন সংস্কৃত শিক্ষাবিষয়ে প্রকৃত তথ্যজ্ঞাপন ("accurate information") মহাত্মা রামমোহন এই ভাবে করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, হিন্দু পণ্ডিতের অধীনে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ব্যাকরণের ফক্কিকা ও দর্শনের সূক্ষ্মবিচার মাত্র ছাত্রদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিবে, যাহা ব্যক্তি বা সমাজের কোন কাজেই লাগে না। ১২ বৎসর ধরিয়া ব্যাকরণ পড়া, কিংবা পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসা-শাস্ত্রের আত্মতত্ত্ব, মায়াবাদ ও বৈধহিংসার নিরর্থক বিচারশিক্ষা, অথবা ন্যায়শাস্ত্রের পদার্থবিভাগ ও সম্বন্ধতত্ত্ব আয়ত্ত করা চিত্তবৃত্তির কোন প্রকার উৎকর্ষবিধায়ক তো নহেই, কেবল অজ্ঞানান্ধকারে দেশকে আবৃত করিয়া রাখার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া বিবেচিত হইবে। ভারতীয় রাষ্ট্রচেতনার উন্মেষসূচক এই বিশ্লেষণ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের উজ্জ্বল প্রতিভা যে চিরন্তন প্রণালীতে প্রবহমান ছিল তাহা রাষ্ট্রচেতনার অত্যন্ত বিরোধী—আদি রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা রামমোহন কঠোর ভাষায় ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার দীর্ঘ পত্রের এই প্রধান মন্তব্য উইলসন্ প্রমুখ ইংরাজ প্রভুর চিত্তে যে গূঢ় ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল, রামমোহনের প্রতি তাঁহাদের প্রযুক্ত রূঢ় ভাষাতেই তাহা ধরা পড়ে। সার্ উইলিয়াম্ জোন্সের ন্যায় মহান্ ব্যক্তির হৃদয়কন্দরেও তমসাচ্ছন্ন ভারতবাসীর উপর চিরকালই প্রভুত্ব করার হীনস্পৃহা কিরূপ জাগরূক ছিল, নিম্নোদ্ধৃত সন্দর্ভ হইতে তাহা বুঝা যাইবে।—

(From the 10th discourse to the Society in 1793)

In these Indian territories, which Providence has thrown into the arms of Britain for their protection and welfare, the religion, manners and laws of the natives preclude even the idea of political freedom ; but their histories may possibly suggest hints for their prosperity, while our country derives essential benefit from the diligence of a placid and submissive people, who multiply with such increase, even after the ravages of famine, that, in one collectorship out of twenty-four, and that by no means the largest or best cultivated (I mean Crishna-nagur), there have lately been found by an actual enumeration, a million and three hundred thousand native inhabitants : whence it should seem, that in all India, there cannot now be fewer than

thirty millions of black British subjects. (Memoirs of the Life of Sir William Jones by Lord Teignmouth, 1804, pp. 389 90.)

জীবনীকার অন্যত্র (pp. 364-5) স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, জোন্সের আন্তরিক কামনা ছিল যেন হিন্দুরা "পবিত্র" খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হয় এবং সে বিষয়ে অন্তরায়সমূহ তাঁহার মর্মপীড়া উৎপাদন করিয়াছিল। তাঁহার "লক্ষ্মীস্তোত্রে" হিন্দুদের ভ্রান্তচিত্ত, বিভ্রান্তকর ধর্মগ্রন্থ ও কূট যাজনায় উচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনা আছে :—

Oh ! bid the patient Hindu rise and live,
His erring mind, that wizzard lore beguiles,
Clouded by priestly wiles,
To senseless nature bows, for nature's God.

তৎকালীন পণ্ডিতদের সততার উপর তাঁহার ব্যাপক কটাক্ষও লক্ষ্য করার বিষয় :—

I can no longer bear to be at the mercy of our pundits, who deal out Hindu law as they please, and make it at reasonable rates, when they cannot find it ready made. (ib. p 264 : letter dated Sept. 28, 1785 to C Chapman.)

"কালা আদমী"র এই হর্তাকর্তা মহাত্মার স্মৃতিরক্ষার্থে আজ স্বাধীন হইয়াও আমরা সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতে ব্যস্ত। অথচ যাঁহার আইনগ্রন্থানুসারে দীর্ঘকাল হিন্দুদের বিচার নিষ্পত্তি হইয়াছিল, যাঁহার তুল্য মহাপণ্ডিত ২০০।৩০০ বৎসর মধ্যে এদেশে জন্মেন নাই, এবং একাদিক্রমে ৯০ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া যিনি পৃথিবীর সারস্বত ইতিহাসে অপরাজেয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন, সেই (জোন্সের ভাষায়) Venerable Sage of Tribeni জগন্নাথের স্মৃতিরক্ষা তো দূরের কথা, তাঁহাকে অম্লানবদনে সখের কবিওয়ালার পর্যায়ে ফেলিয়া আমরা সংস্কৃতির পূজা করিতেছি।

দ্বিতীয়তঃ, রামমোহনের মতে, সংস্কৃতভাষা এত দুরূহ যে ইহার সম্যকজ্ঞান লাভ করিতে প্রায় একজীবন লাগিয়া যায় এবং শিক্ষার বাহনরূপে ইহা জ্ঞান প্রসারের সহায়ক না হইয়া অত্যন্ত পরিপন্থী হইয়া পড়ে। চতুষ্পাঠীর তৎকালীন

উচ্চশিক্ষাপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করিলে ইহা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় না এবং প্রাচীনকালের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর আদর্শ তখনও লুপ্ত হয় নাই বুঝা যায়। নবদ্বীপগৌরব শঙ্কর তর্কবাগীশের সময়ে নবদ্বীপের ছাত্রদের সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাটিতে এ বিষয়ে বিস্ময়কর প্রমাণ পাওয়া যায়।—

The students that come from distant parts are generally of a maturity in years and proficiency in learning, to qualify them for beginning the study of philosophy, immeditately on their admission; but yet they say, that to become a real pundit a man sought to spend twenty years at Nuddea in close application. Thus in the east, as well the west, the fruit of the tree of knowledge, costs the high price of *Viginti annorun lucubrationes* (*Calcutta Monthly Register* for Jan. 1791. Cited in Cal. Review, July 1855, pp. 114-5)

তৃতীয়তঃ, সংস্কৃতে যে মূল্যবান তত্ত্বসমূহ সঞ্চিত আছে, তাহার পরিরক্ষণার্থ নূতন বিদ্যালয় স্থাপন না করিয়া নানাস্থানে যে বহুতর অধ্যাপক নিজব্যয়ে নানাবিষয়ে শিক্ষাদান করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে উত্তম বাছিয়া সমুচিত পুরস্কার ও বৃত্তিদান করিলেই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। রামমোহনের ৫০ বৎসর পরে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী বঙ্গদেশ হইতে লোপ পাওয়ার উপক্রম হইলে মহেশ ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রধানতঃ এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়া তাহাদের পুনর্জীবন দান করিয়াছিলেন। চতুষ্পাঠীসমূহ একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক ইহা শ্যাম বিদ্যালঙ্কারের দৌহিত্রের অভিপ্রেত ছিল না।

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলাফল

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের সপাদশতাব্দী পরিপূর্তিকালে স্বাধীনতার সুপ্রভাতে আজ আমরা দেশের প্রকৃত মঙ্গলার্থী শিক্ষানেতাদের নিকট বিনীত প্রার্থনা জানাই, তাঁহারা ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখুন কলেজটি দ্বারা দূরদর্শী মহামনীষী রামমোহনের যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হইয়াছে, না সারবত্তা। এ বিষয়ে কতিপয় তথ্য আমরা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

(১) কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নবদ্বীপই পূর্ব্বভারতে সংস্কৃত শিক্ষার একটি চরম গুরুস্থানরূপে পরিগণিত ছিল—ভারতের দিগ্দিগন্ত হইতে যাতায়াতের অবর্ণনীয় কষ্ট উল্লঙ্ঘন করিয়াও শতসংখ্য পাণ্ডবয়স্ক শিক্ষার্থী

নবদ্বীপে সমাগত হইত। কলেজ স্থাপনার পর হইতে নবদ্বীপের এই বিশ্ব-বিখ্যাত বিদ্যাপীঠের অবনতি খরতরগতিতে ঘটিয়াছে। ১৮২৯ সনে যেখানে ২৫টি টোলে ৫০০-৬০০ ছাত্র ছিল (উইল্‌সনের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য), সেখানে ১৮৬৪ সনে ১২টি টোলে ছাত্রসংখ্যা হইল ১৪৫ (কাওয়েলের রিপোর্ট) এবং ১৮৬৭ সনে ১৫টি টোলে ছাত্রসংখ্যা হইল ২০৯ (তন্মধ্যে অল্পপাঠী ব্যাকরণ-পাঠার্থীর "আখড়া" ছিল দুইটি)। মহেশ ন্যায়রত্নের শুভ পরিকল্পনা দ্বারাও (১৮৯১ সনে) নবদ্বীপের কিছুমাত্র উন্নতি ঘটে নাই। এই ত গেল "ভারতীয় রাজধানী"র অবস্থা। অন্যত্র আরও শোচনীয় অবস্থা—রাজসাহী জিলার অন্তর্গত নাটোর মহকুমায় ১৮৩৫ সনে ৩৮টি টোলে ৩৯২ ছাত্র ছিল (Adam's Report)। তৎস্থলে ১৮৬৫ সনে সমগ্র রাজসাহী, রংপুর ও দিনাজপুর জিলায় মিলাইয়া টোলসংখ্যা হইল ২৯ ও ছাত্রসংখ্যা হইল ২৩২ মাত্র (General Report for 1865-66, pp. 445-7)! পলাশির যুদ্ধের পূর্ব্বে যে দেশে সমাজের পরিচালক ছিল তপোবিদ্যাসম্পন্ন চরিত্রবান পাণ্ডিতশ্রেণী, সে দেশে দুর্নীতিপরায়ণ ধনিকশ্রেণী ও চাকুরিয়ার দল পুষ্ট করিয়া সমাজবিপ্লব সৃষ্টি করাই ইংরাজের স্বার্থ। এই স্বার্থের প্রেরণায়ই নবদ্বীপ ও মিথিলায় কলেজ স্থাপন না করিয়া কলিকাতা রাজধানীতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বয়ং উইল্‌সন সাহেব তখন নবগঠিত শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক, রামমোহনের পত্র অগ্রাহ্য করা প্রধানতঃ তাঁহার দ্বারাই সম্ভবতঃ হইয়াছিল। পণ্ডিতসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার যতই মৌখিক সহানুভূতি থাকুক না কেন, স্যর্ উইলিয়াম জোন্‌সের ন্যায় তাঁহারও হৃদগত ভাব অন্যবিধ ছিল বলিয়া মনে হয়। সুবিখ্যাত রঘুমণি বিদ্যাভূষণ "শব্দমুক্তামহার্ণব" নামে এক বিরাট অভিধান রচনা করেন; উইল্‌সন সাহেব ইহার অনুবাদ করিয়া মুখবন্ধে সদ্যঃপরলোকগত রঘুমণির কেবল ভ্রমপ্রমাদের কথাই চতুর্ম্মুখে ব্যক্ত করিয়াছিলেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৫১, পৃ. ২৬-৭)।

(২) কলেজে ছাত্রসংখ্যা প্রথম ছিল ৮০ (তন্মধ্যে ৫০ জন "বেতনভুক্") এবং সম্বৎসর মধ্যে বাড়িয়া হইল ১২৫—অধিকাংশই কাব্য ও ব্যাকরণের ছাত্র। স্মরণ রাখিতে হইবে, নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িকের একটিমাত্র টোলেই ভারতের নানা স্থান হইতে আগত প্রবীণ ছাত্রের সংখ্যা তৎকালে শতাধিক ছিল এবং সমগ্র বঙ্গদেশে টোলের সংখ্যা এক সহস্রের ন্যূন ছিল না। তাঁহাদের

পরিপোষণ কিংবা রক্ষার কিছুমাত্র ব্যবস্থা না করিয়া বিপুল ব্যয়ে একটিমাত্র সরকারী টোল প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস্তবে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরোধী দুইটি অদৃষ্টপূর্ব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল, বেতনভোগী "ভৃতকাধ্যাপক" এবং অনধিক ১২ বৎসর মধ্যে "সর্বশাস্ত্রজ্ঞ" ছাত্র। ফলে একশাস্ত্রনিষ্ঠ বিশেষজ্ঞের পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি পল্লবগ্রাহী চাকুরীজীবী কলেজীয় পণ্ডিত দ্বারা শাস্ত্ররক্ষা হওয়া তো দূরের কথা, সংস্কৃতশিক্ষায় বাঙালীর গুরুগৌরব চিরতরে বিনাশ করার পথ উন্মুক্ত হইল।

(৫) জনকোলাহলময় রাজধানী জ্ঞানপিপাসুর একাগ্রতার পরিপন্থী, ইহাও সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের নগণ্যতার একটি কারণ। এ বিষয়ে Friend of India হইতে কতিপয় উল্লেখযোগ্য পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল:—

"Neither can it be averred with any truth that the instruction imparted in the Govt. college has been superior in degree and in extent to that communicated in the indigenous schools. A reference to Adam's Report will at once shew the ample range of study which the mud-walled cloisters embrace : not to speak of the additions which the Pundits, who sustain them by their reputation, have made by new treatises to Sungskrit literature. It is a fact which no man will deny that the Pundits of the Govt. college in Calcutta, though they enjoy a desrvedly high reputation, are not the first scholars in the country ; and that their students are not among the most renowned for their acquisitions. (Friend of India, Vol. IV, p. 324, of date 21-6-1838)

ইহা কলেজ প্রতিষ্ঠার ১৪।১৫ বৎসর পরের কথা। কলেজের এই প্রথম স্বর্ণযুগে প্রেমচন্দ্র, তারানাথ, মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র প্রমুখ প্রতিভাশালী ছাত্রের সমাগমও দেশীয় চতুষ্পাঠীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। মুগ্ধবোধের অষ্টম শ্রেণীর আবশ্যকতা হইতে বুঝা যায়, পরে কি জাতীয় ছাত্র কলেজে ভিড় করিয়াছিল। কলেজে ১৮৪১ সনে কৃতী ছাত্রদের মাসিক

১৫৲ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইলে ওই পত্রে প্রতিবাদচ্ছলে তৎকালে দেশীয় সংস্কৃত ছাত্রদের মাসিক ব্যয়ের পরিমাণ উল্লিখিত হইয়াছিল।

(A native student in one of the Sungskrit colleges in the country seldom spends more than four Rupees a month. ib. Vol. VII, under date 13-5-1841)

পরবর্ত্তী সংখ্যায় (Vol. VII, pp. 305-6 of 20-5-1841) সম্পাদকীয় স্তম্ভে Govt. Encouragement of Sungskrit Literature শীর্ষক যে প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, তাহা সংস্কৃতশিক্ষার অনুরাগী প্রত্যেক ব্যক্তির পড়িয়া দেখা উচিত। আমরা স্থলবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম—

From whatever cause it may arise, it is certain that the patronage of the state has done little else than rear up a sickly institution, with none of the robust vigor which the Native schools of learning fed only from the indigenous sources of patronage, exhibit. During the 17 years of its existence, the Sungskrit college has produced no great scholars who might vie with those produced in the mud-walled cottages in which the great Pundits hold their schools. As far as we can learn, only two of its students have been thought worthy of the place of professor in this college and these have been of inferior order. For teachers, this well fed college still depends upon the talent which the indigenous schools turn out from year to year. Not one has aimed at the acquisition of a high reputation for learning among his own countrymen The comparative ease of their circumstances; the distractions of a busy metropolis, and the foreign economy of a public establishment have been unfavourable to that close application which makes the great scholar and which is to be found in the more humble and secluded seats of learning in the country.

এ স্থলে উল্লিখিত কৃতী ছাত্রদ্বয় হইলেন বৈদ্যকশ্রেণীর মধুসূদন গুপ্ত ও অলঙ্কার শ্রেণীর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ। এই দুইজনই প্রথম অধ্যাপকপদে বৃত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের নগণ্যতার প্রমাণস্বরূপ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ১৮৮৭ সন হইতে বঙ্গদেশে যে সকল পণ্ডিত "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি পাইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মাত্র দুইজন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র এবং

তাহাও অতি অল্পকালের জন্য। সাম্প্রতিক জয়ন্তী উৎসবে যাঁহারা সভাপতি কিংবা প্রধান অতিথি হইয়াছিলেন, একজন ভিন্ন সকলেই "ভাড়াটিয়া" এবং যাঁহাকে "প্রাচীনতম প্রাক্তন ছাত্র" বলিয়া জানার চেষ্টা হয় তিনি প্রাচীনতম তো নহেনই, ছাত্রও নহেন।

(৪) গত ১২৫ বৎসর কলেজে যাঁহারা অধ্যাপক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পাণ্ডিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (তারানাথ ও চন্দ্রকান্তের কতকটা পল্লবগ্রাহিতা ছিল—ইহা পণ্ডিতসমাজে প্রচারিত আছে)। শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ নবদ্বীপের পাঠ শেষ করিয়া এবং রাখালদাস ন্যায়রত্ন ভাটপাড়ার পড়া শেষ করিয়া জয়নারায়ণের নিকট পাঠ স্বীকার করিয়াছিলেন, বলা বাহুল্য সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া নহে, কিন্তু তাঁহার গৃহস্থিত চতুষ্পাঠীর ছাত্ররূপে। কলেজের অত্যন্ত স্বল্পপাঠী ন্যায়শ্রেণী জয়নারায়ণের অসাধারণ প্রতিভার বিলাসক্ষেত্র হওয়ার নিতান্তই অযোগ্য ছিল। সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের প্রতি রামমোহন অপেক্ষাও বিদ্যাসাগরের বিদ্বেষ ছিল বেশি,—বেদান্ত ও সাংখ্য তাহার মতে "ভ্রান্ত" দর্শন (ইতিহাস পৃ. ৫৪) এবং নব্যন্যায়ের প্রতি তিনি কিরূপ বিরূপ ছিলেন, কাউয়েল সাহেব তাহা লিখিয়া গিয়াছেন—

The writer has heard Pundit Iswar Chunder Vidyasagar relate how he first conceived his disgust at the native Nyaya, when as a student he once spent a week of hard labour to master some abstruse opinion, which day after day was elucidated and at length made clear by the teacher. When the class met the next day, the first thing they heard was, "now this view is only the purvapaksa, we must now proceed to shew that it is incorrect." (Proc. of the A. S. B., June 1867, p. 94 fn.)

সুতরাং বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনায় নব্যন্যায় কলেজ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া দর্শনশাস্ত্রের কতিপয় প্রাথমিক গ্রন্থ পাঠ্য হইল (ইতিহাস, পৃ. ৭৯-৮০)। অর্থাৎ যে দার্শনিক সূক্ষ্মবিচারের জন্য বঙ্গদেশ প্রায় ৪০০ বৎসর যাবৎ ভারতে এক বরেণ্য গুরুস্থান হইয়া ছিল, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া শিক্ষার মান অতিমাত্রায় কমাইয়া দেওয়া হইল। জয়নারায়ণের প্রতিভা নিতান্তই পঙ্গু হইয়া যাইত, যদি না তাঁহার স্বগৃহে পৃথক চতুষ্পাঠী থাকিত এবং এশিয়াটিক সোসাইটীর প্রশংসনীয় প্ররোচনায় তদ্দ্বারা বৈশেষিক দর্শন ও বাৎস্যায়নভাষ্য

সম্পাদিত হইত। মহেশ ন্যায়রত্ন তাঁহার চতুষ্পাঠীর ছাত্র ছিলেন, সংস্কৃত কলেজের নহে (ইতিহাস, পৃ. ৩০ সংশোধনীয়)। সংস্কৃত কলেজের নগণ্যতায় পরোক্ষ-প্রমাণ স্বরূপ কাশীধাম হইতে মৃত্যুর অল্পপূর্ব্বে লিখিত জয়নারায়ণের একটি মূল্যবান পত্র উদ্ধৃত হইল।

শ্রীদুর্গা শরণং / শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মণঃ / শ্রীমান্ রামগিরিনামকোঽয়ং সাধুরানন্দগিরিসম্প্রদায়ান্তঃপাতী মম নিকটে কতিপয়ং প্রকরণং পঠিতবান্ তেনাস্য দর্শনমার্গে প্রবেশোজাতঃ ভবতাঽয়ং যত্নতোঽধ্যাপনীয়ঃ ইতি আশ্বিনস্য শুক্লপঞ্চমীদিবসীয়া লিপিঃ—

চং কাশীতঃ অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরমোহন তর্কচূড়ামণি
দেয়া নবদ্বীপে বাবাজী চিরঞ্জীবিতেষু

হরমোহন সুপ্রসিদ্ধ শ্রীরামশিরোমণির জ্যেষ্ঠপুত্র এবং মাধবচন্দ্র তর্ক-সিদ্ধান্তের মৃত্যুর পর ১৬ বৎসর (১২৭২-১২৮৮ সন) নবদ্বীপের "প্রধান" নৈয়ায়িক ছিলেন। জয়নারায়ণ তাঁহার সন্ন্যাসী ছাত্রকে তাঁহার কর্ম্মভূমি সংস্কৃত কলেজে না পাঠাইয়া নবদ্বীপের অক্ষুণ্ণ গৌরব সূচনা করিয়া সেখানেই পাঠাইয়াছিলেন।

উপসংহার: এই "রুগ্ন প্রতিষ্ঠানে"র পরবর্ত্তী ইতিহাস আমরা অত্র আলোচনা করিলাম না। যে মহান্ উদ্দেশ্য লইয়া ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে সাধিত হয় নাই। বিদ্যাসাগরের মতে পণ্ডিতদের "গোঁড়ামী" (ইতিহাস, পৃ. ৫৬) তজ্জন্য দায়ী। কিন্তু আজ বাঙ্গলার চতুষ্পাঠীসমূহ যে ছাত্রাভাবে লোপ পাওয়ার উপক্রম হইয়াছে, তাহার বহুবিধ কারণের মধ্যে প্রধান হইল দুর্নীতির রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে এই কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া দেশের সমস্ত সংস্কৃত শিক্ষাগারের বন্ধন। রামমোহন-পরিকল্পিত উপায় পূর্ব্বাবধি অবলম্বিত হইলে এই দুরবস্থা ঘটিত না। স্বাধীনতার সূচনায়ই দেশের যাবতীয় সমস্যার সমাধান ভবিষ্যতের জন্য তুলিয়া রাখিয়া বাঙ্গলার ভাগ্যনিয়ন্তাগণ তিন দিনেই সংস্কৃত শিক্ষার উন্নয়নের জন্য পরিষদ গঠন, "বড়লোক"-বহুল ওই পরিষদের শ্রুতিমধুর প্রস্তাবাবলীর রচনা ও তাহা প্রায়শঃ কার্য্যে পরিণত করিয়া ভস্মে ঘৃতাহুতির ব্যবস্থা করিলেন দেখিয়া আমাদের প্রশ্ন হয়, ইহা কি বস্তুতঃ বঙ্গদেশে সংস্কৃত শিক্ষার উন্নয়নপ্রচেষ্টা, না অন্ত্যেষ্টিবিধান?

"প্রবুদ্ধচন্দ্র"

বাজার-দর

বিখ্যাত দার্শনিক এবং নেতা পণ্ডিত লোকেশ্বরনাথ শহরে পদার্পণ করিয়াছেন। স্থানীয় নাট্যশালার ভিত্তি স্থাপন করিবেন। ছোট শহর সরগরম। বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজনে ফাঁপিয়া ফুলিয়া বড় হইয়া উঠিয়াছে।

স্টেশনেই মাল্যদান। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী পুরোভাগে করিয়া মিছিল চলিতে আরম্ভ করিল। পণ্ডিত লোকেশ্বরনাথ ঘামিয়া উঠিলেন। কিন্তু পলাইবার রাস্তা নাই। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এবং খাকি পোশাক-পরা স্বেচ্ছাসেবক চারিদিক ঘিরিয়া আছে।

ময়দানে আসিয়া মিছিল থামিল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী মিলিটারি কায়দায় দাঁড়াইল। গার্ড অব অনার। লোকেশ্বরনাথ সকলের সঙ্গে করমর্দন করিতে বাধ্য হইলেন।

আর কি?—লোকেশ্বরনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন।

হতবুদ্ধি পণ্ডিত তাঁহার কর্তব্যগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লওয়ার বুদ্ধি করিয়াছেন।

বারোটায় রায় বাহাদুর গোবিন্দ ঘোষের বাড়িতে আহার। একটা পর্যন্ত বিশ্রাম।

লোকেশ্বরনাথ মৃদু আপত্তি করিলেন, তিনটার সময় তো? তা হ'লে বিশ্রাম একটা পর্যন্ত কেন?

মাঝখানে আরও কয়েকটা ফাংশন আছে কিনা।—স্থানীয় কর্মকর্তা বারীন চৌধুরী বিনয়ভূষিত জবাব দিলেন।

কি ফাংশন?

দেড়টায় সময় ধরুন মিউনিসিপালিটিতে অভিনন্দন আর মাল্যদান। বারীন চৌধুরী প্রোগ্রামের কাগজ দেখিয়া বলিলেন। দুটো পনেরো মিনিটে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অভিনন্দন আর মাল্যদান। দুটো চল্লিশে আজাদ ব্যায়ামাগার। তিনটেয় ভিত্তিস্থাপন—নাট্যশালার। চারটেয় চা।

তারপরে বিশ্রাম?—লোকেশ্বরনাথ ব্যাকুলকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

বারীন চৌধুরী মৃদু হাসিয়া বললেন, আজ্ঞে না। বিশ্রাম আরও পরে। রাত্রি দশটায়।

আর কি কি, ব'লে যান।

চারটে তিরিশে সাহিত্য-চক্র। পাঁচটায় বস্ত্র-ব্যবসায়ী-সমিতি। সাড়ে পাঁচটায় টাউন-ক্লাব। ছটায়—

দাঁড়ান, লিখে নিচ্ছি।

কিছু দরকার নেই স্যার। আমি সঙ্গেই আছি।

বেশ বেশ। তার পরে ব'লে যান। ছটায়?

ছটায় বার-লাইব্রেরি। সাড়ে ছটায়—

লোকেশ্বরনাথ আবার বাধা দিলেন, মানে, ঠিক আধ ঘণ্টা পর পরই একটা ক'রে আছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেশ। আর বলতে হবে না। চলুন এবার। আরম্ভ করা যাক।

মিউনিসিপালিটি।

মাল্যদান এবং অভিনন্দনের পরে পণ্ডিত লোকেশ্বরনাথের ছোট বক্তৃতা। মিউনিসিপালিটির কর্তব্য, নাগরিকের কর্তব্য, কর্মীদের কর্তব্য সম্বন্ধে চমৎকার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করিলেন। হাতে সময় থাকিলে আরও করিতে পারিতেন; কিন্তু ঘড়ি দেখিয়া লইয়াছিলেন।

বলিলেন, নগর-জীবন সুষ্ঠু এবং সুন্দর ক'রে তোলাই হচ্ছে পৌরসভার একমাত্র কর্তব্য।

সকলে ধন্য ধন্য করিল। শেষে বন্দেমাতরম্ গান।

ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড।

বলিলেন, জেলার প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ড। জননীও বলা চলে। পুত্রবৎসলা জননী যেমন— ইত্যাদি।

এবার জন-গণ-মন গানের সঙ্গে সভার কার্য শেষ হইল।

আজাদ ব্যায়ামাগার।

দেশের যুবশক্তি হ'ল দেশের নাড়ী। সমগ্র দেশের প্রাণস্পন্দন এই নাড়ী টিপিয়া ধরা যায়। এই নাড়ী সুস্থ সবল এবং দৃঢ় রাখিতে চাই ব্যায়াম। কাজেই ব্যায়ামই জাতির মেরুদণ্ড। শুধু শরীরের নয়, হৃদয়ের ব্যায়াম।

প্রবল করতালির পরে সঙ্গীত।

সভা ভঙ্গ।

এবার নাট্যশালা। আসল ব্যাপার।

মাল্যদান, সঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, বক্তৃতা, অবশেষে ভিত্তিস্থাপন।

সুন্দর একখানি বক্তৃতা দিলেন। একখানা গানের মত, অথচ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ। অভিভূত শ্রোতাগণ সকলেই একমত। বেশ বলিয়াছেন, পণ্ডিত লোক।

উপসংহারে বলিলেন, কৃষ্টিগত সার্থকতাই জাতীয় জীবনের মাপকাঠি। নাটক এবং অভিনয় জাতীয় কৃষ্টির একটা প্রধান অঙ্গ। তার জন্য ঘর চাই। সেই ঘরের ভিত্তি-স্থাপন ক'রে আপনারা আজ জাতির মহা উপকার সাধন করলেন। এই ঘর অক্ষয় হউক—ভগবানের কাছে এই আমার প্রার্থনা।

বারীন চৌধুরী আসিয়া বলিলেন, এখন চা।

বাকিগুলো শেষ ক'রে গেলেই ভাল হয় না?—লোকেশ্বরনাথ শুষ্ককণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন।

অনেক রাত হয়ে যাবে যে!

আচ্ছা, চলুন।

চা-পানের পর লোকেশ্বরনাথ বলিলেন, এবার?

সাহিত্য-চক্র।—বারীন চৌধুরী কাগজ দেখিয়া বলিলেন।

সাহিত্য-চক্র।

সাহিত্য জাতির বাহন। ক্লান্তকণ্ঠে লোকেশ্বরনাথ বলিতে আরম্ভ করিলেন। বাহন যত জীবন্ত হবে, যত উন্নত হবে, জাতি তত বড় হবে, তত দৃঢ় হবে।

সংক্ষেপে শেষ করিয়া আনিলেন।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সমাপ্তি হইল।

বস্ত্রব্যবসায়ী-সমিতি।

বলিলেন, গোড়ায় মানুষ উলঙ্গ ছিল। ক্রমে গাছের বাকল আর পশুর চামড়া পরতে শিখল। ফলে লজ্জাবৃত্তি মানুষের এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বস্ত্র সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্ত্র অত্যাবশ্যক হ'লে বস্ত্র ব্যবসায় অপরিহার্য। ফলে বস্ত্র-ব্যবসায়-সমিতির উদ্ভব। ইহাও সভ্যতারই অঙ্গ। যার ফলে আজ আমাদের এখানে আসতে হয়েছে।

সংক্ষেপেই শেষ করিতে চাহিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ীগণ ঘুঘু লোক। কিছু খরচপত্র করিয়া ফেলিয়াছে। মাতব্বর ব্যবসায়ী একজন উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সবিনয়ে বলিলেন, আর একটু বলুন স্যার। আপনার কথা শোনবার ভাগ্য আমাদের আর কবে হবে কে জানে! বড় ভাল লাগছে।

অনেকটা 'এন্‌কোরের' মত। কাজেই আরও বলিতে হইল।

দেশের বস্ত্র যোগানের পুণ্যব্রত আপনারা গ্রহণ করেছেন।

হিয়ার হিয়ার।

সেই ব্রত পালন করতে আপনারা ভারতের ঐতিহ্যের কথা বিস্মৃত হবেন না—এই আমার অনুরোধ। ইত্যাদি।

জন-গণ-মন গানের পরে জলযোগ।

ঘড়ি দেখিয়া বারীন চৌধুরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। পনরো মিনিট লেট্ হয়ে গেল স্যার। সাড়ে পাঁচটায় কথা ছিল।

কোথায়?

বার লাইব্রেরী।

চলুন।

বার লাইব্রেরী।

বলিলেন, অনেক কিছুই বলিলেন।

শেষ হইলে বারীন চৌধুরী আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এবার?

ক্রেতা-সমিতি।

কি সমিতি?

ক্রেতা-সমিতি।

ওঃ। চলুন।

ক্রেতা-সমিতি।

বলিলেন, দুঃখ আছে, অভাব আছে, জানি আমি। কিন্তু তার জন্য দুঃখ করলে চলবে না। সুখ তৈরি ক'রে নিতে হবে।

একজন বকাটে ছোকরা বলিয়া উঠিল, কোথায়? ফ্যাক্টরিতে?

প্রবল হাততালির মধ্যে সভা ভঙ্গ হইল।

আগমন এবং নির্গমন ক্রমেই বিলম্বিত হইয়া পড়িতেছিল। প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ করা কঠিন। বারীন চৌধুরী চিন্তিত হইলেন।

রাত্রি দশটার সময় বারীন চৌধুরীর মুখমণ্ডলে শোকের ছায়া পড়িল।

দুটো বাদ প'ড়ে গেল যে!—বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিলেন।

আজ আর পারছি নে ভাই। লোকেশ্বরনাথ যুক্তকর হইলেন।

কাল সকালে ছটায় আবার রাইফেল ক্লাব আছে কিনা। বারীন চৌধুরী ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন।

রাইফেল ক্লাব! কিন্তু রাইফেল সম্বন্ধে আমি তো কিছুই জানি নে ভাই।—লোকেশ্বরনাথ আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন।

আমি সব ঠিক ক'রে দোব। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

দেখা যাক।

এ দুটো তা হ'লে?

আজ আর পারব না ভাই। মানুষের শরীর তো! ওদের খবর দিন। কাল দেখা যাবে।

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার

সংবাদ-সাহিত্য

মহাকবি বেদব্যাস এক মহাভারতের কথা মহাকাব্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডবদের সহিত অন্তরে এবং বাহিরে দীর্ঘকাল দ্বন্দ্ব করিয়া শেষ পর্যন্ত কঠিন দ্যূতযুদ্ধে তাহাদিগকে পরাস্ত করত বনবাসে এবং অজ্ঞাতবাসে পাঠাইয়া কৌরবেরা ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুরে মহাসমারোহে মহাভারত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্নেহান্ধ বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদের সহায় হইয়াছিলেন। তাহার পর কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কৌরবেরাই সগৌরবে মহাভারত শাসন করিয়াছিলেন। অভিমানী কর্ণ, স্বার্থপর দুর্যোধন, দাম্ভিক দুঃশাসন ও ধূর্ত শকুনির দুষ্কৃতি মহাভারতকে কি ভাবে গৃহযুদ্ধে এবং আত্মীয়যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিল, সেই ইতিহাস—যাঁহারা পুরাণকে ইতিহাস বলেন না, তাঁহাদের মতে সেই কাহিনী—আমরা গত চার হাজার বছর শুনিয়া আসিতেছি।

আজ আবার সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইতেছে। প্রায় একই স্থানে অর্থাৎ দিল্লীতে মহাসমারোহে মহাভারতও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। পণ্ডিত

জওহরলালের কথায় কথায় অভিমান, রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রাদেশিক-স্বার্থপরতা, বল্লভভাই প্যাটেলের দম্ভ ও শ্রীরাজাগোপালাচারীর ধূর্ততা বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সস্নেহ আশীর্বাদ সত্ত্বেও সাধারণের কাছে মনোরম ঠেকিতেছে না। বেদব্যাসের মহাভারতের পাণ্ডবেরা পূর্বী এবং কৌরবেরা পশ্চিমী ছিলেন কি না জানি না, কিন্তু আধুনিক মহাভারতে পূর্ব ও পশ্চিমের দ্বন্দ্বই দিনে দিনে আধ্যাত্মিক ও মানসিক ক্ষেত্র ছাড়িয়া ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও প্রকট ও বিকট হইয়া দেখা দিতেছে। ভাষা, সীমান্ত, চাকুরি এবং ব্যবসায় সকল ক্ষেত্রেই পূর্বীরা ধীরে ধীরে বনবাস হইতে অজ্ঞাতবাসে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে। কোন্ কদর্য কুরুক্ষেত্রে এই ঘোরতর গৃহদ্বন্দ্বের সমাপ্তি হইবে বলিতে পারি না; কিন্তু মোটের উপর আবহাওয়া ক্রমশ আবিলতর হইতে দেখিতেছি।

যাঁহাদের হাতে বর্তমান শাসনভার তাঁহারা পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন অর্থাৎ সহৃদয়তা-বস্তুটি সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতেছেন। "বন্দে মাতরম্"-এর প্রশ্ন লইয়া অভিমানী জওহরলাল কথায় কথায় চোখ রাঙাইতেছেন, বাংলা-বিহারের সীমান্ত নির্ধারণ লইয়া রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্বার্থ বিবিধ চক্রান্তে পর্যবসিত হইতেছে। দাম্ভিক বল্লভভাই প্যাটেল সেদিন দশচক্রে ভূতীভূত বাঙালীর অশ্রুপরায়ণতা লইয়া কুৎসিত রসিকতা করিয়াছেন, তাই শ্রীরাজাগোপালাচারীর মধুর প্রেম ও শান্তির বাণীও শৌকুনিক বা ঔরঙজীবীয় কৌশল বলিয়া মনে হইতেছে। বাঙালী আজ বহুবিভক্ত, যুদ্ধক্লান্ত ও রক্তক্ষয়জনিত অবসাদে দুর্বল তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ভারতবর্ষের মানসিক ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা-যুদ্ধে অগ্রণী হইয়া সে যে সর্বস্ব খোয়াইয়া বসিয়া আছে, একটু করুণাপরবশ হইলে আধুনিক কর্তারা সকৃতজ্ঞচিত্তে তাহা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতেন।

অপরকে দোষী করিয়া নিজেদের সাফাই গাহিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। বাঙালী সত্যই অপরাধী, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই সে আজ পরাজিত। সাহিত্য শিল্প ও শিক্ষার গৌরব তাহার ছিল, আজ তাহাও সে হারাইতে বসিয়াছে। বাংলা দেশের তরুণেরা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে গগনভেদী চীৎকার তুলিতেছে বটে, কিন্তু তাঁহার আদর্শ একবারও স্মরণ করিতেছে না। সুভাষচন্দ্র রফা করিতে শিখেন নাই, তিনি চিরসংগ্রামশীল ছিলেন। বাংলা দেশের তরুণেরা আজ সংগ্রাম ভুলিয়া স্লোগান ছাড়িতে শিখিয়াছে, লেখাপড়ার সাধনা ভুলিয়া "সার্বজনীন" বাণীপূজার হল্লোড়ে মাতিতে চাহিতেছে। এখনও পৌষ

মাস শেষ হয় নাই, ইতিমধ্যেই চাঁদা তোলার ধুম পড়িয়া গিয়াছে;—পাড়ায় পাড়ায় দল, গলিতে গলিতে পাল্লা। বাণীপূজার মণ্ডপে সভাপতি, উদ্বোধক, প্রধান অতিথি সংগ্রহের জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে। এবারে আবার একটি নূতন পাপ জুটিয়াছে, প্রতিমার আবরণ উন্মোচনের জন্যও হতভাগ্যদের সন্ধান চলিতেছে। সন্দেহ হইতেছে, ইহার পর ইহারা স্ব স্ব বিবাহে সভাপতি, উদ্বোধক, প্রধান অতিথি ও কন্যার আবরণ-উন্মোচক নিয়োগ না করিয়া তৃপ্ত হইবে না।

বাণীপূজার ধুম বাড়িয়াছে বলিয়া শিক্ষা চুলার দুয়ারে গিয়াছে, বাংলা দেশের ছেলেরা লেখাপড়া করে না, সরস্বতীর পূজা করে, লেখাপড়ার দায়িত্ব অন্য প্রদেশের ছেলেরা গ্রহণ করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা আর নাই, হুল্লোড়ের নেশা না হইলে বাঙালী ছেলেরা আর কোনও কাজ সহজে করিতে পারে না। আফিমের গুলিতে আর কাজ হইতেছে না, মর্ফিয়া ইন্জেক্শন চাই। ভারতবর্ষের অন্যত্র কি ঘটিতেছে, বাঙালীকে কাহারা কোথায় লাথি মারিতেছে, সে হুঁশ তাহাদের নাই। বল্লভভাই প্যাটেল দাম্ভিক হইলেও কর্তাব্যক্তিদের একজন, তাঁহার লাথি আপাতত না সহিয়া উপায় নাই। কিন্তু সারা ভারতবর্ষের প্যাটেলেরা যে বাঙালীর পিঠসই করিয়া লাথি উঁচাইতেছে, আত্মস্থ হইয়া তাহার প্রতিকারও কি তাহারা করিবে না?

দৃষ্টান্ত অনেক মিলিবে, একটির উল্লেখ করিতেছি। বাবুরাও প্যাটেল নামক একজন প্যাটেল বোম্বাইয়ের 'Filmindia' কাগজের সম্পাদক। ইনি বর্তমান জানুয়ারি সংখ্যা পত্রিকায় বাঙালীদের সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন —লজ্জায় অনুবাদ দিতে পারিলাম না—

"The Bengalees are a race of lazy and unenterprising thinkers. They eat too much, sleep too long, talk too much and work too little."

বাঙালী ছিঁচকাঁদুনে, বাঙালী অলস, বাঙালী অপদার্থ—এই কুৎসিত অপবাদ আজ ভারতবর্ষের সর্বত্র শোনা যাইতেছে। জীবনযুদ্ধে পরাস্ত "শতকরা পঁচানব্বই ভাগ কেরানী" বাঙালী পড়িয়া পড়িয়া শুধু মারই খাইতেছে, হয়তো লজ্জা ঘৃণা ও অনুতাপের সঙ্গে স্মরণ করিতেছে, একদা তাহাদের

পূর্বপুরুষেরা দম্ভভরে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশবাসীকে অসম্মান ও অবজ্ঞা করিয়াছিল বলিয়া কালের কুটিলচক্রে এই লাঞ্ছনার মধ্য দিয়া তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। ভাগ্যহত বাঙালী কি এই নিষ্ক্রিয় অনুতাপের মধ্যেই প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিবে? তরুণ বাংলা দেশ কি আবার সুস্থ আত্মস্থ জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া সাধনা ও কর্মের মধ্য দিয়া নিজ শক্তির পরিচয় দিবে না? বহু গৌরবময় মৃত্যু এককালে বাঙালীকে ভারতের শীর্ষস্থানে স্থাপন করিয়াছিল, পরাধীন দেশে সে মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে বাঙালীর গৌরবময় জীবনই শুধু বাঙালীর কলঙ্কক্ষালন করিতে পারে। ভাঙনের কাজে বাঙালী প্রচণ্ড বীর্য দেখাইয়াছে—আজ প্রয়োজন গঠনের কাছে বীর্যবান বাঙালী। ছটফট করিয়া লাভ নাই, বাঙালী তরুণেরা অগ্রণী না হইলে আমাদের কলঙ্ক দূর হইবে না, ব্যাঙ হইতে হাতী পর্যন্ত সকলের লাথি আমাদিগকে খাইতে হইবে।

সিনেমা-জগতের আলোচনা করা আমাদের পক্ষে অনধিকারচর্চা, তথাপি উক্ত জগতের একটি ঘটনা সামাজিক দিক দিয়া বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। সম্প্রতি লাহোর হইতে প্রকাশিত 'সিনেমা-রাজ্যের কে কি' ('Who's Who in Filmland') নামক একটি সচিত্র বিরাট পুস্তক দেখিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করিলাম, এই রাজ্যের অধিকাংশ মুসলমান অভিনেতা-অভিনেত্রী-প্রযোজক-পরিচালকেরা একটি করিয়া পোশাকী হিন্দুনাম গ্রহণ করিয়া সেই নামের আড়ালে ব্যবসা চালাইতেছেন। ওইগুলির সাহায্যে তাঁহারা হিন্দুস্থানের গাছের খাইয়া স্বনামে পাকিস্তানের তলারও কুড়াইতেছেন। এই সকল বেনামের ফলে অনেক সামাজিক বিপর্যয়ও ঘটিয়াছে বলিয়া অবগত হইয়াছি। কুমার, দিলীপ, বীণা, ঝরনা প্রভৃতি হিন্দুনামে সুপরিচিত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কেহই হিন্দু নহেন—ইহাতে ভাগবৎ অশুদ্ধ হয় না ইহা ঠিক; কিন্তু হিন্দুনামধারী সত্যকার হিন্দু অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আর্থিক ও অন্যান্য দিক দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হন। এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক কোনও বিধান জারি সম্ভব কি না জানি না, কিন্তু সিনেমা-রাজ্যের কর্ণধারগণ অবিলম্বে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে সুবিবেচনার পরিচয় দিবেন।

পশ্চিম ভারতবর্ষে আরও লক্ষ্য করিলাম, বহু বাংলা বই মারাঠী, হিন্দী, উর্দু ও গুজরাটী ভাষার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া উক্ত ভাষাভাষীদের হৃদয় হরণ করিতেছে। বাঙালী লেখক ও নায়ক-নায়িকাদের এবং ঘটনাস্থলের নামের পরিবর্তন সাধন করিয়া উচ্চশ্রেণী হইতে অতিশয় নিম্নশ্রেণীর বাংলা উপন্যাস-গল্পের এইভাবে প্রতিপত্তি বাড়িতে দিলে স্থানীয় লেখকদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়। আশা করি, স্থানীয় সরকার এরূপ অনাচার অচিরাৎ রোধ করিবেন। তাঁহারা যদি অবহিত না হন, তাহা হইলে বাঙালীদের উচিত বাঙালী লেখক ও বাংলা বইকে অজ্ঞাতসারে কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমের সর্বত্র এই যে পাপ অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার ভাগী না হইয়া পাপডাকুদের নাম প্রকাশ করিয়া দেওয়া। ভারতবর্ষে কপিরাইটের আইনের তেমন জোর নাই, অন্তত ইংরেজের আমলে ছিল না। স্বাধীন ভারতবর্ষে এই আইনটিকে যদি জোরদার করা যায়, তাহা হইলে বাংলা দেশের অবাঞ্ছিত চাপে মারাঠী গুজরাটী উর্দু হিন্দী লেখকদের অসুবিধা আর ঘটিবে না এবং তাঁহারা ধীরে মাথা তুলিয়া আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন।

রাষ্ট্রভাষাসম্পর্কিত মামলার মধ্যে না ঢুকিয়াও কেবলমাত্র আর্থিক কারণে যে বাঙালী লেখক সম্প্রদায়ের হিন্দী বা হিন্দুস্থানী লিখিতে পড়িতে শেখা উচিত, সে বিষয়েও এতদিনে নিঃসন্দেহ হইয়াছি। হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভারতবর্ষে সর্বাধিক প্রচলিত, এই দুই ভাষার পাঠকসংখ্যা, সুতরাং ক্রেতার সংখ্যা, অন্যান্য যে কোনও প্রাদেশিক ভাষা অপেক্ষা অন্তত পাঁচ গুণ। ফলে হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষার লেখকদের আয় অন্য যে কোনও প্রাদেশিক ভাষার লেখক অপেক্ষা পাঁচ গুণ। চলচ্চিত্রের বেলায় এই আয় দশ গুণেও দাঁড়াইয়াছে। দুই ভাষা বলিতেছি বটে কিন্তু দুই ভাষাই মূলত এক, ব্যাকরণ এক—অভিধানেই যা তফাত। একটিতে সংস্কৃত তৎসম তৎভব শব্দের আধিক্য, অন্যটিতে উর্দু শব্দের আধিক্য। চেষ্টা করিয়া শব্দকোষ মাত্র আয়ত্ত করিলে দুই ভাষাতেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়া যায়। বাঙালী লেখকেরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন যে, হিন্দীভাষায় যে সকল লেখক নাম করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেরই মাতৃভাষা পাঞ্জাবী—হিন্দীর সহিত তাহার মোটেই মিল নাই। ইহারা সামান্য চেষ্টা করিয়া হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষা আয়ত্ত করিয়া

শুধু অনুবাদের জোরে প্রভূত উপার্জন করিতেছেন—অন্যত্র মৌলিক লেখকেরাও সে পরিমাণ অর্থাগম কল্পনা করিতে পারিবেন না। সেদিন একখানি মাদ্রাজী চলচ্চিত্র নাটকের হিন্দী অনুবাদককে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে—মূল লেখক পাইয়াছেন মাত্র পাঁচ হাজার। বাঙালী লেখকদের বহু উপন্যাস কদর্য হিন্দীতে এখনই চালু আছে। লেখকেরা নিজেরাই যদি সামান্য পরিশ্রমে হিন্দী শিখিয়া অনুবাদ প্রকাশ করেন, চালু অনুবাদ হইতে তাহা নিন্দার হইবে না। এ বিষয়ে আরও একটি দেওয়ার মত সংবাদ এই যে, সম্প্রতি ভারতবর্ষে যে লেখকের হিন্দী বর্ণপরিচয় ও প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগ সর্বাপেক্ষা অধিক চলিতেছে, তিনি পশ্চিম পাঞ্জাবের অধিবাসী। তাঁহার 'সবকী বোলী' প্রথম ভাগ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে একসঙ্গে দেড় লক্ষের উপর চলিতেছে। পাঞ্জাবীরা যাহা পারিতেছেন, বাঙালীর তাহা না পারিবার কোনই হেতু নাই। আমাদের মতো যাঁহারা প্রবীণ হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য এই ইঙ্গিত নহে। যাঁহারা এখনও তরুণ, যাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষকে জীবনের সংগ্রাম ক্ষেত্র করিতে চান, তাঁহাদিগকে এই পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। ইহাতে মাতৃভাষা বাংলার অমর্যাদা তো হইবেই না, বরং বাঙালী লেখকেরা সজ্ঞানে ও অজ্ঞাতসারে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে পারিবেন। বাঙালীর পক্ষে একমাত্র বাধা হইতেছে লিপির বাধা—দেবনাগরী অক্ষর অনেকে বরদাস্ত করেন না। লিপি আয়ত্ত হইলে পাঠক আরামের সহিত লক্ষ্য করিবেন যে, শব্দ বা ভাষা প্রায় বারো আনা বাংলারই অনুরূপ।

—

কিছুদিন পূর্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান-সাহিত্য-সম্মেলন নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। সভাপতি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহের অভিভাষণ পাঠ করিয়া মনে হইল, পূর্ব-পাকিস্তান নয়—ইহা সমগ্র বাংলা দেশেরই সম্মেলন। কারণে যে ব্যবধান রচিত হইয়াছে, তাহার বিলোপ মহাকাল সাধন করাইবেন; কিন্তু অকারণে যে ব্যবধান ও বিরোধ বাংলার পূর্বে ও পশ্চিমে গজাইয়া উঠিয়াছিল এই সম্মেলনের ফলে তাহার অনেকাংশে বিদূরিত হইল। বাঙালী বাংলা সাহিত্য ভালবাসে, সেই বাংলা সাহিত্যের কথা সম্ভ্রমের সঙ্গে যেখানে আলোচিত হয়, সেখানেই বাঙালীর তীর্থস্থান। ডক্টর শহীদুল্লাহ যে নির্ভয়ে বাঙালীর মর্মকথা নিবেদন করিয়াছেন, এজন্য পশ্চিমেও আমরা কৃতজ্ঞ হইয়া

উঠিয়াছি। তাঁহার সম্পূর্ণ অভিভাষণ দৈনিক সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা অংশত তাহা 'শনিবারের চিঠি'র পৃষ্ঠায় ধরিয়া রাখিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। সংবাদপত্রে দেখিলাম, কোনও কোনও আত্মবিস্মৃত বাঙালী এই অভিভাষণকে কলহের উপকরণ করিতে চাহিয়াছেন, 'আজাদ' প্রভৃতি অধুনা-ধর্মান্তরিত সংবাদপত্রও উষ্মা প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু যে সাত কোটি বাঙালী বাংলা দেশ ও বাংলা সাহিত্যকে ভালবাসে—সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠাবশত নিঃশেষে ছাতু অথবা গোস্ত বনিয়া কিঞ্চিৎ রাষ্ট্রিক সুযোগসুবিধা গ্রহণ করিতে যাহারা লজ্জিত, তাহারা এপারে ওপারে আত্মীয়তার যোগ-সূত্র খুঁজিয়া পাইয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিবে। ডক্টর শহীদুল্লাহ বলিতেছেন—

"ঢাকার নিকটবর্তী পূর্ববঙ্গের এককালীন রাজধানী সোনারগাঁও ন্যায়বান বাদশাহ গিয়াসুদ্দীন আজমশাহের পুণ্যস্মৃতি আজও বুকে ধ'রে আছে। স্মৃতি আমাদের নিয়ে যায় ঢাকার অদূরবর্তী বিক্রমপুরে সেন রাজাদের শেষ রাজধানীতে, যেখানে একদিন লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন ও মধুসেন রাজত্ব করে-ছিলেন। দূর-স্মৃতি আমাদের টেনে নিয়ে চলে বিক্রমপুরের সন্নিকট রাজা রামপালের স্মৃতি চিহ্ন রামপালে এবং বৌদ্ধ মহাপণ্ডিত শীলভদ্র কমলশীল ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশের স্মরণপূত অধুনাবিস্মৃত জন্মভূমিতে। এই অঞ্চল যেমন বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমানদের স্মারকালিপি হয়ে আছে, প্রার্থনা করি তেমনই এ যেন নূতন রাষ্ট্রের জাতি-বর্ণ-ধর্মনির্বিশেষে সকল নাগরিকদের মিলনভূমি হয়।

"আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোনও আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জোটি নেই। নৃতাত্ত্বিক গবেষণার অণুবীক্ষণযন্ত্র চোখে ধ'রে হয়তো আবিষ্কার করতে পারেন, কার শরীরে দু চার ফোঁটা বেশি বা কম আর্য, আরব, পাঠান বা মোগল রক্ত আছে। কিন্তু ঋষি কবির কথাই ঠিক—

'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
হেথায় দ্রাবিড়, চীন—

শক-হূন-দল পাঠান মোগল,
এক দেহে হ'ল লীন।'

"পূর্ব-বাংলার বিশেষ গৌরব এই যে, এই প্রদেশের প্রাচীন নাম বাঙাল থেকে দেশের নাম হয়েছে বাঙ্গালা বা বাংলা।

"পূর্ব-বঙ্গের শ্রেষ্ঠ গৌরব এই যে, এই দেশ থেকেই বাংলা সাহিত্য এবং নাথপন্থের উৎপত্তি হয়েছে। মৎস্যেন্দ্রনাথ যেমন বাংলার আদিম লেখক, তেমনি তিনি নাথপন্থের প্রবর্তক। তাঁর নিবাস ছিল ক্ষীরোদসাগরের তীরে চন্দ্রদ্বীপে, বর্তমানে সম্ভবতঃ যাকে সন্দ্বীপ বলে। ৬৫৭ খৃঃ অব্দে এই পূর্বাঞ্চলের ভীম, দিব্বোক, ঈশা খান, চাঁদ রায়, কেদার রায় প্রভৃতি বীরেরা সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল।...

"স্বাধীন পূর্ব বাংলার স্বাধীন নাগরিকরূপে আজ আমাদের প্রয়োজন হয়েছে সর্ব শাখায় সুসমৃদ্ধ এক সাহিত্য। আমরা আজাদ পাক নাগরিক গঠনের উপযুক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়ের অনুশীলন চাই। এই সাহিত্য হবে আমাদের মাতৃভাষা বাংলার। পৃথিবীর কোন জাতি জাতীয় সাহিত্য ছেড়ে বিদেশী ভাষায় সাহিত্য রচনা ক'রে যশস্বী হতে পারে নি। ইসলামের ইতিহাসের একেবারে গোড়ার দিকেই পারস্য আরব কর্তৃক বিজিত হয়েছিল, পারস্য আরবের ধর্ম নিয়েছিল, আরবী সাহিত্যেরও চর্চা করেছিল। কিন্তু তার নিজের সাহিত্য ছাড়ে নি।

"পল্লীগীতিকায় মুসলমানের দান অতি মহৎ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহায্যে জ্যেষ্ঠ সহোদরকল্প পরলোকগত দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে ও উৎসাহে গাথাগুলি সংগৃহীত হয়েছে, তা ছাড়া আরও বহু পল্লী-কবিতা পূর্ববঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে আছে।...

"এ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৫৪টি পল্লীগাথা প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে ২৩টি মুসলমান কবির রচিত।...

"ঘৃণা ঘৃণাকে জন্ম দেয়। গোঁড়ামি গোঁড়ামিকে জন্ম দেয়। একদল যেমন বাংলাকে সংস্কৃত-ঘেঁষা করতে চেয়েছে, তেমনি আর একদল বাংলাকে আরবী-পারসী-ঘেঁষা করতে উদ্যত হয়েছে। একদল চাচ্ছে খাঁটি বাংলাকে বলি দিতে,

আর একদল চাচ্ছে জবে করতে। এক দিকে কামারের খাঁড়া, আর এক দিকে কসাইয়ের ছুরি।....

"স্বাধীন পূর্ব-বাংলায় কেউ আরবী হরফে কেউ বা রোমান অক্ষরে বাংলা লিখতে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু বাংলার শতকরা ৮৫জন যে নিরক্ষর, তাদের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান বিস্তারের জন্য কি চেষ্টা হচ্ছে? যদি পূর্ব বাংলার বাইরে বাংলা দেশ না থাকত, আর যদি গোটা বাংলা দেশে মুসলমান ভিন্ন অন্য সম্প্রদায় না থাকত, তবে এই অক্ষরের প্রশ্নটা এত সঙ্গীন হ'ত না। আমাদের বাংলাভাষী প্রতিবেশী রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হবে। কাজেই বাংলা অক্ষর ছাড়তে পারা যায় না। পাকিস্তান রাষ্ট্র ও মুসলিম জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার প্রয়োজনীয়তা আমরা স্বীকার করি। তার উপায় আরবী হরফ নয়। তার উপায় আরবী ভাষা। আরবী হরফে বাংলা লিখলে বাংলার বিরাট সাহিত্য-ভাণ্ডার থেকে আমাদিগকে বঞ্চিত হতে হবে।..."

—

কবি প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর মৃত্যুতে ঊনবিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধকের সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে আমরা পুনরায় সচেতন হইলাম। কবি প্রমথনাথ দীর্ঘকাল পূর্বে সাহিত্যচর্চায় অবসর গ্রহণ করিয়া অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার স্বদেশীযুগের উদ্দীপনাময় কবিতা ও গান বাঙালীর স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার সম্বন্ধে সব চাইতে বড় কথা এই যে, তিনি স্বদেশের প্রতি প্রেমবশত বিদেশী শাসকদের সম্মানে সম্মানিত হইতে চাহেন নাই।

—

মাঘ মাসের কাগজ, ডাকঘরের নূতন বিধানের জন্য, সেই মাসের মধ্যে প্রকাশ করিতে হইল বলিয়া "বনফুলে"র 'ডানা' বাদ দিয়াই পৌষ-সংখ্যা বাহির করিতে বাধ্য হইলাম। অপরাধ আমাদের, "বনফুলের" নহে; তিনি আমাদের গদাইলস্করি মাসের হিসাব অনুযায়ীই 'ডানা' পাঠাইয়া থাকেন।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
২১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫৫

গান্ধীচরিত

অসঙ্গ

গীতায় "সঙ্গ" শব্দ আসক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গহীনতা বলিলে যেমন অনাসক্ত ভাব বুঝায়, অপর দিক দিয়া তেমনই মানুষের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী সঙ্গহীন, নিঃসঙ্গ অবস্থাকেও বুঝায়। গান্ধীজী শুধু অনাসক্তি নয়, সঙ্গহীনতার সাধনাও অভ্যাস করিতেন। সেই বিষয়েই আলোচনা করিব।

একটি একান্ত ব্যক্তিগত ঘটনা লইয়াই আরম্ভ করি। বিষয়টি আমার পক্ষে লজ্জার হইলেও তাহার মধ্যে শিক্ষণীয় বস্তুও আছে বলিয়া সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া উল্লেখ করিতেছি। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস, তারিখ ১৭। গান্ধীজী তখন নোয়াখালি পরিক্রমার পর বিহারে উপস্থিত হইয়াছেন। সেদিন আমরা সকালে পাটনা-গয়া লাইনে তারেগনা স্টেশনে নামিয়া দাঙ্গা-বিধ্বস্ত মসৌঢ়ি নামে একটি স্থানে চলিয়াছি। পথে প্রচণ্ড ভিড়। প্রতি স্টেশনে, এমন কি স্টেশনের বাহিরেও বিপুল জনতা হাতে পতাকা লইয়া, শোভাযাত্রা করিয়া গান্ধীজীকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। গাড়ির পাদানিতে দর্শনেচ্ছু লোকের ভিড় বারংবার জমিয়া উঠিতেছে; গান্ধীজী জানালার পাশে বসিয়া কিছু লিখিতেছেন, মাঝে মাঝে জনতার দিকে ফিরিয়া নমস্কার করিতেছেন। গ্রামের লোক সাজ-গোজ করিয়াও যেমন আসিয়াছে, তেমনই মাঠের চাষী ধুলাপায়ে সোজা পাশের মাঠ হইতে ছুটিয়াও আসিয়াছে।

আমার নিজের একটি ব্যক্তিগত অভ্যাস আছে। প্রাতঃকালে নিত্যক্রিয়া সম্পাদনের জন্য মাঠে যাইতে হইলে আমি মাটিতে একটি গর্ত করিয়া থাকি, এবং মাটি খুঁড়িবার জন্য কোন ছোট অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি। এরূপ কাজের জন্য কি অস্ত্র লইলে সুবিধা হইবে, অথচ যাহা পুঁটুলির ভিতরে সহজে বহন করা যায়, ইহা লইয়া মাঝে মাঝে গবেষণা করিয়াছি ও একটির পর একটি অস্ত্রের পরীক্ষাও করিয়াছি, কিছুতেই যেন সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই। যখন আমরা তারেগনার জন্য রেলে চলিয়াছি, এমন সময়ে একটি স্টেশনে দর্শনেচ্ছু জনতার মধ্যে অকস্মাৎ এক চাষীর হাতের একখানি সাধারণ খুরপির উপরে নজর পড়িল। প্রচণ্ড ভিড় এবং কোলাহলের মধ্যে তাহাকে

ডাকিয়া খুরপিখানি চাহিয়া লইলাম। মনে হইল, ইহার দ্বারা কাজ হইবে। তাহাকে বলিলাম, তুমি এটি আমাকে দিবে? পয়সা দিতেছি, এইরূপ আর একখানি খরিদ করিয়া লইও। সে ইতস্তত করিতে লাগিল। আমি জিনিসটি ফিরাইয়া দিতে চাহিলাম; কিন্তু পাশের জনতা সমবেত হইয়া তাহাকে বলিল, গান্ধীজীর সঙ্গের লোক এই সামান্য জিনিস চাহিতেছেন, ইহার দাম লইও না; এমনই দিয়া দাও। লোকটি এই হট্টগোলের ভিতরে কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া রাজি হইয়া গেল। জনতার মধ্যে পতাকাধারী কংগ্রেসকর্মীগণ হাঁকিয়া বলিলেন, আমরা উহার ব্যবস্থা করিয়া দিব, আপনি খুরপিটি লউন। ইত্যবসরে গাড়ি ছাড়িয়া দিল। আমি খুরপিখানি আজও রাখিয়া দিয়াছি, কোনদিন ব্যবহার করিতে পারি নাই, বা তাহার সুযোগ ঘটে নাই।

মাঝে মাঝে এই ঘটনাটির বিষয়ে ভাবিয়াছি। গান্ধীজীর পার্শ্বচর। ত্যাগী মহাপুরুষের পার্শ্বচর, অতএব ত্যাগের বিভূতিতে মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু সেই বিভূতির সুযোগ লইয়া একটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য নয়, অনাবশ্যক দ্রব্যকে স্বচ্ছন্দে আত্মসাৎ করিতে পারিলাম। তাহাও জনসাধারণের কোনও প্রয়োজনে নয়; একান্ত ব্যক্তিগত কারণে। ইহার গ্লানি আমার পরিপূর্ণভাবে আজও কাটে নাই, এবং আমাকে সাবধানও করিয়া দিয়াছে—যেন কোনও ঐশ্বর্যকে ভাঙাইয়া না খাই। কিন্তু ত্যাগ বা মহিমার ঐশ্বর্যকে ভাঙাইয়া খাইবার প্রবৃত্তি যে কী তীব্র আকার ধারণ করে, তাহা আমি নিজের জীবনে এবং বন্ধুদের জীবনেও প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি। তাহার আকস্মিক ছায়ায় সেবাধর্ম বা অপর কোন বৃহৎ ধর্মও ক্ষণেকের জন্য রাহুগ্রস্ত হইয়া যায়।

যাঁহারা দীর্ঘদিন গান্ধীজীর পাশে থাকিয়া বহু তপস্যার মধ্য দিয়া গিয়াছেন, অনাহার, অর্ধাহার, শারীরিক শ্রম, মৃত্যুভয় প্রভৃতিও যাঁহাদিগকে সেবাধর্মের পথ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই, তাঁহাদের মধ্যেও ছোটখাট ঘটনায় অসাবধানতার পরিচয় পাইয়াছি। সামান্য এক জোড়া জুতা কিনিতে হইবে, তাহার জন্য কোনও ভক্তের প্রকাণ্ড মোটর গাড়িতে চড়িয়া পাঁচ টাকার তেল পুড়াইতে আমরা লজ্জিত হই নাই। ভক্ত গাড়িখানি ব্যবহার করিতে দিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন, ইহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আমাদের তিন টাকার জুতা কিনিতে গিয়া সস্তার বাহন খোঁজা উচিত ছিল কি না, ইহাও ভেবে জানিবার বিষয়।

গান্ধীজীর পার্শ্বচরদের দশা যাহাই হউক না কেন, তাঁহার নিজের মধ্যে এইরূপ সতর্কতায় শিথিলতা কখনও অনুভব করি নাই। দরিদ্রতম মানুষের সঙ্গে একাত্মভাব স্থাপন এবং তাহাদের মনুষ্যত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মনের মধ্যে সেই ভাব কম্পাসের কাঁটার মত সর্বদাই এক দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া থাকিত। সঙ্কেতের দ্বারা তাঁহাকে পথচ্যুতি হইতে রক্ষা করিত। বস্তুত উহাই তাঁহার রক্ষাকবচের মত ছিল।

ইহার ফলে গান্ধীজীর দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নিজের জন্য তিনি যথাসম্ভব কম খরচ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯১৬-১৭ সালে যখন চম্পারণে সত্যাগ্রহ চলিতেছে, তখন তো তিনি নিজের আহারের জন্য প্রত্যহ তিন আনার বেশি ব্যয় করিতেন না। কিন্তু পরবর্তী কালে নানাভাবে শরীর দুর্বল হওয়ার কারণে ডাক্তারদের পরামর্শমত তিনি যাহা আহার করিতেন, তাহার মূল্য তিন আনার বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বৃদ্ধি পাইলেও শরীরের জন্য যাহা একান্ত প্রয়োজন, তিনি সে সীমা কিছুতেই লঙ্ঘন করিতেন না।

পূর্বে গান্ধীজী ফাউণ্টেন পেন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু একটি কলম হারাইয়া যাইবার পর তিনি সাধারণ নিব-যুক্ত কলমেই লেখার কাজ সারিতেন। রেলে বা মোটরে লিখিবার সময়ে তাঁহাকে আমাদের কাহারও কলমই ব্যবহার করিতে দিতাম, কিন্তু অপর সকল সময়ে তিনি উহাকে বাদ দিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। কেহ দামী কলম উপহার দিলে, যত শীঘ্র পারেন তাহা আর কোনও অভাবী লোকের হাতে তুলিয়া দিয়া তবে তিনি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতেন। লিখিবার উপযুক্ত এক টুকরাও সাদা কাগজ তাঁহার কাছে ফেলিবার উপায় ছিল না। পুরাতন খাম কাটিয়া, তাহার লেখা অংশের উপরে নূতন কাগজ সাঁটিয়া তিনি চিঠিপত্র পাঠাইতেন। লাট সাহেবের নিকটেও এইরূপ মেরামত-করা খামে চিঠি পাঠানো হইয়াছে, তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অর্থাৎ কোন বস্তু অপচয়ের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। সকল বস্তুর সম্পূর্ণ ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেন। ফলে কখনও কখনও তাঁহাকে অত্যন্ত কৃপণস্বভাবের মনে হইত।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, কার্পণ্যের ভাব তাঁহার মধ্যে আদৌ ছিল না। যখন কোনও কাজের জন্য বিপুল অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হইত, তখন তিনি

প্রয়োজন বিবেচনায় তাহা ব্যয় করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। একবার নোয়াখালি হইতে দিল্লীতে পণ্ডিত জওহরলালের নিকট অত্যন্ত জরুরী চিঠি পাঠাইবার প্রয়োজন হয়। ডাকেও তাড়াতাড়ি পাঠানোর উপায় ছিল। কিন্তু পূর্বে দুই-একখানি চিঠি ডাকে পাঠানোর ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কোনও উপায়ে তাহার মর্ম অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া সেবার গান্ধীজী টাটযোগে ফেনী, এবং ফেনী হইতে কলিকাতা পর্যন্ত বিশেষ এরোপ্লেনের সাহায্যে ও কলিকাতা হইতে দিল্লী পর্যন্ত প্লেনে লোক মারফত চিঠি পাঠাইবার আদেশ দিলেন। ফলে, একখানি চিঠির পিছনে কয়েক শত টাকা খরচ হইয়া গেল। এ বিষয়ে গান্ধীজী যে নীতি অনুসরণ করিতেন, তাহা বহুদিন পূর্বে লেখা একখানি প্রবন্ধের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল।

Because an institution happens to have plenty of funds it does not mean that it should anyhow spend away every pie that it possesses. The golden rule is not to hesitate to ask for or spend even a crore when it is absolutely necessary and when it is not, to hoard up every pie though one may have a crore of rupees at one's disposal. —(*Young India*, 21-5-31, p. 118)

টাকা বা কোনও বস্তুর প্রতি গান্ধীজীর আসক্তি ছিল না, বৈরাগ্যও ছিল না। স্বাস্থ্যের বা শরীরের সম্বন্ধেও তাই। স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহার যত্নের অভাব ছিল না; অথচ প্রয়োজন হইলে শরীরকে যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিবার জন্য তিনি যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। অত্যন্ত নিয়মিত ভাবে চলিয়া, পরিমিত সু-সম আহার করিয়া যে দেহযন্ত্রকে সেবাধর্মের উপকরণস্বরূপ তিনি রক্ষা করিতেন, আবার মানুষের মনে শুভবুদ্ধি জাগাইবার জন্য সেই দুর্বল শরীর লইয়া পদব্রজে নোয়াখালি পরিক্রমার সঙ্কল্প লইতে, অথবা কলিকাতায় আমরণ উপবাসের ব্রত গ্রহণ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। মাঝে মাঝে তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, আমি চিকিৎসকদের চেষ্টায় শুধু দেহধারণ করিয়া পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাই না। আমার দেহ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সজীব জড়পিণ্ডের মত পড়িয়া থাকিবে—ইহা আমার নিকট অসহ্য মনে হয়। কাজ করিতে করিতে দেহপাত ঘটুক, ইহাই আমি প্রার্থনা করি।

টাকা এবং স্বাস্থ্যের সম্পর্কে তিনি যে উদাসীনতার পরিচয় দিতেন, নিজের গড়া প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কেও তাহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইত। মানুষ অনেক সময়ে নিজের চেয়ে নিজের ছেলেকে বেশি ভালবাসে। নিজের মৃত্যু কামনা করিতে পারে, কিন্তু নিজের রচিত কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিন্দুমাত্র আঘাত করিলে হিংস্র মূর্তি ধারণ করে। কিন্তু বিচিত্র এই যে, গান্ধীজী এ বিষয়ে মমতাশূন্য ছিলেন, অথবা মমতাশূন্যতার অতি নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন। সবরমতীর আশ্রম, অথবা গান্ধী সেবা-সংঘ নামক সংঘকে সম্পূর্ণ ভাঙিয়া নূতন রূপ দেওয়ার কাজ যেমন তিনি নিঃসঙ্কোচে করিয়াছিলেন, একদিন প্রয়োজনবোধে সেবাগ্রাম পরিহার করিয়া পূর্ববঙ্গের স্থায়ী অধিবাসী হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেও তেমনই তাঁহার কোনও দ্বিধা হয় নাই। পিছনের কোনও টান তাঁহার ছিল বলিয়া কেহ অনুভব করে নাই।

নোয়াখালি পৌঁছিবার কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি জানাইলেন যে, এখানে তিনি শুধু ধ্বংসলীলা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য আসেন নাই, বরং স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার জন্য, বাঙালী হইবার জন্যই, আসিয়াছেন। প্রথমে ঠিক বুঝা যায় নাই, কতদিন থাকিতে হইবে। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন, এখানকার কাজের জন্য কয়েক বৎসর ব্যাপী স্থির চেষ্টার প্রয়োজন। এবং অনুভবমাত্র সেই কার্যে নিষ্ঠার সহিত লিপ্ত হইলেন, পিছনের দাগ যথাসম্ভব মুছিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিলেন।

গান্ধীজী ঐ কারণেই বাংলা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ কারণেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত সহকর্মী প্যারেলাল, আভা, সুশীলা নায়ার, সুশীলা পাই, ঠক্কর বাপা প্রভৃতি সকলকে দূরে সরাইয়া একাকী আশ্রয়হীনভাবে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে বসবাস করিয়া তাহাদের বদ্ধ হৃদয়ের দুয়ারে বারংবার করাঘাত করিতে লাগিলেন; অপরপক্ষে নিমগ্ন, অত্যাচারজর্জরিত হিন্দুকে উদ্ধার করিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য তদানীন্তন সুহরাবর্দি গভর্নমেন্টের পক্ষ হইতে চেষ্টার অবধি ছিল না, মুসলিম লীগের কর্মীগণ মুসলমান জনসাধারণের উপরে তাঁহাকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে জিন্না সাহেবের পাকিস্তানের দাবিকে কৌশলে পরাস্ত করিতেছেন, মুসলিম লীগকে উহার

মূল্যস্বরূপ ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রামে কংগ্রেসের সহিত ময়দানে নামাইবার জন্য অছিলার পর অছিলা খুঁজিতেছেন, ইহা তাহারা জানিত এবং সেই জন্যই গান্ধীজীকে ইসলামের প্রবলতম শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিত। এ অবস্থায় তাঁহার জীবনের আশঙ্কা যথেষ্টই ছিল। পুলিসের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়াও যে কেহ নোয়াখালিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার দেহান্ত ঘটাইতে পারিত, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঝাঁপাইয়া সেই আগুনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছিলেন। সেই ঝাঁপাইবার কালে তাঁহাকে স্বহস্তে নিজের পুরাতন বন্ধনগুলি উৎপাটিত করিতে দেখিয়াছি। এরূপ বীর্যের এক অমোঘ আকর্ষণ আছে বলিয়া গান্ধীজীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম।

আমরা যখন নোয়াখালি হইতে বিহারের অভিমুখে যাত্রা করিলাম, তখন বাঙালী সেবকদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সেবাকার্যে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন, সেই জন্য রান্না কাপড়-কাচা প্রভৃতির কাজে ব্রতী একটি বালককে বিহার পর্যন্ত লইয়া যাইবার প্রস্তাব করা হইল। কে জানে, সেখানে গিয়া আবার নূতন লোককে এই কাজে তৈয়ারি করিতে কত দিন সময় লাগিয়া যাইবে? কিন্তু গান্ধীজী দৃঢ়ভাবে বলিলেন, এরূপ একজন কর্মীকে এখানেই কোন গ্রামের মধ্যে কাজের জন্য রাখিয়া যাইতে চাই। সামনে যাহা হইবার তাহা হইবে, আমার কোন কাজ আটকাইয়া থাকিবে না।

এরূপ কথা শুনিলে মনে আনন্দ হইত; আবার ভয়ও হইত এই ভাবিয়া যে, বারংবার পরীক্ষা ও পরিবর্তনের ভার তাঁহার দুর্বল শরীর কতদিন সহ্য করিবে? নিকেতনহীন মানুষ, কিন্তু নিকেতনের বিকল্পে অন্তত স্থির সেবার একটা আচ্ছাদন তো চাই।

কিন্তু বিহারে অবস্থানকালে গান্ধীজীর চরিত্রে একটি সংস্কারের আভাস নূতন করিয়া অনুভব করিলাম। ইহার জন্য ততটা প্রস্তুত ছিলাম না। গান্ধীজী নিজে হাতে পুরাতনের রজ্জুবন্ধনগুলিকে কাটিয়া ফেলিলেও তাহারা তো তাঁহাকে ছাড়িতে চায় না। যে চন্দ্র সূর্যের দীপ্তি লাভ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, সূর্যের পক্ষে তাহাকে দরকার নাই; কিন্তু চন্দ্রের তো সূর্যকে প্রয়োজন আছে, তাহার আকাঙ্ক্ষা তো অত সহজে মিটিবার নয়। আমরা সাধারণ মানুষ। প্রতিফলিত আলোক ও উত্তাপের লোভ সংবরণ করা আমাদের পক্ষে কঠিন

হইয়া উঠে। সে কথা অনুভব করিয়াই গান্ধীজী সাময়িকভাবে নোয়াখালি পরিত্যাগ করিবার সময়ে সেবাগ্রাম হইতে আগত সহচারীগণকে বলিয়া গেলেন, এবার তোমাদের পরীক্ষার সময়। আমি নিকটে থাকিব না, হয়তো সারা জীবন তোমাদিগকে এখানে অতিবাহিত করিতে হইবে, সংবাদপত্রের সহিত সম্পর্ক থাকিবে না, এমন অবস্থায় যে অধঃপতিত মনুষ্যত্বের পঙ্কোদ্ধার করিবার কাজে একাগ্র থাকিতে পারিবে, সেই সার্থক হইবে। সার্থকতা ভিন্ন তাহার আর কোনও পুরস্কার নাই।

বিহারে গান্ধীজী চলিয়া আসিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে, নোয়াখালি হইতে নয়, অপর প্রান্ত হইতে আশ্রমের পুরাতন সহকর্মীগণ মধ্যে দুই-একজন সেখানে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এমন এক-আধজন কর্মীর কারণে কিছু অসুবিধাও ঘটিতে লাগিল। যে বিশেষ কর্মীটির কথা এখন স্মরণে আসিতেছে, তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে গান্ধীজীর সান্নিধ্যের হয়তো প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই সান্নিধ্যের যতই প্রয়োজন থাকুক না কেন, তাঁহার উপস্থিতিতে শিবিরে কিঞ্চিৎ অসুবিধা ঘটিতে লাগিল। আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব ছিল না; গান্ধীজী নিজেই যত দিন না এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তত দিন আমার পক্ষে কিছু বলা অশোভন হয়। একদিন ঘটনাক্রমে প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। আমিও গান্ধীজীকে বলিলাম, আপনি যেমন কঠোরহস্তে নোয়াখালিতে পুরাতনের বন্ধনপাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন, আজও তাহা করিবেন না কেন?

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সেবাগ্রাম এবং বোম্বাইয়ের পুরাতন সহকর্মীদের নিকট হইতে গান্ধীজীর নিকট কঠিন পত্র আসিতেছে। ব্রহ্মচর্য প্রবন্ধের প্রসঙ্গে উহার উল্লেখ করিয়াছি। গান্ধীজী দৃঢ়কণ্ঠে স্বীয় মত ঘোষণা করিতেছেন, এবং আমাদিগকে ডাকিয়া কখনও কখনও ইহাও বলিতেছেন, একলা চলাই আমার ভাগ্যের লিখন। সকলে ছাড়িয়াও যদি চলিয়া যায়, তবু আমি যাহাকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি, সে পথ হইতে বিচ্যুত হইতে পারিব না। এইরূপ অকুণ্ঠ বীর্যের মধ্যেও যখন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি মমতায় তাঁহাকে প্রভাবান্বিত হইতে দেখিতাম, তখন মনে হইত, এত বীর্যের সহিত এই কোমলতা (বা দুর্বলতাই বলি), স্থান পায় কেন? তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলাম, লিখিয়া জানাইলাম, কাজের অসুবিধা ঘটিতেছে

আপনি কেন দৃঢ় হইবেন না? তিনি দুঃখভরা অন্তঃকরণে আমাকে লিখিয়া উত্তর দিলেন—

Your letter is frank. ...it makes me sad. I see that I have lost caste with you. I must not defend myself. If we ever meet and if you would discuss what I consider to be your hasty judgment, we shall talk. Love. Bapu.

গান্ধীজী আজ নাই। যখন তিনি ছিলেন, তখন তাঁহার নিকটে যে নির্মমতা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, সেবাধর্মের যজ্ঞে সকল বস্তুকে একান্তভাবে আহুতি দিবার যে প্রচণ্ডতা কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহা না পাওয়ায় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। পরমহংসদেব যখন ব্রহ্মসাধনা করিতেছিলেন, তখন বারংবার কালী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দৃষ্টির পথরোধ করিতেছিলেন। তিনি যখন অসির আঘাতে সেই মূর্তিকে খণ্ডিত করিলেন, তখনই মুহূর্তের মধ্যে কালীর সমগ্র কালো পিছনের ব্রহ্মসত্তার সহিত একীভূত হইয়া গেল, ভগবান পরমহংস নির্বিকল্প সমাধিতে নিমজ্জিত হইলেন।

গান্ধীজীর মধ্যে এইরূপ, এই তমিস্রবিদারী অসির শাণিত শক্তির প্রকাশ দেখিব—এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া গিয়াছিলাম। তাহা যে পাই নাই এমন কথা বলিব না। তাহা ক্ষণে ক্ষণে দর্শন করিলাম, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত, নবসমাজের সংস্কারের অবশেষও গান্ধীজীর মধ্যে লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

গান্ধীজীকে বিদ্যুৎশিখার পরিবর্তে বরং মহা মহীরুহের মতই মনে হইতে লাগিল। অনুভব করিতাম, যেন তাহাই তাঁহার যোগ্যতের প্রতীক। মানুষ কত বড় হইতে পারে, অপর মানুষের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াও কেমন ভাবে আকাশস্পর্শী হইতে পারে, তাহারই সাক্ষাৎ গান্ধী-চরিত্রের মধ্যে লাভ করিয়াছিলাম। ধরণী হইতে উদ্ভূত বিশাল মহীরুহ শত শত যুগের বুদ্ধি ও বেদনার ভার বহন করিয়া জনসমাজের অরণ্যের পরপারে যে গগন বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, তাহাকেই যেন চুম্বন করিতেছে, কিন্তু ধরণীর সহিত যোগ তাহার বিচ্ছিন্ন হয় নাই। আর শুধু ছিন্ন হয় নাই, এমন নহে। যে শিকড় মাটির মধ্যে বর্তমান রহিয়াছে, তাহার শিরায় শিরায় যে সকল মাটির ঢেলা জড়াইয়া রহিয়াছে, যে মৃত্তিকাস্তূপ হইতে, যে অগণিত ক্ষুদ্রতর জীবরাশির দেহপঙ্ক রসাস্বাদনে মহীরুহ পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি, সেই মাটির প্রতি,

সেই জীবকণিকার প্রতি, তাহার যেন মমতার অবধি নাই। তাহাদের রক্ষা করিতে, নিজের পত্রবাজির আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকেই সমৃদ্ধ করিতে যেন এই বৃদ্ধ মহীরুহের যত্নের শেষ নাই।

নোয়াখালিতে গান্ধীর নিকট গিয়াছিলাম, গান্ধীজী ইদানীং যেন নরম হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৯৪২ সালের অগস্ট মাসে কারাবাসের পূর্বে তাঁহার চরিত্রে অসির প্রভার মত যে তীব্রতা প্রকাশ পাইত, কারাবাসের সময়ে মহাদেব দেশাই এবং তৎপরে কস্তুরবার মৃত্যুর পর নাকি তাহা হ্রাস পায়। আমি যে অবস্থায় ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহার সঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম, তাহা ইহারও পরের ঘটনা। বিচিত্র নয় যে, মানবের প্রতি কোমলতা, অপরকে রক্ষা করিবার, ধারণ করিবার, পোষণ করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার চরিত্রে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিল, পুরুষ মাতৃত্বের মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছিল।

ভারতীয় শিল্পে অর্ধনারীশ্বরের এক অপরূপ কল্পনা একদা কোনও সাধক সৃজন করিয়াছিলেন। পাথরের গড়া মূর্তিতে নয়, মাটির গড়া মানব-চরিত্রের মধ্যে, তাহারই প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইয়াছি। ধন্য হইয়াছি।

শ্রীনির্মলকুমার বসু

হিন্দী বনাম বাংলা

'শনিবারের চিঠি'তে রাষ্ট্রভাষা সম্বন্ধে আলোচনা দেখি। এই প্রসঙ্গে আমি কিছু বলা দরকার মনে করি। হিন্দী ও হিন্দুস্থানী নিয়ে যা মতবিরোধ সেটা এ প্রদেশের, আমাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। গান্ধীজী হিন্দুস্থানীর সমর্থক ছিলেন, জওহরলালও তাই। রাজনৈতিক কারণে অন্ততঃ হিন্দুস্থানী থাকা উচিত। তা ছাড়া হিন্দুস্থানী ভাষাটি চমৎকার। আমি ওটাকে সৌজন্যের ও প্রেমকাব্যের ভাষা ব'লে জানি। জওহরলালের ওপর হিন্দীর প্রবর্তকেরা খুশি নন। হিন্দীর দিকে জোর অনেক। যারা এই ভাষা বলে, তাদের সংখ্যা অপরিমেয়। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিন্ধ্য-প্রদেশ, রাজস্থান, পূর্ব-পাঞ্জাব হিন্দীভাষী। তা'র পিছনে এ সকল প্রদেশের সরকারী জোর আছে এবং হিন্দীকে অগ্রবর্তী করবার জন্য হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনের মত প্রতিষ্ঠানের ও শ্রীপুরুষোত্তমদাস টণ্ডন, শেঠ গোবিন্দদাস ও

রাহুল সাংকৃত্যায়নের মত রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির জোরালো তাগিদ আছে। বাঙালীর তরফ থেকে হিন্দীর দাবিকে জোরালো করেছেন প্রধানত শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এখানকার 'অমৃতবাজার পত্রিকা'ও হিন্দীই যে রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত খুব প্রচার করেছেন। হিন্দীর সবল প্রতিবাদী শিখ, মাদ্রাজী ও মারাঠীরা; বাঙালী একেবারেই নয়।

বাঙালী যে প্রতিবাদী নয় তার কারণ বোধ করি যে, আমাদের পরোক্ষ-ভাবে উপলব্ধি আছে যে বাংলা সাহিত্য ভঙ্গুর নয়, কোন রাষ্ট্রভাষাই তার ক্ষতি করতে পারে না। বাংলা সাহিত্য প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে হিন্দী মারাঠী ও গুজরাতী সাহিত্যের পুষ্টিসাধন ক'রে আসছে, এ কথাটা পুরানো। কিন্তু যে কথাটা এ সম্পর্কে নূতন ক'রে বলা যেতে পারে তা এই যে, অ-বাঙালী সাহিত্যের এ গ্রহণপ্রবণতার আমরা কোনদিন সুযোগ নিই নি, যা বহুকাল পূর্বে নেওয়া আমাদের কর্তব্য ছিল। তা হ'লে আজ আমাদের কান্নাকাটি করতে হ'ত না। আমার মনে হয়, এখনও সে শুভক্ষণ হারিয়ে যায় নি। এখনও আমাদের দেবার ও নেবার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

যা লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাতে এ কথা জোর ক'রে বলা যায় যে, হিন্দীর জয় হবেই। হিন্দীতে এমন বড় লেখক দেখি না, যে নিজের প্রতিভা দিয়ে হিন্দী সাহিত্যকে আগিয়ে দিতে পারে, সবই সাধারণ ব'লেই ধ'রে নেওয়া উচিত। কিন্তু হিন্দী সাহিত্যিকদের একটি অসাধারণ গুণ আছে, সেটি তাঁদের নিষ্ঠা ও হিন্দী সাহিত্যকে বড় করবার জেদ। এঁদের সাহিত্যগত কিছু আচার আমার খুব ভাল লাগে। তার ছেলেমানষী অংশটুকু বাদ দিয়ে সে সব আমাদের জানবার ও শেখবার মত। ছেলেমানষী—ফরমাশ দিয়ে বড় সাহিত্য গ'ড়ে তোলার তাগাদা। এ তাগাদাটা নিত্য ও তার হাস্যকর দিকটার বিষয়ে বড় ছোট কোন হিন্দী সাহিত্যিকই সচেতন নন। এঁদের সকলের ধ্রুব বিশ্বাস যে, একবার কলম নিয়ে বসলেই রবীন্দ্রনাথ বা শেক্সপীয়রের মত সাহিত্যসৃষ্টি করা যেতে পারে। এটাকে আমি হিন্দী সাহিত্যের প্রচারের দিক বলব। হয়তো এই সন্ধিক্ষণে এ রকম ছেলেমানষী কথা বার বার বলারও প্রয়োজন আছে।

এঁদের গুণের দিকটা লক্ষ্য করবার মত। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন ও

হিন্দুস্থানী অ্যাকাডেমি সাহিত্য প্রচারের জন্য যথেষ্ট তৎপর ও অর্থব্যয় করেন। এ দুটি প্রতিষ্ঠান খুব সজীব ও সক্রিয়। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সে ক্রিয়াশীলতা ও সজীবতা নেই। দূর থেকে মনে হয়, এদের তুলনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ এখন একটা মিউজিয়মে দাঁড়িয়েছে। প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের তো কথাই নেই, সেটা কেবল একটা বাৎসরিক সামাজিক মিলন-ক্ষেত্র, তা দিয়ে বাংলা সাহিত্যের বিন্দুমাত্র কোন শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, এমন কথা আমার জানা নেই।

হিন্দী সাহিত্যিকদের জেদ আমার ভাল লাগে। তাঁদের দলাদলি নেই। হিন্দী সাহিত্যকে বিপন্ন মনে করলে এঁরা একযোগে কাজ করতে পারেন। ব্রিটিশ শাসনকালে বোখারির অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও-র বিরুদ্ধে সকল হিন্দী সাহিত্যিকের ধর্মঘট মনে রাখার মত ঘটনা। তাতে অনেকের অন্নে হাত পড়েছিল। আমরা বৎসরান্তে সাহিত্য-সভা করি এখানে ওখানে। হিন্দী সাহিত্যিকদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান তো আছেই, তার মত এত সাহিত্যিক ও সাহিত্যমোদীর সমাগম বোধ করি আমাদের কোন সাহিত্য-সভাতে কোনকালে হয় না। এঁরা কেবল এই বাৎসরিক সভা ক'রেই ক্ষান্ত নন। কবি-সম্মেলন ও মুশায়রা এঁদের নিত্যকারের অনুষ্ঠান। একটু সুযোগ পেলেই, পাঁচজন লোক একত্র হবার সম্ভাবনা হ'লেই, সেখানে কবি-সম্মেলন আহ্বান করা একটি চমৎকার অভ্যাস। তাতে শুধু নূতন কবি ও লেখককে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা হয় না, একসঙ্গে ব'সে বিচার আলোচনা করারও একটা মস্ত মূল্য আছে। সারারাত্রি ধ'রে সাহিত্যামোদীদের কবি-সম্মেলন এ প্রদেশে নিত্যকার ব্যাপার। তা থেকে কেউ উঠে যায় না, ঘুমে ঢুলেও পড়ে না, তন্ময় হয়ে কাব্যালোচনা শোনে। এঁদের দেখলে আমার মনে হয় যে, এমন সাহিত্য-ফ্যানাটিক ও সাহিত্য-মাতাল লোক আর কোন দেশে নেই। আজ হিন্দীতে কোন প্রতিভাসম্পন্ন লেখক নেই, কিন্তু এ কথা আমি খুবই বিশ্বাস করি যে, এই সাধনার শক্তি তিলে তিলে সঞ্চিত হয়ে একদিন তুলসীদাসের পুনরাবর্তনের কাল পরিপক্ব হয়ে উঠবে, প্রতিভার আগমন হবেই, যেমন ক'রে বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের উদয় হয়েছিল পূর্বকালের নিরবচ্ছিন্ন সাধনার কারণে। এর সঙ্গে এখানকার বাঙালীর রবীন্দ্র-সাহিত্য-বাসর তুলনীয়। মাসে একবার এই সভা। দু-চারশো লোক থাকে যতক্ষণ চলে নাচ-গান, কিছু পাঠের সময়ে যাঁ

দশজন লোকও উপস্থিত থাকে সেটাকে খুব সফল সভা বলতে হবে। আমাদের উচিত, এই কবি-সম্মেলনের প্রথা নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করা।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের মত যে, বর্তমান কালের সকল সাহিত্যই অকিঞ্চিৎকর। এ কথাটার গায়ের জোরেও প্রতিবাদ করা যায় না। বর্তমান হিন্দী সাহিত্যকে এ পর্যায়ে ফেলা অন্যায় হবে না। এ সাহিত্যের পরিধি খুব ছোট, শুধু কাব্য ও গল্প-সাহিত্য। তুলনায় গল্পের চেয়ে কাব্যপ্রচেষ্টাকে ভাল ও বড় বলা যায়। গল্প-সাহিত্যে আলোচনার অংশটা খুবই কম। হিন্দী উপন্যাস, বর্তমান বাংলা উপন্যাসের মত, জার্নালিজমের দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত। শুধু উদ্দেশ্যমূলক, ঘটন-গঠন জাতীয় ভিত্তিতে, দেশাত্মবোধক গভীরতর ও কঠিনতর প্রকাশ বিষয়ে হিন্দী লেখকদের মিলনের কোন চেষ্টা দেখা যায় না। হিন্দীর স্থায়ী কোন রঙ্গমঞ্চ নেই, কাজেই বাংলা দেশের মত নাটকের হাতে কলমে শিক্ষা হিন্দী নেই। রেডিওর চাহিদার কারণে এখন এ দেশে একাঙ্ক নাটক লেখার ধুম লেগে গেছে। ভারতীয়রা কখনও থিয়েটার দেখে নি, এমন নাট্যকারের লেখা নাটক রেডিওতে প্রচার হ'তে দেখেছি। কাজেই, বর্তমান কালে হিন্দী নাটক অভাব প্রাচীন ব'লে মনে হয়। হিন্দী ছোটগল্পের ছাঁচ এখনও কারও গ'ড়ে ওঠে নি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য যেমন, হিন্দী সাহিত্যও তেমনই তিনটি প্রবল প্রভাবের দ্বারা আক্রান্ত। সে প্রভাব সিনেমা, রেডিও ও জার্নালিজমের। ক্যামেরার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার জন্য চিত্রশিল্পে নানা অঙ্কনপদ্ধতি গ'ড়ে উঠেছে, কিন্তু সাহিত্যকে রক্ষা করবার কোন উদ্যোগ কোথাও দেখা যায় না। বাংলা সাহিত্যের নিকটবর্তী অতীতটা খুব মজবুত ও জোরালো; কাজেই বর্তমান কালের এ তিনটি প্রভাব তার সমূহ ক্ষতি করতে পারবে না ব'লেই মনে হয়। হিন্দী সাহিত্যিকেরাও এ প্রভাবের অত্যন্ত অহিতকর ফল সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন নয়, বরং সিনেমা-রেডিও ও সংবাদ-সাহিত্যকে প্রকৃত সাহিত্য ব'লে গ্রহণ করবার খুব ঝোঁক দেখা যায়। কালের গুণে এখনকার ইংরেজী গল্প-সাহিত্যে যেমন, সমসাময়িক কাল মানুষ-নায়ককে স্থানচ্যুত ক'রে নিজেই নায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলা সাহিত্য এ নূতন বিপদ থেকে মুক্ত নয়, হিন্দী তো নয়ই। সমসাময়িক কালকে নায়ক সাজান প্রথম এডগার অ্যালেন পো। তাঁর লেখার ধরনের কারণে তাঁর এ নূতন নায়কের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু

এই নূতন নায়কের আগমন দেখে শঙ্কিত হয়েছিলেন বিখ্যাত ফরাসী লেখক, গঁকুর ভ্রাতারা। তাঁরা বলেছিলেন, সেই ১৮৫৬ সালে যে, একদিন মানুষ তার অফুরন্ত দুঃখবেদনা সত্ত্বেও সাহিত্যে আর নায়কত্ব করবে না, করবে এই সমসাময়িক কাল, সেই হবে মুখ্য, আর মানুষ ও তার সকল প্রকাশ হবে গৌণ। ইংরেজ সাহিত্যিকদের এ বিষয়ে সচেতনতা দেখি, নিত্য প্রতিবাদ পড়ি। আমাদের এ বিষয়ে চৈতন্য হয় নি, হিন্দী সাহিত্যিকের বয়স এখনও অপরিণত, তার তো হবার কথাই নয়। ইংরেজী সাহিত্য এ নূতন প্রয়াসের দ্বারা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না, সেটা আপনা হতেই শুকনো পাতার মত ইংরেজী সাহিত্যের অঙ্গ থেকে খ'সে পড়বে। বাংলা সাহিত্যের, রবীন্দ্রনাথ সত্ত্বেও, ক্ষুণ্ণ হওয়া সম্ভব। কিন্তু হিন্দী সাহিত্যের এ ঘোর বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ কথা নয়। একা প্রেমচাঁদের প্রভাব এ দুর্ঘটনার ফল ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। সে প্রভাব কতটুকুই বা! সাহিত্যের ভেতর দিয়ে সমাজ-সংস্কার করবার প্রবণতা হিন্দী লেখকদের খুবই বেশি, কাজেই এ প্রয়াসটা সাহিত্যিক না হয়ে একান্ত প্রচারধর্মী ও উদ্দেশ্যমূলক হয়ে পড়ে। তুলনামূলক এই অল্প কয়েকটি কথা বলাই যথেষ্ট।

হিন্দীর এলাকায় অনেক বাঙালীর বাস। দেশের নূতন পরিকল্পনায় আমাদের নিজের বিশিষ্ট সংস্কৃতি বজায় রাখা এখনই কঠিন হয়ে উঠেছে, পরে আরও হবে ব'লে মনে হয়। এখন থেকে সচেতন ও সাবধান না হ'লে সংঘর্ষণ ঘটাও আশ্চর্য নয়। রক্ষা পাবার দুটো ছাড়া তিনটে উপায় নেই। প্রথম উপায়, নিজের সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাওয়া, অনেকে এই পথ এখনই ধরেছেন। নূতন পরিচয়ে দেখি "বাংলাভাষী বিহার", "বাংলাভাষী হিন্দুস্থানী"। এটা আত্মবিক্রয় ক'রে টিকে থাকার ও অন্নসংস্থান করার সহজ পথ ব'লে মনে হ'লেও প্রকৃতপক্ষে সহজ নয়, শুধু হীনতা স্বীকার করা। এই হাত-কচলানো সত্ত্বেও পাটনা রেডিওতে আমি আজ পর্যন্ত একটিও বাংলা শব্দ উচ্চারিত হতে দেখি নি। মানুষ যেখানেই যাক নিজের দেশের জলবায়ু, দেশ, খাদ্য, আচার-আচরণ নিজের সঙ্গে নিয়ে যায়। এ কথা বৈজ্ঞানিক সত্য। অন্তত বলেছেন জুলিয়ন হক্সলি, হাডন ও কার-সণ্ডার্স সাহেব। আমার বাবা ও পিতৃবন্ধু শ্রীকেদারনাথ বাঁড়ুজ্জে মহাশয় উত্তর চীনের টিনসিন শহরে থাকতেও ধুতি পাঞ্জাবি প'রে, দেশী শাক-চচ্চড়ি খেয়ে নিজের দেশ ও জাতিকে স্মরণ

করতেন। আমি জম্মু শহরে এক ডোগরার বাঙালী স্ত্রী দেখেছি। মেয়েটি নিম্নশ্রেণীর ও অশিক্ষিত হ'লেও নিজের ভাষা ও বাঙালীত্বের শাঁখা-সিঁদুর বর্জন করে নি। শিয়ালকোটের কাছে এক নিভৃত গ্রামে আমি আর একটি বাঙালী মেয়ে দেখেছি, তার স্বামী পাঠান। কিন্তু মেয়েটির ঘরে শিবলিঙ্গ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, সঞ্চয়িতা। নিজের সংস্কৃতি আমরা পরিহার করতে চাইলেও সংস্কৃতি তার মানব-রক্তের বাসা ছেড়ে যেতে চাইবে ব'লে মনে হয় না। মন-যোগানো, সুযোগ-সুবিধার চেয়েও জন্মের কারণে, ঐতিহ্যের কারণে বাঙালীর প্রাণবায়ু বাঙালীত্ব দিয়েই গঠিত, সেইটাই বড় কথা। প্রকৃত বাঙালী না হ'লে প্রকৃত ভারতীয়ও হওয়া যায় না, তার উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ, যাঁর বাড়া আর নেই।

দ্বিতীয় পন্থা, নিজের খোঁটার জোর বাড়িয়ে, তাতে জোর রেখে আক্রমণক হওয়া। এ দেশের ভাষা, সাহিত্য, বিশিষ্ট সংস্কৃতি আয়ত্ত ক'রে নূতন রূপে এ দেশকেই দেওয়া, যা এ দেশে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ক'রে গেছেন। আর, এই দেশেরই কায়মনোবাক্যে কল্যাণ চাওয়া, "প্রবাসী" হয়ে থাকা নয়। সাহিত্যের দিক দিয়ে যুক্তপ্রদেশের লোকেরা বাঙালীকে আজও হিংসা করে না, খুবই শ্রদ্ধা করে। বাঙালী সংস্কৃতির ওপর ঝোঁকও কম দেখা যায় না। সন্দেশ রসগোল্লা থেকে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎবাবুকে এরা আজও নিজের ব'লে জানে। ঐক্যের বন্ধন আজও আছে, যদিও কিছু অর্বাচীনের রবীন্দ্রনাথকে খাটো করবার প্রয়াসও দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমরা নিজেদের পূর্ব মর্যাদা আর যে রক্ষা করতে পারছি না, সেটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের দোষ। আমরা সর্বরকমে ছোট হয়ে গেছি, যার বাড়া আর দুঃখ নেই। দোষটা বড় কম নয়। আমরা আর নিতেও পারি না, দেবার শক্তি তো নেইই। প্রথম আমরা যখন এ দেশে আসি, তখন আমার বয়স আট বছর। উর্দু আর হিন্দীতে হাতেখড়ি তখনই হয়েছিল। তারপর এ দেশে যখন স্থায়ীভাবে এলুম, তখন আমার বয়স তেরো, হিন্দী ও উর্দু অবশ্যশিক্ষণীয় হ'ল। একসঙ্গে তিনটি অ-বাঙালী ভাষা শিখতে গিয়ে লেখাপড়া না হতে পারে, কিন্তু মারা যাই নি, বাপ-মাও কান্নাকাটি করেন নি। আমার বি. এ. ক্লাসেও এমন বাঙালী সহপাঠী ছিলেন, যাঁরা ফারসী পড়তেন। উর্দু ও ফারসীনবিসের বাঙালী সমাজে বেশ প্রাচুর্য ছিল। অথচ তাঁরা কেউই বাঙালীত্ব পরিহার করেন নি। এখনকার এদেশী বাঙালী

উর্দু দূরের কথা, হিন্দীর নামেই শিউরে ওঠেন। সবচেয়ে বিশ্রী জিনিস যা প্রায়ই কানে শুনি সেটা নিজেদের জাতি ও ভাষাকে শ্রেষ্ঠতর মনে ক'রে হিন্দীকে হেয় ভাবা। আগে আমরা দু মাসের জন্য বিলেত গেলে অক্সফোর্ড ড্রলের বাঁকা বুলি আওড়াবার চেষ্টা করতুম। ছ বছর এ দেশে বাস ক'রে হিন্দী ব'লে এক গ্লাস জল চাইতেও শেখেন নি, এমন ভয়াবহ বাঙালী আমার আশেপাশে সমারোহ ক'রে আছেন। অথচ হিন্দী অত্যন্ত সৌজন্যের পোলাইট ভাষা। হিন্দী এখন বাঙালীর স্কুলেও অবশ্যশিক্ষণীয় হয়েছে, তা নিয়ে হা-হুতাশের অন্ত দেখি না। আর উঠে গেছে এদেশবাসীদের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপন করার চমৎকার অভ্যাস। বনেদী বাঙালীর সামাজিক আদান-প্রদান এখনও কিছু আছে, নবাগতের একেবারেই নেই ভাষার অজ্ঞতার কারণে। বই প'ড়ে কোন ভাষা সম্যক আয়ত্ত হয় না, তার প্রকৃষ্ট পথ মানুষের মুখ থেকে শেখা।

৺অমৃতলাল শীল ফারসী ও উর্দুর পণ্ডিত ছিলেন। বহুকাল পূর্বে ৺রামানন্দবাবুর তাগিদে তিনি জেবউন্নিসা থেকে গালিব পর্যন্ত বহু বিশিষ্ট কবির রচনা বাংলায় ভাষান্তরিত ক'রে গেছেন। উর্দুর প্রথম সাহিত্যালোচনার সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন ৺মাখনলাল মিত্র ১৮৭৮ সালে কিংবা ১৮৮০ সালে, আগ্রা থেকে। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন ৺চিন্তামণি ঘোষ। আমাদের যুবক বয়সে কবি অতুলপ্রসাদের বাড়িতে প্রতি রবিবারে জটলা হ'ত। তিনি আমাদের সামনেই কজরী গ্রহণ ক'রে বাংলা ভাষায় কজরী রচনা করেছিলেন। তাঁর মুখে প্রথম আমরা বাংলা কজরী গান শুনি। তারপর এই গ্রহণ করবার ব্যাপারটা উঠে গেল। বোধ করি এখন বাঙালী ঐতিহাসিক ছাড়া আর কেউ উর্দু হিন্দী নথিপত্র ঘাঁটে না। ঠেট হিন্দীর পুরাতন কাব্য খুবই চমৎকার। কজরী রসিয়া লোকগীতির রত্নসম্ভার এখনও আমাদের গ্রহণ করবার অপেক্ষায় আছে। যাঁরা কবিতা রচনা করেন, এমন লোকের এ বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, কিন্তু কোনও ফল হয় নি।

বাঙালী হিন্দী লিখতে পারেন এমন দু-চারজন আছেন, কিন্তু তাঁরা সাহিত্যিক-গুণসম্পন্ন নন। নিজের অভিজ্ঞতার কারণে বলতে পারি যে, আমাদের হিন্দী লেখার দুটি অন্তরায়। প্রথম, আমাদের ভাষা অত্যন্ত সংস্কৃত-শব্দবহুল আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। শব্দবিন্যাস ও শব্দমাধুর্য আয়ত্ত করা বহু সাধনা

ভিন্ন সম্ভব হয় না। এই শিক্ষানবিসী কালটা অত্যন্ত কষ্ট ও দুরূহ। সবচেয়ে বড় বাধা লিঙ্গভেদের কচকচি আয়ত্ত করা। "লোটা ডুব গয়া" "লুটিয়া ডুব গঈ" এই বিভেদ আমাদের পক্ষে সমস্যামূলক ব্যাপার। ইংরেজী Preposition-এর নির্ভুল ব্যবহার যেমন কোন ভারতীয় লেখকের কোনদিন আয়ত্তীভূত হ'ল না, হিন্দীর লিঙ্গভেদ তেমনই আমাদের সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত হবার নয় ব'লেই আমি মনে করি। লিঙ্গের পার্থক্য সর্বত্র এক নয়। কাশী প্রয়াগ লক্ষ্ণৌ মথুরার ব্যবহারে একই ক্রিয়ার ব্যবহার সর্বদা এক নয়। তাতে হিন্দুস্থানীরাও ভুল করে। কিন্তু আমাদের বেলায় যে ভুলটা হাস্যকর, তাদের বেলায় নয়, কতকটা ভিন্ন "মুহাবরা"-য় দাঁড়ায়। 'শনিবারের চিঠি' পঞ্জাবী লেখকের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁদের এ বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয় না, লিঙ্গভেদটা তাদেরও একই ধরনের ব'লে। এইটুকু ছাড়া আমাদের হিন্দী লেখার কোন বাধা নেই। ভাষার চর্চা পাঠ ও মেলামেশার দ্বারা আয়ত্ত করা অসম্ভব নয়! আমাদের হিন্দী সম্পূর্ণ ক'রে শিখতে হবে, হিন্দী থেকে নিতে হবে, তাকে দিতেও হবে। শব্দের বর্ণপর্যায়, স্বাদিষ্ট শব্দের বেলায় হিন্দী দরিদ্র। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে আমাদের সে ঐশ্বর্য কম নয়। আমরা দু হাতে তা বিলিয়ে হিন্দীকে সমৃদ্ধ করতে পারি। ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করার গর্ব বাঙালীর আছে। হিন্দী বাংলা ভাষার সহোদর ভগ্নী। শ্যালিকার অনুগ্রহলাভ করার মত সেটাকে যথেষ্ট আয়ত্ত করা বেশ সহজ কথা। আমি স্বপ্ন দেখি যে, একদিন বাঙালী লেখক হিন্দী সাহিত্যে বন্যা ডেকে আনবে। সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় আমাদের শুধু বাংলার বাইরে পা বাড়াবার উদ্যমের দরকার।

আমি নিয়ম ক'রে দুটি ইংরেজী সাহিত্য-পত্রিকা পড়ি। সে দুটির নাম Penguin New Writing ও Horizon। এ দুটি পত্রিকার আলোচনা কেবল ইংরেজী সাহিত্যে আবদ্ধ নয়। আধুনিক গ্রীক ও চীনা সাহিত্যও আমি তাতে আলোচিত হতে দেখেছি। পত্রিকা দুটির নূতনকে জানবার আগ্রহ খুবই। New Writing-এর সম্পাদক জন লেহ্‌ম্যান আমাকে বাংলা সাহিত্যের বিষয়ে লেখবার নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। পাছে আমার হাতে প'ড়ে বাংলা সাহিত্য-পরিচয় An Acre of Green Grass-এ দাঁড়ায়,

(৩৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

২

এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মক্ষেত্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই হরপ্রসাদ সে-যুগের অপর এক শ্রেষ্ঠ মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইনি—প্রবীণ পুরাতত্ত্ববিৎ রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ইঁহারই সাহচর্যে কলিকাতায় হরপ্রসাদের প্রকৃত কর্ম-জীবনের সূত্রপাত হইয়াছিল; তিনি প্রধানতঃ পুরাতত্ত্ব-চর্চায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

হরপ্রসাদ লিখিয়া গিয়াছেন, ১৮৭৮ সনে রাজেন্দ্রলাল প্রথমে তাঁহাকে গোপালতাপনী উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ করিতে বলেন। এই সময়ে রাজেন্দ্রলাল নেপাল হইতে আনীত সংস্কৃতে লিখিত বহু বৌদ্ধ পুথির বিবরণমূলক তালিকা প্রস্তুতকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পুথিগুলির উদ্ধৃত অংশের বা বিবরণের ইংরেজী অনুবাদ তাঁহারই সম্পন্ন করিবার কথা, কিন্তু দীর্ঘকাল অসুস্থ হইয়া পড়ায় হরপ্রসাদের সাহায্য চাহিয়াছিলেন। ন্যস্ত কার্য্যটি হরপ্রসাদ কিরূপ যত্নের সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন, ১৮৮২ সনে প্রকাশিত *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* গ্রন্থের ভূমিকায় রাজেন্দ্রলাল তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন; তিনি লিখিয়া গিয়াছেন:—

> "It was originally intended that I should translate all the abstracts into English, but during a protracted attack of illness, I felt the want of help, and a friend of mine, Babu Haraprasad Sastri, M. A., offered me his

---

* রমেশচন্দ্র দত্ত সায়নের ভাষ্য অবলম্বনে ১৮৮৫ সনে ঋগ্বেদের যে অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার ভূমিকায় লিখিয়া গিয়াছেন:—"এই প্রণালীতে অনুবাদ কার্য্য সম্পাদন করিবার সময় আমি আমার সুহৃদ্ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীহর-প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। হরপ্রসাদবাবু সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রসমূহে কৃতবিদ্য;—তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ও শাস্ত্রী উপাধি হইয়া পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎ কার্য্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরু কার্য্য সমাধা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।"

co-operation, and translated the abstracts of 16 of the larger works. His initials have been attached to the names of those works in the table of contents. I feel deeply obliged to him for the timely aid he rendered me, and tender him my cordial acknowledgments for it. His thorough mastery of the Sanskrit language and knowledge of European literature fully qualified him for the task ; and he did his work to my entire satisfaction. I must add, however, that I did not deem it necessary, nor had I the opportunity, to compare all his renderings with the originals."

প্রকৃতপক্ষে হরপ্রসাদ এই প্রবীণ প্রাচ্যবিদেরই নিকট পুথির তালিকা প্রণয়ন কার্য্যে দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন। যে-কার্য্যের জন্য পরবর্ত্তী জীবনে তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাহারই সূচনা বলিতে হইবে।

রাজেন্দ্রলাল এশিয়াটিক সোসাইটির স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার আনুকূল্যে হরপ্রসাদ ১৮৮৫ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সোসাইটির সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হন; সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাষাতত্ত্ব কমিটিরও (Philological Committee) সভ্য হইয়াছিলেন। তদবধি সোসাইটির বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা গ্রন্থমালার তত্ত্বাবধানকার্য্যে তিনি ডঃ হর্নলিকে সাহায্য করিতে থাকেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সোসাইটির Joint Philological Secretary নির্ব্বাচিত হইয়া বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা গ্রন্থমালার সংস্কৃত-বিভাগের তত্ত্বাবধান ভার প্রাপ্ত হন। ১৯০৭ সনে সোসাইটির আজীবন সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়া পর্য্যন্ত তিনি এই কার্য্য অতীব যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সোসাইটি তাঁহাকে ১৯১০ সনে "ফেলো" এবং ১৯১৯-২০ ও ১৯২০-২১ সনে উপর্য্যুপরি দুই বার সভাপতির পদে বরণ করিয়া গুণেরই সমাদর করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রলালের উপর এশিয়াটিক সোসাইটির পুথি-সংগ্রহের ভার ছিল। তিনি ১৮৭০ সন হইতে সোসাইটির আনুকূল্যে সংগৃহীত-পুথির বিবরণ *Notices of Sanskrit Mss.* নামে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহার

১০ম খণ্ড, ১ম ভাগ (ইং ১৮৯০) প্রকাশিত হইবার অল্প দিন পরে ১৮৯১ সনের ২৬এ জুলাই তাঁহার দেহান্ত হয়। হরপ্রসাদই ১০ম খণ্ডের শেষার্দ্ধ বা ২য় ভাগ সঙ্কলন ও প্রকাশ করেন (ইং ১৮৯২)। সমগ্র দশ খণ্ডের সূচীও তাঁহারই কৃত। রাজেন্দ্রলালের অবর্ত্তমানে সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষ জুলাই মাসেই হরপ্রসাদকে পুথি-সংগ্রহ-কার্য্যের পরিচালক (Director of the Operations in search of Sanskrit Mss.) পদে অভিষিক্ত করেন। তদবধি প্রায় সারা জীবনই তিনি পুথি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে ভারতের বিভিন্ন স্থান ও বিদ্যাকেন্দ্রগুলি পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছে; এমন কি নেপালের মত প্রত্যন্ত প্রদেশেও তিনি একবার নহে—চারি বার গমন করেন। সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্যের বহু দুর্লভ পুথি তিনি নেপালে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যের ব্যাপকতা ও বিশালতা উপলব্ধি করা যায়—সোসাইটির সেক্রেটরীকে প্রদত্ত পুথি-সংক্রান্ত তাঁহার রিপোর্টগুলি হইতে; এগুলি নানা তথ্যসম্ভারে সমৃদ্ধ। এই সকল রিপোর্টের মধ্যে আমরা এই কয়খানির সন্ধান পাইয়াছি :—

1892 Report of the Operations in search of Sanskrit Mss (Sep. 1888—1891), 8 pp.

1895 Do (1892—Nov 1894), 20 pp.

(এই দুইটি রিপোর্ট ১০ম খণ্ড, ২য় ভাগ ও ১১শ খণ্ড *Notices of Sanskrit Mss*-এর সহিত মুদ্রিত হইয়াছে)

1901 Rep. on the Search of Sanskrit Mss (1895—1900), 25 pp.

1905 Do (1901—1902 to 1905—1906), 18 pp.

1911. Do (1906—1907 to 1910—1911), 10 pp.

হরপ্রসাদের পুথি-সংগ্রহকার্য্যে পারদর্শিতা ও পুরাতত্ত্বে বহুজ্ঞতার কথা সরকারের অবিদিত ছিল না। এই জন্য ১৯০৮ সনে অক্সফোর্ড হইতে আগত প্রাচ্যবিৎ ম্যাক্‌ডোনেল সাহেব যখন উত্তর-ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন, তখন তাঁহার সাহায্যকল্পে সহযাত্রী হইবার জন্য হরপ্রসাদই অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে হরপ্রসাদ অক্সফোর্ডে ম্যাক্সমূলর-স্মৃতিভবনের জন্য বহু দুষ্প্রাপ্য বৈদিক পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে আরও প্রায় ৭ হাজার দুর্লভ প্রাচীন পুথির সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে ক্রয় করিতে

পারেন নাই; ১৯০৮, ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি পুথিগুলি তাঁহার দৃষ্টিগোচর করিলে ম্যাকডোনেল এই পুথি-সংগ্রহের জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির তৎকালীন চ্যান্সেলর লর্ড কার্জনের নিকট আবেদন জানাইতে বিলম্ব করেন নাই। কার্জন নেপালের মহারাজাকে তার করেন। মহারাজা অক্সফোর্ডের বড্‌লিয়ান লাইব্রেরিকে উপহার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহারই অর্থে হরপ্রসাদকে পুথিগুলি ক্রয় করিতে বলিয়াছিলেন। হরপ্রসাদ এই সকল পুথির তালিকা প্রণয়ন ও যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জন হরপ্রসাদকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধারযোগ্য :—

1, Carlton House
Terrace, S. W.
5th January, 1910

My Dear Sir,

I have heard from Oxford of the invaluable part that you have played in arranging for the purchase, the cataloguing and the despatch to England, of the wonderful collection of Sanskrit manuscripts, which Maharaja Sir Chandra Shumshere Jung of Nepal has so generously presented to the Bodleian Library; and I should like both as a former Viceroy and Chancellor of the University to send you a most sincere line of thanks for the great service which your erudition, good will and indefatigable exertion have enabled you to render to us.

With the best wishes for the New Year and with the hope that scholars like yourself may never be wanting in India

I am,
Yours faithfully,
CURZON OF KEDDLESTON.

১৯০৯, ফেব্রুয়ারি মাসে এশিয়াটিক সোসাইটির কাউন্সিল রাজপুতানা

ও গুজরাটে ভাট ও চারণ কবিদিগের পুথিগুলি অনুসন্ধান করিবার জন্য হরপ্রসাদের শরণাপন্ন হন। এগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রথমে সার্ জর্জ গ্রীয়ার্সন ১৯০৪ সনে তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জনকে সচেতন করেন। কিন্তু চারি বৎসরের মধ্যে পত্রলেখালেখি ছাড়া পরিকল্পনাটি কার্য্যকর হয় নাই। এই কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে হরপ্রসাদের চারি বৎসর লাগিয়াছিল। এ-বিষয়ে ১৯১৩ সনে তিনি সোসাইটিকে যে *Preliminary Report on the Operation in Search of Mss. of Bardic Chronicles* দাখিল করেন তাহাতে প্রকাশ :—

"I have made three tours in Rajputana visiting some of the capitals and ancient towns therein and in Gujerat. I have submitted four Progress Reports since 1909 to the Society and I am now submitting a General Report of my work for the last four years. In the first year I visited Jaipur, Jodhpur and Baroda. In the third year, I visited Jaipur, Jodhpur and Bikanir, and in the fourth, I visited Bharatpur, Bundi, Ujjain, Mandasore, Ajmere, Jodhpur and Bilada."

উল্লিখিত চারি খানি Progress Report মুদ্রিত হইয়াছিল, অন্ততঃ একখানির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে ; উহা—*Report of a Tour in Western India in Search of Mss. of Bardic Chronicles.* 6 pp. এই সকল রিপোর্ট রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্ম ও সাহিত্য বিষয়ে রাজপুতানার ইতিহাসে নূতন আলোকপাত করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ১৩২১ সালে বর্দ্ধমান সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত হরপ্রসাদের "হিন্দুর মুখে আরঙ্গেবের কথা" প্রবন্ধ পঠিতব্য।

কিন্তু কেবলমাত্র পুথি সংগ্রহ করিয়াই হরপ্রসাদ তৃপ্ত থাকিতে পারে নাই। তিনি সংক্ষিপ্ত বিবরণী সহ তৎকর্ত্তৃক পরীক্ষিত নানা স্থানের ও নেপাল-দরবারের পুথিগুলির তালিকা প্রস্তুত কার্য্যেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পাদনায় এই তালিকাগুলি প্রকাশিত হয় :—

Notices of Sanskrit Mss.

First series : 1892 : Vol. X (2nd part).
1895 : Vol. XI (Indices).

Second series : 1898-1900 : Vol. I, pp. 432.
1898-1904 : II, „ 238.
1904-1907 : III, „ 253.
1911 : IV, „ 265

1905. *A Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nepal* Vol. I. (with a Historical Introduction by Cecil Bendall.)

1915. Do. Vol. II.

1915. *Catalogue of Manuscripts in the Bishop's College Library, Calcutta* (Under orders of the Government of Bengal.)

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনাকালে হরপ্রসাদের প্রচুর অবসর ছিল; তিনি সোসাইটির কার্য্যে—বিশেষ করিয়া পুথি-সংগ্রহ ও পুথি-সংরক্ষণ কার্য্যে যথেষ্ট সময় দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়া অবধি তাঁহার অবসর একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। তিনি দুঃখের সহিত সোসাইটিকে লিখিয়াছিলেন :—' My appointment to the Principalship of the Sanskrit College was rather unfortunate for my literary and scientific work." অগত্যা নিরলস কর্ম্মী হরপ্রসাদকে কলেজের ছুটির দিনগুলি দূরবর্ত্তী স্থানে পুথি-সংগ্রহ কার্য্যে অতিবাহিত করিতে হইত। ১৯০৮ সনের শেষ ভাগে সংস্কৃত কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সত্যই স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি সোসাইটির কাউন্সিলের নিকট প্রস্তাব করেন যে, সোসাইটির গৃহে গবমেণ্টের ও সোসাইটির নিজস্ব যে পুথি-সংগ্রহ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার একটি বিস্তৃত তালিকা—Descriptive Catalogue সঙ্কলন করিতে তিনি প্রস্তুত আছেন। এই প্রস্তাবে সোসাইটি যে কেবল সম্মত হইয়াছিলেন তাহা নহে, এই কার্য্যের জন্য মাসিক দুই শত টাকা বৃত্তি দিবারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।* এই সময়ে সোসাইটির গৃহে পুথির

* এই বৃত্তি সম্বন্ধে এশিয়াটিক সোসাইটির নথিপত্রে প্রকাশ :—

"Since 1909 Mm. Haraprasad Shastri has been in receipt of an allowance of Rs. 300. Of this Rs 100 was debited under the head Salary of Officer in charge of Bureau of Information, and Rs. 200 under the head Sanskrit Mss.

সংখ্যা ছিল—১১,২৬৪ খানি ; ইহার মধ্যে ৩১৫৬ খানি রাজেন্দ্রলাল কর্তৃক ও বাকী ৮১০৮ খানি হরপ্রসাদ কর্তৃক ক্রীত। এ সম্বন্ধে হরপ্রসাদ লিখিয়াছেন :—

"This is the first of a long series of volumes of a descriptive catalogue of Sanskrit manuscripts belonging to the Government collection in the Asiatic Society's Rooms,—collected since the institution of the Search of Sanskrit Manuscripts under the order of Lord Lawrence's Government in 1868. The number of the collection stands at present at 11,264; of these 3,156 were collected by my illustrious predecessor Raja Rajendralal Mitra, LL. D., C. I. E., and the rest by my humble self. Besides Sanskrit, it has manuscripts in Prakrit, Hindi, Marwari, Marhatti, Newari, and Bengali. But these form an insignificant part of the whole. The works relate to orthodox Hinduism, Buddhism of various yanas, Jainism of various schools, Vaisnavism, Saivaism, Tantrism and other systems of sectarian Hinduism. The various branches of the knowledge of the Hindus are well represented in this collection. Manuscripts are written in various scripts, Bengali, Devanagari, Udiya, Marwari, Kasmiri, Newari—both ancient and modern. Some of the ancient manuscripts go so far back as the 9th century A. D. There is one

---

Fund. The Shastri was proposed as President in 1918 and elected in February, 1919. It was thought desirable that a President should not be in receipt of emoluments from the Society. The Shastri waived his claims to a remuneration during his term of Presidency which lasted during 1919 and 1920. In 1921 he was appointed a Professor in the Dacca University and he again waived any claim to receipt of the old allowance (his letters of 17th May and 7th June, 1921) till the termination of his appointment, end June 1924. He offered to continue his work on the Catalogue gratuitously and to let the Government grants accrue during this period to be utilised for expenditure on printing." ('হরপ্রসাদ জীবনী', পৃ. ১১৪)

unique manuscript in ancient Bengali hand, copied undoubtedly in the last years of the 10th century. There are numerous manuscripts, dated in the 11th century. The subsequent centuries are very well represented....... Besides unique manuscripts which open up vast vistas of research in history, religion and sciences of ancient India, whole literatures are revealed in this collection. For instance, there are numerous works of Vajrayana, Mantrayana, Kalacakrayana to be found here, which throw a flood of light on those later phases of Buddhism which developed out of the Mahayana system. But for these works, these phases of the religion would have remained only a name." (*A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Government Collection under the care of the Asiatic Society of Bengal.* Vol. I. Preface)

হরপ্রসাদ Descriptive Catalogue-এর সমগ্র অংশ সম্পাদন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার জীবিতকালে এই কয় খণ্ড, তথ্যপূর্ণ মুখবন্ধ সহ, প্রকাশিত হইয়াছিল :—

ইং ১৯১৭ : ১ম খণ্ড—বৌদ্ধ সাহিত্য
১৯২৩ : ২য় খণ্ড—বৈদিক সাহিত্য
১৯২৫ ৩য় খণ্ড—স্মৃতি
১৯২৩ ৪র্থ খণ্ড—ইতিবৃত্ত ও ভূগোল
১৯২৮ ৫ম খণ্ড—পুরাণ
১৯৩১ . ৬ষ্ঠ খণ্ড—ব্যাকরণ ও অলঙ্কার

এই তালিকার অপরাপর খণ্ডের পাণ্ডুলিপি হরপ্রসাদেরই তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইয়াছিল; এগুলি সোসাইটি কর্তৃক ক্রমশ প্রকাশিত হইতেছে। ইতিমধ্যেই

ইং ১৯৩৪ : ৭ম খণ্ড—কাব্য
১৯৩৯-৪০ : ৮ম খণ্ড—তন্ত্র (দুই ভাগ)
১৯৪১ : ৯ম খণ্ড—দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য
১০ম খণ্ড—জ্যোতিষ

মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। বাকী কেবল—দর্শন, জৈন সাহিত্য, বৈষ্ণব ও বিবিধ। ডক্টর সুশীলকুমার দে যথার্থই লিখিয়াছেন :— "কেবল সংখ্যায় ও বিষয়-বৈচিত্র্যে নহে, বহু অজ্ঞাত ও দুর্লভ পুথির আবিষ্কারেও হরপ্রসাদের এই সংগ্রহ আজ পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ সংগ্রহের সমকক্ষ; এবং হরপ্রসাদের পণ্ডিতোচিত জীবনের একটি বিরাট্ ও অবিনশ্বর কীর্ত্তি। জীবনের পক্ষে এই বৃহৎ প্রচেষ্টাই পর্য্যাপ্ত।"

কিন্তু হরপ্রসাদের নিকট ইহা পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে হয় নাই। তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত কতকগুলি দুর্লভ সংস্কৃত পুথি প্রধানতঃ এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন ; সেগুলি—

ইং ১৮৮৮-৯৭ : বৃহদ্ ধর্ম্মপুরাণ (বিব্লিওথিকা ইণ্ডিকা, নং ১২০)

১৮৯৪-১৯০০ বৃহৎ স্বয়ম্ভূ পুরাণ (বি. ই. নং ১৩৩)
(নেপালের স্বয়ম্ভূক্ষেত্রের বিবরণ-সম্বলিত বৌদ্ধপুরাণ)

১৮৯৮ : 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ' (জর্নাল ১৮৯৮)

১৯০৪ : আনন্দভট্ট-কৃত 'বল্লালচরিত' (বি. ই. নং ১৬৪)

১৯১০ : সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' (মেমোয়ার, ৩য় খণ্ড, নং ১)

১৯১০ : রত্নকীর্ত্তি, পণ্ডিত অশোক ও রত্নাকরশান্তি-রচিত ছয় খানি বৌদ্ধ ন্যায়ের পুথি (বি. ই. নং ১৮৫)

১৯১০ : অশ্বঘোষ-কৃত 'সৌন্দরানন্দ' কাব্য (বি. ই. নং ১৯২)

১৯১০ : কুমায়ুন-রাজ রুদ্রদেব-কৃত বাজপক্ষী-শিকার সম্বন্ধীয় 'শ্যৈনিক-শাস্ত্র', ইংরেজী অনুবাদ সহ (বি. ই. নং ১৯৩)

১৯১৪ : আর্য্যদেব-কৃত 'চতুঃশতিকা' (মেমোয়ার, ৩য় খণ্ড, নং ৮)

১৯২৭ : 'অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ' (গায়কবাড় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ, নং ৪০)

এই সকল সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' ও আর্য্যদেবের 'চতুঃশতিকা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"তিনি কেবল প্রাচ্যবিদ্যার সংগ্রাহক বা ভাণ্ডারী ছিলেন না, এই বিদ্যার আহরণে ও সদ্ব্যবহারেও অসীম উৎসাহী ছিলেন। এই পুথিগুলি অবলম্বন

করিয়া বৌদ্ধ ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনেকগুলি নূতন গ্রন্থ সম্পাদন এবং বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।... প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ধর্ম্ম, ইতিবৃত্ত, ও সংস্কৃতির কোন দিকই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই; এবং পঞ্চাশ বৎসরের অধিককালব্যাপী পরিশ্রম, আলোচনা ও বহুদর্শনের পরিণত ফল এই পুস্তক ও প্রবন্ধগুলির বহু সহস্র পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রধান আসক্তি ছিল দুইটি বিষয়ে—মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম ও সাহিত্যের আলোচনা এবং নানা দিক দিয়া কালিদাসের গ্রন্থাবলির গুণগ্রাহিতা।...প্রাচীন লিপি ও শিলালেখ সম্বন্ধে তাঁহার ব্যুৎপত্তির পরিচয় *Epigraphica Indica* প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ পত্রিকায় পাওয়া যাইবে।...পথিকৃৎ হিসাবে এবং প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কারের জন্য প্রকৃত পণ্ডিতসমাজে এই জ্ঞান-তপস্বীর মর্য্যাদা কোন কালে ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। তিনি সাধারণ পণ্ডিত বা সাধারণ অধ্যাপক ছিলেন না। পশ্চিম ভারতে যেমন রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, পূর্ব্ব ও উত্তর ভারতে তেমনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচ্যবিদ্যার আধুনিক গবেষণার মূলপত্তন করিয়াছিলেন।...তাঁহার সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা বলিয়াছিলেন: He, of all people, has been the real father of Oriental Research in North India." (ডঃ সুশীলকুমার দে: 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা' ১৩৫৫)*

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হিসাবী

হারিয়ে গেছে আমার অনেক, হারিয়ে গেছি আমি,
ছেঁড়া খাতায় ক্ষতির হিসাব লিখছি দিবস-যামি

---

* অনবধানতাবশতঃ গত বারে এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে দু-একটি ভুল রহিয়া গিয়াছে। পৃ. ২৩৪, পংক্তি ১২: "নবেম্বর" স্থলে "অক্টোবর" পড়িতে হইবে। পৃ. ২৩৪, প. ২৬: "১৮৬১, ৯ই জানুয়ারি" প্রকৃতপক্ষে এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনের তারিখ; ঐদিন ১ম খণ্ড (Fas. 1) 'বৈশেষিকদর্শন' প্রকাশের সংবাদ ঘোষিত হয়; প্রকাশকাল বোধ হয় কিছু পূর্ব্বে।

কবিতাগুচ্ছ

বন্যার মৃত্তিকা দিয়ে যে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গড়া

বন্যার মৃত্তিকা দিয়ে যে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গড়া,
সে রাষ্ট্রের বাসিন্দা আমরা ;
এ বন্যার ধ্বংস থেকে জাগে নাকো ক্রন্দনের রোল,
শহীদের রক্তস্রোতে এ বন্যার তরঙ্গ নিটোল,
মানুষ মরে না কোন, সম্পদের নেই অপচয়—
কিষাণের চালাঘর এ বন্যায় অটল অক্ষয়,
শুধু মরে—
লুব্ধ বাজ মাংসলোভী শকুনের দল
নিরন্নের অন্ন লুঠে গ'ড়ে ওঠে যাদের মহল।

যাযাবর বৃত্তি কেন—জীর্ণবস্ত্র পেটভরা ক্ষুধা,
কেন রোগ, কেন শোক—কে বলে সে কৃপণ বসুধা!
অনেক উর্বরা মাঠ—
সোনার ফসল ঢেউ তোলে,
তবুও মেলে না ঘর—
ভেসে যাও অশ্রুর কল্লোলে ?
আজ তাই তীক্ষ্ণ অস্বীকার
কাকুতি মিনতি নয়, বক্ষে তোল বন্যার ঝঙ্কার !
কিছু যাবে— ?
যৎকিঞ্চিৎ ক্ষতি !
দধীচি দেয় নি হাড় ?
মৃত্যু দিয়ে জন্মের আরতি।

শক্তি আর সম্পদের আত্মঘাতী তৃষ্ণা দূর করে,—
সে বন্যার গান কবি লেখো আজ অক্ষরে অক্ষরে ;
শিল্পী তুমি মুক্ত-প্রাণ—
জীবনের আঘাতে আঘাতে—
লেখনী হয়েছে অস্ত্র—
তুলে ধর আসন্ন প্রভাতে।

অনেক দিনের পাপ অনেক ক্ষতির বোঝাপড়া,
মাংসলুব্ধ শ্বাপদের চালিয়াৎ বৈষ্ণবী আখড়া,—
এ বন্যায় ডুবে যাবে।
তিলে তিলে মেলে তিলোত্তমা ;
হাজারো ক্ষতের মুখে এ বন্যার মিলেছে উপমা।

কর্ণফুলি

নবজন্মের প্রভাতে দেখেছি কর্ণফুলি,
শ্যাম তটরেখা ইঙ্গিতে যাই সকলি ভুলি :—
অনেক কথার—
অনেক গানের পাপড়ি খুলি,
এসেছি আবার ওগো বিদেশিনী কর্ণফুলি।
বৈশাখী-বাতে তোমার বুকেতে আমার গান,
শুনেছি তাই তো আজকে বন্ধু—
এ অভিযান :
বহু জীবনের প্রত্যাশাটুকু
পেতেছে কান
বন্ধু, আমার ধরবে না হাত দেবে না দান ?
জীবন-মরুর পথচারী আমি—
ভরসা নাই,
বাণীহারা প্রাণে তাই তো মুখর—
তোমারে চাই ;
তোমার চোখেতে দুটি চোখ রেখে দীর্ঘকাল—
পার হয়ে যাব,
কাটবে না জানি ছন্দতাল।
লক্ষ বাহুর বেদনার তুমি
একটি সুর,
আমার প্রাণেতে তাই মায়াবিনী
এত মধুর ;
ঘুচুক দূর !

এক মুঠো ফুল এক ঝাঁক পাখি তোমার দূত,
কি অদ্ভুত।
আমায় টেনেছে আমার বাহিরে অকস্মাৎ,
অবগুণ্ঠন ছিঁড়ে ফেলে দাও অন্ধরাত।

উপলব্ধি

শ্রবণের বাতায়নে প্রিয়তমা আসে চুপিসাড়ে,
বিরহের খরতাপে জ্ব'লে যায় বসন্তসম্ভার ;
কোথা যাই কি যে করি—মুখ ঢাকি কোন্ অন্ধকারে,
প্রিয়ার সজল চোখে আনাগোনা দুর্বোধ্য ভাষার।

দিনের হাজারো কাজে অস্বীকার প্রেমের বেদনা—
মাটির পুতুল নয় খেলাঘর ভেঙে দিলে শেষ—
আকাশের সূর্য ঘোরে—অস্তরাগে আরক্ত চেতনা,
জীবন-দেবতা দাও মিলনের অমোঘ নির্দেশ।

নির্জন রাত্রির কোলে কেঁদে-মরা এ নহে পৌরুষ,
জন্মের পৃথিবী মোর বিদ্রোহের কোথায় নিশান—
প্রেমের শাসন নেই তার মানে সকল অঙ্কুশ,
বুক-জোড়া অগ্নিতাপ অশ্রুসিক্ত বিহ্বল আহ্বান।

প্রমত্ত জীবন-স্বপ্নে মন্দাক্রান্তা ছন্দ কেন কবি,
বন্যার দুর্জয় স্রোতে বাঁধ দেওয়া সে নহে সম্ভব ;
ছবি সে তো ছবি নয়—ধ্যানমগ্ন তাপসী ভৈরবী
বেদনার গ্রন্থিগুলি টান দেয় জাগে কলরব।

সকল কামনা আজ কেন্দ্রীভূত একটি হিয়ায়,
আকাশে অনেক তারা জ্যোতিহারা একা শুধু জাগে ;
লক্ষ কোটি জ্যোতিষ্কের বিচ্ছুরিত আলোক বিদায়
আমার প্রিয়ার মুখ—আলোড়িত দীপ্ত অনুরাগে।

সীমানা সংকীর্ণ নয়—তবু শোন বিরহীর বাণী,—
প্রবল বিরুদ্ধ শক্তি—নির্বিকার আমাদের দল ;

আনন্দের অনুভূতি প্রতীক্ষার ভরে পাত্রখানি,
সত্যের নির্লিপ্ত রূপ আমাদের হৃদয়-স্পন্দন।

পথের আবর্ত থেকে এ প্রেমের প্রচণ্ড উন্মেষ,
গৃহতীর্থে মুক্তি এর সুনিশ্চিত উপলব্ধি সঙ্গী ;
একমাত্র অন্ধকারে চাঁদ পারে করিতে নিঃশেষ—
অনাবিল জ্যোতিঃপুঞ্জ,—সে কথা কি জান না ক্রৌঞ্চকী ?

শ্রীসমর সোম

ডানা

৭

অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্যা সমাধান হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ডানা কিন্তু খুব নিশ্চিন্ত হয় নি। মনের নেপথ্যলোকে গোপন অস্বস্তির একটা কীট কোথায় যেন সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। তার ঠিক স্বরূপ সে দেখতে পাচ্ছিল না ; কিন্তু অনুভব করছিল, সে ঠিক যা চাইছে তা পায় নি। অথচ সেটা যে ঠিক কি, তা-ও সে জানে না। খাওয়া পরা থাকা ছাড়া মাসিক দেড় শত টাকা বেতন মোটেই তুচ্ছ করবার মত নয় এ বাজারে। এমন একটা ভদ্র পরিবারের আশ্রয়ও অবাঞ্ছিত নয়। তবু কি যেন একটা কি খচখচ করছে মনের ভিতরে। আনন্দবাবু, রূপচাঁদবাবু—দুজনেই ভদ্র শিক্ষিত লোক, দুজনেই তাকে সাহায্য করবার জন্যে উন্মুখ, অথচ—। সন্ন্যাসীর মুখটা মনে পড়ল। আশ্চর্য সন্ন্যাসী। কোনও ভড়ং নেই, গেরুয়া জটা কমণ্ডলু কিচ্ছু নেই, কথাও বলতে চান না বেশি। সব সময়ে থাকেনও না। নদী পার হয়ে মাঝে মাঝে চ'লে যান কোথায় যেন চরের উপর দিকে। দু-তিন দিন পরে হঠাৎ আবার ফিরে আসেন। নিজের হাতে ভাতে-ভাত রান্না করেন ইঁটের তৈরি উনুনে ছোট মাটির মালসায়। তাঁকে দেখলে মনে সন্দেহ হয়, ভিক্ষা করতে বার হন উনি বোধ হয়। ভিখারীকে ঘৃণা করতে শিখেছে সে ছেলেবেলা থেকে। এই সন্ন্যাসীটিকে ভিখারী ভাবতে ইচ্ছা করে না কিন্তু তার। ভিক্ষুকের মত কোনও দীনতা তো লক্ষ্য করে নি একদিনও সে। বরং উলটো কথাটাই মনে হয় তাঁর চেহারা দেখে। প্রকৃত ঐশ্বর্যশালীর আভিজাত্য যেন ফুটে বেরোয় তাঁর চোখে মুখে। তাঁর গাম্ভীর্য, তাঁর নির্বিকার ভাব-ভঙ্গী সমস্ত দীনতার অতীত ক'রে রেখেছে তাঁকে।...

··· সশব্দে পাশের দুয়ারটা খুলে গেল। শশব্যস্ত বৈজ্ঞানিক এসে প্রবেশ করলেন। কুণ্ঠিত হাসিমুখে নমস্কার ক'রে বললেন, আমার দেরি হয়ে গেছে বোধ হয়, না? আপনি প্রস্তুত নিশ্চয়।

হ্যাঁ।

আচ্ছা, তা হ'লে শুরু করা যাক এবার।

হাতে হাত ঘ'সে বৈজ্ঞানিক একটা চেয়ারে বসলেন। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর হেসে বললেন, আনন্দবাবুরও আসবার কথা ছিল, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব কিনা ভাবছি।

ডানা কি-যে বলবে ভেবে পেলে না ঠিক। তার মনে হ'ল, এঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা এতদিন বেশ সহজ ছিল, কিন্তু সহসা ইনি মনিব হয়ে যাওয়াতে ব্যাপারটা একটু যেন গড়্বিল হয়ে পড়ল। এঁর আচরণে ঘুণাক্ষরে যদিও কোন রকম মনিবত্ব প্রকাশ পায় নি, কিন্তু ডানার মনে কেমন যেন একটা সঙ্কোচ জেগে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। অমরবাবু যথেষ্ট ভদ্রতাই করেছেন। ডিক্‌টেশন নেবার জন্যে ডানাকে তিনি অনায়াসে নিজের বাড়িতে যেতে বলতে পারতেন। তা কিন্তু বলেন নি তিনি। তিনি নিজেই এখানে আসবেন বলেছেন যখন দরকার হবে। চাকরি করার যেটা প্রধান গ্লানি—ঠিক সময়ে আপিসে রোজ হাজিরা দেওয়া—তার থেকে মুক্তি দিয়েছেন তাকে

সঙ্কুচিত কণ্ঠে, যেন একটা অনুগ্রহ চাইছেন এমনই ভাবে, অমরবাবু বললেন, হয়ে, একটা কাজ যদি করতে পারেন, বেঁচে যাই আমি

কি বলুন?

ইংরেজীতে একটানা ডিকটেশন দেওয়া তো আমার অভ্যাস নেই কোন দিন। আমি ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে একটানা ব'লে যেতে পারি। হয়তো অনেক সময় এলোমেলোও হবে, আপনি সেটা শুনে যদি ইংরেজীতে লিখে যান, পারবেন কি, তারপর আমি সেটা দেখে দেব না হয়। পারবেন?

তা পারব বোধ হয়। চেষ্টা ক'রে দেখি একবার।

পারেন তো বেশ হয়। জিনিসটা আপনি যদি বুঝতে পারেন, তা হ'লে ইংরেজী করা আর শক্ত কি। বৈজ্ঞানিক নাম-টাম অবশ্য আপনাকে দিয়ে দেব আমি। নোট ক'রে এনেছি সব।

তাড়াতাড়ি পকেটে হাত ঢুকিয়ে কতকগুলো টুকরো কাগজ বার করলেন তিনি।

আজকের বিষয়টা হচ্ছে 'পাখির ডিমের রঙ'। পাখিদের বার্ষিক গতিবিধি জিনিসটা যেমন বিস্ময়কর, তা নিয়ে যেমন গবেষণার অন্ত নেই; পাখিদের ডিমের রঙও তেমনই অদ্ভুত, তা নিয়েও বৈজ্ঞানিকরা নানাভাবে মাথা ঘামিয়েছেন। এই সব সম্বন্ধেই আলোচনা করব আজকের প্রবন্ধটাতে।

আমি তা হ'লে খাতা পেন্সিল নিয়ে আসি।

ডানা ঘরের ভিতরে ঢুকে খাতা আর পেন্সিল নিয়ে এল। খাতা পেন্সিল আনিয়েই রেখেছিল সে এজন্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কবিও হাজির হলেন এসে।

আপনার এত দেরি হয়ে গেল যে?

আমি একটু আটকে পড়েছিলাম রাস্তায়। অদ্ভুত একটা শোভা হয়েছে আজকাল, লক্ষ্য করেছেন সেটা?

কিসের শোভা?—প্রশ্ন করলেন বৈজ্ঞানিক।

প্রকৃতির। বসন্তকাল যে, খেয়াল আছে সেটা? ফুলই ফুটেছে কত রকম। আমের মুকুল তো ধরেইছে, তা ছাড়া আরও যে কত রকম ফুল, তার ইয়ত্তা নেই! লালে লাল হয়ে উঠেছে ওই বুড়ো শিমুলগাছটা। দেখেছেন? তাড়া আমড়াগাছটা লক্ষ্য করেছেন? সবুজের শিখা ফুটে বেরুচ্ছে যেন তার সর্বাঙ্গ থেকে। একদল সোনার প্রজাপতি যেন পাখা মেলে ব'সে আছে শিয়ালকাঁটার বনে। ঘেঁটফুলও ফুটেছে অজস্র, আর কি তাদের রূপ! ঘাসের ফুল দেখেছেন? সাদা সাদা ছোট ছোট ফুলগুলো কি যে চমৎকার! বটের গাছেও লাল লাল ফলের ভিড়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, কত জিনিসই যে আমরা দেখি না—

হ্যাঁ, তা তো বটেই। ভাল ক'রে দেখার নামই তো দর্শন এবং দর্শনেরই একটা অংশ তো বিজ্ঞান। আমিও একটু পরেই বেরুব। এঁকে একটা প্রবন্ধের মালমসলা দিয়ে দিই। আপনি বসবেন, না, ঘুরে বেড়াবেন নদীর ধারে?

আমি বসছি একটু। বই-খাতা সঙ্গে এনেছি, ও-ধারটায় ব'সে আমিও লেখাপড়া করি একটু। আপনি ততক্ষণ কাজ সেরে নিন আপনার। একসঙ্গেই বেরুনো যাবে তারপরে। আপনার প্রবন্ধের বিষয় কি?

ডিমের রঙ?

বেশ, শোনাই যাক একটু।

বেশ বেশ।—কৃতার্থ হয়ে গেলেন যেন বৈজ্ঞানিক। কবি একটা চেয়ার টেনে এক ধারে বসলেন।

বৈজ্ঞানিক শুরু করলেন, দেখুন, এ বিষয়ে একটা কথা প্রথমেই বলা দরকার—ডিমের এত বর্ণবৈচিত্র্য কেন, তা বিজ্ঞান ঠিক করতে পারে নি এখনও। যাঁরা বলেন যে, শত্রুদের কাছ থেকে ডিম গোপন করবার জন্যেই ডিমে এত রঙ, ইংরেজীতে যাকে camouflage বলে, তাঁরা সব ক্ষেত্রে তাঁদের মত সমর্থন করবার মত প্রমাণ খুঁজে পান নি। এই ধরুন না, কাকের ডিম greenish blue, শালিকের ডিম নীল রঙের। কিন্তু তারা কি সব সময়ে পারিপার্শ্বিক সবুজের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ডিম পাড়ে? শালিক পাখি অনেক সময় বাড়ির কার্নিসে বাসা বানায়, তা তো আমরা সবাই জানি। কাকের এলোমেলো বাসার মধ্যে যেখানে ডিমটা থাকে, সেখানে তো সবুজের কোনও চিহ্ন নেই। তা ছাড়া তাই যদি হ'ত, তা হ'লে যে সব পাখি গাছে বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে, সকলেরই ডিম সবুজ বা নীল হ'ত। তা কিন্তু হয় না তো। আর একদল বৈজ্ঞানিক বলেন যে, আলোর সঙ্গে রঙের সম্বন্ধ আছে। ট্রপিকাল দেশের মানুষের গায়ে যে কারণে pigment অর্থাৎ রঙ হয়, ঠিক সেই কারণে, তাঁদের মতে যে সব ডিম যত সূর্যের আলো পায়, তারা তত বর্ণবহুল হয়। এরও অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। যে সব পাখি গর্তের মধ্যে অন্ধকারে ডিম পাড়ে, তাদের অনেকের ডিম অবশ্য সাদা কিন্তু অনেকের আবার রঙিনও হয়, যেমন গাংশালিক। গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে না অথচ রঙ সাদা—এমন ডিমেরও অভাব নেই, যেমন বক পায়রা হাঁস মুরগী। সুতরাং ঠিক নির্দিষ্ট ক'রে বলা যায় না কিছু। Bayne সাহেব বলেছেন একটা অদ্ভুত কথা। বলেছেন, স্ত্রী-পাখিদের এটা বোধ হয় artistic impulse অর্থাৎ শিল্প-প্রেরণা। স্ত্রী-পাখিদের গায়ে সাধারণত রঙ কম হয়, তাই তারা সে শখটা মেটায় ডিমের গায়ে নিজের নিজের পছন্দমত রঙ বসিয়ে। এটা অবশ্য কবিত্ব।

বৈজ্ঞানিক কবির দিকে চেয়ে হাসলেন একটু।

কবি উত্তর দিলেন, সেইজন্যেই বোধ হয় সত্য। কবিরাই সত্যকে দেখতে

পায়। আপনারা কেবল আঁকুপাঁকু ক'রে মরেন, তাতেও আনন্দ কম নেই।

বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, এই camouflage ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গাংচিল, বাটান প্রভৃতি পাখি বালির চড়ায় ডিম পাড়ে, কোনও বাসা বানায় না, কিন্তু ওদের ডিমের রঙ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এমন মিশে যায় যে চট ক'রে ধরা যায় না। লোকে অনেক সময় মাড়িয়ে ফেলে, তবু দেখতে পায় না। যাদেরই ডিম খাকী রঙের বা মাটির রঙের বা স্টোন কলার্ড (stone coloured) তাদের সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে, যেমন ধরুন Bustard, Curlew, Indian Courser, আরও অনেক আছে। ডিমের রঙের সম্বন্ধে আর একটা কথাও মনে হয়, ওদের Endocrine glands, বিশেষ ক'রে Adrenal নিশ্চয় এ সবের জন্যে দায়ী। জীবদেহের সমস্ত রকম pigment-এর সঙ্গে Endocrine gland-এর যোগ আছে। যাঁরা পাখিদের ডিম নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁরা সাতটা রঙই পেয়েছেন। আপনি ওখানটা একটু ফাঁক রেখে দেবেন রঙের কটমট বৈজ্ঞানিক নামগুলো আমি পরে বসিয়ে দেব। রঙগুলো স্পেকট্রাম অ্যানালিসিস ক'রে বার করেছেন Sorby; এই সূত্রে আর একটা কথাও মনে হয়—

আমি নদীর ধারে একটু ঘুরে আসি, বুঝলেন।—কবি উঠে পড়লেন।

আচ্ছা, বেশ।—অপ্রসন্ন মুখে উঠে দাঁড়ালেন বৈজ্ঞানিকও।

আমি এটা শেষ ক'রে ফেলব এখনি। আপনি ততক্ষণ বাটানগুলোর খবর নিন না!

কবি চ'লে গেলেন।

বৈজ্ঞানিক আমার দিকে চেয়ে বললেন, হাঁ, কি বলছিলাম যেন? আমি বললে, রঙগুলো স্পেকট্রাম অ্যানালিসিস ক'রে বার করেছেন Sorby; এই সূত্রে আর একটা কথাও মনে হয়—

ও, হ্যাঁ। সব রঙেরই মূল হচ্ছে সূর্যালোক। আমরা যখন কোনও জিনিসকে সবুজ দেখি, তখন আসলে কি হয়? সূর্যালোকের যে সাতটা রঙ আছে, তার ছটা রঙই সেই জিনিসটা আত্মসাৎ ক'রে নেয়, সবুজটাকে করে না, আমরা সেটা দেখতে পাই। সুতরাং বকের ডিমকে আমরা যখন সবুজ দেখছি, তখন বুঝতে হবে ভিবজিওরের জি-টা ছাড়া বাকি সবগুলো ওই ডিম শুষে

নিচ্ছে। হয়তো বকের ভ্রূণের পক্ষে ওই ছটা রঙের তরঙ্গাঘাত প্রয়োজন, সবুজটা অনিষ্টকারী। এদিক দিয়েও ডিমের রঙের বিষয় চিন্তা করা যেতে পারে। তা ছাড়া পাখির খাদ্যের সঙ্গেও নিশ্চয় সম্পর্ক আছে এর। কারণ জীবজগতের যত কিছু রঙ, তা তো খাদ্য থেকেই তৈরি হয় শেষ পর্যন্ত। পাখির ডিমের রঙের সঙ্গে হিমোগ্নোবিন আর বাইল পিগ্‌মেন্টের যে সম্বন্ধ আছে, তা তো আবিষ্কারই করেছেন Sorby—

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ কাংস্য স্বর বাতাসকে চিরে দিয়ে চ'লে গেল। বৈজ্ঞানিক থেমে গেলেন এবং উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে ডানার দিকে চেয়ে বললেন, শুনলেন?

হ্যাঁ, প্রায়ই শুনতে পাই। কি পাখি বলুন তো?

কাঠঠোকরা। শব্দটা অদ্ভুত, নয়? আচ্ছা, সংস্কৃতে ক্রেঙ্কার ধ্বনি ব'লে একটা কথা আছে, তা কি এই রকম শব্দ? আপনি তো সংস্কৃত জানেন।

যে কোন কর্কশ শব্দকে ক্রেঙ্কার ধ্বনি বলা যায়, কিন্তু হাঁসের ডাকের শব্দকেই ক্রেঙ্কার ধ্বনি বলেছেন সংস্কৃত কবিরা।

ও। কিন্তু এ সব শব্দকে কি কর্কশ বলা উচিত?

সেটা নির্ভর করে শ্রোতার উপর।—মৃদু হেসে ডানা বললে।

তা ঠিক। কাঠঠোকরা দেখেছেন? দেখেন নি? ভারি চমৎকার দেখতে। আজই চিনিয়ে দেব আপনাকে. এইটে হয়ে যাক, তারপর বেরুনো যাবে, কি বলেন? আমি কয়েকটা ফর্দ ক'রে এনেছি ডিমের রঙের। পাখিগুলোর বাংলা নামই দিয়েছি। আচ্ছা, প্রবন্ধগুলো প্রথমে বাংলা কোনও কাগজে দিলে কেমন হয়, কি বলেন আপনি? বাংলাতেই প্রথমে লিখে ফেলুন, পারবেন?

পারব না কেন? বাংলা ইংরেজী দু রকমই লিখে দেব।

বাঃ. গ্র্যাণ্ড হবে তা হ'লে।

কাগজের কয়েকটা টুকরো বার করলেন তিনি পকেট থেকে। তারপর বললেন, হ্যাঁ, লিখুন এইবার। আমি রঙ অনুসারে ভাগ করেছি। কুচকুচে কালো ডিম চেনাশোনা কোনও পাখিরই নেই। ভায়োলেট রঙের ডিমও বড় দেখতে পাওয়া যায় না এদেশী পাখির। ইন্‌ডিগো রঙের ডিমও দেখি নি। নীল রঙ অবশ্য অনেক আছে। আর একটা কথা, নিছক একরঙা ডিম খুব কম আছে। অধিকাংশ ডিমেই এক বা একাধিক বর্ণের সংমিশ্রণ

দেখা যায়। তা ছাড়া অনেক ডিমের গায়েই কালো বা বাদামী বা লাল রঙের ছিটছিট থাকে।

ডানা দ্রুতবেগে লিখে যাচ্ছিল। অমরবাবু চুপ ক'রে গেলেন ডানার চলমান পেন্সিলের দিকে চেয়ে।

হ'ল ?

হয়েছে। আপনি ব'লে যান না।

নীল রঙের ডিম—ছাতারে, শালিক, গাংশালিক, গোশালিক। গাংশালিক গর্তের ভিতর ডিম পাড়ে, তবু কিন্তু ওর ডিম নীল। এইবার লিখুন ফিকে নীল—গ্রে হেডেড (Grey headed) ময়না, যাদের দেশী নাম—পাওয়াই, ব্রাহ্মণী ময়না, সবুজ মুনিয়া। সাদাটে নীল—দর্জিপাখি, শিকরা, দর্জিপাখির ডিম লালচেও হয়। অনেক পাখিরই ডিমের রঙ এক রকম হয় না। দর্জিপাখি আর শিকরার ডিমে ছিটছিট থাকে। সবুজাভ নীল—খয়রা, কোচ-বক।

ডানা লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করলে, খয়রা কি পাখি ?

ইংরেজী নাম স্নেক বার্ড (Snake bird), অনেকটা হাঁসের মত। গলাটা কেবল সাপের মত লম্বা, অদ্ভুত লম্বা। বিলে পায় দেখা যায় এগুলোকে। যখন মাছ ধরে, মনে হয়, সাপে ছোবল দিচ্ছে। মাথা আর গলা এদের খয়েরী রঙের। সেইজন্যেই খয়রা নাম বোধ হয়। জানি না ঠিক। খয়রা মাছও আছে এক রকম, কিন্তু তাদের রঙ তো রূপার পাতের মত। বলতে পারি না খয়রা নাম কেন,—সুনীতিবাবু হয়তো পারবেন। এ পাখিগুলো ডুব-সাঁতার দিতে খুব ওস্তাদ, ডুব-সাঁতার দিয়ে মাছ ধরে এরা। ডানা দেখলে খয়রা-প্রসঙ্গে বাধা না দিলে ক্রমাগত ব'লে যাবেন উনি।

ও। সবুজাভ নীল আর কোনও পাখির আছে কি ?

আর কারও নেই। নীলচে সবুজ আছে, কিন্তু সে সবুজের কোঠায় হবে এখন। এইবার লিখুন—নীলাভ সাদা। এগুলো সাদাই, একটু নীলের আভা আছে কেবল। গাই-বক (Cattle Egret), এদের ডিমের রঙ অনেকটা মাখন-তোলা দুধের রঙের মত। ফ্লেমিংগোর (Flamingo) ডিমও নীলাভ সাদা। এরা অবশ্য স্পেন ইরাক প্রভৃতি দেশে ডিম পাড়ে। এ দেশে কচ্ছ প্রদেশে পাড়ে শুনেছি।

ফ্লেমিংগো ? বাংলা নাম আছে কোনও ?

রাজহংস বলে অনেকে। কিন্তু রাজহংস নামে অনেক পাখিই চলছে বার-হেডেড গুজকে (Bar-headed Goose) অনেকে রাজহংস বলে, আবার মিউট সোযানও (Mute Swan) রাজহংসরূপে চিত্রিত দেখেছি সরস্বতীর ছবিতে। পেলিকানও (Pelican) রাজহংস নামে চ'লে গেছে কোথাও। আপনি ফ্লেমিংগোই লিখুন। কিংবা বাংলা নামকরণ করতে পারেন যদি—

পাখিটা দেখতে কি রকম?

দেখতে? রঙ সাদা, ডানার ধারে ধারে গোলাপী, পা দুটো খুব লম্বা, ঠোঁটও একটু বিশেষ ধরনে বাঁকানো।

পা দুটো লম্বা? খুব লম্বা?

খুব।

তা হ'লে লম্বগ্রীব, লম্বকর্ণের মত লম্বচরণ বা লম্বপদ বলা যায় অনায়াসে।

বাঃ, চমৎকার হবে। তাই লিখুন। ব্র্যাকেটে ইংরেজী নামটা দিন।

ডানা লিখতে লাগল। অমরবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে। মেয়েটি নিতান্ত তুচ্ছ করবার মত নয় তো। বাঃ। তার ঘাড়ের কুঞ্চিত কতকগুলো চুলের দিকে চেয়ে তাঁরও ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল। পাখির পালকে ঠিক এই রকম দেখা যায়। সেদিন দোয়েলের যে পালকটি পেয়েছেন—। হঠাৎ ডানা মুখ তুলে বললে, তারপর বলুন। নীলাভ সাদা আর কোনও পাখির আছে?

আছে। শর্ট-টোড ঈগল (Short-toed Eagle). দেশী নাম সাপমার। এদের ডিম ধবধবে সাদাও হয়। এদের আর একটা বিশেষত্ব— এরা মাত্র একটি ডিম পাড়ে। হোয়াইট ইবিস—সংস্কৃত নাম মুণ্ডক, এদের ডিমও নীলাভ সাদা, সবুজাভ সাদাও হয়। যাদের ডিম দু রকম বা তিন রকম রঙের হয়, তাদের নামটা আর একটা পাতায় টুকে যান তো। আগে পেয়েছেন দর্জিপাখি। যে সব ডিমে ছিটছিট থাকে—অর্থাৎ যাদের ডিম Blotched—তাদের আলাদা একটা লিস্ট করেছি আমি। আচ্ছা, এইবার সবুজে আসা যাক। ঠিক সবুজ ডিম হয় না কারও। গ্রে হেরনের (Grey Heron) ডিম সী-গ্রীন।

গ্রে হেরনের বাংলা কি?

কাঁক-পাখি, সাদা কাঁক, সংস্কৃত—কঙ্ক। সী-গ্রীনের বাংলা কি লিখছেন? সাধারণত সমুদ্রকে আমরা নীল বলি, কিন্তু ওর সবুজ রঙও হয—দেখেছেন কখনও?

দেখেছি। সী-গ্রীন সাগর-সবুজ লিখলে ক্ষতি কি?

কিছু ক্ষতি নেই। তাই লিখুন। এদেরই আর এক আত্মীয় পার্পল হেরন (Purple Heron) নীল-বক নামে পরিচিত। নীল-বক, কানা-বক, ওয়াক-বক এবং তাদের জ্ঞাতি-গুষ্টিদের · আপনি এট্রেট্রা এট্রেট্রা লিখে দিন…অনেকেরই ডিম ফিকে সবুজ রঙের। আরও দু রকম বকের কথা আগেই বলেছি, কোঁচ-বক গাই-বক, এদের ডিমে অবশ্য নীলেরই প্রাধান্য। সারস, ব্ল্যাক ইবিস্ (Black Ibis, দেশী নাম কাঁচা কোল) এদের ডিমও ফিকে সবুজ, কিন্তু ছিটছিট। রীফ হেরন (Reef Heron) এ দেশে বড় দেখা যায় না, তাদেরও ফিকে সবুজ ডিম। এই সারস বকেদের দলে ঢুকে পড়েছে কিন্তু দুটি ছোট ছোট পাখি কালী-শ্যামা আর দুর্গা-টুনটুনি। এদের ডিমও ফিকে সবুজ আর ছিটছিট। এই পাখি দুটি নিজেরা যেমন অস্থির, এদের ডিমের রঙেরও তেমনই কোনও স্থিরতা নেই। কালী-শ্যামার সাদা, পীত, ফিকে সবুজ—তিন রকম ডিম হয। দুর্গা-টুনটুনি ছাই রঙের ডিমও পাড়ে। আশ্চর্য নয়? একটা থিয়োরি খাড়া করেছি আমি, পরে বলব। সবুজ, ফিকে সবুজ হয়ে গেল, এইবার আসুন নীলচে সবুজ—Bluish green। আগে হয়েছে greenish blue—সবুজাভ নীল। গোলমাল ক'রে ফেলবেন না। কাক, দাঁড়কাক, জলকাক—যার চলতি নাম পানকৌড়ি, ইংরেজী নাম Cormorant—এদের ডিম নীলচে সবুজ। কাক দাঁড়কাকের ডিমে ছিটছিট আছে, আর পানকৌড়ির ডিমের উপর সাদা বা নীলচে সাদা খড়ির মত এক রকম গুঁড়ো-গুঁড়ো জিনিস মাখানো আছে। বকেদের সঙ্গে যেমন জুটেছিল কালী-শ্যামা আর দুর্গা-টুনটুনি, কাকেদের সঙ্গে তেমনই জুটেছে দোয়েল আর শ্যামা। দোয়েলের ডিমে ছিটছিট আছে। লিখেছেন?

একটু বাকি আছে।

তাড়াতাড়ি লেখা শেষ ক'রে ডানা বললে, হয়েছে, বলুন। কিন্তু বাধা প'ড়ে গেল।

একজন কনস্টেব্‌ল সমভিব্যবহারে দুটো কুলি এসে হাজির হ'ল। দুটো কুলির মাথায় দুটো বাক্স। কনস্টেব্‌ল ডানাকে সেলাম ক'রে চিঠি দিলে একটা রূপচাঁদের চিঠি। রূপচাঁদ লিখছেন—

ডানা, কাল রাত্রে আবিষ্কার করলাম যে, গানের তুমি খুব ভক্ত একজন আমাদের পরিচিত এক বন্ধু দারোগার একটি গ্রামোফোন ও অনেকগুলি ভাল ভাল গানের রেকর্ড ছিল। তিনি অল্প কিছু দিনের জন্য বদলি হয়ে বাইরে যাচ্ছেন। আমার কাছে এগুলো রেখে যাচ্ছিলেন, আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আশা করি, গান শোনবার জন্যে বাইরের লোক ডাকবার আর প্রয়োজন হবে না তোমার। ইতি— আর. সি.

বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার?

রূপচাঁদবাবু একটা গ্রামোফোন আর কিছু রেকর্ড পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ও, বেশ তো। আমার কাছে পাখির গানের কিছু রেকর্ড আছে পাঠিয়ে দেব এখন।

ডানা কনস্টেব্‌লের দিকে চেয়ে বললে, ভিতরে রাখিয়ে দাও?

কনস্টেব্‌ল কর্তব্য সমাধান ক'রে চ'লে গেল।

বৈজ্ঞানিক বললেন, নিন, তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেলতে হবে এটা। আনন্দবাবু হয়তো অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে নদীর ধারে।

আবার শুরু করলেন তিনি।

ক্রমশ

"বনফুল"

নিজের কথা

সংগ্রাম

খোচার প্রণালীতে মজা দেখার আয়োজন বহুমুখী। প্রশ্ন শুনতাম, আপনি ছবি আঁকেন, আবার কুস্তিও লড়েন? আশ্চর্য! কেউ জিজ্ঞাসা করতেন, আচ্ছা, বাঘ মারেন কেন? বনের জানোয়ার তো আপনার কোন ক্ষতি করে নি। তারপরেই আসত ছোরা নিয়ে শার্দূল হত্যার প্রস্তাব।

বীরত্ব দেখার আশায় আত্মহত্যার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট থাকলেও প্রতিবাদ চলে না, কারণ শ্রোতা চায় কথোপকথনে আনন্দ। তাঁর খোরাক যোগাতে গিয়ে

আমি মরি আর বাঁচি, তাতে কার কি গেল এল! রজকের কাপড় কাচার মত, কার কাপড় ছিঁড়ল, কিছু যায় আসে না। ধোপার কাজ হ'ল পরিষ্কার করা, ওইটুকু কাজ সারতে পারলেই তার কর্তব্য শেষ। দর্শকের উপদেশে কাপুরুষ যদি বীরের ধাপে উঠে যায়, তা হ'লে উপদেশদাতার কিছু বলার থাকে।

কেউ কেউ ঘরোয়া কথা শোনার জন্যে উদ্‌গ্রীব, বিনা দ্বিধায় জিজ্ঞাসা ক'রে বসতেন, কেন আপনার একটি মাত্র ছেলে? আপনার স্ত্রী কেন অত রোগা? আমার চারিত্রিক উন্নতি সম্বন্ধেও অনেকের অসাধারণ আগ্রহ দেখেছি। মদ্য-পানের খরচ কমিয়ে ভাল কাজের ফর্দ ধ'রে দিয়েছেন, তারপরেই প্রতিশ্রুতি চেয়ে বসেছেন, অমন দুষ্কর্মের দিকে যেন আর না ফিরি। হিতৈষীদের অনুরোধ অনেক ক্ষেত্রে এমনই জুলুম জাতীয় হয়ে পড়ত যে, গত্যন্তর না থাকায় ব'লে ফেলতাম, কাল থেকেই ছেড়ে দেব। প্রতিশ্রুতি, বার তিনেক সত্যের গা ঘেঁষে গিয়েছে, বাস্তবিকই ঘটনাচক্রের ফলে প্রায় ছেড়ে দেবার যোগাড় করেছিলাম। পরিবর্তন যা এসেছিল, তাতে সাধুবাবা হয়ে যেতে পারি নি।

যাঁরা কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য আমাকে উদ্ব্যস্ত করতে আসতেন, তাঁরা সব সময় নিরাপদ কেন্দ্র গুছিয়ে নিতে পারতেন না। পেশাদার ভদ্রলোককে আমি নখী শৃঙ্গীর মতই সন্দেহের চক্ষে দেখতাম, ওদের গুপ্তি মার সম্বন্ধে হুঁশিয়ার না থেকে উপায় নেই। দু-চার কথায় তাঁরা বিদায় না নিলে আমি বাক্‌-অস্ত্র চালাতাম, ভোঁতা কৌশলের সাহায্যে, চেষ্টা থাকত—ঝিকে মেরে বউকে শেখানো, কিন্তু বেশির ভাগ স্থলেই দেখতাম, মার সোজাই যথাস্থানে পৌঁছে গিয়েছে। বউ নিজে মাথা এগিয়ে দিলে, মারের গতির উপর ব্রেক কষা যায় কেমন ক'রে? এই প্রথায় অনেক নিরীহ দর্শকও হয়তো মার খেয়ে থাকবেন, তাঁদের জন্য আমি বাস্তবিক দুঃখিত।

আত্মরক্ষার জন্য কঠোরোক্তি ক্রমে আমাকে মার্জিত দুর্মুখ ক'রে তুলল। যাঁরা মজা দেখার জন্যে আমাকে কটুভাষী ক'রে তুললেন, তাঁরা সকলেই ভদ্রজন। মজার দাম আমাকেই দিতে হ'ত।

সামাজিক অনুষ্ঠানে এই সব মানুষের সঙ্গেই মেলামেশা বেশি। বিকেলের দিকে পাড়া ঘুরতে বার হ'লে, চৌকাঠ পার হবার আগেই মন্ত্রজপ শুরু ক'রে দিতাম, ওদের যেন বাড়িতে না পাওয়া যায়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে

দরজার সামনেই "Not at home"-এর প্যাটরা দর্শন হয়ে যেত। অর্ধ্য দিয়ে আসতাম তিনটি ভিজিটিং কার্ড।

প্রতিকূল অবস্থায় নাজেহাল হয়ে যেতাম। গ্রীষ্মকালেই বিপদ বেশি। আলাপের প্রথমেই "ব্যারোমিটার হান্‌ড্রেড অ্যাণ্ড ইলেভেন ইন দি শেড" ব'লে হা-হুতাশ না করতে পারলে আহাম্মক ব'নে যেতে হ'ত। তাপের উগ্রতাই পরস্পরের সমবেদনার সহায়ক, সুতরাং আকাশের জ্বর না মেপে ঘর থেকে বার হবার উপায় নেই। এইখানেই কি শেষ? মেয়েদের পরিচ্ছদ ও গঠনশ্রীর প্রশংসা আগে থাকতে গুছিয়ে রাখতে হয়, যথা—What a shapely figure and how you retain it, is simply a wonder! Oh, you are a darling! যাঁর উপর ছাঁকা বিশেষণগুলির বর্ষণ হ'ল, তিনি হয়তো বেখড়ক মোটা অথবা অস্থিচর্মসার কৃশাঙ্গী।

স্বচক্ষে দেখেছি, এক ঘণ্টায় তিনবার দেহের রঙ বদলে যেতে। সঙ্গের প্রসাধনের পোটলা, ইঞ্জিনে জোড়া কয়লার গাড়ির মতই, ক্ষণে ক্ষণে দেহের বর্ণে ইন্ধন দিয়ে চলে। প্রসাধনের আড়ম্বরে সাজাটাই ওদের সর্বস্ব, আসল রূপ থাকে আড়ালে। সহজ ও সরলের প্রকাশ হয়, ইচ্ছাকৃত অবহেলার দ্বারা; দেহাবরণ দাঁড়ায় গোছালো শ্লথবেশ, সোজা কথায় তাক বুকে নগ্নতার উঁকি।

প্রসাধনের শেষে যে রূপ বাহ্যদৃশ্য, তা কতটা ফাঁকি আর কতটা আসল, সঠিক খবর জানতে হ'লে ছুটতে হয় দর্জী-বাড়ি, তার সঙ্গে রুজ ও ড্রাই পমেডের বিলের হিসাবও প্রয়োজন। আবেষ্টনী রসিকের প্রাণান্ত করিয়ে ছাড়ে। সদাই সন্দিগ্ধ না থাকলে যে কোন মুহূর্তে দৃষ্টিভ্রম, নকলকে আসল ব'লে চালিয়ে দিলে পস্তাবারও অবসর পাওয়া যায় না। এই আবেষ্টনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় অনেক সময় দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। তথাপি ডলীর খাতিরে সবজান্তা হবার চেষ্টা করতাম, আবহাওয়ার খবর থেকে আরম্ভ ক'রে প্যারীসের অতি-আধুনিক ফ্যাশন পর্যন্ত অধ্যয়ন, গীতাপাঠের ন্যায় ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু সবেরই সীমা আছে, উপদ্রব গা-সওয়া ক'রে নেওয়া গেল না। বহুকষ্টে যে ছদ্মবেশটি সংগ্রহ করেছিলাম তাও ছিঁড়তে শুরু করল, তাপ্পি বেড়েই চলল, ছেঁড়ারও কামাই নেই, শেষ পর্যন্ত পোশাক ছাড়তে হ'ল।

ডলীকে জানিয়ে দিলাম, তোমাদের ভদ্রাচার আমার ধাতে সইছে না। শীঘ্র নিজের মত ক'রে বাঁচার ব্যবস্থা না হ'লে মাথার রোগ এসে যেতে পারে। পাগল হবার সম্ভাবনা জেনেও ডলী বিশেষ চিন্তিতা হয়েছেন ব'লে মনে হ'ল না, সমবেদনার পরিবর্তে দেখলাম ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসির প্রকাশ।

ভদ্রবেশী ছদ্মরূপ বর্জন ক'রেও পরিত্রাণ পেলাম না। আমার আসল চেহারা লোকের সামনে বার করার উপায় নেই। সমাজরক্ষণশীল ব্যক্তিরা আমার খ্যাতি ঢাক পিটিয়ে রাষ্ট্র ক'রে দিয়েছেন। খবর কৌতূহল ডিঙিয়ে আতঙ্কের কিনারায় এসে পড়েছে, সকলেই আমাকে পাশ কাটাতে পারলে বাঁচে। এই সময় সোনায় সোহাগা এসে জুটল, আমি সুরাসক্ত হয়ে পড়লাম।

যে লোকের এক কালে মদের প্রতি বিতৃষ্ণা ছিল, আত্মবিস্মৃত মদ্যপকে কৃপার চক্ষে দেখত, সেই ব্যক্তির নিকট পূতিগন্ধযুক্ত পানীয় মধুর হয়ে উঠল কেমন ক'রে, জানার কৌতূহল স্বাভাবিক। সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ:—

সাহেবী খানায় রাত্রি-ভোজনের জন্যে ডাক পড়েছিল ইংরেজ বন্ধুর বাড়িতে। নিমন্ত্রিতদের ভিতর আমরাই প্রধান অতিথি। অভ্যর্থনার জন্য বহু প্রকারের প্রাচীন সুরা সাজানো ছিল, সর্বাগ্রের পাত্রটি বেজায় খর্বাকার। শাস্ত্রসম্মত পানের বিধি ওই খর্বাধার থেকে শুরু।

সুস্থ মানুষকে মাতলামি করতে দেখেছি, করুণার দৃশ্য। কোন্ জাতীয় মদ কতটা খেলে সুস্থ মানুষ বেসামালের অবস্থায় এসে পড়ে, জানা ছিল না। ঠিক ক'রে ফেলেছিলাম, ওই জিনিস ভিতরে ঢুকলেই মানুষ নিজেকে হারিয়ে ফেলে। ভয় ছিল মনে।

গৃহকর্ত্রীর প্রতিনিয়ত অনুরোধ সত্ত্বেও ইতস্তত ভাব কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। ডলী আমার বেহায়াপনায় অস্বস্তি বোধ করছিলেন, নিজে যৎসামান্য খেয়ে দেখিয়ে দিলেন, ভয় পাবার কিছু নেই। তিনি সাহেবী চালের অনেক কিছুই জানতেন। ডাইওসেসন কলেজে খাঁটি বিলাতী মেম শিক্ষা দিয়েছিলেন, টেবিলে ছুরি চালানো থেকে এ দিকটাও বোধ হয় এগিয়ে দেওয়া ছিল। এ ছাড়া অত্যুগ্র পাশ্চাত্য-পন্থী আত্মীয়দের প্রভাবও ছিল যথেষ্ট, সুতরাং সাহেবী চালে মেলামেশায় অবর্জনীয়কে জানাটাই স্বাভাবিক। তাঁর দুঃসাহসিক কীর্তির প্রতিক্রিয়া কি রকম

দাঁড়ায়, লক্ষ্য করছিলাম। তিনি দেখলাম কাজটা নিশ্চিন্ত মনেই সারলেন এবং বেমালুম হজমও ক'রে ফেললেন। তাজ্জব ব্যাপার!

দৃশ্যটি আমার পৌরুষকে ক্ষুণ্ণ করছিল। ভাবতে লাগলাম, যে কাজ অবলা নারী অবলীলাক্রমে করতে পারে, তা আমার মত একজন সাজোয়ান পুরুষ পারবে না কেন? ডলী এরই ভিতর আর একটি ঢোক গিলে, বাংলায় বললেন, একটু সিপ ক'রে রেখে দাও, তা নইলে হোস্টরা অসুবিধায় পড়ছেন।

ওইটুকু তো পাত্র, তাতে আবার ঢোক গেলার স্থান কোথায়? পৌরুষকে বাঁচাবার জন্য এক চুমুকেই পাত্র খালি ক'রে দিলাম। ডলী আমার কাণ্ড দেখে অবাক। আমি ভাবলাম, একটা মহৎ কীর্তি ক'রে ফেলেছি।

তরলাগ্নি ভিতরে গতিশীল হয়ে উঠতে নতুনের সাড়া পেতে লাগলাম। অনতিবিলম্বে রসনা কাচার দিকে এগুতে শুরু ক'রে দিলে। বেগশীল গতি, ক্ষণিকেই চিত্ত ভাবময় হয়ে উঠল, যৌবন এল এগিয়ে। সুদীর্ঘকাল পরে নিজের স্ত্রীর মধ্যে পরকীয়ার আকর্ষণ খুঁজে পেলাম। উয়িং (Wooing) নয়, একেবারে ভুলে যাওয়া হৃদয় রোমান্স ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ডলীকে মনের কথা বলতে চেয়েছিলাম বোধ হয়। অন্তত ইঙ্গিতে দ'মে গেলাম।

ইতিমধ্যে ভোজন শুরু হয়ে গিয়েছে, কাটা চামচে দিয়ে মনের মত ক'রে গ্রাস তুলতে পারছিলাম না। হাত দিয়েই আসল কাজটা সেরে নেবার চেষ্টায় ছিলাম, খাটি স্বদেশী ধমক খেলাম, করছ কি? ভাল কষ্ট করছিলাম, কিন্তু ধমকে বাড়ন্ত হাত থমকে দাঁড়িয়ে গেল। রসের গুণে বামাকণ্ঠের তিরস্কারও এত মধুর হয় জানতাম না, একেবারে গ্রামের খেঁদীর মা বা পাঁচকড়ির বউয়ের ভাষা। গদগদভাবে বধুর দিকে তাকালাম। আমার দৃষ্টিতে কি ছিল জানি না, তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কি নির্মম প্রতিদান! এই ঘটনায় একটি পরম সত্য আবিষ্কার করলাম, সভ্য সমাজে ধর্মপত্নীর নিকট প্রেমনিবেদন অনধিকার চেষ্টা।

আহারান্তে চাকাযুক্ত চলন্ত টেবিল রঙিন রস নিয়ে হাজির। আমার উপরেও রঙ চড়েছিল, নিঃসঙ্কোচে ব'লে ফেললাম, সেই সবুজ রঙের বস্তুটি চাই। তখন আমি "সবই সবুজ ও কাচা" দেখছি, কেবল "পুচ্ছ তুলে নাচার" বাকি। বিদুষী কড়া দৃষ্টি আমার উপর রেখেছিলেন, তাঁর চাউনি সব

কিছু ফাঁসিয়ে দিলে। বুঝলাম, ওদিকে আমার পাওনার দাবি শেষ হয়ে গিয়েছে, আমার এখন কেবল দেখার পালা।

যে সময় বিদুষীর চাহনির খপ্পড়ে পড়েছিলাম সেই সময় দেখলাম, অন্য নিমন্ত্রিতেরা ঢালার কাজে সকলেই উদযোগী হয়ে উঠেছেন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি দেওয়া ও নেওয়ার কাজে উদার। 'সে, হোয়েন'-এর বিপদ-সঙ্কেত পুনঃ পুনঃ শুনছি, অথচ আমার সম্বন্ধে সকলেই নির্বিকার। রাত গভীর হয়ে আসছিল, ডলী বললেন, এবার আমাদের উঠতে হয়। ওঠার পিছনে যে গূঢ় রহস্য জড়িয়ে ছিল, তা বুঝতে বাকি রইল না। সকলকে ছেড়ে দিয়ে তিনি আমাকেই ঠাওরালেন—কাজ গুছিয়েছি। ওদের ঢালা তখনও চলছে, আমরা উঠলাম।

দীক্ষার কিছুদিন পরেই আমি খ্যাতনামা সামরসিক হয়ে গেলাম। মানুষ মহৎগুণসম্পন্ন হ'লেই, গুণের ব্যাপক প্রচার অবশ্যম্ভাবী। আমার সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি।

ঝানু কারবারীর দল আমার খ্যাতির সম্পদকে নিজেদের ব্যবসার মূলধন ক'রে নিলেন। পরের ধনে পোদ্দারি সুচিন্তিত হিসাবের ব্যাপার, স্বল্প চেষ্টাতেই তাঁদের জমার দিক পুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। পুষ্টির প্রচারে বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁরা আমাকে মাটির দেশে একমেবাদ্বিতীয়ম ক'রে ছাড়লেন। সারা পৃথিবীতে মাতাল বলতে আমাকেই বোঝাত। অনেকে রাস্তার গন্ধেই আমার ঠিকানা আবিষ্কার করতেন। যাঁরা কৃপাপরবশ হয়ে আমাকে বেসামাল দেখতেন, দুঃখ প্রকাশ ক'রে বলতেন, লোকটা কি হ'তে পারত, আর কি হ'ল। তাঁদের অনেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয়ের সুযোগও পাই নি। ঘরের বাইরেও আমাকে দেখবার উপায় নেই, কারণ আমি ঘর থেকে বার হই না।

যাঁরা পরিচয়ের সুবিধা নিয়ে ছোঁয়াচে রোগ স্বেচ্ছায় গায়ে মাখতেন তাঁরা জানতেন না, আমার মদ্যপানের কেরিয়ারে ঐখানেই গলদ থেকে গিয়েছে। গুণগ্রাহীরা বলেন, আমার পানশক্তি একটা গিফ্‌ট্‌। মাতালের কাছে নেশার আসল লাভ টলা, দুর্ভাগ্যক্রমে এই দিকটায়ই লোকসান দিয়েছি বিস্তর। অভাবে নিজের খরচায় পরের টলা দেখে আত্মসান্ত্বনা সংগ্রহ করেছি। মজার ব্যাপার এই যে, যাঁরা আমার খরচায় বেসামাল হতেন, তাঁরাই দেখতেন আমার টলা।

আমার নামের প্রচারকরা সঠিক খবর চেপে গিয়েছিলেন।

কেরিয়ারের গলদ সম্বন্ধে প্রামাণিক দৃষ্টান্ত আজও আমার শিকারের বাক্সে তোলা আছে, বস্তুটি একটি থ্রী-ক্যাসেল সিগারেটের টিন। শিকারের ঘটনায় এটি সংগ্রহ করেছিলাম।

রাত দুটোয় বেজায় ভারি এবং অতি বৃহৎ রাইফেল দিয়ে প্রায় একশো ফুট দূর থেকে দাঁড়ানো অবস্থায় ওই টিনটি ঠিক মাঝখানে ছেঁদা করি, সাধারণ বৈদ্যুতিক টর্চের সাহায্যে। এইটুকু বলতে পারি, বিনা রেস্টে নিশানা করা তো দূরের কথা, সাধারণ বাঙালী যুবকের পক্ষে ওয়েস্টলি রিচার্ডসের ৪২৫ বোর হাই ভেলসিটি রাইফেল কাঁধের উপর সোজা বসানোও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ঘটনাটি বাজির ডাকমারি থেকে। ডিগুভাসচায় বাঘ মারার উৎসবে কয়েকজন ফরেস্ট অফিসার যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতে চান না, বাঘের মাথার খুলি নিশানার দ্বারা উড়েছিল। তাঁদের ধারণা, দৈবাৎ লেগে গিয়েছে। লক্ষ্যভেদ সম্বন্ধে আমার অহমিকাকে নত করতে পারি নি। বাজি মেনে নিয়েছিলাম। শর্ত ছিল, দেড় বোতল ব্র্যাণ্ডি শেষ ক'রে লক্ষ্যভেদ করব। যাঁরা বাজি ধরেছিলেন, তাঁদের ভিতর একজন ছাড়া কেউই বাজির খেলা দেখবার জন্যে ব'সে থাকতে পারেন নি। এবং যিনি কোন প্রকারে টাকার মায়া সামলাচ্ছিলেন, তাঁরও নির্ভরশীল সাক্ষী ভাবা চলে না, কারণ তিনি চোখ বুজেই সব কিছু দেখছিলেন।

প্রহিবিশনের যুগে কেউ যদি এই সত্যটি আস্ফালন মনে করেন, তা হ'লে পুনরায় পূর্ববর্ণিত অবস্থায় এই কেরামতি দেখাতে পারি, অবশ্য ছাড়পত্র দরকার, এ ভার সন্দিগ্ধ সুযোগদাতাদের উপর ছাড়াই ভাল।

পান-সাধনাতেও বাহবার লোভ ছিল বইকি, তা নইলে কেরিয়ারের কথা উঠল কেন? সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত 'ননস্টপ রিভিউ' চালিয়ে যে লোকের ভারী রাইফেল দিয়ে অতি ক্ষুদ্রাকার লক্ষ্য ফুটো করতে হাত কাঁপে না, তারই পা টলতে দেখায় দিব্য-দৃষ্টির ক্ষমতা থাকা দরকার। হয়তো যাঁরা আমার কাছে আসতেন, তাঁদের এদিকটায় চর্চা ছিল। তাঁদের সাধনায় বাধা দিতে চাই না। আমার বক্তব্য, সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে ঘরে চড়াও দর্শকের দল কখনও আমাকে টলতে দেখেন নি। এতটা জোর দিয়ে লিখলাম, কারণ আমার উপরওয়ালা বিদুষীর কাছে টলার কেরামতি

এখন লায়াবিলিটিস হয়ে আছে, ব্যবসাবুদ্ধি না থাকায় অ্যাসেট ক'রে নিতে পারেন নি। বিদুষীকে এই জাতীয় লায়াবিলিটিসের ভার নিতে বলার সাহস অন্তত আমার নেই।

স্বীকারোক্তিতে নামি। চলতি দর্শক যা দেখে নি তা কখনও ঘটে নি—এমন কথা বলি কেমন ক'রে? স্থান, কাল ও পাত্র বিচারে, গণ্ডির বাইরে গিয়ে মজা দেখেছি বইকি। দেহ খানায় না পড়লেও মন ট'লে গিয়েছে; উপরওয়ালার (বর্তমান ক্ষেত্রে আমার স্ত্রী) শাসনের ভয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছি।

স্বীকার যখন করলাম, এখন পানের সমর্থনেও কিছু বলা দরকার; তা না হ'লে নেমকহারামি হয়ে যাবে। মদ অনেক দুঃখ থেকে বাঁচিয়েছে, দুরারোহ স্থানে ওঠবার সাহস দিয়েছে, বোকা হ'লেও অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধির সহায়তা পেয়েছি, বহু নীতির ব্যভিচারিতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছি, নিজেকে এখন অভদ্র ব'লে পরিচয় দিতে পারি, সুতরাং দাতার দানকেও অস্বীকার করা চলে না।

পানের উদ্দেশ্যই তো একটু কি-রকম হওয়া, কাঁটা-বনে ফুল ফোটানো, যে ফুল সহজ চোখে দেখবার উপায় নেই তাকেই রঙিন মনে চাক্ষুষ করা, সাদার মধ্যকে রঙ দিয়ে প্রাণ দান। ফুলের মিষ্টি গন্ধে মশগুল হবার সময় দুটো কাঁটা গায়ে বিঁধে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু বেদনার অনুভূতি আসে ভোগচরিতার্থতার পরে। হোক না আনন্দ ক্ষণিকের, আসুক না আনন্দ বেদনাকে পিছনে নিয়ে, তবু ক্ষণিকের আনন্দকে কি তুচ্ছ করার উপায় আছে? ভোগ করেছি, দাম দেব না? দিলাম না হয় বেদনা-ভোগে আনন্দের দাম। কবির কথা এখানে কাজে লাগিয়ে দিই।—ছোট মেয়ে বললে, দেখ দেখ মা, কি এনেছি দেখ। কুড়ানো পালকে মা দেখলেন, তুচ্ছ পাখির পালক, গিন্নির রস-ভোগশক্তি না থাকায় সুন্দর পেল অবজ্ঞার স্থান। খুকী এসেছিল ভাগ দিতে তার আনন্দের অনেকটা অংশ মাতাকে, প্রতিদানে পেল তাচ্ছিল্য, নির্মম আঘাতে শুকিয়ে ফেলল তার আনন্দের খোরাক। আনন্দের উৎস যেখানে নিরীহ সেখানে গোপনে ভোগস্পৃহার ইচ্ছা আসত না, আরও পালক জড় হ'ত না যদি খুকী ভোগের চূড়ান্ত প্রকাশেই করতে পেত। হয়তো সে নতুন রঙের সন্ধানে নিজে থেকেই নোংরা পালক ফেলে দিত।

কিন্তু ভোগের পূর্বেই ত্যাগের তাড়নায় রূপরসিক সুন্দরকে আঁকড়ে ধরছে। অবজ্ঞার বস্তুর ভিতরেও যে সুন্দর লুকানো থাকতে পারে, আনন্দের স্রোত ব'য়ে চলে, আনন্দ ক্ষণিকের হ'লেও তার জের যে সারা জীবনব্যাপী চলতে পারে—এ খবর সংস্কারের তাড়নায় মাতার কাছে পৌঁছায় নি। যা তুচ্ছ, যা অবজ্ঞার বস্তু, তাও যে ব্যবহারের পার্থক্যে এবং পাত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে আনন্দের উৎস হতে পারে, তা সন্ধানের জিনিস। সন্ধানের অবসর বা সাহস থাকে কজনের? মলিন অঙ্গার থেকেই হীরকের উৎপত্তি, ভোগীর প্রয়োজনীয়তাতেই হীরকের আত্মপ্রকাশ। পালংকের নোংরা আবরণের ভিতর খুকী দেখেছিল সুন্দরের উজ্জ্বল রূপ, রূপভোগে চেয়েছিল আনন্দের খোরাক, সুতরাং অস্পৃশ্যের মধ্যেও এমন গুণ থাকতে পারে, যা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

পাননিরোধী যে সংস্কার বা অভিজ্ঞতা থেকেই নীতিকে কঠোর ক'রে তুলুক, তা মাত্র সাময়িক বিচারের সন্তুষ্টি; চিরন্তন নিয়ম নয়, কারণ সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য যুগে যুগে নীতির পরীক্ষা হয়েছে, পরীক্ষার ফলে নীতির পরিবর্তনও ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। পরিবর্তনের যদি ফাঁক থাকে, তা হ'লে বিচারও নিরপেক্ষ ও অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মাতালের সহজ অর্থে বুঝি, কারণের প্রতিক্রিয়ায় মনের সমাধি অথবা অসাধারণ চঞ্চলতা, সংক্ষেপে নিজের চিন্তায় বেহুঁশ হয়ে যাওয়া। এই সূত্র অবলম্বনে মাতাল যদি ঘৃণ্য হয়, তা হ'লে দেখা যাবে, দার্শনিক, ধার্মিক, রাজনৈতিক থেকে দাবার খেলোয়াড় পর্যন্ত সকলেই অল্পবিস্তর মাতালের গা ঘেঁষে চলেছে। দৃষ্টান্তের অভাব নেই, জনরব—শ্রাদ্ধবাসরে নিমন্ত্রিত দার্শনিক প্রথম কথাতেই জানতে চাইলেন, যার শ্রাদ্ধে এলাম তাকে তো কই দেখছি না! দাবার খেলায় মাতাল সর্পাঘাতে পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, কাদের সাপ? সবই তো কোন না কোন কারণের প্রতিক্রিয়া, সকলেই নিজের তালে বেহুঁশ, সকলেই সামঞ্জস্য সম্বন্ধে নির্লিপ্ত।

সুতরাং ন্যায্য বিচার সম্ভব হ'লে দেখা যাবে, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে গিয়েছে, নীতির ধ্বজা টিকে আছে ঝাণ্ডা বদলাবার জন্য।

আমার এখানে যাঁরা সান্ধ্য-ভ্রমণের আড্ডা গেড়েছিলেন, তাঁদের ভিতর একদল ছিলেন 'খাই যদি হয় পরের পয়সায়', আর একদল হিতৈষী

সেজে আসতেন। আর্থিক অনটনে যখন অতিথি-সৎকারে বিঘ্ন ঘটতে লাগল, তখন প্রথম দলভুক্তরা আমাকে অভদ্র ব'লে বসলেন। বিচারে অপমানকর কিছু ছিল না। ন্যায্য পাওনা ব'লেই মেনে নিয়েছি। আড্ডার কথা ছেড়ে দিই যে সব ছাত্রের সঙ্গে সমানভাবে মিশেছি, ক্ষমতার বাইরে গিয়ে আর্থিক সাহায্য করেছি, সুখদুঃখের ভাগ নিয়েছি, সর্বোপরি স্বাধীনভাবে রূপসন্ধানের পথ দেখিয়ে দিয়েছি, তাদের মধ্যে অনেকেই দাতার দান স্বীকার করতে রাজি নয়, তাদের শিল্পী হিসাবে অস্তিত্ব যে আমার পথনির্দেশ ব্যতীত হ'ত না, এ কথা তারা না স্বীকার করুক, আমি কথাটা সত্য ব'লেই জানি; কারণ সারা ভারতের মধ্যে এইখানে একটি শিক্ষাপীঠ আছে, যেখানে গোঁড়ামির দাপট এখনও কিছু করতে পারে নি যথেচ্ছাচারিতার সহানুভূতি দেখাতে না পারলেও, আমার চালে তাদের দাসখৎ লিখতে বলি নি। এখানে নিজের দানশীলতার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করছি না, হৃদয় ভেঙে যাবার কারণ দেখাবার চেষ্টা করছি মাত্র। মানুষ কেমন ক'রে রূঢ় হয়ে যায়, তারই একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। দুঃখের মধ্যেও আনন্দ আছে—আমার দান মাঠে মারা পড়ে নি, বাংলায় এবং বাংলার বাইরে রূপরাজ্যে নতুনের আগমন যদি সুস্থতার পরিচয় দিতে পারে, তা হ'লে মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের নাম নিজের স্থান খুঁজে নেবে। ইতিমধ্যে বয়েসের জন্যই হোক বা যে কারণেই হোক, অনেক মাসিক-পত্রিকাতে দেখি, আমার নামের ডগায় শিল্পাচার্যের খেতাব এসে পড়েছে। আধুনিক যুগে ভারতের মধ্যে শিল্পাচার্যের যোগ্যতা একমাত্র গুরু অবনীন্দ্রনাথের আছে। তিনি জানেন, এসব কথা বলতে গিয়ে কোথায় থামতে হয়। আমার বয়স পঞ্চাশের কিনারায় এলেও এখনও শিখছি, সুতরাং আচার্যের দাবি থেকে আমি কেন, আরও অনেককে বাদ দিতে হয়।

আড্ডার দ্বিতীয় দলভুক্তদের কথা বলি। তাঁদের নিয়েই আমি অসুবিধায় পড়েছিলাম। তাঁরাই গোপনে আমার খ্যাতির সম্পদ নিয়ে কারবার চালাচ্ছিলেন। মাল-মসলার অভাব ঘটলেই আমার কাছে হাজিরা দিতেন। যাঁর নেতৃত্বে ব্যবসা ফেঁপে উঠছিল, তিনি একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি। রাজা উজির মন্ত্রী থেকে মডেলের খবুরীর সঙ্গে অবলীলাক্রমে মিশতে পারতেন। শিল্পী সাজার শখ ছিল যথেষ্ট, যতটা না পারতেন হাতের কাজে, কথার প্যাঁচে সেরে নিতেন। আমাদের দেশে এই প্রথাতেই প্রতিষ্ঠা

সুপ্রশস্ত। সুতরাং লোকে যদি তাকে শিল্পী ব'লে জেনে থাকে তো অভিযোগ তোলার ফাঁক নেই। গুণধর যে বাস্তবিক একজন বিশিষ্ট প্রতিভাবান, তা ধরা পড়ল তাঁর সদিচ্ছা আত্মপ্রকাশ করায়, প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে গদীচ্যুত করার মামলায়। সত্যের উদ্ঘাটনে দেখলাম, খর্বাকার মানুষের ভিতরই লুকানো রয়েছে পিশাচের বিরাট প্রতীক। এই লোকটি অতি কুচক্রী, নিজেকে তিনি সবজান্তা ব'লে প্রচার ক'রে থাকেন, এবং অনেকেই তা মানেন। তবে আর যাই হন, লোকটি ভদ্র। জনরব—পদি-পিসী বলেন, ছেলে আমার চোর হোক, ছ্যাঁচোড় হোক, কিন্তু তার উঁচু নজরটি নেই বাপু, ছেলেটা ভাল। সুতরাং উঞ্ছবৃত্তি থাকলেও ভদ্র হতে বাধা কোথায়?

যে সময় ভদ্রলোক নিজের প্রতিভা কাজে লাগাচ্ছিলেন, সেই সময় আমার সংগ্রাম বাঁচা ও মরার সন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে। তাঁর কর্মকৌশল এমনই আটঘাট বাঁধা যে, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিস লাগিয়ে দিলেও তারা তাঁকে সেলাম ঠুকে পিছিয়ে পড়ত। কোন দিক দিয়েই প্রতিভার নাগাল পাবার উপায় নেই, অথচ জানি, কোন্ লোকের নির্দেশে কি ঘ'টে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ঘূর্ণ্যমান ঘটনাচক্র এমন একটি জায়গায় এসে উপস্থিত হ'ল যে, আত্মসম্মান বাঁচাতে হ'লে দুটি পথ খোলা দেখলাম। একটি চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া, আর একটি উপরওয়ালার সঙ্গে লড়াই। চাকরি ছাড়তে হ'লে একটা কিছু যোগাড় ক'রে নিতে হয়, সংসারের বোঝা ঘাড়ের ওপর। পৈতৃক সম্পত্তি যা পেয়েছিলাম তা খরচের তাড়ায় বেশির ভাগই উপে গিয়েছিল, নিজের উপায়ের নগদ টাকাও বহুবার ছয় অঙ্কের ধাপে খরচ করায় ব্যাঙ্ক খালি। ভাবলাম, সিনেমাতে ঢুকতে না পেলে শেষ পর্যন্ত রিক্‌শা টানতে আরম্ভ ক'রে দেব। সব প্রস্তুত, সিনেমার দু-চারজন অধিকারীর সঙ্গে দেখাও করলাম, তাঁরা এমন সমীহের সঙ্গে কথা বললেন যে, ভিন্ন প্রকারে জানিয়ে দিলেন—তোমার সঙ্গে আমাদের প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ চলবে না। দিশাহারা হয়ে যাচ্ছিলাম। ডলী বললেন, জঘন্য অপবাদ থেকে খালাস না হওয়া পর্যন্ত চাকরি ছাড়া চলবে না, তোমাকে লড়তে হবে; আমি জানি, তোমার দ্বারা জঘন্য কাজ সম্ভব নয়, যেমন ক'রে পার সত্যকে লোকের সামনে ধরতে হবে। শীর্ণকায়া মহিলা

আমার সামনে শক্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়ালেন। বাস্তবিক, সেদিন তাঁর অপূর্ব রূপ দেখেছিলাম। ভাবলাম, চাকরি ছাড়লে সব অপবাদ মাথায় নিয়েই বার হতে হবে। কলঙ্কের ভার শুধু আমার উপর থাকবে না, আমার একমাত্র সন্তান তাকেও সারাটা জীবন বহন করতে হবে। ছেলের বয়স তখন ১৬, জিজ্ঞাসা করলাম, কি করা যায় বল তো? কিছুমাত্র দ্বিধান্বিত না হয়ে ব'লে দিলে, You must fight and assert the spirit of a Bengali। (ছেলে ভাল বাংলা জানে না, ওর মাতৃভাষা তামিল হয়ে গিয়েছে।)

পথ ঠিক হয়ে গেল, কিন্তু লড়ব কার বিরুদ্ধে, যে রক্ষক সেই যে ভক্ষক! বিচারপ্রার্থী হব কার কাছে, যে বিচার করবে সেই তো নরপিশাচের পৃষ্ঠপোষক। দণ্ডের ব্যবস্থা যেখানে প্রস্তুত হয়ে আছে, সেখানে বিচারের সময় কোথায়।

ভগ্নীর সাহসে দ্বিধা কেটে গেল, কলম চালালাম প্রভুর বিরুদ্ধে। বৎসরাধিককাল ধ'রে উভয় তরফ থেকে পাল্টা জবাব চলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত পীড়নকারীকে বিদায় হতে হ'ল। এ বিষয়ে অনেক লেখবার ছিল, কিন্তু Wild-এর ভাষায় বলি—Details are vulgar।

এতকাল বঙ্গের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে ছবির রাজ্যে বিপ্লবের সাড়া প'ড়ে গিয়েছে। চতুর্দিকে originality র দাঙ্গা। উদ্ভট বিকট বীভৎস, সব কিছুই নীচে থেকে উপরে উঠে আসছে, সুন্দরের নবতম আদর্শ তৈরির জন্যে। রসগ্রাহী ও রূপস্রষ্টার উপাস্য দেবতা পিকাসো, ভ্যানগগ্‌, গোঁগেঁ, শিযান, ম্যাটিসি ইত্যাদি।

ইউরোপে ইতিমধ্যে কিউবিজ্‌মের যুগ ঝিমিয়ে যাওয়ায় সুর্‌রিয়েলিজ্‌ম প্রাধান্য পেয়ে বসেছে। চারধারে একটা নতুন কিছু করার ধুয়ো। বিদেশী হুজুগের ঝড় এদেশেও এসে পড়ল। বাংলায় দেখা গেল নানা নামে গ্রুপের আবির্ভাব। আধুনিকতম দৃষ্টিভঙ্গীতে অবনীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পড়লেন পুরাতনের আবর্জনায়।

পিকাসোর কোলে মানুষ, নবজাত পোটোইজ্‌ম, ডিম্বায়তন মুকুট প'রে মাথা খাড়া করল, হরিজন আর্টের খিচুড়ি পরিবেশনের জন্যে। দৈন্যই হ'ল এদের প্রধান আকর্ষণ।

এই সময় ওরিয়েণ্টাল ডিজাইনের চাহিদা বেড়ে উঠেছে বিদেশীদের

কাছে। জনরব, মার্কিন দেশে বালিশের খোল ও দরজার পর্দায়, ভারতীয় সংস্কৃতির কিছু নথি দেখানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, ডিম্বাকৃতির ফরমা জলদি ছাপমারার সুবিধা ক'রে দিলে। পাশ্চাত্য প্রাচ্যকে জানার তাড়ায়, নয়া পোটোইজমের কেরামতিতে ব্যক্তিগত শিল্পীর কাজ থাকল না, রসের কারবারে কারখানা খুলে গেল। ওরিজিনালিটির একই ফরমায় বহুর আবির্ভাব অভিনব প্রথায় শুরু হ'ল। ছবির ড্রইং থেকে নাম সই পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্পীর কাজ, কর্ণধার ব'সে থাকেন শেষের দিকে ওরিজিনালিটির সার্টিফিকেটে দস্তখৎ মারবার জন্য। ঘড়ির কাঁটা ধ'রে ছবি শেষ হয়, ওজন-দরে রপ্তানির জন্যে।

যাঁরা পটচিত্রে গোময়-লিপ্ত মাটির গন্ধ এড়াতে চাইলেন, তাঁরা ভিন্ন প্রথায় দ্রুত কাজ সারার পথ খুঁজে নিলেন, ঝটপট আঁচড় কেটে ইঙ্গিতময় আর্টের প্রবর্তন হ'ল। নকশার ফর্ম নেই, বক্তব্যের উদ্দেশ্য নেই, ফরমায় ফেলা কতকগুলি প্যাঁচালো রেখা ছন্দের আশায় হুড়োমুড়ি লাগিয়ে দিলে। বলার কথা যদি কিছু থাকে তো তা ভিড় জমানোতেই শেষ। বাকি যা অব্যক্ত রইল, তা ভেবে নেবার জিনিস। শিল্পী, রসগ্রাহীর চিন্তাশীলতার রাস্তা ক'রে দিয়েই খালাস। ইংরেজীতে এই চালাকিকে শুদ্ধ ভাষায় বলা হয়—scope of imagination। নবতম সমঝদার সুবিধা পেলেন প্রচুর, ছবিতে যা নেই তারই আবিষ্কারের ব্যাখ্যায় আর্ট অব হিজিবিজি কৃষ্টি-সাধনের বিরাট অঙ্গ হয়ে উঠল। কৃষ্টির ক্রূরতা এইখানেই শেষ নয়, abstractness-এ গোলোক-ধাঁধার ধুয়ো আমাদের মত অবুঝদের মাথায় চরকিবাজি ঘুরিয়ে দিলে, মাথার ভিতরে বারুদ ফাটায় চোখে তুবড়ির খেলা দেখতে লাগলাম, ছবির কোনখানে পাত্তা নেই।

নির্দিষ্ট আদর্শের অভাবে অথৈ পাথারে প'ড়ে গেলাম। ভেসে থাকার উদ্দেশ্য নেই, তবু বাঁচতে হয়, স্রোতের টানে নিজেকে ছেড়ে দিলাম। ভাসমান অবস্থায় দেখলাম, ঢেউয়ের ঠেলায় পিছনের জিনিস সামনে এগিয়ে আসছে, সবই মড়া। স্রোতের টান বাঁচা আর মরার কোন প্রভেদ রাখে না, টানের সামনে যা পড়ে তাই ব'য়ে নিয়ে যাওয়া বেগশীল স্রোতের কাজ। দম নিঃশেষিত হবার উপক্রমে কত বার অগ্রগামী মড়াকেই আঁকড়ে ধরার ইচ্ছা এসেছে, কিন্তু মড়া কিছুকালের জন্য প্রাণধারণের আশ্রয় হ'লেও পূতিগন্ধ

শহ্য করার অভ্যাস না থাকায় পিছিয়ে পড়াকে অধিকতর বরণায় মনে করেছি।

স্রোত পরিবর্তনকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে, চতুর্দিকে মড়া ছাড়া কিছু নেই। ভাসমান অবস্থাতেই ভাবতে থাকি, পরিবর্তনকে বাধা দেবে কে? স্রোতবহা সান্ত্বনা দেয়, ওরাও যাবে চ'লে, ওরাও পড়বে পিছিয়ে। কাজে আন্তরিকতা, সুন্দর ও সত্য থাকবে বেঁচে। বাঁচার প্রয়োজন থাকলে আপন চেষ্টাতেই বাঁচবে, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে নিজেকেই আঁকড়ে থাক, বাঁচার ব্যবস্থা তোমার নিজের কাছে।

ভাসতে ভাসতে উঠলাম এক দেশে। চোখ খুলতে দেখি, আমারই বাংলা, স্রোতের টান নতুন জায়গায় নিয়ে যায় নি, ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে গিয়েছিলাম। পাড়ে উঠে যে দিকে তাকাই সেই দিকেই দেখি, আর্টের আয়োজনে গাজনতলার ভিড়। মেলায় বেচাকেনার ব্যাপারে সস্তার মাল ভরা। ক্রেতা ও বিক্রেতার বোঝাপড়াও সহজ ও সরল কথায়। এক দাম, এক কথা, ফাঁকির বিচার মাল বিক্রির পরে। সোজা হিসাবই বটে, এক পক্ষকে অন্তত ঠকাবার উপায় নেই।

সরল, সস্তা ও এক কথার ত্র্যহস্পর্শে কারবারস্থান পুণ্যভূমি হয়ে উঠেছে। ঘুরতে লাগলাম সরলের কাছে, দেখলাম, শিশুর মনে ভাগ বসাতে চায় পরম পাকা বুড়ো। বুড়ো কোন কালে ছিল নৃত্যকলাবিৎ, কোমর ভাঙায় তার নাচ হয়ে গেল সরল। সুরের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, তাল বেসামাল, লোকটা নেচে গেল খোকনের নাচ।

নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, ফাঁকিতে পড়ল কে, দর্শক, না নট? উত্তর পাই, কেউ না, ওদের কাজ ছিল ভিড় বাড়ানো, কাজ সেরেছে উভয়েই, ফাঁকির ভাগ যা রইল প'ড়ে তা আর্টের আয়োজন। মাঝখান থেকে কতকগুলো বিশেষণ হ'ল ঘায়েল। মরণকামড় কামড়ে দিলে ছাপার অক্ষরে আত্মজাহিরের জন্য। চিন্তিত হয়ে পড়লাম, বিশেষণে বিশেষণে কামড়া-কামড়ি—সে আবার কেমনতর দৃশ্য? রসের বাজারে টিটকারি ওঠে, নেপথ্যে কে ব'লে যায়, লোকটা কোথাকার মানুষ, নতুনের খবর রাখে না! বিশেষণের ঠোকাঠুকি, হ'ল প্রশংসার লড়াই, এ বলে—আমাকে দেখ, ও বলে—আমাকে। রসের দাম বাড়ে কি মন্ত্র দিয়ে? দেখলে না, খোকনের নাচ তারিফ ক'রে গেল,

রামুর মতই আর এক বুড়ো ? রামুর কোমর ভাঙুক, তবুও চোখে দেখে, আর যে তারিফ করলে সে একে কানা তায় আর একটা চোখও যেতে বসেছে। ভিক্ষের বাজার মন্দা, আজকাল আবার যাচাই ক'রে দয়া ফাটে, তাই তো নতুন আর্টের খেলা। সামলে চলতে পারলে বাজারে সবই চ'লে বাবু, একটু নতুনকে চিনতে শেখো। অর্থ বোঝার চেষ্টায় ভিড়ের মাঝ থেকে স'রে দাঁড়ালাম।

ক্রমশ

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

আগামী পথের যাত্রী

৪

আপ পাঞ্জাব মেল পশ্চিম-বাংলা, বিহার এবং যুক্তপ্রদেশ পেরিয়ে এলে পৌছল পূর্ব-পাঞ্জাবে। আম্বালা, জালন্ধর প্রভৃতি অতিক্রম ক'রে সৈনিক এসে উপস্থিত হলেন অমৃতসরে। পূর্ব-পাঞ্জাবের কোন স্টেশনে অথবা গাড়িতে সহযাত্রী হিসাবে কোন মুসলমানের দর্শন না পেয়ে সৈনিক নিজের মনে ভাবতে লাগলেন, সত্যই কি পূর্ব-পাঞ্জাব আজ মুসলমানশূন্য ? অনুসন্ধানে জানলেন, সমাজ-জীবনে বহু অসুবিধা ভোগ করছেন পাঞ্জাবের অধিবাসীবৃন্দ। কাপড় কাচবার ধোপা নেই, চুল কাটবার নাপিত নেই, কারখানার সস্তা মজুর নেই, তবু পূর্ব-পাঞ্জাব হিন্দু এবং শিখের জাতীয় বাসভূমি তো বটে। পাঠানকোটের গাড়ি ছাড়তে কয়েক ঘণ্টা দেরি ছিল, তাই সৈনিক অমৃতসর শহর ঘুরে দেখবার সুযোগ পেলেন, অঞ্জলি দিয়ে এলেন চোখের জল শত শহীদের স্মরণে শহীদভূমি জালিয়ানওয়ালাবাগে, প্রণাম ক'রে এলেন মোগলযুগে মহাভারতের স্বাধীনতাযজ্ঞের ঋত্বিক্ শিখগুরুদের উদ্দেশ্যে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে।

পাঠানকোট থেকে কনভয়ে যাত্রা হ'ল শুরু ডোগরা-রাজের শীতকালীন রাজধানী জম্মু শহরের উদ্দেশে। জম্মু এবং কাশ্মীর সামন্তরাষ্ট্রের জম্মু বিভাগ হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং অধিবাসীবৃন্দ ডোগরা নামে অভিহিত। সামরিক জাতি হিসাবে এরা ভারতবিখ্যাত।

পাহাড়ের আঁকবাঁকা পথ অতিক্রম ক'রে সৈনিক কনভয়ে এগিয়ে চললেন। কোথাও চোখে পড়ে পাহাড়, কোথাও ক্ষুদ্রকায়া কিন্তু বেগবতী

গিরিনদী, কোথাও অনাবাদী পতিত জমি। জম্মুর উদ্দেশে এগিয়ে চলতে চলতে সৈনিক ভাবছিলেন—পদ্মা-মেঘনা-বিধৌত শস্যশ্যামলা বাংলা যেমন তাঁর একান্ত নিজস্ব, জম্মু এবং কাশ্মীরের জনবিরল পার্বত্য অঞ্চলেও তেমনই তাঁর চির আপনার। কাশ্মীর থেকে কুমারিকা অবধি, পাঞ্জাব থেকে আসাম অবধি বিস্তৃত অঞ্চল মহাভারতের প্রাকৃতিক পরিপূর্ণ প্রতিকৃতি। মহাভারতের এই স্বাভাবিক রূপ যুগযুগান্তর ধ'রে আমাদের বীরচূড়ামণি, দেশপ্রেমিক এবং দার্শনিকদের অন্তরে প্রেরণা জাগিয়েছে। তাই মহাবীর চন্দ্রগুপ্ত গান্ধার থেকে জলধি-শেষ অবধি মহাভারতকে কৃপাণদণ্ডে একত্রিত ক'রে গেছেন, দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য কাশ্মীর থেকে কুমারিকা অবধি মহাভারতকে সমজাতীয়তাবাদের সন্ধান দিয়ে গেছেন, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ শতশতাব্দীর দাসত্বের পরেও মহামিলনের সঙ্গীতে পাঞ্জাব থেকে কলিঙ্গ পর্যন্ত মহাভারতকে সেই শাশ্বত সত্যের নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

মাস দুয়েক পরে আবার কনভয় যাত্রা হ'ল শুরু জম্মু এবং কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরের উদ্দেশে, ভূস্বর্গের স্বপ্নপুরী শ্রীনগরের উদ্দেশে, ভারতমাতার শিরোশোভা শ্রীনগরের উদ্দেশে।

কাশ্মীরীদের মধ্যে রূপ আছে, কিন্তু রুচি নেই। জনসাধারণ অত্যন্ত অশিক্ষিত এবং অপরিচ্ছন্ন। ঝিলাম নদীর তীরে শ্রীনগর শহরের প্রাকৃতিক অবস্থিতি সত্যই অপূর্ব। বিধাতা যেন নিজের হাতে ভারতমাতার মুকুট চিত্রিত ক'রে রেখেছেন অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, তাই মনে হয়, কাশ্মীর ব্যতীত ভারতবর্ষ অপূর্ণ থাকত, শেখ আবদুল্লা তাই পারেন নি ভারত-কাশ্মীর সম্বন্ধকে অস্বীকার করতে, কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, প্রাকৃতিক, ভৌগোলিক এবং মানসিক দিক থেকে ভারত-কাশ্মীর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য।

শ্রীনগর শহরের রাজপ্রাসাদ মন্দ নয় এবং দশম শতকে নির্মিত শঙ্করাচার্যের মন্দির শহরের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। শ্রীনগরের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আছে, কিন্তু শিক্ষা এবং রুচিহীন দেশবাসী পারে নি বিধাতার দানকে জগতের সামনে নিখুঁতভাবে তুলে ধরতে। কাশ্মীর উপত্যকার শত-করা নব্বই জন মুসলমান এবং তারা প্রায় সকলেই দরিদ্র এবং অশিক্ষিত, শতাব্দীর গোলামির ফলে এরা হারিয়েছে মানসিক বল এবং চরিত্রের দৃঢ়তা। হিন্দুদের সংখ্যা শত-করা দশ জনেরও কম এবং তারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ। হিন্দুরা

প্রায় সকলেই শিক্ষিত এবং সঙ্গতিপন্ন। বিধাতার দেওয়া রূপের বিচারে এখানকার প্রায় সকলেই সুন্দর, কিন্তু বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণেরা অপরূপ। পৃথিবীর যে কোন জাতির সঙ্গে এদের রূপের তুলনা চলতে পারে।

প্রাচীন কিম্বদন্তীর চিত্রসেনের গন্ধর্বলোক এবং শেরে-কাশ্মীর শেখ আবদুল্লার বর্তমান কাশ্মীর অভিন্ন। হিন্দুযুগে কাশ্মীর সংস্কৃত-শিক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্রভূমি ছিল, মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে সে দিনের হিন্দু পণ্ডিতদের এবং পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সংস্কৃতিগত যোগাযোগ ছিল। আজও সংস্কৃত-শিক্ষার বদলে যুগোপযোগী শিক্ষায় কাশ্মীরী ব্রাহ্মণেরা খুব পিছনে প'ড়ে নেই। তাঁদেরই রক্ত বইছে প্রধান মন্ত্রী মাননীয় পণ্ডিত নেহেরু এবং তেজবাহাদুর সপ্রুর ধমনীতে। বীরত্বের গৌরবও রেখে গেছে কাশ্মীর ভারতের ইতিহাসে। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য সপ্তম শতাব্দীতে আসাম এবং বাংলা ছাড়া গোটা উত্তর-ভারত জয় করেছিলেন।

মুসলমানী যুগ আনল কাশ্মীরের শিক্ষা এবং সভ্যতার উপর প্রবল ঢেউ। পাঠান-আমলে সংস্কৃত-শিক্ষার কেন্দ্রগুলি হ'ল ভস্মীভূত এবং মন্দিরগুলি হ'ল চৌচির। কিন্তু আজও ভগ্ন জীর্ণ অস্তিত্ব বহন ক'রে মার্তণ্ডদেবের মন্দির এ যুগের ঐতিহাসিকদের জানিয়ে দিচ্ছে, হিন্দুযুগে কাশ্মীর কত উন্নত ছিল।

পরবর্তী মোগলযুগে সম্রাটেরা গ্রীষ্মকালে আসতেন কাশ্মীর উপত্যকায়। সঙ্গে তাঁদের থাকত সাধারণ সৈনিক থেকে অভিজাত সম্প্রদায়ের আমির ওমরাহ এবং ফৌজদারের দল। দিল্লী এবং আগ্রার কমমুখর দিনে পরিশ্রান্ত শাসকশ্রেণী তাঁদের কামনা এবং বাসনাকে বিকৃত ক'রে তুলতেন ঝিলাম নদীর তীরে শ্রীনগরে। সৈনিকেরা ভোগ করেছেন সাধারণ মহিলাদের, আমির-ওমরাহকুল শক্তির অপব্যবহার করেছেন অভিজাতবংশীয় মহিলাদের উপর অত্যাচার ক'রে। হিন্দু-সমাজব্যবস্থার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির অভাবে মোগলের অত্যাচারিতা রমণীরা স্থান পান নি হিন্দু-সমাজে। ফলে দিনের পর দিন বেড়ে গেছে মুসলমানের সংখ্যা। এখানকার প্রায় সকল মুসলমানের শরীরেই বইছে হিন্দুরক্ত। তাই বোধ হয় পাঠানের ক্ষাত্রতেজ এঁদের নেই, রয়েছে শূদ্রসুলভ মনোবৃত্তি এবং চিন্তাধারা।

মোগল-পাঠানেরা রণকুশলী ছিলেন, তাঁদের চরিত্রে স্বধর্মপ্রীতি একতাবোধ এবং সৈনিকসুলভ নিয়মানুবর্তিতাও ছিল, কিন্তু ছিল

মানবিকতার বিকাশ, আর ছিল না ন্যায় এবং নীতি বোধ। তাই তাঁরা ভেঙেছেন মহানালন্দা, ধ্বংস করেছেন সোমনাথ, ধূলিসাৎ করেছেন মার্তণ্ড-দেবের মন্দির। কিন্তু ইসলামধর্মাবলম্বীরা পরস্পর পরস্পরকে ভাইয়ের সম্মান এবং আদর জানিয়েছেন, কিন্তু অমুসলমানদের বলেছেন—কাফের। তাই বিধর্মীর রক্তে, বিধর্মীর মন্দির ধ্বংস ক'রে এবং বিধর্মীর নারী লুণ্ঠন ক'রে স্পেন থেকে দ্বীপময় ভারত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আরবীয় সামরিক সাম্রাজ্যবাদ। আর হিন্দুরা বলেছেন, যত মত তত পথ, বসুধৈব কুটুম্বকম্। এই নীতিবোধ এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ মুসলমানদের অজ্ঞাত ছিল, তাই এ যুগের শ্রেষ্ঠ হিন্দু পণ্ডিত রবীন্দ্রনাথের মুখে ধ্বনিত হয়েছে হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ, জৈন-পারসিক, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান সকলের সম-অধিকারের মহাভারতীয় জাতীয়তাবাদ, আর অপর পক্ষে এ যুগের শ্রেষ্ঠ মুসলমান পণ্ডিত ডাঃ ইকবালের কলমে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেই একদর্শী ইসলামিক চিন্তাধারা। চীন ও আরব আমার, হিন্দুস্থান আমার আমি মুসলমান, সারা বিশ্বের মুসলমানের ঘরই আমার ঘর। তাই সাতশো বছর ভারতবর্ষে বাস ক'রেও মুসলমানেরা হতে পারেন নি ভারতীয়, উপরন্তু হিন্দু-সমাজের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বহু ভারতীয়কে করেছেন আরবীয়। তাই ভারতবর্ষে ব'সে মিঃ জিন্নাকে সম্মান জানাতে প্রয়োজন হয়েছিল আরবের বালির বেলা এবং মরুভূমির খেজুর। মুসলমানেরা ভারতকে খণ্ডিত করেছেন তাঁদের চিরন্তন একদর্শী বিকৃত মনোবৃত্তি দিয়ে, আর অতিরিক্ত মানবপ্রীতি এবং আদর্শবাদের রাজনীতি ক'রে ঠকেছেন হিন্দুরা, তাঁদের ধর্ম, সমাজ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে।

কাশ্মীরেই হয়তো প্রমাণিত হবে, সে কি চায়—ধর্মকেন্দ্রিক মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র, না, গণতন্ত্রসম্মত যুগোপযোগী জনরাষ্ট্র। তবে এ কথা সত্য যে, সামরিক গুরুত্ব-পূর্ণ কাশ্মীরের পার্বত্য অঞ্চলের প্রয়োজন মহাভারতের আছে বিশ্বসভায় প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বীয় আসন চিরপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য, কারণ কাশ্মীর যদি ভারতের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তা হ'লে শুধু আফগানিস্তান, তিব্বত এবং মধ্য-এশিয়ায় ভারতের রাজনৈতিক প্রভাবই বিস্তৃত হবে না, এই পার্বত্য অঞ্চলের বহুবিধ কাঁচা মাল সাহায্য করবে ভারতকে অধিকতর সমৃদ্ধ হ'তে, এবং ধর্মোন্মত্ততা থেকে মুক্তি পাবে ভারতীয় গণতন্ত্রের শীতল ছায়ায় অতি প্রাচীন একটি মহাঅঞ্চল; অন্য দিকে পশ্চিম-পাকিস্তানের সত্তা হবে

নগণ্য, পরিণত হবে তা শক্তিহীন 'বাফার স্টেটে'। আর যদি রাজনৈতিক বিপর্যয়ে কাশ্মীর পশ্চিম-পাকিস্তানের কবলিত হয়, অসীম ক্ষমতাপন্ন হবে পশ্চিম-পাকিস্তান—সম্পদে, শক্তিতে এবং জনবলে। তুরস্ক থেকে আফগানিস্তান পর্যন্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলির তা হ'লে শুধু নেতৃত্বই পাকিস্তান করবে না, হয়তো বা সুলতান মামুদ এবং মহম্মদ ঘোরীর অভিযান আবার ঘনিয়ে আসতে পারে ভারতের ইতিহাসে। তাই কাশ্মীর-সমস্যা আজ আর শেখ আবদুল্লা এবং মহারাজ হরি সিংহের ব্যক্তিগত সমস্যা নয়, মহাভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হ'ল জম্মু এবং কাশ্মীরে অবস্থিত প্রত্যেক ভারতীয় ইউনিটে। সৈনিকের ইউনিটেও জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হ'ল জনগণমন সঙ্গীতধ্বনিতে বাঙালী যুবকদের সহযোগিতায়। উচ্চতম অফিসার থেকে শুরু ক'রে নিম্নতম সিপাই পর্যন্ত বিভিন্ন পদমর্যাদার সৈনিকগণ সম্মিলিতভাবে অভিবাদন জানালেন জাতীয় পতাকার সামনে।

প্যারেড গ্রাউণ্ড থেকে ফেরবার পথে সৈনিকের একজন সহকর্মী মারাঠী বন্ধু সৈনিককে বললেন, শিবাজী ভাই, আন্তরিক স্বীকার করছি, তোমরা ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তোমরা না হ'লে হয়তো আজ জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া সম্ভব হয়ে উঠত না পতাকা উত্তোলনের সময়। তোমরা শুধু জাতীয় সঙ্গীত লিখেই ক্ষান্ত হও নি, অন্তরে উপলব্ধি করেছ তার মর্ম। শুধু এই কেন, বহুলপ্রতিভার বহুমুখী বিকাশ আধুনিক কালে ভারতীয় জাতিগুলির মধ্যে একমাত্র বাংলাতেই সম্ভব হয়েছে। তোমরা কবিতা লিখছ, গান গেয়েছ, নৃত্যকলার সৃষ্টি করেছ, বিজ্ঞানেও তোমাদের দান কম নয়, আবার নিশীথরাত্রে বিদ্যুৎ-শিখার হাতছানিতে তোমরাই দলে দলে ছুটে গেছ ফাঁসির মঞ্চে অথবা দ্বীপান্তরে। দুর্যোগরাত্রে ভাসিয়ে দিয়েছ তরী দুস্তর পারাবারে। আকাশে ঝড় দেখে ভয় পেয়ে হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থেকে সময়মত সুযোগ গ্রহণ করতে চাও নি, ফলে আজ ভাগ্যচক্রে তোমরা খানিকটা বিপন্ন হয়ে পড়েছ হয়তো, কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই, তোমাদের প্রাণসত্তা অপরিসীম।

সৈনিক হেসে বললেন, বন্ধুবর, আজ তোমার ভিতরে এতটা বাঙালী-প্রীতি উপচে উঠল কেন?

উত্তরে মারাঠী ভদ্রলোক পুনরায় বললেন, পরিহাস রাখ, বঙ্গ-মারাঠার আন্তরিকতাবোধ প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বকবির "শিবাজী" কবিতার ভিতর দিয়ে, স্বীকৃত হয়েছে পাঁচ সালের কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গের যুগে লোকমান্য তিলকের তীব্র প্রতিবাদে। আর তা ছাড়া তোমার প্রদেশের সঙ্গে আমার প্রদেশের সীমা-পুনর্বণ্টন নিয়ে কোন তিক্ততা সৃষ্টির সম্ভাবনা যখন নেই এবং আমার সত্য-ভাষণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে কোন লাটসাহেবী মসনদ থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনাও আমার নেই। তবে দুঃখ হয় কি জান—এত জ্ঞানী, গুণী, পণ্ডিত এবং দেশ-প্রেমিকের জন্ম তোমরা দিলে, কিন্তু গত কয়েক বছরের বিভিন্ন বিপর্যয়ে আজ যেন মনে হচ্ছে, তোমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

বাংলার নগণ্য সন্তান হ'লেও বাঙালী-জন্মের দাবিতে সারা বাঙালী জাতির তরফ থেকে তোমার মত বঙ্গবন্ধুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ আজ সর্বত্রই যেন বাঙালী জাতি নিজেকে বন্ধুহীন মনে করছে, তবে একটা কথা কি জান, আগামী সম্বন্ধে আমার বিশ্বাসী মন বলছে, ভগবান সম্ভবত চাইছেন, বাঙালী জাতি অতীতের চাইতে ভবিষ্যতে আরও বেশি জ্ঞানে, গুণে, বিজ্ঞানে সাফল্য লাভ করুক। তাই একের পর এক বিপর্যয় দিয়ে বাংলার ভাগ্য-বিধাতা বাঙালী জাতির জীবনীশক্তিকে অধিকতর প্রখর ক'রে তুলছেন।

শ্রীচুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বনের পাখী

এমন ক'রে ডাকিস নে আর
 ওরে গহন বনের পাখী,
মধুর স্বরে ডাক দিয়ে সে
 পালিয়ে গেছে দিয়ে ফাঁকি।
তারই কথা পড়ছে মনে
 খুঁজে বেড়াই সঙ্গোপনে
বল্ সে কোথায় লুকিয়ে আছে
 আপনাকে আজ আড়াল রাখি?
ব্যাকুল হয়ে খুঁজি তারে
 আর সে ফিরে আসবে নাকি?

বসন্ত যে আসছে ফিরে
 যৌবনেরি উন্মাদনে,
ছড়িয়ে রঙিন উত্তরীয়
 দিকে দিকে নীল গগনে।
বিরহে ভোর ছিল যারা
 ফুলের সাজি ভরল তারা
ধূলায় প'ড়ে আমার ডালি—
 ভরবে কে হায় তার যতনে?
তারি মতন এমন ভালো
 বাসতে পারে বল্ কজনে।

কে বাজায় এ ব্যাকুল বাঁশী
 ফাটিয়ে ছাতি আকুল সুরে,
হারিয়ে গিয়ে বনের মাঝে
 এমনি খরা ভর্-দুপুরে ?
রাখাল ছেলে চরায় ধেনু—
 সে কি বাজায় মোহন বেণু ?
ওরে পাগল আগল ভেঙে
 কেন ঘুরিস পথটি জুড়ে,
মনের কথা শুনাস কারে ?
 যাক্ সে ভেসে অনেক দূরে।

বনের পাখী যাস রে যদি
 ভিন্‌দেশে সে সাগর পারে
দেখতে পেলে বলিস শুধু,
 এই কথাটি শুনিয়ে তারে।
রয়েছি তার আশায় ব'সে
 ক্ষমি আমার সকল দোষে
নেয় যেন সে আবার ডেকে
 ভালবেসে ঘরছাড়ারে,
চৈতী হাওয়া ডুকরে কাঁদে—
 আছড়ে প'ড়ে ব্যথার ভারে !

বুকের কাছে পেয়েও তারে
 কেন গো হায় পেলাম নাকো,
তারি পরশ না পেলে কে
 ভাঙা বাঁধে বাঁধবে সাঁকো ?
বসন্তে আজ বসুন্ধরা
 হ'ল নতুন স্বয়ম্বরা
ফুটছে কুসুম থরে থরে
 উড়ছে মধুপ লাখোলাখো
বনের পাখী লুকিয়ে থাকি
 তুমি আমায় তাই কি ডাকো !

দিনের আলো ঝিমিয়ে এল
 আকাশ জুড়ে ফুটল তারা,
অন্ধকারের নীরবতায়
 দেবে কি কেউ আমায় সাড়া ?
তারি লাগি প্রহর গনি
শুনি আলোর আগমনী
তোমার সুরে বনের পাখী
 হয়েছি তাই আত্মহারা
পলাতকায় ফিরিয়ে দিয়ে
 ধন্য কর সুরের ধারা।

শ্রীশান্তি পাল

রুবাই

কি যে আমি, কেন আমি, কিসে মোর পরিচয়,
এ জীবন-অর্ণবে কে আমার তরী বয়—
কিছুই জানি না ঠিক, খুঁজে মরি ঠিকানা
মোর মাঝে জানা আর না-জানার পরিচয়।

আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার

জীবনপঞ্জী

১৮৭০, ১০ ডিসেম্বর	… জন্ম, করচমাড়িয়া গ্রাম, জেলা রাজশাহী। পিতা—রাজকুমার সরকার।
১৮৯১, মার্চ	বি. এ. পরীক্ষায় ইংরেজী ও ইতিহাসে অনার্স, মাসিক ৫০৲ বৃত্তি লাভ।
১৮৯২, ডিসেম্বর	… এম. এ. পরীক্ষায় ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর প্রথম, (with record marks)।
১৮৯৩, জুন	· রিপন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক।
১৮৯৬-১৮৯৮, মার্চ	বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক।
১৮৯৭, ডিসেম্বর	… প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ।
১৮৯৮, জুন—১৮৯৯, জুন	· প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক।
১৮৯৯, জুলাই—১৯০১, জুন	পাটনা কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক।
১৯০১, জুলাই—ডিসেম্বর	প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক
১৯০২, জানুয়ারি—১৯১৭, আগস্ট	··পাটনা কলেজে প্রথমে ইংরেজী, পরে ইতিহাসের অধ্যাপক।
১৯১৭, আগস্ট—১৯১৯, জুলাই	· কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত-ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক।
১৯১৮	আই. ই. এস স্তরে উন্নীত।
১৯১৯, জুলাই—১৯২৩, অক্টোবর	· কটক র‍্যাভেন্শ কলেজে ইতিহাসের, তথা ইংরেজীর অধ্যাপক।
১৯২৩, এপ্রিল	· রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেনের 'অনারারি মেম্বর' বা সম্মানিত সদস্য।
১৯২৩, অক্টোবর—১৯২৬, আগস্ট	··পাটনা কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক।
১৯২৬, জানুয়ারি	· সি. আই. ই.
১৯২৬-১৯২৮	· কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার।
১৯২৯, জুন	·· 'নাইট' (Kt) উপাধি লাভ।
১৯২৩, জুলাই	… রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি বোম্বাই শাখার সার্ জেম্স ক্যাম্পবেল স্বর্ণপদক লাভ।

১৯৩৫-৩৬, ১৯৪০-৪৪, ১৯৪৮ … বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি।
১৯৩৬ … ডি. লিট্ (ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়)
১৯৩৮ … বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 'বিশিষ্ট সদস্য'।
১৯৩৯, ৪ সেপ্টেম্বর … এশিয়াটিক সোসাইটির "অনরারি ফেলো"
১৯৪৪ … ডি. লিট্ (পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয়)।

বাংলা গ্রন্থাবলী

১। সিয়ার্ উল্-মুতাখ্খরীন্ : অনুবাদক গৌরসুন্দর মৈত্র (সম্পাদিত) কার্তিক ১৩২২ (ইং ১৯১৫)। পৃ. ৪০—অসম্পূর্ণ
২ শিবাজী। (নভেম্বর ১৯২৯)। পৃ. ২৬৪।
৩ মারাঠা জাতীয় বিকাশ (সরল কাহিনী)। আষাঢ় ১৩৪৩ (ইং ১৯৩৬) পৃ. ৬৮। মরাঠা জাতির অভ্যুদয়, শিবাজী, শিবাজীর পর মারাঠা ইতিহাসের ধারা, মারাঠাদের সাহিত্য ও ইতিহাস উদ্ধারের কাহিনী।

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রচনা

১৩০২, বৈশাখ · 'মুকুল' … রবিবার ও কুস্তমেলা ৮১ বৎসর পূর্বে
১৩১১, কার্তিক ·· 'প্রবাসী' … আওরাঙ্গজীবের আদি লীলা
১৩১২, আষাঢ় · 'নব্যভারত' … সাংগঠন
অগ্রহায়ণ 'প্রবাসী' … কবিতা ক্ষুধা
পৌষ · ঐ … চাটগাঁ ও জলদস্যুগণ
মাঘ 'নব্যভারত' … এক জন বাঙ্গালী মুসলমান বীর
১৩১৩, জ্যৈষ্ঠ ·· 'প্রবাসী' শায়েস্তা খাঁর চাটগাঁ অধিকার
অগ্রহায়ণ ·· ঐ … শাহজাহানের রাজ্য-নাশ।
·· "সোনার তরী"র ব্যাখ্যা।
১৩১৪ আষাঢ় ·'ভারত-মহিলা'·· সতি-উন্ নিসা
ভাদ্র ·· 'প্রবাসী' … দুই রকম কবি—হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ
১৩১৫, ভাদ্র · ঐ … সিয়ার-উল-মুতাখ্খরীন্
আশ্বিন · ঐ … খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর
১৩১৬, ফাল্গুন · ঐ … মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ
… বঙ্গভাষীদের জন্য বিহারে কলেজ স্থাপন (মথুরানাথ সিংহের নামে প্রকাশিত)

	ফাল্গুন	···ভাগলপুর সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য-বিবরণ	···মুসলমান ভারতের ইতিহাসের উপকরণ
১৩১৭, মাঘ	·	'প্রবাসী'	· বাঙ্গালীর ভাষা ও সাহিত্য
	২য় সংখ্যা	· 'রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'	মালদহ উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতির ভাষণ
১৩১৮, আশ্বিন		'প্রবাসী'	··· বাদশাহী গল্প
	অগ্রহায়ণ ···	'জাহ্নবী'	৺রজনীকান্ত সেন
১৩২০, শ্রাবণ		'প্রবাসী'	··· পূর্ব্ব-বঙ্গ (সমালোচনা)
১৩২১, কার্ত্তিক	·	ঐ	··· মুর্শীদ কুলী খাঁর অভ্যুদয়
১৩২২, বৈশাখ	···	ঐ	·· বর্দ্ধমান বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির ভাষণ (১৩৫৫, আশ্বিন 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত)
	শ্রাবণ ··	ঐ	· বাঙ্গালার ইতিহাস (সমালোচনা)
১৩২৩, বৈশাখ		'মানসী ও মর্ম্মবাণী'	· আওরংজীবের পরিবারবর্গ
	আষাঢ়-শ্রাবণ	· 'ভারতবর্ষ'	··· উইলিয়ম আর্ভিন, আই. সি. এস
	মাঘ	· 'প্রবাসী'	··· পাটনায় প্রাচীন চিত্র
	ফাল্গুন	· 'ভারতবর্ষ'	পাটনার কথা
১৩২৪, আষাঢ়		'প্রবাসী'	··· প্রবাসী বাঙ্গালী ও বঙ্গসাহিত্য
	শ্রাবণ ·	ঐ	··· বিশ্ব-বিদ্যা-সংগ্রহ
	ভাদ্র ···	'ভারতবর্ষ'	'বাঙ্গলার বেগম', ২য় সংস্করণ (সমালোচনা)
১৩২৬, আশ্বিন		· 'প্রবাসী'	·· প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ (১৩৫৫, আষাঢ়ের 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত)
	কার্ত্তিক ···	ঐ	··· মুসলমান আমলের ভারতশিল্প
	অগ্রহায়ণ	··· 'ভারতবর্ষ'	··· রামমোহন রায়ের কীর্ত্তি
	চৈত্র ···	ঐ	··· মুঘল ভারতেতিহাসের লুপ্ত-উপাদান

১৩২৭, কার্তিক	...	'প্রবাসী'	... প্রতাপাদিত্যের পতন (১৩৫৫, জ্যৈষ্ঠ 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত)
নিদাঘ সংখ্যা	...	'প্রভাতী'	.. নূতনের মধ্যে পুরাতনের প্রকাশ
১৩২৮, বৈশাখ	...	'ভারতবর্ষ'	... অরাজক দিল্লী (১৭৪৯-৮৮)
আষাঢ়		'প্রবাসী'	.. প্রতাপাদিত্যের সভায় খ্রীষ্টান পাদ্রী (১৩৫৫, আষাঢ় 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত)
শ্রাবণ	.	ঐ	... বোকাইনগর কেল্লা ও উস্‌মান
আশ্বিন		ঐ	. আওরংজীব ও মন্দিরধ্বংস ঐতিহাসিক সত্য কি ?
			কেজো রসায়নের ওস্তাকশপ
১৩২৮, অগ্রহায়ণ	.	'প্রবাসী'	. বঙ্গের শেষ পাঠান বীর
মাঘ	..	'শিক্ষক'	. শিক্ষার আলোচনা কেন আবশ্যক ?
নিদাঘ সংখ্যা	...	'প্রভাতী'	. দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা
শীত সংখ্যা		ঐ	. আওরংজীবের রাজত্বের হিন্দু ঐতিহাসিক
১৩২৯, বৈশাখ		'প্রভাতী'	বাঙ্গলার একখানি প্রাচীন ইতিহাস আবিষ্কার
আষাঢ়	.	'ভারতবর্ষ'	.. আওরংজীবের সাতারা-অবরোধ
ভাদ্র	...	'প্রবাসী'	. বাঙ্গলার স্বাধীন জমিদারদের পতন
ভাদ্র	...	'প্রভাতী'	. ভারতের ঐশ্বর্য্য
পৌষ	.	ঐ	ঐতিহাসিক ভীমসেন
ফাল্গুন	...	'প্রবাসী'	.. বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গী
১৩৩০, পৌষ	..	'প্রভাতী'	.. সম্রাট শাহজহানের দৈনন্দিন জীবন
মাঘ	...	ঐ	... মুঘল শাহজাদার শিক্ষা
১৩৩৩, বৈশাখ	...	'প্রবাসী'	... কুমার দারার বেদান্ত চর্চ্চা
১৩৩৫, চৈত্র	...	ঐ	... মহারাষ্ট্র দেশ বা মারাঠা জাতি
১৩৩৬, অগ্রহায়ণ-পৌষ		'প্রবাসী'	... পিতাপুত্রে
১৩৩৭, বৈশাখ	...	ঐ	... আওরংজীবের জীবন-নাট্য

১৩৩৭ শ্রাবণ	ঐ	নাদির শাহের অভ্যুদয়
আশ্বিন	ঐ	ভারতে মুসলমান
চৈত্র	ঐ	বঙ্গে বর্গী
১৩৩৮, বৈশাখ-আষাঢ়	ঐ	বর্গীর হাঙ্গামা
জ্যৈষ্ঠ	'ভারতবর্ষ'	বিদ্যাসাগর
১৩৩৯, আশ্বিন	'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা' ২য় খণ্ড	শিবাজী ও জয়সিংহ
১৩৩৯, পৌষ	'ভারতবর্ষ'	'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (সমালোচনা)
মাঘ	'বঙ্গশ্রী'	মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস
চৈত্র	ঐ	মারাঠা সৌভাগ্য-সূর্য্যের অবসান।
১৩৪০, শ্রাবণ	'ভারতবর্ষ'	নবীন বঙ্গের জাগরণ-প্রভাতের দৃশ্য ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ২য় খণ্ড; সমালোচনা)
১৩৪১, জ্যৈষ্ঠ	ঐ	জাতীয় সাহিত্যের বিকাশ ('বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস'র সমালোচনা)
" কার্ত্তিক-পৌষ	'বুলবুল'	ইতিহাসের গুরুত্ব (কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ১২শ অধিবেশনে ইতিহাস-শাখার উদ্বোধন-বক্তৃতা)—১৩৫৫, আশ্বিন 'শনিবারের চিঠি'তে পুনর্মুদ্রিত।
১৩৪২, জুন	'রজত-জয়ন্তী ভারত-সাম্রাজ্যের ২৫ বৎসর'	আধুনিক ভারতে ইতিহাসের বিকাশ
পৌষ	'ভারতবর্ষ'	'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ৩য় খণ্ড (সমালোচনা)
১৯৩৬, ২৪ জানুয়ারি	'নূতন পত্রিকা'	ইসলামী সভ্যতার স্বরূপ কি?
	'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'	বঙ্গে মুঘল-পাঠান সংঘর্ষ, ১৫৭৫ খ্রীঃ
১৩৪৩, ৩০ আশ্বিন	'এডুকেশন গেজেট'	বঙ্গের বাহিরে শক্তিপূজা
	চন্দননগর সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ	ইতিহাস-শাখার সভাপতির ভাষণ (৯ ফাল্গুন ১৩৪৩

১৩৪৪, আষাঢ় ... 'ভারতবর্ষ' ... বেকার
১৩৪৫, আষাঢ় ...'মাসিক বসুমতী' ... বঙ্কিমচন্দ্র ও ইসলামীয় সমাজ
১৩৪৫, আষাঢ় ...'শনিবারের চিঠি' ... বঙ্কিম-প্রতিভা
আশ্বিন ... 'অলকা' ... যুগধর্ম্ম ও সাহিত্য
২য় সংখ্যা . 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' .. মুঘল ভারতের ঐতিহাসিকগণ
১ম সংখ্যা . ঐ মুসলমান-যুগে ভারতের ঐতিহাসিকগণ
১৩৪৬, ২য় সংখ্যা ... ঐ ... ঐ
১৩৪৭, ১ম সংখ্যা . ঐ ... রামমোহন রায়ের বিলাত-যাত্রা
৪র্থ সংখ্যা ... ঐ ... মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাসের মশলা
১৩৪৮, আশ্বিন ...'শনিবারের চিঠি' ... রবীন্দ্রনাথের একটি দান
পৌষ 'প্রবাসী' ... মোহিনীমোহন চক্রবর্ত্তী-স্মৃতি
১৩৪৯, ১ম সংখ্যা ...'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ... হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১৩৫০, ৩য় সংখ্যা .. ঐ ... দুর্গেশনন্দিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি
১৩৫১, ১ম সংখ্যা ... ঐ ... নাট্য-সাহিত্য কোথায় গেল ?
চৈত্র .. 'প্রবাসী' ... আকবরের আমল
১৩৫২, মাঘ ... ঐ ... আর্য্যা নিবেদিতার আদর্শ
... গবেষণার প্রণালী
ফাল্গুন-চৈত্র ... ঐ ... পত্রাবলী
১৩৫৪, আশ্বিন ... ঐ ... স্বাধীনতার উপায় চিন্তা (১৫ আগস্ট ১৯৪৭)
১৩৫৫, আশ্বিন ... ঐ ... দেশের ভবিষ্যৎ
কার্তিক ... প্রাচী (শান্তিপুর) ... বাহিরের জগৎকে বাঙ্গলার দান
পৌষ ... 'প্রবাসী' ... আমার জীবনের তত্ত্ব

যদুনাথ-লিখিত বাংলা ভূমিকা

প্রাচীন ইতিহাসের গল্প	…	শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	… পৌষ	১৩১৯
প্রতাপসিংহ (৩য় সং)	…	সতীশচন্দ্র মিত্র	… মে	১৯১৭
মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা	…	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	… আষাঢ়	১৩২৬
জহান্‌-আরা	…	ঐ	… জ্যৈষ্ঠ	১৩২৭
শিবাজী মহারাজ	…	ঐ	… ফাল্গুন	১৩৩৫
ওমর খৈয়াম	…	শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী	… ভাদ্র	১৩৩৬
আনন্দমঠ	…	পরিষৎ-সংস্করণ	… আষাঢ়	১৩৪৫
দুর্গেশনন্দিনী	…	"	… পৌষ	১৩৪৫
দেবী চৌধুরাণী		"	… ভাদ্র	১৩৪৬
রাজসিংহ	…	"	… শ্রাবণ	১৩৪৭
সীতারাম (২য় সং)	…	"	… ফাল্গুন	১৩৫২
বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ		রেজাউল করীম	… মে	১৯৪৪
ছেলেদের বাবর	.	শ্রীনলিনী গুপ্ত	… বৈশাখ	১৩৫২

ইংরেজী গ্রন্থাবলী

1. *India of Aurangzib* : Topography, Statistics, and Roads … 1901
2. *Economics of British India* … 1909, Mar
3. *History of Aurangzib* :

Vol. I	…	July 1912
II	…	„
III	…	1916
IV	…	Nov 1919
V	…	Dec 1924

4. *Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays* … 1912, Nov.

১৯২৫, জুলাই মাসে ইহার ২য় সংস্করণ *Anecdotes of Aurangzib* নামে প্রকাশিত হয় ; একমাত্র Life of Aurangzib ছাড়া প্রথম বারের সকল প্রবন্ধই এই সংস্করণে বর্জিত হইয়াছে।

5. *Chaitanya : his Pilgrimages and Teachings* (afterwards *Chaitanya's Life and Teachings*, 1922) ... 1913
6. *Shivaji and His Times* ... 1919, July
7. *Studies in Mughal India* ... 1919, Oct.
   (*Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays* পুস্তকের ১০টি ও নূতন ১২টি প্রবন্ধের সমষ্টি)
8. *Mughal Administration* :
   1st Series ... Cal. 1920
   2nd Series ... 1925 (Patna Univ.)
   Combined volume 1924
9. *Later Mughals*, 1707 1739 :
   By Wm. Irvine, ed. and continued by J N. Sarkar. Vols. I II ... 1922
10. *India Through the Ages* ... 1928
11. *Short History of Aurangzib* ... 1930
12. *Bihar and Orissa during the fall of the Mughal Empire* ... 1932
13. *Fall of the Mughal Empire*
    Vol. I ... 1932
    II ... 1934, Sep.
    III ... 1938, Nov.
14. *Studies in Aurangzib's Reign* ... 1933
15. *House of Shivaji* ... 1940, May
16. *Maasir-i-Alamgiri* (Bib. Indica)
    Eng. trans. by J. N. S. ... 1947, Oct.
17. *Poona Residency Correspondence* (EDITED) :
    Vol. I ... 1936
    Vol. VIII ... 1945
    Vol. XIV ... (in the press)

18. *Ain-i-Akbari*, Bib. Ind. (EDITED) :
    Vol. III, Eng. tr. by Jarrett ... 1948
    Vol. II, Do. (in the press)

* * *

ইহা ছাড়া *Cambridge History of India* (Vol. IV, 1937 গ্রন্থের ৮, ১০-১৯ ও ১৭শ অধ্যায় যদুনাথের লিখিত। ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত *History of Bengal* (Vol. II May 1948) গ্রন্থখানি তিনি কেবলমাত্র সম্পাদনই করেন নাই, ইহার দুই শতাধিক পৃষ্ঠা নিজে লিখিয়া দিয়াছেন।

যদুনাথ-লিখিত ইংরেজী ভূমিকা

1. *History of the Jats* : K. R Qanungo ... 1925, Aug.
2. *Begam Samru* : Brajendra Nath Banerjee 1925, Septr.
3. *Mirat-i Ahmadi*, ed. by S. Nawab Ali ... 1927
4. *Aitihasik Patren Yadi wagaire Lekh* (2nd ed.) : G. S Sardesai ... 1930, June
5. *Tarikh i Mubarak Shahi* :
   Eng. trans. by K K Basu .. 1932
6. *The First two Nawabs of Oudh* :
   Ashirbadi Lal Srivastav ... 1933
7. *Malik Ambar* : Jogindra Nath Chowdhuri 1934, Feb
8. *Shindeshahichin Rajakaranen* :
   Vol. I (Satara 1934)
   Vol. II (Satara 1940)
9. *Malwa in Transition* : Raghubir Sinh ... 1936
10. *Historical Papers relating to Mahadji Sindhia* : ed. by G. S. Sardesai ... 1937, Dec.
11. *Badshah Begam* : Md. Taqi Ahmad ... 1938
12. *A Bibliography of Mughal India* :
    (1526—1707 A.D.) : Sri Ram Sharma 1939

13 *History of the Sikhs, 1739-'68 :*
Hari Ram Gupta ... 1939
14. *History of Medieval Vaishnavism in Orissa* : Prabhat Mukherjee ... 1940
15 *Marathi Riyasat,*
Vol. 5, Baji Rao : Sardesai ... 1942
16. *Begams of Bengal* ·
Brajendra Nath Banerjee ... 1942, Oct.
17. *Peshwa Baji Rao I* : V. G Dighe .. 1944
18. *Sardar Sakharam Hari* . Y R Gupte .. 1946
19. *Humayun in Persia* Sukumar Roy ... 1948

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ইংরেজী রচনা

সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠায় যদুনাথের বহু ইংরেজী রচনা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইহার অতি অল্প অংশই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে এই সকল রচনার নির্ভরযোগ্য তালিকা সংকলন করা সম্ভবপর নহে বলিয়া আমরা কেবলমাত্র কতকগুলি পত্রিকার নামোল্লেখ করিতেছি :—

Calcutta University Magazine, Modern Review, Bihar & Orissa Research Socy.'s Journal, Bengal : Past and Present, Journal of the Asiatic Socy. of Bengal, Islamic Culture (Hyderabad), Muslim Review, Indian Historical Quarterly, Hyderabad Arch. Socy.'s Journal, Hindusthan Review, Indian Review, Ravenshavian (Cuttack), Presidency College Magazine, Prabuddha Bharat, Bombay University Journal, Times of India, Science and Culture, Patna College Magazine, Calcutta Municipal Gazette.

ইহা ছাড়া Proceedings of the Indian Historical Records Commission, B. C. Law Commemoration Vol., Sardesai Commemoration Vol. (1933), Birla Park Annual প্রভৃতিতে তাঁহার রচনার সন্ধান মিলিবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জিজ্ঞাসা

কথায় কথায় উচ্চারে কারা মহাত্মাজীর নাম,
ওরা কি সবাই মহামানবের মন্ত্র-শিষ্য দল?
উপদেশ দেয় সবারে গাহিতে—জয় জয় রাজারাম,
রহিতে সদাই মহাত্মাজীর আদর্শে অবিচল?

কালোবাজারের আলো-আঁধারের চোরা-গলিপথ দিয়ে
করে না'ক ওরা কদাপিও কেউ চুপিচুপি আনাগোনা,
শ্রমীর শোণিত ব'লে কৌশলে যত পারে শুষে নিয়ে
সিন্দুক ভ'রে পুঁজি ক'রে যায় তাল তাল কাঁচা সোনা?

মদে ও সিগারে শাড়িতে গাড়িতে ব্যয় করে যাহা রোজ,
এক-শতাংশ স্বেচ্ছায় তারা করে কি কখনো দান,
সেই সব ভবিক্ষনদের,—যারা দু বেলা দু মুঠি ভাত
প্রাণপাত ক'রে পারে না তবুও ক'রে নিতে সংস্থান?

ওদের কাছে কি মানুষ নহে—অর্থ যাদের নাই
পীড়ন করিয়া সেবা নেওয়া ঠাই পায় নাকো মনোমাঝে
চাষী ও মজুরে তাই ভেবে কভু ধার দিতে পারে ঠাই,
ছিন্নবসনে রাজপথে যেতে পায় না'ক মনে লাজ?

নারীর দেহেরে ভাবে না পণ্য, ভাবে—নারী মহীয়সী,
বিরাম-বাসর রচে না কখনো বাগানবাড়ির মাঝে;
পরকাল ভেবে অস্থির হয় টাকার গদিতে বসি,
ক্ষতির ভয়েও অমিল হয় না কখনো কথায় কাজে?

ব্যবসা জাঁকাতে ছাড়ে না কখনো মিথ্যা বিজ্ঞাপন,
মজুরের টাকা মেরে তাই দিয়ে কেনে না রঙিন মদ,
চোর হয়ে কভু করে না চোরের বিচারের প্রহসন
ঘুষ পেলে কভু করে না মানুষ খুনের মামলা রদ?

দেবতা শুনেছি রসিক পুরুষ, দেখি নি শ্রীমুখখান্,
দানবকণ্ঠে শোনান সবারে আপনার জয়গান।

শ্রীশিবদাস চক্রবর্তী

হিন্দী বনাম বাংলা

(৩০৪ পৃষ্ঠার পরে)

সেই দারুণ ভয়ে অগ্রসর না হয়ে আমার বন্ধু শ্রীসজনীকান্ত দাস, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ও শ্রীঅমল হোমকে ভাগ ক'রে এ কাজ করতে অনুরোধ করেছিলুম। কেবল অন্নদাশঙ্করবাবু উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি ইংরেজী লিখতে অভ্যস্ত নন। আমাদের মধ্যে যাঁরা পারেন তাঁদের এমন সুন্দর কাজ হাতে নেওয়া উচিত। 'শনিবারের চিঠি'র মত পত্রিকার দরকার হিন্দী মারাঠী তামিল গুজরাতী সাহিত্যের গতিবিধি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তা থেকে গ্রহণ করা। ইংরেজ লেখক এ বিষয়ে সতর্ক। আমি বিখ্যাত তামিল কবি ত্যাগরাজের রচনা নিজের ভাষায় পাই নি, ইংরেজ অনুবাদকের দয়ায় পেয়েছি। অজানাকে জানার, নূতনকে ডাকার অনেক মূল্য আছে।

ভাল বাংলা সাহিত্য হিন্দীতে ভাষান্তরিত ক'রে প্রচার করার শুভ-মুহূর্ত এসেছে। বাজার নূতন। ব্যবসার দিক দিয়ে বাজারটা যে খুব বিস্তৃত তা বলতে পারব না। বই খাঁটি এ. এইচ. হুইলার কোম্পানির অফিসে আমি নিত্য যাই। সেখান থেকে জানা যায় যে, হিন্দী বইয়ের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু এখনকার সমস্ত বই সাহিত্যপদবাচ্য নয়। সম্প্রতি আমি আমার দুটি প্রকাশককে হিন্দীর দিকে নজর দিতে অনুরোধ করেছিলুম। বাঙালী প্রকাশক সে কথা কানে তোলেন নি। কিন্তু ইংরেজ প্রকাশকটি হিন্দীতে বই প্রকাশ করবার বিষয়ে তৎপর হয়েছেন। তাঁদের প্রতিনিধি হিন্দীভাষী প্রদেশে বেড়িয়ে হিন্দী পাঠকদের ক্রয় করবার ক্ষমতা কতটা তার আন্দাজ নিয়ে গেছেন। পরে এই বৃহৎ ইংরেজ কারবারের ডাইরেক্টরও এখানে নানাস্থানে ঘুরে গেছেন। হিন্দী পাঠকদের কেনবার শক্তিটা এখনও বড় নয়। তবুও এই ইংরেজ প্রকাশক পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য কিছু হিন্দী বই প্রকাশ করবেন। আমি ভাল বাংলা বই বাছাই করবার পরামর্শ দিয়েছি।

হিন্দী লেখকেরা আমাদের মতই দরিদ্র। সিনেমা-কোম্পানিরা কত টাকা লেখক ও অনুবাদককে দেয় তা আমার জানা নেই। কিন্তু পত্রিকাগুলির দেবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। যা দেয় তা অকিঞ্চিৎকর, তাও সকল পত্রিকা দিতে পারে না।

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার

সনাতন

জবরদস্ত দেশীয় রাজ্যের দরিদ্র কৃষক সনাতন। বর্গাচাষী। বৃষ্টিতে ভেজে, রৌদ্রে পোড়ে, জমি চাষ করে। ফসল কাটিয়া অর্ধেক বাড়িতে আনে, অর্ধেক জমির মালিকের বাড়িতে পৌছাইয়া দেয়।

স্ত্রী স্বর্ণবালা ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া চাউল করে।

সুখেই আছে।—সনাতনের বিশ্বাস।

সনাতন, আছ কেমন?

আজ্ঞে, ভালই আছি সরকার মশায়।

সনাতনের চিরাচরিত জবাব। আ-র ভাল!—বলিয়া চলতি ভণ্ডামি করে নাই কোন দিন।

কিন্তু বড় ছেলে মাধব গোলমাল বাধাইয়াছে। বলিতেছে, আসলে তারা সুখে নাই। অতিশয় দুঃখে আছে।

কে বলেছে তোকে?

বলবে কেন? আমি নিজেই জানি।—মাধব নিজের মত জবাব দেয়।

এঃ! ভারি জান্‌নেওয়ালা রে!—সনাতন খেঁচাইয়া উঠে।

কিন্তু মাধব ছাড়ে না।—শহরের সেই বাবুটা এসেছে গো। সে-ই বলছে যে।

বলুক। তার কাছে তোর যাবার দরকার কি?—সনাতন ধমক দিয়া থামাইয়া দেয়।

মাধব সরিয়া গেল, কিন্তু ব্যাপারটা থামিল না। শহরের বাবু নবকিশোর অনিবার্যভাবে আসিয়া দেখা দিল। মোলায়েম মিষ্ট ভাষায় বুঝাইতে লাগিল।

সনাতন ভাই, আজকে ভাববার দিন এসেছে। ভাবতে হবে, বুঝতে হবে। পেছিয়ে থাকলে চলবে না।

বহুব্যবহৃত বক্তৃতার শব্দগুলি আগে আসিয়া পড়ায় নবকিশোর নিজের উপর বিরক্ত হইল। কিন্তু থামিল না।

কত কষ্টে আপনারা আছেন—আমরা আছি! সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ধান দিয়ে আসতে হয় জোতদারের গোলায়। দু বেলা দু মুঠো ভাতও নিজেদের জোটে না।

সনাতন হতবুদ্ধির মত তাকাইয়া রহিল। কারণ সনাতনের ভাতের ব্যাপারে মুঠোর প্রশ্ন উঠে না। সে অনেক ব্যাপক ব্যাপার।

ভাত জোটে তো দুধ জোটে না, মাছ জোটে না—

মাছের কথাটা খাঁটি কথা বলেছেন বাবু মশায়।—সনাতন সায় দিয়া বলিল।—কানা বিলটা শুকিয়ে যাবার পর থেকে মাছের কষ্ট খুব হয়েছে।

নবকিশোর বলিয়া চলিল, পরনে কাপড় নেই, শাড়ি নেই, জুতোও নেই একজোড়া—

আছে, চটিজুতো আছে একজোড়া।—সনাতন বিনীত গৌরবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল।

নবকিশোর তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়া সনাতনকে ধূলিসাৎ করিয়া দিল। বলিল, চটিজুতো! হুঁঃ! জানেন? বড়লোকের একজোড়া জুতোর দামে আপনার একজোড়া বলদ হতে পারে?

সনাতন চক্ষু বিস্ফারিত করিল।—তাই নাকি?

তবে?

এবারে আঘাতটা সনাতনের বিস্ফারিত চক্ষুর ভিতর দিয়া মর্মে ঠেকিল। বড় বলদটা বছর খানেকের বেশি হইল মারা গিয়াছে। আর কিনিতে পারে নাই। একটা বলদের সঙ্গে একটা গাভী জুড়িয়া কোন রকমে কাজ চলিতেছে।

সনাতন ভাবিতে লাগিল।

সত্য কথা। ভাল খাইতে পায় না, ভাল পরিতে পায় না। হাড়ভাঙা পরিশ্রম। সমস্তই সত্য। নবকিশোর ভাবিতে সময় দিয়া চলিয়া গেল।

তামাকের কলিকায় আগুন লইতে আসিয়া সনাতন কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। মাধব মাকে বুঝাইতেছে,—দেশে স্বরাজ হয়েছে। এখনও যদি আমাদের ঢেঁকিতে ধানই ভানতে হয়, তবে আর স্বরাজ হয়ে লাভ হ'ল কি?

ধান ভানব না তো খাওয়া আসবে কি সগগ থেকে?—স্বর্ণবালা খা-খা করিয়া উঠিল।

স্বরাজ আবার হ'ল কবে রে?—সনাতন জিজ্ঞাসা করিল।

ও হরি! তাও তুমি জান না?

সনাতনের মনে পড়িয়া গেল।—ও-হো, হ্যাঁ হ্যাঁ। সেই যে স্বদেশী লোক এসে ব'লে গেল যে, রাত-দুপুরে শঙ্খ বাজাতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে রাগও হইল।—স্বরাজ হয়েছে তাতে তোর কি রে শুয়োর? কাজ নেই, কম্ম নেই, ধেই-ধেই ক'রে নাচা হচ্ছে?

স্বর্ণবালা ঢেঁকি বন্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল, স্বরাজ হ'লে হয় কি শুনি?

দেশের লোকে রাজা হয়, আবার কি হয়?—মাধব বলিল।—আগে ইংরেজরা রাজা ছিল তো? এখন দেশের লোক রাজা হয়েছে।

সনাতন বলিল, যে দেশে হয়েছে, সেই দেশে যা না তুই—যা। এখানে আগেও মহারাজা ছিল। এখনও আছে।

মাধবের চক্ষু নাচিয়া উঠিল। হঠাৎ চাপা গলায় ব'লল, সেই জন্যেই তো! ও— এখন বলব না।

এক হাতে মুখ বন্ধ করিয়া ছুটিয়া সরিয়া গেল।

সনাতন আর স্বর্ণবালা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল।

পরের দিন নবকিশোর আবার আসিল। সনাতন ধান মাড়াই করিতেছিল। বন্ধ রাখিয়া আদর করিয়া বসাইল। বলিল, আমরা কষ্টেই আছি—বুঝলাম। কিন্তু এর ওষুধ কি?

ওষুধ আছে।—নবকিশোর আনন্দে উত্তেজিত হইয়া উঠিল।—ওষুধ আপনাদের হাতে, আমাদের হাতে। আমরা যা বলি, সেই মত কাজ করুন, দেখবেন, জোতদার জমিদার মায় রাজা মহারাজা পর্যন্ত ঢিট হ'য়ে যাবে। কিন্তু রুখে দাঁড়াতে হবে। ভয় করলে চলবে না।

সনাতন চিন্তিত মুখে বলিল, আচ্ছা, দেশে তো এখন স্বরাজ হয়েছে? দেশের লোক রাজা হয়েছে? তা হ'লে—

নবকিশোর লুফিয়া লইল। উল্লাসে বলিয়া উঠিল, তারা বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। এ স্বরাজ স্বরাজ নয়। এ স্বরাজ গরিবের নয়, এ স্বরাজ বড়লোকের। আমাদের স্টেটের দিকে চেয়ে দেখুন। যেমন ছিল ঠিক তেমনই আছে। স্বরাজ কোথায়? আজ আমাদের—

বাড়ির মধ্যে স্বর্ণবালা চীৎকার করিয়া উঠিল। শ্রোতা বক্তা উভয়েই ছুটিয়া ভিতরে গেল। ঢেঁকির নীচে পড়িয়া স্বর্ণবালার হাত কাটিয়া গিয়াছে। কাপড় চাপা দিয়া হাতটা ধরিয়া সে আর্তনাদ করিতেছে।

বড় মেয়ে সরস্বতী এক দলা লঙ্কাবাটা আনিয়া ছেঁড়া কাপড় দিয়া হাতটা বাঁধিয়া দিল। স্বর্ণবালা যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল।

নবকিশোর দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, এই তো স্বরাজ!

ক্রোধ সংক্রামক। সনাতনও ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, দেখুন স্বরাজের অবস্থা।

নবকিশোর আর দাঁড়াইতে পারিল না। সনাতনের হাত ধরিয়া বলিল, সনাতন ভাই, মনে থাকে যেন, সামনের হাটের দিন রাত্রিতে মীটিং আছে। আমাদের নেতা নিজে আসছেন।

নিজে আসছেন নাকি?

হ্যাঁ।

দেখব তো কেমন।

নিশ্চয় দেখতে হবে। আচ্ছা, আবার আসব আমি।

নবকিশোর চলিয়া গেল।

সনাতন সরস্বতীকে তামাক দিতে বলিয়া স্বর্ণবালার কাছে বসিল।

দেখ্ দেখি, কি ভোগান্তিটা ক'রে নিলি? কাজকর্মের কি ব্যবস্থা হবে বল্? একা সবোর কাজ নাকি?

স্বর্ণবালা খিঁচাইয়া উঠিল। ওরে আমার কাজ রে। হাতের জ্বালায় মরি আমি, উনি আছেন কাজের চিন্তায়। গোল্লায় যাক তোমার কাজ!

গোল্লায় গেলে খাবি কি?

খাব ছাই।

তাই খাস।—বলিয়া সরস্বতীর হাত হইতে হুঁকা লইয়া টানিতে টানিতে সনাতন উঠিয়া গেল।

পরের দিন মাধব গোপন কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। চুপিচুপি কহিল, বাবা, শোন। আমরা বিপ্লব করব। সারা তালুক জুড়ে বিপ্লব হবে। বিপ্লব ক'রে নিজেরা দেশের মালিক হব। তারপরে যার লাঙলে যত জমি আবাদ হয়, সব পাওয়া যাবে। টাকা দিতে হবে না, পয়সা দিতে হবে না। ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ!

ও আবার কি রে?

মানে—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

কি হোক?

দীর্ঘজীবী হোক। মানে—চিরকাল বেঁচে থাক্।

সনাতন বুঝিল, কিন্তু পছন্দ করিল না। বলিল, চিরকালই ওই বিলপেব না কি তাই করতে হবে নাকি?

মাধব একটু গোলমালে পড়িয়া গেল। না না, চিরকাল করতে হবে কেন? চিরকাল করতে হবে না।

মাথা চুলকাইতে লাগিল। অবশেষে সরিয়া পড়িল।

হাটের দিন রাত্রিতে সভা হইয়া গেল। প্রচণ্ড আগুন-জ্বালানো বক্তৃতার উত্তাপ সনাতনকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। পরের দিন নবকিশোর আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের নেতাকে দেখলেন?

সনাতন গাঢ়স্বরে বলিল, একেবারে দেবতা।

অথচ অতি সাধারণ লোক।—নবকিশোর বলিল, চকচকে পোশাক নেই, গাড়ি নেই, বাড়ি নেই। আপনার আমার মতই গরিব

তবে নেতা হলেন কি ক'রে?—সনাতন সহসা প্রশ্ন করিল।

বুদ্ধির জোরে, পাণ্ডিত্যের জোরে। ওঁর মত ভাল বক্তৃতা এ দেশে আর কেউ করতে পারেন না।

সনাতন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, বুঝলাম। এখন বুদ্ধির যুগ।

নবকিশোর বলিতে লাগিল, ওই জঙ্গলের মধ্যে কত কষ্ট ক'রে উনি আছেন। শুধু উনি কেন, আমাদের সকলেই আছেন। কিসের জন্যে? শুধু আপনাদের মঙ্গলের জন্যে। কিন্তু আপনারা যদি ভয় পেয়ে পেছিয়ে থাকেন, আপনাদের ভাল সংসারে আর কেউ করতে পারবে না। বড়লোকের গভর্মেণ্ট গরিবের ভাল কোনদিনই করবে না, ঠিক জানবেন। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

সনাতন খাড়া হইয়া উঠিল।—কবে?

আর দেরি নেই। সব প্রস্তুত। সময়মত খবর পাবেন সকলে, আমাদের নেতা যেদিন আদেশ করবেন।

অপ্রয়োজনে নবকিশোর আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিল না।

ভীতি এবং ভয়াবহ প্রত্যাশার মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট দিবস উপস্থিত হইল। বিদ্রোহী কৃষক নবকিশোরদের নেতৃত্বে একসঙ্গে পাঁচটি থানা আক্রমণ করিয়া দখল করিল। জোতদারের বাড়ি আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দিল, লুণ্ঠন

করিল, হত্যা করিল। পরিচালক দলের নেতাকে সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া স্বাধীন হইল।

স্বর্ণবালার হাতের ঘা সারিয়া গিয়াছে। ঢেঁকির কাজ আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু কাজের চাপ এত বেশি পড়িয়াছে যে, সরস্বতী আর সে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও শেষ করিয়া উঠিতে পারে না। নবকিশোররা রাগ করে, ধমকায়। স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদের জন্য চাউল এবং খাদ্যবস্তু অংশমত সময়মত যোগান দিতে পারে না। না পারিলে কি ভয়ঙ্কর পরিণাম হইতে পারে, পুনঃ পুনঃ তাহাদের সে কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্টেটের সৈন্য আসিয়া মারিয়া কাটিয়া পুড়াইয়া সব লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবে।

শুধু কি তাই? আরও থানা দখল করিতে হইবে, ক্রমে জেলা, অবশেষে গোটা রাজ্যটাই দখল করিতে হইবে। কিন্তু খাদ্য না পাইলে সমস্ত পণ্ড হইয়া যাইবে যে!

কি করব?—সখেদে এবং সভয়ে স্বর্ণবালা বলে—মানুষের শরীরে এর বেশি আর হয় না যে বাবু মশায়!

হয় না বললে হবে না।—নবকিশোর সক্রোধে বলিল।—চাই! বুঝলে?

ইস্, হুকুম!—সরস্বতী খোঁচা দিয়া উঠিল।

হ্যাঁ, হুকুম!—নবকিশোর মাটিতে পা ঠুকিয়া বলিল। ভুলো না যে, এ হুকুম তোমাদেরই ভালর জন্যে।

রাত্রিতে সনাতন বাড়ি আসিলে স্বর্ণবালা কাঁদিয়া বলিল, আমি পারব না আর চাল দিতে। ধান নিতে হয়তো নিক, না হয়তো গোল্লায় যাক।

নূতন কথা নয়।

ফ্যাচফ্যাচ ক'রে কাঁদিস নে। কি হয়েছে আগে বল্।—রুক্ষকণ্ঠে সনাতন বলিয়া উঠিল।

স্বর্ণবালা রাগ করিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

সনাতন সরস্বতীকে ডাকিয়া বলিল, ভাত দে তুই।

ভাত নেই।

কি?

সব চাল ওরা নিয়ে গেল যে। তাতেই কত রাগ!

নূতন কথা নয়। সনাতন শুম হইয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে বলিল, খুদ থাকে তো ডালের সঙ্গে তাই আল দিয়ে নামা।

সরস্বতী খুদের সন্ধানে গেল।

দিন কয়েক পরের কথা। একটা মৃতদেহ বহন করিয়া নবকিশোর এবং আরও তিনজন স্বেচ্ছাসেবক সনাতনের আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল। সনাতন তামাক খাইতেছিল। হুঁকার টান এবং রক্তচলাচল সনাতনের একসঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল। অবশ দেহটা যন্ত্রচালিতের মত ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

কে ?

শহীদ মাধব।—শব নামাইয়া নবকিশোর জবাব দিল।

সনাতন নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়াইয়া মাধবের মুখের পানে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। অবশেষে ভাঙিয়া পড়িল।

স্বর্ণবালা ছুটিয়া আসিয়া মৃতদেহের উপর আছড়াইয়া পড়িল। আবার উঠিয়া নবকিশোরের পায়ের উপর মাথা কুটিতে লাগিল,—আমার মাধুকে এনে দাও তোমরা, এনে দাও। এনে দা-ও।

কিন্তু নবকিশোর সৈনিক। সে অত্যন্ত অটল চিত্তে বুঝাইতে লাগিল, মাধব শহীদ হয়েছে। এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কি আছে ? এর চেয়ে ভাল মৃত্যু মানুষের হয় না। মাধব তো অমর হয়ে থাকবে। প্রতি বৎসর মাধবের আত্মার উদ্দেশ্যে ফুল দেবে লোকে। সে নিজে ম'রে আমাদের মরতে শিখিয়ে দিয়ে গেল। মাধব তোমাদের—আমাদের চিরকালের গৌরব হয়ে রইল।

স্বর্ণবালা ততক্ষণে একটা কাঠের খণ্ড লইয়া নিজের মাথায় মারিতে শুরু করিয়াছে। সরস্বতী চীৎকার করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং পাড়ার লোক মিলিয়া শহীদ মাধবের শেষকৃত্যের আয়োজন করিতে লাগিল।

নবকিশোর সনাতনের কাছে মাধবের বীরত্ব-কাহিনী বিবৃত করিল। স্টেটের সৈন্যরা যেখানে ঘাঁটি করিয়াছে, সেখানে মাধব গভীর রাত্রিতে একা যাইয়া পর পর পাঁচজন সৈন্য হত্যা করিয়া অবশেষে নিজেও শত্রুর গুলিতে প্রাণ দিয়াছে। প্রাণ দিয়াছে, কিন্তু বন্দুক দেয় নাই। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় অন্ধকারে লুকাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। এমন পুত্র কয়জন পিতার

আছে? তা ছাড়া এখন শোকের সময় নাই। শত্রুরা প্রস্তুত হইয়াছে। শীঘ্রই তাহারা আমাদের আক্রমণ করিবে। আমাদের কৃষক-রাষ্ট্র সমস্ত শক্তি দিয়া রক্ষা করিতে হইবে।

ভাল কথা, নবকিশোর হঠাৎ কথায় মোড় ঘুরাইয়া দিল।—একটা সুখবরও আছে। আমরা আরও তিনটে থানা দখল করেছি।

সনাতন মুখ তুলিয়া চাহিল। নবকিশোর বাক্‌রুদ্ধ হইয়া থামিয়া গেল।

* * *

সব মিটিয়া গিয়াছে। এতবড় দুঃখের রাত্রিও সনাতনের প্রভাত হইয়াছে। কিন্তু স্বর্ণবালার হয় নাই। দিন আর রাত্রি স্বর্ণবালার একাকার হইয়া গিয়াছে।

পুত্রশোক সনাতনকে অতি শীঘ্র ভুলিতে হইল। শোকের অবসর নাই। কর্তব্য আগে। কৃষক-রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়কের নির্দেশ, অমান্য করিলে দণ্ডনীয় হইবে। রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য অর্থাৎ কৃষকদের নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য প্রত্যেকের নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করিতেই হইবে। ইহার মধ্যে শোকের স্থান নাই। আলস্যের স্থান নাই।

সনাতন ভুলিয়াছে। বিপদ হইয়াছে স্বর্ণবালাকে লইয়া। ঢেঁকিতে সে আর উঠিবে না। না উঠুক, অংশমত চাউল দিতে হইবে—সর্বাধিনায়কের নির্দেশ। সনাতন ক্ষিপ্ত হইয়া মারধোরও করিয়াছে। কোন লাভ হয় নাই। গভীর রাত্রি পর্যন্ত সরস্বতী ঢেঁকি চালায়, সনাতনই সাহায্য করে। চাউল দিতেই হইবে।

একদিন রাত্রিতে পাড়ার ছেলে মহেশ চুপিচুপি আসিয়া দাঁড়াইল। অতি মৃদুকণ্ঠে কহিল, সোনাকাকা, একটু কথা ছিল।

একটু দাঁড়া।—সনাতন হাতের কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া উঠিয়া আসিল। কি রে?

মহেশ চারিদিকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। পরে বলিল, সরকারী সৈন্যরা দুটো থানা উদ্ধার ক'রে ফেলেছে। দু-তিন দিনের মধ্যে আমাদের এখানেও এসে পড়বে। জান তো, আমাদের স্টেট এখন কংগ্রেসের হাতে গেছে? মহারাজার আর কোন ক্ষমতা নেই এখন। কাজেই এখন আর আমাদের ভয়ের কিছু নেই। আমাদের ভালর জন্যেই তারা সৈন্য পাঠিয়েছে।

আমাদের উদ্ধারের জন্তে। এই জংলী রাজত্বে আর বেশি দিন থাকলে আমরা ধনে প্রাণে মারা যাব কাকা, সে তো বুঝতেই পারছ।

মরবার আর বাকি কি আছে এখন?—সনাতন রুদ্ধকণ্ঠে বলিল।

আর একটা কথা,—মহেশ ফিসফিস করিয়া বলিল, এদের হয়ে যারা লড়েছে, তাদের উপর কিন্তু ভয়ানক অত্যাচার হবে, মনে রেখো। কথাবার্তায় এদের সঙ্গেও অবশ্য ভাব রাখতে হবে, নইলে এরাও কমে ছাড়বে না।

পরদিন ভোরে উঠিয়া বাহিরে যাইবার সময় দরজার সম্মুখে সনাতন কতগুলি বিজ্ঞাপন কুড়াইয়া পাইল। কিসের বিজ্ঞাপন? আগের দিন তো ছিল না। বিভ্রান্ত সনাতন কাগজগুলি লইয়া মহেশের কাছে গেল।

মহেশ পড়িয়া শুনাইল—

বন্ধুগণ! আপনাদের উদ্ধারের জন্য আমরা আসিতেছি। আমাদের রাজ্যে কৃষক-মজুর-প্রজা-রাজ স্থাপন হইয়াছে। আপনারা দেশদ্রোহীদের ফাঁদে পড়িয়া বাহিরে পড়িয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা আপনাদের উদ্ধার করিবই। দেশ-দ্রোহীদের কবলমুক্ত করিয়া আপনাদের মঙ্গল সাধন এবং দেশে শান্তি স্থাপনই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। আপনাদের সাহায্য এবং শুভেচ্ছা কামনা করি।

কি রাজ্য লিখেছে?—সনাতন জিজ্ঞাসা করিল।

কৃষক-মজুর-প্রজা-রাজ। মানে—কৃষক আর মজুর এই সব প্রজারাই দেশের রাজা হয়েছে।

তাই আবার হয় নাকি?

হবে না কেন, খুব হয়।

সনাতন চুপ করিয়া গেল। কিন্তু সন্দেহ গেল না।

মাত্র একদিন পরেই বিজ্ঞাপনের প্রতিশ্রুতি কার্যে পরিণত হইল। সরকারী ফৌজ আসিয়া এলাকাটা দখল করিয়া ফেলিয়াছে। নবকিশোরদের কোন খবর নাই। কোন সংঘর্ষ হয় নাই। ভীত সমস্ত গ্রামবাসীরা যে যাহার বাড়ির মধ্য হইতে উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া বাহিরের দৃশ্যটা মাঝে মাঝে দেখিতে চেষ্টা করিয়াছে মাত্র।

তারপরের অংশ গতানুগতিক। ধরপাকড়, মারধোর, চীৎকার, সৈন্য এবং পুলিসের সামান্য বাড়াবাড়ি যেটুকু আশা করা যায় সমস্তই গতানুগতিকভাবে ঘটিয়া গেল।

সনাতন এবং সরস্বতীও বাদ যায় নাই। মাধবের পিতা এবং ভগ্নী হিসাবে যেটুকু বেশি পাওনা ছিল, তাহাও পাইয়াছে।

মহেশ দেখা করিয়া সান্ত্বনা দেয়।—এসব ব্যাপারে একটু আধটু বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমাদের ভালর জন্যেই হ'ল।

সনাতন অবোধের মত চাহিয়া থাকে।

সরস্বতী আজ কেমন আছে?—মহেশ সসংকোচে জিজ্ঞাসা করে।

কি জানি! কাজকর্ম করছে তো।—সনাতন জবাব দেয়।

স্বর্ণবালাও এখন কাজ করে। চারিদিকে হাহাকারের মধ্যে স্বর্ণবালা যেন মাধবের হত্যার প্রতিশোধ দেখিতে পাইয়াছে। এখন কাজ করে।

একদিন মহেশ আসিয়া প্রস্তাব করিল—সোনাকাকা, চল, শহর থেকে বেড়িয়ে আসি। খুব ভারি সভা হবে। আমাদের নেতা আসবেন।

সনাতন চমকিয়া উঠিল। নেতা? কোন্ নেতা?

দেখবে চল। উনিই তো রাজ্য চালাবেন এখন।

সেই কাগজের লেখার কথাটা সনাতনের মনে পড়িয়া গেল। বলিল, কি রাজ্য? কিষ—কিষ—

মহেশ হাসিয়া বলিয়া দিল, কৃষক-মজুর-প্রজা-রাজ।

চল্, যাব। সনাতন রাজী হইল।

সভায় যেন সারা দেশের লোক জমা হইয়াছে। সনাতন অবাক হইয়া গেল।

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে প্রচুর মাল্যভূষিত এক ব্যক্তি বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইলেন। মহেশ কানে কানে বলিল, ইনি।

সনাতন কেমন যেন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে। ফিসফিস করিয়া কহিল, মহারাজা নাকি? সেইরকম মুখ!

সোনাকাকার একেবারে বুদ্ধি নাই।—বিরক্ত হইয়া মহেশ কহিল, মহারাজার ওই রকম পোশাক? দেখছেন না, খদ্দরের ধুতি চাদর?

ওঃ, কিষক?

বক্তৃতা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মহেশ আর জবাব দিল না।

ফিরিবার পথে সনাতন প্রশ্ন করিল, খুব বড়লোক নাকি রে?

মহেশ বলিল, টাকায় বড়লোক কি না জানি নে। তবে বিদ্যায় বুদ্ধিতে বক্তৃতায় তো খুবই বড়।

সনাতন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, ঠিক। বিদ্যাবুদ্ধিরই যুগ। আর বক্তিতা।

বাড়ি ফিরিয়া সনাতনের শহরের উত্তেজনা জল হইয়া গেল। বলদটার কি অসুখ হইয়াছে, কিছুই খাইতেছে না। বোকার মত ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া আছে। চক্ষু দিয়া যেন জল পড়িতেছে। সনাতনেরও চক্ষে জল আসিয়া পড়িল।

বলদটা ভোরের দিকে মারা গেল। কিছুতেই বাঁচানো গেল না। সনাতন গ্রাম্য চিকিৎসার কোন ত্রুটি করে নাই।

বর্গাচাষ বন্ধ হইয়া গেল। সনাতন এখন দিন-মজুরিতে খাটে।

স্বর্ণবালার ঢেঁকির কাজ বাড়িয়া গিয়াছে। এখন শুধু নিজের নয়, পরের ধানও ভানে। এক মণ ধান ভানিয়া দিলে তিন সের চাউল মজুরি পায়।

শ্রীভূপেন্দ্রমোহন সরকার

সংবাদ-সাহিত্য

[বঙ্গ]ীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে আচার্য যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সম্বর্ধনা হইয়া গেল। সেদিন এই কথাটাই বিশেষ ভাবে ঘোষিত হইল যে, ভারতবর্ষীয় ইতিহাস বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত গবেষণালব্ধ বিপুল কীর্তির মধ্যেই তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের সাফল্য সীমাবদ্ধ নহে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যেমন বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতি হইয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, যদুনাথও তেমনই বহু ঐতিহাসিক শিষ্যমণ্ডলীকে পরিচালিত করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন এবং দেশকেও ধন্য করিয়াছেন। আর একটি কথা তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—তিনি নিজে পুরাতন হইয়াও নূতনের প্রতি কখনও বিমুখ হন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-প্রদত্ত মানপত্রে এই দুই প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—

"তুমি একক সাধনায় শুধু আপনার গৌরব অর্জনে ও বর্ধনে কালাতিপাত কর নাই। বহু শিষ্য সমভিব্যাহারে সকলের উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তোমার জয়যাত্রা, তুমি স্বদেশের কল্যাণের কাজে সকলকে উদ্‌বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়াছ। তোমার অনুপ্রেরণায় তাঁহারা ভারতবর্ষের লুপ্ত ইতিহাস ধীরে

ধীরে উদ্ধার করিতেছেন। তুমি একা একশত হইয়া আজ ইতিহাস-অনুশীলন-কার্যকে ভারতবর্ষে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছ। তোমার শিষ্য-প্রশিষ্য-মণ্ডলীর সাধনার ধারার মধ্য দিয়া তোমার কীর্তিকে অবিনশ্বর রাখিয়া তুমি চিরজীবী হইয়াছ......

"তুমি প্রবীণ হইয়াও জরাগ্রস্ত হও নাই। তোমার মনের সতেজ তারুণ্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে, দুঃখে তুমি নিরুদ্বিগ্নমনা, সুখে তুমি বিগতস্পৃহ, হে কর্মযোগী, তুমি তরুণের সঙ্গে, নূতনের সঙ্গে নিজের যোগ কখনও বিচ্ছিন্ন কর নাই, প্রবীণের জ্ঞান লইয়া নবীনের উদ্যমকে বরাবরই বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছ, দেশের নবজাগ্রত যৌবনের অভিযানে তোমার পূর্ণ সমর্থন আছে, তরুণ সম্প্রদায়ের নিত্য নূতন প্রয়াসকে তুমি আশীর্বাদের দ্বারা জয়যুক্ত করিয়াছ......"

আচার্য্য যদুনাথের যে সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ও রচনাপঞ্জী শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলন করিয়া এই সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনা ও সিদ্ধির কতকটা পরিমাপ করিতে পারিব, বুঝিতে পারিব তাঁহার নিরলস কর্মসাধনা ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনও কারণেই একদিনের জন্যও ব্যাহত থাকে নাই, তাঁহার প্রতিভার সহিত অধ্যবসায় মিলিত হইয়া তাঁহাকে দেশবরেণ্য করিয়াছে।

যদুনাথের ঐতিহাসিক গবেষণার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় সভাই সেদিন বলিয়াছেন—

"তিনি আমাদের দেশে ঐতিহাসিক গবেষণায় অগ্রণী। তিনি দেখাইয়াছেন, পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আমরা নিজের দেশের ইতিহাস নিজে লিখিতে পারি। তিনি পিষ্ট-পেষণ করেন নাই, পরস্ব অপহরণ করেন নাই, নিজে ফারসী ও মরাঠী মাতৃকা অধ্যয়ন করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলন করিয়াছেন।...

"অতীতকে আশ্রয় করিয়া বর্তমান দাঁড়াইয়া আছে। যিনি অতীতকে যথাযথ দেখাইতে পারেন তিনি বর্তমানের গন্তব্য নির্দেশ করিতে পারেন। যে অতীতের প্রতিরূপ যথাসম্ভব ভ্রমশূন্য হইবে, মিথ্যার আড়ম্বরে কলুষিত হইবে না, সে ঐতিহাসিক প্রতিরূপই আমাদের কাম্য, আমাদের উপদেষ্টা হইতে পারে। অল্প সাধনায় তর্কবিদ্যাশ্রিত ঐতিহাসিক প্রবৃত্তি জন্মে না।

শ্রীযুত সরকার মহাশয়ের ইতিহাস গ্রন্থ কামনা-দুষ্ট নহে, এই হেতু প্রামাণিক হইয়া থাকিবে।"

—

আচার্য যদুনাথের সম্বর্ধনা-সভায় পরিষৎ-সভাপতি আচার্য যোগেশচন্দ্র-প্রেরিত প্রশস্তিতে এবং যদুনাথের ভাষণে একটি বিষয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, অন্তত চিন্তাশীল বাঙালীমাত্রেরই দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। ইহা আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের জাতীয় চরিত্র সংক্রান্ত একটা গুরুতর ত্রুটির কথা। যোগেশচন্দ্র বলিয়াছেন—

"বাঙালীর মেধা আছে, কিন্তু ধৈর্য নাই; কুশাগ্রবুদ্ধি আছে, কিন্তু অধ্যবসায় নাই। এই কারণে বাঙালী কোন হিতকর স্থায়ী কর্ম করিতে পারে না।"

আচার্য যদুনাথ বলিয়াছেন—

"আমরা কল্পনা ও ভাবে মাতোয়ারা হয়ে থাকতে ভালবাসি, বাস্তব জগতে কাজের লোক হয়ে এবং তার উপযুক্ত প্রণালীতে চিন্তা করতে আমরা স্বভাবতই চাই না বা পারি না। এজন্য আমাদের বিলাতী শিক্ষকেরা অনেকবার বলেছেন যে, অর্থাগম ও মানব-সুখ বাড়াবার জন্যে বিজ্ঞান-চর্চা তো সব দেশেই আবশ্যক। কিন্তু ভারতবর্ষে তার উপর অন্য এক কারণে এ আবশ্যক। সেই বিশেষ কারণ হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞান শিক্ষার সংযম ও কঠোর ব্রহ্মচর্য ভিন্ন ভারতীয়দের মানসিক গঠন শক্ত ও বিচিত্র করা সম্ভব নয়।

"আমাদের দেশে অতি প্রাচীন যুগে একদল মনীষী যে বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক ছিলেন, এ কথা আমি অস্বীকার করি না। পাণিনির ব্যাকরণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, সূর্যসিদ্ধান্ত, রেকসাহিত্য এবং মানসার বা স্থপতিশাস্ত্র যে জাতি রচনা করেছিল, তারা ভাবপ্রবণ কল্পনা-বিলাসী ছিল না। কিন্তু আজ আমাদের বংশধরদের কোথায় দেখতে পাই? শত সহস্র বৎসর ধরে আমাদের চিন্তার নেতারা, আমাদের গ্রন্থকারগণ, প্রাচীন ভারতের এই লক্ষ্য ভুলে শুধু ভাব ও দর্শনের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে বিধর্মী রাজার অধীনতা, অত্যাচার, অবমাননা ও দারিদ্র্য সহ্য ক'রে বাঙালীর জর্জরিত প্রাণ বেদান্তচর্চায় ও ভক্তিসাধনায় আশ্রয় নিয়ে চিত্তের একমাত্র শান্তি ও সুখ পেয়েছে।

"কিন্তু আজ যে বিশ্বময় বিজ্ঞানের রাজত্ব, আজ যে সব দেশেই মানবজীবনের সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের প্রণালী ও মন্ত্রতন্ত্র একাধিপত্য করছে। এ রাজত্ব শুধু রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা চিকিৎসা ও যন্ত্রপাতির কারখানায় নয়, সাহিত্যের সব বিভাগেই প্রকাশ্যে হোক অপ্রকাশ্যে হোক এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত হচ্ছে।

"প্রথম থেকে আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল কি ক'রে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও কর্মপ্রণালী আনা যায়। এই কাজের জন্যে চাই ন্যায়ের তর্কের জন্যে আবশ্যক তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার মস্তিষ্ক নয়—যা শুধু শুক্‌নো খড় কাটতে পারে; ভাবে উন্মত্ত বা ভক্তিরসে অশসিক্ত শুষ্ক মস্তিষ্ক—যা মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, তাও নয়। এখন বাঙালীর চাই ধীর স্থির সংলগ্ন চিন্তাশক্তি, অসীম শ্রমশীলতা, পরীক্ষা না ক'রে কোন কথা গ্রহণ করব না—এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সমস্ত উপকরণ একত্র ক'রে সামঞ্জস্য ক'রে তার ভিতর থেকে খাঁটি নির্যাস বের করব এই মন্ত্রে দীক্ষা।"

আমরা গতবারে দেখিয়াছি যে, বাঙালী চরিত্রের এই শোচনীয় দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশ প্রবলবিক্রমে বাঙালীদূষণে লাগিয়াছে। শুধু সুদূরস্থিত বল্লভভাই বা বাবুরাও প্যাটেল নয়, প্রতিবেশী প্রদেশগুলিতে কর্তৃপক্ষস্থানীয় সকলেই শুধু দূষণে সন্তুষ্ট নন—নানাভাবে নিষ্পেষণ ও নির্যাতনও শুরু করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে কাঁদা চীৎকার করিয়া লাভ নাই, কারণ আমাদের বর্তমান শ্রেষ্ঠ মনীষীদের উক্তির দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে—আমরা চরিত্রে শ্লথ ও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপ যে সদ্য সদ্য অদ্যই ঘটিয়াছে তাহা নয়, বিদ্যাসাগরের আমলের বাঙালীদের কথা বলিতে গিয়া আজ হইতে তেপ্পান্ন বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথও আমাদের জাতীয় চরিত্রের ঠিক এই দুর্বলতাগুলি লইয়াই ধিক্কার দিয়াছিলেন। তিনিও সেদিন বলিয়াছিলেন—

"আমরা আরম্ভ করি শেষ করি না; আড়ম্বর করি কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না; ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহঙ্কার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতা লাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি অথচ পরের

ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি ;—পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিক্স্‌ এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল।"

বিগত অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যে বুদ্ধিমান বাঙালী চরিত্রের এই দুর্বলতা বিন্দুমাত্র সংশোধিত হয় নাই। একজন বিদ্যাসাগর, একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করিয়া লতাগুল্মপরিবেশে বনস্পতি-মাহাত্ম্য মাত্র বৃদ্ধি করিয়াছেন—গুল্ম বৃক্ষে এবং বৃক্ষ মহীরুহে পরিণত হইবার কোনও প্রণালী এই দুর্ভাগ্য দেশে কার্যকরী হয় নাই। আচার্য যোগেশচন্দ্র ও যদুনাথ এই মহীরুহ-সম্প্রদায়ের শেষ নিদর্শনমাত্র হইয়া রহিলেন। যে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ ও প্রবর্তন করিয়া আচার্য যদুনাথ বাংলা দেশের চিন্তায় ও সাহিত্যে দৃঢ়তা সত্যনিষ্ঠা ও বাক্‌সংযম আনিতে প্রয়াস করিয়াছেন, আজ বাংলা দেশের দিকে দিকে তাহারই অনুশীলন ও প্রসার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। বাংলা দেশের বাহিরে বাঙালীর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমরা যতই তীব্র ও আর্ত চীৎকার করি না কেন, নানা সমিতি স্থাপন করিয়া আবেদন নিবেদন ও আস্ফালনের মাত্রা যতই কেন না বাড়াই, যতক্ষণ ভাবাতিশয্য পরিহার করিয়া আমরা কর্মপরায়ণ না হইতে পারিতেছি, ততক্ষণ আমাদের কল্যাণ নাই। মানুষ নিজের ভাগ্য নিজে গড়ে। জাতির সম্বন্ধেও সেই কথা। দেশের মহৎ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এই আত্মদুষণ গত শতাব্দীকালের মধ্যেও আমাদের জড়চিত্তে চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিল না, ইহাই সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয়। যে বৃহৎ সূচনা বৃহত্তর নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হয় তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই, সামান্য সামান্য ব্যাপার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সুদৃঢ় অধ্যবসায়ের সঙ্গে যদি আমরা নিষ্পন্ন করিতে শিখি, তবেই বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আমরা সফলতা অর্জন করিয়া বাঙালী চরিত্রের এই শোচনীয় কলঙ্ক অপনোদন করিতে পারিব।

—

এলাহাবাদের শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার বর্তমান সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে "হিন্দী বনাম বাংলা" নিবন্ধে হিন্দীওয়ালাদের প্রশংসনীয় তৎপরতা ও আমাদের

নিষ্ক্রিয়তার উল্লেখ করিয়াছেন। এই নিবন্ধটির প্রতি বাঙালী লেখক ও প্রকাশকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বাংলা দেশে অনেক স্থলে আজ হিন্দী-আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। এই আতঙ্ক অমূলক এবং লজ্জাকর। হিন্দী শিখিলেই বাংলা ভাষা উচ্ছন্নে যাইবে, যাঁহারা আজ এইরূপ মনে করিতেছেন, তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা হিন্দী অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ইংরেজী ভাষা শিখিতে কোনও দিনই ভয় পান নাই। ইংরেজী ভাল করিয়া শিখিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের হাতে মাতৃভাষা বাংলা নানাদিগ্‌দেশ-প্রসারী ও শক্তিশালী হইতে পারিয়াছিল। মধুসূদন ও বঙ্কিম যে পরিমাণ ইংরেজীনবিস ছিলেন, সেই পরিমাণ হিন্দীনবিস আজিও কোনও বাঙালী হইতে পারেন নাই। শুধু রাষ্ট্রভাষা অপেক্ষা রাজভাষা+রাষ্ট্রভাষার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেক অধিক হইবার কথা। সে কঠিন প্রভাব অতিক্রম করিয়া যাঁহারা বাংলা ভাষাকে পুষ্ট ও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই ইংরেজী-স্কুলে পড়া মানুষ। তাঁহাদের বংশধর আমরা কি এতই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি যে, গোষ্পদপরিমাণ হিন্দীর ভয়ে আমাদের হাত-পা অসাড় হইয়া পড়িতেছে? আজ যদি জাপান অথবা জার্মানি আমাদের রাষ্ট্রিক ভাগ্যনিয়ন্তা হইত ও তাহাদের ভাষার নিগড়ে আমাদের বাঁধিয়া ফেলিত, তাহা হইলেই কি আমাদের ভাষা ও সাহিত্য শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা পড়িত? পুরুলিয়ার বাঙালী ছেলেরা ও তেজপুরের বাঙালী মেয়েরা যদি যথাক্রমে হিন্দী ও আসামী ভাষায় লায়েক হইয়া উঠিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলেই কি তাহাদের মাতৃভাষা ও সাহিত্য জাহান্নামে চলিয়া যাইবে? নীতিগতভাবে রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবি লইয়া ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন আমরা নিশ্চয় করিব। প্রয়োজন হইলে যেমন লড়াই স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে করিয়াছি, তেমনই লড়াই করিব; কিন্তু 'ভাষা গেল, সাহিত্য গেল' বলিয়া কাঁদিয়া ভাসাইব কেন? কারণ এই ধ্রুবসত্যে আমাদের বিশ্বাস অটুট রাখিতে হইবে যে, এত সামান্য পীড়নে ভাষা ও সাহিত্য যায় না। আমাদের সতর্ক হইতে হইবে বইকি! হিন্দীর প্রচারে হিন্দীওয়ালারা যে একতা দৃঢ়তা ও কর্মনিষ্ঠা দেখাইতেছেন, শচীন্দ্রবাবু তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছেন। এইগুলি আমাদের অনুকরণ করিতে হইবে। কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে আক্রমণাত্মক প্রচারের দ্বারা ভাষা ও সাহিত্য কখনই প্রসার লাভ করে না। তরবারির সাহায্যে ধর্মপ্রচারে

ভারতবর্ষ কোনও দিনই আস্থাবান ছিল না। ভারতবর্ষীয় ধর্ম প্রেম ও প্রীতির সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যও আজ ভারতবর্ষের সর্বত্র সেই ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। যে হিন্দীওয়ালারা প্রচারে ইসলামীয় রীতি অবলম্বন করিতেছেন তাঁহারাও বাংলা সাহিত্যকে এতখানি ভালবাসেন যে, শুধু মাত্র ভাষান্তরিত করিয়া সেই সাহিত্যই তাঁহারা আজও পর্যন্ত প্রচার করিতেছেন। হিন্দী-আতঙ্ক আর যাহারই হউক, সবভুক ও সর্বগ্রাসী বাঙালীর শোভা পায় না।

আমরা বাংলা দেশে বসিয়া অকাতরে দৈনন্দিন ব্যবহারে ভাল মন্দ ও মাঝারি হিন্দী-হিন্দুস্থানী চালাইতেছি, রাষ্ট্রিক প্রয়োজনসাধনে হিন্দী প্রয়োগে আমরা পিছপা হইব কেন? বিগত চৌষট্টি বৎসর ধরিয়া আমরা চোস্ত ইংরেজীতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলন চালাইয়াছি, আজ চোস্ত হিন্দীতেই বা তাহা চালাইতে পারিব না কেন? ভাষা ও সাহিত্যের অত বিপুল সমৃদ্ধি লইয়া ইংলণ্ড বহু শতাব্দীর শাসনে ও নির্যাতনে যদি আয়ার্ল্যাণ্ডের ভাষা ও সাহিত্যকে কাবু করিতে না পারিয়া থাকে—অপেক্ষাকৃত অনেক হীন হিন্দী কি মধুসূদন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের বাংলাকে ঘায়েল করিতে পারিবে?

তবে আমরা ছুৎমার্গী উন্নাসিক হইয়া নিশ্চয়ই থাকিব না, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে গ্রহণযোগ্য যদি কিছু থাকে তাহা আমাদিগকে নিশ্চয়ই গ্রহণ করিতে হইবে। ইংরেজরা সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্যকে আত্মসাৎ করিয়া ইংরেজী সাহিত্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত করিয়াছে। হিন্দী মারাঠী তামিল তেলেগু গুজরাতী উড়িয়া আসামী ভারতবর্ষেরই ভাষা, ভারতীয় চিন্তাধারা এই সকল ভাষার সাহিত্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে এবং সে চিন্তাধারা ভারতবর্ষের সর্বত্রই এক। বাঙালীরা সামান্য পরিশ্রমে সেই সকল চিন্তাধারাকে আয়ত্ত করিয়া বাংলা সাহিত্যকে নূতন রসধারায় সিঞ্চিত করিতে পারিবে। ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করিয়া বাঙালী যদি মাতৃভাষার গৌরব বিস্মৃত হইয়া ভিন্নভাষাবলম্বী হইয়া উঠে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, পরাজয়ের কারণ বাংলা সাহিত্যের মধ্যেই আছে। দেবনাগরী বর্ণমালার প্রতি আমাদের বিতৃষ্ণা স্বাভাবিক নহে, আমরা চিরদিন এই বর্ণমালাকে শুধু শ্রদ্ধা ও সমীহ করি নাই—নিজস্ব বলিয়াই মনে করিয়াছি। আজ রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর

রাগ করিয়া সেই বর্ণমালাকে বর্জন করিলে ভারতবর্ষকেই বর্জন করা হইবে। এবং যে ভারতবর্ষের কথা আমরা বলিতেছি, তাহা বাঙালীরই সৃষ্টি। সমস্ত ভারতবর্ষে এই বোধ বাঙালীই জাগাইয়াছে। বাঙালীর মনীষা, বাঙালীর চিন্তা, বাঙালীর প্রেম পুরাতন ভারতবর্ষকে ছানিয়া এই নূতন ভারতবর্ষকে সৃষ্টি করিয়াছে।

—

পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের "পরিভাষা-সংসদ" কর্তৃক ভাষান্তরিত শব্দগুলির প্রথম স্তবক প্রকাশিত হওয়ায় একটি সুফল এই হইয়াছে যে, শব্দের মৌলিক অর্থ সম্বন্ধে অনেকেই সচেতন হইয়াছেন, এবং বহু স্থলে নানা পণ্ডিত কর্তৃক বিভিন্ন শব্দের কুলজী-কোষ্ঠী বিচার চলিতেছে। ইহাতে আমাদের ভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বহু বহু-ব্যবহৃত শব্দের যথার্থ তাৎপর্য সম্বন্ধে আমরা অবহিত হইতেছি। কেহ কেহ তৎসম শব্দের বিচারে নিছক সংস্কৃত রীতিরই অনুসরণ করিতে চাহিয়াছেন, কেহ কেহ প্রচলিত প্রয়োগকে সমর্থন করিয়া অর্থের দিক দিয়া গোল-যোগ সত্ত্বেও সেগুলি বহাল রাখিতে চাহিয়াছেন। আমরা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নহি, তথাপি এই ধরনের আলোচনার সমর্থন করি। বাংলা সংস্কৃতের সন্তান হইলেও জীবন্ত চালু ভাষা। মাতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সে এখন আলাদা সংসার পাতিয়াছে, স্বচ্ছন্দবিহারের অধিকার তাহার হইয়াছে। তাহা ছাড়া আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রার সর্ববিধ কাজের উপযোগী শব্দসম্পদ এখনও তাহার অভিধানভুক্ত হয় নাই। এই কারণে এখন নিছক সংস্কৃতশুচিতা ক্ষতিকর হইতেও পারে। পরিভাষা-সংসদের অন্যতম সদস্য অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য মহাশয় বিশেষ যত্নের সহিত অধুনা শব্দতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতেছেন। এই বিষয়ে পারদর্শী পণ্ডিতেরা এই সময়ে পরামর্শ করিয়া যদি বাংলা শব্দধারার গতি ও বৈদেশিক শব্দের স্থান নির্ধারণ করিয়া দেন, তাহা হইলে ভাষার প্রাণশক্তি বৃদ্ধিই পাইবে। শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবি হইয়াও এই আলোচনায় যোগদান করিয়াছেন, এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার পেশাগত শব্দগুলি লইয়া আলোচনা করিতেছেন। এবারেও এখানে তাঁহার একটি আলোচনা আমরা প্রকাশ করিলাম। আশা করি, শব্দতত্ত্বে অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁহার আলোচনায় কর্ণপাত করিয়া একটি মীমাংসায় উপনীত হইবেন। যতীন্দ্রবাবু লিখিতেছেন—

"সম্প্রতি এক সংখ্যা 'কলিকাতা গেজেটে' দেখিলাম, বহু অবর-নিবন্ধকের (Sub-registrar) নিয়োগ, অবসর ও বদলি সংক্রান্ত ঘোষণা ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই মুদ্রিত হইয়াছে। কিছুদিন হইতে প্রতি গেজেটেই তিন-চারিটি ঘোষণা এইভাবে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল; এবার দেখিলাম, একটি সমগ্র বিভাগের সমস্ত ঘোষণা সম্পর্কে ওই নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে। একটি নমুনা দেওয়া যাইতে পারে—

'বীরভূম জেলার সিউড়িস্থিত সদর নিবন্ধ করণের সংশ্লিষ্ট অবেক্ষাধীন অবর-নিবন্ধক শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়, তাঁহার হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ার অস্থায়ী অবর-নিবন্ধকের কার্য অন্তে শ্রীসিদ্ধার্থপ্রকাশ বড়ুয়া কর্তৃক ভারমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অথবা পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত ২৪ পরগণা জেলার ঘাটেশ্বরস্থিত কাকদ্বীপের যুক্ত অবর-নিবন্ধক পদে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন।'

ইহার পর যথারীতি ইংরেজী ঘোষণা মুদ্রিত হইয়াছে।

গত ১২ই জানুয়ারি তারিখের দৈনিক পত্রিকায় দেখিলাম, পশ্চিম-বঙ্গ সরকার বিভিন্ন বিভাগকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, গেজেটে যে সমস্ত ঘোষণা প্রকাশিত হইবে তাহার অধিকাংশ যেন বাংলা ভাষায় লিখিত হয় ইহা হইতে অনুমান করা যায়, পরিভাষা-সংসদ যে পরিভাষা প্রস্তাব করিয়াছেন গবর্মেণ্ট তাহাই বিনাপরিবর্তনে গ্রহণ করিয়াছেন,—অন্তত গেজেটে প্রকাশ করিবার উপযোগী মনে করিয়াছেন। হয়তো আশা করিয়াছেন যে, এইভাবে মুদ্রিত হইয়া কান-সহা হইয়া গেলে ইহা ক্রমে জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইবে।

কিন্তু অগ্রহায়ণের 'শনিবারের চিঠি'তে Engineering বিভাগ সম্পর্কীয় পরিভাষার যে সামান্য আলোচনা দেখিলাম, তাহা হইতে মনে হয়, এ সম্বন্ধে এখনও শেষ সিদ্ধান্ত হয় নাই। Engineer শব্দটির পরিভাষারূপে গৃহীত হইতে পারে এমন একটি বাংলা শব্দ সংসদ-প্রস্তাবিত পরিভাষার প্রথম স্তবকে পাওয়া যায় না। সেখানে কোথাও 'বাস্তকার' কোথাও 'যন্ত্রবিৎ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 'কলিকাতা গেজেটে'র ঘোষণার পক্ষে ইহাই কি উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অথচ Engineer শব্দের একটি সাধারণ বাংলা প্রতিশব্দ রচনা করা গেল না, ইহাও তো গৌরবের কথা নহে। বিশ্বকর্মা শব্দটির ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া অবধি প্রস্তাব করিয়াছিলাম, Engineer-এর পরিভাষা 'কর্মা' বা

'কর্মবিৎ' হইতে পারে। অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করিয়াছেন 'নির্মাণবিৎ'। স্বল্পাক্ষর করিবার উদ্দেশ্যে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রস্তাবিত হইয়াছে—'নির্মাণী'। 'বাস্তু' শব্দের পুরাতন আভিধানিক অর্থ যখন একমাত্র 'গৃহ' নয়, গৃহক্ষেত্র তড়াগ সেতু ইত্যাদি অনেক কিছু, তখন পূর্বপ্রচলিত 'পূর্তকার' অপেক্ষা 'বাস্তুকার' যে Engineer-এর পরিভাষা হইবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী ইহা স্বীকার্য। অতএব 'পূর্তকার' বাদ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু Mechanical বা Electrical Engineer-কে বাস্তুকার বলা চলে না—ইহাও স্বীকার করিতে হয়, এবং সেইজন্যই সংসদ ইহাদের জন্য একটি পৃথক শব্দ, যন্ত্রবিৎ, প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার উপর 'বাস্তু' কথাটি বাংলায় যেভাবে প্রচলিত তাহাতে উহার মধ্যে কোন শুভ ইঙ্গিত নাই। ভিটা, ঘুঘু ও সাপ এই তিন ভিন্ন বাস্তুর সহিত আর কোন কিছুর বড় একটা সম্পর্ক এখন দেখা যায় না, এবং এ তিনই ধ্বংসের প্রতীক। যুগটাও বাস্তু-ত্যাগের যুগ। Port অর্থে 'বন্দর' শব্দটি বাংলায় সুপ্রচলিত ও সর্বজনবোধ্য হওয়া সত্ত্বেও ইহা Port শব্দের পরিভাষারূপে সংসদ কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে গৃহীত হয় নাই। ইহার যে কারণ দেখানো হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, এই বৈদেশিক শব্দটির অর্থ ও ব্যঞ্জনা সকল ভারতবাসীর নিকট সমান নহে। 'কলিকাতার বন্দরমহাধ্যক্ষ' বাংলায় খুব ভালই চলে; কিন্তু বেহারের লোক পাছে মনে করে—কলিকাতার কোন গোদা বাঁদরের কথা হইতেছে, সেইজন্য 'বন্দর' শব্দটির উপর জোর না দিয়া পরিভাষায় দীর্ঘবিস্মৃত পৌরাণিক 'পত্তন' শব্দের পুনঃপত্তন প্রস্তাবিত হইয়াছে। পশ্চিমের মান বাঁচাইতে যদি সুপ্রচলিত বাংলা শব্দ বাংলা পরিভাষার অনুপযোগী বিবেচিত হয়, তবে কৌটিল্য শাস্ত্রে যাহাই বলুক বাঙালীর কান বাঁচাইতে 'বাস্তু' শব্দটি ত্যাগ করিলেই বোধ হয় ভাল হয়। শব্দটির ব্যঞ্জনা বাঙালীর কানে বেশ শ্রদ্ধা জাগায় না।

'কার'-শব্দযুক্ত যে সব পদ বাংলাতে সাধারণত প্রচলিত, সেগুলি অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীর পক্ষে প্রয়োগ। যেমন—কর্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, মালাকার ইত্যাদি। অর্থাৎ যাহারা স্বহস্তে কাজটা করে। Engineer বাস্তু করে না, করায়। সে বাস্তুবিজ্ঞানের তত্ত্বজ্ঞ। সুতরাং 'কার' অপেক্ষা বিৎ-যোগে Engineer-এর পরিভাষা রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

'নির্মাণবিৎ' শব্দটি সাধারণ Engineer-এর পরিভাষা রূপে গৃহীত হইবার

উপযোগী। পূর্তকার বা বাস্তুকার অপেক্ষা নিঃসন্দেহে ভাল। কিন্তু "Scientist-কে যেমন বিজ্ঞানী বলা হয়, সেইরূপ "Engineer-কে 'নির্মাণী' বলা চলে" চিঠির এই যুক্তি সুপ্রযুক্ত হয় নাই। Scienist-কে আমরা তো বিজ্ঞানী বলি না, বৈজ্ঞানিক বলি। তবে স্বল্পাক্ষর শব্দ হিসাবে 'নির্মাণী' বলায় সুবিধা আছে। এ শব্দটিও সংসদের বিবেচনাযোগ্য।

এইবার একটু technical কথার অবতারণা করি; কারণ বিষয়টাই technical। Engineer মাত্রেই জানেন engineerieeg ব্যাপারের দুইটি প্রধান শাখা। একটি construction বা নির্মাণ, অপরটি repair বা সংস্কার। অর্থাৎ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ের কাজই বিশ্বকর্মাকে করিতে হয়—সৃজন ও পালন। বড় বড় বাদশাহী সড়ক নির্মাণ করার পর বহু engineer বহুদিন যাবৎ তাহাদের সংস্কার (repair) ও পালন maintenance) করিয়া আসিতেছেন, এক্ষেত্রে তাহারা নির্মাণী না হইয়াও engineer। এই কথা গৃহ সেতু তড়াগ প্রাসাদ এবং সর্ববিধ যন্ত্র সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য। সৃষ্ট বস্তু ভাঙিয়া ফেলা অবশ্য শিবের এলাকায় পড়ে। কিন্তু বিনা তাণ্ডবে অর্থাৎ হিসাব করিয়া ভাঙিতে হইলে (dismantling) বিশ্বকর্মারই প্রয়োজন। নূতন হাওড়ার পোল নির্মাণ করিতেও engineer, পুরাতনটিকে ভাঙিয়া ফেলিতেও engineer। সেইজন্য engineer শব্দটি যে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, নির্মাণবিৎ বা নির্মাণীর মধ্যে সেই ব্যাপকতার অভাব। কর্মবিৎ শব্দটির ব্যাপকতা আবার প্রয়োজন অপেক্ষা কিছু অধিক, কারণ কর্মমাত্রেই engieer-এর এলাকায় পড়ে না, যদিও বিশ্বকর্মা বলিতে তাহাই বুঝি এবং কর্ম-শব্দটির মধ্যেই বিশ্বকর্মার চেলাদের প্রাণবস্তু নিহিত।

প্রস্তাবিত শব্দ কয়টি লইয়া কিছু আলোচনা করিলাম। পরিষৎ ও সরকার একটা শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নির্দেশ দিলে, গেজেটে যাঁহারা ঘোষণা প্রকাশ করেন তাঁহাদের কর্তব্য সহজ হয়। অনুপযোগী শব্দ কান-সহা হইয়া গেলে ভাষায় যে বিভ্রাট ঘটে, তাহার নমুনা 'শনিবারের চিঠি'র মারফৎ আমরা জানিতে পারিতেছি।"

* * *

শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত (মুর্শিদাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ) ভুল হউক শুদ্ধ হউক প্রচলিত শব্দগুলির ব্যাকরণগত সংস্কারে রাজি নহেন। তিনি লিখিতেছেন—

"গত অগ্রহায়ণের পত্রিকায় "সংবাদ-সাহিত্য" পর্যায়ে অধ্যাপক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য-কৃত কয়েকটি শব্দের আলোচনা স্থান পেয়েছে। সেই সম্পর্কে প্রথমেই ব'লে রাখা ভাল যে, যে ভুলগুলির আর সংশোধনের উপায় নেই সেগুলো বার বার কচলিয়ে লাভ কি? বাংলা ভাষা বা সাহিত্য যে সংস্কৃত অভিধান ও সাহিত্য মাফিক চলে না, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সংস্কৃত ভাষাও যে চিরকাল স্থাণু ছিল এ রকম মনে করবারও কোন কারণ নেই। বৈদিক সংস্কৃত ও কালিদাসের যুগের সংস্কৃত কি উচ্চারণে কি শব্দ-সম্ভারে যে এক নয়, সেজন্য কেউ নালিশ করেছেন ব'লে শুনি নি। অপ্রয়োজনীয় ভুল সংশোধনের প্রচেষ্টায় শুষ্ক পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু গঠনমূলক কিছুর আভাস থাকে না।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের আলোচনা পড়লে মনে হয়, তিনি বাংলা ভাষার শব্দগুলোকে বুঝি বা ঠিক সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালতে চান। কিন্তু তা হয় না। ইংরেজী শব্দতত্ত্বের সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন Analogy দ্বারা বহুতর শব্দের সৃষ্টি হয়। ইংরেজী Sovereign ও Speargrass এ পর্যায়ের ক্লাসিকাল উদাহরণ। কিন্তু এ আলোচনা শব্দতত্ত্বের বইতেই নিবদ্ধ, কোনরকম বিদ্যা জাহির করবার জন্য ব্যবহৃত নয়।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের কতকগুলি শব্দের আলোচনা প'ড়ে মনে হয়, তিনি সংস্কৃত শব্দের অর্থও সহজবুদ্ধির দ্বারা আলোচনা করার চাইতে প্রামাণিক প্রয়োগের দ্বারা বিচার করতে তৎপর। যেমন "আঙ্গিক" ও "আন্তর্জাতিক" শব্দবিচার করেছেন। সংস্কৃতে অভিনয় সম্বন্ধে "আঙ্গিক" (অঙ্গসঞ্চালন দ্বারা ভাবপ্রকাশক) শব্দ ব্যবহার হয়েছে ব'লেই বাংলায় আর অর্থান্তর করা যাবে না, এ যুক্তিতে আর যাই থাক্ সারবত্তা নেই। অঙ্গ অর্থে "form"ও হতে পারে। যেমন অনঙ্গ হলেন "formless" কিংবা দেহহীন। সেই হিসেবে বহিরঙ্গ রূপটিকে "অঙ্গ" বলা চলে, সংস্কৃতে প্রয়োগ না থাকলেও। সুতরাং বহিরঙ্গ রূপবিকাশের কৌশলটিকে আঙ্গিক (relating to form) স্বচ্ছন্দে বলা চলে। বলা বাহুল্য "প্রযুক্তবিদ্যা" "Direction"-এর সমার্থসূচক হ'লে, technique-এর সমার্থসূচক কিছুতেই নয়। বহিরঙ্গকৌশল অন্তরঙ্গকৌশল দুটিই প্রযুক্তবিদ্যার মধ্যে পড়ে। সুতরাং প্রযুক্তবিদ্যা বললে কেবলমাত্র বহিরঙ্গ শিল্পকে বোঝানো চলে না।

'আন্তর্জাতিক' শব্দবিচারেও অধ্যাপক অনুরূপ শুষ্ক পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে 'অন্তর্গেহ' মানে গৃহের মধ্যে। ভাল কথা। কিন্তু "গৃহগুলির মধ্যে" এই অর্থে অন্তর্গেহ ব্যবহারে সংস্কৃত ব্যাকরণের যাই দোষ থাক, বাংলা ব্যাকরণে দোষ কই? মূলত জাতিক বা জাতীয় বলতে জাতি-মধ্যস্থ, ও আন্তর্জাতিক বলতে জাতিসমূহের মধ্যস্থ এইরূপ ব্যবহার বাংলায় চলে ও চলা উচিত। অন্তঃপূর্ব পদের এই বিশেষ রীতি বাংলার নিজস্ব মনে করলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু সংস্কারকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা দুঃসাধ্য। অধ্যাপকের সংস্কৃত pre-disposition তাঁকে একদেশদর্শী করেছে। তাঁর দেশ-প্রাদেশিক শব্দ তত্ত্বের কবরেই স্থান পাবে, বাগানে নয়।

জাতীয়করণের পরিবর্তে তিনি যে শব্দ দুটির প্রয়োগে তৎপর, সেগুলোও পুঁথি ও কেতাবী। রাষ্ট্রসাৎ বললে প্রথমেই আত্মসাৎ করার কথা মনে পড়বে। বাংলায় সাৎ শব্দটি খারাপ অর্থেই প্রযুক্ত। নস্যাৎ থেকে আরম্ভ ও আত্মসাৎ-এ শেষ। বরং রাষ্ট্রায়ত্ত তবু চলে।

আবহসংগীত সত্যই ভ্রম-সংকুল। এক্ষেত্রে আবহমান বোধ হয় দায়ী। সেই হিসেবে যে সংগীত প্রসঙ্গানুক্রম সুরটিকে বহন ক'রে আনে, এই রকম অর্থে আবহসংগীত চলছে বোধ হয়। আমার মনে হয় নেপথ্য-সংগীত চালানো উচিত।

ইতিকথা। "ওরি ইতিবৃত্তকথা ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ" রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগ। সিংহ-চিহ্নিত আসনের 'সিংহাসন' হতে বাধা না থাকে তা হ'লে 'ইতিবৃত্তকথা'কে 'ইতিকথা'য় পর্যবসিত করলে দোষ কি? এক্ষেত্রে সংস্কৃত আভিধানিক প্রয়োগই কি একমাত্র প্রামাণ্য বিষয় হবে?

এই প্রসঙ্গে 'সমাবর্তন' শব্দটি আধুনিক convocation-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার হয় কিনা এ বিষয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে শেষ করি।

সমাবর্তন শব্দটি ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন, অথচ convocation শব্দটি কর্মবাচ্যে নিষ্পন্ন। সম্যক আবর্ত হওয়া সমাবর্তনের মূলকথা। আর আহ্বান করা হচ্ছে convocation-এর গোড়ার কথা। অবশ্য সংস্কৃতে সমাবর্তন কথাটির বিশেষ প্রয়োগ আছে। সেটি হচ্ছে উপনয়নে ব্রহ্মচর্য থেকে গার্হস্থ্য আশ্রমে ফিরে আসা। কিন্তু ডিগ্রী লাভের সভাকে ঠিক এইভাবে ব্রহ্মচর্য থেকে গার্হস্থ্য আশ্রমে ফিরে আসার রীতির সঙ্গে তুলনা করা চলে না। রবীন্দ্রনাথ

convocation শব্দের বাংলা করেছিলেন পদবীসম্মান-বিতরণী সভা। অবশ্য বিস্তারিত, কিন্তু অর্থবোধক। আমার মনে হয় কোন বার্ষিক অনুষ্ঠানকে সমাবর্তন অনুষ্ঠান বলা চলে। Convocation-এর বাংলা বোধ হয় সমাহ্বান করা যেতে পারে।"

—

তবে আমাদের ভয় নাই। বঙ্গভারতী বাক্‌দেবী বীণাপাণির নৈষ্ঠিক ভক্ত সেবকেরা বৎসরে বৎসরে তাঁহার পূজাকে উপলক্ষ্য করিয়া যে বিচিত্র বাক্‌বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রেরিত নিমন্ত্রণ-পত্রগুলি মারফৎ তাহা অবগত হইয়া আমরা পুলকিত হইয়াছি। ইহাতে ভাষার শব্দসম্ভারের সঙ্গে সঙ্গে ভঙ্গীসম্ভারও বাড়িতেছে। যথা—

সুধী, চলতি মাসের ২১শে তারিখের নির্মল প্রভাতে মায়ের পায়ে দু'টী ফুল দেবার জন্য যে সামান্য আয়োজন করেছি, আপনাকে সেজন্য সপরিবারে সাদর আমন্ত্রণ ও অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

আমাদের বিষণ্ণ, রুক্ষ দিনগুলি হঠাৎ যেন কার আগমনে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শীতের শেষে নোতুন পাতার শ্যামলিমায়, আম্র-মুকুলের গন্ধে গন্ধে, নব-বসন্ত আবার এল বুঝি আমাদের মনের দুয়ারে আনন্দোচ্ছল জীবনের বাণী নিয়ে। তাই দেবী-ভারতীর দেউলে তার সম্বর্দ্ধনা উৎসবের আয়োজনের মাঝে সাংস্কৃতিক ও প্রগতিশীল জীবনের প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখবার আমাদের এই প্রচেষ্টা। একুশে মাঘ শ্রীপঞ্চমীতে সেই উৎসব। এ আনন্দের অংশ নিতে আপনাকেও ডাকছি।

জাগ্রতা ভারতীর 'এ' অভ্যুদয় লগ্নে আগামী ২১শে মাঘ শুক্লা পঞ্চমীতে আমরা আমাদের মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কুন্দশুভ্রা বাণীর আবাহন করবো। আপনার সবান্ধব উপস্থিতি আমাদের এই উৎসবকে মহীয়ান্ করে তুলুক—ইহাই কামনা করি।

বসন্তের পূর্বাভাসে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবেশে, আমরা জ্ঞানদাত্রীকে আবাহন করবার সঙ্কল্প করেছি।

—মাগো—অন্ধ মোরা—ঘুমন্ত বিবেক—গতিশক্তিহীন তমসার তীর হতে লয়ে যাও টানি—উজ্জ্বল আলোকে, জাগাও মোদের মা পূর্ণ চেতনা।

সৌম্য, শুক্লা পঞ্চমীর শুভ প্রভাতে শুক্লাবসনা মঞ্জুভাষিণীর চরণে দেবো

আমাদের হৃদয়ের রক্ত শতদল। আপনার উপস্থিতিতে ভ'রে উঠুক উৎসব-রসের পাত্রটুকু।

যুগান্তের সঞ্চিত বেদনার অবসান ক'রে, জগত আজ ছুটে চ'লেছে পরিপূর্ণ স্বাধীন সত্তার দিকে—সেই সত্তাকে উপলব্ধি করবার জন্যে; বিভ্রান্তি ও বিদ্বেষের কালিমা বিধৌত ক'রে, জ্ঞান-রশ্মির আলোকে উদ্ভাসিত হ'তে আমরা বাণী কল্যাণীর চরণতলে অর্চ্চনার অর্ঘ্য নিবেদন করতে চাই।

আয় মা বাণী, বীণাপাণি, শূলপাণির শূলহাতে;
আদর্শ আর শিল্পকলার রূপ কি ফোটে এই কাল রাতে?
অলক্ষীর ঐ কালপেঁচারা ডাকছে চোরা গলি পথে,
ভোরের আলোয় আয় মা নেমে নবযুগের লাল রথে।

আমরা বন্দনা করবো জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর,—প্রার্থনা করবো—মানুষ যেন সত্যকারের জ্ঞানোজ্জ্বল কল্যাণময় দর্শনের অধিকারী হয়।

মাঘ শুক্ল পঞ্চমী ...

বিশ্বরূপা ভারতীর অর্চনায়, হে সম্বোধি, সভ্যসমুত্থানে সার্থক করুন বিশ্বরূপার প্রাংগণ।

মাঘের একুশে পঞ্চমী তিথি—বন্দনা হবে মার;
মোদের দেউলে বাণী অর্চ্চনা—তাইতো এ উপচার।
আসবেন কোথায়? একাম, —রোডে
কবে? একুশে, বাইশে ও তেইশে মাঘ তেরোশ পঞ্চান্ন

মা সরস্বতী স্নান করে এসে নিজের বাগানের তোলা ফুলের অলঙ্কারে সাজিয়ে দিলেন নিজের সমস্ত অঙ্গকে। তারপর আস্তে আস্তে বীণা হাতে করে বসলেন কুঁড়ের দাওয়ায়; সুরু হোল তার বীণা বাজানো।

কিন্তু হঠাৎ একি হোল? বীণার তার গেল ছিঁড়ে, সুর গেল থেমে। বিষাদের ছায়ায় ভরে গেল চারিদিক। গোধূলির সাথে সাথেই নেমে এল চির অন্ধকার।